ISSN : 2582-3841 (O)
2348-487X (P)

এবং প্রান্তিক

Ebong Prantik

বর্ষ ১১, সংখ্যা ২৬, মে, ২০২৪

এবং প্রান্তিক

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 8.111
Vol. 11th Issue 26th, May, 2024

সম্পাদক

সৌরভ বর্মন

এবং প্রান্তিক
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

Ebong Prantik
A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 8.111
[ISSN : 2582-3841(O), 2348-487X(P)],
Published & Edited by Dr. Ashis Roy, Chandiberiya, Saradapalli,
Kestopur, Kolkata - 700102, and
Printed by Ananya, Burobattala, Sonarpur, Kolkata - 150,
Vol. 11th Issue 26th, 27th May., 2024, Rs. 950/-
E-mail : ebongprantik@gmail.com
Website : www.ebongprantik.in

প্রকাশ
১১ তম বর্ষ ও ২৬ তম সংখ্যা
২৭ মে, ২০২৪

ISSN : 2582-3841 (Online)
2348-487X (Print)

কপিরাইট
সম্পাদক, এবং প্রান্তিক

প্রকাশক
এবং প্রান্তিক
আশিস রায়
রেজিষ্টার্ড অফিস
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০ ১০২
ফোন - ৯৮০৪৯২৩১৮২
সার্বিক সহয়তা - সৌরভ বর্মন
ফোন - ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

মুদ্রণ
অনন্যা
বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৫০
ফোন - ৯১৬৩৯৩১৪৬৫

মূল্য : ৯৫০ টাকা

এবং প্রান্তিক

উপদেষ্টামণ্ডলী

ড. মানস মজুমদার, ড. ব্রততী চক্রবর্তী, স্বামী তত্ত্বসারানন্দ, স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ,
ড. অমলেন্দু চক্রবর্তী, ড. সেলিম বক্স মণ্ডল, ড. প্রবীর প্রামাণিক,
ড. মনোজ মণ্ডল, সুজয় সরকার

বিশেষজ্ঞমণ্ডলী

ড. মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায় (বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সৌমিত্র শেখর (উপাচার্য, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমন গুণ (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুব্রত জ্যোতি নেওগ (অসমীয়া বিভাগ, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অচিন্ত কুমার ব্যানার্জী (বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজন্তা বিশ্বাস (ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. হোসনে আরা জলী (বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমিতা চ্যাটার্জি (বাংলা বিভাগ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. দীপঙ্কর মল্লিক (বাংলা বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির)
ড. বিনায়ক রায় (ইংরাজি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজিত মণ্ডল (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অনির্বাণ সাহু (বাংলা বিভাগ, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. মৃণ্ময় প্রামাণিক (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. ইনতাজ আলী (ইংরেজি বিভাগ, নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়)

সম্পাদকমণ্ডলী

রচনা রায় (বাংলা বিভাগ, আমডাঙ্গা যুগল কিশোর মহাবিদ্যালয়)
ড. অজয় কুমার দাস (বাংলা বিভাগ, বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়)
শর্মিষ্ঠা সিন্‌হা (বাংলা বিভাগ, ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ)
ড. অজয় ঘোষ (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ)
ড. আশীষ কুমার সাউ (বাংলা বিভাগ, আর্য মহিলা পি. জি. কলেজ, বারাণসী)
ড. রতন সরকার (শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগ, পি. কে. কলেজ, কাঁথি)

কার্যকরী সম্পাদক - সৌরভ বর্মন

সহ-সম্পাদক - ড. টুম্পা রায়

প্রধান সম্পাদক - ড. আশিস রায়

লেখা পাঠানোর বিষয়ে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়

১. সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ পাঠাতে হবে। ২০০০ - ২৫০০ শব্দ সংখ্যা এবং সঙ্গে ৪০০/৫০০ শব্দের সারাৎসার পাঠাতে হবে।
২. পেজমেকার/ওয়ার্ড ফাইলে লেখা পাঠানো যাবে। ১৪ ফন্টে লেখা পাঠাতে হবে এবং সঙ্গে পি ডি এফ ও সফট কপি (লেখা নির্বাচিত হলে) পাঠাতে হবে। হাতে লেখা হলে মার্জিনসহ পরিচ্ছন্ন লেখা পাঠাবেন।
৩. অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হবে না। লেখার কপি রেখে লেখা পাঠাবেন।
৪. পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা প্রকাশ করা হয় না।
৫. কোনো লেখা ছাপার জন্যে নির্বাচিত হয়েছে কিনা তা জানতে ৩/৪ মাস সময় লাগতে পারে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

প্রধান কার্যালয়

চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

ফোন : ৯৮০৪৯২৩১৮২

Registered Address

Ebong Prantik, Chandiberiya, Saradapalli,
Kestopur, Kolkata - 700102
Ph. No. : 9804923182
E-mail : ebongprantik@gmail.com

ব্রাঞ্চ অফিস

ভগবানপুর, বি. এইচ. ইউ, বারাণসী - ২২১০০৫ / বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০১৫০

পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ১৫০০ টাকা এবং
ডাকযোগে পত্রিকা পাঠাতে হলে ডাক খরচ গ্রাহককে বহন করতে হবে

প্রাপ্তিস্থান

দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা / পাতিরাম বুকস্টল, কলেজ স্ট্রিট / ধ্যানবিন্দু, কলকাতা / এবং পত্রিকা দপ্তর

বিস্তারিত জানতে দেখুন
Website : www.ebongprantik.in

সূচিপত্র

মহাভারত একটি রত্ন - মহাসাগর

নীলকান্ত বিশ্বাস ১৫

প্রাচীন খমের সভ্যতার হাসপাতাল, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও ঔষধের অনুশীলন

অবিনাশ সেনগুপ্ত ২১

মনোরঞ্জন ব্যাপারীর বাতাসে বারুদের গন্ধ উপন্যাস : প্রসঙ্গ বঞ্চনা এবং বিচ্ছিন্নতা

তন্ময় সরকার ২৯

সমাজ ও সাহিত্যে পুরাণের প্রভাব

হরিপদ মহাপাত্র ৩৬

করুণাহত্যা : একটি নৈতিক আলোচনা

রেশোব মণ্ডল ৪০

পুতলি মায়া দেবী (পোদ্দার) ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও সমাজ সংস্কারের ইতিহাসে এক অনালোচিত নাম

নারায়ণ নন্দী ৪৭

রমাপদ চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যের এক জীবনবাদী সাহিত্যিক

মৌসুমী পাল ৫৫

সমাজ পরিবর্তনে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী : একটি পর্যালোচনা

সোহরাব মণ্ডল ৬২

নলিনী বেরার গল্পে দলিত জীবন

প্রীতিলতা সরকার ৭০

ন্যায় হল বন্ধুর উপকার সাধন ও শত্রুর ক্ষতি সাধন : প্লেটোর সমালোচনা এবং বর্তমান প্রেক্ষিত

দীপঙ্কর কৈবর্ত্ত ৮০

মতুয়া আন্দোলনে নারী মুক্তির ধারনা

পরিতোষ মণ্ডল ৮৭

সন্মাত্রানন্দের ‘নাস্তিক পন্ডিতের ভিটা’ : ইতিহাসের চিত্রপটে আঁকা এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর জীবনালেখ্য

কৃষাণ নমঃ ৯৪

মেঘনাদবধ কাব্য চর্চার বিবর্তন : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিবেদিতা গুহ ১০৪

‘নবান্ন’ বনাম ‘দেবীগর্জন’ উত্তরণের দিশারী
শিপ্রা দত্ত (ঘোষ) ১১০
সময়, সমাজ ও তুলসী লাহিড়ীর ‘ছেঁড়া তার’
পিনাকী বিশ্বাস ১১৯
‘রস’–রসিক–রহস্য - আখ্যানের নবনির্মাণ
মধুরা চক্রবর্তী ১২৬
স্বস্তিমৃত্যু : একটি নৈতিক আবেদন
শিল্পা দাস ১৩১
অনুসন্ধানে বাঁকাউল্লা : অপরাধ-কাহিনির নানা দিক
সৌপ্তিক কুমার মান্না ১৪০
ইরাবতী কার্ভের মহাভারত-চিন্তন ও দুই বাঙালি সমালোচক
শিবনাথ দত্ত ১৪৯
উনিশ শতকের কলকাতা : প্রসঙ্গ মদ্যপান
অদিতি ব্যানার্জী ১৫৮
প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে ক্রীড়াপ্রসঙ্গ : একটি অনুসন্ধান
রাহুল পণ্ডা ১৬৮
কাজী নজরুল ইসলামের রাজনৈতিক চেতনার অনুসন্ধান
পুলক কুমার দাস ১৭৫
কিন্নর রায়ের ছোটগল্প : সময় ও সমাজের শিল্পরূপ
উজ্জ্বলা সূত্রধর ১৮৬
কল্লোলের আড্ডায় সম্পর্কের রসায়ন
সুতৃষ্ণা ঘোষ ১৯৪
জাতীয়তাবাদ ও রাণী রাসমণি
সুকুমার ষন্নিগ্রহী ২০২
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে সমাজভাবনা : প্রাক্‌স্বাধীনতা পর্ব
অপর্ণা সেনগুপ্ত ২১০
দৃষ্টির ভিন্নতায় নন্দনতত্ত্ব
বিশ্বজিৎ দে ২২৭
ধর্মীয় অভিজ্ঞতায় মুক্তির পথ : দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ এর অভিমত
প্রতিমা ঢালী ২৩৬
প্রান্তিক মানব-পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুজীবনের কথা : একটি
ঐতিহাসিক গ্রন্থ পর্যালোচনা
রঘুনাথ রায় ২৪২

বাংলা ভাষাচর্চায় উইলিয়ম কেরী : প্রসঙ্গ ‘কথোপকথন’
রোহিত মণ্ডল ২৫১
বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও লোক ঐতিহ্য
তপনকুমার বালা ২৬০
বাঁকুড়া জেলা : ইতিহাসের প্রেক্ষিতে
প্রদ্যোৎ কুমার হোতা ২৭১
বিমল করের ‘যদুবংশ’- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সামাজিক অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে চার যুবকের আত্মার মৃত্যু ও পুনর্জন্মের আখ্যান
শঙ্খ দত্ত ২৭৯
ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে গৌতম বুদ্ধের আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ : একটি পর্যালোচনা
জয়ন্ত বায়েন ২৮৭
ভারতবর্ষে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বৈদ্যুতিন প্রশাসনের ভূমিকা
প্রভাস মন্ডল ২৯৬
মধ্যযুগের রোমান্টিক প্রণয়কাব্য কোরেশী মাগন ঠাকুর বিরচিত ‘চন্দ্রাবতী’ : একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন
হুমায়ুন কবির ৩০৫
‘ময়মনসিংহ-গীতিকা’য় মৃত্যুর অনুষঙ্গ : সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং সহাবস্থানের দ্বন্দ্ব
সুব্রত পোদ্দার ৩১২
রাজপাট ধর্মপাট : বর্তমান সময়ের নিরিখে ষোড়শ শতকের বাংলার ধর্ম, রাজনীতি ও চৈতন্যদেবের অবস্থান
অরিজিৎ পাল ৩১৮
লিঙ্গ বৈষম্যের জৈবিক ও সামাজিক ভিত্তি
প্রণব ঘোষ ৩২৭
শব্দ সমীক্ষা : বিষ্ণু দে-র কবিতা
খোকন বর্মন ৩৩৭
সারদাদেবী : চিরকালীন আধুনিকতার এক প্রতিচ্ছবি
পারমিতা দত্ত ৩৫১
সত্তরের ছোটগল্প : প্রতিষ্ঠান বিরুদ্ধ স্রোত
নবীনচন্দ্র দে ৩৫৬
সপ্তগ্রাম বন্দরের হাত ধরে বেতড় বন্দরের উত্থান (ষোড়শ থেকে সপ্তদশ শতক)
মানসী জানা ৩৬৪

স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথ
প্রদীপকুমার পাত্র ৩৭১
সমরেশ বসুর 'সুচাঁদের স্বদেশযাত্রা' : উদ্‌ভ্রান্ত উদ্বাস্তু মানুষের দল
দেবাশিস মণ্ডল ৩৮২
'মনসা'র বিবর্তন...লেখকের কলম থেকে পাঠকের চোখে...
শম্পা লাহা ৩৮৬
"ভেসে থাকি অস্তিত্বের দৈন্য নিয়ে" : অমল, বিমল, কমলের
অস্তিত্ব-জিজ্ঞাসা 'এবং ইন্দ্রজিৎ'
শ্রেয়সী রায় ৩৯২
"মহাশ্বেতা দেবীর হারুণ সালেমের মাসি : বিশ্বমাতৃত্বের মহীয়সী রূপ"
আশিস কুমার সাহু ৪০০
অসহযোগ আন্দোলন ও প্রবাসী পত্রিকায় শিক্ষা বিষয়ক ভাবনা :
একটি পর্যালোচনা
অরিজিৎ প্রামাণিক ৪০৭
বাংলা ছড়ায় প্রচ্ছন্ন ইতিহাস
লিসা পাল ৪১৬
যোগের সিদ্ধি ও ঈশ্বর : একটি দার্শনিক সমীক্ষা
চৈতালী সাহা ৪২৪
উনিশ – বিশ শতকের বাংলা নাটকে প্রতিফলিত মহাভারতের কর্ণ চরিত্র
সৌরভ সামন্ত ৪৩৪
সমাজ সংস্কারে নদীয়া জেলা ; প্রসঙ্গ বিধবা বিবাহ
ইন্দ্রাণী দত্ত ৪৪১
ব্যক্তি-ইচ্ছা : প্রকৃতির প্রতিফলন
জয়িতা দত্ত ৪৪৫
বীরাঙ্গনা দুর্গাবতী : রাজকন্যা, রাজমহিষী ও রাজমাতা
জীবনকৃষ্ণ পাত্র ৪৫৫
তোমায় কিছু দেব বলে : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'খেয়া' কাব্যের অন্তর্জগত
সুমনা সান্যাল ৪৬১
হামিরউদ্দিন মিদ্যার 'মাঠরাখা' পল্লিবাংলার নকশি কাঁথা
সুখেন্দু ঘোষ ৪৬৮
এশিয়ার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার : বিশ শতকের প্রগতিশীল এবং
জাতীয়তাবাদী ভারতীয় বাঙালির দৃষ্টিতে জাপানের উৎসব ও পারফরমেন্স
অদ্রিজা ভট্টাচার্য ৪৭৬

অরুণোদয় সাহার ‘পদ্ম পাতায় জল’: সমকালীন সমাজের প্রতিচ্ছবি
রাকেশ দেবনাথ ৪৮৬
রবীন্দ্রনাথের ‘শাস্তি’: নামকরণের অন্দরমহল
রামকৃষ্ণ মণ্ডল ৪৯৩
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুঙ্গভদ্রার তীরে : একটি ভিন্ন পাঠ
বনমালী খাটুয়া ৫০২
“হরিজন উন্নয়ন কথা”: ভাঙ্গী সম্প্রদায়ের জীবনগাথা
তুহিনা মণ্ডল (মল্লিক) ৫১৭
জাতি চেতনা সম্প্রসারণে জাতি সংগঠন : নমঃশূদ্র জাতির
একটি পর্যালোচনা (১৮৭২-২০০০)
কৃষ্ণ কুমার সরকার ৫২৭
বর্তমান ভারতবর্ষের দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যার
সমাধানে ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার দার্শনিক ভাবনা ও
তার প্রাসঙ্গিকতা
পায়েল গিরি ৫৩৭
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘ভীম বধ’ ; নাটকের মধ্যে নাটক
দিবাকর দাস ৫৪৬
নারীর কলমে নারীকণ্ঠ : প্রসঙ্গ রাসসুন্দরী দাসীর ‘আমার জীবন’
অরবিন্দ সরকার ৫৫৩
লুক্কায়িত প্রবৃত্তির জীবন্ত ক্যানভাস : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত
‘প্রাগৈতিহাসিক’ গল্প
নার্জিয়া পারভীন ৫৬৩
বাংলা মঞ্চ ও অভিনয়ের বিবর্তনরেখা : শম্ভু মিত্রের বুদ্ধিদীপ্ত আলোকপাত
লিপিকা সরকার ৫৬৯
বাঙালি নারীর স্মৃতিকথায় আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অনুভব
অতনু রায় ৫৭৭
বনফুলের ছোটগল্পে মানবজীবনের বিচিত্র রূপ
রেন্টু মন্ডল ৫৮৭
‘বিদেশী নায়িকা’ কবিতায় অদ্বৈতের অনন্য অনুভূতি
মৌসুমী পাল ৫৯৬
রামেশ্বরের ‘শিবায়ন’ কাব্যের নির্বাচিত পাঠে কারক-বিভক্তির প্রয়োগ বৈচিত্র্য
মিন্টু নস্কর ৬০০
মনোজ বসুর ছোটগল্পে যুগ ও জীবনের অসঙ্গতি
সৌমেন মণ্ডল ৬১৪

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় চিত্রকল্প
সুব্রত মাহাত ৬২৫
উনিশ শতক ও সমাজ সংস্কার : প্রসঙ্গ কালীপ্রসন্ন সিংহের কলকাতা
ইতিষা নন্দী ৬৩৪
সমীর রক্ষিতের ছোটোগল্পে মহানগর : জীবন ও জীবিকার লড়াই
সৈকত মাহাতো ৬৪৮
হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বেণের মেয়ে' : অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের আখ্যান
অভিজিৎ মান্না ৬৫৭
ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে সুন্দরবন অঞ্চলের জনজীবন,
জীবিকা ও বিপন্নতা
অনুময় মণ্ডল ৬৬৮
বঙ্গভঙ্গ ও মুসলিম সমাজ : এক ঐতিহাসিক পর্যালোচনা
জগবন্ধু সরদার ৬৭৮
সংকটের প্রশ্নে ঘোড়ামারা দ্বীপ : একটি ঐতিহাসিক অনুসন্ধান
বিদ্যুৎ সরকার ৬৮৬
"Cinema as the Mouthpiece of the Lower Class
People of the Society : A Descriptive Study of Select
Buddhadev Dasgupta's Films"
Balaram Mistry
Ashok Kumar Meena ৬৯৪
Journey to Liberation : A study of Moksha in Indian philosophy
Shashank Pandey ৭০৩
Moral Standard : An analysis from Kantian Perspective
Nripen Biswas ৭১০
The Relation between Aesthetics and Morality :
An Ethical Perspective
Pankaj Sen ৭১৯
Post Pandemic Education in India : A Feministic Perspective
Kamalika Basu ৭২৫
PUBLIC HEALTH AND MEDICAL SYSTEM IN MEDINIPUR
DISTRICT DURING COLONIAL PERIOD : A HISTORICAL STUDY
Indrajit Mahanta ৭৪১

Women's empowerment in India
Utkalika Sahoo ৭৫১
NEP 2020 And Inclusive Education For All : A
Comprehensive Review
RIYA BISWAS
SARTHAK PAUL ৭৬১
Community Identities through Oral Narratives of Partition
Prajna Paromita Podder ৭৭২
The Fever in South West Bengal – A Study
Subhankar Sengupta ৭৮২
Formation of Identity in Dalit Autobiographies
Kisor Baulia ৭৯০
Feluda : Literary Legacy vs. Cinematic Charm - A
Comparative Analysis of Popularity and Impact
Sayan Sarkar ৮০৫
UPENDRA NATH BARMAN : CASTE MOBILITY
MOVEMENT UNDER KSHATRIYA SAMITI AND
SOCIAL REFORM
Mampi Barman ৮১৬

সম্পাদকীয়

দেখা আর না-দেখার মধ্যে অনেক বিস্তর পার্থক্য থাকে। আমরা সকলে দেখি। তবে সেটা শুধু মাত্র দেখার জন্য দেখা। তার মধ্যে কোন উদ্দেশ্য বা বিধেয় থাকে না। থাকে না কোন গভীর অনুসন্ধানী চোখ। কিন্তু দেখা যদি শুধুই দেখা হয় তাহলে অনেক ফাঁকি থেকে যায়। দেখার সাথে বুদ্ধিমত্তার মিশ্রণ থাকা খুব জরুরী। সাধারণ দেখাটা অসাধারণ তখনি হবে যখন অনুসন্ধানী চোখ থাকবে। এবারের ‘এবং প্রান্তিক’ -এ সেই অনুসন্ধানী চোখ ও বুদ্ধিমত্তার সংমিশ্রণ ঘটেছে।

মহাভারত একটি রত্ন - মহাসাগর

নীলকান্ত বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সারসংক্ষেপ : মহাভারত মানব সভ্যতার সর্ববিধ আচার - অনুষ্ঠান ও চিন্তার আকর। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে আমাদের বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। বিষয়বস্তুর গৌরবে গাম্ভীর্যে এবং আকৃতির বিশালতায় এই গ্রন্থ পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। মানব জীবনের এরূপ কোন অবস্থা আসিতে পারে না, যাহাতে মহাভারতের উজ্জ্বল আলোক তাহার পথপ্রদর্শক হইবে না। এই মহাভারত সর্ববিধ জ্ঞানের আকর। মহাভারত যেমন ভগবান কৃষ্ণ থেকে বহু বিশিষ্ট পুরুষের আখ্যান, তেমনই কুলপঞ্জিকায় গৃহীত নয় এমন বহুনারীর জীবন সংগ্রামের কাহিনিও। মহাভারতের বহুধা বৈচিত্র্যমণ্ডিত চরিত্রের বর্ণনায় নারী ও পুরুষদের নিয়ে অসংখ্য উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক লেখা হয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে সুখ ও দুঃখ, যে জয় ও পরাজয়, যে সান্ত্বনা ও বঞ্চনা, তার সবটাই সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে মহাভারতের পর্বে পর্বে। আজকের দিনের জীবন- যুদ্ধের সঙ্গে হয়তো সেদিনের জীবন- যুদ্ধের অনেক বৈসাদৃশ্য আছে এবং তা থাকাও স্বাভাবিক। তবুও বলতে পারি স্বাদৃশ্য আছে অনেকখানি। তাই কয়েক হাজার বছরের ব্যবধান অতিক্রম করেও বিশ শতকের মানুষ এই মহাকাব্যের মধ্যে নিজ জীবনের বহু সমস্যার সমাধান খুঁজে পাচ্ছে এবং অনুপ্রেরণা লাভ করেছে জীবন পথে অগ্রসর হবার। মহাভারতের জনপ্রিয়তা শুধু আজ ভারতবর্ষেই নয় ভারতবর্ষের বাইরেও মহাভারতের পঠন- পাঠন ও আলোচনার কথা শুনতে পাই। মহাকাব্য মহাভারতের প্রত্যেকটি চরিত্র মানবচরিত্রের এক একটি বৈচিত্র্যের বৈজয়ন্তী পতাকা। হিমালয়ের ন্যায় মহাভারতও অতি তুঙ্গ এবং বিরাট, রত্নাকর সুগম্ভীর সমুদ্রের ন্যায় ইহা অতলস্পর্শী এবং অসংখ্য রত্নের আকর। সুতরাং বিষয়টি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়াস রাখে।

মূল শব্দ: মহাভারত, মহাকাব্য, ভারতীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, কৃষ্ণ।

সংস্কৃত মহাকাব্য: মহাভারত হলো সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রাচীন ভারতের দুটি প্রধান মহাকাব্যের অন্যতম (অপরটি হলো রামায়ণ)। এই মহাকাব্যটি সংস্কৃত শাস্ত্রের ইতিহাস অংশের অন্তর্গত। সংস্কৃত মহাকাব্য বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ভাষায় রচিত ধ্রুপদী সাহিত্যের অন্যতম প্রধান শ্রেণি বিভাগ। মহাকাব্যের উৎপত্তির প্রকৃত সময় নির্দিষ্ট করা কঠিন কিন্তু এটা বিশ্বাস করা হয় যে ঋগ্বেদের মন্ত্র ও তত্ত্ব দিয়ে মহাকাব্য সৃষ্টির বীজ শুরু হয়েছিল। রামায়ণ ও মহাভারত দুটি মহাকাব্যের সৃষ্টির পর একই ধরনের আদর্শ অনুসরণ করে অন্যান্য মহাকাব্য তৈরি হচ্ছে, যা ভারতীয় সাহিত্যকে মর্যাদা দিয়েছে।

রামায়ণ ও মহাভারত শুরু হওয়ার সাথে সাথে প্রাক্- কালিদাস, কালিদাস এবং কালিদাস- পরবর্তী যুগের শেষ কবি শ্রীহর্ষ পর্যন্ত মহকাব্য সৃষ্টি অব্যাহত ছিল। এই মহাকব্যের বিস্তৃত পরিসর ভারতীয় সাহিত্যে মুল্যবোধ যুক্ত করেছে।

মহাভারতের বিষয়বস্তু: মহাভারতের মূল উপজীব্য বিষয় হলো কৌরব ও পাণ্ডবদের গৃহবিবাদ এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বাপর ঘটনাবলি। তবে এই আখ্যান ভাগের বাইরেও দর্শন ও ভক্তির অধিকাংশ উপাদানই এই মহাকাব্যে সংযোজিত হয়েছে।[১] ভরতবংশীয়দের (কৌরব ও পাণ্ডবদের) মধ্যকার যুদ্ধের কাহিনির কাব্যরুপ হলো মহাভারত। রামায়ণের মতো মহাভারতও হিন্দুদের কাছে একাধারে ধর্মগ্রন্থ ও জাতীয় মহাকাব্য। বিশালায়তন এই মহাকাব্যটিতে ভারতবর্ষের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও অধ্যাত্মচেতনার পূর্ণ বিকাশ লাভ করেছে। মহর্ষির ভাষায়-

"পুরা কিল সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ সমেত্য তুলয়া ধৃতম্।
চতুর্ভ্যঃ সরহস্যেভ্যো বেদেভ্যো হ্যধিকং যদা্।।
তদা প্রভৃতি লোকেহস্মিন্ মহাভারতমুচ্যতে।
মহত্ত্বে চ গুরুত্বে চ ধ্রিয়মাণং যতোহধিকম্।
মহত্ত্বাদ ভারবত্ত্বচ্চ মহাভারতমুচ্যতে।। আদি ১/২৭২, ২৭৩
ভরতানাং মহজ্জন্ম তস্মদ্ভারতমুচ্যতে।" স্বর্গা ৫/৪৫

অর্থাৎ, প্রাচীনকালে দেবতারা মিলিত হয়ে তুলাদণ্ডের একদিকে সরহস্য সমগ্র বেদ ও অন্য দিকে মহাভারতকে স্থাপন করে ওজন করেছিলেন। এই গ্রন্থটির মহত্ত্ব ও গুরুত্ব অধিক হওয়ায় এই গ্রন্থখানি মহাভারত নামে পরিচিতি লাভ করে। ভরতবংশীয় নৃপতিগণের জন্মবৃত্তান্ত এই গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে। সে কারণে এই গ্রন্থ ভারত নামেও পরিচিতি লাভ করেছে। এই মহাভারতকে কার্ষ্ণ বেদ (আদি ১/২৬৮, স্বর্গা ৫/৪১) অর্থাৎ মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ (দ্বৈপায়ন) কর্তৃক বিরচিত বেদ এবং ইহাকে পঞ্চম বেদও (আদি ৬৩/৮৯। শা ৩৪০/২১) বলা হয়েছে।[২]

মহাভারতের রচয়িতা: মহাভারতের রচয়িতা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস। প্রাচীন ঐতিহ্য অনুযায়ী মহাভারত অষ্টাদশ পুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণের রচয়িতা একই সাথে বেদকে বিভক্তকারী মহর্ষি ব্যাস স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার হিসেবে মনে করা হয়। বেদের মন্ত্রসমূহ ও খণ্ডিত করা হিসেবে তাঁর নাম বেদব্যাস। প্রাচীনকালের ইতিহাস অনুসারে ঋষি সত্যবতীর পুত্র কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস। অনুমান করা হয় সত্যবতী যমুনার কোনও দ্বীপে সন্তানের জন্ম দেন তাই তাঁর সন্তানের নামকরণ হয় দ্বৈপায়ণ। তাঁর শরীরের বর্ণের রং ছিল কৃষ্ণ বর্ণের তাই তাঁর নাম কৃষ্ণ। রামায়ণের রচয়িতা বাল্মীকি ছিলেন রামায়ণের একটি চরিত্র এবং রামায়ণের মূল ঘটনার সাথে জড়িত, তেমনি মহাভারতের রচয়িতা ব্যাসদেবও মহাভারতের অন্যতম চরিত্র। ব্যাসদেব ছিলেন ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের পিতা। বাল্মীকির ন্যায় ব্যাসদেবও ছিলেন রহস্যময় অজ্ঞাত পুরুষ।[৩]

মহাভারতের কাহিনি: ভরত বংশের রাজা ছিলেন শান্তনু। তাঁর পুত্রের নাম ছিল ভীষ্ম। ধীবরকন্যা সত্যবতীর রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে সত্যবতীকে শান্তনু বিয়ে করেন। সত্যবতীর গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য নামক দুই পুত্র সন্তান লাভ করেন। ভীষ্ম পিতার স্বার্থে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে না বসে তিনি চিরকুমার থাকবেন এমন সিদ্ধান্ত নিলেন। সত্যবতীর অপর পুত্র তার নাম কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। চিত্রাঙ্গদের অকালে মৃত্য হলে ভীষ্ম বিচিত্রবীর্যকে রাজ্যের উত্তরাধিকরী নিয়োগ প্রদান করেন। বিচিত্রবীর্যও পুত্রহীন অবস্থায় মারা গেলেন। সত্যবতীর আদেশে ভীষ্মের পরামর্শে নিয়োগবিধি অনুসারে বিচিত্রবীর্যর ভ্রাতা মহর্ষি ব্যাসের ঔরসে রাজমহিষী অম্বিকা, অম্বালিকা ও অম্বিকার দাসীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর এই তিন জন পুত্রের জন্ম হয়। এদের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন জন্মান্ধ। এজন্য ধৃতরাষ্ট্রের পরিবর্তে পাণ্ডু রাজা হলেন। ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী ছিলেন গান্ধার রাজকন্যা গান্ধারী। তাঁদের শত পুত্র ছিল- দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি। পাণ্ডুর দুই পত্নী ছিল তাঁদের নাম যাদব রাজবংশের কন্যা কুন্তী ও মদ্রদেশের রাজকুমারী মাদ্রী। কুন্তীর তিন পুত্র ছিল- যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন । মাদ্রীর যমজ পুত্র ছিল নকুল ও সহদেব। সমস্ত কাহিনিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মূখ্য চালকের ভূমিকায় থাকেন। কে রাজা হবেন- পাণ্ডুর পুত্র, না ধৃতরাষ্ট্রের? শুরু হয় হিংসা, ষড়যন্ত্র, কপট দ্যূতক্রীড়া বনবাস ইত্যাদি । কাহিনির পরিণতি অষ্টাদশদিবসব্যাপী এক সংহারক যুদ্ধ। যাকে বলা হয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ। যাতে ভারতবর্ষের বহু রাজার প্রাণ যায়। মৃত্যু হয় ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্যোধন, দুঃশাসনসহ মোট শতপুত্রের। শেষে রাজত্ব পান জ্যেষ্ঠ পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্টির।[৪]

মহাভারতের পর্ব সংখ্যা: মহাভারত মহাসমুদ্রের মতো বিশাল ও অনন্ত জ্ঞানরত্নের অমূল্য ভাণ্ডার। তাই বলা হয়েছে-

“যথা সমুদ্রো ভগবান্ তথা হি হিমবান্ গিরিঃ।
খ্যাতাবুভৌ রত্ননিধি তথা ভারতমুচ্যতে।।” স্বর্গা ৫/৬৬

মহাভারত আঠারটি পর্বে বিভক্ত। পর্বগুলে হলো ১. আদি পর্ব ২. সভা পর্ব ৩. বন পর্ব ৪. বিরাট পর্ব ৫. উদ্যোগ পর্ব ৬. ভীষ্ম পর্ব ৭. দ্রোণ পর্ব ৮. কর্ণ পর্ব ৯. শল্য পর্ব ১০. সৌপ্তিক পর্ব ১১. স্ত্রী পর্ব ১২. শান্তি পর্ব ১৩. অনুশাসন পর্ব ১৪. অশ্বমেধিক পর্ব ১৫. আশ্রমবাসিক পর্ব ১৬. মৌষল পর্ব ১৭. মহাপ্রাস্থানিক পর্ব ও ১৮. স্বর্গারোহণ পর্ব।

১. আদি পর্ব: অনুক্রমণিকায় মহাভারত রচনার পূর্বের কাহিনি কৌরব ও পাণ্ডব বংশের ইতিহাস, কুরু পাণ্ডবের অস্ত্রশিক্ষা, পাণ্ডবদের ছদ্মবেশে ভ্রমণ, দ্রোপদীর বিবাহ ও খাণ্ডবদাহ ইত্যাদির বর্ণনা করা হয়েছে।

২. সভা পর্ব: সভাগৃহ নির্মাণ, রাজসূয় যজ্ঞ, কৌরব ও পাণ্ডবদের দ্যূতক্রীড়া, দ্রৌপদীর অপমান, পাণ্ডবদের পরাজয় ও বনবাস বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।[৫]

৩. বন পর্ব: পাণ্ডবদের বনবাসের কাহিনি আলোচনা করা হয়েছে।

৪. বিরাট পর্ব: পাণ্ডবদের ছদ্মবেশ ধারণ করে বিরাট রাজপুরীতে অবস্থান, কৃষ্ণের আগমন ও সন্ধির প্রস্তাব প্রভৃতি কাহিনি আলোচিত হয়েছে।

৫. উদ্যোগ পর্ব: উভয় পক্ষ অর্থাৎ কৌরব ও পাণ্ডবদের যুদ্ধের কাহিনি এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

৬. ভীষ্ম পর্ব: এটি মহাভারতের একমাত্র পর্ব যেখানে প্রধান নায়ক অর্জুন নয় বরং ভীষ্ম ও কৃষ্ণ। এই পর্বে কৃষ্ণ তার ঐশ্বরিক বিশ্বরূপ দেখান।

৭. দ্রোণ পর্ব: দ্রোণ কর্তৃক ভয়াবহ যুদ্ধ, জয়দ্রথ প্রভৃতি বধের কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে।

৮. কর্ণ পর্ব: অর্জুনের দ্বারা কর্ণের নিধনের কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে।

৯. শল্য পর্ব: শল্যের হত্যা, গদাযুদ্ধে ভীম কর্তৃক দুর্যোধনের হত্যার কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে।

১০. সৌপ্তিক পর্ব: পাণ্ডবদের বিনাশ, অশ্বত্থামার পাণ্ডব শিবিরে আক্রমণ, ভুলক্রমে দ্রৌপদীর পাঁচপুত্রকে হত্যার কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে।

১১. স্ত্রী পর্ব: আত্মীয় স্বজনসহ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর শোক আলোচিত হয়েছে।

১২. শান্তি পর্ব: যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক, আশ্রমধর্ম, ও রাজ্যপালন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১৩. অনুশাসন পর্ব: যুধিষ্ঠিরকে ভীষ্ম কর্তৃক ধর্মের (আইন) শাসনের উপদেশ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১৪. অশ্বমেধ পর্ব: যুধিষ্ঠিরের উদ্বেগ ও ব্যাসদেবের উপদেশ, যুধিষ্ঠির নিকট কৃষ্ণের আগমন, যুবনাশ্ব রাজার অশ্বহরণ, অশ্বমেধ যজ্ঞের উদ্যোগ, অর্জুনের অশ্বসহ পৃথিবী ভ্রমণ প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

১৫. আশ্রমিক পর্ব: গান্ধারী, ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয় ও কুন্তীর বনে গমন বিষয়ে আলোচিত হয়েছে।

১৬. মৌষল পর্ব: যদুবংশীয়রা নিজেদের মধ্যে সংঘাতের ফলে তাঁদের বংশের করুণ পরিনতি বিষয় আলোচনা হয়েছে।

১৭. মহাপ্রাস্থানিক পর্ব: ভ্রাতৃদ্বয়সহ পঞ্চ পাণ্ডবের সাথে দ্রোপদীর মহাপ্রস্থানের বিষয়ে আলোচিত হয়েছে।

১৮. স্বর্গারোহণ পর্ব: পাণ্ডবগণের মেঘনাদ পর্বতে আরোহন, দ্রোপদীর দেহত্যাগসহ যুধিষ্ঠিরের সশরীরে স্বর্গে গমন ও অন্যান্য আত্মীয়দের সাথে মিলনের কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে।[৬]

মহাভারতের রচনাকাল: মহাভারতের রচনাকাল বললে কোন একটি বিশেষ সময়কে বুঝায় না। কোন নির্দিষ্ট সময়ে, কোন এক জনের দ্বারা এর রচনা শুরু হয়ে শেষ হয়ে যায় নি। কালের যাত্রাপথে যুগে যুগে বিভিন্ন দিক থেকে মেদ সঞ্চয় করে মহাভারত তার স্বীয় কলেবর উন্নতি করেছে। সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্মনীতি, ভাষানীতি, ছন্দ

ইত্যাদি ক্ষেত্রে মহাভারতের নানা অংশের মধ্যে রচনাগত পার্থক্য আছে। আর এর থেকে সহজেই অনুমান করা হয়, মহাভারত একই কালের এবং কোন একজনের দ্বারা রচনা নয়। মহভারত প্রধানত তিনটি স্তরে রচিত।

১. প্রথম স্তর: জয় বা সৌত রচনা।

২. দ্বিতীয় স্তর: ভারত বা ব্রাহ্মণস্য রচনা।

৩. তৃতীয় স্তর: ভিক্ষু বা শ্রমনগণের রচনা।

১. প্রথম স্তর: জয় বা সৌত রচনা: মহাভারতের মূল অংশ কোন সুদূর অতীতে রচিত হয়েছিল তা নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এই পর্যায়ে কেবল কুরু পাণ্ডবদের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী রাজাদের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ বিগ্রহের কাহিনি রচিত হয়েছে। এই স্তরে শ্লোক সংখ্যা ৮৮০০ তাই মহাভারতের আদি পর্বে বলা হয়েছে- "অষ্টৌ শ্লোক সহস্রাণি অষ্টৌ শ্লোকশতানি চ।" কুরু পাণ্ডবদের যুদ্ধ মহাভারতের মূল ঐতিহাসিক ঘটনা হওয়ার থেকে বলা যায় যে, আনুমানিক ৭০০ থেকে ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মহাভারত রচিত হয়েছিল।

২. দ্বিতীয় স্তর: ভারত বা ব্রাহ্মণস্য রচনা: এই স্তর থেকে মহাভারতের কলেবর বৃদ্ধি পেতে থাকে। দেবতাদের কাহিনি, সৃষ্টি, স্থিতি, ও প্রলয়ের নানা গল্প, রাজনীতি, ধর্মনীতি বিষয়ক আখ্যান, উপাখ্যান, নলদময়ন্তি, সমুদ্র মন্থনের উপাখ্যান ইত্যাদি। এখানে কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার রূপে স্বীকার করে ব্রহ্মা- বিষ্ণু- মহেশ্বরের দেবত্ব ও প্রাধান্য বর্ণনা করা হয়েছে। শ্লোক সংখ্যা ২৪ হাজার। তাই বলা হয়েছে-

"চতুর্বিংশতি সাহস্রীংচক্রে ভারতসংহিতাম্।"

এই কাহিনি থেকে খুব সহজেই অনুমান করা হয় যে, আনুমানিক ৫০০ থেকে ২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মহাভারত রচিত হয়েছিল।

৩. তৃতীয় স্তর: ভিক্ষু বা শ্রমনগণের রচনা: তৃতীয় স্তরের রচনা ভিক্ষু বা শ্রমনগণের রচনা। এই স্তরে অনুশাসন ও দার্শনিক তত্ত্ব ছাড়াও অহিংসা, ব্রহ্মচর্য, জাগতিক নশ্বরতা, মোক্ষ ও নীতি ধর্মের উপদেশ প্রভৃতির দ্বারা সমৃদ্ধি হলে মহাভারত ১৮টি পর্বে, এক লক্ষ শ্লোক সমন্বিত হয়েছে বিশাল গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। তাই বলা হয়েছে-

"একংশত সহস্রং মানুষেষু প্রতিষ্ঠিতম্।"

দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে মহাভারতের প্রক্ষিপ্তাংশ সূচক। সহজেই অনুমান কর যায়, আনুমানিক ২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৩০০ খ্রিস্টাব্দের সময় মহাভারত রচিত হয়েছে। Winternitz বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, খ্রি.পূ. চতুর্থ শতক থেকে খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতক পর্যন্ত সুদীর্ঘ কাল ধরে মহাভারতের রচনর কাজ চলে- "Between the 4th centaury B.C. and the 4th centaury A.D. the transformation of the Epic Mahabharata into our present compilation took place, probably gradually."[৭]

উপসংহার: পৃথিবীতে যদি কোনও গ্রন্থ থাকে, যা চিরকালীন, চিরকালের মানুষের জন্য চিরন্তন সত্য - সে গ্রন্থ মহাভারত। যেগুলি মানুষের অপ্রয়োজনীয়, সেগুলি বাদ দিয়ে আধুনিকতম মানুষও মহাভারতে তাঁর ভাবনার, চিন্তার, জীবনধারার সকল খোরাকই পাবেন মহাভারত নামক রত্ন ভাণ্ডারে। মহাভারতের ব্যাপারে বাংলায় একটি প্রবাদ আছে, যা নেই ভারতে, তা নেই মহাভরতে। এর মানে হলো মহাভারতে যা আছে, তা ভারতবর্ষের অন্য কোথাও থাকতে পারে। কিন্তু মহাভারতে যা নেই, তা ভারতের কেথাও নেই। একারণে মহাভারত একটি রত্ন - মহাসাগর।

তথ্যসূত্র:

১. সেন, শিশির কুমার, 'মহাভারতের মূল কাহিনি ও বিবিধ প্রসঙ্গ', সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ, ১৩৯০, পৃ. ২- ৩।

২. ভট্টাচার্য, শ্রীসুখময়, 'মহাভারতের চরিতাবলী', আনন্দ প্রকাশক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন, ১৩৭৩, পৃ. ১-৩।

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ, 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ১৯৮৮/এ, পৃ. ৬৯।

৪. তদেব, পৃ. ৭২।

৫. তদেব, পৃ. ৭১।

৬. তদেব, পৃ. ৭২- ৭৩।

৭. বিশ্বাস, ড. নিখিল রঞ্জন, 'সংস্কৃত মঞ্জুষা', (প্রথম খণ্ড), প্রকাশক, দেববাণী, গোপালগঞ্জ, পৃ. ৫২- ৫৩।

প্রাচীন খমের সভ্যতার হাসপাতাল, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও ঔষধের অনুশীলন

অবিনাশ সেনগুপ্ত
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
খড়গপুর কলেজ

সারাংশ : খমের সাম্রাজ্য সমকালীন ইউরোপের অন্যান্য সভ্যতার তুলনায় অত্যন্ত অগ্রগামী ও উঁচু সংস্কৃতি সম্পন্ন সমাজ বলে পরিগণিত হয়, যেখানে এক উন্নত সুসংগঠিত স্বাস্থ্যপরিষেবা ব্যবস্থার পত্তন হয়েছিল। সমকালীন বহু শিলালিপি ও অন্যান্য সূত্র থেকে তাদের উন্নত হাসপাতাল ও আরোগ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। ঐ স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক, উভয় চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। হাসপাতালগুলির পরিচালন ব্যবস্থা ডাক্তার-কর্মী ও ঔষধ নির্মাণের উপাদান সম্পর্কিত তথ্যগুলি খমের রাজত্বের উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রামাণিকতা ও ব্যাপকতাকে প্রতিষ্ঠিত করে। রাজা সপ্তম জয়বর্মণ প্রজাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখার প্রয়োজন সম্বন্ধে সদা সতর্ক ছিলেন। চিকিৎসা শিক্ষার এক ভিন্নতর ব্যবস্থার পাশাপাশি তাদের ঔষধি জ্ঞান অবশ্যই খমেরদের চিকিৎসা ব্যবস্থার অগ্রগতিকে তুলে ধরে এবং এই স্বাস্থ্যপরিষেবা রাষ্ট্রের দ্বারা বিনামূল্যে প্রদান করা হত। সুতরাং খমের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, ঔষধি জ্ঞান ও হাসপাতাল সম্পর্কিত তথ্য ও বিশ্লেষণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
মূল শব্দ : খমের, আঙ্কর, হাসপাতাল, ঔষধ, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, সপ্তম জয়বর্মণ, মন্দির।

প্রত্যেকটি সভ্যতার কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে, যা একটি সমাজ ও সভ্যতাকে অন্য সভ্যতা থেকে আলাদা রাখে। খমেরদের ক্ষেত্রে এই ভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ভর করেছিল ভৌগোলিক ও পরিবেশগত বিষয়ের উপর। ভৌগোলিক ও পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যের সাথে খমের জনগণের কঠিন জীবনচর্চা ও উদ্যোগ খমের সামাজ্যকে সাহায্য করেছিল ইতিহাসের অন্যতম সম্পদশালী ও শক্তিশালী সাম্রাজ্য হিসেবে গড়ে উঠতে। বর্তমান যুগের দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটা বৃহৎ অংশ জুড়ে খমের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। আধুনিক কাম্বোডিয়া, লাওস, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামের অনেকটা অংশে এই হিন্দু-বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের আধিপত্য ছিল। খমের সাম্রাজ্যের সূচনা প্রচলিতভাবে ৮০২ খ্রীষ্টাব্দে ধরা হয়ে থাকে, যখন খমের রাজপুত্র দ্বিতীয় জয়বর্মণ নিজেকে চক্রবর্তীন বা সর্বজনীন শাসক বলে ঘোষণা করেছিলেন। খমের সাম্রাজ্যের সমাপ্তি ঐতিহ্যগতভাবে ১৪৩১ সালে ধরা হয়ে থাকে। ইউরোপের অন্যান্য সভ্যতার তুলনায় ঐ সময়ে খমেররা ছিল অত্যন্ত

অগ্রগামী ও উঁচু সংস্কৃতি সম্পন্ন সমাজ। খমেরদের বহু কৃতিত্বের পরিচয় তাদের ইতিহাস থেকে পাওয়া যায়।

স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা বিশ্বের যেকোন মহান সভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। একটি সভ্যতার আধুনিকতার মূল্যায়ন করা যেতে পারে তার চিকিৎসা ব্যবস্থার ইতিহাস থেকে। সাম্প্রতিক গবেষণা দাবী করে যে প্রাচীন আঙ্কর সাম্রাজ্য সরকারী উদ্যোগে পৃথিবীর প্রথম যথাযথ স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল। বৌদ্ধ সম্রাট সপ্তম জয়বর্মণ অসংখ্য হাসপাতাল (আরোগ্যশালা) নির্মাণ করেছিলেন।[১] ১২ শতকের শেষদিক থেকে হাসপাতালগুলির কার্যকারিতা শুরু হয়ে যায়। উত্তর-পশ্চিম কাম্বোডিয়ার আঙ্করের প্রাচীন খমের মহানগরীর মধ্যে, প্রাচীর ঘেরা শহর আঙ্কর থমের ঠিক বাইরে, প্রত্নতাত্ত্বিকরা বিশ্বের প্রথম সরকারি স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার প্রমাণ খুঁজে পেয়েছেন। তারা টোনলে স্নগাউট নামে একটি দ্বাদশ শতাব্দীর হাসপাতাল কমপ্লেক্সের ধ্বংসাবশেষ অনুসন্ধান করেছেন, যেটি আঙ্কর থমের পাঁচটি প্রবেশদ্বারের একটির নিকট অবস্থিত ছিল। হাসপাতালটি হাজার হাজার বাসিন্দা, ভ্রমণকারী, রোগী এবং তীর্থযাত্রীদের শহরে প্রবেশ এবং ত্যাগ করার জন্য একটি ব্যস্ত চেকপয়েন্ট হিসাবে কাজ করেছিল।[২] প্রথম একজন ফরাসী গবেষক এই বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন, এবং ১৯০৩ সালে তিনি কাম্বোডিয়ার একটি প্রাচীন হাসপাতালের লিপিকে অনুবাদ করে প্রমাণ করেন যে খমের রাজত্বে প্রাচীন যুগে হাসপাতাল ব্যবস্থা চালু ছিল। এ বিষয়ে পন্ডিতরা প্রায় একমত যে মানব সভ্যতার ইতিহাসে খমেরদেরই প্রথম সংগঠিত স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থা ছিল।[৩] বলা হয়ে থাকে যে, খমের হাসপাতালগুলি তর্কযোগ্যভাবে ইউরোপের প্রথম হাসপাতালের অনেক আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি একটি উন্নত মধ্যযুগীয় রাষ্ট্র ছিল এবং আঙ্কর সম্ভবত ১২০০ সালে পৃথিবীর বৃহত্তম শহর ছিল। বিশ শতকের প্রথমদিকে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষক জর্জ সেডেসের দ্বারা অনুসন্ধান করা খমের শিলালিপিগুলি রাজ্য জুড়ে ১৫টি হাসপাতালের অস্তিত্ব নিশ্চিত করেছে। এই হাসপাতালের শিলালিপিগুলি চিকিৎসা কর্মীদের সংখ্যা এবং তাদের বিভিন্ন ভূমিকা যেমন হাসপাতালের ব্যবস্থাপক, ড্রাগ কম্বাইনার ও ড্রাগ ডিস্ট্রিবিউটর প্রমুখদের সম্বন্ধে বর্ণনা দেয়।

সপ্তম জয়বর্মণের জনস্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্নতার কারণ ছিল রোগ বা মহামারীর প্রাদুর্ভাব, যা এই অঞ্চলের স্থিতিশীলতাকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছিল। এই পরিষেবা তার রাজনৈতিক ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করতে এবং তার প্রতি জনগণের আনুগত্য বাড়াতেও সাহায্য করেছিল। এছাড়াও একজন বৌদ্ধ রাজা হিসাবে সপ্তম জয়বর্মণ জানতেন যে জনগণের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার প্রতি তার পরার্থপরতা তার নিজের এবং তার রাজ্যের জন্য মহান কর্মফল সঞ্চয় করবে। এই হাসপাতালগুলি জনগণকে বৌদ্ধ ধর্মে রূপান্তরিত করতেও সাহায্য করেছিল।[৪] তৎকালীন খমের সাম্রাজ্যের অংশ লাওসের সে-ফং অঞ্চলে ১২ শতকের একটি শিলালিপি পাওয়া যায়, যে শিলালিপি থেকে ১১৮৬ সালের মধ্যে ১০২টি হাসপাতাল নির্মাণের তথ্য জানতে পারা যায়। আঙ্কর থমের উত্তর

গেটের ঠিক বাইরে, সপ্তম জয়বর্মণ পাথরের শিলালিপিতে তাঁর কাজ এবং পরিকল্পনা নথিভূক্ত করে গেছেন। তাঁর দ্বারা নির্মিত মন্দিরগুলির মধ্যে একটি হল তা-প্রহম, যার একটি দেওয়ালে সাম্রাজ্য জুড়ে আরোগ্যশালার সংখ্যা এবং হাসপাতাল পরিচালনার নিয়মগুলি লিপিবদ্ধ করা আছে।[৫] এই মন্দিরের উৎসর্গীকৃত স্টেলা জানায় যে, রাজ্য জুড়ে নির্মিত এই হাসপাতালগুলি ৮৩৮টি গ্রামের শ্রম এবং তাদের ৮০০০০ জন বাসিন্দার দ্বারা টিকে ছিল।[৬] এই শিলালিপিগুলি নিরাময়কারী বুদ্ধ, ভৈসজ্যগুরুকে উৎসর্গীকৃত। এতে বিখ্যাত লাইন রয়েছে যে রাজা কীভাবে তার নিজের চেয়ে প্রজাদের দুঃখ-কষ্ট বেশি অনুভব করেছিলেন।[৭] এখানে জয়বর্মণ লিখেছেন, 'তিনি তাঁর নিজের চেয়ে তাঁর প্রজাদের অসুস্থতা বেশি ভোগ করেছিলেন; কারণ জনসাধারণের বেদনাই রাজাদের বেদনা, তাদের নিজের কষ্টের চেয়ে'।

কয়েক দশকের অশান্তির পর, ১১৮১ সালে সপ্তম জয়বর্মণ বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন এবং একটি অভূতপূর্ব জনস্বাস্থ্য পরিষেবা চালু করার মাধ্যমে আঙ্কর সাম্রাজ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। শিলালিপিগুলি আঙ্করের প্রথম বৌদ্ধ রাজা সপ্তম জয়বর্মণ সম্বন্ধে বহু তথ্য প্রদান করে। তিনি সমস্ত রাজ্য জুড়ে জনসাধারণের জন্য অনেক উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলেন। জয়বর্মণের শাসনকালের নির্মাণ প্রকল্পগুলির জন্য বিশাল সম্পদের প্রয়োজন ছিল। তার হাজার হাজার খমের প্রজাদের নতুন রাষ্ট্রীয় মন্দির, রাস্তা, সেতু, বিশ্রামাগার এবং হাসপাতাল নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একত্রিত করা হয়েছিল।[৮] ব্যবহারিক স্তরে জয়বর্মণ সারা দেশে ২০০টির বেশি বিশ্রামাগার তৈরী করেছিলেন।[৯] এগুলি জনগণের সেবার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল এবং এগুলি রাজাকে রাজধানীর বাইরে বিদ্রোহ মোকাবিলা করার পাশাপাশি সাম্রাজ্যের বাইরে বাণিজ্যপথগুলিকে আরও উন্মুক্ত করতে সাহায্য করেছিল। মনে করা হয়, জয়বর্মণের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী অন্যদের চেয়ে স্বতন্ত্র ছিল।

কাম্বোডিয়ায় চিকিৎসা জ্ঞানের একটি দীর্ঘ ইতিহাস আছে, কিন্তু সম্ভবত রাষ্ট্র-স্পনসর স্বাস্থ্য পরিষেবা বলতে যা বোঝায় এবং যা রাজকীয় অনুদান দ্বারা সমর্থিত, তা শুধুমাত্র ১২ শতকে আবির্ভূত হয়। সবচেয়ে বড় নিরাময়কারী স্থাপনা হল নিক পিনের মন্দির কমপ্লেক্স, যা একটি বৃহৎ মানব সৃষ্ট জলাধারের কেন্দ্রে সপ্তম জয়বর্মণের রাজত্বকালে নির্মাণ করা হয়েছিল। এখানে শুধুমাত্র নৌকা দ্বারা পৌঁছানো যেত এবং এটি একটি পুকুর ও একটি কেন্দ্রীয় মন্দির নিয়ে গঠিত। যার পাথরের ভিত্তি এখনো দাঁড়িয়ে আছে। কেন্দ্রীয় পুকুরটি পৌরাণিক হ্রদ অনাবতপ্তের প্রতিনিধিত্ব করে বলে মনে করা হয়, এবং যার জল সমস্ত অসুস্থতা নিরাময় করে বলে বিশ্বাস করা হত। আঙ্করে অনাবতপ্ত হ্রদ সৃষ্টি, রাজাকে বুদ্ধের সাথে তাঁর সম্পর্ককে শক্তিশালী করতে সক্ষম করেছিল।[১০] রাজা জয়বর্মণের ব্যবস্থাপনায় হাসপাতালগুলির নকশা একই রকম ছিল বলে মনে করা হয়। প্রতিটি কম্পাউণ্ডের মধ্যে একটি মন্দির ও হাসপাতাল থাকত। মন্দিরটি থাকত পূজার জন্য। মন্দিরের চারপাশে, রোগী এবং চিকিৎসকদের থাকার

জন্য ছাদযুক্ত কাঠের কাঠামো ছিল। রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে ধর্মীয় দিক এবং চিকিৎসার দিক উভয়ই একই গতিতে চলেছিল।[১১]

খমের রাজত্বের পুরো সময়কাল ধরে যে ১০২ টি হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছিল, তার সমস্ত কিছুই হয়েছিল নিয়মনীতি অনুসারে। ড. রেথি চেম, একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, যিনি কাম্বোডিয়ায় ছুটিতে থাকার সময় কিছু খনন কাজ করেছিলেন যার মধ্যে একটি ২০০৬ সালে সিয়েমরিপ প্রদেশের আঙ্কর প্রত্নতাত্ত্বিক পার্কে, যেখানে তারা একটি হাসপাতাল খনন করেছিলেন। এটি সেই ১০২টি হাসপাতালের মধ্যে একটি যা সেই যুগের পাথরের শিলালিপি অনুসারে রাজা সপ্তম জয়বর্মণ ১২ শতকের শেষের দিকে নির্মাণের আদেশ দিয়েছিলেন। ২০০৬ সালের ২৮ আগস্ট মাসে রয়্যাল ইউনিভার্সিটি অফ ফাইন আর্টসে বক্তৃতার সময় ড. চেম ব্যাখ্যা করেন যে হাসপাতালটি রাজ্যের সকল প্রজাদের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত ছিল।[১২] যদিও কিভাবে এই ধরণের সেবা ব্যবস্থার জন্য অর্থ প্রদান করা হয়েছিল তা অজানা। হয়তো জনগণের থেকে দান সংগ্রহ করা হত। তবে এই স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য কোনো প্রকার মূল্য লাগত না। হাসপাতালগুলি বিনামূল্যে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেছিল। হাসপাতালগুলির সাথে থাকা পাথরের মন্দিরগুলির মধ্যে ৩০টি এখনও পর্যন্ত পাওয়া গেছে। হাসপাতালগুলিকে ভৈসজ্যগুরু বৈদুর্যপ্রভা দ্বারা সুরক্ষিত বলে বিশ্বাস করা হয়েছিল, যা আজও চীনে মেডিসিন বুদ্ধ নামে পরিচিত।[১৩] প্রতিটি হাসপাতালেই চিকিৎসা ও নিরাময়ের বুদ্ধ ভৈসজ্যগুরুর একটি মন্দির থাকত। হাসপাতালের নির্দেশে বলা হয়েছে যে ভৈসজ্যগুরুর নাম শোনাটাই সমস্ত রোগ সারানোর জন্য যথেষ্ট।[১৪] মনে করা হয়, নিরাময়কারী বুদ্ধ ভৈসজ্যগুরু ছিল জয়বর্মণের সমগ্র সাম্রাজ্য জুড়ে হাসপাতাল নির্মাণের উদ্দীপক।[১৫] সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত শিলালিপিগুলি চিকিৎসা কর্মীদের সম্পর্কে বিবরণ প্রদান করেছে।[১৬] খমের রাজত্বে প্রতিটি হাসপাতালে যথাযথ পরিচালনা ব্যবস্থা ছিল। এবং প্রতিটি হাসপাতালে প্রায় ১০০ জন কর্মী ছিলেন, যাদের মধ্যে একজন পরিচালক সহ ডাক্তার, নার্স, ফার্মাসিস্ট ও সহকারী কর্মীরা কর্মরত থাকতেন। এই স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থাটি রাজা সপ্তম জয়বর্মণের সময়েই তৈরী হয়েছিল।[১৭] সে-ফং শিলালিপি জানায় যে, ডাক্তার ফার্মাসিস্ট ছাড়াও জ্যোতিষবিদ ও অন্যান্য স্বাস্থ্য পেশাদাররাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।।[১৮] এছাড়াও জানা যায় যে, রাজার ব্যক্তিগত দোকান থেকে প্রতি তিনমাস অন্তর হাসপাতালে ওষুধ পাঠানো হত। বিভিন্ন হাসপাতাল কর্মীদের মধ্যে একজন বলিদানকারী এবং একজন জ্যোতিষী থাকতেন। সেই সাথে ওষুধের বিভিন্ন উপাদান যেমন চাল, মধু, মোম, তিল, মাখন, গোলমরিচ, জিরা, জায়ফল, কর্পূর, চিলি, এলাচ, আদা, অরিগানো, সরিষা, চন্দন, এমনকি জলজ প্রাণী ইত্যাদির কথাও জানা যায়। এছাড়া, শারীরিক ও ঔষধি চিকিৎসার জন্য একটি পৃথক এলাকাও ছিল।[১৯] ৮৩৮টি গ্রামের মোট ৮১,৬৪০ জন পুরুষ ও মহিলাকে হাসপাতালগুলিতে বিভিন্ন দ্রব্য সরবরাহ করার জন্য নিযুক্ত করা

হয়েছিল। ১০টি গাছ থেকে জ্বরের জন্য একটি ঔষুধ তৈরী করা হয়েছিল। প্রতিটি হাসপাতালে দুজন ডাক্তার এবং সহকারী, দুজন ডিসপেনসারির কর্মী, দুজন বাবুর্চি যারা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতেও সাহায্য করেছিল, এবং যাদের কাজ ছিল জল গরম করা, ওষুধ প্রস্তুত করা ইত্যাদি।[২০]

ডাক্তাররা সম্ভবত, পালস পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয় করতেন। হাসপাতালগুলি ওষুধের সাথে মধু, মাখন, তেল এবং গুড়ের কথাও প্রেসক্রিপসন করতেন। সম্ভবত, চিকিৎসা রসায়ন, আঙ্করে স্বাস্থ্য পরিষেবার একটি বৃহৎ অংশ গঠন করেছিল। তা-প্রহম মন্দিরের একটি শিলালিপিতে ধাতু এবং যন্ত্রপাতির রাজকীয় অনুদানের তালিকা পাওয়া গেছে যা অ্যালকেমির জন্য কাজে লাগত। এই চিকিৎসা পদ্ধতির প্রমাণ পাওয়া যায় ১৩ শতকে আঙ্কর সফরকারী ঝাউ দাগুয়ানের ডায়েরি থেকে। আঙ্করের দৈনন্দিন জীবনের প্রাণবন্ত বিবরণে তিনি লিখেছেন যে পারদ এবং সালফার চীন থেকে আমদানী করা হয়েছিল। জলে ডুব দিয়ে বা বারবার মাথা ধুয়ে রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা হত, সম্ভবত নিক-পেনে এই চিকিৎসা হত।[২১] তবে ঐ সময় কুষ্ঠরোগের মতো চর্মরোগই ছিল অন্যতম প্রধান সমস্যা।[২২] এছাড়াও কাম্বোডিয়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে জানা যায় যে, গাছের গুঁড়ি, শিকড় এবং পাতা থেকে প্রাপ্ত ঐতিহ্যবাহী ভেষজ ঔষধগুলি বিশুদ্ধ জলে মেশানো হত। তারপর কার্যকারিতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে তরল ঔষধটিকে একটি শিব লিঙ্গের উপর ঢেলে দেওয়া হত এবং একটি ড্রেন পাইপের মাধ্যমে এই তরলটি মন্দিরের বাইরে উত্তর দিকে প্রবাহিত হত। সেখান থেকে বাইরে অপেক্ষারত রোগীরা এই তরল ওষুধ পান করতে পারতেন।[২৩] আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় প্রশিক্ষিত ডাক্তারদের দ্বারা রাজদরবারে ঔষধের অনুশীলন করা হত।

চিকিৎসা জ্ঞানের বাইরে, এই নিরাময়কারীরা জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কারশাস্ত্র এবং দর্শনের মতো অন্যান্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানেও পারদর্শী ছিলেন। শাসক গোষ্ঠীর সন্তানদের মধ্যে থেকে মেডিকেল ছাত্রদের নির্বাচন করা হত। এই ছাত্ররা দরবারী ডাক্তার, পুরোহিত বা জ্যোতিষীদের মতো গুরুদের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করতেন। মেডিসিনের জন্য আলাদা কোনো বিদ্যালয় ছিল না তবে ছাত্রদের একটি ছোট দল দীর্ঘ বৃত্তিমূলক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শিক্ষকদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। সংস্কৃত ভাষা ছিল শিক্ষার মাধ্যম এবং খমের এপিগ্রাফি থেকে জানা যায়, এই ভাষার মাধ্যমে ছাত্ররা বিভিন্ন পবিত্র গ্রন্থ থেকে শিখতে পারত, যেমন অন্যতম হিন্দু চিকিৎসা সংকলন সুশ্রুত সংহিতা।[২৪] বৌদ্ধ রাজা সপ্তম জয়বর্মণের রাজদরবারে ওষুধের অনুশীলন রাজ্যের সমস্ত স্তরে প্রসারিত হয়েছিল।

জানা যায়, প্রতিটি গ্রামের নিজস্ব নিরাময়কারী ছিল। তারা কেউ কেউ ছিলেন পূর্ববর্তী সন্ন্যাসী, যারা মঠ থেকে তাদের চিকিৎসা নৈপুণ্য শিখেছিলেন। অন্যরা তাদের পিতা বা অরণ্যের তপস্বী সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে শিখেছিলেন। এদের কেউ পড়তে পারতেন আবার কেউ ছিলেন সম্পূর্ণ নিরক্ষর যারা তাদের স্থানীয় গুরুকে পর্যবেক্ষণ

করে শিখেছিলেন। এই মৌখিক শিক্ষা পদ্ধতি, খমের গ্রামের ঔষধ শিক্ষার প্রকৃতি ও চরিত্রকে তুলে ধরে। এখানে অ্যানিমিস্টিক মেডিসিন, প্রাকৃতিক এবং যাদুবিদ্যার অনুশীলন দ্বারা তৈরী করা হয়েছিল। নিরাময়কারীরা ভেষজ ঔষধ ব্যবহার করে রোগীদের চিকিৎসা করতেন এবং প্রায়ই মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমেও রোগ সারানোর ব্যবস্থা হত।[২৫] জয়বর্মণের সিংহাসনের আরোহণের পূর্বে ইতিমধ্যেই খমের রাজ্যে একটি দীর্ঘ চিকিৎসার ঐতিহ্য ছিল। নবম শতাব্দী থেকে লিখিত গ্রন্থ, খমের শাস্ত্র বা পাম পাতার পাণ্ডুলিপির উপর খমের ঐতিহ্যবাহী ওষুধ সম্পর্কে লেখা থাকত, যা পূর্বতন খমের সাম্রাজ্যের অনেক মন্দিরে সংরক্ষণ ও অধ্যয়ন করা হত। তবে কাম্বোডিয়ার গৃহযুদ্ধের সময় বা খমের রুজ শাসনকালে, কাম্বোডিয়ার প্রায় সমস্ত ঐতিহাসিক পান্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ এবং দার্শনিক সাহিত্য ধ্বংস হয়ে যায়, যার মধ্যে অনেক খমের চিকিৎসা বিষয়ক পাণ্ডুলিপি ছিল।

ঐতিহ্যগত খমের ঔষধের সঠিক উৎপত্তি অস্পষ্ট রয়ে গেছে। তবে এটি ফুনান যুগ থেকে উৎপত্তি হয়ে নবম শতাব্দীতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। সপ্তম শতাব্দীর কাছাকাছি চীনা তাং রাজবংশের নথি থেকে জানা যায় যে একজন ভারতীয় সন্ন্যাসী বৌদ্ধ ধর্ম এবং ঔষুধ সম্পর্কিত ধর্মগ্রন্থ নিয়ে কাম্বোডিয়ায় এসেছিলেন। প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতির ক্ষেত্রে ভারতীয় ও চীনা সংস্কৃতি কাম্বোডিয়াকে প্রভাবিত করেছিল।[২৬] ঐতিহ্যগত খমের ঔষধের ভিত্তি তৈরী করতে এই বিদেশী কাঠামো এবং অনুশীলনগুলি স্থানীয় বিশ্বাস এবং কুসংস্কারের সাথে মিশ্রিত হয়েছিল। আঙ্কর যুগে নেক পোয়ানের মন্দিরটি খমের ঔষধের কেন্দ্রীয় মন্দির ছিল বলে মনে করা হয়।। এছাড়াও চীনা ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন চীনা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে ভেষজ চিকিৎসা অধ্যয়নের জন্য দুই বছরের জন্য কাম্বোডিয়ায় পাঠানো হয়েছিল। আঙ্করে ওই সময় ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা ডাক্তার হতেন এবং ভারতীয় আয়ুর্বেদিক ঔষধ ব্যবহার করে রোগীর যত্ন নেওয়ার একটি ঐতিহ্যও ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে গবেষকরা সম্ভবত ঔষধের জন্য ব্যবহৃত অসংখ্য জার খুঁজে পেয়েছিলেন যা প্যালিওবোটানিস্টদের দ্বারা অধ্যয়ন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।[২৭]

প্রাচীন খমের চিকিৎসা গ্রন্থগুলি থেকে তাদের ঔষধি জ্ঞান ও চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারা যায়। সপ্তম জয়বর্মণের নেতৃত্বে খমেররা এক উন্নত স্বাস্থ্যপরিসেবা ব্যবস্থার প্রচলন করেছিলেন যা সমসাময়িক অন্যান্য সভ্যতার তুলনায় অনেক এগিয়ে ছিল। তাদের হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা শাসকের প্রজাদের প্রতি দায়িত্বশীল মনোভাবের পরিচয় তুলে ধরে। সেই ঐতিহ্যগত স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থা বর্তমানে টিকে থাকতে পারেনি এবং পন্ডিতরা বিস্মিত হয়েছেন যে এই মহান চিকিৎসা ঐতিহ্য কেন টিকে থাকেনি? হয়তো আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থ্যার কারণে, বা আঙ্কর সাম্রাজ্যের ধীরে ধীরে পতন এবং থেরাবাদ বৌদ্ধ ধর্মে স্থানান্তর, মূল চিকিৎসা সংস্কৃতিকে ব্যাপকভাবে

প্রভাবিত করার কারণে। তবে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা, তার আধুনিকতা ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতিও এর জন্য কিছুটা দায়ী ছিল বলে মনে করা হয়।

তথ্যসূত্র:

১. Bhattacharya, Kamaleswar. 1953, Some Aspects of Temple Administration in the Ancient Khmer Empire, Proceedings of the Indian History Congress, Vol. 16 (1953), p. 162.

২. Brown, Marley. 2018, Angkor Thom's Divine Medicine, 'Magzter' Archaeology, January/February, https://www.magzter.com

৩. Thoeurn, Orm Bun. 2022, 'The Phnom Penh Post', 21 July, Phnom Penh, Cambodia

৪. Wolfarth, Joanna. 2020, The Angkor Empire's National Health Service, History Today, 14 May, www.historytoday.com

৫. Brown, Marley. 2018, Angkor Thom's Divine Medicine Archaeology, Vol. 71, No. 1 (January/February), Published by: Archaeological Institute of America Stable URL: https://www.jstor.org/stable/26348962, pp. 52

৬. Hall, Kenneth R. 2011, A History of Southeast Asia: Maritime Trade and Societal Development, 100-1500, Rowman & Littlefield Publishers, New York, p.197.

৭. Woodward, Hiram. 2005, The Art and Architecture of Thailand: From prehistoric Times through the Thirteenth Century, Second Edition, Brill, London, pp. 167,199

৮. Hall, Kenneth R. ibid, 2011, p.197. see, Coedes, George. 1906. "La Stele de Ta-Prohm." BEFEO 6:44-81

৯. Conlan, Roberta. (Chief editor) and by the editors of Time-Life Books, South East Asia: A Past Regained, Time-Life Books, Alexandria, p. 98

১০. Wolfarth, Joanna. ibid, 2020, www.historytoday.com

১১. Rohany, Isa. 2023, Healing the Empire: Angkor's Chapel Hospitals, Cambodianess, September 16.

১২. Chhem, Rethy K. 2000, Medicine and Culture in Ancient Cambodia, The Singaporte Biochemist Review, Vol. XIII, Singapur, March, p. 26
১৩. Miksic, John N. 2007, Historical Dictionary of Ancient Southeast Asia, The Scarecrow Press, UK, p.172
১৪. Wolfarth, Joanna, 2020, ibid, www.historytoday.com
১৫. Woodward, Hiram. 2005, The Art and Architecture of Thailand: From prehistoric Times through the Thirteenth Century, Second Edition, Brill, London, p. 167, 199
১৬. Brown, Marley. 2018, ibid, p. 52
১৭. Thoeurn, Orm Bun. 2022, ibid.
১৮. Vachon, Michelle. 2015, Uncovering the Healthcare System of Angkor, 'The Cambodia Daily', August 22.
১৯. Brown, Marley. ibid, 2018, p. 52
২০. Miksic, John N. 2007, ibid, p. 172
২১. Wolfarth, Joanna. 2020, ibid, www.historytoday.com
২২. Rohany, Isa. 2023, ibid.
২৩. Chan, IV. 2010, History of Medicine, pp. 70-76
২৪. Chhem, Rethy K. 2000, ibid, p.25
২৫. Chhem, Rethy K. 2000, ibid, p.26
২৬. Rohany, Isa. 2023, ibid.
২৭. Vachon, Michelle. 2015, ibid

মনোরঞ্জন ব্যাপারীর বাতাসে বারুদের গন্ধ উপন্যাস : প্রসঙ্গ বঞ্চনা এবং বিচ্ছিন্নতা

তন্ময় সরকার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: বাংলা কথাসাহিত্যে মনোরঞ্জন ব্যাপারী এক অতি সুপরিচিত নাম। প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে দাঁড়িয়ে অসহায়, দলিত, দরিদ্র মানুষের কথা তাঁর সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। সত্তর-আশির দশকে নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা গৃহত্যাগ করে হাতে অস্ত্র তুলে নেয়। তারা জোতদার ও রাষ্ট্রের হাত থেকে জমি আদায় করে ভূমিহীন এবং অত্যাচারিত দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন করে দিতে থাকেন। এসব আন্দোলনকারী যুবক-যুবতীদের গ্রেফতার করে উচ্চ আদালতে পাঠানো হয়। সেই জেলে পাঁচজন নকশালবাদী সুকৌশলের মাধ্যমে জেল ভাঙানোর ছক কষলেন। বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে তাদেরকে মুক্ত হতেই হবে। এই জেলেই ভগবান নামে এক ছিঁচকে চোর বিনা পয়সায় খাওয়া ও থাকার জন্য প্রায়ই জেলে আসতেন। পরবর্তীতে নকশালদের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক ভালো হয়। মনোরঞ্জন ব্যাপারী নকশালবন্দী থাকার সময় জেলের যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন তারই প্রতিফলন লক্ষ করা যায় 'বাতাসে বারুদের গন্ধ' উপন্যাসটিতে। বঞ্চনা ও বিচ্ছিন্নতা মানুষের আদর্শবাদকে যে কতটা ভিতর থেকে নাড়িয়ে দেয় তা এই উপন্যাসে দেখতে পাওয়া যায়।

সূচক শব্দ: নকশাল, সামাজিক বিপ্লব, বারুদের গন্ধ, সেপাই-জমাদার, আমদানি ওয়ার্ড, লছমন সিং, ব্যান্ডেজ ভূত, বঞ্চনা, বিচ্ছিন্নতা, ইন্টারভিউবালা।

সত্তর দশকে নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রভাবে দেশজুড়ে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল, যার প্রভাব পরেছিল সমকালীন প্রায় সমস্ত সাহিত্যিকদের সাহিত্যে। দেশভাগের ফলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে লেখকের পরিবারকে ভারতবর্ষে চলে আসতে হয়। শিয়ালদহ স্টেশন, বাঁকুড়ার শিরোমণিপুর ক্যাম্প, দণ্ডকারণ্য, আন্দামানসহ একাধিক জায়গায় থাকতে হয়। একদিকে ক্ষুধার-যন্ত্রণাঅন্যদিকে নানান প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করতে হয় লেখককে। মা-বাবা ও ভাই-বোনের না খেতে পারার যন্ত্রণাকে তিনি নিজের চোখে দেখেন। সত্তর-আশির দশকে পশ্চিমবঙ্গে নকশাল আন্দোলনের প্রভাব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এই সময়ে শোষণমুক্ত এক শ্রেণিহীন সমাজ নির্মাণের কথা, লেলিনবাদ, মার্কসবাদ ইত্যাদি সম্পর্কে জানার আগ্রহ মনোরঞ্জন ব্যাপারীর বাড়তে থাকে। নকশাল নেতা শঙ্কর গুহ নিয়োগীর নেতৃত্বে লেখক মনোরঞ্জন ব্যাপারী ২৪ বছর

বয়সে নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। একদিন গোয়েন্দা পুলিশের দল এক কুঁড়ে ঘরে হানা দিয়ে লেখক মনোরঞ্জন ব্যাপারীকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠায়। জেলখানায় এক পাঠশালার মাষ্টারমশায়ের কাছ থেকে তিনি ২৬ বছর বয়সে অক্ষর জ্ঞান লাভ করেন। জেলে নকশালবন্দী থাকার সময়ে বিচিত্র ধরনের মানুষের সঙ্গে মেলামেশার অভিজ্ঞতার নিরিখে 'বাতাসে বারুদের গন্ধ' উপন্যাসটি লেখেন। বঞ্চনা এবং বিচ্ছিন্নতা মানুষের আদর্শবাদের উপর যে কঠিন আঘাত আনতে পারে এই উপন্যাসটি তারই প্রমাণ।

মনোরঞ্জন ব্যাপারীর 'বাতাসে বারুদের গন্ধ' উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন ওয়ার্ডে একাধিক বন্দী রয়েছে, যারা নানান অসামাজিক কার্যকলাপের জন্য জেলে এসেছে। সত্তরের দশকের প্রথম দিকে নকশালদের কারণে সব জেলখানার পরিস্থিতি ছিল ভয়াভহ অগ্নিগর্ভ। খাবারের মান নিয়ে জেলখানার বন্দী ও কারারক্ষীদের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ হত। কারারক্ষী এবং জেলখানার বন্দীদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে একজন বন্দীর মৃত্যু হয়। যার ফলে পূর্বতন জেলার জেল কর্তৃপক্ষের রোষের মুখে পড়ে। জেলখানায় সবচেয়ে সুরক্ষিত সেলের মধ্যে পাঁচজন ভয়ঙ্কর অপরাধী নকশালকে রাখা হয়েছিল। অন্যদিকে জেলের এক পাগল ডাক্তার নকশালদের প্রতি বড়ই সহানুভূতিশীল ছিলেন।

সবার সামনে তিনি বলেন 'আরে ওরা চোর-ডাকাত নয়। সব শিক্ষিত-ভদ্র ছেলে। একটা ভুল করে ফেলেছে বলে কি অমানুষ হয়ে গেছে।'[১]

তিনি আবার পকেটমার, চোর ও ডাকাতদের দেখলে সহ্য করতে পারেন না। ধর্ষণ কেসের আসামীকে তো দেখলেই ক্ষেপে উঠেন।

উপন্যাসের চমকপ্রদ ঘটনা হল নওয়ালকিশোর আর লছমন সিং একই অপরাধে দুজনে জেলে বন্দী রয়েছেন। জেলের নিয়ম হলো কোনো সাজাপ্রাপ্ত বন্দী ভালো কাজ করলে তার শাস্তি জেল কতৃপক্ষ কমিয়ে দিতে পারে। একদিন একটি বিষাক্ত সাপ জেলের মধ্যে ঢুকে পড়ে। লছমন সেই সাপটাকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। এই সাহসিকতার জন্য জেলকতৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেয় চারদিনের সাজা কমানোর। সেটাই এখন চিন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে তার বন্ধু নওয়ালকিশোরের। কারণ এক সোনার দোকানে হংকং মার্কা সোনার বিস্কুট চুড়ি করে সেগুলি মাটির তলায় পুঁতে রেখে দেয় তারা। ইচ্ছে ছিল পরে সেগুলি তারা উদ্ধার করবে। কিন্তু অন্য এক সোনার দোকানে চুরি করতে গিয়ে দুজনে ধরা পড়ে যায়। লছমন আগে জেল থেকে ছাড়া পেলে সেগুলি সে একাই আত্মসাৎ করবে। যে ডাকাতির জন্য নওয়ালকিশোরের জেল হল, সেহয়তো শেষপর্যন্ত কিছুই পাবে না। সারারাত এসব কথা ভাবে নওয়ালকিশোর।

জেলে প্রতিদিন দুবেলায়প্রায় চার হাজার লোকের রান্না হয়। ডাল ও তরকারি প্রতিদিনের মেনু। মাছ সপ্তাহে একদিন ও মাংস মাসে একবার দেওয়া হয়। কাঁচা কয়লার আগুনে লোহার ড্যাগে চালের খুঁদ আর পাতলা ডালের খিচুড়ি, যার নাম

'লপছি'। জেলের নিয়ম মেনে চৌকা থেকে ডেকে করে দু নম্বর ওয়ার্ডের দোতলায় খাবার নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব ছিল দুই বন্ধু লছমন ও নওয়ালকিশোরের। সেদিন নওয়ালকিশোর পরিকল্পনা করে প্রথমে 'লপছি'র ড্যাগটায় মোটা বাঁশে ভর দেয়। আর তার পিছনে থাকেন লছমন। দু নম্বর ওয়ার্ডের সিড়িটা ভীষণ খাড়া। যে কারণে ঘটে এই দুর্ঘটনা। আধফুটন্ত লপছির খিচুড়ি লছমনের গায়ের উপরে পড়ে। প্রচন্ড যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে লছমন জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই খবর চাউর হতেই জেলখানার সবাই ছুটে আসে লছমনকে উদ্ধার করতে। শরীর থেকে চামড়া খুলে গিয়ে ডিমের মতো সাদা ধবধবে হয়ে যায় লছমনের সারাশরীর। এই অবস্থায় লছমনকে ওষুধ লাগিয়ে ডাক্তার ব্যান্ডেজ বেঁধে দেয়। কিন্তু জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার আগেই যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে রাত এগারোটার সময় লছমন মারা যায়। শেষপর্যন্ত লছমন মুক্তি পেল কিনা তা নিয়ে তর্ক রয়েছে কারণ সে দিনটা ছিল শনিবার তার উপর ভরা অমাবস্যার দিন। বিহারের কোন এক গ্রামে লছমন সিংহের বাড়ি। পরিবার থেকে কেউ তার মৃতদেহ নিতে আসেনি। ফলে লছমনের মৃত শরীর লাশগাদায় পড়ে পচতে থাকে। পরে কি হয় কেউ তা জানে না। অপঘাতে মারা যাওয়ার ফলে লছমনকে নিয়ে এক গা ছমছমে ভুতুড়ে পরিবেশ তৈরি হয় পুরো জেল চত্তরে। লেখক মনোরঞ্জন ব্যাপারী বলেছেন - 'জীবিত লছমনের চেয়ে মৃত লছমন জেলখানার দেওয়ালে এপারে বড়োই ভয়ঙ্কর হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। প্রায় তাকে দেখা যায় হাসপাতালের সামনে রাস্তা ধরে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে বারো নম্বর ওয়ার্ডের দিকে হেঁটে আসতে। তখন যেভাবে মারা গিয়েছিল, ঠিক সেই সাদা ব্যান্ডেজ জড়ানো থাকে গায়ে। কখনো শোনা যায় তার কাতর গোঙানি- আঃ জ্বল গায়া। কখনও সে বারো নম্বর ওয়ার্ড থেকে ছুটে গিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে।'[২]

জেলখানায় সাপ্লাই আসা ডাল-চালসহ অন্যান্য জিনিসপত্র খুব একটা উন্নতমানের ছিল না।এবং সে জিনিসপত্র আসেও কম। জেলে অফিসার, কেরানী, সেপাই থেকে শুরু করে দাগী আসামীসহ অনেকে জিনিসপত্র হাতানোর অপেক্ষায় থাকে। ডিউটি অবস্থায় জেলের অধ্যক্ষ প্রতিদিন নিয়ম করে জেলে আসতেন। তিনি একদিন দেখেন কয়েদিদের জন্য লুচিভাজা ও মাংসের ঝোলের আয়োজন হচ্ছে। এই দেখে জেলার বীরেশ্বর মুখার্জী জিজ্ঞেস করেন কার পেটে এসব যাচ্ছে। উত্তরে ডেপুটি জেলার বলেন ব্যান্ডেজওয়ালা ভূতকে সন্তুষ্ট করতে এইসব লুচি মাংসের আয়োজন হচ্ছে। কেননা অপঘাতে মৃত লছমন সিংহের আত্মা আজও জেলের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় আর নওয়ালকিশোরকে খোঁজে। তাই তার আত্মার সন্তুষ্টির জন্য প্রতিদিন বটগাছের তলায় লুচি মাংস রেখে আসা হয়। কিছুক্ষণ পরে সেই থালা ফাঁকা হয়ে যায়, কে যেন খেয়ে যায়। ব্যান্ডেজওয়ালা ভূতকে অখুশি করে কে নিজের বিপদ ডেকে আনবে কার এতো সাহস আছে। জেলার বীরেশ্বর মুখার্জীও আর এই বিষয় নিয়ে ভাবেন না। অবসর হলেই তিনি যেন বেঁচে যান।

একদিন রাতে হালুম শুয়ে ছিলেন গুদামের লোহার উপরে। রাত একটার সময় হঠাৎ তার ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে খিদে পেয়ে যায়। তখন চৌকাও খালি হয়ে গেছে। বাসনপত্র ধুয়ে লেবাররা অনেকক্ষণ আগে চলে গেছে। হয়তো আমদানিতে গেলে কিছু একটা পাওয়া যেতে পারে। দুই নম্বর ওয়ার্ডের মাঝের রাস্তা ধরে হালুম হেঁটে কেস টেবিলের সামনে গিয়ে পৌঁছায়। আমদানির কাছে এসে দাঁড়িয়ে দেখেন একটা বাল্ব জ্বলছে আমদানির মধ্যে। সেই আলোর ফাঁকে রুমের কোণে কোণে একটা ভৌতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। কোর্ট ফেরত আসামীরা মেঝেতে শুয়ে ঘুমাচ্ছে। এরকম অবস্থায় হালুম ভিতরে যাবে কি করে। অনেক চিন্তার পর হালুম জানলায় উঠে একটা লাফ মারে, কিন্তু সে অনুমান ভুল ছিল। যেখানে হালুমের নামার কথা ছিল সেখানে না নেমে সে ভুল করে আসামী জলধরের বুকের উপরে পড়ে যায়। লেখক জানিয়েছেন - 'আচমকা বুকে ভারী বস্তুর আঘাত তন্দ্রার ঘোরে জলধর ঝাঁকিয়ে ওঠে- আঃ আঃ আঃ... তার এই আর্তনাদে অন্য সবারও ঝিমুনি ছুটে যায়। যাদের কেউ কেউ আগেও এই জেলে এসেছে এবং ব্যান্ডিসওয়ালার কথা জানে, তারা আধো আধো ঘুম জড়ানো চোখে দেখল- ব্যান্ডিসওয়ালা। সে তার শরীরটা অনেক ছোটো করে নিয়েছে বটে, কিন্তু শরীরে সাদা ব্যান্ডেজ আর আগুন ঝরা চোখ লুকোয়নি। সে তার সমস্ত ক্রোধ নিয়ে আক্রমণ করেছে জলধরকে। তাই আতঙ্কে তারাও চিৎকার জুড়ে দেয়। আঃ আ আ আ। তাদের কান্না, আর্তরব শুনে কী হল, কী নয়া হল নয়া বুঝে সব আসামি একযোগে এক স্বরে কঁকিয়ে ওঠে- আঃ আ আ আ আ।'[৩]

জেলখানায় এমন বিশ্রী চিৎকারে এক ভয়ানক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এসময় হালুম তার পরিকল্পনা বাতিল করে যে পথে এসেছিল সে পথ দিয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। আমদানির এই ভয়ার্ত চিৎকার তিন চার নম্বর সেলে পৌঁছে যায়। সেখানে রাখা হয়েছে জেলের ভাষায় 'ছোকড়া ফাইল'। কমবয়সী আসামীরাও প্রবল চিৎকার জুড়ে দিলে মুহুর্তের মধ্যে সারা জেলজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। এরকম পরিস্থিতিতে জেলের সেপাই ভজন বিশ্বাস সবাইকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেন যে ব্যান্ডিজওয়ালা ভূত নয়। ভজন বিশ্বাস নিজের চোখে দেখেছে জেলের বিড়ালটাকে লাফ মেরে পালিয়ে যেতে। এরকম পরিস্থিতিতে জেলের কয়েদিরা দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল ভজন বিশ্বাসের বক্তব্যকে মেনে নেয়। অন্যদল ভেবে নেয় দেবতা-অপদেবতারা কী না করতে পারে। ওরা ইচ্ছা করলে মোষের রুপ নিতে পারে, বিড়ালের রুপ নিতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি।

জেলখানার সম্মানীয় কেস তিনশো দুই, অর্থাৎ যারা মার্ডার কেসের আসামী। দ্বিতীয় সম্মানীয় কেস হচ্ছে তিনশো পঁচানব্বই অর্থাৎ যারা ডাকাতি কেসে জড়িত। তিনশো আশি যারা চুরি কেসের আসামী তাদের কোনো সম্মান নেই। বলতে গেলে তারা গরু চোর। সবচেয়ে ঘৃণার কেস হচ্ছে তিনশো ছিয়াত্তর ও চারশো কুড়ি। একটা রেপ কেস ও অন্যটা চিটিং কেসের। তবে তিনশো দুই আগের সম্মান আর আদায়

করতে পারছে না। প্রকাশ্য শত্রু বা গোপন মিত্র আসামী হোক বা সেপাই সবার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে নকশালরা আছেন। এছাড়াও বিভিন্ন চরিত্র এই উপন্যাসে ভীড় করে আছেন। যেমন ভগবান নামে এক ছিঁচকে চোর বিনা পয়সায় থাকা খাওয়ার জন্য প্রায়ই জেলে আসে। এই সমাজ তাকে শিখিয়েছে ক্ষুধার জ্বালা থেকে বড় জ্বালা আর কিছু নেই। ভগবানের মতো ছিঁচকে চোর সমাজে আজও বিদ্যমান। সমাজ পরিবর্তন হচ্ছে, দেশ পরিবর্তন হচ্ছে, দলিত, দরিদ্র অসহায় মানুষের সেরকম পরিবর্তন হচ্ছে না। জেলখানাকেই তারা নিরাপদ আশ্রয় বলে মনে করে। যেখানে অন্ন,বস্ত্র, পাকা ছাদ,ওষুধ বিনামূল্যে পাওয়া যায়। বাইরে থাকলে এসব কিছু পাওয়া সম্ভব নয়। অনেকে মনে করেন ‘জেলখানা নাকি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়।’ জেলখানায় জীবনের যা পাঠ মেলে সে পাঠ নাকি কোথাও পাওয়া যায়না। অবহেলিত, লাঞ্ছনা,বঞ্চিত না হলে ভগবানের মতো ছিঁচকে চোর বারবার জেলে আসতে হত না। জেলের অধ্যক্ষ বীরেশ্বর মুখার্জী ভগবানকে গুপ্তচর হিসেবে নিযুক্ত করেন। কেননা নকশালদের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক ভালো ছিল। এছাড়াও বীরেন দত্ত, সমরেশ, বরুণসহ একাধিক চরিত্র ‘বাতাসে বারুদের গন্ধ’ উপন্যাসটিতে আছে।

১২ নম্বর সেলের রাজনৈতিক নকশালবন্দীদের নিয়ে সবচেয়ে বেশি ভয় ছিল জেল কতৃপক্ষের। রাষ্ট্রীয় শোষণের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের জন্য তারা কলম ছেড়ে হাতে অস্ত্র তুলে নেয়। তারা প্রত্যেকেই উচ্চশিক্ষিত কেউ শিক্ষক, কেউ ডাক্তার, কেউ সাংবাদিক, কেউ ইঞ্জিনিয়ার। রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে এদেরকে ধরা হয়েছে। এদের মধ্যে কেউ ছিল শিক্ষিত বেকার, কেউ ছাত্র। ‘বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় যে যত পড়ে সে তত মূর্খ হয়।’ পড়াশোনা মাঝপথে বন্ধ করে দিয়ে গ্রাম ও শহরের মধ্যে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রাষ্ট্রিয় ক্ষমতা দখলের সক্রিয় কর্মী হয়ে। রাষ্ট্র সর্বশক্তি প্রয়োগ করে এদের মতাদর্শকে দমাতে পারেনি। তাই জেলের মধ্যেকঠোর নিরাপত্তায় এই সেলেটিকে রাখা হয়। তবুও তাদের কোনো হেলদোল নেই। তারা কবিতা লেখে, গান গায় আর নকশাল আন্দোলনের বিভিন্ন রকম শ্লোগান দিতে থাকে। লেখক মনোরঞ্জন ব্যাপারী জানিয়েছেন - ‘পাঁচটা সেলের দরজায় দাঁড়িয়ে পাঁচ জন তরুণ বন্দী গান গাইছে। এই গান তাদের আশা-ভরসা-ভালোবাসার আর বিশ্বমুক্তির গান। সবারই চোখ বোজা, শিরদাঁড়া টানটান আর গলা উদাত্ত। পারিপার্শ্বিক কোনো কিছুই তাদের মনের ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। ঋজু হয়ে নির্ভয় তারা গেয়ে চলেছে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল- জাগো জাগো সর্বহারা অনশনবন্দি ক্রীতদাস। শ্রমিক দিয়েছে আজি সাড়া, উঠিয়াছে মুক্তির আশ্বাস।

সনাতন জীর্ণ কু- আচার
চূর্ণ করে জাগো জনগন
ঘুচাও এ দৈন্য হাহাকার
জীবন-মরণ করি পন।

শেষ যুদ্ধ শুরু আজি কমরেড
এসো মোরা মিলি একসাথে।
গাও ইন্টারন্যাশনাল মিলাবে মানব জাত।'[৪]

এসব নকশাল বন্দীদের জন্য কতৃপক্ষ সর্বদা সচেতন থাকত। কারণ এরা অবাধ্য, অকুতোভয়ী, দুঃসাহসী এবং অবিনয়ী। পরিমল, বিজন, নিমাই, গৌতম, বাবলু, আশু, কল্যাণরা যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। মরাটা যেন এদের কাছে ছেলেখেলা। প্রতি মুহুর্তে এরা সুযোগ খুঁজে জেল ভেঙ্গে পালানোর জন্য। এরা দেশ ও দেশের মানুষকে ভালোবাসত। তারা শোষিত, বঞ্চিত দেশবাসীদের দুঃখ মোচনের কথা ভেবেছিল। জেল কতৃপক্ষের কড়া নজরদারীর মধ্যে এরা থাকে। কতৃপক্ষ আগেই অনুমান করেছিল তারা পালানোর ছক করছে। জেল ভেঙ্গে তারা কি মুক্ত হতে পারেনি। তাদের সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। জেল কতৃপক্ষ পরিমল, আশু, নিমাই, বিজন, রজতসহ বাকিদের উপর নির্মম অত্যাচার করে। সেই অত্যাচারের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে এই তরতাজা যুবকদের প্রাণ শেষ হয়ে যায়। নকশালবন্দী যুবকদের চিন্তাভাবনা নানান কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জেলের অন্যান্য চরিত্র ও কাহিনি জুড়ে আছে 'বাতাসে বারুদের গন্ধ' উপন্যাসে। জেলের দরদী ডাক্তার, চোর ভগবান, জেলের সেপাই ভজন বিশ্বাস ও অন্যান্য কয়েদীসহ সকলেই এই উপন্যাসের অসাধারণ চরিত্র।

দেশভাগের ফলে মনোরঞ্জন ব্যাপারীকে ছোটবেলায় পরিবারের সঙ্গে এদেশে চলে আসতে হয়। নানান জায়গায় তাঁকে থাকতে হয়। ২৪ বছর বয়সে নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন তিনি। দুবছর জেলবন্দী থাকার সময়ে একাধিক মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। বিশেষ করে নকশাল মানুষদের যন্ত্রণা, শাষণ, শোষণ, বঞ্চনার কথা, জেল ভাঙ্গার ঘটনা ও বিপ্লবের কথা জানতে পারেন লেখক। জেলে বসেই ২৬ বছর বয়সে তাঁর অক্ষর জ্ঞান হয়। জেলবন্দী থাকার সময়ে জীবনের এক বিচিত্র ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে 'বাতাসে বারুদের গন্ধ' উপন্যাসটি লেখেন। এই উপন্যাসটির

ইংরেজি অনুবাদ 'There's Gunpowder in the Air' জন্য ২০১৯ সালে JCB পুরস্কার পান। দক্ষিণ এশিয়ার সাহিত্যের মধ্যে নামকরা পুরস্কার ও ভারতীয় মুদ্রায় ১৮ লাখ টাকার ডিএসসি (DSC) প্রাইজ। ২০১৯ সালের লংলিস্টে যে পনেরোটি উপন্যাস জায়গা পেয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল মনোরঞ্জন ব্যাপারীর 'বাতাসে বারুদের গন্ধ' উপন্যাসটি। অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক অরুনাভ সিংহ। ষাটের দশকে অত্যাচারিত নিপীড়িত দরিদ্র মানুষদের জন্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত তরুণ যুবকদের মরণপণ বিপ্লবকে এক অসাধারণ দক্ষতার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন লেখক মনোরঞ্জন ব্যাপারী। তা এককথায় অনবদ্য।

তথ্যসূত্র:

১. ব্যাপারী, মনোরঞ্জন। *‘বাতাসে বারুদের গন্ধ’* ।একা, ওয়েস্টল্যান্ড পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ ২০১৯, চেন্নাই। পৃ - ১৯

২. তদেব। পৃ - ৩৭

৩. তদেব। পৃ - ৫১

৪. তদেব। পৃ - ৪৫

সহায়ক গ্রন্থ:

১. ব্যাপারী, মনোরঞ্জন। *‘ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন’।* দে পাবলিকেশন, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈশাখ ১৪২৬, কলকাতা।

সমাজ ও সাহিত্যে পুরাণের প্রভাব

হরিপদ মহাপাত্র
সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ,
সাঁকরাইল অনিল বিশ্বাস স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, ঝাড়গ্রাম

সারসংক্ষেপ: সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে পুরাণের বিশিষ্ট ভূমিকা অনস্বীকার্য। 'পুরাণ' শব্দের মূল অর্থ- প্রাচীন কাহিনী। বৈদিক সাহিত্যে আখ্যান, উপাখ্যান, পুরান, ইতিহাস প্রায় সমার্থকরুপে ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যাসদেব মহাভারতকে সংহিতা, পুরাণ, আখ্যান, ইতিহাস বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন। 'পুরান' শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হল পুরা কালীন, আর ইতিহাস শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হল - 'ইতি-হ আস। পুরান ও ইতিহাসের পার্থক্য নিরূপন করতে গিয়ে Monier Williams বলেছেন- "The Itihasas are the legendary histories of heroicmen before they were actually deified, whereas the puranas are properly the history of the same heroes converted into positive gods, and made to oceupy the highest position in the Hindu Pantheon".[1]

প্রাচীন পরম্পরায় পুরাণ সাহিত্য সম্পূর্নভাবে ধর্মীয় রচনা এবং বেদের ন্যায় ঐতিহ্যপূর্ণ, বেদ যেমন অপৌরুষেয়, পুরান ও তেমনি শ্রুতি। বৈদিক যুগের বহু কাহিনী, দার্শনিক তত্ত্ব, আখ্যান- উপাখ্যান, পুরাতাত্ত্বিক প্রভৃতি পুরানের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। প্রকৃতপক্ষে বেদ, সাহিত্য, ধর্মশাস্ত্র, স্মৃতি ও ইতিহাসের উপাদান পুরানের অন্যতম অবলম্বন। মহাভারতের অনেক কাহিনী এবং সমগ্র হরিবংশ ও বায়ু পুরানের মধ্যে কোনও কোনও অংশে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে মহাভারতের ও কোনও কোনও কাহিনী হয়ত প্রাচীন পুরান থেকে গৃহীত হয়েছিল। বিষ্ণু পুরানে বলা হয়েছে আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা সমন্বয়ে মহমতি ব্যাস একটি পুরান সংহিতা রচনা করেন।
সূচকশব্দ : পুরাণ, সাহিত্য, সমাজ, রামায়ণ, মহাভারত, বৈদিক সাহিত্য।

মূলপ্রবন্ধ:

ভারতবর্ষের সভ্যতা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও ধর্ম জীবনের ইতিহাস পর্যালোচনায় পুরান সমূহ অপরিহার্য। শতপথ ব্রাহ্মণ এবং ছান্দোগ্য উপনিষদে পুরানকে পঞ্চম বেদ নামে অভিহিত করা হয়েছে। যাজ্ঞবাল্ক্য স্মৃতিতে পুরাণকে ধর্ম ও বিদ্যার অন্যতম আকর্ষণ বলা হয়েছে হিন্দুধর্মের নানা তথ্য নিহিত আছে পুরাণে। ভারতবর্ষ ধর্ম প্রধান দেশ। এদেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সমাজ সব কিছুই গড়ে উঠেছে ধর্মকে ভিত্তি করেই। যুগ যুগান্তর ধরে পুরান সমূহ নিয়ন্ত্রিত করে এসেছে ভারতীয় ধর্ম জীবনকে, চরিতার্থ করেছে মানুষের ধর্মজ্ঞান-পিপাসাকে। দেবালয় বা সাধারনের মিলনস্থানে পুরান পাঠ

পবিত্র কর্তব্য রুপে বিবেচিত হত। পুরান পাঠ পুরান হাতে নকল করাকে লোকে পূণ্যকর্ম বলে মনে করত। এখনও শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে, বার ব্রতে পরম শ্রদ্ধায় পুরান পঠিত হত। বেদ পাঠে ও বৈদিক ধর্মচর্চায় সকলের অধিকার না থাকলে ও পুরান পাঠে এবং পৌরাণিক ধর্মানুষ্ঠানে স্ত্রীলোক এবং শূদ্রের ও সমান অধিকার ছিল। হিন্দুধর্মকে ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনের কঠোরতা থেকে মুক্ত করে তাকে সার্বজনীন ধর্ম রুপে প্রতিষ্ঠিত করার মূলে আছে পুরানের অবদান। তাই দেখা যায় ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবতার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন- ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি। বৈদিক হোম বা আহুতির পরিবর্তে মূর্তি পূজার প্রচলন ও পৌরানিক। যাই যজ্ঞের পরিবর্তে বিভিন্ন মূর্তির রূপকল্পনা, বৈদিক মন্ত্রের পরিবর্তে নতুন মন্ত্রের উদ্ভব ও ঘটেছে পুরানের যুগেই। পৌরাণিক ব্রতাচরনের ও ধর্মানুষ্ঠানের ফলশ্রুতি রূপে নানাবিধ ঐহিক ও পারিত্রিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কথা বিভিন্ন স্থলে উল্লিখিত হয়েছে।

পুরানের বর্ননায় অতিরঞ্জন আছে। আছে অতিশয়োক্তি, কিন্তু ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তার মধ্য থেকে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্যটুকু গ্রহণ করতে হবে। তৎকালীন সমাজে প্রচলিত ধর্ম, বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা, সামাজিক অনুশাসন প্রভৃতি জানতে হলে ও পুরানের দ্বারস্থ হতে হবে। পারজিটার এর মতে পুরান সমূহ হল ক্ষাত্র ধারার বাহক। তিনি মনে করেন যে, বৈদিক সাহিত্য অপেক্ষা ইতিহাসের উপাদান অনেক বেশি আছে পুরান সাহিত্যে। ভারতবর্ষের সুদূর অতীতের রাজনৈতিক ইতিহাস জানার ক্ষেত্রেও পুরানের মূল্য অপরিসীম। তবে পুরানের বিভিন্ন তথ্যকে সতর্কতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিককে প্রকৃত ইতিহাস অনুধাবন করতে হবে। এপ্রসঙ্গে (Winternitz) বলেছেন-

> "The puranas are valuable to the historian and to the antiquarian as sources of political history by reason of their genealogies even though they can only be used with great caution and careful discrimination".

শেব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মুখ্য ধর্মগ্রন্থ রূপে ও পুরান সমাদৃত। ভাগবত পুরাণ বৈষ্ণবদের কাছে বেদস্বরুপ। মার্কণ্ডেয় পুরানের অন্তর্গত দেবী মাহাত্ম্য সাধারণত: 'চন্ডী' নামে অভিহিত। বিভিন্ন পূজা পার্বনে, ধর্মানুষ্ঠানে আজও চণ্ডীপাঠ আবশ্যিক পবিত্র কর্তব্য রুপে বিবেচিত হয়। পুরানের কথকতা বহুকাল যাবৎ গনশিক্ষার মাধ্যম রূপে বিবেচিত হয়ে আসছে। পুরান কথকেরা প্রাচীন কাহিনীকে নতুন রূপদান করছেন। ব্যয়বহুল ও আয়ামসাধ্য বৈদিক যাগযজ্ঞের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক চেতনার প্রথম প্রকাশ পরিলক্ষিত হয় পুরান সাহিত্যে। নদী ও তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য, দান ধর্ম, অতিথিসেবা প্রভৃতি ও ধর্মাচরণের প্রকৃষ্ট পন্থা একথা পুরানেই প্রথম উদঘোষিত হয়েছে। এভাবে বৈদিক সাহিত্যে ও বৈদিক ধর্মকে যুগপোযোগী সংস্কারের মাধ্যমে সর্বজনলভ্য ও সাধারণের গোচরীভূত করার সার্থক প্রয়াস দেখা যায় পুরান সাহিত্যে। ভারতবর্ষের ধর্ম

ও সংস্কৃতি সাধারণীকরণই হল পুরান সমূহের উল্লেখযোগ্য অবদান। ভারতীয় ধর্ম সাধনার ইতিহাসে পুরান সাহিত্যের এই অমূল্য প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে ভিন্তারনিৎস্ মন্তব্য করেছেন-"They are of inestimable value from the point of view of the history of religion "

পরবর্তীকালে বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে ও নদীর মাহাত্ম্য যেভাবে কীতির্ত হয়েছে তার মূলে ও আছে পুরানের প্রভাব, বিভিন্ন ব্রত ও ধর্মানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণকে দান করার প্রথাও পৌরানিক। ভারতবর্ষের সমাজ ও ধর্মের ইতিহাস আলোচনা করতে হলে পুরানের প্রসঙ্গ অপরিহার্য। পুরান সমূহের এই অপরিসীম গুরুত্ব সম্পর্কে ভিন্তারনিসে বলেন-" They effored us for greater insight into all aspects and phases of Hinduism, it's mythology, it's idolworship, it's theism and pantheism, it's love of God, it's philosophy and it's Superstitions, it's festivals and ceremonies and it's ethics, than any other works".

সাহিত্য হিসাবে পুরান গুলি খুব উচ্চস্তরের না হলে ও পরভাবী ভারতীয় সাহিত্যে পুরানের প্রভাব অপরিসীম। পুরানের বিভিন্ন আখ্যান, উপাখ্যান উত্তর কালীন কবিদের প্রতিভা স্পর্শে নবতর রূপ লাভ করে মহাকাব্য বা নাটকে পরিনত হয়েছে। দুষ্যন্তশকুন্তলার পুরান- বর্নিত প্রেমোপাখ্যানকে নতুনভাবে বর্ণনা করে মহাকবি কালিদাস তাঁর অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে মর্ত্যের চঞ্চল রূপজ প্রণয়নকে দিব্য প্রেমের মঙ্গল সৌন্দর্যে উন্নীত করেছেন। পুরান-প্রথিত উর্বশী-পুরূরবার কাহিনী অবলম্বন করে রচিত হয়েছে "বিক্রমোর্বশীয় নাটক। রাম সীতার পৌরাণিক কাহিনী নাট্যকার ভবভূতির হাতে করুন রসাশ্রিত " উত্তর রামচরিত " নাটক পরিনতি লাভ করেছে।
পুরানাশ্রয়ী রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা অপার্থিব দিব্য ভাবরূপ স্ফুলিঙ্গ হয়েছে ভক্ত কবি জয়দেবের কোমল কান্ত পদাবলী। 'গীতগোবিন্দ' নামক গীতিকাব্যে।

পুরান সমূহ ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। বাংলা সাহিত্যে ও পুরান সমূহের প্রভাব সুদূর প্রসারী। ভাগবত পুরাণে বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনীর সঙ্গে লৌকিক প্রেমকাহিনীর সমন্বয় সাধন করে রচিত হয়েছে বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। পুরান গুলির ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস জানতে হলে পুরানকে আশ্রয় করা ঘাড়া গত্যন্তর নেই। বিভিন্ন পুরানে উল্লিখিত রাজবংশের পৌর্বাপর্যের মধ্যে অনৈক্য পরিলক্ষিত হয়। বাংলায় রচিত বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে ও পুরানের দ্যুতি অনায়াস লক্ষ্য। শাক্ত গীত গুলির কাহিনী পুরান মূলক। আগমনী ও বিজয়ার গান এপ্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্ম, মৎস্য, বায়ু এবং ভাগবত পুরাণের বিভিন্ন আখ্যান কাব্যধর্মী, বাঙালী কবি বৃন্দ রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় পুরান থেকে ও কালে কালে উপাদান আহরণ করে কাব্য কাব্য ও নাটক রচনায় ব্রতী হয়েছেন। এভাবে ভারতীয়দের সমাজ ও ধর্ম জীবনের ন্যায় পুরান সমূহ ভারতীয় সাহিত্যকেও নতুন রূপ দান করেছে।

তথ্যসূত্র:

১. Hinduism-P-82

গ্রন্থসূচী:

১. সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস রামচন্দ্র মিশ্র চৌখম্বা বিদ্যাভবন বারানসী-1960

২. সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস- A Berriedale Keith মোতীলাল বনারসী দাস- বারানসী- 1960

৩. সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস- ধীরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ-1988

৪. সংস্কৃত - সাহিত্য - রাজেন্দ্রপ্রসাদ মিশ্র- প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রয়াগ।

৫. সংস্কৃত সাহিত্য অভিনব ইতিহাস- রাধাবল্লভ ত্রিপাঠী, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন- বারানসী-2001

৬. সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস বাস্পেতি গৈরোলা চৌখম্বা বিদ্যাভবন, বারানসী-2017

৭. সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস- উমাশঙ্কর শর্মা, চৌখম্বা ভারতী - বারানসী 2019।

করুণাহত্যা : একটি নৈতিক আলোচনা

রেশোব মণ্ডল
স্নাতকোত্তর, দর্শন বিভাগ,
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড়মঠ, হাওড়া

সারসংক্ষেপ: জন্ম-যৌবন-বার্ধক্য এই ত্রিস্তরে মানুষের জীবনধারা গঠিত। জন্ম যেমন সত্য, মৃত্যুও তেমনই অনিবার্য। মৃত্যু অনিবার্য হলেও মৃত্যুর কারণ বিভিন্ন হতে পারে- কখনও স্বাভাবিক ভাবে (Normal Death), কখনও দুর্ঘটনাতে (Accidental Death), কখনও হত্যার দ্বারা (Murder), কখনওবা আত্মঘাতী (Suicide), আবার কখনও বা রাষ্ট্রের সম্মতিতে ডাক্তারি বা পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতায় কোনও ব্যক্তির মৃত্যু বা হত্যা-জনিত মৃত্যুকে ব্যবহারিক নীতিবিদ্যায় 'Euthanasia 'বা করুণাহত্যা বলা হয়। সাধারণত একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে কোনও ব্যক্তির দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত (Murder) হয়ে কোনও ব্যক্তির প্রাণনাশ বা হত্যা হলে তা অনৈতিক; কিন্তু রাষ্ট্র বা আইনের সম্মতিতে চিকিৎসক ও পরিবারের সহযোগিতায় কোনও রোগীর প্রাণনাশের ঘটনাকে কি নৈতিক বলা যাবে? কাজেই 'Euthanasia 'বা করুণাহত্যা নামক জীবননাশ বা হত্যাজনিত মৃত্যু সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গুলি নৈতিক আলোচনার দাবি রাখে।
মূলশব্দ: জীবন, জীবন-যন্ত্রণা, হত্যা, মৃত্যু, মুক্তি, অধিকার, নৈতিকতা।

মূল আলোচনা:

'Euthanasia' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে – 'Eu' ও 'Thanatos' নামক দুটি গ্রিক শব্দের সমন্বয়ে। 'Eu' শব্দটির অর্থ সহজ বা স্বস্তিদায়ক (Good), অপরদিকে 'Thanatos' শব্দটির অর্থ হলো মৃত্যু (Death)। সুতরাং 'Euthanasia' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো সহজমৃত্যু বা স্বস্তিদায়ক মৃত্যু।[১] তবে আক্ষরিক অর্থে 'Euthanasia' শব্দটি স্বস্তিমৃত্যু, কৃপাহত্যা, করুণাহত্যা নামক বহু অর্থে প্রচলিত থাকলেও বর্তমান পরিসরে আলোচনার সুবিধার্থে 'Euthanasia' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ 'করুণাহত্যা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অক্সফোর্ড অভিধানের ক্ষুদ্র সংস্করণে 'Euthanasia' শব্দটির অর্থ পাওয়া যায়, সেখানে 'Euthanasia' সম্পর্কে বলা হয়েছে 'A quiet and easy death' (Euthanasia হলো শান্ত ও সহজ মৃত্যু), অথবা 'The means of procuring this' (এই ভাবে মৃত্যু ঘটানোর উপায়), অথবা 'The action of inducing a quiet and easy death' (শান্ত ও সহজ মৃত্যু ঘটানোর ক্রিয়াটি)।[২] 'Euthanasia' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো নিষ্কৃতিমৃত্যু, যে হত্যায় মৃত্যুকাঙ্খী ব্যক্তির মৃত্যুটি হয় শান্তিপূর্ণ। করুণাহত্যার ক্ষেত্রে কোনও ব্যক্তি বীভৎস রোগ যন্ত্রনাদায়ক মৃত্যু থেকে রেহাই পেতে নিজের মৃত্যু কামনা করে। অর্থাৎ 'Euthanasia'

বা করুণাহত্যা হলো হত্যাজনিত মৃত্যু। 'Euthanasia' এমন একপ্রকার মৃত্যু যেখানে হত্যার মাধ্যমে রোগগ্রস্ত মানুষের রোগের অবসান ঘটানো একমাত্র লক্ষ্য। আপাতদৃষ্টিতে হত্যা বলতে অনৈতিক মনে হলেও এক্ষেত্রে হত্যার মাধ্যমে রোগীকে কৃপা করা হয়। হত্যার পরিণামস্বরূপ একজন মানুষ অসুস্থতার যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভ করে। ফলত 'Euthanasia'কে বলা হয় 'Good death' বা স্বস্তিমৃত্যু।[৩] করুণাহত্যা হত্যাজনিত হলেও যে ব্যক্তির মৃত্যু হয় তার কাছে বিষয়টি শান্তি ও মুক্তির বার্তা বহন করে। ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ তাই অনেক ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ করুণাহত্যা কামনা করে। ফলত 'Euthanasia' শব্দটির ব্যাপক অর্থ গ্রহণ না করে সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করা শ্রেয়। সংকীর্ণ অর্থে 'Euthanasia' শব্দটির অর্থ গ্রহণ করে এমন বলা যায় যে 'আত্মহত্যার ক্ষেত্রে একজন মানুষ নিজের মৃত্যুর তোড়জোড় করে, কারণ সে তার জীবদ্দশা থেকে রেহাই পেতে চায়, কিন্তু 'Euthanasia' ক্ষেত্রে একজন মানুষ স্ব-নিধনের উদ্যোগ নেয়, কারণ সে বিশেষ একধরনের অবাঞ্ছিত মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেতে চায়'।[৪] করুণাহত্যা সম্পর্কে সার্বিকভাবে বা যথাযথ কোনও সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। তবে অধ্যাপক Peter Singer তাঁর *Practical Ethics* গ্রন্থে 'Euthanasia' বা করুণাহত্যার সংজ্ঞা দিয়েছেন- "It is now used to refer to the killing of those who are incurably ill and in great pain or distress, for the sake of those killed, and in order to spare them further suffering or distress."[৫] অর্থাৎ বহুদিন যাবৎ রোগ যন্ত্রণায় আক্রান্ত রোগীকে মুক্তি দেওয়ার লক্ষ্যে কৃপাবশত প্রাণহরণের ব্যবস্থাকে করুণাহত্যা বলা হয়।

বিভিন্ন দিক থেকে করুণাহত্যার মধ্যে শ্রেণীবিভাগ করা হয়। করুণাহত্যাজনিত-মৃত্যু ঘটানোর উপায়ভেদে করুণাহত্যাকে দুভাগে ভাগ করা হয়। 'সক্রিয় করুণাহত্যা' (Active euthanasia) এবং 'নিষ্ক্রিয় করুণাহত্যা' (Passive euthanasia)। 'তীব্র যন্ত্রণায় আক্রান্ত রোগীর দুঃখ-দুর্দশার হাত থেকে সরাসরি মুক্তি দেওয়ার লক্ষ্যে তার মৃত্যু বা প্রাণহরণের ব্যবস্থা করাকে সক্রিয় করুণাহত্যা বলা হয়'।[৬] উদাহরণস্বরুপ-প্রাণঘাতী ইনজেকশন বা অতিরিক্ত মাত্রায় ঘুমের ওষুধ খাইয়ে সরাসরি রোগীকে মেরে ফেলার প্রক্রিয়া এই শ্রেণির করুণাহত্যা। সাধারণ অর্থে মেরে ফেলা বলতে যা বোঝায় তার সঙ্গে সক্রিয় করুণাহত্যার তেমন কোন পার্থক্য নেই, এক্ষেত্রে কেবল তীব্র যন্ত্রনায় আক্রান্ত রোগীকে শান্তি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দেওয়া হয়। যা ভারতবর্ষসহ বহুদেশে বেআইনি। অপরদিকে, 'নিষ্ক্রিয় করুণাহত্যার ক্ষেত্রে রোগীর উপর সক্রিয়ভাবে কোন কিছু করা হয় না, শুধুমাত্র রোগীর চিকিৎসা বা প্রাণদায়ী ব্যবস্থা গুলি প্রত্যাহার করে নিয়ে মৃত্যুর পথ প্রশস্ত করা হয়। এক্ষেত্রে রোগীকে মৃত্যুর মুখে যেতে অনুমতি দেওয়া (letting die) হয়।[৭] এই বিষয়ে অধ্যাপক পিটার সিঙ্গার *Practical Ethics* নামক গ্রন্থে 'স্পাইনা বাইফিডা' নামক কালান্তক জন্মগত শিশুরোগের একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। উক্ত রোগের ক্ষেত্রে জন্মগত ভাবে কোনও শিশু শরীরের পিছনে একটি ছিদ্র নিয়ে

জন্মগ্রহণ করে, শিশুর স্পাইনাল কর্ড সেই ছিদ্র দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই রোগের কোনও চিকিৎসা না থাকার কারণবশত অল্প কিছু দিনের মধ্যেই শিশুটি মারা যেত। পরবর্তীতে 'হোল্টার ভালভ্' নামক একটি যন্ত্রের মাধ্যমে 'স্পাইনা বাইফিডা' রোগের চিকিৎসা শুরু হলেও এইরূপ চিকিৎসার মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকা ছিল অর্থহীন। কেননা বেশিরভাগ শিশু প্যারালিসিসের শিকার, শরীরের উপর কোনরকম নিয়ন্ত্রণ থাকে না, অর্ধেকের বেশি শিশু মানসিক প্রতিবন্ধী হয়ে যায়। ফলে চিকিৎসকেরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে হোল্টার ভালভ্ পদ্ধতিতে এই রোগে আক্রান্ত সকল শিশুর চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। বরং যারা জন্মগত কম ত্রুটি নিয়ে জন্মেছে কেবল তাদেরই চিকিৎসা করা উচিৎ। এক্ষেত্রে যে সমস্ত শিশুদের প্রতি কোনও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া হচ্ছে না এবং চিকিৎসা প্রত্যাহার করা হচ্ছে তা হলো নিষ্ক্রিয় করুণাহত্যা।

অপর এক দিক থেকে করুণাহত্যাকে তিন প্রকার বলা হয়। ঐচ্ছিক করুণাহত্যা (Voluntary euthanasia), অনৈচ্ছিক করুণাহত্যা (Involuntary euthanasia) এবং ইচ্ছা-নিরপেক্ষ করুণাহত্যা (Non-voluntary euthanasia)।

ঐচ্ছিক করুণাহত্যা (Voluntary Euthanasia): অধ্যাপক পিটার সিঙ্গার *Practical Ethics* নামক গ্রন্থে ঐচ্ছিক করুণাহত্যা সম্পর্কে বলেন- "Voluntary Euthanasia is Euthanasia carried out at the voluntary request of the person killed, who must be, when making the request, mentally competent and adequately informed."[৯] অর্থাৎ যখন একজন স্বাধীন স্বতন্ত্র সচেতন ব্যক্তিকে তার ইচ্ছা অনুসারে অনারোগ্য ব্যাধি ও দুর্দশা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য তার মৃত্যুতে সাহায্য করা হয় তখন তাকে ঐচ্ছিক করুণাহত্যা বলে।

উদাহরণস্বরুপ, অধ্যাপক Peter Singer-এর *Practical Ethics* গ্রন্থ অবলম্বনে ঐচ্ছিক করুণাহত্যার একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়। ডেরেক হামফ্রে নামক একজন ব্যক্তির ক্যানসারে আক্রান্ত স্ত্রী নিজের দ্রুত ও শান্তিপূর্ণ মৃত্যুর ব্যবস্থা করার জন্য তাকে অনুরোধ করেছিলেন। কেননা তার স্ত্রী নিজের রোগের শেষ পরিণতি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। পরবর্তীতে ডেরেক তাঁর স্ত্রীর কথামতো কিছু প্রাণঘাতী ওষুধ সংগ্রহ করে দিয়ে ছিলেন যেগুলি ব্যবহার করে তার স্ত্রী স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ করেন।[১০]

অনৈচ্ছিক করুণাহত্যা (Involuntary Euthanasia): অধ্যাপক পিটার সিঙ্গার *Practical Ethics* নামক গ্রন্থে অনৈচ্ছিক করুণাহত্যার সম্পর্কে বলেন- "I shall regard euthanasia as involuntary when the person killed is capable of consenting to her own death but does not do so, either because she is not asked or because she is asked and chooses to go on living."[১১] অর্থাৎ অনৈচ্ছিক করুণাহত্যা সেই ধরনের করুণাহত্যাকে বোঝায় যেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার প্রাণনাশের ব্যাপারে সম্মতি দিতে সমর্থ, কিন্তু বাস্তবিক তিনি সম্মতি

দেননি। এক্ষেত্রে হয় প্রাণনাশের ব্যাপারে তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়নি অথবা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কিন্তু ব্যক্তিটি বেঁচে থাকার কথাই জানিয়েছে। যদিও এপ্রকার অনৈচ্ছিক করুণাহত্যা অতিবিরল।

ইচ্ছা-নিরপেক্ষ করুণাহত্যা (Nonvoluntary Euthanasia): অধ্যাপক পিটার সিঙ্গার *Practical Ethics* নামক গ্রন্থে ইচ্ছা-নিরপেক্ষ করুণাহত্যা সম্পর্কে বলেন- "If a human being is not capable of understanding the choice between life and death, euthanasia would be neither voluntary nor involuntary, but nonvoluntary."[১২] অর্থাৎ যেক্ষেত্রে একজন রোগীর জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কে কোনও বোধ থাকে না, তার পক্ষে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে একটি বেছে নেওয়ার ক্ষমতা থাকে না, সেক্ষেত্রে করুণাহত্যা ঘটানো হলে তাকে ইচ্ছা-নিরপেক্ষ করুণাহত্যা বলা হয়। ইচ্ছা-নিরপেক্ষ করুণাহত্যার উদাহরণস্বরুপ পিটার সিঙ্গারের উল্লিখিত উদাহরণের উল্লেখ করা হলো- মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের দুর্বলতার জন্য লুই রিপাওলি-র (Louis Repouille) পুত্র-সন্তান জীবস্মৃত অর্থাৎ মৃতের ন্যায় তার জীবনদশা। অবস্থান-চলা-বলার সামর্থ্য নেই, কোনও কিছু করার সামর্থ্য নেই। দীর্ঘ পাঁচ বছর এই ভাবে অতিবাহিত হবার পর একদিন লুই তাঁর মৃতবৎ পুত্রকে ক্লোরোফর্ম (Chloroform) হত্যাস্বরূপ দুর্বিষহ জীবন থেকে মুক্তি দিলেন।[১৩]

Euthanasia বা করুণাহত্যার সমর্থনযোগ্যতা:

করুণাহত্যা সমর্থনযোগ্য কি-না এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যথেষ্ট কষ্টসাধ্য এবং বিতর্কিত। কেননা, আমরা করুণাহত্যার প্রতি ক্ষেত্রেই দেখতে পাই দুর্বিষহ রোগ-যন্ত্রণাময় জীবন থেকে মুক্তির জন্য করুণাহত্যা করা হয়। কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার আছে, ফলত অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা যায় না। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী কারো জীবননাশের প্রতি আমাদের কোনও অধিকার নেই। প্রাথমিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা করুণাহত্যা অসমর্থনযোগ্য পদ্ধতি বলে বিবেচনা করতে পারি চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক Hippocrates-র শপথ-বাক্য অনুসরণ করে। শপথ-বাক্যে বলা হয় "To give no deadly medicine to anyone if asked, nor suggest any such counsel."[১৪] অর্থাৎ কেউ কামনা করলেও তাকে প্রাণঘাতী ঔষধ দেওয়া যাবে না এবং ঔই রকম ঔষধ ব্যবহার করার জন্যে কোনও ব্যক্তিকে পরামর্শ দেওয়াও যাবে না। তবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক Hippocrates এর শপথ-বাক্য অনুসারে করুণাহত্যাকে অসমর্থনযোগ্য বললেও করুণাহত্যার গ্রহণযোগ্যতা শর্ত সাপেক্ষ।

ঐচ্ছিক করুণাহত্যার ক্ষেত্রে রোগীর সম্মতিতে প্রাণনাশ ঘটে থাকে ফলে ঐচ্ছিক করুণাহত্যা গ্রহণযোগ্য। কিন্তু যেক্ষেত্রে সম্মতি পাওয়া যায় না সেক্ষেত্রে করুণাহত্যার বৈধতা বিচার করা অসুবিধাজনক। অনৈচ্ছিক করুণাহত্যার ক্ষেত্রে সম্মতি পাওয়া সম্ভব নয়, কেননা রোগী নির্দিষ্ট পরিস্থিতে সম্মতি দানের অবস্থায় থাকে না। অপরপক্ষে ইচ্ছা-নিরপেক্ষ করুণাহত্যার ক্ষেত্রে রোগী কোনও দিনই সচেতন থাকে না

কিংবা বিচারশীল অবস্থায় থাকে না ফলত রোগীর পক্ষে করুণাহত্যার স্বপক্ষে সম্মতি দেওয়া সম্ভব নয়। অনৈচ্ছিক ও ইচ্ছা-নিরপেক্ষ এই দুটি ক্ষেত্রেই ডাক্তার কিংবা পরিবারের লোক রোগীর জীবনের পরিণামের দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে। ইচ্ছা-নিরপেক্ষ করুণাহত্যার ক্ষেত্রে প্রাণনাশের সিদ্ধান্ত কোনও ভাবেই রোগীর পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয় ফলত করুণাহত্যার সমর্থনযোগ্যতার ক্ষেত্রে ইচ্ছা-নিরপেক্ষ করুণাহত্যার ঘটনাটিকে সর্বাধিক অন্যায় বা অবৈধ বলে মনে হয়। যে সমস্ত মানুষ জন্মগত বিকলাঙ্গ, জড়বুদ্ধি, যাদের ইন্দ্রিয়ে ত্রুটি রয়েছে এবং যাদের বিচারের ক্ষমতা নেই তাঁদের ক্ষেত্রে প্রাণনাশের ঘটনাটি ইচ্ছানিরপেক্ষ করুণাহত্যা। সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে বুদ্ধিবৃত্তি, স্বাধীনতা এবং আত্মসচেতনতাই মানুষের লক্ষণ। কিন্তু বিকলাঙ্গ ও জড়বুদ্ধি শিশুর মধ্যে এই সমস্ত ধর্ম থাকে না ফলত এই জাতীয় শিশুর হত্যাকে স্বাভাবিক শিশুর হত্যার সঙ্গে তুলনা করা যায় না।

এ বিষয়ে পিটার সিঙ্গার বলেছেন বিকলাঙ্গ শিশুর ও স্বাভাবিক শিশুর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যের নিদর্শন পাওয়া যায় শিশুর পিতা-মাতার মনোভাবের মধ্যে। শিশুর জন্ম তার পিতা-মাতার কাছে একটি সুখকর ঘটনা হওয়া সত্ত্বেও যখন বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হয় তা নেহাতই একটি দুঃখজনক ঘটনা। যে সমস্ত শিশু জন্মগত বিকলাঙ্গ তাঁদের করুণাহত্যার মাধ্যমে প্রাণনাশের বিষয়টি পিতা-মাতার কাছে অনেকটা স্বস্তিদায়কও। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে ইচ্ছা-নিরপেক্ষ করুণাহত্যা সমর্থনযোগ্য।[১৫]

কিন্তু যদি কোন দম্পতি কিংবা পিতা-মাতা তাদের বিকলাঙ্গ সন্তানের দীর্ঘ জীবন কামনা করেন তাহলে অবশ্য করুণাহত্যা করা সম্ভব নয়। কেননা বিকলাঙ্গ শিশুর ক্ষেত্রে প্রাণনাশের বিষয়টি নির্ভর করে পিতা-মাতার সম্মতির উপর। এক্ষেত্রে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে পিতা-মাতার সম্মতি আছে এরূপ করুণাহত্যার ক্ষেত্রে বিকলাঙ্গ শিশুর প্রাণনাশের বিষয়টি কি সমর্থনযোগ্য?

এ-প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ একটি নিদর্শনের উল্লেখ করা যায়- ‘Down Syndrome’ বা ‘Mongolism’ রোগ আক্রান্ত শিশুরা মানসিক প্রতিবন্ধী হয় এবং তারা কখনই স্বাভাবিক মানুষ হয়ে উঠতে পারে না। এছাড়াও শিশুরা আরও একটি শারীরিক সমস্যা নিয়ে জন্মাতে পারে যার নাম ‘Spina bifida’। এই রোগের মূল লক্ষণ হলো মেরুদণ্ড পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ না করা। জন্ম থেকেই শিশুর কোমরের নীচ থেকে বাকি অংশ অসাড় হয়ে পড়ে এবং মস্তিষ্কে এক রকম তরল পদার্থ জমা হয়। এই অবস্থাকে বলা হয় ‘Hydrocephalus’ যার ফলে শিশু মানসিক দিক থেকে প্রতিবন্ধী হয় এবং শিশু জড়বুদ্ধি হয়ে পরে।[১৬]

কিছু চিকিৎসকের মতানুসারে ‘Spina bifida’ রোগে আক্রান্ত শিশুদের অস্ত্রোপচারের সাহায্যে কিছু দিন বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হলেও তারা চিরদিনের জন্য সুস্থ হয়ে উঠতে পারেনা। এক্ষেত্রে তাদের জীবন কিছুটা দীর্ঘায়িত হলেও দুর্বিষহ তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যায়। এই কারণবশত চিকিৎসকেরা মনে করেন এই সকল

শিশুদের বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করার পরিবর্তে করুণাহত্যার মাধ্যমে তাদের দুর্বিষহ জীবনের শান্তিপূর্ণ প্রাণনাশ ঘটানো শ্রেয়। অবশ্য যেক্ষেত্রে একটি শিশু জন্মগত অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও নিজস্ব জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সেক্ষেত্রে করুণাহত্যা করা উচিত নয়। যেমন- 'Haemophilia' রোগে আক্রান্ত শিশুর রক্ত জমাট বাঁধতে পারে না। সামান্যতম কারণে যদি কখনও রক্তক্ষরণ হয় তাহলে তা দীর্ঘকাল চলতে থাকে। এর ফলে শিশু পঙ্গু হয়ে পড়তে পারে, তার মৃত্যু হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। তবুও এই রোগে আক্রান্ত শিশুরা বাঁচতে চায়। এই কারণবশত হেমোফিলিয়া রোগাক্রান্ত শিশুকে তার অসুস্থতা থাকা সত্ত্বেও হত্যা করা উচিত নয়। তার জীবন যদি তার কাছে অর্থপূর্ণ হয় তাহলেও তাকে বাঁচার সুযোগ দেওয়া উচিত। কিন্তু যে সমস্ত বিকলাঙ্গ শিশুর পক্ষে সুস্থ ও অর্থপূর্ণ জীবন যাপন করা সম্ভব নয়, এছাড়াও যেখানে জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর পার্থক্য অতিসামান্য সেখানে করুণাহত্যাই একমাত্র অনুসরণযোগ্য পথ।[১৭]

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় করুণাহত্যা ক্ষেত্র বিশেষে অসমর্থনযোগ্য হলেও যে সমস্ত ক্ষেত্রে রোগীর অসুস্থতার কারণে জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে, এছাড়াও যে সমস্ত শিশু জন্মগত বিকলাঙ্গ, যাদের ক্ষেত্রে বেঁচে থাকার অর্থ হলো অসংখ্য যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করা তাঁদের ক্ষেত্রে করুণাহত্যা নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য বলা যায়।

সূত্রনির্দেশ:

১. পাল, সন্তোষ কুমার, *ফলিত নীতিশাস্ত্র* (প্রথম খন্ড), লেভান্ত বুকস, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ-২০২১, পৃষ্ঠা: ১১০-১১১।

২. গুপ্ত, দীক্ষিত, *নীতিশাস্ত্র,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, প্রথম মুদ্রণ-২০১৭, পৃষ্ঠা: ২১৬।

৩. ঐ।

৪. চক্রবর্তী, সোমনাথ, *কথায় কর্মে এথিক্স,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ-২০২০, পৃষ্ঠা: ১৬৬।

৫. Singer, Peter, *Practical Ethics*, Cambridge University Press, USA, Third Edition-2011, P:157.

৬. পাল, সন্তোষ কুমার, *ফলিত নীতিশাস্ত্র* (প্রথম খন্ড), লেভান্ত বুকস, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ-২০২১, পৃষ্ঠা: ১১২।

৭. ঐ।

৮. Singer, Peter, *Practical Ethics*, Cambridge University Press, USA, Third Edtion-2011, P: 178-179.

৯. ঐ, P: 157.

১০. পাল, সন্তোষ কুমার, *ফলিত নীতিশাস্ত্র* (প্রথম খন্ড), লেভান্ত বুকস, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ-২০২১, পৃষ্ঠা: ১১৩।

১১. Singer, Peter, *Practical Ethics*, Cambridge University Press, USA, Third Edition- 2011, P: 158.

১২. ঐ।

১৩. পাল, সন্তোষ কুমার, *ফলিত নীতিশাস্ত্র* (প্রথমখন্ড), লেভান্ত বুকস, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ-২০২১, পৃষ্ঠা: ১১৪-১১৫।

১৪. Singer, Peter, *Practical Ethics*, Cambridge University Press, USA, Third Edition-2011, P: 155.

১৫. গুপ্ত, দীক্ষিত, *নীতিশাস্ত্র*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, প্রথম মুদ্রণ-২০১৭, পৃষ্ঠা: ২২৫-২২৬।

১৬. ঐ, পৃষ্ঠা: ২২৬।

১৭. ঐ, পৃষ্ঠা: ২২৭।

গ্রন্থপঞ্জী

- সন্তোষ কুমার পাল, ফলিত নীতিশাস্ত্র, প্রথম খন্ড, লেভান্ত বুকস, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ-২০২১।
- দীক্ষিত গুপ্ত, নীতিশাস্ত্র, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, প্রথম মুদ্রণ-২০১৭।
- সোমনাথ চক্রবর্তী, কথায় কর্মে এথিক্স, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ-২০২০।
- সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য, ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ-২০২০।
- বেনুলাল ধর, ব্যবহারিক নীতিদর্শন, মিত্রম, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ-২০২২।
- স্বপ্না সরকার, নীতিবিদ্যা: ফলিত পরিবেশ ও অধিনীতিবিদ্যা, মিত্রম, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: 2022।
- Peter Singer, Practical Ethics, Cambridge University Press, USA, Third Edition-2011.

পুতলি মায়া দেবী (পোদ্দার) ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও সমাজ সংস্কারের ইতিহাসে এক অনালোচিত নাম

নারায়ণ নন্দী
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
সরোজিনী নাইডু কলেজ ফর উইমেন

সারসংক্ষেপ : ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশী যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয় ও ইংরেজদের জয়লাভের মধ্য দিয়ে সূচনা হয়েছিল ভারতবাসীর পরাধীনতার। এরপর ভারতবর্ষকে বহন করতে হয়েছিল প্রায় দুই শত বছরের পরাধীনতার গ্লানি। পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনে ভারতবর্ষকে কঠিন মূল্য দিতে হয়েছে, দিতে হয়েছে বহু তাজা প্রাণ বলিদান। ভারতবর্ষ জুড়ে পরিচালিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ধারায় জাতীয়তাবাদী তথা স্বাধীনতা আন্দোলন। এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম পীঠস্থান ছিল বাংলা। তবে বাংলার সর্বত্র এই আন্দোলনের ব্যপকতা সমান ছিল না। কলকাতা, মেদিনীপুর, ফরিদপুর, ঢাকা, চট্টগ্রামে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের তীব্রতা ও ব্যাপকতা ছিল যথেষ্ট বেশি। উত্তরবঙ্গে জাতীয় আন্দোলনের তীব্রতা তুলনামূলক কম ছিল।তবে জাতীয় আন্দোলনে উত্তরবঙ্গের মানুষের আত্মত্যাগ একেবারে উপেক্ষা বিষয় ছিল না। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে দার্জিলিঙে পার্বত্য অঞ্চলে জনবসতি বৃদ্ধি পেতে থাকে। গান্ধিজীর আন্দোলন এই অঞ্চলে চরিত্রগত পরিবর্তন এনেছিল। তার আন্দোলনের পদ্ধতি দেশের অন্যান্য অংশের মানুষের মতো উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষকেও প্রভাবিত হয়েছিল। দার্জিলিং এর গোর্খাগণ স্থানীয় নেতা দলবাহাদুর গিরির দ্বারা স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ব্রিটিশভক্ত বলে পরিচিত গোর্খাদেরও তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। জাতীয় আন্দোলনে পুরুষদের পাশাপাশি বহু নারীও নিজেদেরকে সামিল করেছিল। সমাজের নানা কুসংস্কারের বেড়াজাল, বাঁধা-নিষেধ, পদে পদে প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে, সংকীর্ণতার উর্ধে উঠে তারা পুরুষ বিপ্লবীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমতলে জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে। এমনকি আর্থিক সমস্যা ও সামাজিক নানা চাপ থাকাও সত্বেও তারা জাতীয় আন্দোলনে নিবেদিতপ্রাণা ছিলেন। এমনই এক মহীয়সী বীরাঙ্গনা নারী ছিলেন দার্জিলিং জেলার কার্শিয়াং এর পুতলি মায়া তামাং (পোদ্দার)। দীর্ঘ সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের পর ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ১৫ ই আগস্ট ভারতবর্ষ তার কাঙ্খিত স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু আজও পুতলি মায়া দেবীর মত দেশপ্রেমী বীরকন্যারা ইতিহাসের পাতায় অনালোচিত রয়ে গেছে। তাদের আত্মত্যাগ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁর বীরত্বের কাহিনী যথামথভাবে আজও উঠে আসেনি। আজও তারা উপেক্ষিতা।

আলোচ্য প্রবন্ধে এই বীরকন্যা পুতলি মায়া দেবীর আত্মত্যাগ,বীরত্ব, জাতীয় আন্দোলন ও সমাজ সংস্কারে তাঁর অবদানের বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি ।
সূচকশব্দ : পরাধীনতা, দেশপ্রেম, কংগ্রেস, দার্জিলিং, কার্শিয়াং, গোর্খা।

দীর্ঘ আন্দোলন ও সংগ্রামের পর ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছে।এই স্বাধীনতা লাভের পথ খুব একটা সহজ ছিল না, ছিল বন্ধুর-দুর্গম। আর এই কঠিন দুর্গম পথে জাতীয় আন্দোলনে পুরুষদের পাশাপাশি বহু নারীও নিজেদেরকে সামিল করেছিল।পরিবার ও সমাজের নানা কুসংস্কারের বেড়াজাল,বাঁধা-নিষেধ, পদে পদে প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে সংকীর্ণতার উর্ধে উঠে তারা পুরুষ বিপ্লবীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমতলে জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে।তারা নানাভাবে বিপ্লবীদের সহায়তা প্রদান করেছে।কখনোবা বিপ্লবীদের আশ্রয়দান, আবার কখনো অস্ত্র ও প্রচার পুস্তিকা সরবরাহ করা, কখনোবা তা গোপন কোন স্থানে লুকিয়ে রাখা, ছদ্মবেশে বিপ্লবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও খবরাখবর প্রদান, আবার কখনো সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ, কোন কোন ক্ষেত্রে নেতৃত্বদান প্রভৃতি নানাবিধভাবে তারা বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম অঙ্গ বা অংশীদার হয়ে উঠেছে। ঊনিশ শতকের প্রথমপাদ থেকে জাতীয়তাবাদী সংস্কৃতিক তথা দেশাত্মবোধক গান, কবিতা, সাহিত্য,

পত্রপত্রিকা, নাটকমেলা প্রভৃতি তাঁদেরকে স্বাদেশিকতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে। তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে- এর শরিক হয়ে ওঠে। এরপর গান্ধীজি ও জাতীয় কংগ্রেসের কার্যাবলী তাদেরকে অনুপ্রাণিত করে। অ্যানি বেসান্ত, সরোজিনী নাইডু, উর্মিলা দেবী, বাসন্তী দেবী, হেলেন লেপচা (সাবিত্রী দেবী) উজ্জ্বল মজুমদার প্রমূখ খুব বীরাঙ্গনার নেতৃত্ব, আত্মত্যাগ ও কার্যকলাপ নারীদের জাতীয় আন্দোলনের অংশগ্রহণে উৎসাহী করে তোলে, এর পাশাপাশি বিপ্লবী বীণা দাস, বিপ্লবী শান্তি,সুনিতী, লীলা নাগ ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার-এর মত বীরকন্যাদের কার্যকলাপ ও আত্মত্যাগ তাদেরকে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত করে স্বাধীনতার পথে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহ ও সাহস জুগিয়েছিল।গৃহের অন্দরমহল ছেড়ে, পারিবারিক নানা বিধিনিষেধ ও প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে এমনকি আর্থিক সমস্যা ও সামাজিক নানা চাপ থাকাও সত্বেও তারা জাতীয় আন্দোলনে নিবেদিতপ্রাণা ছিলেন। এমনই এক মহীয়সী বীরাঙ্গনা নারী ছিলেন দার্জিলিং জেলার কার্শিয়াং এর পুতলি মায়া তামাং (পোদ্দার)।[১]

দীর্ঘ সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের পর ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ১৫ ই আগস্ট ভারতবর্ষ তার কাঙ্খিত স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু আজও পুতলি মায়া দেবীর মত দেশপ্রেমী বীরকন্যারা ইতিহাসের পাতায় অনালোচিত রয়ে গেছে। তাদের আত্মত্যাগ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁর বীরত্বের কাহিনী যথাযথভাবে বা সুস্পষ্ট ভাবে আজও উঠে আসেনি। আজও তারা উপেক্ষিতা। রয়ে গেছেন অন্তরালে।আলোচ্য প্রবন্ধে এই বীরকন্যা পুতলি মায়া দেবীর আত্মত্যাগ, বীরত্ব, জাতীয় আন্দোলন ও সমাজ সংস্কারে

তাঁর অবদানের বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি ।দার্জিলিং ঊনিশ শতকের প্রথমপাদ পর্যন্ত একটি স্বল্প জনসংখ্যা যুক্ত অঞ্চল ছিল। [২]

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই ব্রিটিশরা দার্জিলিং-এ তাদের গ্রীষ্মকালীন বাসস্থান রূপে গড়ে তুলতে থাকে। রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি হয়। এই সময় দার্জিলিং-এ ব্রিটিশের এই অনুপ্রবেশ, শিক্ষা ব্যবস্থা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়নের ফলে এবং চা বাগিচায় কাজের সুযোগ ও নানাবিধ বাণিজ্যিক কার্যকলাপের জন্য এই অঞ্চলে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।এই অঞ্চলে বাসিন্দারা ছিল মূলত নেপাল থেকে স্থানান্তরিত এবং দার্জিলিং মহকুমায় বসবাসকারী গোর্খা জনগণ। [৩]

যারা ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ছিল এবং তাঁদের সাহসিকতা, বীরত্ত ও প্রচন্ড আনুগত্যের জন্য তারা পরিচিত ছিল। সাধারণত গোর্খাগণ ব্রিটিশ অনুগত বা ব্রিটিশভক্ত বলে পরিচিত ছিলেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় এটি ব্যাপকভাবে প্রমাণিত হয়েছিল। তবে তাই বলে তাঁরা ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয় আন্দোলন তথা স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেননি, তা নয়। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিংয়ের এই অঞ্চলে যে সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামী দেশের মুক্তি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন 'পাহাড়ি গান্ধী' নামে পরিচিত দল বাহাদুর গিরি।[৪]

এছাড়াও ভক্তবীর লামা, হেলেন লেপচা, প্রতিমান শিঙ লামা, পুতলি মায়া দেবী (পোদ্দার) প্রমূখ। আলোচ্য প্রবন্ধে পুতলি মায়া পোদ্দার, একজন গোর্খা নারী ছিলেন,তাঁর আত্মত্যাগ, নানা প্রতিবন্ধকতা জয় করে জাতীয় আন্দোলনের সক্রিয়ভাবে তার অংশগ্রহণ প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরার প্রয়াস মাত্র।

তিনি জাতীয় আন্দোলনে শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গের এক জন উল্লেখযোগ্য নারী মুখই ছিলেন না। তিনি অত্যাচারী, বৈষম্যমূলক, সম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে প্রচলিত নানা কুসংস্কার ও সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়েছিলেন। পচনশীল, ঘুণধরা সামাজিক ব্যবস্থাকেও তিনি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তরবঙ্গে দার্জিলিংয়ের নেপালি ভাষাভাষী যে সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামী অংশগ্রহণ করেন।তাঁদের অন্যতম ছিলেন এই পুতলি মায়া দেবী। তিনি ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে দার্জিলিং জেলার বর্ধমান রোডে অবস্থিত একটি বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। [৫]

তার পিতা ছিলেন মদন বাহাদুর তামাং। যিনি বর্ধমান রোডে একটি ছোট্ট মাংসের দোকান চালাতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি কার্শিয়াং মহাকুমা অফিসে একজন চৌকিদার বা প্রহরী হিসেবে নিযুক্ত হন। সরকারি কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি তাঁর মাংসের দোকানের ব্যবসা ছেড়ে দেন। মদন বাহাদুরের চার সন্তানের মধ্যে পুতলি ছিলেন জ্যেষ্ঠ কন্যা।ছোটবেলা থেকেই পুতলি দেবী ছিলেন খুবই সাহসী এবং তিনি কার্শিয়াং এর স্কট মিশনের স্কুলে পড়াশোনা করেন। [৬]

ইতিমধ্যে একটি ঘটনা তাঁকে বিশেষভাবে আন্দোলিত করে। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে বিহারের যুব কংগ্রেস নেতা সর্যূ প্রসাদ পোদ্দার বিহার থেকে উত্তরবঙ্গে আসেন। তাঁর এই অঞ্চলে আগমনের উদ্দেশ্য ছিল এই অঞ্চলের যুবকদের মধ্যে ঐক্যবোধ জাগরণ ও জাতীয় ভাবাবেগের চেতনা তৈরি করা। কার্শিয়াং শহরে খদ্দরের কুর্তা পাজামা পরা এই বিহারী যুবককে দেখে স্বাধীনতা প্রেমিক হরিশ ছেত্রী, পুতলি মায়া দেবীসহ এই অঞ্চলের আরো কয়েকজনের মনে কৌতূহল সঞ্চারিত হয়।সর্যূ প্রসাদ তখন কার্শিয়াং-এর বর্ধমান রোডের একটি গ্যারেজে থাকতেন।

সর্যূ প্রসাদ পোদ্দারের সঙ্গে যোগাযোগের পর হরিশ ছেত্রী স্বাধীনতা তথা জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য কংগ্রেস পার্টিতে যোগদান করেন। পুতলি মায়া দেবীও সেই সময় কংগ্রেসে যোগদান করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি সে সময় স্কট মিশন স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। তার বয়স তখন খুবই কম ছিল। তাই সর্যূ প্রসাদ তাকে তখন তাঁর পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য পরামর্শ দেন।[৭] তা সত্ত্বেও পুতলি মায়া দেবী স্কুল জীবনে কংগ্রেসের কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং কংগ্রেসের আন্দোলন সম্পর্কে খোঁজখবর রাখতেন।

ইতিমধ্যে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে হেলেন লেপচা (সাবিত্রী দেবী) হরিশ ছেত্রী, প্রতিমান সিংহ লামা প্রমুখের সহায়তায় কার্শিয়াং-এ কংগ্রেসের শাখা অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়।তখন পুতলি মায়া দেবী কংগ্রেসের সদস্যপদ লাভ করেন এবং কংগ্রেসী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।শুধু তাই নয়,এই সময় তিনি মহিলাদের নানাবিধ সমস্যা কংগ্রেস কমিটির গোচরে আসতো সেগুলোর সঠিক সমাধান করতেন। তাঁর পরিবার বিশেষত তার পিতা মদন বাহাদুর তামাং জাতীয় আন্দোলনে যুক্ত হতে দিতে চাননি। কেননা তিনি একজন সরকারি কর্মচারী ছিলেন। তার কন্যা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যুক্ত হওয়ায় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁকে নানাভাবে চাপ দিচ্ছিল ও হেনস্থা করছিল এমনকি পুতলি দেবীকে আন্দোলনকে থেকে দূরে থাকার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে একজন নার্স বা সেবিকা হিসাবে চাকরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল।[৮]

কিন্তু তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এরপরও ব্রিটিশ পুলিশ ও প্রশাসন তাকে সরকারী নীতির বিরুদ্ধে না যাওয়ার জন্য বারবার সতর্ক করেছিল, এমনকি হুমকি প্রদান করেছিল।কিন্তু তিনি তাতে কোনপ্রকার কর্ণপাত করেন নি। জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা ছাড়াও এই সময় পুতলি মায়া দেবী কার্শিয়াং-এ 'হরিজন সমাজ' গঠন করে তিনি হরিজন জনগণকে শিক্ষার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। তিনি হরিজনদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন।তিনি স্থানীয় মানুষদের মদ্যপানের কুফল সম্পর্কে অবহিত করেন এবং বয়স্কদের রাতের স্কুলে পড়িয়ে সচেতন করতে উদ্যোগী হন। তাঁর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল যুবক ও নারীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম জাগ্রত করা এবং মহিলাদের চরকার প্রশিক্ষণ দেওয়া। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'নারী কল্যাণ সমিতি' নামে একটি মহিলা সমিতি গঠন

করেন। যার উদ্দেশ্য ছিল মহিলাদের আর্থ-সামাজিক নানাবিধ সমস্যার সমাধান করা, চরকা, খাদি এবং স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি। তিনি আরো বুঝতে পেরেছিলেন যে মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা প্রয়োজন। তাদের একটি প্ল্যাটফর্ম প্রয়োজন যাতে তাঁরা জাতীয় আন্দোলনে পুরুষদের সাথে সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। তাঁর হরিজন সমাজ ও নারী কল্যাণ সমিতি মানুষের কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।মহিলারা প্রকাশ্যে গান্ধীজীর ছবি রেখে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রচার শুরু করে।এই সমস্ত কার্যকলাপ ব্রিটিশ সরকার ভালোভাবে নেয় নি।সরকারী কর্তৃপক্ষ তাঁকে থানায় ডেকে সতর্ক করে দেয় এবং জাতীয় আন্দোলন থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়। [৯]

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে কার্শিয়াং-এ রেল স্টেশনের কাছে একটি বাড়িতে কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হয়েছিল।সেখানে জনসাধারণ বিভিন্নভাবে প্রতারিত হচ্ছিল।হরিশ সেত্রী প্রতিমান সিংহ লামা, সর্যূ প্রসাদ এবং পুতলি মায়া দেবী প্রমূখ এই কার্নিভালের বিপক্ষে ছিলেন।জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশ প্রশাসন এর পক্ষে ছিল । হরিশ ছেত্রী পুতলি মায়া দেবী প্রমুখের নেতৃত্বে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক দল কার্নিভাল বিরোধী প্রচার শুরু করে। এই প্রচার এতটাই জোরদার হয়েছিল যে মাত্র দুদিনের মধ্যে কার্নিভাল বন্ধ করে দিতে হয় এবং একজন সাধারণ মানুষও এতে যোগ দেয় নি।কিন্তু এই ঘটনায় পুতলি মায়া দেবীর পরিবারকে প্রশাসন থেকে ডেকে হুমকি দেয়া হয়েছিল যে যদি পুতলি মায়া দেবী বিপ্লবী কর্মকাণ্ড না ছেড়ে দেয়,তবে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।সরকারি কর্তৃপক্ষের চাপে তাঁর পিতা ও পরিবার তাকে জাতীয় আন্দোলন থেকে সরে আসতে বলেন।কিন্তু পুতলি মায়া দেবী তাঁর পথ থেকে একটুও সরে আসেন নি। [১০]

তার এই হরিজন সমাজ ও নারী কল্যাণ সমিতির মাধ্যমে দেশপ্রেম জাগ্রত হয়। কার্শিয়াং-এর এই অঞ্চলে কংগ্রেসী কার্যকলাপ দ্রুত বৃদ্ধি পায়।মানুষের মন থেকে ভয় দূর হয়। উত্তরবঙ্গের এই অঞ্চলে ধীরে ধীরে কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।যারা কংগ্রেসের নাম বলতে ভয় পেত, তাঁরা দলে দলে কংগ্রেসের সদস্যপথ গ্রহণ করে জাতীয় আন্দোলনে সামিল হযতে থাকে। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং-এর এই অঞ্চলে কংগ্রেসের শক্তি ঘাঁটিতে পরিণত হয়।

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ৮ই আগস্ট বোম্বাইতে কংগ্রেসের অধিবেশনে কংগ্রেস 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব পাস করে। পরদিন ৯ই আগস্ট ব্রিটিশ পুলিশ গান্ধীজিসহ কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বকে গ্রেফতার করে।এর বিরুদ্ধে সারাদেশে প্রতিবাদ জানানো হয়। [১১] ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে গান্ধীজীর ডাকে ভারত ছাড়ো বা আগস্ট আন্দোলনে সমগ্র দেশের মত উত্তরবঙ্গও উত্তাল হয়ে ওঠে। [১২] ওই বছরই ১২ ই আগস্ট কার্শিয়াং এর একটি জনসভা হয়। সেখানে ব্রিটিশ পুলিশ সর্যূ প্রসাদ পোদ্দারকে গ্রেফতার করে। এরপর ১৩ই আগস্ট পুতলি মায়া দেবী ভারত ছাড়ো আন্দোলনকালে এক বিশাল জনসমাবেশে বিক্ষোভের

নেতৃত্ব দেন।[১৩] কার্শিয়াং থানায় সামনে এই প্রতিবাদ মিছিলটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মিছিলটি স্লোগান দিতে দিতে শহরের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছানোমাত্র পুলিশ পুতলি মায়া দেবীকে গ্রেফতার করে। তাঁর মুক্তির দাবিতে বহু সংখ্যক মানুষ থানা ঘেরাও করে। [১৪]

আন্দোলনকারীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকায় পুলিশ শঙ্কিত হয়ে পড়ে। শৃঙ্খলার অবনতি হওয়ার আশঙ্কায় পুলিশ পুতলি মায়া দেবী সহ অন্যান্য বন্দী নেতৃবৃন্দকে থানার পিছন দিক দিয়ে চা বাগানের রাস্তা দিয়ে জিপে করে দার্জিলিং-এ জেলে নিয়ে যান। [১৫] দার্জিলিং-এ পুলিশ প্রশাসন তাদেরকে জানান যে তাঁরা যদি মুচলেকা প্রদান করে যে-তাঁরা এ জাতীয় কাজে আর নিজেদেরকে যুক্ত করবে না,তাহলে তাঁরা মুক্তি পাবে। কিন্তু কয়েকজন বন্দী মুচলেকা স্বাক্ষর করে মুক্তি পেলেও সর্যূ প্রসাদ পোদ্দার,জনক লাল কূর্মী এবং পুতলি মায়া দেবী বিট্রিশের এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি।ফলে অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপ করার জন্য বিচারে পুতলি মায়া দেবীর কারাদন্ড হয়।বিচারে তাঁর ১২ বছরের কারাদন্ড হয়।জেলে তিনি অনশন করেছিলেন।অনশন আন্দোলনের পর জেল কর্তৃপক্ষ তাকে সাধারণ বন্দী থেকে রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা দিতে বাধ্য হয়।কারাগারে থাকার সময় তিনি প্রতিদিন চরকা কাটতেন এবং গীতা পাঠ করতেন। [১৬]

কিন্তু তাঁর কারাবাসের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই ১৯৪৪ সালে স্বাস্থ্যের অবনতির কারণে তিনি ব্রিটিশের কারাগার থেকে মুক্তি পান।কিন্তু তার পরিবার এই সময় তাঁকে নিয়ে খুবই বিব্রত ছিল। তাঁর পরিবার তাকে জানিয়ে দেয় যে জাতীয় আন্দোলন আন্দোলন নতুবা পরিবার তাকে একটা দিক বেছে নিতে হবে।তিনি পরিবারের পরিবর্তে জাতীয় আন্দোলনের পথকেই বেছে নেন।এই সময় একই বছরে সর্যূ প্রসাদও জেল থেকে মুক্তি পান এবং তিনি কার্শিয়াং ফিরে আসেন।

এই সময় কার্শিয়াং এর কংগ্রেস নেতৃত্বকে পুতলি মায়া দেবী তার বাড়ির সমস্যার কথা জানান।তখন তাঁরাই উত্তরবঙ্গের জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের এই দুই সহযোদ্ধা সর্যূ প্রসাদ পোদ্দার ও পুতলি মায়া দেবীকে বিবাহ করে বাস্তব জীবনে সঙ্গী হবার পরামর্শ দেন। উভয়ই এই প্রস্তাবে রাজি হন এবং কার্শিয়াং এর গোর্খা পাবলিক লাইব্রেরী ভবনে দুই মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে বিবাহের আয়োজন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের এই দুই সহচর-এর বিবাহ ছিল একটি অসবর্ণ বিবাহ ; যা তৎকালীন সমাজ স্বীকৃত ছিল না। স্থানীয় বহু মানুষ এই বিবাহের বিরুদ্ধে ছিলেন। তারা এই বিবাহের প্রতিবাদ করেছিল।এই বিবাহের অনুষ্ঠান বন্ধ করার জন্য বহু মানুষ খুকরি (ছোট ছোড়া জাতীয় ঐতিহ্যবাহী অস্ত্র বিশেষ) নিয়ে গোর্খা পাবলিক লাইব্রেরী ঘিরে ফেলে।[১৭] এমনকি পুতলি মায়া দেবীর পিতা-মাতাও এই বিবাহের বিপক্ষে ছিলেন।কেননা সর্যূ প্রসাদ পোদ্দার ছিলেন একজন বিহারী যুবক এবং পুতলি একজন নেপালি মহিলা।তবে নেপালি সম্প্রদায়ের মধ্যে মিসেস টি ভি প্রধান এই বিয়েতে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছিলেন। তবে বিয়ের পর তাঁরা প্রচন্ডভাবে আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হন এমন

বহুদিন তারা অতিবাহিত করেছেন অভুক্ত থেকে অথচ স্বাধীনতা আন্দোলনে তারা ধারা থেকে বিচ্যুত হন নি ।[১৮].

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ১৫ ই আগস্ট ভারত স্বাধীন হওয়ার পর পুতলি মায়া দেবী চা বাগিচার মহিলাদের মধ্যে ঐক্য ও জাতীয়তাবাদ নিয়ে কাজ করতে থাকেন। একজন পূর্ণ সময়ের সমাজকর্মীরূপে কংগ্রেসের ছত্রতলে থেকে নিরলসভাবে তিনি কাজ করে গেছেন। কার্শিয়াং-এর এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ তাকে 'মাতাজি' (মা) বলে ডাকত।[১৯] মাতাজী ছিলেন প্রকৃত অর্থে দরিদ্র দুর্বল অসহায় মানুষদের জন্য আশার আলো ষ,নতুন দিশা।১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারত সরকারের কাছ থেকে তাম্রপত্র পুরস্কার পান এবং সরকার তাঁর দেশসেবার জন্য তাকে 'স্বাধীনতা যোদ্ধা' বলে ঘোষণা করেন এবং আজীবন তাঁকে স্বাধীনতা সেনানী পেনশন বা মুক্তিযুদ্ধের পেনশন প্রদান করেছেন। তিনি কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা কমিটির সহ-সভাপতি এবং কার্শিয়া মহকুমার কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হিসেবে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছেন।[২০] দীর্ঘকাল অসুস্থতার পর ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে ১লা(পয়লা) ডিসেম্বর তিনি শিলিগুড়ি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বেদীতে এই বীরাঙ্গনা গোর্খা নারীর আত্মত্যাগ ও সেবা তাকে অমর করে রেখেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু আজও উত্তরবঙ্গের এই মহান বিপ্লবী ও সমাজ সংস্কারকের যথার্থ মূল্যায়ন হয়নি।আজও তিনি ইতিহাসের পাদ প্রদীপে অস্পষ্ট ও অনালোচিত।মনে রাখা উচিত একটি রক্ষণশীল পরিবারের ও সমাজের বিরুদ্ধে গিয়ে সকল ভয় উপেক্ষা করে,পুরুষ বিপ্লবীদের সঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ, অসবর্ণ বিবাহ করা, সমাজ সংস্কারে ব্রতী হওয়া কম কৃতিত্বের কথা নয়। একজন নেপালি নারী হয়েও পুতলি মায়া দেবী যেভাবে একজন বিহারী পুরুষকে বিবাহ করে অসবর্ণ বিবাহ করে সমাজের বর্ণ কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, রক্ষণশীল সমাজের বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন, এমনকি তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন তা ছিল যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং কাজ। দেশ ও সমাজের কাজে তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন।মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁর জীবন ও কর্মকাণ্ড আগামী প্রজন্মের জন্য একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

তথ্যসূত্র :

১. আনন্দ গোপাল ঘোষ, স্বাধীনতা আন্দোলনে দার্জিলিং জেলার নেপালিদের ভূমিকা, ইতিহাস অনুসন্ধান ৩, কলকাতা,পৃষ্ঠা নম্বর ৩৪৩.

২. উত্তরবঙ্গের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবনালেখ্য(প্রথম খন্ড),ক্ষুদিরাম স্মৃতিরক্ষা কমিটি, কোচবিহার, ২০১৩, পৃষ্ঠা নম্বর-২৬৪.

৩. ড.আনন্দ গোপাল ঘোষ ও ডঃ নীলাংশু শেখর দাস,উত্তরবঙ্গের ইতিহাস ও সমাজ (প্রথম খন্ড), দিপালী পাবলিশার্স, শিলিগুড়ি, ২০০৯, পৃষ্ঠা নম্বর ৮২

৪. রাজেশ বিশ্বাস ও ডঃ মৃত্যুঞ্জয় পাল সম্পাদিত, ইতিহাস অন্বেষণ, গড়িয়া সোসাইটি ফর স্টাডিস অব মার্জিনাল পিপল, গড়িয়া,কলকাতা, ২০২৪, পৃষ্ঠা নম্বর-২১০.

৫. পুতলি মায়া দেবী (পোদ্দার), সূর্যমণি শর্মা সম্পাদিত আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা, সুমেরু পাবলিকেশান, দুর্গাবাড়ি, সিলগড়ি, ২০০৬, পৃষ্ঠা নম্বর-৭১.

৬. তদেব, পৃষ্ঠা নম্বর-৭২.

৭. তদেব, পৃষ্ঠা নম্বর-৭৩-৭৪.

৮. Alma Grace Barla, Indigenous Heroine , A Saga of Tribal Women of India, IWGIA, Copenhagen, 2015, page no-43-44.

৯. তদেব, পৃষ্ঠা নম্বর ৪৪.

১০ তদেব, পৃষ্ঠা নম্বর ৪৪-৪৫.

১১. মলয় শঙ্কর ভট্টাচার্য, মধুপর্ণী, বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা, বালুরঘাট, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা নম্বর ৯৬.

১২. শংকর সরকার,কালীকৃষ্ণ সূত্রধর,চন্দন সরকার সম্পাদিত উত্তরবঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিবৃত্ত,কুনাল বুকস,নিউ দিল্লি,২০২২,পৃষ্ঠা নম্বর ১৬.

১৩. তদেব,পৃষ্ঠা নম্বর ৭৩.

১৪. Kalikrishna Sutradhar,Historising the Nationalism and Freedom Struggle of North Bengal, Abhijit Publication, New Delhi, 2023, page no. 40-41.

১৫. পুতলি মায়া দেবী(পোদ্দার),সূর্যমণি শর্মা সম্পাদিত আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা,সুমেরু পাবলিকেশান, দুর্গাবাড়ি, সিলগড়ি, ২০০৬,পৃষ্ঠা নম্বর-৭৩.

১৬. তদেব,পৃষ্ঠা নম্বর-৭৪.

১৭. Alma Grace Barla,Indigenous Heroine , A Saga of Tribal Women of India, IWGIA, Copenhagen, 2015, page no-45.

১৮. তদেব,পৃষ্ঠা নম্বর-46.

১৯. পুতলি মায়া দেবী(পোদ্দার),সূর্যমণি শর্মা,পূর্বোক্ত গ্রন্থ,পৃষ্ঠা নম্বর-৭৫-৭৬.

২০. Alma Grace Barla, পুর্বোক্ত গ্রন্থ,পৃষ্ঠা নম্বর-46.

রমাপদ চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যের এক জীবনবাদী সাহিত্যিক

মৌসুমী পাল
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
স্বামী বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়, ত্রিপুরা

সারসংক্ষেপ : রেলশহর খড়গপুরে বড় হয়ে উঠা এক আত্মতুষ্ট ও বিনয়ী ব্যক্তিত্ব ছিলেন সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরী। তিনি জীবনের ছোটোখাটো কষ্ট বা যন্ত্রণাকে বিস্মৃত হয়ে জীবনের পাওয়া এবং আনন্দকেই মনে রেখেছেন। তাঁর সাহিত্যেও এর প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। ছোটগল্প ও উপন্যাস উভয় ক্ষেত্রেই রমাপদ চৌধুরী তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রচিত তাঁর গল্পগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যেমন - মধ্যবিত্ত জীবননির্ভর গল্প, মনস্তত্ত্বনির্ভর গল্প, যুদ্ধনির্ভর গল্প, প্রেমসম্পর্কিত গল্প, আদিবাসী জীবননির্ভর গল্প। এছাড়াও তিনি কিছু উদ্ভট গল্পও লিখেছেন।

সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্প প্রথম পছন্দ হলেও কিম্বা ছোটগল্পের মাধ্যমে সাহিত্য জীবন শুরু করলেও অথবা ছোটগল্প তাঁকে সাহিত্য জগতে পরিচিতি দিলেও উপন্যাসের জগতেও সমানভাবে বিচরণ করেছেন তিনি। তাঁর উপন্যাসের মধ্যে আছে প্রথম উপন্যাস ‘প্রথম প্রহর’, জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠা ‘লালবাঈ’, চিরায়ত সাহিত্যের সম্মানপ্রাপ্ত ‘বনপলাশীর পদাবলী’, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উপন্যাস ‘খারিজ’, আছে ঔপন্যাসিকের নিজের মতে সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস ‘বীজ’, তরুণ-তরুণীদের উপযোগী ‘এখনই’ (রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত) ও ‘পিকনিক’, যুদ্ধবিরোধী উপন্যাস ‘স্বজন’, অসহায় মানুষের অলৌকিক নির্ভরতার উৎস নির্ণয়ের উপন্যাস ‘শেষের সীমানা’ এবং আরো নানাবিধ বিষয়নির্ভর উপন্যাস। এত বেশি বিষয়বৈচিত্র্যে বাংলা সাহিত্যে খুব কম সংখ্যক ঔপন্যাসিকের লেখায় দেখা যায়।

আমার এই প্রবন্ধে ছোটগল্পকার ও ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী সম্পর্কে সর্বাঙ্গীন আলোচনা করার চেষ্টা করবো। লেখকের জন্ম, বড় হয়ে ওঠা, সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ, পুরস্কারপ্রাপ্তি – ইত্যাদি সমস্ত কিছুই আমার এই আলোচনায় স্থান পাবে।

সূচক শব্দ: ছোটগল্প, উপন্যাস, দেশ পত্রিকা, আনন্দবাজার পত্রিকা, মধ্যবিত্ত জীবন, পুরস্কারপ্রাপ্তি।

মূল প্রবন্ধ

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের লেখক হিসেবে পরিচিত রমাপদ চৌধুরীর সাহিত্যক্ষেত্রে আগমন প্রকৃতপক্ষে চল্লিশের দশকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উত্তাল সময়ের সাক্ষী তিনি।

তিনি দেখেছেন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিপর্যয়, মূল্যবোধের অবক্ষয়, স্বার্থপরতা, হিংসা, হানাহানি ইত্যাদি। রমাপদর সাহিত্যে এসব কিছুই উঠে এসেছে। ১৯২২ সালের ১৮ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরী। জন্মস্থান বি. এন. রেলওয়ের রেলশহর খড়গপুর। পিতা স্বর্গীয় তারাপ্রসন্ন চৌধুরী, মাতা স্বর্গীয়া হরিপ্রিয়া দেবীচৌধুরানী। তাঁদের আদিনিবাস ছিল বর্ধমান জেলায়। পিতা বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়েতে চিফ অ্যাকাউন্ট অফিসার ছিলেন। তারা ছয় ভাই বোন। রমাপদর স্কুল জীবন শুরু হয় খড়্গাপুরে। বি. এন. রেলওয়ের ইন্ডিয়ান হাইস্কুলে তিনি পড়াশোনা করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. পাস করেন তিনি। ২০১৮ সালের ২৯শে জুলাই এই সাহিত্যিকের মহাপ্রয়াণ ঘটে।

এক আত্মতুষ্ট ও বিনয়ী ব্যক্তিত্ব ছিলেন রমাপদ চৌধুরী। যথেষ্ট আলাপীও ছিলেন। জনপ্রিয়তা, যশ ইত্যাদি তাঁর সুন্দর মন ও সাবলীল আচরণকে বিপথে চালিত করেনি কিংবা অহংবোধে জর্জরিত করতে পারেনি। ধুতিপাঞ্জাবী পরিহিত এক সহজ সরল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি রমাপদ চৌধুরী। জীবনের অসম্পূর্ণতার চেয়ে সম্পূর্ণতায় বিশ্বাসী জীবনবাদী এই সাহিত্যিকের জীবনে দুঃখ-কষ্ট যন্ত্রণা এলেও তাঁর লেখায় ছাপ ফেলতে পারেনি। তাই তিনি জীবনের ছোটোখাটো কষ্ট বা যন্ত্রণাকে বিস্মৃত হয়ে জীবনের পাওয়া এবং আনন্দকেই মনে রেখেছেন। তাঁর সাহিত্যেও এর প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় প্রতিটি গল্প লেখার জন্য প্রথমে পাঁচ টাকা করে পেতেন। পরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল চল্লিশ টাকায়। গল্প লিখে ও পত্রিকার সম্পাদনা করে কাটিয়ে দিয়েছিলেন দীর্ঘ দশটা বছর। 'ইদানিং' এবং 'রমাপদ চৌধুরীর পত্রিকা' নামে দুটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। ১৯৫৩ সালে তিনি দেশ পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক সাগরময় ঘোষের প্রস্তাব গ্রহণ করে আনন্দবাজার পত্রিকার অফিসের কাজে যোগদান করেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত এই অফিসই ছিল তাঁর কর্মস্থল। আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রতি বুধবারে প্রকাশিত সাহিত্যজগতের সম্পাদনা করতেন তিনি। পরে 'রবিবাসরীয়' এর সম্পাদনা করেছেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

স্কুলে পড়ার সময় 'রামধনু' পত্রিকাতে কবিতা আর ছড়া পড়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে রমাপদ কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন। ১৯৪০ সালে বন্ধুদের সঙ্গে শর্ত রেখে লিখলেন তাঁর জীবনের প্রথম প্রকাশিত গল্প 'ট্র্যাজেডি'। যা 'আজকাল' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই গল্পটি পাওয়া যায়নি। একশো চল্লিশটি গল্প লিখেছেন রমাপদ। এই গল্পগুলি 'গল্পসমগ্র' নামক গ্রন্থে ছাপা হয়েছে। 'গল্পসমগ্র' এর প্রথম গল্প 'উদয়াস্ত' ১৯৪৩ সালে 'যুগান্তর সাময়িকী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। এই গল্পটি তখন খুব সাড়া ফেলেছিল। এই গল্পটি সম্পর্কে গল্পকার মতি নন্দী বলেছিলেন – "ওই বয়সে এমন একটা গল্প লিখতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করতাম।"[১] এরপর তাঁর বিভিন্ন গল্প 'পূর্বাশা', 'দ্বন্দ্ব', 'চতুরঙ্গ' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

রমাপদ চৌধুরীর অনেক গল্পই উত্তমপুরুষে লেখা। তাঁর নিজের জীবনের ছায়াপাত রয়েছে এমন ঘটনাগুলি তিনি কোন একটা কাল্পনিক নাম দিয়ে গল্প করে তুলেছেন। আবার একেবারে অন্যের দেখা কোন ঘটনা উত্তমপুরুষে লিখেছেন। গল্পরচনার ক্ষেত্রে রমাপদ তাঁর গল্পগুলির কোন পর্বভাগ করতে চাননি। যদিও তিনি জানেন যে তাঁর প্রথম জীবনের লেখা গল্পগুলি থেকে পরবর্তী জীবনে লেখা গল্পগুলির বিষয় এবং আঙ্গিক সম্পূর্ণ আলাদা।

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রচিত রমাপদ চৌধুরীর গল্পগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যেমন - মধ্যবিত্ত জীবননির্ভর গল্পের মধ্যে রয়েছে 'সহযোগ', 'শিশুমেধ', 'তিনতারা', 'ড্রেসিং টেবিল', 'হিসেবী', 'টাকার দাম', 'আমি একটি সাধারণ মেয়ে', 'আজকের গল্প', 'ফ্রীজ' প্রভৃতি গল্পগুলি। মনস্তত্ত্বনির্ভর গল্পে আছে 'ঈর্ষা', 'জ্বালাহর', 'দুধের স্বাদ', 'নতুন চশমা', 'নোনাজল', 'ডাইনিং টেবিল' এর মত গল্পগুলি। 'এক খিলি মিঠে পান', 'রক্তবীজ', 'করুণকন্যা', 'অঙ্গপালি' প্রভৃতি রমাপদর যুদ্ধনির্ভর গল্প। প্রেমসম্পর্কিত গল্পের মধ্যে রয়েছে 'তালাক', 'অভিসার রঙ্গনটী', বুড়ী ডিহিংয়ের সাঁকো', 'বাসুকি বসুন্ধরা', 'ইমলী' প্রভৃতি গল্পগুলি। আদিবাসী জীবননির্ভর গল্পের মধ্যে আছে 'দরবারী', 'জলরঙ', 'রেবেকা সোরেনের কবর', 'লাটুয়া ওঝার কাহিনী', 'মন্ত্র'র মতো গল্পগুলি। 'মাধবিকা', 'একটি কিংবদন্তী', 'প্রদত্তার নগ্নদেহ' রমাপদর ইতিহাসাশ্রিত গল্প। এছাড়াও তিনি কিছু উদ্ভট গল্পও লিখেছেন। যেমন – 'বড়বাজার', 'চাবি' 'আপট্রেন' প্রভৃতি গল্প।

'দেশ' পত্রিকায় বিনা আমন্ত্রণে কোনো গল্প পাঠাননি রমাপদ। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন – "ঈষৎ খ্যাতির বোধ হয় কিছুটা দম্ভ থাকে, বিখ্যাত হয়ে গেলে মানুষ বিনয়ী হয়।"[২] 'দেশ' পত্রিকার সাধারণ সংখ্যায় রমাপদর গল্প ছাপা হয়েছে মাত্র চার-পাঁচটি। 'শারদীয়া দেশ'এ অনেকগুলি। 'পূর্বাশা' ও 'চতুরঙ্গ'তে প্রকাশিত কিছু গল্প পড়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন রমাপদর সঙ্গে দেখা করার জন্য। সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও আতাউর রহমানের বদান্যতায় হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রীটের বাড়ির আড্ডাতে যেতে শুরু করলেন রমাপদ চৌধুরী। 'দেশ' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক সাগরময় ঘোষ ছিলেন সেখানকার নিত্যযাত্রী। প্রেমেন্দ্র মিত্রই পরিচয় করিয়ে দিলেন রমাপদকে সাগরময় ঘোষের সঙ্গে। সাগরময় ঘোষের অনুরোধে 'দেশ' পত্রিকায় গল্প লিখতে শুরু করেন রমাপদ। এরপর বর্মন স্ট্রীটের 'দেশ' পত্রিকার অফিস ঘরের আড্ডায় এসে জুটলেন তিনি। এখানে তিনি পেয়েছেন অনেক সাহিত্যিক সতীর্থদের। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সন্তোষকুমার ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সুবোধ ঘোষ, বিমল কর, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেককে।

মুম্বাই সিনেমা জগতের বিখ্যাত শচীন ভৌমিক কয়েকজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে বের করলেন মাসিকপত্র 'সূচীপত্র'। রমাপদর বিখ্যাত গল্প 'দরবারী' 'সূচীপত্র'তে প্রকাশিত

হয়। একই নামে রমাপদর গল্পগ্রন্থও বের হয় একটি। গল্পগ্রন্থটি পড়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রমাপদকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। তিনি তাঁর 'বিপাশা' উপন্যাসটি রমাপদকে উৎসর্গ করেছিলেন পুরস্কার হিসেবে। রমাপদ চৌধুরীর অনেক গল্পই প্রকাশিত হবার আগে রেডিওতে পড়া হয়েছিল। 'বিবিকরজ' এর মধ্যে একটি। এই গল্পটিকে কেন্দ্র করে পরিচালক তপন সিংহ 'কালামাটি' নামে ছবি করেছিলেন। 'ঠগ', 'খুনীবউ', 'দুধের স্বাদ', 'রাঙাপিসীমা', 'মনবন্দী', 'ঋণ', 'ঝিনুকের কৌটো', 'দু'বার বাঁচা' রেডিওতে পড়া গল্প। 'খুনীবউ' গল্প অবলম্বনে সলিল চৌধুরী হিন্দীতে দূরদর্শনের জন্য ছবি করেন। 'দুবার বাঁচা' রেডিওতে নাটক হয়। সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় বের হয়েছিল 'আজকের গল্প' 'এক পাটি জুতো' নামে। স্টেটসম্যান পত্রিকায় 'Today's Story' নামে প্রকাশিত হয়েছিল গল্পটি। শারদীয়া 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত লেখকের গল্পগুলোর মধ্যে অন্যতম 'রুমাবাঈ', 'যুবতীধরম', 'রায়', 'মানুষ অমানুষের গল্প', 'শুধু কেরানী', 'একটি কর্নিক', 'মন্ত্র', 'নির্জনতা নেই' ইত্যাদি গল্প। শারদীয়া ও বার্ষিক দোল সংখ্যা আনন্দবাজারে প্রকাশিত হয়েছে 'বাবুই', 'লাটুয়া ওঝার কাহিনী', 'রেবেকা সোরেনের কবর', 'ঝুমরা বিবির মেলা', 'নারীরত্ন', 'হিসেবী', 'ঈর্ষা', 'লোভ', 'স্ত্রৈণ', 'এক সের বেগুন', 'একটি মানিব্যাগ ও একফালি হাসি'। শারদীয়া 'জনসেবক'এ প্রকাশিত হয় 'মদিরেক্ষণা' ও 'বউরানী'।

রমাপদর বহু গল্পের অনুবাদ করেছিলেন সরোজ আচার্য, জগন্নাথ চক্রবর্তী এবং অন্নদাশঙ্কর রায়ের পত্নী লীলা রায়। 'ভারতবর্ষ' গল্পটি সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিন্টন বি সিলি গল্পটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন এবং আমেরিকা থেকে প্রকাশিত লিটারারি অলিম্পিয়াস সংকলনে এটি ছাপা হয়। 'জলসা' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল 'নতুন চশমা', 'আমি, আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া', 'জনৈকা নায়িকার মৃত্যু' গল্প তিনটি। শারদীয়া 'বসুমতী'তে প্রকাশিত হয়েছিল ভিন্ন আঙ্গিকের গল্প 'একটি হাসপাতালের জন্ম ও মৃত্যু'। 'চতুষ্কোণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'পাঠক' গল্পটি। ১৩৭৩ সালের পর গল্পকারের প্রায় সব গল্পই শারদীয়া বার্ষিক 'আনন্দবাজার' ও শারদীয়া 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কিছু কিছু ছোটগল্প প্রকাশিত হয় 'পত্রানু', 'দক্ষিণীবার্তা' ইত্যাদি পত্রিকায়। শারদীয়া 'গণশক্তি'তে প্রকাশিত হয় 'মেকি' গল্পটি।

সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্প প্রথম পছন্দ হলেও কিম্বা ছোটগল্পের মাধ্যমে সাহিত্য জীবন শুরু করলেও অথবা ছোটগল্প তাঁকে সাহিত্য জগতে পরিচিতি দিলেও উপন্যাসের জগতেও সমানভাবে বিচরণ করেছেন তিনি। স্কুলে পড়াকালীন ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে রচনা করেছিলেন 'চোরাবালি' উপন্যাস। যে উপন্যাসটিকে নিজেই পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। এই প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন – "রাগ, ভয়, লজ্জা – কোন্ কারণে জানি না, হঠাৎ একদিন দুপুরবেলায় সকলে যখন ঘুমোচ্ছে, রান্নাঘরের উনুনে খাতাটা পুরে দিয়ে খানিকটা কেরোসিন তেল ঢেলে দেশলাই জ্বেলে দিলাম।"[৩]

রমাপদর প্রথম উপন্যাস ‘প্রথম প্রহর’। এর রচনাকাল ১৩৫৪ সাল আর শেষ উপন্যাস ‘পশ্চাদপট’ রচনা করেছেন ২০০৪ সালে। রমাপদর উনপঞ্চাশটি উপন্যাস বাঙালি পাঠকের সামনে মধ্যবিত্ত জীবনের বিভিন্ন দিককে উন্মোচিত করেছে। রমাপদ চৌধুরীর একমাত্র ইতিহাসাশ্রিত এবং পাঠক দরবারে বিপুল সাড়া জাগানো উপন্যাস ‘লালবাঈ’ (১৩৬৩)। এই সম্পর্কে লেখক নিজেই বলেছেন – ‘‘লালবাঈ’ এর মতো জনপ্রিয়তা আমার আর কোন উপন্যাসই পায়নি। আমি রাতারাতি বৃহত্তর পাঠক সমাজের কাছে পরিচিত হয়ে গেলাম।’’[৪] তাঁর উপন্যাসের মধ্যে আছে প্রথম উপন্যাস ‘প্রথম প্রহর’, জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠা ‘লালবাঈ’, চিরায়ত সাহিত্যের সম্মানপ্রাপ্ত ‘বনপলাশীর পদাবলী’, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উপন্যাস ‘খারিজ’, আছে ঔপন্যাসিকের নিজের মতে সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস ‘বীজ’, তরুণ-তরুণীদের উপযোগী ‘এখনই’ (রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত) ও ‘পিকনিক’, যুদ্ধবিরোধী উপন্যাস ‘স্বজন’, অসহায় মানুষের অলৌকিক নির্ভরতার উৎস নির্ণয়ের উপন্যাস ‘শেষের সীমানা’ এবং আরো নানাবিধ বিষয়নির্ভর উপন্যাস। এত বেশি বিষয়বৈচিত্র্য বাংলা সাহিত্যে খুব কম সংখ্যক ঔপন্যাসিকের লেখায় দেখা যায়। সমালোচকের মতে, ‘‘ব্যক্তিগত বোধ থেকে নৈর্ব্যক্তিক বোধ - এই উত্তরণ সব সফল শিল্পীর ছাড়পত্র। রমাপদ চৌধুরী এই অনুজ্ঞা কোনদিন ভোলেননি।’’[৫]

রমাপদ চৌধুরীর ‘আশ্রয়’, ‘বীজ’, ‘দাগ’, ‘হৃদয়’, ‘রাজস্ব’, ‘এই পৃথিবী পান্থনিবাস’ প্রভৃতি উপন্যাসে অর্থনীতি পরিস্ফুট হয়েছে। প্রেম পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে ‘অ্যালবামে কয়েকটি ছবি’, ‘আরো একজন’, ‘এখনই’, ‘স্বজন’ প্রভৃতি উপন্যাসে। বাড়িওয়ালা-ভাড়াটের সম্পর্ক নিয়ে লেখা ‘খারিজ’, ‘আশ্রয়’, ‘বাড়ি বদলে যায়’ প্রভৃতি উপন্যাস। লেখকের বাস্তবদৃষ্টির পরিচয় বহন করে প্রজন্মগত ব্যবধান পরিলক্ষিত হয় ‘হৃদয়’, ‘ছাদ’, ‘এখনই’, ‘পিকনিক, ‘ডুবসাঁতার’, ‘বীজ’, ‘চড়াই’, ‘বনপলাশীর পদাবলী’, ‘রাজস্ব’, ‘এই পৃথিবী পান্থনিবাস’ প্রভৃতি উপন্যাসে। মানবিক সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় ‘স্বজন’, ‘এই পৃথিবী পান্থনিবাস’, ‘বাহিরি’, ‘চড়াই’ প্রভৃতি উপন্যাসে। আর ‘যে যেখানে দাঁড়িয়ে’, ‘পরাজিত সম্রাট’, ‘আরো একজন’ উপন্যাসগুলিতে অবৈধ সম্পর্কের ছায়াপাত পরিলক্ষিত হয়।

রমাপদর উপন্যাস মূলত বাঙালী মধ্যবিত্তজীবনের বিভিন্ন দিককে উন্মোচিত করেছে। সমালোচকের ভাষায় - ‘‘সংখ্যাতত্ত্বের হিসেবে বিপুল না হলেও তাঁর প্রতিটি লেখা হয়ে উঠেছে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। সচেতন শিল্পী মনের অভিজ্ঞান।’’[৬] ঔপন্যাসিক রমাপদ তাঁর উপন্যাসের ক্ষেত্রে একটা নিজস্ব ফর্ম তৈরি করেছিলেন। এই ফর্ম তিনি মধ্যবিত্তদের নিয়ে লেখা উপন্যাসগুলিতে ব্যবহার করেছেন। তিনি নিজেই এর নাম দিয়েছেন Mixed Weves বা মিশ্র তরঙ্গ। ‘খারিজ’ উপন্যাস এবং এর পরবর্তী সব উপন্যাসে তিনি এই রীতি অনুসরণ করে এসেছেন। দীর্ঘ লেখক জীবনে রমাপদ কখনোই অতিকথনে বিশ্বাসী নন। তাঁর উপন্যাসগুলোর মধ্যে পরিচয় রয়েছে তাঁর মেধার, মনোযোগের, স্থির প্রত্যয়ের এবং সর্বোপরি পরিমিত বাগভঙ্গীর। লেখকের

প্রথম যুগের উপন্যাসগুলিতে এই বৈশিষ্ট্য আভাসিত এবং পরবর্তী উপন্যাস গুলিতে তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট এবং শাণিত হয়ে উঠেছে।

ত্রিবেণী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে রমাপদ চৌধুরীর স্মৃতিকথামূলক রচনা 'লেখালেখি'। এতে রয়েছে রমাপদর লেখক হয়ে ওঠার গল্প। ১৯৪০ সালের 'ট্র্যাজেডি' গল্পটি রচনার পূর্বে লেখক হয়ে ওঠার প্রস্তুতি পর্বটি এখানে পাওয়া যায়। সে সময় তিনি লিখেছিলেন 'চোরাবালি' নামক একটি উপন্যাস। কিন্তু আত্মীয়-স্বজন এবং অন্যান্যদের কবি, লেখক ইত্যাদি পরিহাসসূচক নামকরণে তিনি সেটি পুড়িয়ে ফেলেন। এর স্বীকারোক্তি 'লেখালেখি'তে রয়েছে। রমাপদ লিখেছিলেন 'আমরা সবাই একসঙ্গে' ও 'রূপায়ণী' নামে দু'খানি প্রবন্ধের বই। 'পত্রনবীশের শুভদৃষ্টি', 'রঙমিছিল', 'চোখে চোখে', 'মনময়ূরী' নামে কিছু রম্য রচনা, 'ভূতগুলি সব গেল কোথায়' নামে একটি ছোটদের ছড়ার বই, যেগুলি যত্নের অভাবে এখন আর পাওয়া যায় না। শেষ বয়সে তিনি লিখতে শুরু করেছিলেন একটি আত্মজীবনীমূলক লেখা 'হারানো খাতা'।

সাহিত্যে অবদানের জন্য রমাপদ চৌধুরীর পুরস্কার প্রাপ্তির সংখ্যাও নেহাত কম নয়। ১৯৬৩ সালে তিনি পান আনন্দ পুরস্কার, ১৯৭১ সালে পান রবীন্দ্র পুরস্কার, ১৯৮৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত শরৎচন্দ্র স্বর্ণপদক ও পুরস্কার, ১৯৮৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সাহিত্য সম্মান জগত্তারিণী স্বর্ণপদক, ১৯৮৮ সালে 'বাড়ি বদলে যায়' উপন্যাসটির জন্য তিনি সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত হন। ১৯৯৮ সালে তিনি পান সাম্মানিক ডি. লিট। ২০১১ সালে নিউ দিল্লীর 'দি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট তাকে কবিগুরুর সার্ধশততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে 'রবীন্দ্রনাথ টেগোর মেমোরিয়াল ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ' প্রদান করে। পুরস্কারের অর্থমূল্য ছিল এক কোটি টাকা। এই পুরস্কার প্রাপ্তিতে তিনি শুধু পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতবর্ষের নয়, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের মর্যাদায় আসীন হয়েছেন।

তথ্যসূত্র :

১)	চৌধুরী, রমাপদ, 'গল্পসমগ্র', দ্রষ্টব্য: প্রসঙ্গকথা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২য় নতুন সংস্করণ, অক্টোবর, ১৯৯৯, পৃঃ ৮৮২।
২)	তদেব, পৃঃ ৮৮৩।
৩)	তদেব, 'লেখালেখি', ত্রিবেণী প্রকাশনী, পৃঃ ৭৮।
৪)	তদেব, 'উপন্যাস সমগ্র'-৫, আনন্দ পাবলিশার্স, কলি-৯, ১ম সংস্করণ, জুন, ১৯৯৪, পৃঃ ৫১২।
৫)	দত্ত, বিজয়কুমার, 'আর্ত হৃদয়ের রূপকার:বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী', দ্রষ্টব্য: 'প্রমা', সুরজিৎ ঘোষ (সম্পাদক), পৃঃ ৯৩।
৬)	চৌধুরী, শম্পা, 'ইতিহাস সমকাল ও রমাপদ চৌধুরী', দ্রষ্টব্য: 'দেশ', অভীক সরকার, ১৭ই জুন, ২০০৫, পৃঃ ৯৫।

সহায়ক গ্রন্থ :

১) চৌধুরী, রমাপদ, ‘গল্পসমগ্র’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলি-৯, ২য় নতুন সংস্করণ, অক্টোবর, ১৯৯৯।

২) তদেব, ‘উপন্যাস সমগ্র’-৫, আনন্দ পাবলিশার্স, কলি-৯, ১ম সংস্করণ, জুন, ১৯৯৪,

৩) ঘোষ, সুরজিৎ, (সম্পাদক), ‘প্রমা’, ৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ১৯৮৭।

৪) চৌধুরী, রমাপদ, ‘লেখালেখি’, ত্রিবেণী প্রকাশনী।

৫) সরকার, অভীক, ‘দেশ’, ১৭ই জুন, ২০০৫।

৬) চৌধুরী, শম্পা, ‘রমাপদ চৌধুরীর কথাশিল্প’, এবং মুশায়েরা, ১ম প্রকাশ, ২০১০।

সমাজ পরিবর্তনে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী : একটি পর্যালোচনা

সোহরাব মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
প্রভাত কুমার কলেজ, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর

সারসংক্ষেপ : উনিশ শতকের অন্যতম সামাজিক, নারীপ্রগতি ও শিক্ষাবিষয়ক সংস্কারক ছিলেন দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী। দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী শুধুমাত্র সামাজিক সংস্কার ও নারীপ্রগতির কথা বলেননি বস্তুতঃ তিনি তা বাস্তবে করে দেখিয়েছিলেন। মাত্র ৫৪ বছরের জীবনে তিনি নারীজাতির উন্নতির জন্য রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন, বিশেষ করে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যেভাবে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন, তা তাকে যুগপুরুষের আসনে বসিয়েছে। দ্বারকানাথ চাইলে সারাজীবন বিলাসিতার সঙ্গে জীবন কাটাতে পারতেন কিন্তু যুগের প্রয়োজনে তা তিনি করেননি। 'অবলাবান্ধব'-এ দ্বারকানাথ যেভাবে নারীজাতির শিক্ষা ও উন্নতির জন্য মত প্রকাশ করেছিলেন তা ছিলো যুগোপযোগী। প্রকৃতপক্ষে দ্বারকানাথ তাঁর পত্রিকা 'অবলাবান্ধব' - এর জন্যই বিখ্যাত হয়ে আছেন। দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী কোনসময় নিজেকে থামিয়ে রাখেননি। হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় এই সময় বন্ধ হয়ে গেলে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী ভারতসভার সদস্য হন।

সূচক শব্দ : বঙ্গসন্তান, ঔপনিবেশিক, রক্ষণশীল, পুরুষতান্ত্রিক, কুলীন, যুগপুরুষ, প্রগতিশীল, ব্রাহ্ম।

উনিশ শতকের বাংলায় ঘটে যাওয়া নবজাগরণের যে সমস্ত কাণ্ডারীরা ছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম বঙ্গসন্তান ছিলেন দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী। সমকালীন রক্ষণশীল ও পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লেখা সম্ভব হলেও বাস্তবে তা রূপ দেওয়া ছিল খুবই অসম্ভব ব্যাপার। সেই অসম্ভবকে সম্ভব করতে যারা অগ্রগন্য ভূমিকা পালন করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী। উনবিংশ শতাব্দীতে সারা দেশের ন্যায় বাংলাতেও ঔপনিবেশিক শাসনকালে দুটি ধারার মধ্য দিয়ে কিছু মানুষ সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। প্রথমত,ঔপনিবেশিক সরকার ও তাদের দোষর অত্যাচারী জমিদার ও মহাজনদের হাত থেকে বাঙালীদের মুক্তি ঘটাতে। দ্বিতীয়ত, সমাজের রক্ষণশীল ও পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে অত্যাচারিত শ্রেণীর পাশে দাঁড়িয়ে তাদের মুক্তি ঘটানো।আর কিছু মানুষ দ্বিতীয়টির জন্য আজীবন সংগ্রামের পাশাপাশি প্রথমটিরও গুরুত্ব উপধাবন করেছিলেন,যাদের মধ্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী।

১৮৪৪ সালের ২০ এপ্রিল অধুনা পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরের মাগুরখন্ডের বাঘিরার সুপ্রসিদ্ধ কুলীন বংশে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী জন্মগ্রহণ করেণ।[১] তৎকালীন সময়ে কুলমর্যাদাতে কুলীনগন ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। ১৮৬২ সাল নাগাদ এক হতভাগিনী বিপথগামিনী কুলীন কন্যাকে তার আত্মীয়স্বজন কর্তৃক বিষপ্রয়োগে হত্যার ঘটনা শুনে কুলীনশ্রেষ্ঠ হয়েও তিনি বহুবিবাহের মত গর্হিত কাজের বিরোধিতা করেন।[২] দ্বারকানাথ চাইলে সারাজীবন বিলাসিতার সঙ্গে জীবন কাটাতে পারতেন কিন্তু যুগের প্রয়োজনে তা করেণ নি,আর এজন্যই তিনি যুগপুরুষ। দ্বারকানাথ নিশ্চিতভাবে জানতেন যে,তিনি বহুবিবাহের বিরুদ্ধাচারণ করলে তার পরিবারের উপরও এর প্রভাব পড়বে,তা সত্ত্বেও তিনি একাজ করেণ। দ্বারকানাথের প্রতিজ্ঞারক্ষার ফলে তাঁর দুই ভগিনীকে চিরকুমারী থাকতে হয়েছিল।[৩]মানুষ উত্তরাধিকারসূত্রেও কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। দ্বারকানাথ তাঁর স্বহৃদয়তা ও মানবতাবাদী বৈশিষ্ট্য পেয়েছিলেন তাঁর বাবা ও মায়ের থেকে। তাঁর পিতা কৃষ্ণপ্রাণ গঙ্গোপাধ্যায় পরদুঃখকাতরতার জন্য বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তবে তাঁর মাতা উদয়তারা দেবীর তেজস্বিনী,মনস্বিনী,ধর্মপরায়ণ গুনাবলীই তাঁর চরিত্র গঠনে সহায়ক হয়েছিল। একবার তীর্থ দর্শনের উদ্দেশ্যে জগন্নাথ ক্ষেত্রে যাবার জন্য ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। কিন্তু আর্থিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তিনি যানবাহনে না গিয়ে পায়ে হেঁটে তীর্থযাত্রা সমাপ্ত করেণ। মায়ের আত্মমর্যাদাজ্ঞানই দ্বারকানাথ পেয়েছিলেন।[৪]

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর বাড়ির প্রত্যেকে পুরুষানুক্রমে ৪০/৫০ টি করে বিয়ে করত,আসলে এটিই ছিল কুলীন পরিবারের যেন বংশমর্যাদা। দ্বারকানাথ সাত বছর পর্যন্ত গ্রাম্য পাঠশালায় পড়াশুনা শেষ করে পার্শ্ববর্তী গ্রামের কালীপাড়া এন্ট্রাস স্কুলে ভর্তী হন। এই স্কুলের মনীষী অক্ষয়কুমার দত্তের ‘ধর্মনীতি’(১৮৫৬) ও ‘বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার’(১৮৫২-৫৩) এর উপর পাড়ানো দ্বারকানাথের উপর প্রভাব ফেলে। উভয় গ্রন্থেই অবৈধ বিবাহের ফল; অল্প-বয়স্ক,বৃদ্ধ,উতকট-রোগগ্রস্থ ও বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদিগের বিবাহের অকর্ত্তব্যতা;অসবর্ণ বিবাহের বৈধতা প্রভৃতি সমাজ-সংস্কারমূলক নানা বিষয়ের অবতারণা আছে। এইসব বিষয়ের উপর অধ্যায়ন করে বহুবিবাহ দ্বারকানাথের মনে ঘোরতর দুষ্কর্ম বলে মনে হয়েছিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে ,’আমি এক বই দুই বিবাহ করিব না’। যদিও প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি কাদম্বিনী বসুকে বিবাহ করেছিলেন। প্রগতিশীল ব্রাহ্ম-দলে যোগদানের বহু পূর্বেই ১৮৬২ বা ১৮৬৩ সালে হিন্দুমতে দ্বারকানাথের প্রথম বিবাহ হয়েছিল।[৫] ১৮৭০ সালে তিনি যখন কলকাতায় আসেন তখন বিপত্নীক। স্ত্রীর মৃত্যুর বহুদিন পরে তিনি ১৮৮৩ সালে কাদম্বিনী গাঙ্গুলীকে দ্বিতীয় বিয়ে করেণ। তার এই নীতির মান্যতা দিতে তিনি পরিবার ত্যাগ করতেও দ্বিধা করেন নি।

নারীশিক্ষা ও নারী স্বাধীনতার উদ্দেশ্যেই দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী ১৮৬৯ সালে ঢাকায় ‘অবলাবান্ধব’ নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করতে শুরু করেন। অবলাবান্ধবে

দ্বারকানাথ যেভাবে নারীজাতির শিক্ষা ও উন্নতির জন্য মতপ্রকাশ করেছিলেন তা ছিল যুগোপযোগী। প্রকৃতপক্ষে দ্বারকানাথ তাঁর পত্রিকা 'অবলাবান্ধব'-এর জন্যই বিখাত হয়ে আছেন। এই জন্য ঊনিশ শতকের নারীকুলের কাছে 'অবলাবান্ধব দ্বারকানাথ' ভরসাযোগ্য নাম হয়ে উঠেছিল। তেরো কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে তাঁর বাসস্থানটি 'অবলা ব্যারাক' নামে নিন্দিত ও নন্দিত দুই-ই ছিল ।[৬] রক্ষনশীল সমাজ ও সামাজিক উৎপীড়নের ভয় তাঁকে কোনও দিন বিচলিত করেনি।বরং সামাজিক প্রতিকূল স্রোতের বিরুদ্ধে বুঝবার অসম্ভব ক্ষমতা ছিল তার।গোঁড়ামির বিরুদ্ধে ও প্রগতির পক্ষে লিখতে তিনি সর্বদাই ছিলন আপোষহীন। তাই দ্বারকানাথের পত্রিকাটির স্থায়িত্ব খুব বেশী দিনের না হলেও তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন 'অবলাবান্ধব' নামের আড়ালেই,কারণ এমন সার্থকনামা মানুষ,নামদরদী বাঙালীর জীবনে খুব কমই এসেছেন। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরকে অবলাকুলের পরিত্রাতা হিসাবে আমার যেভাবে মনে রেখেছি, তার পাশেই দ্বারকানাথকেও রাখতে হবে।

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী এই সময় সুপ্রসিদ্ধ ম্যাজিস্ট্রেট ও ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের অগ্রগন্য সভ্য অভয়াকুমার দাস মহাশয়ের পুত্র প্রাণকুমার দাসের মত কিছু যুবকের সহযোগিতায় পত্রিকার প্রচার কলকাতাতেও করতে থাকেন। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন,প্রাণকুমার দাস একবার কলিকাতাতে আসিয়া আমাদের কয়েকজনকে "অবলাবান্ধবে" লেখার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া গেলেন। ১৮৭০ সালে দ্বারকানাথ অবলাবান্ধবকে কলকাতায় স্থানান্তর করেন[৭] ও ক্রমে ক্রমে তাকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেই এক 'অবলাবান্ধব নারীহিতৈষী দল' গড়ে ওঠে। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে বিভিন্ন আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে প্রধানতঃ দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর উদ্যোগেই নারীগনের শিক্ষা ও সামাজিক সংস্কারের জন্য এক বিরাট সচেতনতা ও আন্দোলনের পরিবেশ গড়ে ওঠে। স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষে প্রধান নেতা ছিলেন দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী-একথা স্বীকার করেছেন আর এক ব্রাহ্মনেতা তথা সংস্কারক শিবনাথ শাস্ত্রী।[৮]

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী অন্যতম জনপ্রিয় ও বাগ্মী ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে বারবার নিয়মভঙ্গের অভিযোগ তুলতে কোন দ্বিধাবোধ করেণ নি। পর্দার বাইরে মেয়েদের বসা ও নারীশিক্ষা নিয়ে প্রচন্ড জেদী ও নিয়মানুবর্তী দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর সঙ্গে কেশবচন্দ্র সেনের চরম মতবিরোধ হয়।[৯] শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর আত্মচরিতে বলেছেন যে, ১৮৭২ সালে আমার বন্ধু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী,দুর্গামোহন দাস,রজনীনাথ রায়,অন্নদাচরণ খাস্তগীর প্রমুখ কতকগুলো ব্রাহ্ম কেশববাবুকে বলিলেন যে,তাঁহারা তাঁহাদের পরিবারস্থ মহিলাদিগকে লইয়া মন্দিরে পর্দার বাহিরে বসিতে চান।কেবল একথা যে বলিলেন তাহা নহে,একটা কিছু স্থির হইতে না হইতে একদিন অন্নদাচরন খাস্তগীর ও দুর্গামোহন দাস স্বীয় স্বীয় পত্নী ও কন্যগনসহ পর্দার বাহিরে সাধারণ উপাসকদের মধ্যে গিয়া বসিলেন। কেশবচন্দ্র ও তাঁর সঙ্গীরা এটা মান্যতা না দেওয়ায় তাঁরা মন্দিরে যাওয়া ত্যাগ করলেন।

শেষপর্যন্ত কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মমন্দিরের এক কোনে পর্দার বাইরে অগ্রসর দলের মহিলাদের বসার ব্যবস্থা করে দিলেন।[১০]

বিলেত থেকে মিস আনেট আক্রয়েড ১৮৭২ সালে কলকাতায় আসেন ও নারীদের শিক্ষাক্ষেত্রে সমান সুযোগ দেওয়ার জন্য ১৮৭৩-এর সেপ্টেম্বরে হিন্দুমহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেণ। প্রধানতঃ মনোমোহন ঘোষ,দুর্গামোহন ঘোষ ও তৎপত্নী ব্রহ্মময়ী প্রভৃতির সহায়তা ও আনুকূল্যে ২২ নং বেনিয়াপুকুর লেনে একটি বাড়ি ভাড়া করে মাত্র পাঁচ জন ছাত্রী নিয়ে এই বোর্ডিং স্কুলের সূচনা হয়। উদার ব্রাহ্ম নেতা দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী ছিলেন এই হিন্দু মহিলাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা ও তিনি এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। স্কুলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা, যানবাহনাদির বন্দোবস্ত করা, পাঠাদির ব্যবস্থা করা, ছাত্রীনিবাসে ছাত্রীগনের আহারাদির ব্যবস্থা করা, তাহাদের পিড়াদির সময়ে চিকিৎসাদির বন্দোবস্ত করা, প্রভৃতি সমুদয় কার্যের ভার একা দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী করতে কখনও দ্বিধাগ্রস্থ হন নি।[১১] কিন্তু এই শিক্ষায়তনটিও বেশিদিন তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারে নি ।

১৮৭৫ সালের এপ্রিল মাসে কুমারী আক্রয়েডের সঙ্গে ঐতিহাসিক হেনরি বেভারিজের বিবাহের অল্প দিন পরেই- মার্চ মাসে হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়টি উঠে যায়। কিন্তু দ্বারকানাথ দমার পাত্র ছিলেন না। তিনি অল্পদিনের মধ্যেই অর্থাৎ ১লা জুন ওল্ড বালিগঞ্জ রোডে পূর্বেকার আদর্শে 'বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়' নামে আর একটি বিদ্যালয় তৈরী করলেন। একাজে তাঁকে সর্বোতভাবে সাহায্য করেছিলেন আনন্দমোহন বসু ও দুর্গামোহন দাস। দ্বারকানাথ ছিলেন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ;শিক্ষাকতা থেকে আরম্ভ করে কুলীর কাজ পর্যন্ত তিনি করেছেন। এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা এতোটাই উন্নত ছিল যে,এখান থেকেই শিক্ষিতা ব্রাহ্মগৃহিনীদের অনেকেই শিক্ষালাভ করেছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের ভগিনী স্বর্ণপ্রভা বসু(আনন্দমোহনের পত্নী),দুর্গামোহন দাসের দুই কন্যা-লেডী অবলা বসু(জগদীশচন্দ্রের পত্নী) ও সরলা রায় (ডঃ প্রসন্নকুমার রায়ের পত্নী),গিরিজাকুমারী সেন,কাদম্বিনী বসু ও শিবনাথ শাস্ত্রীর কন্যা হেমলতা দেবীর নাম করা যায়। এখানকার শিক্ষাপদ্ধতি সরকারি শিক্ষা-বিভাগের প্রশংসা করেছিল-" In every sense the most advanced school in Bengal."[১২]এইজন্য তাকে 'বঙ্গমহিলাগণের উচ্চশিক্ষার পথপ্রদর্শক' বললে অন্যায় হবে না ও অচিরেই স্কুলটি বন্ধ হয়ে গেলে অদম্য ব্রজকিশোরের আন্তরিক চেষ্টায় ১৮৭৬ –এর এপ্রিলে গড়ে ওঠে 'বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়'। কিন্তু এই শিক্ষায়তনটিও বেশিদিন তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারেনি ও ১৮৭৮- এর ১লা আগষ্ট বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় বিখ্যাত বেথুন স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী। দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী কোন সময় নিজেকে থামিয়ে রাখেন নি।হিন্দুমহিলা বিদ্যালয় এই সময় বন্ধ হয়ে গেলে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী ভারতসভার সদস্য হন।[১৩]এই সময় মধ্যবিত্ত

লোকের রাজনীতিচর্চার জন্য গড়ে তোলা হয় ১৮৭৬ সালে ভারতসভা।তিনি শুধুমাত্র ভারতসভার সদস্য হন নি,তিনি জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রজ ভারতসভার সহকারী সম্পাদক ছিলেন।সৌখিন রাজনীতিক হওয়াটা তাঁর স্বভাবে ছিল না।অনেক সময় বিপদ মাথায় করে নিয়ে তিনি ভারতসভার কাজে বিদেশযাত্রা করেছেন। আসামের চা বাগানের কুলীদের দুর্দশা অনুসন্ধান করতে তিনি আসামে যান।প্রাকৃতিক দুর্যোগ,স্বার্থপর মানুষের প্রতিকূলতা ও পুলিশের অনুসরণ উপেক্ষা করে তিনি সংবাদ সংগ্রহ করতেন,আর তা নিয়মিত 'সঞ্জীবনী' পত্রিকাতে পাঠাতেন।

আসামের ধুবড়ি, গোয়ালপাড়া, ডিব্রুগড় প্রভৃতি জায়গায় দ্বারকানাথ জীবনের ঝুকি নিয়ে সঞ্জীবনীর এজেন্ট রূপে ও ভারতসভার সহকারী সম্পাদকরূপে আসামের কুলী আইনের কাজ বিষয়ে ও অপরাপর কোনো কোনো বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য সেখানে যান। ঐ সময় ইংরেজ কর্মচারীরা কুলী আইনের বিষয়ে খুবই সজাগ ছিলেন। তাই যখন দ্বারকানাথ ও শিবনাথ শাস্ত্রীকে একসঙ্গে দেখে সরকারী কর্মচারীরা সেখানকার উকিল ও অপরাপর ভদ্রলোককে প্রশ্ন করেন যে,দ্বারকানাথের সঙ্গে ইনি কে ? ইনিও কি কুলী আইন প্রভৃতি রাজনীতিমূলক বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য এসেছেন। অর্থাৎ কুলী আইনের অপপ্রয়োগের বিষয়ে প্রতিবাদী হিসাবে দ্বারকানাথ ব্রিটিশের কাছে পরিচিত মুখ ছিলেন।দ্বারকানাথ কোনদিন থেমে থাকেন নি,অবলাবান্ধব লুপ্ত হওয়ার পর দ্বারকানাথ বন্ধুদের সহযোগীতায় 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে সংবাদপত্র জগতে সঞ্জীবনী সুপ্রসিদ্ধ হয়েছিল। আসলে জনমতগঠনে সংবাদপত্রের গুরুত্ব যে অপরিসীম তা বোঝা যায় খুব শ্রীঘ্রই সরকার কর্তৃক কুলী আইন সংশোধন করা থেকে।[১৪]

জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে প্রথম থেকেই দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী এই প্রতিষ্ঠানটিকে ভারতীয়দের অধিকার আদায়ের প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেখতে চান। ১৮৮৭ সালে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে দ্বারকানাথ কুলীদের প্রতি অত্যাচারের বিষয়টি উত্থাপন করতে গেলে সেটিকে প্রাদেশিক আখ্যা দিয়ে এড়িয়ে যায়। পরের বছর প্রথম বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনীয় অধিবেশনে বিপিনচন্দ্র পাল বিষয়টি উত্থাপন করলে দ্বারকানাথকে এবিষয়ে আলোকপাত করতে অনুরোধ করা হয়। দ্বারকানাথ কুলীদের শোষনের বিষয়ে বিস্তারিত বক্তৃতা প্রদান করলেও সেখানে উপস্থিত সকলকে বোঝাতে সক্ষম হন যে,এই সমস্যাকে প্রাদেশিক আখ্যা দেওয়া আদতে ভ্রান্ত ধারনা।সভায় ১৮৮৭ সালের কংগ্রেস অধিবেশনের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করা হয় ও কুলীদের বিষয়টিকে জাতীয় স্তরের সমস্যা হিসাবে গন্য করা হয়। এর পর যদিও জাতীয়স্তরে স্বীকৃতি পেতে আরও কয়েকবছর সময় লাগে।অবশেষে ১৮৯৬ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে কুলী সমস্যাকে জাতীয় স্তরের সমস্যার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর নারীদের ডেলিগেট করার দাবি তোলেন ও যারফলে পঞ্চম অধিবেশন হবার পূর্বে কংগ্রেস সেই দাবী পূরণ করার জন্য ১৮৮৯-এ বোম্বাই শহরে

অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে ছয় জন মহিলা ডেলিগেটের ব্যবস্থা করা হয়। তারমধ্যে দ্বারকানাথের পত্নী কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ছিলেন অন্যতম।দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা সুপ্রসিদ্ধা মহিলা লেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবী ঘোষালও ডেলিগেটদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম।[১৫] দ্বারকানাথ শুধুমাত্র নিজে শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত হন নি, স্ত্রী কাদম্বিনী গাঙ্গুলীকেও রাজনীতিতে নিয়ে আসা ও তাকে শ্রমিক আন্দোলনে অংশগ্রহন করতে উৎসাহিত করেছিলেন।

স্ত্রীশিক্ষার চরম পৃষ্ঠপোষক এই মানুষটি নিজের স্ত্রীকেও উচ্চশিক্ষা গ্রহনে চরম উৎসাহিত করেন। নারী চিকিৎসা ও নারীদের জীবিকা অর্জনের পথ উন্মুক্ত করার জন্য দ্বারকানাথ সর্বপ্রথমে নিজ স্ত্রীকে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করে দেন। বিবাহের পর তাঁর পত্নী পাঁচ বছর মেডিক্যাল কলেজে অধ্যায়ন করে চিকিৎসাকার্যে যোগ দেন। পরবর্তীতে চিকিৎসাশাস্ত্রে আরও উচ্চশিক্ষার জন্য চার সন্তানকে স্বামীর কাছে রেখে বিলেতে পাড়ি দেন ও এডিনবরা ও গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল.আর.সি.পি. ও এল.আর.সি.এস ডিগ্রী অর্জন করেন। এসব সম্ভব হয়েছিল দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর নারীহিতৈষী ভাবনার জন্য। কোন সময়ের জন্য দ্বারকানাথ অন্যায় ও কুসংস্কারের সঙ্গে আপোষ করেণ নি।স্ত্রী কাদম্বিনী গাঙ্গুলির অপমানের জবাব তিনি চরমভাবে দিয়েছিলেন। কাদম্বিনী তৎকালীন রক্ষনশীল সমাজের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করেও নিজ সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য যে অটল ছিলেন ও সক্ষম হয়েছিলেন সে পথ খুব মসৃণ ছিল না। 'বঙ্গবাসী' গোষ্ঠীর 'বঙ্গবানিবাসী' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকার ডাকসাইটে সম্পাদক মহেশচন্দ্র পাল একটি কার্টুন (বারবনিতা ডাঃ কাদম্বিনী স্বামী দ্বারকানাথের নাক ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন) ছেপে কাদম্বিনীকে 'স্বৈরিনী'র সঙ্গে তুলনা করেণ। কার্টুন ছাপার বিরুদ্ধে দ্বারকানাথ অবিলম্বে পত্রিকা অফিসে হাজির হয়ে সম্পাদককে কার্টুনটি জল দিয়ে গিলে খেতে বাধ্য করেন ও আদালতে মামলা করেণ। আদালতে সম্পাদকের ১০০ টাকা জরিমানা আর ছয় মাসের জেল হয়। এক নারীর সম্মান রক্ষার্থে তাঁর স্বামীর করা ১৮৯১ সালের এই মামলাটি অতি গুরুত্বপূর্ণ।[১৬]

সত্য ও ন্যায়ের অনুসরণে তাঁকে প্রতি পদে পদে লোকের সঙ্গে বিচ্ছেদ করতে হয়েছে। তাঁর চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল যা তাঁকে যুগোপযোগী হতে সাহায্য করেছে। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর সম্পর্কে উদ্ধৃতি করেছেন যে, "কিন্তু অপরের বিবাদে আর দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবাদে একটু প্রভেদ ছিল।....তিনি বলিবার যাহা বলিলেন,প্রতিবাদীর মুখের উপরেই বলিলেন,করিবার যাহা করিলেন,দশজনের সমক্ষেই করিলেন। তৎপরেই আর কিছুই নাই,বিদ্বেষ লইয়া ঘরে আসিলেন না,এই গুনের জন্যই তাঁকে ভালো বাসতাম।"[১৭] তাঁর নির্ভীকতা ও আত্মমর্যাদা জ্ঞানের অনেক নিদর্শন আছে,যা শুনলে বাঙালীর রক্ত ও মনুষ্যত্বের স্পৃহা উদ্দীপ্ত হবে। একবার দ্বারকানাথের বৈঠকখানার রাস্তায় একটি গলির সম্মুখে রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে একজন বন্ধুর জন্য

অপেক্ষা করছিলেন। রাত দশটা নাগাদ একখানা গাড়ি এসে থামল ও গাঙ্গুলী দেখলেন, একজন ইংরেজ গাড়ী থেকে নেমে গলির মধ্যে গেলেন। গাড়ির গাড়োয়ান "সাহেব ভাড়া, সাহেব ভাড়া" বলে তার সঙ্গে ছুটল। এই ঘটনায় ইংরেজটি গাড়োয়ানকে প্রহার করতে যায়। গাড়োয়ানটি ফিরে এসে গাঙ্গুলী মহাশয়ের সাহায্য চাইতেই গাঙ্গুলী তাকে বললেন, "চল,সাহেবের নাম জিজ্ঞাসা করি ও বাড়ির নম্বর দেখি,কাল ওর নামে নালিশ করিস,আমি সাক্ষী দেব।" এই বলে ইংরেজের কাছে নাম জানতে চাইলে সে প্রহার শুরু করে দেয়,গাঙ্গুলী মহাশয়ও কালবিলম্ব না করে পাল্টা ইংরেজটিকে প্রচুর প্রহার (ঘুষাঘুষি) করে,আর সবটাই ঘটল ঐ ইংরেজের ঘরের দরজার সামনে। চিৎকার শুনে ঘরের ভিতর থেকে ৩/4 জন এসে বিরোধ মিটিয়ে দেন। এরপর ইংরেজটি হয়তো ভূল বুঝতে পেরে শেকহ্যান্ড করতে চাইলে গাঙ্গুলী বলেন, "আমি তোমার মত কাপুরুষের সহিত শেকহ্যান্ড করি না।"এই অসীম সাহসী মানষিকতা ও প্রতিবাদী চরিত্র দ্বারকানাথের ছিল। এই খবর ১৮৯৮ সালের ২রা জুলাই সঞ্জীবনী পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছিল।[১৮]

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী মাত্র ৫৪ বছরের জীবনে যে সকল কাজ করতে পেরেছেন,তা নিরলস অক্লান্ত কর্মী না হলে ও মানব কল্যানের অদম্য ইচ্ছা ছাড়া কোনভাবেই সম্ভব হয় না। দ্বারকানাথের চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল মানবিকতা ও প্রচন্ড জেদ। তিনি কোনদিনই অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করেন নি বা ব্যক্তিস্বার্থে নিজেকে পরিচালিত করেন নি। মানবকল্যানের স্বার্থে বিশেষকরে নারীজাতির কল্যানার্থে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী ঢাকা থেকে কলকাতায় চলে আসেন, আবার বরিষ্ঠ ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্রের সঙ্গে বাকবিতন্ডায় জড়াতেও দ্বিধা করেন নি। নারীজাতির উন্নতির জন্য দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী স্কুল প্রতিষ্ঠার সঙ্গে শুধুমাত্র যুক্ত ছিলেন না,বস্তুতঃ স্কুলের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। দ্বারকানাথ শুধুমাত্র ভারতসভার সদস্য ছিলেন না,১৮৭৬-৭৮ ও ১৮৮১ সালে ভারতসভার কার্যনির্বাহক সদস্য ছিলেন এবং ১৮৮২ সাল থেকে আমৃত্যু ১৮৯৮ সাল পর্যন্ত সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ১৮৭৮-এ প্রতিষ্ঠিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তিনি শুধুমাত্র প্রাধান সারথি ছিলেন না।দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী প্রথমে ১৮৮৩ সালে ও পরে ১৮৯৬ থেকে ১৮৯৮ সাল পর্যন্ত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করেছিলেন। এইসমস্ত কার্যাবলীর উদ্যোগ নেওয়া ও তা দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদনের জন্য দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীকে সমাজ পরিবর্তনের কান্ডারী বললে মনে হয় অযৌক্তিক হবে না।

তথ্যসূত্র:

১. দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পাদনা), অবলাবান্ধব (নবপর্যায়) প্রসঙ্গঃ নারী, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কলিকাতা, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃ.নয়

২. শিবনাথ, শাস্ত্রী, আত্মচরিত, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ,পৃ. ২২৭

৩. তদেব, পৃ.২২৭
৪. শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলিকাতা, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ ,পৃ.৬
৫. তদেব, পৃ.৩৮
৬. দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পাদনা), অবলাবান্ধব (নবপর্যায়), প্রাগুক্ত,পৃ.৬
৭. শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, চিত্র-চরিত্র, বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়, হাওড়া, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, পৃ.১১০
৮. শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৪
৯. শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, প্রাগুক্ত,পৃ.১১
১০. শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৩-১১৪
১১. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, সম্পাদনাঃ বারিদবরণ ঘোষ, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা.লি., কলকাতা, দ্বিতীয় সংশোধিত নিউ এজ সংস্করণ, ২০০৭, পৃ.২২৮
১২. শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩
১৩. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, সম্পাদনাঃ বারিদবরণ ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৯
১৪. দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শিশুর সদাচার, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কলিকাতা, সপ্তম সংস্করণ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ , পৃ.২৯
১৫. প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলার নারী জাগরণ, সাধারণ পাবলিকেশন কমিটি, কলিকাতা, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ , পৃ.৮৭
১৬. সোমা বিশ্বাস, ঊনবিংশ শতকে বাংলাদেশে চিকিৎসা বিজ্ঞান চর্চা; পথিকৃৎ চার বাঙ্গালী মহিলা, কে.পি.বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, 2015, পৃ.৯৮
১৭. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০
১৮. দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শিশুর সদাচার, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১

নলিনী বেরার গল্পে দলিত জীবন

প্রীতিলতা সরকার
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
কবি নজরুল মহাবিদ্যালয়, সোনামুড়া, ত্রিপুরা

সারসংক্ষেপ: গল্পকার নলিনী বেরা পাঠক সমাজকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে বাস্তব পরিসরে। বিপর্যস্ত ও দলিত জীবন গল্প জুড়ে রয়েছে।বদলে যাওয়া গ্রামবাংলা ও তার মানুষ গল্পকে সমৃদ্ধ করেছে। দলিতদের লজ্জাজনক জীবন ও মানুষের স্পর্শকাতর ধারার বিবরণ দিয়ে যান গল্পকার। তিনি নিখুঁত অনুভবে আর অভিজ্ঞতায় গল্প রচনা করেন। তিনি দলিত সমাজের চরিত্রগুলির ব্যক্তিগত খুঁটিনাটি বিবরণ দিতে দিতেই পৌঁছে যান সামাজিক মাত্রায়। তাঁর গল্পের আলোচনার মধ্যে এক সমগ্রতার সুর যা দলিত জনের উপাখ্যান।বিশ শতকের শুরুতে কিছু জনপ্রিয় রচনায়, কতিপয় লেখক ভারতীয় এবং আত্মপরিচয় নিয়ে নতুন করে ভাবনা চিন্তা করেন। পরবর্তী সময়ে একুশ শতকেও বিভিন্ন লেখকদের মধ্যে এই ভাবনা কাজ করেছে।
মূলশব্দ: দলিত, দলিতজীবন, আর্য, অনার্য, আদিবাসী, ব্রাত্য জন, প্রান্তিক সমাজ, দেশজ, কুসংস্কার ইত্যাদি।

> "যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
> তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই
> বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী স্তম্ভিত হয়ে বও।
> ভাষা দাও তারে, হে মুনি অতীত, কথা কও, কথা কও।"[১]

ঋগবেদের সময়কাল থেকে ভারতে সমাজের যে শ্রেণিবিন্যাস, সেখানে এর সূচনা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র এই চারটি জাতির ওপর উচ্চাবস্থানে থাকা মানুষদের অত্যাচার ও অবমাননা ছিল প্রবল।পরবর্তীকালে এরা অস্পৃশ্যতার নাগপাশে আবদ্ধ হন। তাদের জীবন ছিল লজ্জাজনক। তাদের চাষবাসের জমি ছিল না। তেমনি তাদের কোনো নির্দিষ্ট পেশাও ছিল না।অন্তহীন শ্রমের বিনিময়ে তারা পেতেন পশুর মতো ব্যবহার। গ্রাম বাংলার অনেক জাতি রয়েছে যেমন—চর্মকার, কর্মকার, মালাকার, জেলে, কলু, শবর, সাঁওতাল, সন্ন্যাসী প্রভৃতি জাতিরা উচ্চবিত্তের কাছে অস্পৃশ্য ও তাদের দ্বারা শোষিত।

সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এর মতে 'সাঁওতাল' শব্দটি সংস্কৃত 'সামন্তপাল' থেকে এসেছে। অর্থাৎ সীমান্ত রক্ষার কাজে প্রধানত এই জাতিকেই ব্যাবহার করা হতো। আদিবাসী জনজাতির মধ্যে সাঁওতালরা সাংস্কৃতিকভাবে অনেকটাই অকৃত্রিম থেকে গেছে। সাঁওতালরা আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে গানে বলে —

“হিহিড়ি পিপিড়িরে বন জানা মলেন
খোঁজ কামান রে বন খোঁজলেন
হারতা বে বন হারালেন
মাসাং বেড়া রে বন জাউ এ না হো।”[২]

দলিত প্রসঙ্গকে আলোচনা করার আগে ‘আর্য’ ধারণার ইতিহাস ভাবনা সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। ব্রিটিশ ও অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানীরা অঙ্গাসঙ্গিভাবে যুক্ত বিভিন্ন মতবাদের ফলস্বরূপ আর্য জাতি তত্ত্ব ভারত ইতিহাসের ভিত্তি বলে দেখা হয়। ঋগবেদ ও ইন্দো-ইউরোপীয়দের প্রাচীনতম স্তর বিচার করে ঐতিহাসিকরা বলেছেন, যারা একভাষায় কথা বলে তারা যে অবশ্য এক জৈব জাতির সদস্য সেটাই ভাবা হতো।আর্য ভাষায় কথা বল্য দুই গোষ্ঠী দুইদিকে ছড়িয়ে যায়। একটি গোষ্ঠী উত্তর-পশ্চিম ভারত আক্রমণ করে দেশীয় মানুষদের দাসে পরিণত করে। শরীরের বর্ণের কথা ধরে নেওয়া হয়েছে গৌর বর্ণ আর্য, কৃষ্ণ বর্ণ আদিবাসী। শারীরিক ভেদজনিত সচেতনতাকে জাতিভেদের সঙ্গে তুলনা করা যায় না।

যেই আর্যরা ইউরোপে গমন করে তারা অনেক বেশি কর্মঠ, লড়াকু। অন্যদিকে দক্ষিণের আর্যগণ ইরান যারা ইরান ও কালক্রমে ভারতবর্ষে পা রাখে তারা চিন্তাশীল ছিল বিশেষত ধর্ম ও দর্শণ নিয়ে। ম্যাক্সমুলার ভাষা ও জাতির যেকোনো সম্পর্ক সেটাকে অস্বীকার করেছেন। কোনো ভাষা ঐতিহাসিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে নির্ভর করে এক ভাষায় একাধিক জাতির মানুষ কথা বলতে পারে।

ভারতীয়দের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে ভারতবর্ষের প্রকৃত বাসিন্দা হলো যাদের আদিবাসী তকমা দেওয়া হয়, তারা শুদ্র, অতিশুদ্র ও দলিতদের তিনি এর অন্তর্ভুক্ত করেন। বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা হয় ক্ষত্রিয়দেরকেও। আর্য প্রতিভূ সমাজে কথিত উচ্চবর্ণদের আগমনকে আদিবাসীরা রুখতে সচেষ্ট হলেও শেষ পর্যন্ত আদিবাসীরা বিজিত ও অধস্তনে পরিণত হয়। উচ্চবর্ণের মানুষ নিছক নিজ সুবিধার্থে আর্য জাতি তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করে তাই নয়, এই তত্ত্বে এক নতুন মোড় আসে যা উচ্চবর্ণের সামাজিক মর্যাদার আকাঙ্খা এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে থাকে। উচ্চবর্ণের মানুষরাই আর্য এই উৎকৃষ্টতার স্বপক্ষে একটি তত্ত্ব কাজ করে উচ্চবর্ণের মানুষরা সরাসরি আর্যদের উত্তরপুরুষ।এই ভাবনাচিন্তার সঙ্গেই উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে জাতীয়তাবাদের উত্থানও ঘটে থাকে।ধর্মীয়, আঞ্চলিক, ভাষাতাত্ত্বিক বিভিন্ন প্রকারের জাতীয়তাবাদের এই আর্যতত্ত্ব ও আত্মপরিচয়ের ভাবনা প্রবল।

বিশ শতকের শুরুতে কিছু জনপ্রিয় রচনায়, কতিপয় লেখক ভারতীয় এবং আত্মপরিচয় নিয়ে নতুন করে ভাবনা চিন্তা করেন। পরবর্তী সময়ে একুশ শতকেও বিভিন্ন লেখকদের মধ্যে এই ভাবনা কাজ করেছে। জাতি, শ্রেণি এবং ধর্মের পৃথক পরিচয় বিচ্ছিন্নতাকে গুরুত্ব দিতে থাকে।

কোনো জাতির ইতিহাস অনুধাবন করা সম্ভব তার প্রধান ধর্ম বা সমকালীন সমাজে উচ্চবর্ণের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করার মধ্য দিয়ে। পাশাপাশি যেসব মানুষ জমির প্রকৃত উত্তরাধিকার বলে দাবির ক্ষেত্রকে উজ্জীবিত করে।

"আমি জানি আমার সহজ শৈশব
কেটেছে পুকুর পাড়ে, হিঙচার গাছ আর
কেদারের বউ দুজনেই পাশাপাশি দেখেছে,
আমাকে, ধবলী ছাগল সুনা সাঁওতাল
দেখেছি বাঁদর নাচ কেঁদরার ছো দিনমান।" [৩]

নলিনীর 'ভাতুয়ামঙ্গল' গল্পে আঞ্চলিক প্রাকৃতিক পরিবেশ উপস্থিত। উদ্ভিদ জগতের বৈচিত্রময় বর্ণনার সঙ্গে মানুষের বৈচিত্র্যময় স্বভাবও গল্পে আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠে। হিরমিচা, ঘলগসি, আটরি চরচু, ডকা, কুচলা, ধ, আসন, শাল, পিয়াশাল, কেঁদ, করমভাদু, করনকইম, বাদাম, বাদভেলা, কদম, গাবগুবি, গুটিমন, দুধিয়াকুড়চি, সোনালী, জাড়াজারুন, পরাশ, পাকুড় কতরকম গাছ। গাছের মতো মানুষের বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাজির এই জগতে।

'জরিলাল' নামে একটি গ্রামে সুনা নামের যুবক থাকতো। জাতিতে সাঁওতাল। সারা বছরের ভাতে কাপড়ে নলিনীর বাড়িতে কাজ করতো।যাকে বলতো ভাতুয়া।যেমন—সুনা সাঁওতাল, তেমনি তার মা ঢালো বুড়ি সারাদিন কাজ করতো। সুনা সাঁওতাল ও ঢালো বুড়ি কঠোর পরিশ্রমে সাঁওতালদের সীমাহীন জীবনযন্ত্রণা নিয়ে লিখেন নলিনী লেখেন 'ভাতুয়ামঙ্গল' গল্পটি। যা সাঁওতালদের অসীম প্রাণসম্পদে ভরপুর।

দলিত মানুষগুলোর কথা লিখতে গিয়ে নলিনী তাদের বিচিত্র জীবনের কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থনৈতিক টানাপোড়েন কিভাবে এই মানুষগুলোর পেশা বদলে দেয় তা আমরা গল্পে লক্ষ্য করি। বাংলা দলিত সাহিত্যের ইতিহাস এসে মিশেছে আদিবাসী আন্দোলনের আখ্যানে।চর্যাপদের সময় থেকেই যেমন ব্রাত্যজনের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক অবদান অনুসন্ধান করা হচ্ছে।তেমনি বর্তমানেও তা প্রাসঙ্গিক। মানুষের এই শ্রেয়তর বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে স্মরণ করতে হয় রবীন্দ্রনাথকে:

"বিশ্ব যখন নিদ্রা মগন গগন অন্ধকার
কে দেয় আমার বীণার তারে এমন ঝঙ্কার।" [৪]

নলিনী তাঁর গল্পে সমাজের অবহেলিত ব্রাত্যজনের অনালোচিত জীবনযন্ত্রণার কথা তুলে আনলেন। অন্যদিকে অন্যরা তুলে আনেন অবহেলিত ব্রাত্যজনের অনালোচিত জীবনযন্ত্রণার কথা।

নলিনী বেরার বিভিন্ন গল্পে সাঁওতাল জনজাতির উপস্থিতি বর্তমান। সাঁওতাল সান্তাল, সন্তাল-মালদহ জেলার কৃষিজীবি অমুসলমানদের মধ্যে বরিন্দ অধিবাসীরা বেশ বড় সংখ্যায় বসবাস করেন। এই সাঁওতালরা ছোটনাগরপুর অঞ্চল থেকে তারা বিভিন্ন

জায়গায় ছড়িয়ে যায়। শুধুমাত্র উচ্চশ্রেণির মানুষরা শোষণ চালায় তা নয়। সরকারী অত্যাচারও চলে।

ভারতের প্রাচীনতম জনগোষ্ঠী অষ্ট্রো-এশিয়াটিক খেরওয়াল গোষ্ঠীর প্রধান শাখা এই সাঁওতাল সমাজ। ভাগলপুর, উত্তর উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় এদের বাসস্থান।

বাংলা সাহিত্যে দলিত প্রসঙ্গ বহু আগে থেকেই আলোচনা চলছে।সাহিত্যের কাব্য, উপন্যাস, গল্প ইত্যাদি স্থানে বিস্ময়করভাবে প্রান্তিকতার কথা এসেছে। নলিনী বেরার গল্পে আছে সাঁওতাল জাতি।এরা নিম্নবর্গভুক্ত।ধর্মাচরণের দিক থেকে বেদ বহির্ভূত। উল্লেখিত 'ভাতুয়ামঙ্গল' ও 'ঝরাপালকের জাদু' গল্প দু'টি গভীরভাবে পড়লে আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। দলিত বা প্রান্তিক সমাজেরই একজন বক্তা গল্পকার নলিনী বেরা।

নলিনী বেরা নিজেই প্রান্তিক সমাজের একজন।তিনি নিজেই গল্পদ্বয়ের বক্তা ও চরিত্র। তিনি তুলে আনলেন সমাজের অবহেলিত ব্রাত্যজনের অনালোচিত জীবনযন্ত্রণার কথা। গল্পকার নিজেই অন্ত্যজ পরিবারে জন্ম নিয়েছেন। দলিত মানে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা নয়, মেধা এবং লড়াইয়ে সুচারুভাবে বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিকল্প স্বরে কথায় হবে সাহিত্যে প্রতিবাদের ভাষা। বিকল্প ধারার লেখকরা হলেন—মধুসূদন দত্ত, অদ্বৈত মল্লবর্মণ অনুসারী। নলিনী বেরা নীরবে সেই বিনির্মাণ করে চলেছেন সাহিত্যকর্মে।

নলিনী গল্পে রয়েছে অফুরন্ত শব্দভাণ্ডার:

মানুষের নাম: রাইবুচামটু, গুড়গুড়িয়া, কুলাই, ছোটরাই, পিতাম, গুরা, বড়কাই, সুনি, ভুসকি, ধনু, গুরভা।

গাছের নাম: বাদভেলা, দুধিয়া, কুড়চি, জারুল, পরাশ, কেঁদ, ভাদু।

দৈনন্দিন কার্যকলাপ: খতখানা, মাটিকাম, কাড়হান, বাঁওলাকাটা, ছঁচ, বতর।

উৎসবের নাম: দাঁশাই, বাঁধনাপরব, পইড়ান, গরুজাগরণ।

বাদ্যযন্ত্র: ভুয়াঙ।

খাদ্যবস্তু: ঘুসুর, মেরম, ছাঁকা, খাপরা, বনবাঁওলার মূল।

নলিনীর ছোটকাকা, পিসিমা, কাকিমা প্রত্যেকেই কিছু লোক বিশ্বাস নিয়ে গল্পে হাজির। স্থান ভেদে, কাল ভেদে মানুষের আকৃতি প্রকৃতি ভেদে, জীবনজীবিকা সুচারু হয়ে ওঠে গল্পের আঙিনায়। নলিনীর মেজকাকার জীবনযাত্রা ও তার চারপাশে লৌকিক জীবন নিয়ে 'ঝরাপালকের জাদু' গল্পটি। 'রবিনহুড', 'নবকুমার', 'দেবদাস', 'সুরেন্দ্র' ইত্যাদি চরিত্র সেজে সশরীরে অভিনয় চর্চায় প্রতিনিয়ত। আদিবাসী জনজাতির জীবন সংস্কৃতি অনেকটাই অকৃত্রিম থেকে গিয়েছে। গল্পে দেখা যায়, বুধন মর্মর বাড়িতে কাঁচা লাল পাতার ঠোঙায় লাল নীল রঙের বোঁদে খাচ্ছেন। নিম্নবর্গের অনুন্নত সম্প্রদায়ের

মানুষ নলিনীর কাকা। ভবঘুরে, মর্যাদাহীন নিম্ন বৃত্তিজীবি। গানের সুরে তার নিজের মনের আবেদন, কর্মহীনতার যন্ত্রণা প্রকাশ পায়।

১. ‘‘জীবনে যদি দীপ জ্বালাতে নাহি পারো সমাধি পরে মোর জ্বেলে দিও।’’ [৫]

২. ‘‘কাজল নদীর জলে ভরা ঢেউ ছলছলে প্রদীপ ভাসাও কারে স্মরিয়া/সোনার বরণী মেয়ে বলো কার পথ চেয়ে আঁখিদুটি ওঠে জলে ভরিয়া।’’ [৬]

নলিনী বেরার বাড়ি ডাঙাসাহী অঞ্চলে। এই অঞ্চলের জঙ্গলের উপস্থিতি হল তার উপজাতি পরিচিতি। শাল, মহুয়া ও পলাশের এই মহাল আদিম উপজাতিদের বসবাসকে মনে করিয়ে দেয়। সাঁওতালদের মধ্যে চুনকাম বা মাটিকাম করার শিল্প বেশ অদ্ভুত ধরনের। যে মাটি দিয়ে দেওয়াল পরিষ্কার করা হয় সেই মাটির সন্ধানে অনেক দূরদুরান্তর থেকে আনা হয়। গিরি মাটি দিয়ে মাটিকাম করা দেওয়ালের উপর লতা পাতা ফুল পাখি আঁকা হতো। আদিবাসী সংস্কৃতিতে ছঁচ দেওয়া একটি শিল্পকর্ম।ছঁচ দেওয়া মানে মাটির দেওয়ালে ছবি আঁকার কাজ। ছঁচ দেওয়ার রস তৈরি হতো বর্ষার ঢ্যাঁড়স গাছ কেটে শিলনোড়ায় ছেঁচে রস বের করে, রসের সঙ্গে চালের গুড়ি মিশিয়ে তৈরি করা হয়। আদিবাসী সংস্কৃতির সঙ্গে ছবি আঁকা এক ধরনের জীবনকেন্দ্রিক শিল্প। গল্পের বর্ণনায় এর পরিচয় রয়েছে —

> ‘‘মাটির দেয়ালে ‘ঠঁচমাটি’ লেপা, তার উপর গিরিমাটি সিমপাতা পুঁই-মেচড়ির লাল রং ললুদ গাঁদার রস আর কাঠকয়লা দিয়ে সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা, ফুল-পাতা, জীবন্ত লাউয়ের লতা মাচান বেয়ে খড়ের চালে উঠেছে।’’ [৭]

আঞ্চলিক লোকসংস্তৃতির আকর, লোকভাষা, লোকখাদ্য, লোকবাদ্য, লোকগান আয়ত্ব করতে শুরু করেন নলিনী বেরা।তার গল্পের চরিত্র সুনা সাঁওতালের ঘর বাড়ি নেই। বনজঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে ও খালবিলের পাশে ঝুপড়ি বানিয়ে থাকে। ডাঙাসাহীর মাঝখানে মস্ত বাঁশবনের ভিতর তার ঘর।আলোর প্রতি সুনা সাঁওতালের অনীহা। সুনার জীবনের দুঃখ যন্ত্রণা প্রায় অবিচ্ছেদ্য সুরের মতো বিরামহীন এবং চলমান।তার জীবন একই ধারায় চলমান।তার জীবন যেন তার ঘরের আলোর মতো,

> ‘‘পলতের জায়গায় বিন্দুবৎ সেই আগুনের ফুড়গুনি আর তার নীলচে আভা টুকু-সে আভায় কোন কিছু স্পষ্ট নয়, সব যেন সেই অস্ফুট অনাবিষ্কৃত রহস্যে রোমাঞ্চকর!’’ [৮]

সুনা সাঁওতাল নলিনীর সুনা ভাগ্না নামে পরিচিত। ফর্সা চেহারা, মুখেও পিঙ্গল দাঁড়ি গোঁফ বড় সড় চেহারা নিয়ে সারাবছর কাজকর্মে মগ্ন থাকতো। সে অসুস্থ হয়ে এখন বিছানায় শোয়া। কষ্টের লেশ শরীরে নেই কিন্তু মনে রয়েছে। নলিনী বেরা এই গল্পে গোপিবল্লভপুরের জনবসতির সঙ্গে নিজের ঘরের উপাখ্যান বিবৃত করেন। এমনি আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের অন্ধকার কোনোভাবেই যেতে চায় না। সুনা ভাগ্নাও ঘরের মধ্যে সবচেয়ে অন্ধকারময় জায়গাকে খুঁজে নেয়। কোনোসময় উজ্জ্বল আলোতে থাকার অভ্যাসরপ্ত নয়।

সুনা ভাগ্না, নলিনী ও তার পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে তার দীর্ঘজীবনের যাপিত জীবন এবং জীবনের আনন্দঘন মুহূর্তে মাতোয়ারা সুনা সাঁওতালের সঙ্গে তার অসহায়তার চিত্র গল্পটিকে অনবদ্য রূপ দিয়েছে। এই গল্পে সুনা সাঁওতালের কাডহান বা ঘাস নিড়ানো, বাঁওলাকাটা, গরু জাগরণে পইরান ইত্যাদি কাজ করতো।শরীরের শক্তি ব্যয় করে ঘরে বাইরে সমানভাবে কাজ করে।সুনা সাঁওতাল জঙ্গলমহলে কুঠার মানুষ হলেও মনের মাঝে পুঁতে রেখেছেন মানবিকতার বীজ। নলিনীর খোড়পোষ দাবি করার কথার উত্তরে বলল —

> "বলামাত্র কেমন যেন হয়ে গেলো সে, তার ঠোঁট দুটো থর থর করে নড়ে উঠলো, চোখের কোণ বেয়ে দু-ফোঁটা জলও বুঝিবা গড়িয়ে পড়লো, বিড় বিড় করে যেন বলল, এতদিন তুমাদের পালপোষ করে এসেছি, আজ তুমারা আমাকে খোরপোষের লোভ দেখাচ্ছ—বলছো কি, তুমাদের কাছে খোরপুষের ল্যাওড়া দাবী তুলতে?" [৯]

কুলি কুলি যাতে ছিলি জাঁগায়ে জাঁগায়ে কার্তিক মাসে ভাতৃদ্বিতীয়ার দিনে বাঁধনাপরব শুরু হয়। এটি একটি জাঁকজমকপূর্ণ পরব। বাঁধনা আসলে গো বন্দনা বা গরু পরিচর্যামূলক অনুষ্ঠান। সারা বছর কৃষকের কৃষিকাজ গোনির্ভর। আজ একটি বিশেষ দিনে খুঁটিতে বলদকে বেঁধে, তাদের কপালে ঝোলানো ধানশীষের পাটিমোড় গলায় গাঁদা ফুলের মালা, গায়ে নানা রঙের চকরাবকরা এঁকে মাদল বাজিয়ে গরুগুলিকে চড়ানো হয়। গরু খেলানো পার্টি বা সুনা সাঁওতালের দল এসে বলে ওঠে।

" 'অহিরে'...... সবু দিন তো চরাই ভালা
বিরি-মুগো ক্ষেতে যে বাবু হো
আজি তোরো দেখিব বলিয়ানি—
আজি কারো রণে ভালা হারি যদি যাও গো
তোরো ছালে বরদা খুঁটাবো।।" [১০]

বাঁধনা প্রধানত দক্ষিণ-পশ্চিমবাংলার কুর্মী কৃষিজীবীদের শ্রেষ্ঠ পার্বণ। স্বাভাবিকভাবে এদের পাল পার্বণের প্রভাব অন্য জাতিগোষ্ঠীদের মধ্যে কম বেশি সঞ্চালিত হয়েছে। বাঁধনা পরবে কুর্মীদের সঙ্গে সাঁওতালদের যোগ দিয়ে বাঁধনা পরব গরু জাগানের গান শুরু করে।

অন্য একটি উৎসব হল বুড়ি বাঁধনা বা ভাইফোঁটার দিনে বিল জঙ্গল থেকে বেনা খাস, কুশ গাছ দা দিয়ে কেটে বিনুনি তৈরি করে পইড়ান তৈরি করা হয়। পার্শ্ববর্তী বড় কোনো গাছের শিকড়ে অথবা অন্য কোনো ভারী জিনিসের সঙ্গে বেঁধে মাটিতে পুঁতে দিয়ে দেওয়া হয়। সেই পুতে দেওয়া পইড়ানকে টেনে তোলার সময় শরীরে অসীম শক্তি দরকার। এই অঞ্চলে সুনা সাঁওতালেরই সেই জোর আছে। কায়দা কসরত করে পইড়ান তুলে সুনা সাঁওতাল প্রথম হয়।

ঝাড়গ্রাম, গোপীবল্লভপুর, জরিলাল প্রভৃতি অঞ্চলে বিভিন্ন পূজা পার্বণ করা হয় সেই প্রসঙ্গও গল্পে জায়গা পায়। সাঁওতাল হিসেবে চিহ্নিত জনসংখ্যা এক শতাংশের মতন পুনর্ব্যবহার তার গল্পে দেখা যায়। প্রকৃতি ও মানুষ তার গল্পের বড় উপাদান। প্রান্তিক শ্রেণির মানুষজন মূলত প্রকৃতির পূজারী। তারা একসঙ্গে প্রকৃতির অঙ্গ এবং সেবায়ত। যা নলিনী নিজেও বহন করেন তার সত্তায়। সাঁওতালদের জীবনব্যপ্ত দেশজ ও ভূমিজ উপাদানে।এই সমস্ত উপাদানও 'ভাতুয়ামঙ্গল' গল্পের উপাদান।

নলিনী বেরার আরেকটি অনবদ্য গল্প 'ঝরাপালকের জাদু'। সংস্কার কুসংস্কার, শুভ অশুভের খন্ড চিত্র ইতিহাসের শিকড় গাঁথা মানুষজনের জীবন তার গল্পের প্রতিচ্ছবি। এই গল্পে যারা উঠে এসেছে তাদের জীবনধারা আর সংস্কৃতি একই ধারায় মিশ্রিত অশুভ কিছু ইঙ্গিতের ধারণা গল্পের শুরুতেই আছে—

> ''সাদামাটা পাতিকাকের তুলনায় ঈষৎ ভারি দাঁড়কাকটার শরীরের ভারে কতক বুড়ো নিমপাতা ঝরেও পড়ল ঝুর্ঝরা আর অমনি আমাদের মা-কাকিমাদের মধ্যে চিন্তার উদ্রেক হলো-না জানি কী খারাপ খবর আসছে!'' [১১]

গ্রাম বাংলার লোকালয়ের বাইরে অন্যান্য জায়গা আছে যেখানে তারা তাদের আদিম পূর্বপুরুষদের কাহিনীকে নিজেদের বিশ্বাসে বাঁচিয়ে রেখেছেন মানুষের মনুষ্যত্বহীনতার চিত্র তারা চারপাশে দেখেছে। সাঁওতালদের মধ্যে এক ধরনের লোককাহিনী ছিল মরকে মারা যাওয়া মানুষদের মধ্যে শকুনরা ব্রাহ্মণ কায়স্থদের মৃতদেহ না খেয়ে হাঁড়ি-ডোম-সান্তালদের মৃতদেহ খাচ্ছে। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলল শকুনগুলি বোকা বলে পচা মৃতদেহ খাচ্ছে, উত্তরে শকুন বলল—

> ''ওহে ব্রাহ্মণ! আমরা হিশাব করে মানুষের মাংসই খাচ্চি, তুমি ঠিক চিনতে পারছ না। আসলে 'চান্দো বোঙা' মানুষের শরীরে পশুর আত্মাও ভরে দেন। আবার পশুর শরীরে মানুষের আত্মাও ভরে দেন। আমরা ঠিক চিনতে পারি।....'' [১২]

মানুষের মনুষ্যত্ব জ্ঞানই হচ্ছে আসল। হাড়ি-ডোম ওরাও মানুষ। মনুষ্যত্বের স্বর বুধনের মা, নলিনী ও তার ছোটকাকা তাদের চরিত্রে রয়েছে। এ চরিত্রগুলি দাপটে নাজেহাল কখনো অস্তিত্ব নিয়ে ঘোরাফেরা করেনি। নলিনীর আলোচিত দুটি গল্পে মানবিকতার স্পর্শময়, গতিময়, সাবলীল ভঙ্গিমায় পুনরাবিষ্কার ঘটে পাঠকের। গল্পকার উপস্থাপনার অসামন্যতায় পাঠককে বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলের বসতি স্থাপনকারীদের চিরায়ত ঐতিহ্যকে ছুঁয়ে থাকা বিষয়ের প্রতি আগ্রহী করে তুলেছেন।

নলিনী বেরা তার ছোটগল্পের নিজস্ব আয়তন রেখাটি গড়েন বিভিন্ন উপাদান নিয়ে। গল্পকার নিজস্ব ভাষায় ও ভঙ্গিমায় নিজস্ব বিষয়কে উপস্থাপন করেন। তিনি তার একান্তই নিজস্বতায় জীবন ও শিল্পের পরিচিতিটুকু অর্জন করতে পেরেছেন। তার গল্পে লোকায়ত ধারা রয়েছে। হাজার হাজার বছর পেরিয়ে আজও গুহার গায়ে যে ছবি, আদিবাসী সমাজের আজো রয়ে গেছে। আলাদা জনপদ বেঁধে বাস করা মানুষদের শিল্পী

মনের খবর আমরা কম রাখলেও নলিনী লোকায়ত জনপদের আচার অনুষ্ঠান, বিশ্বাস, উৎসব তার গল্পে আলোচিত হয়েছে।

দাঁশাই একটি উৎসবের নাম। এই দিনে মুখে কালি মেখে সং সেজে ভুয়াঙ বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে কচিকাঁচা ছেলেদের দল সমস্বরে বলে উঠবে— 'ভুঙচুঙসারেঙা'। আর গ্রামের মেয়ে লোকরা ঝোলার মধ্যে চাল ডাল পিঠেপুলি ঢেলে দেয়। দাঁশাই উৎসবকে কেন্দ্র করে শারদ উৎসবের মতো সাঁওতাল পুরুষরা দলবদ্ধভাবে নাচ করে। বেলবরন, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীর মহাউৎসব হলো এই দাঁশাই। সাঁওতাল পুরুষরাই এই উৎসবে নাচে। আদিবাসীদের এই নাচের মধ্যে বিশ্বাস ও সংস্কার একটি অন্যতম দিক। আদিবাসীরা বিশ্বাস করে যে গ্রামের মধ্যে যে অপদেবতা বা সরষের ক্ষতি করে, মহামারি নিয়ে আসে নাচ এই অপদেবতা থেকে রক্ষা করে।

আদিম জনপদবাসি বাঙ্গালিদের গানের সুর তাল লয় এর মান আমাদের অজানা। গ্রামাঞ্চলে যে গান গায় তার মধ্যে বাঙালির সেই লোকায়ত ধারা স্পষ্ট। সাঁওতালি গানের ভাষা সাধারণত আমরা বুঝতে পারি না।

> ''জমআবন ঞুইআবন রাইস্কারেবন তাঁহে না।নওয়া হাসা হড়ম বার সিঞ লাগি।'' [১৩]

'ঝরাপালকের জাদু' গল্পে গানের শব্দে রয়েছে সাঁওতালি ঠার শব্দের ব্যবহার। সাঁওতালি ঠার সবাই বোঝে না। কিন্তু নলিনীর ছোটকাকা উচ্ছ্বসিত হয়ে গানের অর্থ বুঝিয়ে বলে—

> ''আহা কী কথা! খাব দাব ফুর্তি করব, এই মাটির শরীর দুদিন বৈ ত নয়!'' [১৪]

নলিনীর গল্পের ভেতর তৈরি হওয়া প্রত্যাশা তীব্রতর হয় তার গল্পগুলি পড়লে। সাধারণ, পরিচিত, চেনা চরিত্রগুলো তার গল্পের স্থান পায়। আটপৌড়ে অনুভব গল্পের নির্মাণে প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাই মাঝে মাঝেই তার গল্পে পুনর্গঠনের প্রয়াস দেখা যায়। বাংলার একটি প্রান্তের মানুষ সেখানকার মানুষদের জীবন, অভিজ্ঞতা নলিনীর শিল্পরূপ গঠন করে। তিনি একান্ত নিজস্বতায় জীবন ও শিল্পের পরিচিতিটুকু অর্জন করতে পেরেছেন। নলিনীর গল্প পড়ে মনে হয় তিনি দায়বদ্ধ থাকেন সাঁওতাল আদিবাসী সমাজের কাছে। তার গল্পে পুনরাবৃত্তি থাকলেও গভীরভাবে দেখলে দেখা যাবে অনার্য সমাজে দুঃখ যন্ত্রণা প্রায় অবিচ্ছেদ্য সুরে বহমান।

সারা বছর ধরে জঙ্গলমহলের মানুষগুলি যাত্রাগান নিয়ে মেতে থাকে। আসলে এসবের মধ্যে থেকে তারা অর্থনৈতিক কষ্টকে ভুলে থাকতে চায়, চায় দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনকেও ভুলে থাকতে। কিন্তু অভাব তাদের পিছন ছাড়তে চায় না। 'ঝরাপালকের জাদু' গল্পে দেখা যায়, নলিনীর ছোটকাকা ডুবকার জঙ্গলে তীর ধনুক হাতে নিয়ে মাথায় পালক গুজে রবিনহুড সেজে ঘুরে বেড়ায়।

অতীতকে বাদ দিয়ে চলা যায় না কারণ অতীতেই থাকে আমাদের ঐতিহ্যের শিকড়। তারাশঙ্কর যেমন কাহার বেদেদের নিয়ে সাহিত্যের জগৎ তৈরি করেছেন, পরবর্তী সময়ে সতীনাথ, দেবেশ রায়ের হাত ধরে নতুনভাবে শুরু হয়েছিল সাহিত্যের দলিতদের পথচলা। সত্তরের দশকে একদল লেখক তাদের কথা বলতে চেয়েছেন ভালিয়াঘাঁটি, টটাসাহী, ডাঙাসাহী প্রভৃতি অঞ্চলের সাঁওতাল, সবর, মুমুর্দের নিয়ে সাহিত্যে হাজির হলেন নলিনী বেরা। তিনি তাদের মধ্যেকার একজন মানুষ। তাঁর লেখায় আমরা পেলাম নিরব কণ্ঠস্বর।

তথ্যসূত্র:

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, মাঘ ১৩৪৮, 'সঞ্চয়িতা', কলকাতা, বিশ্বভারতী, পৃ. ৩৮০।

২। মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, ২৭ জানুয়ারি, ১৯৯৯, 'বাঙালির ইতিহাস', কলকাতা, বেঙ্গল লোকমত প্রিণ্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ৬৫।

৩। সামন্ত, সুবল(সম্পাদিত), শ্রাবণ ১৪০২, জুলাই ১৯৯৫, 'বাংলা গল্প ও গল্পকার', কলকাতা, এবং মুশায়েরা, পৃ. ১৭৯।

৪। মিত্র, মধু ও ঘোষ, বাসব(সম্পাদিত), বইমেলা, ২০১৭, 'বাঙালির সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি সংকট ও উত্তরণ, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, পৃ. ১৭০।

৫। রায়, প্রশান্ত(সম্পাদিত), মে-অক্টোবর ২০১৩, ত্রিচত্বাবিংশত্তম বর্ষ, 'মাঝি', সাহিত্য সময়পত্র, ত্রৈমাসিক, ক্রমিক ১১১, পৃ. ১৮০।

৬। তদেব

৭। রায়, প্রশান্ত(সম্পাদিত), মে-অক্টোবর ২০১৩, ত্রিচত্বাবিংশত্তম বর্ষ, 'মাঝি', সাহিত্য সময়পত্র, ত্রৈমাসিক, ক্রমিক ১১১, পৃ. ১৮১।

৮। সামন্ত, সুবল(সম্পাদিত), শ্রাবণ ১৪০২, জুলাই ১৯৯৫, 'বাংলা গল্প ও গল্পকার', কলকাতা, এবং মুশায়েরা, পৃ. ১৮৯।

৯। তদেব, পৃ. ১৯০।

১০। তদেব, পৃ. ১৮৬।

১১। রায়, প্রশান্ত(সম্পাদিত), মে-অক্টোবর ২০১৩, ত্রিচত্বাবিংশত্তম বর্ষ, 'মাঝি', সাহিত্য সময়পত্র, ত্রৈমাসিক, ক্রমিক ১১১, পৃ. ১৭৯।

১২। তদেব, পৃ. ১৮২।

১৩। তদেব, পৃ. ১৮০।

১৪। তদেব।

গ্রন্থপঞ্জি:

১। মিত্র, মধু ও ঘোষ, বাসব(সম্পাদিত), বইমেলা, ২০১৭, 'বাঙালির সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি সংকট ও উত্তরণ, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

২। ভোজ, মনোজ(সম্পাদিত), বইমেলা, ২০১৬ 'কথাসাহিত্য ও অন্যান্য', কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

৩। সামন্ত, সুবল (সম্পাদিত), শ্রাবণ ১৪০২, জুলাই ১৯৯৫, 'বাংলা গল্প ও গল্পকার', কলকাতা, এবং মুশায়েরা।

৪। মুখোপাধ্যায়, সুব্রত, জানুয়ারি ২০১৬, 'জঙ্গলমহলের কুঠার-মানুষ', হুগলি, ছোঁয়া।

৫। মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, ২৭ জানুয়ারি, ১৯৯৯, 'বাঙালির ইতিহাস', কলকাতা, বেঙ্গল লোকমত প্রিণ্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

৬। সোম, সুস্মিতা, ২০১১, 'মালদহ জাতি-সম্প্রদায় ও কুটীর শিল্প', কলকাতা, সোপান।

পত্র-পত্রিকা:

১। রায়, প্রশান্ত(সম্পাদিত), মে-অক্টোবর ২০১৩, ত্রিচত্বাবিংশত্তম বর্ষ, 'মাঝি', সাহিত্য সময়পত্র, ত্রৈমাসিক, ক্রমিক ১১১।

ন্যায় হল বন্ধুর উপকার সাধন ও শত্রুর ক্ষতি সাধন : প্লেটোর সমালোচনা এবং বর্তমান প্রেক্ষিত

দীপঙ্কর কৈবর্ত্ত্য
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
শ্রীরামপুর গার্লস কলেজ, শ্রীরামপুর, হুগলী

সারসংক্ষেপ: গণরাজ্য বা The Republic গ্রন্থে প্লেটো(Plato) "ন্যায় কী?" বা "What is Justice?" এই প্রশ্নটি দুভাবে উত্তর দিয়েছেন। প্রথমত, তিনি দেখিয়েছেন ন্যায় কী নয়। অনেক সময় লোকে ন্যায় বলতে অনেক ভ্রান্ত বিশ্বাসের অধিকারী হয়, কিন্তু তাদের কোনোটিকেই ন্যায় বলা যায় না। অতঃপর তিনি 'ন্যায় কী' তার উত্তর দিয়েছেন। 'ন্যায় হল বন্ধুর উপকার সাধন ও শত্রুর ক্ষতিসাধন' প্রচলিত এই মতটিকে প্লেটো সমালোচনা করেছেন। এখানে আমি আলোচনা করার চেষ্টা করবো 'বন্ধুর উপকার সাধন ও শত্রুর ক্ষতি সাধন' ন্যায় সংক্রান্ত প্রচলিত এই মতটি প্লেটোর দ্বারা কিভাবে সমালোচিত হয়েছে এবং সেই সমালোচনা প্লেটোর সময় থেকে বর্তমান বিশ্বের ক্ষেত্রে কতটা যথাযথ ও গুরুত্বপূর্ণ। 'বন্ধুর উপকার সাধন ও শত্রুর ক্ষতি সাধন' আসলে স্বার্থ দর্শন (Philosophy of self interest)-এর কথা বলে। আমাদের সময়ে তো বটেই, প্লেটোর সময়েও এই দর্শন ছিল রাষ্ট্রীয় শিল্পের ক্ষমতাসীন আবেগ যা রাষ্ট্রের মধ্যে এবং রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের মধ্যে তিক্ততা, দ্বন্দ্ব, ইত্যাদির সৃষ্টি করে। কিন্তু, প্লেটো দেখান ন্যায় বা Justice কেবলমাত্র বন্ধুপক্ষ ও শত্রুপক্ষ এই জাতীয় কোন শিবির তৈরি করে না, যা একে অপরের বিরুদ্ধে অনবরত যুদ্ধ করে চলবে। ন্যায় হল এক আদর্শ সদ্গুণ যা ব্যক্তিচরিত্রে এবং রাষ্ট্রচরিত্রে ফুটে উঠবে। ন্যায় মানুষকে পারস্পারিক বোঝাপড়া এবং শান্তিতে একসঙ্গে বসবাস করতে সাহায্য করবে, কখনোই দ্বন্দ্বে একসঙ্গে মৃত্যু উপতক্যার মুখোমুখি হতে বলবে না। বিশ্লেষণী পদ্ধতি বা যাকে দার্শনিক পদ্ধতি বলা হয় (Analytical Method which is Philosophical Method) সেই পদ্ধতিতেই আমরা আমাদের বক্তব্য উপস্থাপন করার চেষ্টা করবো।

মূল শব্দ: ন্যায়, ঋণ, সদ্গুণ, হিংসা, শান্তি।

(i)

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। অন্তত:, প্রত্নতাত্ত্বিকেরা আজ পর্যন্ত যে সকল তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করতে পেরেছে তা থেকে এই প্রমাণিত হয় যে, মানুষ সব সময় অন্য আরো মানুষের সাথেই থেকেছে। তাই দেখি, Aristotle বলেন, যে মানুষ সমাজে না থেকে নির্জনে থেকেছে সে হয় দেবতা না হয় পশু, মানুষ নয়। এই যে শুরু থেকে মানুষ মানুষের সাথে থেকেছে তার কারণ কী? মানুষ কি আত্মরক্ষার তাগিদে দলে থাকতে চেয়েছে,

অথবা সে কি অন্যদের কাছে দুঃখে সান্ত্বনা পেতে চেয়েছে? কারণ যাইহোক না কেন, একসঙ্গে থাকতে গিয়ে মানুষের জীবনে কিছু সামাজিক প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিয়েছে। প্রথা এবং নিয়ম গড়ে উঠেছে, যে প্রথা ও নিয়মে দলের স্বার্থ এবং দলের মধ্যে নিজের স্বার্থ রক্ষিত হয়েছে। প্রথম প্রথম এই সকল নিয়ম ইত্যাদি অলিখিত আকারেই থেকেছে, কিন্তু এক সময় এগুলো প্রথাসিদ্ধ হয়ে ওঠে ও লিখিত রূপ নেয়। এভাবেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে বলা যেতে পারে।

রাষ্ট্রের উদ্ভবের পরেও বহু শতাব্দী কেটে গেছে এবং তারপর শুরু হয়েছে আদর্শ রাষ্ট্রের খোঁজ। এই আদর্শ রাষ্ট্রের সন্ধানে মানুষ বিপ্লব করেছে, বিশ্বযুদ্ধ ঘটিয়েছে, কারণ মানুষ আদর্শ রাষ্ট্রের স্বরূপ নিয়ে সচরাচর একমত হতে পারেনি। প্রতি যুগের মানুষ নতুন করে বিতর্কে জড়িয়েছে। অতিবিখ্যাত গণরাজ্য বা *The Republic* গ্রন্থে প্লেটো (Plato) আদর্শ রাষ্ট্র বা আদর্শ মানব সমাজের রূপরেখা রচনার চেষ্টা করেছেন। এ কাজ করতে গিয়ে তিনি মানুষের কল্যাণ যা কিছুর উপর নির্ভর করতে পারে তার প্রায় প্রতিটি পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে মানুষের যৌথ সমাজ জীবন তার অন্তর্জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। মানুষের জীবনের যা কিছু ভালো আর যা কিছু মন্দ সবই বড় আকারে ফুটে ওঠে তার সমাজ জীবনের আয়নায়। সেই কারণে আদর্শের সন্ধানে মানুষের অন্তর্জীবনের বিশ্লেষণ যেমন জরুরী তেমনি সমাজ-জীবনের বিশ্লেষণও জরুরী। প্লেটো তাঁর গণরাজ্য বা *The Republic* গ্রন্থে আদর্শ মানুষ ও আদর্শ সমাজের চিত্র মেলে ধরবার চেষ্টা করেছেন।

সংলাপ আকারে রচিত প্লেটোর গণরাজ্য গ্রন্থটি দর্শনের মহাকাব্য-স্বরূপ। এখানে রাষ্ট্রনীতি, অধিবিদ্যা, জ্ঞানতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব এবং ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি সকল বিষয়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে। এ সব কিছু নিয়েই মানুষ ও তার সমাজ। কিন্তু মানুষের প্রকৃত সদ্গুণ কোনটি যা তার সমাজের আয়নায় উৎকৃষ্টরূপে প্রতিফলিত? গ্রীকেরা এ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছেন সেই প্রথম যুগ থেকেই। কেউ কেউ বলতেন মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট সদ্গুণ (Virtue) হল স্থৈর্য (endurance)। তারা গ্রীকবীর ফিদিপাসের মধ্যে সেই গুণের পরাকাষ্ঠা দেখতেন। আবার কেউ কেউ বলতেন মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ হল শৌর্য। যারা শৌর্যের উপাসক তারা থার্মোপাইলি-গিরিপর্বতের যুদ্ধে লিওনিদাস যে শৌর্যের পরিচয় রেখেছিলেন তাকেই আদর্শ দেখতেন। সক্রেটিস বলতেন মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ হল প্রজ্ঞা (wisdom)। প্রজ্ঞা না থাকলে সমস্ত প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করে মানুষ স্থির থাকবে না, কারণ স্থির থাকার জন্য চাই লক্ষ্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান। আবার প্রজ্ঞা ব্যতিরেকে শৌর্য হয়ে পড়ে অন্ধ উন্মত্ততা। কাকে ভয় পেতে হবে কাকেই বা ভয় পাওয়া চলবে না সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। প্লেটো আরো একটু ভিতরে প্রবেশ করে বলতে চেয়েছেন মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট গুণ হল ন্যায়-চরিত্র। চরিত্রের ন্যায় তাকে প্রজ্ঞা-লাভে উদ্বুদ্ধ করে, তাকে স্থৈর্য দেয়, জীবনকে সর্বোতোমুখী করে তোলে।

তাই তিনি তার গণরাজ্য বা *The Republic* গ্রন্থটি শুরু করেন এই নৈতিক প্রশ্ন উত্থাপনের মধ্য দিয়ে - ন্যায় কী?

(ii)

গণরাজ্য বা *The Republic* গ্রন্থে প্লেটো “ন্যায় কী?” বা “What is Justice?” এই প্রশ্নটি দুভাবে উত্তর দিয়েছেন। প্রথমত, তিনি দেখিয়েছেন ন্যায় কী নয়। অনেক সময় লোকে ন্যায় বলতে ভ্রান্ত বিশ্বাসের অধিকারী হয়, কিন্তু তাদের কোনোটিই ন্যায় নয়। তারপর তিনি ‘ন্যায় কী' তার উত্তর দিয়েছেন। অর্থাৎ, গ্রন্থটিতে ন্যায় সম্পর্কে নেতিমূলক ও ইতিমূলক দুপ্রকার আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

The Republic বা গণরাজ্য গ্রন্থে ন্যায় সম্পর্কে প্রথম যে বিরুদ্ধ মতটি উপস্থাপিত হয় তাঁর প্রবক্তা হলেন সিফালাস। সিফালাস বলেন, ‘ন্যায় হল কথায় ও কাজে সততা' (Justice is honesty in word and deed), যাঁর যা প্রাপ্য তাঁকে তা মিটিয়ে দেওয়া। কিন্তু আলোচনা শেষ হওয়ার আগেই সিফালাস স্থান ত্যাগ করেন এবং পুত্র পলিমার্কাস (Polemarchus)-কে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। ইতিপূর্বে দেখা গেল যে, সিফালাস তাঁর অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির কথাই বলেছেন, কিন্তু তাঁর নিজের কোন দার্শনিক যুক্তি বুদ্ধি নাই। পলিমার্কাসের মধ্যে অল্প পরিমাণে দার্শনিক চিন্তা-ভাবনা রয়েছে, যদিও অবশ্য সে চিন্তা-ভাবনা অন্যের কাছ থেকে ধার করা, তাঁর নিজের নয়।

সিফালাস বলতে চেয়েছিলেন যে, সত্য কথন ও প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়া হল ন্যায়। সক্রেটিস দেখাতে চেয়েছেন একে নিঃশর্ত ন্যায়ের নীতি বলা যাবে না, কারণ অবস্থান্তর। পলিমার্কাস বলেন, এটিই সঠিক নীতি। তিনি তাঁর যুক্তির সমর্থনে কবি সাইমনিদেসের উদ্ধৃতি দেন। অতঃপর সক্রেটিস সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

সক্রেটিস বলেন, কবিরা অনেক সময় তাদের বক্তব্য সোজা-সাপ্টা বলেন না। তাঁদের কথায় বক্রোক্তি থাকে, ব্যঞ্জনা থাকে। সুতরাং কবিদের কথার বহিরাবরণ ভেদ করে তাদের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে হয়। তাহলে কবি সাইমনিদেস প্রকৃতপক্ষে কি বলতে চেয়েছেন তা সক্রেটিস জানতে চান। পলিমার্কাস বলেন, সাইমনিদেস সরাসরি যে কথা বলেন তাহল – যার যা প্রাপ্য তাকে তা মিটিয়ে দেওয়া হল ন্যায়। কিন্তু তার প্রকৃত অর্থ হল এই যে সকলের প্রাপ্য এক নয়। আমার কাছে আমার বন্ধুর প্রাপ্য এক প্রকার ও শত্রুর প্রাপ্য আর এক প্রকার। আমার কাছে বন্ধুর প্রাপ্য হল সাহায্য ও উপকার এবং শত্রুর প্রাপ্য হল ক্ষতি বা আঘাত। অর্থাৎ সাইমনিদেসের মতে প্রাপ্য বলতে যা গচ্ছিত রাখা হয়েছে তা ফিরিয়ে দেওয়া না বুঝিয়ে আরো গভীর কিছু বোঝায়। অন্যদিকে পলিমার্কাস ন্যায় বলতে যা বোঝেন তা হল, “Justice as helping friends and harming enemies”[১]। অর্থাৎ, ন্যায় হল বন্ধুর উপকার সাধন এবং শত্রুর ক্ষতি সাধন।

অতঃপর, সক্রেটিস এই মতের অসুবিধার দিকগুলি একে একে তুলে ধরেছেন।

প্রথমত; যদি শত্রুর ক্ষতিসাধন করা ও বন্ধুর উপকার সাধন করাই ন্যায় হয় তাহলে ধরেই নেওয়া হচ্ছে যে, আমার চারপাশে দু-ধরণের মানুষ রয়েছে, যার কেউ কেউ আমার বন্ধু এবং কেউ কেউ আমার শত্রু। ধরা যাক 'ক' নামক ব্যক্তি আমার বন্ধু এবং "খ" নামক ব্যক্তি আমার শত্রু। কিন্তু 'ক' 'খ'-এর শত্রু না হয়ে বন্ধু হতে পারে। সেক্ষেত্রে আমি যদি 'খ'-এর ক্ষতিসাধন করি তাহলে তা 'ক'-এর ক্ষতিসাধন; কারণ বন্ধুর ক্ষতিসাধন মানে আমারও ক্ষতিসাধন। অর্থাৎ শত্রুর ক্ষতিসাধন করতে গিয়ে আমি বন্ধুর ক্ষতিসাধন করছি, এবং প্রকারান্তরে আমি আমার নিজের ক্ষতিসাধন করছি। প্লেটো তাই সক্রেটিসের মাধ্যমে বলেন অপরের ক্ষতিসাধন করা কোনো নীতিই নয়।

দ্বিতীয়ত; সমাজের কাউকে কাউকে আমার বন্ধু এবং কাউকে কাউকে আমার শত্রু ভাবার অর্থ হল সমাজ আমার কাছে দু-ভাগে বিভক্ত, এবং সমাজে সব সময় একটা সংঘাতের পরিবেশ রয়েছে। আমি যারই ক্ষতি করতে চাইব সেও আমার ক্ষতি করতে চাইবে, এবং সাথে সাথে আমার বন্ধুরা তার দিকে তেড়ে যাবে তার ক্ষতিসাধন করার জন্য। তার অর্থ হল, সমাজে সব সময় একটা যুদ্ধের পরিবেশ রয়েছে, এবং সে যুদ্ধ আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ। কিন্তু ন্যায়ের খোঁজ করার অর্থ হল শান্তির খোঁজ করা। অথচ, পলিমার্কাসের যুক্তি অনুযায়ী ন্যায় মানে অশান্তি।

তৃতীয়ত; যদি বলা হয়, এমন নয় যে সমাজ সব সময় অশান্ত, সমাজে শান্তিও থাকে। শত্রুর ক্ষতিসাধন করার কথা উঠেছে এই কারণে যে, কখনও কখনও সমাজে অশান্তি দেখা দেয় এবং সে সময় আমাকে আমার বন্ধুর উপকার ও শত্রুর অপকার সাধন করার কথা ভাবতে হয়। শান্তির সময়ে শুধু বন্ধুর কথাই ভাবি এবং তার উপকার করার কথাই ভাবি। কিন্তু কি ধরণের উপকার? ধরা যাক, ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা। বন্ধুর টাকা পয়সা ইত্যাদি ঠিক ঠিক গচ্ছিত রাখতে পারি। তাহলে, বন্ধুর অর্থ সম্পদ যখন কোনো কাজে লাগছে না তখন আমার ন্যায় কার্যকরী। 'অকার্যকর অবস্থায় কার্যকরী' এক বিরোধাভাস।

চতুর্থত; প্রশ্ন করা যেতে পারে, সমাজের সব মানুষকে কি আমি বন্ধু অথবা শত্রু হিসাবে দেখি? সমাজের সব মানুষকে কি চিনি বা জানি? কিন্তু কাজে কর্মে যে কোনো মানুষের সাথে আমাকে যুক্ত হতে হয়। তাহলে, যাকে আমি শত্রু হিসাবেও দেখি না বা বন্ধু হিসাবেও দেখি না তার সাথে কোন নীতিতে যুক্ত হব – ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে নাকি উপকার সাধনের উদ্দেশ্যে?

পঞ্চমত; বন্ধুর উপকার সাধন ও শত্রুর ক্ষতিসাধন এই নীতি অনুযায়ী বলতে হলে আমাকে মানতে হয় যে, আমার বিচার অভ্রান্ত। যাকে আমার বন্ধু বলে মনে হয় সে প্রকৃতই বন্ধু এবং যাকে আমার শত্রু বলে মনে হয় সে আমার প্রকৃতই শত্রু। কিন্তু মানুষ সম্পর্কে আমাদের বিচার কি সব সময় এতটাই অভ্রান্ত? যদি বিচার অভ্রান্ত না হয় আমার ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে যে লোক আমার বন্ধু সেজে হাজির হয় আমি তার

ক্ষতিসাধনের পরিবর্তে উপকারই করব। কিন্তু তা হল আলোচ্য নীতি বিরোধী। সহজ কথায়, উপকার সাধন ও ক্ষতিসাধনের নীতি নিঃশর্ত নয়। এ নীতি আদৌ যদি কার্যকরী হয় তাহলে ধরে নিতে হয় শত্রু-মিত্র শনাক্ত করার বা কে আমার বন্ধুরূপী শত্রু এবং কে আমার শত্রুরূপী বন্ধু তা বুঝে নেবার ক্ষমতা প্রত্যেক মানুষের আছে এবং সবসময়ই তা আছে। বাস্তবিক তা নয়।

ষষ্ঠত; ক্ষতিসাধনের নীতি স্ববিরোধী নীতি। একটি ঘোড়া প্রকৃতই ঘোড়া যখন তা স্বচ্ছন্দে দৌড়ায়। এই রকম ঘোড়ার একটি পা খোঁড়া করে দিয়ে আমরা তার ক্ষতিসাধন করতে পারি। তাহলে ঘোড়ার দিক থেকে ব্যাপারটা কি দাঁড়ায় – ন্যায় নাকি অন্যায়? বলতে পারি আমার দিক থেকে ন্যায় কারণ ঘোড়ার মালিক হল আমার শত্রু। কিন্তু ঘোড়ার দিক থেকে এ অন্যায় কারণ ঘোড়ার যা প্রকৃত কাজ সে কাজ করতে এক্ষণে সে অক্ষম[২]। অর্থাৎ ক্ষতিসাধনের নীতি যদি ন্যায় হয় তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই ন্যায় অন্যায়ের জন্ম দিতে বাধ্য। কিন্তু এ হল স্ববিরোধী নীতি।

বস্তুতপক্ষে, দলাদলির রাজনীতি ইত্যাদিতে এধরণের বন্ধু পক্ষ ও শত্রু পক্ষে ভাগ দেখা যায়, এবং বন্ধুকে সাহায্য ও শত্রুকে বিপাকে ফেলার চেষ্টা অনেকেই করে থাকে। কিন্তু প্লেটো বলেন ন্যায় হল এক আদর্শ সৎগুণ। বাস্তবে আমরা অনেকে অনেক সময় কি নীতি নিয়ে চলি তা দিয়ে আদর্শ সদগুণের বিচার হয় না। ন্যায় বলিষ্ঠ জীবনের নীতি এবং তা সকলের জন্য ও সমভাবে প্রযোজ্য।

(iii)

'বন্ধুর উপকার সাধন এবং শত্রুর ক্ষতি সাধন' – এটিই ছিল এই মতটির মূল কথা। কিন্তু আজকের বিশ্বে সমালোচিত হওয়া এই মতটির প্রভাবই বেশি লক্ষ্যণীয়। ধর্ম, রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক স্তরে সর্বত্রই এই মতের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। বর্তমান বিশ্বের প্রায় বহু যুদ্ধই হয়েছে ধর্মের কারণে। সেখানে এক ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষ তার নিজের ধর্মাবলম্বীকে বন্ধু হিসেবে ও অন্য ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষকে শত্রুর চোখে দেখেছে। তার নিজের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোককে সাহায্য করেছে এবং অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোককে বঞ্চিত করেছে সেই সাহায্য থেকে। এখন আমরা দেখতে পাই দুটি ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শগত দলের মধ্যে বন্ধু-শত্রুগত মনোভাব। তাছাড়াও আমরা দেখেছি দুটি মহাবিশ্বযুদ্ধ, যে যুদ্ধে যেখানে একটি দেশ অন্য দেশের সাথে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করছে অন্য কয়েকটি দেশের সাথে কেবলমাত্র যাদের সাথে মিলিত হচ্ছে তাদের বন্ধু ভাবে বলে, আর যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে তাদের শত্রু ভাবে বলে। পরবর্তীকালে অর্থাৎ আমাদের সময়ে দেখেছি ঠান্ডা লড়াই। এখানেও একদল ছিল আমেরিকার পক্ষে আর অন্যদল ছিল রাশিয়ার পক্ষে। এছাড়াও বর্তমান সময়ে রাশিয়া-ইউক্রেন বা ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন সংঘাতের মূলেও রয়েছে বন্ধু-শত্রু মনোভাব। বর্তমান বিশ্বে দেখা যাচ্ছে এক ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষ অন্য ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করছে এবং ফলস্বরূপ বিভিন্ন বিভাগ-বিদ্বেষ দেখা যাচ্ছে। সুতরাং, আজকের

পৃথিবী যখন বন্ধুপক্ষ ও শত্রুপক্ষ দুটি পক্ষে বিভিন্নভাবে ভাগ হচ্ছে এবং প্রত্যেকেই চাইছে আপন পক্ষের ভাল হোক এবং অন্য পক্ষের মন্দ হোক, আমাদের মনে হয় এমত অবস্থায় দাঁড়িয়ে মহান দার্শনিকের উক্ত মতের বিরূপ সমালোচনা খুবই প্রাসঙ্গিক এবং যুক্তিযুক্ত।

আমরা দেখলাম পলিমার্কাসের মতানুযায়ী ন্যায় মানে ‘বন্ধুর উপকার সাধন এবং শত্রুর ক্ষতিসাধন' এবং যা মানব সমাজকে দুটি শিবিরে ভাগ করে দেয়-বন্ধুপক্ষ ও শত্রুপক্ষ। কিন্তু মানব জাতির শেষ লক্ষ্য যুদ্ধ ও অশান্তি নয়। মানব জাতির শেষ লক্ষ্য ধর্ম ও সুখ। যুদ্ধ মানেই ধ্বংস, অস্থিরতা ও হারাবার ভয়। প্রত্যেকেই চায় নিজেরটাকে আঁকড়ে বাঁচতে। যদি মানুষ চিরকালই যুদ্ধে লিপ্ত থাকে, যদি যেকোন যুদ্ধবিরতিই সাময়িক এবং ভবিষ্যৎ যুদ্ধের প্রস্তুতিমাত্র হয় তাহলে লক্ষ্য চিরকাল লক্ষ্যই থেকে যায়। যে সম্ভাবনা চিরকাল সম্ভাবনাই থেকে যায় তা অসম্ভাবনারই নামান্তর। একইভাবে, যে লক্ষ্য চিরকাল লক্ষ্যমাত্র তা লক্ষ্যহীনতারই সামিল, বা যে বিকাশের ধারা অনন্ত তা অনন্ত অস্থিরতা মাত্র। মানবজাতির জীবনে চিরশান্তি বাস্তবায়িত হতে বাধ্য। তা নাহলে মানুষের গল্প হবে-‘a tale by an idiot'। কিন্তু মানুষ বিশুদ্ধ বুদ্ধির জীবন্ত বিগ্রহ, নির্বোধ নয়। অন্তবিহীন পথে এগিয়ে চলার নামই জীবন। জীবনের এই পথ অতিক্রম করতে মানুষকে বিভিন্ন বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন তো হতেই হবে, কারণ বেঁচে থাকার অপর নাম সংগ্রাম। প্রকৃতির অসাম্যের মধ্যে মানুষের সাম্য প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে এবং মানবতার জয় গান গেয়েই প্রতিনিয়ত এগিয়ে যেতে হবে আমাদের। এই সাম্য প্রতিষ্ঠার সর্বোত্তম এবং শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হল অন্য সকলের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে এবং এক হয়ে শান্তি স্থাপন। আর, শান্তি প্রতিষ্ঠা হলে ন্যায় যে এক আদর্শ সদ্গুণ তা আমরা অতিসহজেই আত্মস্থ করতে পারবো।

তথ্যসূত্র:

১. Conford, Francis Macdonald, (translate), The Republic of Plato, Oxford University Press, London,_1941, p.7.

২. Nettelship, Richard Lewis, Lecture on the Republic of Plato, Macmillon, New York, 1968, p.19.

গ্রন্থপঞ্জী:

English Books

1. Conford, Francis Macdonald, Translated with introduction and Notes, The Republic of Plato, Cambridge, 1941.

2. Nettleship, Richard Lewis, Lectures on the Republic of Plato, university Press of the Pacific Honolulu, Hawaii, 2003, reprinted.

3. Taylor, A.E., Plato: The Man and His Work, Dover Publications, INC, Mineola, New York, 2017.
4. Plato, Translated from Greek by Benjamin Jowett with an itroduction by Dhananjay Singh, Rupa publishers, New Delhi, Fourth impression, 2017.
5. Plato. The Republic, London: Penguin, 1987.
6. Lindsay, A.D. Plato: The Republic, New York, 1995.
7. Thilly, F. A History of Philosophy, Singapore, Pearson Education, 2001.
8. Stace, W.T. A Critical History of Greek Philosophy, New Delhi, Wiley Eastern Limited, 1991.

বাংলা বই

১। দে, সুধাকান্ত, গণরাজ্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মার্চ ১৯৯০।
২। ফারুক, গোলাম, প্লেটোঃ দর্শন ও রাষ্ট্রচিন্তা, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা-১১০০, পুনর্মুদ্রণ, অক্টোবর, ২০১১।
৩। করিম, সরদার ফজলুল, প্লেটোর রিপাবলিক, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-১১০০, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৪।

মতুয়া আন্দোলনে নারী মুক্তির ধারনা

পরিতোষ মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
গলসী মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: 'বিশ্বে যা-কিছু মহান্ সৃষ্টি চির-কল্যাণকর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর'(কাজী নজরুল ইসলামের সাম্য কাব্যের নারী কবিতা থেকে গৃহীত)। পৃথিবীতে নারী ও পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান সমান অথচ কমবেশি বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে নারীকে অবহেলা করা হয়েছে। নারীর অবহেলা কোন একটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। যুগে যুগে নারী ভোগ্যপণ্য বা বস্তু রূপে পরিগণিত হয়েছে। নারীদেরকে বিভিন্ন সমাজ সংস্কারক, দার্শনিক, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নানা অধিকার দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা যে সব সময় সফল হয়েছেন একথা বলা যাবে না। আজও দৈনন্দিন খবরের কাগজে নজর রাখলে বুঝতে পারি নারীরা কিভাবে শোষিত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত হচ্ছে।

বর্তমান গবেষণা পত্রে মূলত নারী মুক্তি আন্দোলনের কথা আলোচনা করব। উনবিংশ শতকে পূর্ব বাংলায় হরিচাঁদ ঠাকুরের আদর্শ ব্যাপক জনপ্রিয় হয়েছিল। হরিচাঁদ ঠাকুরের আদর্শ, কর্মপন্থা নারী জাগরণে প্রভূত উন্নতির সূচনা করেছিল। তিনি সমাজ সংস্কারের সাথে সাথে দলিত পতিত মানুষ গুলিকে একটি নতুন ধর্মীয় ভাবনা দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে যা 'মতুয়া ধর্ম' নামে পরিচিত হয়েছিল। অনেক পণ্ডিত এই ধর্মকে 'সহজিয়া ধর্ম' বলে অবহিত করেছেন। সকল মানুষের উপযোগী একটি সহজ সরল ধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন। একটি মহান আদর্শ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেই আদর্শের মধ্যে ছিল না কোন পিতৃতান্ত্রিক মাতৃতান্ত্রিক আদর্শ। তিনি এক অনন্য মর্যাদা ও আত্মসম্মানের অধিকার দিয়েছিলেন। মানব সভ্যতার প্রায় অর্ধেক নারী অর্ধেক পুরুষ উভয়েই একে অপরের পরিপূরক অথচ এই নারী নানাভাবে বঞ্চিত অবহেলিত। মতুয়া ধর্মে নারীকে অন্যভাবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই মুক্তির পথ, সেই পথের প্রতিবন্ধকতা অনুসন্ধান করব। নারীদেরকে জাগরিত করতে হরিচাঁদের সংগ্রাম, আদর্শের পুনঃমূল্যায়ন করা হবে। নারীদের দাসত্বের শৃঙ্খলা ভেঙে বেরিয়ে আসার ইতিহাস জানব।

সূচক শব্দ: হরিচাঁদ ঠাকুর, গুরুচাঁদ ঠাকুর, মতুয়া, নারী, ক্ষমতায়ন, অবিভক্ত বাংলা।

ক্ষমতায়ন হল এমন একটি গতিশীল সামাজিক প্রক্রিয়া যা নারী ও অন্যান্য পশ্চাদ্বর্তী সামাজিক গোষ্ঠিকে অধিক ক্ষমতা দানের মাধ্যমে তাঁদের কাঠামোগত অবস্থান পরিবর্তনের তথা উন্নয়নের সুযোগ করে দেয়। তাই বলা যায় ক্ষমতায়নের সাথে সার্বিক কারণেই ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতার সম্পর্ক ও ক্ষমতা বন্টনের বিষয়টি

জড়িত। ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সমাজের নারী জাতি ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মনস্তাত্ত্বিক-সাংস্কৃতিক জীবনে এমন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। যার দ্বারা এই সম্প্রদায়টি তার অবস্থার উন্নতি সাধনে সক্ষম হয়। সাম্প্রতিক কালে 2008 সালে National Human Development Report এপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে ক্ষমতায়ন হলো এমন একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া যার দ্বারা সমাজের ক্ষমতাহীন সদস্য এবং মহিলারা অধিক সুযোগ সুবিধা লাভ করে। সাথে সাথে সমাজে প্রচলিত ঊর্ধ্বতন সম্পর্ক বা বৈষম্যমূলক সামাজিক সম্পর্কের প্রচলিত ধারার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানায়।

এই জাতি পিছে নহে নারীর সম্মানে।।
বিধবা বিবাহ প্রথা এরা মান্য করে।
ব্যাভিচারী নহে তারা এ জাতির ঘরে[১]।।

মিশনারী সি এস মীড নিজে নমঃশূদ্রদের হয়ে কলম ধরেছিলেন। নমঃশূদ্র জাতি নারী জাতিকে সম্মান করতে জানে। তাঁরা নারী পুরুষকে একত্রে ধর্ম পালন করার অধিকার দিয়েছে। নমঃশূদ্র জাতি আচারে অনুষ্ঠানে খুবই উচ্চমানের। তাঁদের চণ্ডাল বলার মতো কোন তথ্য প্রমাণ নেই বলেই মীড সাহেব তার পত্রে দাবী করেছেন বড় লাটের কাছে।

নারীর ক্ষমতায়নে মূল লক্ষ্য মহিলাদের সমান মর্যাদা সমান সুযোগ ও স্বাধীনতা প্রদান করা[২]। যাতে তাঁরা নিজেদের জীবন উন্নত করে গড়ে তুলতে পারে। নারীর ক্ষমতায়নে মধ্য দিয়ে তাঁরা যাতে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করে নিজেদের তৈরি করে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে। পরিপূর্ণ আত্ম-মর্যাদার সঙ্গে জীবনের যেকোনো অবস্থার সম্মুখিন হতে পারে তা সুনিশ্চিত করা। যাতে উচ্চ শিক্ষিত হয়ে নিজের ও সন্তানের জন্য সুস্বাস্থ্য লাভের সুযোগ পায়। উৎপাদনশীল সম্পদের মালিকানা লাভ করতে পারে অর্থনৈতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ বৃদ্ধি করতে পারে। জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে পারে, নারী সমাজে আত্মবিশ্বাস আত্মসম্মান নিয়ে চলতে পারে তা সুনিশ্চিত করা। নারীর ক্ষমতায়নে শিক্ষার ভূমিকা সর্বাগ্রে শিক্ষা ছাড়া নারীর ক্ষমতায়ন ঘটতে পারে না। মহিলারা যাতে তাঁদের অধিকার সম্বন্ধে অবহিত থাকেন। প্রয়োজন হলে আইনের সাহায্য নিয়ে অবিচার অত্যাচারের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে।

বিভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন আর্থসামাজিক ও ধর্মীয় সাংস্কৃতিক পরিবেশে নানান ভাবে তারা বঞ্চিত। কোন সংস্কৃতিতে নারীর ক্ষমতায়নকে অপব্যবহার বলেই মনে করা হয়েছে। যার ফলে তাঁদেরকে কেবলমাত্র সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র ও ঘরকপ্যার কাজের লোক হিসেবে রেখে দেওয়া হয়েছে। যেখানে তাঁদেরকে গৃহস্থলীর উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয়, অথচ বিনিময়ে তাঁরা কোনো অধিকার পায় না। না আছে তাঁদের কোন পারিশ্রমিক, না দেওয়া হয় তাদের কোন সম্মান। তাঁরা গৃহে নানাভাবে অত্যাচারিত শারীরিক-মানসিক বিভিন্নভাবে তাঁরা বঞ্চিত। গৃহ থেকে একেবারে জাতীয় এমনকি আন্তর্জাতিক স্তরে পর্যন্ত অবহেলিত লাঞ্ছিত। অপরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে যা

খুবই দুর্ভাগ্যজনক। এদেরকে এই প্রতিবন্ধকতা গুলি কাটাতে হলে decision-making এর জায়গাতে নিয়ে আসতে হবে অর্থাৎ এদের কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দিতে হবে। নারী অবলা সেই ধ্যান ধারণা ভেঙে তাঁদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করতে জায়গা ছাড়তে হবে। তাঁদেরকে স্বাধীনতা দিতে হবে এবং ধর্মীয় সাংস্কৃতিক এই বেড়াজালের বাইরে বেরিয়ে আসতে হবে। তাঁদের শারীরিক গঠন বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে, এই মানসিকতা পরিহার করতে হবে এবং প্রকৃত সুযোগ দিতে হবে। এক্ষেত্রে একটা বিষয়ে প্রশ্ন কেবলমাত্র সরকারি স্তরে আইন প্রণয়ন করে এই প্রতিবন্ধকতা গুলি দূর করা সম্ভব নয়। এজন্য নারী জন্ম বা নারী সম্পর্কে যে সমস্ত ধারনা গুলি রয়েছে শাস্ত্রে অর্থাৎ তাঁদের কে বলা হয়েছে যে নারী মানেই হতভাগ্য বা মনুস্মৃতিতে বর্ণিত নারী হলো নরকের দ্বার। আরও যে সমস্ত কথা বলা হয়েছে সেগুলিকে থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। নারী মানে পিছিয়ে পড়া নারীদের কোন যোগ্যতা নেই ইত্যাদি সমস্ত বিষয়গুলি থেকেও বেরিয়ে আসতে হবে। তাহলে নারী প্রগতির যে অসুবিধা প্রতিবন্ধকতা গুলি রয়েছে সেগুলি কাটিয়ে উঠা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে কিছু প্রচলিত প্রবাদের কথা যে গুলি নিম্ন মানসিক রুচিরই পরিচয় দেয়---

সাত রাজার ধন ব্যাটা
মেয়ে গলার কাঁটা।
মেয়ে হয়ে জন্ম নিলি
আতুরেই কেন না মরলি।
যার নাই মেয়ে
সে বড়লোক সবার চেয়ে।
ব্যাটা করবে পড়াশোনা
মেয়ে শিখবে রান্নাবান্না ।
ছেলের বেলায় রুপোর থালা
মেয়ের বেলায় হেলাফেলা।
কন্যা যাবে পরের ঘরে
মানুষ করবো কি?
ব্যাটা ঘরের নীতি
স্বর্গ দেবে বাতি।
মেয়ে হলে আয়ু কমে
বাবা-মাকে টানে যমে।

এই হল আমাদের সংস্কৃতি যেখানে পদে-পদে নানান উপকথায় বাগধারায় মেয়েদের সম্পর্কে নিজ এলাকার বিভিন্ন নিম্নরুচির মানসিকতা সম্পূর্ণ অসংলগ্ন কথাবার্তা বা ইঙ্গিতের প্রকাশ ঘটেছে। যার মাধ্যমে বলা যায় একটা মেয়ে বা নারীর

ক্ষমতায়নকে নানানভাবে সংকুচিত করে দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত বাধা গুলিকে দূর করতে হবে এবং তা হলেই আগামী দিনে হয়তো নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন ঘটবে।

হরি-গুরুচাঁদ ঠাকুর মতুয়া ধর্মের প্রধান প্রাণপুরুষ 1812 সালের হরিচাঁদ ঠাকুরের এবং 1846 সালে গুরুচাঁদ ঠাকুরের জন্ম অবিভক্ত বাংলায় পতিত অন্ত্যজ নমঃশুদ্র ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের ভূমিকা বা তাঁদের আদর্শ ছিল দলিত পতিত মানুষের মুক্তির আন্দোলন। সেই আন্দোলনে নারী পুরুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ ছিল না। সারা বিশ্ব যখন নানানভাবে মানবিকতার বিসর্জন চলেছে। ঊনবিংশ শতক ভারতবর্ষের ইতিহাস তথা পৃথিবীর ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বহুল। একসময় এমন একটি পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীতে জন্মগ্রহণ করে তাঁদের আদর্শ চিন্তাধারা বা কর্মকাণ্ড ছিল অতি উত্তম। এমন একটি পরিবারে জন্মগ্রহন করেন যারা বৈষ্ণবদের অনুসারী ছিলেন। বৈষ্ণব অনুগামীদেরদের প্রায়শঃ তাঁদের বাড়িতে আসা-যাওয়ার ফলে ছোট থেকেই বৈষ্ণব ধর্মের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান লাভ ঘটেছিল। বৈষ্ণব ধর্মের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে হরিচাঁদ ঠাকুরের মনে একটা ধারণা তৈরি হয়েছিল। মানুষ মানুষকে ঘৃণা করে, মানুষ মানুষকে কিভাবে বঞ্চিত করে অবহেলায় ফেলে রাখে। সেই জন্য কিন্তু তাঁর মধ্যে ছোট থেকেই এক প্রতিবাদী মনন তৈরি হয়েছিল। শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত গ্রন্থে বারবার সে কথারই প্রতিফলন পেয়েছি। তারক গোঁসাইয়ের বিভিন্ন বিষয়গুলি ফুটে উঠেছে।

নামের তুফানে আর প্রেমের বন্যায়।
কুলনারী ঘর ছেড়ে পথেতে দাঁড়ায়।।
নামগানে জবে প্রেম বন্যা বয়ে যায়।
রামাগণ বামাস্বরে উলুধ্বনি দেয়।।
হাসে কাঁদে গলা ধরি বাহু ধরাধরি।
প্রেমে বাহ্য জ্ঞানহারা বলে হরি হরি।।
মেয়ে পুরুষেতে বসি একপাতে খায়।
মেয়েদের এঁটো খায় পদ ধূলা লয়।।

নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে যেটা আধুনিক সময়ে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করে মেয়েদেরকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার চেষ্টা হচ্ছে। সেখানে প্রায় 200 বছর আগে পিছিয়ে পড়া দলিত নমশূদ্র ঘরে জন্ম গ্রহণ করেও, হরিচাঁদ ঠাকুর যুগের তুলনায় কয়েকশো বছর এগিয়ে ছিলেন। সমাজে নারী মুক্তি আন্দোলনে তাঁর চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। তার চিন্তা-ভাবনা আজও প্রাসঙ্গিক এবং দিনে দিনে যেন তা আরও বেড়ে চলেছে। সমাজে যখন থেকে নারী পুরুষে ভেদাভেদ শুরু হয়েছে এবং তা দিনে দিনে আরও বেড়েই চলেছে। তখন কিন্তু মতুয়াবাদে নারীকে পুরুষের সমকক্ষ করে তোলার কথা বলা হয়েছে। কখনোই নারীকে হীন বা পিছিয়ে পড়া ভাবা হয়নি। এখানে এক মহান আদর্শ ইঙ্গিত দেয়।

ভেদাভেদ জ্ঞান নাই নারী কি পুরুষ[৩]।

নারী পুরুষ প্রকৃতির সৃষ্টি এবং একে অপরকে সহযোগিতা নিতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি বলেছিলেন হরিনাম করলে একে অপরের প্রতি প্রেম বাড়বে। কয়েকশো বছর আগে ভক্তিবাদী আন্দোলনেও ঠিক একই ভাবে মানুষের মুক্তির জন্য প্রেমের কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদ বিভিন্ন জায়গায় সামাজিক ব্যাধিতে স্বামী-স্ত্রী নারী-পুরুষের সমান অধিকার নেই। আজকের দিনেও দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন মন্দির প্রাঙ্গণে নারীদেরকে প্রবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। যা নিয়ে আজকেও আন্দোলন চলছে, অথচ দীর্ঘদিন আগে আদর্শ নারী-পুরুষকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একইসাথে হরিনাম কীর্তনের মাধ্যমে নিজেদের আরও এগিয়ে নিতে বলেছেন। মতুয়া ধর্মে মেয়েদের ঋতু চলাকালীন সময়ে যথাযথ পরিছন্নতা বজায় রেখে ধর্মীয় কাজে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে[৪]।

সংসার মাঝে তুই কারো দায়ী নাই।
একমাত্র দায় রইলি রমণীর ঠাঁই।।
যাও বাছা দিন রাত করগে সংসার।
শোধ দিয়ে এসো গিয়ে রমণীর ধার[৫]।

তুমি (পুরুষ) যদি কিছু ভুল করে থাক তাহলে নিজ সঙ্গী নারীর কাছে তা স্বীকার করতে বলেছেন। অর্থাৎ পারস্পরিক সম্পর্ক আরও মজবুত হবে, যদি একে অপরের নিকট ইগো না রেখে মন খুলে সম্পর্ক রাখে। সেই সম্পর্ক হবে দৃঢ় কঠিন ও ভালবাসায় মোরা।

করিবে গার্হস্থ ধর্ম লয়ে নিজ নারী[৬]।।
সমাজে পুরুষ পাবে যেই অধিকার[৭]।
নারীও পাইবে তাহা করিলে বিচার।।

নারীকে নিয়ে ধর্ম পালন করার মাধ্যমে বহুগামিতাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। নারীর ক্ষমতায়নের প্রতিবন্ধকতা হল, বাল্যবিবাহ পণপ্রথা বহু বিবাহকে ভীষণ রকম ভাবে প্রতিহত করা হয়েছে। ধর্মীয় কার্যকলাপেকে কেন্দ্র করে যে ব্যবসা চলছে তাঁর তিনি তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন নিজের ইন্দ্রিয় সংযম সবচেয়ে বড় সংযম।

দেহের ইন্দ্রিয় বস করেছে যে জন
তার দরশনে সব তীর্থ দরশন।।[৮]

আমরা জানি আমাদের ষড়রিপু সংযম করতে পারলে প্রতিটা মানুষ তাঁর মনুষ্যত্বকে জয় করতে পারবে। গৃহে থেকে নাম গান করতে তাঁর জন্য তাকে গৃহত্যাগী হতে হবে না।

গৃহেতে থাকিয়া যার হয় ভাবোদয়
সেই সে পরম সাধু জানিবে নিশ্চয়।।

এভাবে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বজায় রেখে ধর্মীয় আচরণ পালন করতে বলেছেন। নারী পুরুষের সমান অধিকার দিয়ে গেছেন। মতুয়াবাদী মধুবালার কথায়, 'আমাদেরকে ঠাকুর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছেন[৯]। হরিচাঁদের উত্তরপুরুষ রূপে গুরুচাঁদ তিনি পিতার আদর্শ কে বাস্তবায়িত করার জন্য আপ্রাণ পরিশ্রম করে গেছেন।

শুনেছি পিতার কাছে আমি বহুবার
নারী পুরুষ পাবে সম অধিকার।
সমাজে পুরুষ পাবে সেই অধিকার
নারীও পাইবে তাহা করিলে বিচার।

আদর্শ ভাবাবেগ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেই ভাবাবেগকে সার্থকভাবে প্রতিফলিত করতে এগিয়ে এসেছিলেন গুরুচাঁদ ঠাকুর। পিতার দেখানও পথে কাজ করেছিলেন। সমাজে পিছিয়ে পড়া দলিত নমঃশূদ্র জাতির পিছিয়ে পড়ার কারণ হচ্ছে তাঁদের শিক্ষা। শিক্ষাকে সবার সব থেকে বেশি অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তাই কোথাও বলেছেন যে খাও বা না খাও ছেলে মেয়েকে শিক্ষা দাও।[১০] করিতে শিক্ষা দরকার ভিক্ষা করতে বলেছেন। খাও বা না খাও তাতেদুঃখ নাই। ছেলে-পিলে র শিক্ষা দাও এই আমি চাই। ছেলেমেয়েকে দিতে শিক্ষা প্রয়োজনে করিবে ভিক্ষা। গুরুচাঁদের সময় কালে এই শিক্ষা দিতে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় অগুনতি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। বেশি মানুষের অগ্রগতির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে গিয়েও হাতে কলমে বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান করেছেন। মেয়েদেরকে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য শুধুমাত্র সমাজের সাধারণ মেয়ে নয়, যারা সমাজের বিধবা তাঁদের কেউ ক্ষমতার জন্য তাঁদের বিভিন্ন কাজ শিখিয়েছেন।[১১]

এক্ষেত্রে বিদেশি সি এস মীড এগিয়ে এসেছেন তাকে সহায়তা করতে। এবং আশ্রম তৈরি করেছেন যেখানে বিধবারা থাকতে পারবে।[১২] অর্থাৎ সমাজের বাল্যবিবাহ রোধ বহুবিবাহ রদ এবং বিধবা বিবাহ চালু করা এবং সকলকে আর্থিকভাবে সক্ষম করে তুলতে চেয়েছেন। বিভিন্ন ট্রেনিং মেয়েদের দেওয়া হত স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য। হাতে-কলমে তাঁদের (মায়েদের) শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য গঠনের জন্য বিভিন্ন হাসপাতাল তৈরির ব্যবস্থা করা হয়েছিল[১৩]। হরি-গুরুচাঁদের চিন্তাভাবনা যুগের তুলনায় অনেক এগিয়ে ছিল যা নারীর ক্ষমতায়নের পথকে মজবুত করেছিল। অর্থাৎ মতুয়া আন্দোলন একটি জাতির ধর্মীয় আন্দোলন ছিল তা নয়, এই আন্দোলন সার্বিক মুক্তি আন্দোলন। সেই জাতি বিশেষ করে যারা ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে নারীমুক্তির ক্ষমতায়ন অর্থাৎ হরিচাঁদ গুরুচাঁদের কাছে নারী পুরুষ কোন ভেদাভেদ ছিল না। হরিচাঁদ গুরুচাঁদ সাংসারিক জীবনে আদর্শ বউ-শাশুড়ির যে সম্পর্কটা নিখুঁত চিত্রায়িত করেছেন তা কল্পনার অতীত।

এখানে একটি প্রতিকী ঘটনার দ্বারা নারীর মধ্যে যে অসীম ক্ষমতা ও সম্ভবনা রয়েছে তাই প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। যখন দেশে নারী শিক্ষা সঠিক ভাবে চালু হয়নি। সেই সময় জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের জন্য একটি

প্রতিকী আদালত তৈরি করে বিচার করেছিলেন। এই প্রতিকী বিচারালয় থেকে, দুটো বিষয় পরিস্কার তিনি মেয়েদের অনন্ত সম্ভবনার দিকটি ও তাঁদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির ক্ষেত্র তৈরি করেছিলেন[১৪]।

সর্বোপরি বলা যায় হরিগুরু-চাঁদ নারীর মুক্তির জন্য যা করেছেন তা কোন গোষ্ঠী, জাতি বা কোন কালের দ্বারা বেঁধে রাখা যায় না। তাঁদের কার্যকলাপ ছিল যুগের তুলনায় অনেক বেশি অগ্রবর্তী। তাঁরা নারী ক্ষমতায়নের প্রতিবন্ধকতা গুলি চিহ্নিত করেছেন। যেমন বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, কন্যা দান, অশিক্ষা, ধর্ম সেগুলিকে চিহ্নিত করেছেন। সমস্যা গুলিকে দূর করার জন্য যথা যোগ্য ব্যবস্থা করেছেন। সাংসারিক ক্ষমতায়ন, সামাজিক, ধর্মীয় আচরণে সমানাধিকার, বাল্য বিবাহ বন্ধ, বিধবা বিবাহ, নারী ট্রেনিং স্কুল, মাতৃমঙ্গল স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করেছিলেন[১৫]। তিনি বিদেশী সি এস মীড সাহেবের সাহায্যে পতিত জাতির উন্নতির জন্য বিধবা আশ্রম তৈরি করেছিলেন। নারী জাতির মানসিক, সামাজিক, আর্থিক উন্নতির নানান পরিকল্পনা করেছেন ও তা কার্যকরী করার চেষ্টা করেছেন, যা সমান গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যসূত্র:

১. https://sites.google.com/view/srisriguruchand-charit/255

২. মতুয়া ধর্ম প্রসঙ্গে, সম্পা কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়াল, পৃ-৮৩

৩. তদেব, পৃ-২৭

৪. রেনুবালাসরকার, বয়স-২৫, পিজিছাত্র, বড়মানা, বড়জোড়া, বাঁকুড়া- ২৫.১২.২০২১ (সাক্ষাৎকার)

৫. শ্রীযুক্ততারকচন্দ্রসরকার, শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শ্রীধামঠাকুরনগর, ভারত, ১৪২৫, পৃ-১৩২

৬. ডাঃক্ষিতীশচন্দ্রবিশ্বাস, মতুয়ারাহিন্দুনয়--- কেন?, ২০০৪, কলকাতা, পৃ-১৮৫

৭. মতুয়াধর্মপ্রসঙ্গে, সম্পাকল্যাণীঠাকুরচাঁড়াল, পৃ-৪২

৮. মধুবালা সরকার,গৃহবঁধু, বয়স-৬১ বড়মানা, বড়জোড়া, বাঁকুড়া- ২৫.১২.২০২১ (সাক্ষাৎকার)

৯. C S Mead, The Nama Sudras and other Addresses, adilaide, Australia, 1911 p-27

১০. মনোশান্ত বিশ্বাস, বাংলার মতুয়া আন্দলনঃ সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি, কলকাতা, ২০১৬, পৃ-১৩২-৩৫

১১. সুকৃতিরঞ্জন বিশ্বাস, মতুয়া ধর্ম এক ধর্মবিপ্লব, কলকাতা বইমেলা-২০১৪, পৃ-২৮

১২. মতুয়া ধর্মপ্রসঙ্গে, সম্পা কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়াল, পৃ-৩০

১৩. তদেব, পৃ-৩৫

১৪. শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত, পৃ. ৩২

১৫. গুরুচাঁদচরিত, পৃ. ১৪৪।

সন্মাত্রানন্দের ‘নাস্তিক পন্ডিতের ভিটা’ : ইতিহাসের চিত্রপটে আঁকা এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর জীবনালেখ্য

কৃষাণ নমঃ
অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়, ত্রিপুরা

সারসংক্ষেপ (Abstract) : আলোচ্য গবেষণামূলক নিবন্ধে ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্বরূপ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তত্ত্ব আলোচনা এবং তার ভিত্তিতে সন্মাত্রানন্দের ‘নাস্তিক পন্ডিতের ভিটা’ উপন্যাসকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উপন্যাসটি নির্মাণের ক্ষেত্রে লেখক অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কালকে এক সূত্রে গেঁথে দিয়েছেন। কাহিনীর অগ্রসরতায় অতীতের অনেক চরিত্র মুখোমুখি হয়েছে বর্তমানের চরিত্র গুলির সাথে। একজন বাঙালি সন্তান কিভাবে মহান বৌদ্ধ ভিক্ষু অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানে পরিণত হয়েছেন, সেই ঐতিহাসিক কাহিনীকে ঔপন্যাসিক কালের পরম্পরায় এক সূত্রে গেঁথে উপন্যাসটিকে জনপ্রিয় করে তুলেছেন।
সূচক শব্দ (Key Words) : উপন্যাস, ঐতিহাসিক উপন্যাস, তিব্বতী ভাষা, অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, অবিনশ্বর নারীসত্তা।

মূল আলোচনা (Discussion)

বিশ্বজগতের সীমাহীন বিচিত্র জীবনলীলা, মানব জীবনের বহুমুখী গতিপ্রকৃতির যথাসম্ভব সমগ্র ও শিল্প সমন্বিত রূপ চিত্রিত করাই উপন্যাসের লক্ষ্য। ছোট গল্পের পরিসর যেখানে সংক্ষিপ্ত, নাটক যেখানে মঞ্চ প্রযোজনা ও অভিনয় দক্ষতার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল, উপন্যাসে সেখানে রয়েছে বিস্তৃত ন্যারেটিভ এর পরিসর; কোন বহির্মুখী উপকরণের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার প্রয়োজন ঔপন্যাসিকের নেই; তাঁর শিল্পের সংসারে তাঁর একচ্ছত্র স্বাধীনতা।E.M.Forster তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘Aspects of the Novel’-এ উপন্যাসকে একটি নির্দিষ্ট আয়তনের গদ্য কাহিনী বলে উল্লেখ করেছেন-

> “A fiction in prose of a certain extent.” [১]

উপন্যাসের সংজ্ঞা দেওয়া অসম্ভব, তবুও অনেকেই উপন্যাসকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। অষ্টাদশ শতকে ইংরেজি উপন্যাসের সূচনা পর্বের অন্যতম খ্যাতকীর্তি লেখক হেনরি ফিল্ডিং তাঁর ‘Tom Jones’ উপন্যাসে যে স্বাধীনতা দাবি করেছিলেন তার মধ্যে উপন্যাসের সংজ্ঞা নিরূপণের অসারতার ইঙ্গিত রয়েছে-

> “As I am in reality, the founder of a new province of writing, so I am at liberty to make what laws I please therein.” [২]

উপন্যাসে লেখক যখন গল্প বলেন তখন প্রায়শই তিনি বর্তমান থেকে চলে যান অতীতে, অতীত থেকে ফিরে আসেন বর্তমানে; কখনো আবার বর্তমান থেকে তাঁর মানস যাত্রা ভবিষ্যতে। অর্থাৎ ঘটনা সমূহের স্বাভাবিক কালানুক্রমে সেগুলি লেখকের কাহিনী কথনে উপস্থিত হয় না। সময়ের স্তরান্তর একটি স্তর থেকে অন্যস্তরে আসা-যাওয়ার পরিচিত ও প্রথাসম্মত ব্যবস্থা হল 'Flash back' ও 'Flash forward' এর রীতি।

সাধারণভাবে বলতে গেলে ইতিহাসের কাহিনী ও চরিত্রকে আশ্রয় করে তাঁর অতীতচারী কল্পনায় উপন্যাসিক রচনা করেন ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইতিহাসের অন্তর্লোকে উঁকি দিয়ে একটি বিশেষ যুগ ও তার কিছু নির্বাচিত ঘটনা তথা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বিধা-দ্বন্দ, আশা-নিরাশার ছায়াচ্ছন্ন দর্পণে ঔপন্যাসিক দেখে নেন নিজের ভাব ভাবনা ও সময়ের মুখটিকে।

ইতিহাস তথ্যনিষ্ঠ। তথ্য বিশেষ বা তথ্য সত্যকে প্রকাশ করাই ইতিহাসের লক্ষ্য। অন্যপক্ষে কাব্য তথা সাহিত্য তথ্যকে নিষিদ্ধ করে কল্পনায়। ইতিহাস 'বিশেষ'(particular) কে গ্রহণ ও ব্যক্ত করে; সাহিত্য 'বিশেষ'কে দেয় 'নির্বিশেষ' বা 'সামান্য'(Universal)সত্যের মর্যাদা। অ্যারিস্টটল এই কারণে 'কাব্য' বা 'সাহিত্যকে' ইতিহাসের চেয়ে উচ্চতর অবস্থানের স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই পার্থক্য থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে উপন্যাসে ইতিহাসের নিছক যান্ত্রিক ও তথ্য নির্ভর কাহিনী ও চরিত্রের বিবরণ বাঞ্ছনীয় নয়। ঐতিহাসিক উপন্যাসে তাই ইতিহাসের তথ্যসত্যকে জারিত হতে হবে সৃজনী কল্পনার প্রাণরসে। এই ভাবেই ঔপন্যাসিক সন্মাত্রানন্দ তাঁর 'নাস্তিক পন্ডিতের ভিটা' উপন্যাসে ইতিহাসের তথ্য এবং সত্য ঘটনাগুলিকে কল্পনার রসে জারিত করে পাঠক সমাজের কাছে বৌদ্ধভিক্ষু অতীশ দীপঙ্করের জীবন কাহিনীকে পৌঁছে দিয়েছেন।

অতীশ দীপঙ্করের জীবনের উপর রচিত বাংলা ভাষার প্রথম প্রামাণ্য উপন্যাস হলো 'নাস্তিক পন্ডিতের ভিটা'। হাজার বছরের প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে আজকের পৃথিবীও এই উপন্যাসের আখ্যানভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। সময়ের গলিপথে বিভিন্ন যুগের চরিত্রদের সাক্ষাৎ হয়েছে আলো আঁধারীময় পরিবেশে। অতীশের সঙ্গে জড়িয়ে গেছেন তিব্বতি চাগ লোচাবা, ৮০০ বছর আগেকার রহস্যময়ী কুলবধূ স্বয়ংবিদা, আজকের বাংলাদেশের কৃষক অনঙ্গ দাস ও তাঁর মেয়ে জাহ্নবী, মহানগর কলকাতার অনুসন্ধিৎসু যুবক অমিতায়ুধ এবং উপন্যাসের কল্পিত লেখক শাওন। তিন যুগের তিন নারীর প্রণয় কথার অনুষঙ্গে এই উপন্যাস এক অনন্য অতীশ অনুসন্ধানের ইতিবৃত্ত।'যখন বৃক্ষরাজির ভিতর দিয়ে বহে যাবে সমুষ্ণ বাতাস, নদীর উপর ছায়া ফেলবে গোধূলিকালীন মেঘ,,,,,, তখন, কেবল তখনই আমি তোমার কাছে আসবো।' এই কথা বলে হাজার বছর আগে এক নারী ডুব দেয় মৃত্যুর অনন্ত অন্ধকারে। মৃত্যু পথযাত্রী সেই নারীর মুখের অন্তিম সেই উচ্চারণের অর্থ খুঁজতে গিয়ে রাজকুমার

চন্দ্রগর্ভ হয়ে উঠলেন অতীশ, তিব্বতি পর্যটক চাগ লোচাবা আহিত হলেন ৮০০ বছর আগেকার কোন এক বাঙালি কুলবধূর পিপাসার্ত হৃদয়বিদ্যুতে, আর অধুনাকালে এক কৃষক কন্যার মধ্যে সেসব কথাই গান হয়ে ফিরে আসতে দেখলো অমিতায়ুধ। মৃন্ময়ী প্রতিমা, দারুমূর্তি আর ধাতব মূর্তি খুলে ধরেছে অতীশ চরিত্রের বহুবিধ গবাক্ষ। তবু শেষ পর্যন্ত কাট, পাথর বা ধাতু নয় দীপঙ্কর এক রক্ত মাংসের মানুষ। যার জীবনব্যাপী বিস্তৃত হয়ে আছে এক বাৎসল্যকরণ হৃদয়।

তিব্বতি ভাষায় জোবো, জোবোজে অর্থে 'প্রভু', জোবো ছেনপো অর্থে 'মহাপ্রভু'। বিগত একাদশ শতক থেকে বিংশ শতক, হাজার বছর ধরে তিব্বতের মানুষ জোবোজে, জোবো ছেনপো বলতে প্রধানত যাকে জেনেছেন ও মেনেছেন তিনি আমাদের বাঙালি বৌদ্ধাচার্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। তিব্বতে ও মঙ্গোলিয়ায় কখনো বা সংক্ষেপে অতি+ঈশ অতীশ নামেও তিনি অভিহিত।

মহাপন্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন বলেছেন, বাংলাদেশ অথবা বিহার কোথায় দীপঙ্কর জন্ম নিয়েছিলেন এ নিয়ে এক অহেতুক মতবিরোধ প্রচলিত আছে। তিনি যে ভাগলপুরে জন্মেছিলেন নির্ভরযোগ্য তিব্বতি সূত্র থেকে সন্দেহাতীতভাবে এর সংবাদ পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় তারা এই দৃঢ় সিদ্ধান্তের সমর্থনে তিনি কোন তিব্বতি সূত্র উল্লেখ করেন নি।দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান যে বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং প্রকৃত বাঙালি ছিলেন, তাঞ্জুরে সংগৃহীত গ্রন্থাবলীতে তার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। দীপঙ্করের জন্মভূমি বিক্রমপুর। নাগছো ছুলঠিম জলবা ও ঐতিহাসিক সুমপা তাঁদের রচনায় তিব্বতি হরফে বিক্রমপুর বা তার বিকৃতরূপ বিক্রমণিপুর ব্যবহার করেছেন। জনপ্রবাদ মতে পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে অতীশের আদি বাসস্থান। শশীভূষণ বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ পণ্ডিতরাও এই মত পোষণ করেন। শরৎচন্দ্র দাসের 'অতীশের জীবনী' তে দীপঙ্কর যে বাঙালি ছিলেন তার একটি সুন্দর বিবরণ আছে। তিব্বতের ঐতিহাসিকদের মতে অতীশ এর পিতা সাহোর (তিব্বতী জাহোর)-এর অধিপতি ছিলেন। এই সাহোর ওয়াডেল-এর মতে লাহোর, শরৎ চন্দ্র দাস এর মতে যশোর এবং মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে পূর্ববাংলার সাভার। দীপঙ্কর যে রাজকূলে জন্ম নিয়েছিলেন তিব্বতের ঐতিহাসিকরা এ বিষয়ে একমত।সুমপা বলেছেন, পূর্ব ভারতে জাহোরের রাজকূলে শান্তরক্ষিতের বংশে দীপঙ্করের জন্ম। দীপঙ্করের উক্তি বলে শরৎচন্দ্র দাস একটি তিব্বতী বিবরণ দিয়েছেন। দীপঙ্কর এখানে বলেছেন

"আমার সময়ে ভুইন্দ্রচন্দ্র নামে এক রাজা বাংলায় রাজত্ব করতেন।" [৩]

চন্দ্ররাজ বংশ দীর্ঘদিন বাংলায় রাজত্ব করেছিল ৯০০-১০৫০ খ্রি: মধ্যে যে ছয়জন চন্দ্রবংশীয় রাজা ও দক্ষিণবঙ্গ শাসন করেন, তাঁদের মধ্যে ভুইন্দ্রচন্দ্র নামে কোনো রাজার উল্লেখ পাওয়া যায় না। দীপঙ্কর এই সময়ে জীবিত ছিলেন। বালক চন্দ্রগর্ভের

সাথে প্রথম সাক্ষাতে আচার্য জেতারি তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে চন্দ্রগর্ভ বলেন, সেই দেশের প্রভু তার পিতা। উত্তরটি অহমিকা পূর্ণ মনে করে জেতারি বললেন,

> "আমাদের মধ্যে কেও প্রভুও নেই, দাসও নেই, তুমি যদি এই দেশের শাসকের পুত্র হও তাহলে চলে যাও" [৪]

চন্দ্রগর্ভ তখন অতি বিনীত ভাবে গুরুকে সংসার ত্যাগের বাসনা জানালেন। জেতারিও অবস্থা বিবেচনা করে চন্দ্রগর্ভ কে তার পিতার রাজ্য থেকে দূর নালন্দায় যাবার আদেশ দেন।

সঠিক কালনির্ঘণ্ট নির্দেশের জন্য গোইলোচাবার গ্রন্থটি বিশেষ প্রসিদ্ধ। গাই লোচাবা বিভিন্ন ঘটনা বিচার করে ৯৮২ খ্রি: জল-অশ্ব-বর্ষকেই দীপঙ্করের জন্মবর্ষ বলে গ্রহণ করেছেন। দীপঙ্করের জীবনের পরবর্তী ঘটনা সমূহের শোন্ তারিখের সঙ্গে ৯৮২ খ্রি: তার জন্মবর্ষ রূপে বিশেষভাবেই সঙ্গতিযুক্ত। সংক্ষেপে, রাজকুমার চন্দ্রগর্ভ, পরবর্তী জীবনে দীপঙ্কর নামে খ্যাত। ৯৮২ খ্রি: বাংলার বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। তাঁর পিতা কল্যাণশ্রী, মাতা প্রভাবতী। কল্যাণশ্রী সম্ভবত একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন রাজা ছিলেন। তিব্বতী ঐতিহ্য অনুসারে কয়েক শতাব্দি পূর্বে এবং এই বংশেই আচার্য শান্তরক্ষিত জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

সন্মাত্রানন্দ জ্ঞানপ্রভ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান কে নিয়ে লেখা উপন্যাসটি হল -' নাস্তিক পন্ডিতের ভিটা'। এটি একটি ইতিহাস শ্রয়ী উপন্যাস। হাজার বছর আগেকার বিস্মৃতপ্রায় কিংবদন্তি পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এর জীবন ইতিহাস এই উপন্যাসের আশ্রয়, কিন্তু মূল বিষয় নয়। এই উপন্যাসের মূল বিষয় হচ্ছে অবিনশ্বর নারী সত্তার প্রকাশ, যা সৃষ্টির উৎপত্তির উষালগ্ন থেকে আমাদের অস্থিমজ্জায় নিমজ্জিত হয়ে আছে।যে নারীসত্তা যুগের পর যুগ ধরে মানুষকে জয় করার, উৎসর্গ করার, অগ্রসর হওয়ার, পরিত্যাগ করার প্রেরণা যুগিয়েছে। যে মানবীসত্তা অনন্তকাল ধরে প্রেমে, দাম্পত্যে, বাৎসল্যে জীবনকে লালন করেছে, আস্বাদ করেছে এবং জন্ম-জন্মান্তরের পথ ধরে পৃথিবীর মলিন পথে ফিরে ফিরে এসেছে। সেই শাশ্বত নারীসত্তাই 'নাস্তিক পন্ডিতের ভিটা উপন্যাসের মূল বিষয়। এই উপন্যাসে কখনো সেই নারী সত্তার নাম কুন্তলা, কখনো বা বজ্রডাকিনী স্বয়ংবিদা, আবার কখনো বা গ্রামের সরল মেয়ে জাহ্নবী।

শোনা যায় অবিভক্ত বাংলার বা বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে একটি মাটির ঢিবিকে "অতীশের ভিটা "বা "নাস্তিক পন্ডিতের ভিটা" বলে লোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। কিন্তু এছাড়া তার জন্মভূমি বঙ্গদেশ তথা ভারত বর্ষ তাকে বিশেষ মনে রাখেনি। অথচ তিব্বতের ধর্ম ইতিহাস, রাজকাহিনী, জীবনীগ্রন্থ, স্তোত্র গাথা ও সর্বোপরি তাঞ্জুর নামে বিশাল শাস্ত্রগ্রন্থ সংকলন-সে দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রায় সবগুলি মাধ্যমের মধ্য দিয়ে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতের মানুষের কাছে চির স্মরণীয় হয়ে আছেন।তাই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এর মহৎ ও

বিপুল কর্মজীবন সম্পর্কে যা কিছু তথ্য প্রমাণ তা তিব্বতি সূত্র থেকে সংগ্রহ করা ছাড়া উপায় নেই। সেই সূত্র থেকেই সংক্ষেপে জানা যায়-জল-অশ্ব বর্ষে বা ৯৮২ খ্রি: বিক্রমপুরের রাজা কল্যাণশ্রী ও রানী প্রভাবতী বা শ্রীপ্রভার মধ্যম পুত্র চন্দ্রগর্ভ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথম জীবনে তান্ত্রিক অভিষেক গ্রহণ করেন, তখন তার তান্ত্রিক নামকরণ হয় জ্ঞানগুহ্যবস্তু। পরে ভিক্ষু দীক্ষা গ্রহণকালে তাঁর নাম হয় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। ভারতের বিভিন্ন বিহারে অধ্যায়ন শেষে একত্রিশ বৎসর বয়সে দীপঙ্কর সুবর্ণদ্বীপের আচার্য ধর্মকীর্তির কাছে বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যায়নের জন্য গমন করেন। সেখানে বারো বৎসর শাস্ত্র চর্চা করে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন, এবং চুয়াল্লিশ বছর বয়সে তিনি পুনরায় ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। তারপর ভারতে তিনি যে পনেরো বৎসর ছিলেন সেই সময়ে তিনি বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহারে-ওদন্তপুরী, সোমপুরী এবং বিশেষভাবে বিক্রমশীল বিহারে- অধ্যাপনা ও পরিচালনার কাজে নিযুক্ত থেকে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। তিব্বত রাজের আমন্ত্রণে ও অনুনয়ে দীপঙ্কর আটান্ন বছর বয়সে বিক্রমশীল বিহার থেকে যাত্রা করে নেপাল হয়ে তিব্বতে গমন করেন। সেদেশে রাজানুকূল্যে ও অন্তরঙ্গ শিষ্যভক্তদের সাহায্যে সমগ্র তিব্বতে মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেন। বহু মঠ মন্দির প্রতিষ্ঠা, দ্বিশতাধিক গ্রন্থ রচনা, অনুবাদ ও সম্পাদনা এবং অগণিত ভক্তবৃন্দের সমাবেশের মধ্য দিয়ে তিনি সে দেশের শ্রেষ্ঠ গুরুর সম্মান লাভ করেন। তেরো বৎসর তিব্বত বাস শেষে কাষ্ঠ-অশ্ব বর্ষে অর্থাৎ ১০৫৪ খ্রি: লাসার কাছে ঞেথাং বিহারে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রতিটি গল্পেরই একটি বিশেষ প্রকার প্রকাশভঙ্গি থাকে, এই উপন্যাসেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। ঔপন্যাসিক সন্মাত্রানন্দ সময় সম্পর্কে একটি বিশেষ ধারণা কে ব্যবহার করে এর কথন কৌশল নির্মিত করেছেন। আমরা সাধারণত জানি যে আমাদের জীবনে যা ঘটে গেছে তাই অতীত, যা এখন ঘটছে তা বর্তমান, এবং যা ঘটবে তাই ভবিষ্যৎ। ঔপন্যাসিক অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের এই ক্রমকে স্বীকার করেন না।তিনি মনে করেন অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ একই সঙ্গে প্রবাহমান। লেখক এর দৃষ্টিতে অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বস্তুত একই সমতলে অঙ্কিত পরস্পরচ্ছেদী তিনটি বৃত্তের মত। আলোচ্য উপন্যাসে এই তিনটি বৃত্তের ছেদ বিন্দু গুলির মাধ্যমে কোন কোন বিশেষ মুহূর্তে এক যুগের চরিত্র সমূহের সঙ্গে অন্য যুগের চরিত্রের সাক্ষাৎ হয়েছে। তাদের মধ্যে মতবিনিময় ও ঘটেছে। ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে অতীশ দীপঙ্কর এর বাল্য জীবন, তার খেলার সঙ্গী দৌবারিক কন্যা কুন্তলা, তার তন্ত্র সাধনা জীবন অর্থাৎ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এর রাজপুত্র চন্দ্রগর্ভ থেকে মহান জোবোজে অতীশ দীপঙ্কর হয়ে ওঠার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সেই সাথে তিনি বেশ কিছু স্থানে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। অমিতাভ, জাহ্নবী, অনঙ্গ দাস, মোতালেব মিয়া, আবু তাহের, শ্রীপর্ণা, সম্যক ঘোষ প্রভৃতি চরিত্রগুলোর ঔপন্যাসিকের কল্পনাজাত সৃজন। কুন্তলা, স্বয়ংবিদা, জাহ্নবী চরিত্রগুলোর মাধ্যমে উপন্যাসিক চিরন্তন নারীসত্তা জন্ম-

জন্মান্তরের পথচলাকেই দেখিয়েছেন। এই উপন্যাস পড়তে পড়তে আমাদের মেরুদন্ডে যেন রহস্যের বিদ্যুৎ শিহরণ দিয়ে যায়। উপন্যাসিক যেভাবে অমিতায়ুধ, চাগ লোচাবার মাধ্যমে দীপঙ্করের তিনটি তারা দেবীর মূর্তির সন্ধান করেছেন তাতে মনে হয় আমরা কোনো গোয়েন্দা গল্পের গভীরে অবগাহন করছি। আলোচ্য উপন্যাসে বহুবিধ ও চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। এই উপন্যাসে সর্বমোট চুয়াল্লিশ টি পরিচ্ছেদ রয়েছে। এই চুয়াল্লিশটি পরিচ্ছেদ চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। যথা- পূর্ব পীঠিকা, দক্ষিণপীঠিকা, পশ্চিমপীঠিকা এবং উত্তর পীঠিকা। পূর্ব পীঠিকাতে মত বারোটি পরিচ্ছেদ, দক্ষিণপীঠিকা তে মোট বারোটি পরিচ্ছেদ, পশ্চিমপীঠিকা তে মোট কুড়িটি পরিচ্ছেদ এবং উত্তরপীঠিকা দিয়ে উপন্যাসের উপসংহার টানা হয়েছে।

উপন্যাসে অতীত দিনের দুটি সময় পর্বকে তুলে ধরা হয়েছে। যথা 'দশম - একাদশ শতক (৯৮২-১০৫৪খ্রি), এবং 'ত্রয়োদশ শতক (১২০০-১২৫০খ্রি)। প্রথম পর্ব ও দ্বিতীয় পর্বের মধ্যে ২০০ বছরের পার্থক্য রয়েছে। উপন্যাসে বর্তমান কাল হিসাবে আমরা একবিংশ শতককে পাই। ঔপন্যাসিক অতীত এবং বর্তমান কালের বিবরণ দিতে গিয়ে উপন্যাসে বহুবিধ চরিত্রের পরিচয় দিয়েছেন।

উপন্যাসে অমিত বাংলাদেশে আসে এবং অনঙ্গ দাসের বাড়িতে যায় সেখানে সে একটি বাক্স খুঁজে পেয়েছিল। সেখানে জাহ্নবীর সাথে অমিতের দেখা হয়। তারপর অমিত মোতালেব মিয়ার বাড়িতে থাকতে যায়, এবং সেই বাড়িতেই অমিত অতীশ দীপঙ্করের জীবনের সাথে জড়িত ব্রোঞ্জের তারা দেবীর মূর্তি এবং কাঠের তারা দেবীর মূর্তির সন্ধান পায়। কুন্তলার মৃত্যুর পর চন্দ্রগর্ভ ভগবান বুদ্ধকে স্বপ্নে দেখেন এবং তখন তিনি ওদন্তপুরী বিহারে চলে এসেছেন। সেখানে তিনি আচার্য শীল রক্ষিতের কাছে শ্রামণ্য দীক্ষায় দীক্ষিত হন।আচার্য শীলরক্ষিত উৎফুল্ল কণ্ঠে বলেন-

> "চন্দ্রগর্ভ নামে আর কেউ নাই। গুহ্যজ্ঞানবজ্রেরও অবসান হল... কেবল নিজ হৃদয়কন্দরকে আলোকিত করাই পর্যাপ্ত নয়,,, সব্বে অত্তা সুখিনা হত্ত। এ ধরিত্রী অজ্ঞানতিমিরে সমাচ্ছন্ন, সুচিরকালব্যাপী প্রসুপ্ত। কিন্তু এই তমসাচ্ছন্ন ধরিত্রীকে অজ্ঞাননিদ্রা হতে প্রতিপ্রবুদ্ধ করবে কে? আমার বিশ্বাস, তুমিই তা পারব। কারণ, চিরজাগ্রত জ্ঞানদীপ তোমারই হৃদয়কন্দরে সতত দেদীপ্যমান! আজ থেকে তোমার নাম- দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান!" [৫]

এইভাবে তিনি রাজকুমার চন্দ্রগর্ভ থেকে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নাম ধারণ করেন। মোতালেব মিয়ার বাড়িতে থাকাকালীন অমিত দুটি মেয়েকে দেখতে পায় একটি জাহ্নবী এবং অপরটি আলতাফ চাচার মেয়ে আছরফি। অমিত জাহ্নবীর গলায় একটি গান শুনতে পায় সেটি হল-

> "গাছগাছালির ভিতর দিয়া বইয়া যে যায় বায়। ম্যাঘনা নদীর বুকের উপর অস্তম্যাঘের ছায়। ফুলের পরাগ উইরা পড়ে সাঁঝেরো হাওয়ায়।

> ঢেউয়ের তালে মাতাল অইয়া নাও যে ভেসে যায়।। আঁধার দিশা আলোক অইলে নয়নতারায়। দ্যাহ হাড়ের মালা আমি পড়ছি গো খোঁপায়।। এমুন যহন অইব তহন শুন হে শ্যামরায়, ফিরা্যা পাইব তুমার বুকে তুমারো রাধায়।।" [৬]

গানটি অমিতের খুব চেনা মনে হয়। হঠাৎ তার মনে পড়ে গানের কথাগুলো অমিত সেদিন স্বপ্নে শুনেছে আচার্য শ্রীভদ্রের কাছে। অমিত জাহ্নবীকে জিজ্ঞেস করে এই গান সে কোথায় শুনেছে? জাহ্নবী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায় এবং বলে-

> "গাইছি তো।বহুতবার গাইছি।কত শিশুর মা অইছি, তাগো শিয়রে বইয়া হেই গান গাইয়া ঘুম পারাইছি। আমার মনের মানুষ ঘরে আইলো না দেইখা বর্ষারাতে হুইয়া হুইয়া নিজের মনে হেই গান গাইছি।চক্ষু জলে ভাইসা গেছে। কত বাপের গলা ধইরা হেই গান গাইয়া আবদার করছি। কত্তোবার হেই গানডা গাইতে গাইতে সোয়ামীর বুকে মাথা থুইয়া ঘুমাইছি। বহুতবার গাইছি। আরো বহুত গামু।" [৭]

তারপর জাহ্নবীকে তার বাবা কুন্তলা নামে ডাকে, অমিত অবাক হয়ে যায়। বলাবাহুল্য ঔপন্যাসিক জাহ্নবীকে কুন্তলার পরজন্ম রূপে চিহ্নিত করেছেন। এটিই তার জায়া রূপ। মোতালেব মিয়ার বাড়িতে অমিত আবিষ্কার করে একটি গোপন সুরঙ্গ। এই সুড়ঙ্গের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে অমিত আবিষ্কার করে শ্বেতপাথরের তারা দেবীর মূর্তি,

এই মূর্তিটিই চন্দ্রগর্ভ এবং কুন্তলা বাল্যকালে পূজা করতেন। অমিত আরেকটি পুঁথি আবিষ্কার করে তার নাম 'করণকুন্তলকথা'। এইভাবে অমিত মোট দুটি মূর্তি আবিষ্কার করে।

অতীশ সুবর্ণ দ্বীপে শিক্ষা গ্রহণের জন্য যান। আচার্য ধর্মকীর্তি অতীশকে বলেন তার শিক্ষাগ্রহণ সমাপ্ত হলে তিনি অতীশকে একটি কাঠের তারা দেবীর মূর্তি প্রদান করবেন।তিনি কথা মত অতীশকে একটি কাঠের মূর্তি দান করেন। অতীশ তিব্বত যাত্রার পূর্বে এই কাঠের মূর্তি টি বাংলাদেশের অর্থাৎ তৎকালীন সমতটের বজ্রাসন বিহারে পাঠিয়েছিলেন সেই বজ্রাসন বা বাজাসন দীপঙ্কর এর জন্মস্থান বজ্রযোগিনী গ্রামের খুব কাছেই ছিল। বজ্রাসন বিহারের ভিক্ষুরা কাঠের মূর্তি টি দীপঙ্করের জন্ম ঘরে স্থাপন করে পূজা করতেন। 'করণকুন্তলকথা' পুঁথিতে একটি শ্লোক ছিল-

> "একটি রূপ আমি দেখেছি, আরো দুটি রূপ
> বজ্রযোগিনীতে সূতিকাগৃহ এর কাছে আছে।" [৮]

'করণকুন্তলকথা' একটি কাব্য। কাব্যটি সুমধুর তোটক ছন্দে প্রণীত। কাব্যের শেষে ভনিতা সূচক পদে এই কাব্যের রচয়িত্রীর নাম পাওয়া যায়। সেটি এক রমণীর রচনা, নাম কুন্তলা। এই কাব্যের নায়িকার নামও 'কুন্তলা এবং নায়ক 'করুণ'। কাব্যের আরম্ভে রাজা মহীপালের বন্দনা আছে। তারপরে আছে চন্দ্রবংশীয় নৃপতিদের কথা। সম্ভবত পাল যুগে হরিকেলে এবং বঙ্গে যখন চন্দ্র বংশের রাজত্ব চলছে এই কাহিনী

সেইসময়ের ইতিহাস থেকে নেওয়া। এ যেন সম্পূর্ণ রাজকুমার চন্দ্রগর্ভ এবং দৌবারিক কন্যা কুন্তলার আখ্যান। আলোচ্য উপন্যাসে একবিংশ শতকে আমরা পাই শাওন বসু চরিত্রকে। আমরা ধরে নিচ্ছি এই শাওন বসুই হচ্ছেন আমাদের ঔপন্যাসিক। তিনি আবিষ্কার করেন যে কুন্তলার বেঁচে থাকার সময় এর সব কথা এই পুঁথিতে রয়েছে তা স্বাভাবিক, কিন্তু কুন্তলার আত্মবিসর্জনের পরে 'করুণ' এর জীবন বৃত্তান্ত কে এই পুঁথিতে লিপিবদ্ধ করল? শাওন ভাবলো যে কুন্তলা হয়তো জাতিস্মর রূপে পরজন্মে করুণ এর সব কাহিনী এই পুঁথিতে রচনা করে গেছেন।

কুন্তলার কথামতই মধ্য তিব্বতে থাকাকালীন অতীশ এর সাথে সাক্ষাত হয় এক বৌদ্ধ ভিক্ষুণীর, তার নাম 'জিতসুমনা'। সেই ভীক্ষুণী অতীশকে শ্বেত তারার ধাতুনির্মিত ক্ষুদ্র এক প্রতিমা প্রদান করেন। অতীশ সেই মূর্তিটিকে কাষ্ঠ পেটিকার ভিতর স্থাপন করলেন একটি জপমালা, সেই পুঁথি এবং তারা মূর্তিটিকে পাশাপাশি রাখেন অতীশ। পুঁথিটি বিষয়ে বলাবাহুল্য যে- পুঁথিটির নাম দেন অতীশ 'অবকাশকৌতুকী'। এই পুঁথিটি স্বয়ং অতীশের শ্রী হস্তলিখিত।তিনি এই পুঁথিতে তার দিনলিপি লিখে রাখতেন। সেইদিন অতীশ থোলিং বিহার থেকে বাইরে আসেন এবং সেখানে তিনি সাক্ষাৎ করেন কুন্তলার কন্যা রূপকে। প্রকৃতির রূপ দেখে তার মনে পড়লো কুন্তলা সেই মৃত্যুকালীন গাঁথা-

> “যখন বৃক্ষরাজির, ভিতর দিয়ে বহে যাবে সমুফ বাতাস,
> নদীর উপর ছায়া ফেলবে গোধূলিকালীন মেঘ,
> পুষ্পরেণু ভেসে আসবে বাতাসে,
> আর পালতোলা নৌকা ভেসে যাবে বিক্ষিপ্ত স্রোতধারায়...
> সহসা অবলুপ্ত দৃষ্টি ফিরে পেয়ে তুমি দেখবে-
> আমার কেশপাশে বিজড়িত রয়েছে অস্থিনির্মিত মালা:
> তখন,..., কেবল তখনই আমি তোমার কাছে আসব...
> এরূপে নয়। এ ভাবে নয়। এখানে আর নয়।" [৯]

অতীশ এক তিব্বতী বালিকার মধ্যে কুন্তলার কন্যা রূপটি দেখেছিলেন। সেই বালিকার নাম 'ইয়ংচুয়া'। সেই বালিকা অতীশকে একটি কশেরুকা মালা দান করেন। অতীশ শে মালা চাগ লোচাবাকে দান করেন এবং সেই চন্দন কাঠের বাক্স প্রদান করেন। তিনি লোচাবাকে বলেন বাক্সটি যেন সে নালন্দা বৌদ্ধ বিহারে দিয়ে যায়। চাগ সেই বাক্সটি নালন্দা তে দান করেন এবং দুশো বছর পরের পৃথিবীতে চলে যান। সেখানে স্বয়ংবিদাকে সেই কশেরুকা মালা দান করেন এবং স্বয়ংবিদার মধ্যে চাগ কুন্তলার প্রণয়িনী রূপ কে দেখতে পান। নালন্দা বিহার থেকেই সেই বাক্সটি বিক্রমপুরে লোচাবাই আবার নিয়ে আসে। স্বয়ংবিদাই পরজন্মে জাহ্নবী রূপে অমিতের কাছে জায়া রূপে ধরা দেয়।জাহ্নবীর বাবা অনঙ্গ দাস চাষবাস করতে গিয়ে সেই চন্দনকাঠের বাক্সটি উদ্ধার করেন এবং অমিত সেই বাক্সের সাথে সম্পর্কিত অতীশ দীপঙ্করের

জীবন ইতিহাসকে প্রকাশ করেছে। বাক্স দানকালে চাগ অতীশকে প্রশ্ন করেন যে বাক্স মধ্যস্থ মূর্তিটির কি আর অতীশ এর প্রয়োজন নেই, তিনি কেন বাক্সটি নালন্দা বিহার কে দান করছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে অতীশ বলেন-

> "না, আমার আর প্রয়োজন নাই।আজ দ্বিপ্রহরে এক বালিকাকে দর্শন করে, তার অনাবিল স্নেহের স্পর্শ পেয়ে আমি বুঝেছি,আমি কাষ্ঠ মৃত্তিকা, বা ধাতু নই: আমি মানুষ। আমি শুধু স্নেহ বুভুক্ষু অপার এক সত্তা। শুধু সকাতর এক মাতৃহৃদয়। যে মাতৃহৃদয় যুগে যুগে তার কনিষ্ঠা কন্যা ধরিত্রীর সন্তপ্ত বক্ষের উপর আকাশের বারিবিন্দুর মতন ঝড়ে পড়ে,,, অপেক্ষা যার শেষ হয় না, বারবার পেয়েও বারবার যে হারায়,,, আবার ফিরে পাবার জন্য অন্য কোনও আকাশে নীলনীরদরূপে দেখা দেয়, বরিষধারার মতোই বারবার ফিরে ফিরে আসে,,, আমি সেই আবর্তমান উচ্ছ্বসিত কারুণ্যব্যাকুলতা।" [১০]

চাগ দেখেন যে এই বাক্সটি হুবহু সেই বাক্স যেটি নালন্দা থেকে আচার্য শ্রীভদ্র তাকে দিয়েছিলেন দুইশত বছর পরে, এবং তিনি সেই পেটিকাটি নিয়ে যান বিক্রমপুরে এবং বর্তমানে সেট আছে বজ্রডাকিনী স্বয়ংবিদার কাছে। এই বাক্সটি বহু বছর পর একবিংশ শতকে অনঙ্গ দাস পুনরায় আবিষ্কার করেন।

আলোচ্য উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সন্মাত্রানন্দ বৌদ্ধ পন্ডিত অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এর সম্পূর্ণ জীবন ইতিহাস কে তুলে ধরেছেন। রাজকুমার চন্দ্রগর্ভ থেকে কিভাবে তিনি আচার্য অতীশ দীপঙ্করে উন্নীত হয়েছিলেন তার বিবরণ আমরা এই উপন্যাসে পাই। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান দীর্ঘ জীবন পথ পাড়ি দিয়েছেন- বিক্রমণিপুর, ওড্ডিয়ান প্রদেশ, ওদন্তপুরী বিহার, সুবর্ণদ্বীপ, বিক্রমশীল বিহার, নেপালের কাষ্ঠমণ্ডপ, মানস সরোবর, থোলিং বিহার হয়ে অন্তহীন যাত্রা করেছেন তিনি। এই যাত্রা পথে তিনি কখনও রাজপুত্র, কখনো তান্ত্রিক শ্রমন, বিদ্যার্থী, অধ্যাপক, উপাধিবারিক, অভিযাত্রী বিভিন্ন পরিচয়ে পরিচিত হয়েছেন। কুন্তলা, অদ্বয়বজ্র, শীলরক্ষিত, ধর্মকীর্তি, ভিক্ষু মৈত্রী, বীর্ঘ সিংহ বিনয়ধর, আরো অনেক গণনাতীত চরিত্রের সংস্পর্শে তিনি এসেছেন। প্রত্যেকটি মানুষ যেন একএকটি দূরহ শাস্ত্র।

ঔপন্যাসিক দীপঙ্করের জীবনেতিহাস কে জনসমক্ষে তুলে ধরতে গিয়ে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালের অভাবনীয় সংমিশ্রন ঘটিয়েছেন। কল্পনার কল্পলোকে তিনি আশ্চর্য রকম ভাবে অতীতের কোনো চরিত্রের সাথে বর্তমান বা ভবিষ্যতের সাক্ষাৎ করিয়েছেন। সৃষ্টি করেছেন কাল্পনিক চরিত্র সমূহ। যেই চরিত্রগুলো উপন্যাসের কাহিনী কে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে গেছে। এই উপন্যাস আমাদের বয়ে নিয়ে যায় কল্পনার কল্পলোকে। কল্পনার সংমিশ্রণে আমরা মুখোমুখি হই এক কিংবদন্তির জীবন ইতিহাসের সাথে। ত্রিকালের সংমিশ্রণে সন্মাত্রানন্দের এই উপন্যাস বাংলা ভাষায়

রচিত অতীশ দীপঙ্করের জীবনী নির্ধারিত প্রথম প্রামাণ্য উপন্যাস হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। উপন্যাসিক বলেছেন-

> "অতীশ দীপঙ্করের জীবনের উপর রচিত বাংলা ভাষার প্রথম প্রামাণ্য উপন্যাস। হাজার বছরের প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে আজকের পৃথিবী ও জড়িয়ে আছে উপন্যাসের আখ্যানভাগে। সময়ের গলিপথে বিভিন্ন যুগের চরিত্রদের সাক্ষাৎ হয়েছে আলো-আঁধারিময় পরিবেশে। অতীশের সঙ্গে জড়িয়ে গেছেন তিব্বতি চাগ লোচাবা, আটশো বছর আগেকার রহস্যময়ী কুলবধূ স্বয়ংবিদা, আজকের বাংলাদেশের কৃষক অনঙ্গ দাস ও তাঁর মেয়ে জাহ্নবী, শহর কলকাতার অনুসন্ধিৎসু যুবক অমিতায়ুধ এবং উপন্যাসের কল্পিত লেখক শাওন। তিন যুগের তিন নারীর প্রণয় কথার অনুষঙ্গে এই উপন্যাস এক অনন্য অতীশ অনুসন্ধানের ইতিবৃত্ত।" [১১]

তথ্যসূত্র

১) চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল, আগস্ট ১৯৯৫, 'সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ২৩১
২) তদেব, পৃ. ২৩১
৩) চট্টোপাধ্যায়, অলকা, ভাদ্র ১৩৫৯ বং, 'অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান', কলকাতা, নবপত্র প্রকাশন, পৃ.৩৬
৪) তদেব, পৃ.৩৬
৫) সম্মাত্রানন্দ, নভেম্বর ২০১৭, 'নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা', কলকাতা, ধানসিঁড়ি, পৃ.৭২
৬) তদেব, পৃ. ৭৮
৭) তদেব, পৃ. ৮৩
৮) তদেব, পৃ.৮৩
৯) তদেব, পৃ.৫৩
১০) তদেব, পৃ.৩৩৯
১১) তদেব, পৃ. ১

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ:-

সম্মাত্রানন্দ, নভেম্বর ২০১৭, 'নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা', কলকাতা, ধানসিঁড়ি

সহায়ক গ্রন্থ

১) চট্টোপাধ্যায়, অলকা, ভাদ্র ১৩৫৯ বং, 'অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান', কলকাতা, নবপত্র প্রকাশন
২) চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল, আগস্ট ১৯৯৫, 'সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং প্রাইভেট লিমিটেড।

মেঘনাদবধ কাব্য চর্চার বিবর্তন : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিবেদিতা গুহ
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
শিলিগুড়ি কলেজ

সারাংশ: বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন এবং তাঁর 'মেঘনাদবধ কাব্য' যতটা আলোচিত-সমালোচিত হয়েছে, তা এক ধরনের ব্যতিক্রম। আসলে মেঘনাদবধ তৎকালের বাংলা সাহিত্য ও সমাজের জন্য ছিল একটি জ্বলন্ত ধূমকেতু যার আলোক ছঁটায় তৎকালের পাঠক এবং বিদগ্ধ সমালোচক সকলেই হতবম্ব হয়ে পরেছিলেন। কিছু সমালোচক মেঘনাদবধের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেন, আবার অনেক সমালোচক তাঁর নিন্দা করতে গিয়ে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়লেন। এই সব নিন্দা ও প্রশংসার মধ্যে এমন সমালোচকও কেউ আছেন যিনি জীবনের প্রথম লগ্নে যৌবনের অসীম শক্তিতে মেঘনাদবধের যারপর নাই নিন্দা করলেন তারপর জীবন যখন এগিয়ে চলেছে, তখন অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে, আরো প্রাজ্ঞ হয়ে নিজের তৈরি করা নিন্দার বাণীমন্দিরের দিকে তাকিয়ে লজ্জায় আপন ভুল অকপটে স্বীকার করে সেই মেঘনাদবধ এবং তাঁর স্রষ্টাকে শত কোটি প্রণাম জানালেন বারবার। হ্যাঁ, আমরা শ্রেষ্ঠ বাঙালি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাই বলছি যিনি ভারতী পত্রিকায় ১২৮৯ ভাদ্র সংখ্যায় তাঁর ষোলো বছর বয়সে বললেন- "আমি মেঘনাদবধের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লইয়া সমালোচনা করিলাম না- আমি তাহার মূল লইয়া তাহার প্রাণের আধার লইয়া সমালোচনা করিলাম, দেখিলাম তাহার প্রাণ নাই। দেখিলাম তাহা মহাকাব্যই নয়।" তারপর সময় যখন এগোল কালেরই অভিপ্রায়ে তাঁর চিন্তার বদল ঘটল এবং বললেন- "ইতিপূর্বে আমি অল্প বয়সে স্পর্ধার বেগে মেঘনাদবধের একটি তীব্র সমালোচনা লিখিয়াছিলাম, কাঁচা আমের রসটা অম্লরস, কাঁচা সমালোচনাও গালিগালাজ।" (জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের ভারতী, আষাঢ়, ১৩১৮) এবং শেষ পর্যন্ত তিনিই স্বীকার করলেন- "... মেঘনাদবধ কাব্য বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাব্য।" (আত্মপরিচয়, বৈশাখ, ১৩১৯)।

মূল শব্দ: মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মেঘনাদবধ কাব্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আলোচনা-সমালোচনা, ভাবনার বিবর্তন, সাহিত্যের নবত্ব, মহাকাব্য।

মূল প্রবন্ধ:

বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন ও তাঁর অমর সৃষ্টি 'মেঘনাদবধ কাব্য' আক্ষরিক অর্থে সর্বকালের একটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ হয়ে রয়ে গিয়েছে। উনিশ শতকের বাংলাদেশে নবজাগরণের যে জোয়ার উঠেছিল তার একটি মণ্ডিত সাহিত্যিক রূপ যদি প্রথম কিছু থেকে থাকে তবে তা মধুসূদনের অমর সৃষ্টিগুলি এবং এই সৃষ্টিগুলির মধ্যেও

মেঘনাদবধ কাব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার এক স্বতন্ত্র কহিনূর। এই 'মেঘনাদবধ কাব্য' ১৮৬১ সালে যখন প্রকাশ পেল তখন থেকেই বাঙালির চোখ সেই হীরক দ্যুতির আলোক ছঁটায় বিহ্বল হয়ে পরেছিল। মেঘনাদধ বধ কাব্যের পাঠকও যেমন তৎকালীন প্রায় গোটা শিক্ষিত বাঙালি সমাজ তেমনি এর সমালোচকের সংখ্যা বিস্ময়াপন্ন করার মতোই। বঙ্কিমচন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে একালের তাবড় তাবড় শিক্ষিত বাঙালি জনমানস এই কাব্যের আলোচনা সমালোচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। মধুসূদনের প্রায় সমসাময়িক বঙ্কিমচন্দ্র তো মধুসূদনকে একালের কাণ্ডারী রূপেই গ্রহণ করে নিলেন এবং বললেন- "কাল প্রসন্ন ইউরোপ সহায় সুপবন বহিতেছে দেখিয়া, জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও তাহাতে নাম লেখ- 'শ্রীমধুসূদন'[১] কিন্তু মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যকে যিনি আলোচনা-সমালোচনার মধ্য দিয়ে আত্মস্থ করে সম্পূর্ণ ও বিপরীত মেরুতে গিয়ে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন তিনিই ১৮৬১ সালেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি বিশ্বের দরবারে বাঙালির শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ ১২৮৮ থেকে শুরু করে ১৩৩৫ পর্যন্ত সময়কালে বারবার এই কাব্যের দিকে ফিরে তাকিয়েছেন এবং এই কাব্যের নতুনত্ব-সৌন্দর্য, সৃষ্টিশীলতাকে নতুন ভাবে আবিষ্কার করে বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। আমরা রবীন্দ্রনাথের এই সারাজীবন ধরে মেঘনাদবধ কাব্যে চর্চার মূল সুরটিকে নিজেদের মতো করে চিনে নিতে চেষ্টা করব।

অধ্যাপক উজ্জ্বলকুমার মজুমদার সম্পাদিত 'মেঘনাদবধ কাব্যচর্চা' গ্রন্থে তিনি অন্যান্য সমালোচক ও সম্পাদক সহ রবীন্দ্রনাথেরও 'মেঘনাদবধ কাব্য' চর্চার একটি সমীক্ষা তুলে ধরেছেন। তবে তাঁর চর্চাকে যথার্থ সম্মান জানিয়েও আমরা প্রথমে একটু সংযোজনের পক্ষপাতী। উজ্জ্বলকুমার মহাশয় রবীন্দ্রনাথের মেঘনাদবধ কাব্য চর্চার অধ্যায়ে সময়ের ক্রমে সংযোজন করেছেন এবং তিনি শুরু করেছেন রবীন্দ্রনাথের ষোল বছর বয়সে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম প্রবন্ধটি দিয়ে যার শিরোনাম, ‘মেঘনাদবধ কাব্য’, প্রকাশ কাল ১২৮৯ ভারতী, ভাদ্র সংখ্যায়। এই দীর্ঘ প্রবন্ধে ষোলো বছরের রবীন্দ্রনাথ তার অগ্রজ এবং সব থেকে উজ্জ্বল কবির রচিত শ্রেষ্ঠ কাব্যের ভাব-ভাষা-ছাঁদ-ছন্দ-চরিত্র-চিত্র এবং পুরাণের নব নির্মাণকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আলোচনা সমালোচনা করলেন। রাবণের ক্রন্দন থেকে শুরু করে ভাষার কৃত্রিমতা কোনো কিছুই তাঁর কাছে খুব একটি গ্রহণযোগ্য ছিল না। ছন্দের যে নবত্ব মধুসূদন আনলেন তাতেও নানান ত্রুটি কিশোর রবীন্দ্রনাথ খুঁজে বার করেন। তারপর নির্দ্বিধায় বলেন- "আমি মেঘনাদবধের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লইয়া সমালোচনা করিলাম না- আমি তাহার মূল লইয়া, আমি তাহার প্রাণের আধার লইয়া সমালোচনা করিলাম, দেখিলাম তার প্রাণ নাই। দেখিলাম তাহা মহাকাব্যই নয়।"[২]

এই প্রবন্ধে তিনি মেঘনাদবধ কাব্যের ভাবগত ও শিল্পগত সব দিক খুঁটিয়ে আলোচনা করেছেন। রাবণ সহ সমস্ত চরিত্রের দুর্বলতা তার কাছে বড় দৃষ্টিকটু মনে হয়েছে। তিনি মধুসুদনের ‘great fellow’ রাবণ চরিত্র সম্পর্কে বলেছিলেন- “রাবণকে

কি-মন্দোদরী বলিয়া ভ্রম হইবে না? কোথায় রাবণ ‘বীরবাহুর মৃত্যু শুনিয়া পদাহত সিংহের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিবেন, না সভাসুদ্ধ কাঁদাইয়া কাঁদিতে বসিলেন।... রাবণের সহিত যদি বৃত্রসংহারের বৃত্রের তুলনা করা যায় তবে স্বীকার করতে হয় যে, রাবণ অপেক্ষা বৃত্রের মহান ভাব আছে।”[৩] আবার মেঘনাদবধ কাব্যের ছন্দ সম্পর্কে তাঁর মত খুব একটা উচ্চমানের ছিল না। তিনি এই ছন্দকে বাংলা ভাষার প্রাণের স্পর্শহীন এক ধরনের কৃত্রিম ছন্দ বলে মনে করতেন। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রসঙ্গে তার প্রধান অভিযোগের মধ্যে একটি অভিযোগ হল এর কৃত্রিমতা। রবীন্দ্রনাথ বলেন- “সমস্ত মেঘনাদবধ কাব্যে হৃদয়ের উচ্ছ্বাসময় কথা অতি অল্পই আছে, প্রায় সবগুলিই কৌশলময়।”[৪]

এছাড়াও 'মহাকাব্য লিখতে গিয়ে যে গীতিকাব্যের মূর্ছনা তাতে ধ্বনিত হয়েছে তাও রবীন্দ্রনাথের কাছে শৈল্পীক ত্রুটি বলেই মনে হয়েছে। মহাকাব্য সম্পর্কে কিশোর রবীন্দ্রনাথ নিজের মতো করে আলোচনা করেন তিনি মেঘনাদবধ কাব্য সম্পর্কে বলেন- "এই জন্যই আমরা মহাকাব্যের সর্বত্র চরিত্র বিকাশ, চরিত্রমহত্ব দেখতে চাই! মেঘনাদবধের অনেক স্থানেই হয়তো কবিত্ব আছে, কিন্তু কবিত্বগুলির মেরুদণ্ড কোথায়?"[৫] সমস্ত কাব্যটির চুলচেড়া বিশ্লেষণ করে তিনি শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত করেন মেঘনাদবধ কোন দিক দিয়ে মহাকাব্য তো হয়নি আবার চরিত্র থেকে ভাব, শব্দ থেকে ছন্দ সর্বত্র রয়েছে কৃত্রিমতা। এইসব কারণে তাঁর সেই বয়সে মেঘনাদবধ কাব্যকে গ্রহণ করাটা অসহ্য বোধ হয়েছিল।

এই ভারতীতে প্রকাশিত 'মেঘনাদবধ কাব্য' নামক প্রবন্ধটি এই কাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রথম অভিমত বলে সর্বজন বিদিত হলেও আসলে এর পূর্বেও তিনি মেঘনাদবধ কাব্যকে প্রসঙ্গক্রমে আলোচনায় এনেছেন। এর পূর্বে ঠিক এক বছর আগে ১২৮৮ সালে মাঘ সংখ্যায় ভারতী পত্রিকায় গ্রন্থ সমালোচনায়, বিভাগে, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'রাবণবধ' দৃশ্যকাব্য প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে মেঘনাদবধ কাব্যের আলোচনা খুব স্বল্প পরিশরে তিনি নিয়ে আসেন। বলাবাহুল্য এই প্রবন্ধেও তিনি রাবণ বধের প্রশংসা করতে গিয়ে মেঘনাদবধের নিন্দা করলেন। তিনি ‘রাবণ বধ’ দৃশ্যকাব্যে পুরাণের আনুগত্য রক্ষিত হয়েছিল তার প্রশংসা করেন এবং মেঘনাদবধের প্রসঙ্গে বলেন- "এমন কি, মাইকেল তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যে শূর শ্রেষ্ঠ লক্ষণ দেবরকে কী বেরঙে আঁকিয়াছেন। সেই লক্ষ্মণ মেঘনাদবধ কাব্যের ভীরু স্বার্থপর 'গোঁয়ার' মাত্র দেখিলে আমাদের বুকে কী আঘাতই লাগে।"[৬] তৎকালে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল মাইকেল ভারতীয় সংস্কৃতিকে আঘাত করেছেন, আবার মেঘনাদবধের অমিত্রাক্ষর থেকে গিরিশচন্দ্রের গৈরিশ ছন্দের সৌন্দর্য এবং সহজ চলনকে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য বলেই তাঁর মনে হয়েছিল। তাঁর বক্তব্য ছিল- "আমরা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রের নূতন ধরনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিশেষ পক্ষপাতী। ইহাই যথার্থ অমিত্রাক্ষর ছন্দ।”[৭] এই গ্রন্থ সমালোচনা বিভাগের এক নম্বর প্রবন্ধে যে ভাবনার সূত্রপাত তারই সম্পূর্ণ

প্রকাশ মাত্র একবছর পরে লেখা 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রবন্ধে বিভাগের যার প্রসঙ্গে পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ লজ্জায় অভিভূত হয়েছেন বারবার। তৃতীয় যে প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মাইকেল প্রসঙ্গে কথা বলেছেন তা গ্রন্থ সমালোচনার অন্তর্গত ছয় নম্বর প্রবন্ধে। তিনি শ্রী নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রণীত সিন্ধু দূত কাব্যের ছন্দ প্রসঙ্গে মাইকেলের একটি সনেট- 'আশার ছলনে ভুলি' প্রসঙ্গ তুলে এনেছেন এবং বলেছেন- "মাইকেল রচিত নিম্নলিখিত কবিতাটি যাহাদের মনে আছে তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, সিন্ধু দূত ছন্দ বাস্তবিক নূতন নহে।"[৮] (ভারতী, শ্রাবণ ১২৯০)। মাত্র এক বছরের ব্যবধানেই মাইকেলের অন্য একটি সাহিত্য কীর্তিকে খুব অল্প করে হলেও রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করে নিলেন। প্রশংসা না করলেও নিন্দা করলেন না। এরপর রবীন্দ্রনাথ ২৪ বছর মাইকেল ও তাঁর মেঘনাদবধ কাব্য প্রসঙ্গে একটি কথাও বললেন না। তারপর ক্রমান্বয়ে সাতবার রবীন্দ্রনাথ মাইকেল ও মেঘনাধধধের প্রসঙ্গ আনলেন। সূত্রাকারে প্রথমে প্রসঙ্গগুলির উল্লেখ করা গেল-

১. প্রসঙ্গ মেঘনাদবধ কাব্য- 'সাহিত্য' গ্রন্থের 'সাহিত্য সৃষ্টি' প্রবন্ধ, আষাঢ় ১৩২৪
২. 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের 'ভারতী' আষাঢ়, ১৩১৮
৩. 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের নানা বিদ্যার আয়োজন অধ্যায়, ১৩১৯
৪. 'আত্মপরিচয়' বৈশাখ ১৩১৯
৫. 'ছন্দ' গ্রন্থের 'ছন্দের অর্থ' প্রবন্ধ, চৈত্র ১৩২৪
৬. সুবোধ স্যান্যালকে লেখা পত্র। ১লা মাঘ, ১৩২৬
৭. 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের 'সাহিত্যের রূপ' প্রবন্ধ। বৈশাখ ১৩২৫

১৮৯০ এর পর যখন চব্বিশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল তখন যে রবীন্দ্রনাথ তৈরি হয়ে উঠলেন তিনি 'প্রসঙ্গ: মেঘনাদবধ কাব্য' প্রবন্ধে বললেন- "রামায়ণের যে ধারা আমরা অনুসরণ করিয়া আসিয়াছি তাহারই একটি অত্যন্ত আধুনিক শাখা মেঘনাবধ কাব্যের মধ্যে রহিয়াছে।"[৯] এখানে রাবণ ও তার স্রষ্টা প্রসঙ্গে বলছেন- 'যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া। যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।"[১০] বলাবাহুল্য এই রবীন্দ্রনাথ, অন্য রবীন্দ্রনাথ যিনি চৈরবেতিতে বিশ্বাসী, গন্ডী ভাঙায় বিশ্বাসী যিনি নিজের ভাবনা বিশ্বাসেরও গণ্ডিকে ভাঙে নিজের ভুল অকপটে স্বীকার করেন। 'জীবনস্মৃতির' ভারতী অধ্যায় বলেন- "কাঁচা আমের রসটা অম্লরস, কাঁচা সমালোচনাও গালিগালাজ।"[১১] আত্মপরিচয়ে তিনি নির্দ্বিধায় বলেন "তখনকার অধিকাংশ বাঙালিপাঠক উপহাস, পরিহাস করুক আর যাই করুক তথাপি মেঘনাদবধ কাব্য বাংলার সাহিত্যেরই শ্রেষ্ঠ কাব্য।"[১২]

'ছন্দের অর্থ' প্রবন্ধে অমিত্রাক্ষর ছন্দের অপূর্ব সৌন্দর্য ধ্বনি সাম্যকে তিনি কুর্নিশ জানালেন- যিনি একদিন মাইকালের অমিত্রাক্ষরকে প্রাণহীন অনুকরণ মাত্র মনে করেছিল। পয়ার আট পায়ে চলার প্রবণতা বাংলা ছন্দের মধ্যে কতরকমের বিভিন্নতা ও

সৌন্দর্য আনতে পারে 'অমিত্রাক্ষর তার প্রমাণ। ছান্দসিক রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দের অন্তরকে আবিষ্কার করে তবেই মাইকেলের সৃষ্টিকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। ১৩৩৫, বৈশাখ 'সাহিত্যের রূপ' প্রবন্ধে তিনি তাঁর পরবর্তী কবিগোষ্ঠীর সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের রূপ প্রসঙ্গে আলোচনা করেন এবং মাইকেলের রূপ সৃষ্টির ক্ষমতাকে প্রণাম জানান। তিনি একবাক্যে স্বীকার করেন নিলেন 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শুরু হয়েছে মধুসুদন দত্ত থেকে। তিনিই প্রথমে ভাঙনের এবং সেই ভাঙনের ভূমিকার উপর গড়নের কাজে লেগেছিলেন খুব সাহসের সঙ্গে।"[১৩]

রবীন্দ্রনাথ কল্লোল গোষ্ঠীর কবিদের সাথে সাহিত্যের আধুনিকতা প্রসঙ্গে বেশ কয়টি বক্তৃতা ও প্রবন্ধের মাধ্যমে আধুনিকতা সম্পর্কে নিজের মতটি স্পষ্ট করেছিলেন। এই আধুনিকতা প্রসঙ্গে আলোচনায় তিনি মাইকেলের নতুন রূপ সৃষ্টির প্রবণতা ও ক্ষমতাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন। তিনি এখানে স্পষ্টতই বলেছেন- "রস সাহিত্যে বিষয়টা উপাদান, তার রূপটাই চরম। বলা বাহুল্য মধুসূদন দত্তের প্রতিভা আত্ম প্রকাশের জন্যে সাহিত্যের একটি রূপের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল।"[১৪] মধুসূদন এই রূপ সৃষ্টি করতে গিয়ে যে ভাব-ভাষা শব্দ-ছন্দ নির্মাণ করলেন তা বাংলা সাহিত্যে তার 'দোহার' পেল না ঠিকই কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একবাক্যে স্বীকার করেন- 'মাইকেল তাঁর নবসৃষ্টির রূপটিকে সাহিত্যে চির প্রতিষ্ঠা দেননি বটে, কিন্তু তিনি সাহস দিকে গেলেন। নতুন লেখদের উৎসাহ দিলেন।"[১৫]

মধুসূদনকে সম্পূর্ণ রূপে আত্মস্থ করেই তারপরই রবীন্দ্রনাথের কাছে মধুসূদনকে ভূমিকম্পের মধ্যে দিয়ে ডাঙা উঠে আসা বলে মনে হয়েছে বাংলা সাহিত্যের বুকে। একদিন যে অগ্রজকে তিনি অস্বীকার করেছিলেন তিনি পরবর্তীকালে সময়ের অভিপ্রায়ে আবার স্বীকার করে নিলেন, বারবার, এই বোধহয় ভবিতব্য ছিল। রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্য যেন যথার্থ রূপে মধুসূদনকে স্বীকার করে নিলেন দীর্ঘ প্রতীক্ষা ও জারণের প্রক্রিয়ায়। যেমন বাল্মীকি মরা মরা করতে করতে রামে পৌঁছেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তথা বাংলা সাহিত্যও মাইকেলকে অস্বীকার করতে করতে কবি শ্রীমধুসূদনকে স্বীকার করে নিলেন।

তথ্যপঞ্জি:

১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দ্র. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (সম্পা), মেঘনাদবধ কাব চর্চা, কলকাতা-৫৭, দেজ অফসেট, ২০০৪ জানুয়ারি, পৃ. ৩৩১

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মেঘনাদবধ কাব্য, দ্র. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (সম্পা.) মেঘনাদবধ চর্চা, কলকাতা-৫৭, দেজ, অফসেট, ২০০৪ জানুয়ারি, পৃ. ৩৭২

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৮

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৯

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭০

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাবণ বধ, দৃশ্যকাব্য, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত Available at- রবীন্দ্রনাথ রচনাসমগ্র (google playstore), প্রবন্ধ/ গ্রন্থ সমালোচনা/১
৭. পূর্বোক্ত ৬
৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সিন্ধু দূত, শ্রী নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত, Available at- রবীন্দ্রানাথ রচনাসমগ্র (google playstore), প্রবন্ধ/ গ্রন্থ সমালোচনা/৬
৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি, শিলাইদহ নদীয়া, আদিব্রাক্ষসমাজ, প্রকাশক শ্রী নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ১০৭
১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যের পথে, সাহিত্য রূপে প্রবন্ধ, ২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার, প্রকাশক পুলিন বিহারী সেন। পৃ. ২০৩
১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মপরিচয়, দ্র. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (সম্পা.), মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা, কলকাতা-৭, দেজ অফসেট, ২০০৪ জানুয়ারি, পৃ. ৩৭৪
১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মপরিচয়, দ্র. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (সম্পা.), মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা, কলকাতা-৭, দেজ অফসেট, ২০০৪ জানুয়ারি, পৃ. ৩৭৪
১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যের পথে, সাহিত্যের রূপ, ২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, প্রকাশক পুলিন বিহারী সেন, পৃ. ২৪৩
১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যরূপ, সাহিত্যের পথে, ২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, প্রকাশ ১৩৪৩, সংস্করণ ১৩৬৫, পৃ.২০৫
১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৫

গ্রন্থপঞ্জি :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি, ভারতী, শিলাইদহ, আদিব্রাক্ষ সমাজ, প্রকাশক শ্রী নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রকাশকাল ১৩১৯
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যের পথে, ২ বঙ্কিমচন্দ্র স্ট্রীট, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, প্রকাশক পুলিন বিহারী সেন, প্রকাশকাল ১৩৪৩
৩. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা, কলকাতা-৫৭, দেজ অফসেট, ২০০৪, জানুয়ারি।
৪. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবন কথা, কলকাতা-০৯, আনন্দ পাবলিশার্স, দশম মুদ্রণ বৈশাখ ১৪১৭।

‘নবান্ন’ বনাম ‘দেবীগর্জন’ উত্তরণের দিশারী

শিপ্রা দত্ত (ঘোষ)
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা

সারসংক্ষেপ: বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের আবির্ভাব এক যুগান্তকারী অধ্যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৯) সমাপ্তির পরিণতি সমস্ত দেশজুড়ে এক ভয়ংকর অরাজকতা জন্মনেয়। জাতীয় জীবনে ঘনিয়ে আসে হতাশা, বিশৃঙ্খলা। দেশের গোটা অর্থনৈতিক, সামাজিক ব্যবস্থা তলানিতে গিয়ে পৌঁছায়। অনাহার, অপমৃত্যু, বেকারত্ব, নৈরাশ্য আমাদের সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রাকে তছনছ করে দেয়। এই দুঃখ, বেদনার কাল কাটাতে না কাটাতেই চলে এল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৪)। এই সময়ে যুদ্ধ, মন্বন্তর, বন্যা, মহামারী প্রভৃতি ঘটনা বাঙালির পারিবারিক জীবনে নিয়ে এসেছে আকস্মিক বিপর্যয়। এই সময়ে ঘটে সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ধনতন্ত্রের সংঘাত। চলে ডাস্টবিনে খাদ্যের জন্য কুকুরে মানুষের লড়াই। বহু মানুষ মন্বন্তরের বিপর্যয়ে বিভ্রান্ত হয়ে আমের সম্পর্ক ছিন্ন করে বাঁচার তাগিদে এক মুঠো অন্নের সংস্থানে শহরে আসতে শুরু করে। কিন্তু সেখানেও চরম অব্যবস্থা। একদল মুনাফাখোর, মজুতদার নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মাঠে নেমে পড়ে। আর অসহায় মানুষ খাদ্যের জন্য আর্তনাদ করতে থাকে।

এই শোচনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে ধীরে ধীরে একদল শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন লোকের আগমন ঘটে। তারা নাটককে হাতিয়ার হিসাবে বেছে নেয়। গঠিত হয় ভারতীয় গণনাট্য সংঘ (১৯৪৩)। এই সংঘের পুরোধা ব্যক্তিত্ব বিজন ভট্টাচার্য। হাজার হাজার মানুষকে বেঁচে থাকার অদম্য প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতে একে একে লিখেন 'আগুন', 'জবানবন্দী', 'নবান্ন' 'জীয়নকন্যা, দেবীগর্জন'। এই নাটক গুলির মূল কথা প্রতিরোধ গড়ে তোলা। যার হাত ধরে আগনিত অসহায় মানুষ নূতন করে বাঁচতে শিখেছে, নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়েছে, সংঘবদ্ধ হয়েছে। লড়াই করার শক্তি অর্জন করেছে, প্রতিবাদ করার প্রেরণা পেয়েছে। প্রকৃত পক্ষে নবান্ন নাটক থেকে দেবীগর্জন মানুষকে উত্তরণের দিশা দেখাতে সর্বতোভাবে সার্থক।
মূল শব্দ : বিশ্বযুদ্ধ, সামন্ততন্ত্র, পুঁজিবাদ, নাটক, অদিকার, সঙ্ঘবদ্ধ, প্রতিবাদ, পন্থা।

মূল আলোচনা:

পরাধীন ভারতবর্ষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এক জটিল পরিস্থিতিতে বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে বিজন ভট্টাচার্যের আবির্ভাব ঘটে। একদিকে বিদেশী সরকারের মাত্রাতিরিক্ত শোষণ, আর এক দিকে মহামারী, দুর্ভিক্ষ ও বন্যার ভয়াল

পরিস্থিতিতে নাট্যকার চুপ করে থাকতে পারেন নি। চোখে মুখে এর উত্তাপ বহন করে জনশক্তিকে অবলম্বন করে ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে আগুন ছড়িয়ে দেন। দেশের উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে অসহায় জনসাধারণ বেঁচে থাকার প্রাণ শক্তি যখন হারিয়ে ফেলে, নিজেকে টিকিয়ে রাখতে কোন রাস্তাই যখন খুঁজে পায় না তখনই নাট্যকার এক বিকল্প পথের সন্ধান দিয়ে ভারতবাসীর কাছে কান্ডারী তথা পথ প্রদর্শক হয়ে ওঠেন।

হাজার হাজার মানুষকে বেঁচে থাকার অদম্য প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতে একে একে লিখেন, 'আগুন', 'জবানবন্দী', নবান্ন' 'জীয়নকন্যা', 'দেবীগর্জন' ইতাদি। চলার পথে অভিজ্ঞতার নিরীখে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন একার পক্ষে কোন কাজ করা সম্ভব নয়। প্রয়োজন সম্মিলিত প্রয়াস। মুখ বন্ধ করে নীরবে মৃত্যু বরণ না করে প্রতিবাদে গর্জে উঠতে হবে। কোন শত্রুর কাছে পরাজিত নয়, শপথ গ্রহণ করতে হবে বেঁচে থাকার, সমস্ত অধিকার ভোগ করার। সম্মিলিত শক্তির প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মাধ্যমেই খুঁজতে হবে উত্তরণের পথ, বাঁচার পথ। 'নবান্ন' আর 'দেবীগর্জন' নাটকে বিজন ভট্টাচার্যের চিন্তায়, চেতনায় ও মননে তারই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। অসহায় নিপীড়িত মানুষ কিভাবে লড়াইয়ের পথে নেমেছে, প্রতিবাদ করেছে সমস্ত রকমের অন্যায় এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে। ভারতমাতাকে ভালবেসে প্রাণের তাগিদে নিজেরাই খুঁজে নিয়েছে ধাঁচার পথ। এক ঐতিহাসিক শপথের মাধ্যমে যবনিকাপাত ঘটেছে এই দুটি নাটকের। তাই সমাজ জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার পূর্ণ ফসল বিজন ভট্টাচার্যের অমর সৃষ্টি 'নবান্ন' ও 'দেবীগর্জন'।

তৎকালীন সময়ের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বাস্তুহারা মানুষের মর্মান্তিক যন্ত্রণা, সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনের চরম অবক্ষয়ের বাস্তব প্রতিফলন তাঁর রচিত নাটকগুলি। নাট্যকার এই নাটকগুলির মাধ্যমে শোষিত, নিরন্ন-বুভুক্ষু মানুষের কাছে বুক ভরা আশা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। বিজন ভট্টাচার্যের দীর্ঘ সাংসারিক জীবন এবং নাট্যজীবনে বারে বারে পালা বদল ঘটেছে। কিন্তু মার্ক্সীয় দর্শনের যে শিক্ষাকে ব্রত হিসাবে শিরোধার্য করে নিয়েছিলেন সেই আদর্শ থেকে বিন্দুমাত্র সরে আসেন নি। তাই জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও অগণিত শোষিত মানুষের কথা লিখে গেছেন নিজের হৃদয় দিয়ে, শুনিয়েছেন নূতন করে বাঁচবার মন্ত্র-

“বাঁচবো বাঁচবো আমরা বাঁচবো রে বাঁচবো
ভাঙা বুকের পাঁজর দিয়ে,
নয়া বাংলা গড়বো।”[১]

গণনাট্য সংঘের অন্যতম প্রাণ পুরুষ ছিলেন বিজন ভট্টাচার্য। এই সংঘের প্রধান কাজ ছিল নির্যাতিত, নীপিড়িত শোষিত মানুষের সামনে এসে দাঁড়ানো এবং তাদের মধ্যে চেতনা জাগ্রত করে তাদের অভয় বাণী শুনানো। এছাড়া তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত সচেতন শিল্পী তাই দুইয়ের আদর্শ মাথায় নিয়ে শোষিত মানুষের সমস্ত রকমের শোষণ ও বঞ্চনার অবসান ঘটানোর জন্য তিনি জ্বালাময়ী ভাষায় লেখনীর মাধ্যমে একে

একে লিখলেন বিভিন্ন নাটক। এই নাটক গুলির মধ্য দিয়ে বিশেষ করে শোষক ও শাসক গোষ্ঠীর প্রকৃত চেহারা উন্মোচনের দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে এগিয়ে এলেন। এক মুঠো অন্নের জন্য রেশনে লম্বা লাইন, না খেতে পেয়ে মানুষ অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে, ফলে চারদিকে মৃত্যুর মিছিল। বিজন ভট্টাচার্যের প্রথম রচিত 'আগুন' নাটকে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

খাদ্যের জন্য রেশনের দোকানে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা সবাই একে অপরের সঙ্গে পরামর্শ করছে কি ভাবে এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। নাট্যকার দুর্ভিক্ষের ছবি, বন্যার ছবি অঙ্কন করেছেন ঠিকই কিন্তু এর মধ্যেও যেন নাটকের পাত্র-পাত্রীরা সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে বাঁচার স্বপ্ন দেখছে। তারা একসময় সমস্ত কিছুকে অসহায়ের মতো মেনে নিয়েছে, শত্রুর কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে। কিন্তু এতদিনে উপলব্ধি করতে পেরেছে যে বোবা হয়ে নীরবে ঘরে বসে থাকা আর নয়, বেরিয়ে পড়তে হবে রণক্ষেত্রে। সবাই ঐক্যবদ্ধ হলে শত্রুরা পিছু হঠতে বাধ্য হবেই। দেশের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি 'আগুন' নাটকে যে অসহায় নিরন্ত মানুষের মনে প্রতিবাদের আগুন ধরিয়ে দিয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই নাটকের সমাপ্তি ঘোষিত হয় বেঁচে থাকার শপথের মাধ্যমে। দারুণ বিপদের দিনেও সবাই মিলে বেঁচে থাকার অদম্য প্রেরণায় ঘোষিত হয় জীবনের মূল বক্তব্য, "এখন বাঁচতে হবে, বাঁচতে হলে মিলে মিশে থাকতে হবে, ব্যাস।"[২]

শত্রুর হাতে নীরবে প্রাণ দেওয়া নয় বেঁচে থাকার অঙ্গীকার ঘোষিত হয়েছে 'আগুন' নাটকে। আর সেই অঙ্গীকার আরও জোরালো হয়েছে 'জবানবন্দী' নাটকে। মহামন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত হয় এই নাটক। এতে আমরা দেখতে পাই সম্পন্ন চাষী পরিবার অভাবের তাড়ণায় না খেতে পেয়ে শেষ পর্যন্ত ভিক্ষা বৃত্তিকে একমাত্র পথ হিসাবে বেছে নেয়। তারা গ্রাম ছেড়ে শহরে যাত্রা করে এক মুঠো অন্নের আশায়। হিন্দু-মুসলিম সবাই মিলে গ্রাম ছেড়ে চলে আসে। মন্বন্তরের কালো থাবায় গ্রামের পর গ্রাম শ্মশানে পরিণত হয়ে যায়। সেই সঙ্গে মানুষের বিবেক বুদ্ধি সমস্ত কিছু গেছে নষ্ট হয়ে। ক্ষুধা যে মানুষকে পাগল করে দেয়, বিবেক বুদ্ধি নষ্ট করে দেয় তার জ্বলন্ত উদাহরণ বেন্দার মা, যে শহরে এসে মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়ে ক্ষুধার্ত স্বামী ও রুগ্ন নাতিকে ফেলে লুকিয়ে পিছন ফিরে গোগ্রাসে খিচুরি খেয়ে নেয়। বেন্দার মা যেন মানুষরূপী পশুতে পরিণত হয়ে যায়। অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়।

তাই বেন্দার মা সতীত্বকে বিসর্জন দিয়ে ভদ্রবেশ ধারী মুনাফা লোভী মহাজনের চকচকে লোভের স্বীকার হয়।। পরান মন্ডল এতে খুবই কষ্ট পায়। এত অব্যবস্থা দেখে, দিনের পর দিন না খেতে পেয়ে ফুটপাতে পড়ে মৃত্যু হয় পরান মন্ডলের। এই মৃত্যু দৃশ্য খুবই করুণ এবং মর্মান্তিক। বেন্দা এই দৃশ্য দেখে ভগবানের উদ্দেশ্যে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে,-

"চারদিকে এত সম্পদ, এত ধনদৌলত অথচ এই পিরথিমিতে পরান মন্ডলের বেঁচে থাকবার কোন অধিকার সাব্যস্ত হল না।"[৩] প্রকৃতপক্ষে মহামন্বন্তর, দুর্ভিক্ষ এবং ভয়াবহ বন্যার তান্ডবে গ্রাম বাংলা শ্মশানে পরিণত হয়ে যায়। একদল মানুষ শুধুমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে গ্রামের পুরানো ভিটে মাটি ছেড়ে শহরের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। তাদের এই দুর্বলতার সুযোগে কালোবাজারী মুনাফা লোভীর দল তাদেরকে যথাযথ ভাবে আত্মসাৎ করে। তাই সম্ভ্রান্ত চাষী পরান মন্ডলকে ফুটপাতে পড়ে প্রাণ দিতে হয়েছে। কিন্তু সে তো এইভাবে মরতে চায় নি, তাই মৃত্যুর অন্তিম মুহূর্তে প্রাণের চেয়ে প্রিয় মানুষের কাছে নিজের জবানবন্দী রেখে গেছে এই ভাবে, -"তোরা সব ঘরে ফিরে যা, ঘরে ফিরে যা। আবার আমার সেই মরচে পড়া লাঙ্গল ক'খানা আবার শক্ত করে চেপে ধরগে মাটিতে। খুব শক্ত করে চেপে ধরবি। সোনা, বেন্দা সোনা ফলবে। সোনা ফলবে, ফিরে যা ফিরে যা।"[৪]

পরান মন্ডল নিজে অসহায়ের মতো মৃত্যুবরণ করলেও গ্রামবাসী সবার উদ্দেশ্যে প্রকৃত সত্য কথাটি জানিয়ে দিয়ে গেছে। শহরে অসহায়ের মতো না ঘুরে মহাজনের লোভের স্বীকার না হয়ে নিজের হাতে ফলন ফলিয়ে সম্মানের সঙ্গে বাঁচার স্বপ্ন। দেখায়। সেই স্বপ্নকে হাতিয়ার বানিয়ে গ্রামে ফিরে গিয়ে নিজের শক্তিতে মাঠে মাঠে আবার সোনার ফসল ফলবে সেই আশাতে বুক বেঁধেছে সবাই। এর মধ্য দিয়েই সমাপ্তি ঘোষিত হয়েছে 'জবান বন্দী' নাটকের। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে, মনুষ্যত্বহীন বিবেকবুদ্ধি বর্জিত পৃথিবীতে এও এক ধরনের প্রতিবাদ তথা প্রতিরোধ। তাই' জবানবন্দী' নাটকে বিবেকহীন মানুষের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা অনুচ্চারিত প্রতিরোধের মাধ্যমে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

এই অনুচ্চারিত প্রতিরোধ উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে 'নবান্ন' নাটকের প্রধান সমাদ্দারের কণ্ঠে। এই নাটকেও দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মন্বন্তর পীড়িত অসহায় মানুষের পাঁচালী রচনা করেছেন নাট্যকার। 'নবান্ন' নাটকে দেখি গ্রামের মানুষ খুবই হাসি খুশিতে রুটি রোজগার করে সংসার চালাচ্ছিল। তাদের ছিল বারো মাসে তেরো পার্বণ। হঠাৎ সেই আনন্দের মধ্যে অমাবস্যার কালো অন্ধকার ঘনিয়ে এল। ১৯৪৩ সালে ভারতীয় অর্থনীতিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে খুবই মন্দা দেখা দিয়েছিল। একদিকে বিদেশী সৈন্যদের খাদ্য যোগান দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ সরকার খাদ্যশস্য মজুত করছিল তার সুযোগ নিয়ে অন্যদিকে কিছু দালাল মহাজন নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য খাদ্যশস্য গুদাম জাত করে গোপনে চড়া দামে বিক্রী করে প্রচন্ড সংকট তৈরী করেছিল। ফলে হাজার হাজার মানুষ না খেতে পেয়ে অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল। সেই সময়ের কাহিনীকে নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য তুলে ধরেন 'নবান্ন' নাটকে।

আমিনপুরের কৃষক প্রধান সম্পাদ্দারের পরিবারের কাহিনীকে কেন্দ্র করে সমগ্র দেশবাসীর দুর্গতির চিত্র অঙ্কন করেছেন। 'আগুন' ও 'জবানবন্দী' নাটকে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের যে সুর ছিল অনুচ্চারিত এই নবান্ন নাটকের প্রথম দৃশ্যেই যেন প্রধান

সমাদ্দারের কণ্ঠে জ্বালাময়ী ভাষায় ঘোষিত হল। বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে কোন আপস নয়, তাদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে, তার জন্য প্রয়োজন সম্মিলিত শক্তির। তাই ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের ডাক দিয়েছে প্রধান। কারণ প্রধানের মনে হয়েছে অসহায় ভীত সন্ত্রস্ত পশুর মতো লুকিয়ে থেকে জীবস্মৃত অবস্থায় থাকার চাইতে লড়াই করে প্রাণ দেওয়া অনেক বেশী সম্মানের।

বিশেষ করে সেই সময় যোগ্য নেতার অভাব ছিল। এরই ইঙ্গিত শোনা যায় পঞ্চাননীর গলায়,- "না এর একটা বিহিত করতে হয় কুঞ্জ, বুঝলে এর এটা বিহিত করতে হয়। এ কীরকম যারা কথা। মেয়ে মানুষ, লজ্জা, শরম খুঁইয়ে সব বনে জঙ্গলে গিয়ে বসে থাকবে পহরের পর পহর। কেন বিত্তান্তটা কী? দেশে পুরুষ মানুষ নেই, হ্যাঁ রে কুঞ্জ?"[৫] কমিউনিস্ট পার্টির কর্ণধার বিজন ভট্টাচার্য এবং অনেক কর্মীরা সেই সময় গোপনে নিরন্ন অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের একজন যোগ্য নারী নেতৃ হলেন মাতঙ্গিনী হাজরা। এই চরিত্রটির প্রভাব পড়েছে পঞ্চাননীর মধ্যে। তাই পঞ্চাননী ছেলেকে হারিয়েও আন্দোলন থেকে পিছিয়ে পড়ে নি। ব্রিটিশ সরকারের সমস্ত রকমের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে নিজে সংগ্রামে অটল থেকেছে এবং অন্যান্যদের উদ্বুদ্ধ করেছে অসীম সাহসিকতায়। সংঘবদ্ধ জনতা যাতে কোন ভাবেই আন্দোলন থেকে পিছিয়ে না পড়ে তার জন্য তাদের মনে সাহস জাগাবার জন্য সে বলতে থাকে,- "পেছোস নি, এগিয়ে যা, এগিয়ে যা তোরা সব, এগিয়ে যা"[৬] এমন কি গুলির আঘাত খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মৃত্যুর আগ মুহূর্তেও বলে যায়,- "এগিয়ে যা, এগিযে যা তোরা সব।"[৭]

'আগুন' ও 'জবানবন্দী'তে সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে অন্যায় অত্যাচারকে প্রতিরোধ করার ইঙ্গিত মাত্র ছিল। আর 'নবান্ন' নাটকে প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য থেকেই সেই প্রতিবাদ তথা জোরালো প্রতিরোধের বাণী উচ্চারিত হয়েছে প্রধান, পঞ্চাননী ও দয়াল মন্ডলের কণ্ঠে। কুঞ্জর মুখেও প্রতিবাদের সুর শোনা যায়। গ্রামের মানুষ অভাবের তাড়নায় যখন বাধ্য হয়ে জায়গা জমি বিক্রি করতে চাইছে তখন চোরাকারবারী তথা কালোবাজারী দলের প্রতিনিধি হারু দত্তকে দেখি নাম মাত্র অর্থ দিয়ে প্রধান সমাদ্দারের সমস্ত জায়গা সম্পত্তি কিনে নিতে চাইছে তখন কুঞ্জের কণ্ঠে এর জোরালো প্রতিবাদ শোনা যায়,-" এই চুপ করে থাকতে থাকতে একেবারে বোবা হয়ে যাবে, বোবা হয়ে যাবে এই বলে দিলাম হ্যাঁ।"[৮] যদিও এই প্রতিবাদ করার জন্য তাকে অনেক আঘাত সহ্য করতে হয়। সেবাশ্রমের নামে কালীধন ধারা ও হারুদত্ত যে অবৈধভাবে নারী পাচার করে এবং খাদ্যশস্য গুদাম জাত করে অধিক মূল্যে বিক্রি করে নিরঞ্জন তার গোপন তথ্য প্রকাশ করে দিয়ে এর প্রতিবাদ করেছিল।

'নবান্ন' নাটকে নাট্যকার বিয়ে বাড়ির একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজের দুই শ্রেণীর চরিত্র আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। একদিকে চলছে এক বিত্তশালীর বাড়ীতে বিয়ে উপলক্ষ্যে অঢেল বেহিসেবী আয়োজন আর অন্যদিকে চলছে ডাস্টবিনে পড়ে থাকা খাদ্যের জন্য অসহায় নিরন্ন মানুষের সঙ্গে কুকুরের লড়াই। কুকুরের কামড়ে কুঞ্জ ক্ষতবিক্ষত। এই করুণ দৃশ্য দেখে প্রধানের আর্ত চীৎকার,- "আর কত চেঁচাব বাবু দুটো ভাতের জন্যে। তোমরা কি সব বধির হয়ে গেছ বাবু কিছু কানে শোন না, অন্তর কি সব তোমাদের পাষাণ হয়ে গেছে বাবু।”[৯] সত্যিই যে তারা বধির হয়ে গেছে। প্রধানের এই বেদনাদায়ক উক্তি তৎকালীন মনুষ্যত্বহীন সমাজের প্রতি তীব্র কশাঘাত। দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে সমাজে যখন ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে ফ্যান দাও ফ্যান দাও ধ্বনি তখন অন্যদিকে বিয়েবাড়ীতে বেহিসাবী খাদ্যের প্রাচুর্য এ যেন সভ্যতার এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। এই চরম বৈষম্য ও লজ্জাজনক পরিস্থিতির জন্য প্রধানের কাতরোক্তি এই ঘুন ধরা সমাজের প্রতি তীব্র প্রতিবাদ।

তার পরেই শহরের এই করুণ পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে একে একে সবাই গ্রামে ফিরে যাবার স্বপ্ন দেখে এবং এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্যে সবাই মিলে বিচার সভা ডাকে। সেখানে ঠিক হয় আবার আগের অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য সবাই মিলে কাজ করবে, গোলায় ধান তুলবে। নবান্নের উৎসবে সবাই মাতোয়ারা হয়ে উঠেবে। স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হল ঠিকই কিন্তু একটা অজানা আশঙ্কার ভূত তাদের সবাইকে তাড়া করে। কারণ দুর্যোগের অন্ধকার যেন তাদের মন থেকে মুছে যায় নি। প্রধানের মনে প্রশ্ন জাগে,-"আবার যদি আসে সেই মন্বন্তর?"[১০] দয়াল মন্ডল সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলে,- "গতবারের মতো এবার আর অকাল আচম্বিতে এসে আমার চোখের ওপর থেকে আমারই পরিজন, আমারই স্বজন, আমারই বন্ধুবান্ধব (জনতার দিকে হাত তুলে দেখিয়ে) এই এরাই তো আমার আত্মীয় পরিজন, ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবেনা এদের। কিছুতেই না। এদের নিতে হলে আমারে ঘায়েল করতে হবে। জোর, জোর প্রতিরোধ প্রধান এবার জোর প্রতিরোধ, জোর প্রতিরোধ।"[১১] এই ভাবেই সম্মিলিত জনতার প্রতিরোধের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের শেষ ঘন্টা ধ্বনি সানাইয়ের রাগিনীতে করুণ সুরে বেজে উঠেছিল।

দিকে দিকে নিরীহ, অসহায় নিরন্ন চাষীদের প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠেছে জোরকদমে। কৃষক সংগ্রামের একটি বলিষ্ঠ দিক তেভাগা আন্দোলন। এই আন্দোলনের উত্তপ্ত পটভূমিকায় বিজন ভট্টাচার্য লিখেন 'দেবীগর্জন'। এই নাটকে সর্বহারাদের জাগরণ লক্ষ্য করা যায়। তাই নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য থেকে একই সঙ্গে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের প্রতিরোধের আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। এই সম্মিলিত আওয়াজ প্রতিবাদী জনগণের প্রথম ও প্রধান অস্ত্র। এই নাটকেও দুই শ্রেণীর চরিত্রের কথা তুলে ধরা হয়েছে। গণনাট্যের প্রধান শর্ত হল মানুষের কল্যাণে রুটি রোজগারের

লড়াইয়ের সঙ্গে জীবনের লড়াইকে যুক্ত করা। এরই হাত ধরে 'দেবীগর্জন' নাটকের আত্মপ্রকাশ।

এই নাটকে শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধি হলেন প্রভঞ্জন। অন্য দিকে রয়েছে শোষিত সর্বহারা মানুষের দল। শোষক শ্রেণী তাদের শোষণের মাত্রা বাড়াতে থাকে দিনের পর দিন। ফলে সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যায়, তারই প্রতিফলন ঘটে মংলার গর্জনের মধ্য দিয়ে, "বে- আইন সুদ দিব নাই। নামাই দাও পাথর, বন্ধ করি দাও মাপজোখ।"[১২] 'আগুন' নাটকে যে প্রতিবাদের সুর অনুচ্চারিত ছিল ধীরে ধীরে তা অনেক ভঙ্গুর পথ অতিক্রম করে এখানে এসে পৌঁছেছে। যদিও এর জন্য অনেক বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। মংলার এই গর্জনের ফলে দালাল ত্রিভূবন বুঝতে পেরেছে এমনি করে কৃষক সমাজের মাথায় লাঠি মেরে ক্ষমতার স্পর্ধা দেখানো আর বেশিদিন চলবে না। সেই দিনের অবসান ঘটতে চলেছে। তাই সরকারকে উদ্দেশ্য করে বলে,- "লাঠিবাজির যুগ নাইগ, লাঠিবাজির যুগ বিগত। পরমাণুর যুগ চলেছে ইটা, পরমাণুটো এখন বড় প্রবল। তুমার সর্দারকে বুলে দিও ই-কথাঠো।"[১৩]

ক্ষমতার দম্ভে মত্ত হয়ে প্রভঞ্জন বুকতে না পারলেও যুগ পরিবর্তিত হচ্ছে একথা মেনে নেওয়া যায়.মংলার বক্তব্যে তারই প্রমাণ মেলে। 'নবান্ন' নাটকে কুঞ্জের কথায় যার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল তারই প্রতিধ্বনি সংঘবদ্ধ চাষীদের জোরালো কণ্ঠে প্রকাশিত হয়েছে। ক্ষমতা-লোভী প্রভঞ্জন লোভের বশবর্তী হয়ে যে জমি অন্যায় ভাবে জোর করে তাদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে নিজের কুক্ষিগত করে রেখেছে তাকে মুক্ত করে আনার জন্য সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। চিরকাল নীরবে নিভৃতে যারা অত্যাচার সহ্য করেছিল তারা প্রতিবাদের সঙ্কল্পে মরিয়া হয়ে উঠেছে। প্রভঞ্জনের ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র সমস্ত কিছু তছনছ করে দেয়। পুরাণো পঞ্চায়েত ভেঙে দিয়ে নূতন পঞ্চায়েতী রাজ ঘোষণা করে। সবাই মিলে ঠিক করে অভাবী মানুষের খাদ্যের জন্য তার ধর্মগোলায় তোলা ধান সবাইকে সমান ভাবে ভাগ করে দিতে হবে। প্রভঞ্জন এই দাবিকে অগ্রাহ্য করে পালানোর চেষ্টা করে। সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। ধানের বদলে রত্নার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। ফলে তাদের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে প্রভঞ্জনের উপর। নাট্যকার সবশেষে জানিয়েছেন,- "মহিষাসুর বধের একটি স্থির চাল চিত্রের পশ্চাতে বাঁধের ওপর মহাকালীর তান্ডবনৃত্যের মধ্যে প্রভঞ্জন নিধন পালার যবনিকা পড়ে।"[১৪] এই ভাবে শোষক শ্রেণীর পরাজয় ঘটে। শোষিত তথা সর্বহারার জয় ঘোষিত হয়। অশুভ শক্তির বিনাশ হয়ে শুভ শক্তির প্রতিষ্ঠা ঘটে।

স্বাধীনভাবে বাঁচার সম্মিলিত ভাবে বাঁচার, সম্মানের সঙ্গে বাঁচার যে মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়েছিল 'জবান বন্দী' নাটকে বর্ণিত পরান মন্ডলের মাধ্যমে সেই মন্ত্র শুধুমাত্র উচ্চারণ নয় কার্যক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল 'দেবীগর্জন' নাটকের মধ্য দিয়ে। 'আগুন', 'জবানবন্দী,' 'নবান্ন' নাটকের প্রতিরোধের উচ্চারণ সার্থক ভাবে পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটেছে 'দেবীগর্জন' নাটকে সম্মিলিত জনশক্তির জাগরণের মধ্য দিয়ে। তাই 'নবান্ন' বনাম

'দেবীগর্জন' এক উত্তরণের দিশারী। সমস্ত রকমের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি থেকে, সমস্ত রকমের শাসন ও শোষণ থেকে উত্তরণের দীর্ঘ পরিক্রমার পথ 'আগুন' নাটক থেকে যার যাত্রা শুরু হয়েছিল 'দেবীগর্জন' নাটকে তার সমাপ্তি ঘটেছে মহিষাসুর বধের মধ্য দিয়ে। এটা একটা প্রতীক হিসাবে কাজ করেছে। মহিষাসুরকে বধ করে মা দুর্গা যেমন করে শুভ শক্তির সূচনা করেছিল তেমনিভাবে এখানেও মহিষাসুর বধের মাধ্যমে সর্বহারার জয় ঘোষিত হয়েছে।

আজ দিকে দিকে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামে গঞ্জের মানুষ তাদের ন্যায্য অধিকার সম্পর্কে অনেক সচেতন হয়েছে। এই ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বীজ অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল 'দেবীগর্জন' নাটকে। মুখ বুজে নীরবে সহ্য করার চেয়ে প্রতিবাদ করে সম্মানের সঙ্গে বাঁচা অনেক ভাল। তার জন্যই 'আগুন' নাটকে সর্বহারার যে ক্ষোভ তুষের আগুনের মতো ধিকি ধিকি করে জ্বলতে শুরু করেছিল তা যেন ধীরে ধীরে 'জবান বন্দী' এবং 'নবান্ন'-এর দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে দেবীগর্জনে জ্বলন্ত মশালের মতো জ্বলে উঠেছিল। অসহায় সন্তান দিনের পর দিন কষ্ট পাবে মা তা কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না। আর যেখানে স্বয়ং দেবীই লাঞ্ছিত, নির্যাতিত তখন তিনি সেখানে অবশ্যই গর্জন করে উঠবেন। রত্নার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে তারা আর স্থির থাকতে পারে নি। মংলা এবং গ্রামের অন্যান্য চাষীরা ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণে মরিয়া হয়ে উঠে। এই প্রতিরোধ আন্দোলনের কাছে একদিন হার মানতে বাধ্য হয় মহাজন ও জোতদারের যাবতীয় দুরভিসন্ধি। অসহায় জনসাধারণ জীবন যুদ্ধে টিকে থাকার নূতন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়। যার হাত ধরে অগণিত অসহায় মানুষ নুতন করে বাঁচতে শিখেছে, নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়েছে, সংঘবদ্ধ হয়েছে, লড়াই করার শক্তি অর্জন করেছে, প্রতিবাদ করার প্রেরণা পেয়েছে। যে কোন জটিল পরিস্থিতিতে মোকাবিলা করার সাহস পেয়েছে। তাই বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' থেকে 'দেবীগর্জন' নূতন পথ উন্মোচন করে গণচেতনার এই দিক নির্দেশক তথা আলোকবর্তিকা হয়ে রইল। যার আলোয় আলোকিত আমরা সবাই।

তথ্যসূত্র:-

১। ভট্টাচার্য, বিজন, আগুন, দে'জ, প্রথম সংস্করণ, ২০০৮, পৃষ্ঠা- ৩২
২। ভট্টাচার্য, বিজন, আগুন, দে'জ, প্রথম সংস্করণ, ২০০৮, পৃষ্ঠা ৪১
৩। ভট্টাচার্য, বিজন, জবানবন্দী, দে'জ, প্রথম সংস্করণ, ২০০৮, পৃষ্ঠা ৪৮
৪। ভট্টাচার্য, বিজন, জবানবন্দী, দে'জ, প্রথম সংস্করণ, ২০০৮, পৃষ্ঠা ৫২
৫। ভট্টাচার্য, বিজন, নবান্ন, দে'জ, ষষ্ঠ সংস্করণ, ২০১৪, পৃষ্ঠা- ৩৫
৬। ভট্টাচার্য, বিজন, নবান্ন, দে'জ, যষ্ঠ সংস্করণ, ২০১৪, পৃষ্ঠা ৩৮
৭। ভট্টাচার্য, বিজন, নবান্ন, দে'জ, ষষ্ঠ সংস্করণ, ২০১৪, পৃষ্ঠা- ৩৯
৮। ভট্টাচার্য, বিজন, নবান্ন, দে'জ, ষষ্ঠ সংস্করণ, ২০১৪, পৃষ্ঠা- ৫৮

৯। ভট্টাচার্য, বিজন, নবান্ন, দে'জ, ষষ্ঠ সংস্করণ, ২০১৪, পৃষ্ঠা ৭৭
১০। ভট্টাচার্য, বিজন, নবান্ন, দে'জ, ষষ্ঠ সংস্করণ, ২০১৪, পৃষ্ঠা- ১১৯
১১। ভট্টাচার্য, বিজন, নবান্ন, দে'জ, ষষ্ঠ সংস্করণ, ২০১৪, পৃষ্ঠা- ১২০
১২। ভট্টাচার্য, বিজন, দেবীগর্জন, দে'জ, চতুর্থ সংস্করণ, ২০১০, পৃষ্ঠা ৩৫
১৩। ভট্টাচার্য, বিজন, দেবীগর্জন, দে'জ, চতুর্থ সংস্করণ, ২০১০, পৃষ্ঠা ৪২
১৪। ভট্টাচার্য, বিজন, দেবীগর্জন, দে'জ, চতুর্থ সংস্করণ, ২০১০, পৃষ্ঠা ৫৩

সময়, সমাজ ও তুলসী লাহিড়ীর ‘ছেঁড়া তার’

পিনাকী বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গলসী মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: তুলসী লাহিড়ী (১৮৯৭-১৯৫৯) গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে বাংলা নাটকের জগতে একজন অন্যতম ব্যক্তিত্ব। নাটক, নাট্যমঞ্চ, চিত্রজগত, সঙ্গীতের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। জমিদার পরিবারের আইনজ্ঞ তুলসী লাহিড়ী উত্তরবঙ্গের রংপুরে জন্মগ্রহণ করেও কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লীর সঙ্গে তাঁর ওতপ্রোত সংযোগ ছিল। বিচিত্রমুখী মানুষ তুলসী লাহিড়ীকে গ্রাম্যজীবন, কৃষি, শ্রমজীবি মানুষের জীবন তাঁকে তাড়া করে বেড়িয়েছে। তাই তাঁর লেখনিতে স্বার্থান্বেষী মানুষদের শোষনের বলি হওয়া সাধারণ মানুষের কথা প্রাধান্য পেয়েছে। বস্তুত শোষিত শ্রেণির বঞ্চনার কথা বলতেই তিনি কলম ধরেছিলেন, যুক্ত হয়েছিলেন প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনে। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর নাট্য সৃষ্টি, নাট্য প্রযোজনা তাই বিশেষ রেখাপাত করেছে। প্রখ্যাত অভিনেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের সঙ্গী হয়ে এক সময়ে গণনাট্যের অফিসে আসেন, আবার একদিন তাঁর হাত ধরেই গণনাট্য ছেড়ে নবনাট্য সংস্থার 'বহুরূপী' নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগ দেন। জীবনের নানান অভিজ্ঞতার পথ পার হয়ে একটা সময়ে জলপাইগুড়ি জেলায় এসে কিছু চাষের জমি কিনে সরাসরি চাষাবাদ শুরু করেন। এবং এই সময় থেকেই কৃষকদের সঙ্গে তাঁর সরাসরি সংযোগ এবং আত্মীয়তা গড়ে ওঠে। তাদের সুখ দুঃখের বাস্তব কাহিনী প্রত্যক্ষ করেন। তাই মানবিক, সংবেদনশীল সৃষ্টিশীল নাট্যকারের কলমে উঠে আসে বঞ্চিত শোষিত চাষীদের বঞ্চনার কাহিনী। এই প্রেক্ষিতে লেখা তাঁর নাটকগুলি হল–'দুখীর ইমান' (১৯৪৭), 'পথিক' (১৯৪৯), 'ছেঁড়া তার' (১৯৫০), 'বাংলার মাটি' (১৯৫৩), 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার' (১৯৫৯), 'ঝড়ের মিলন' (১৯৬০) ইত্যাদি। তাঁর 'ছেঁড়া তার' নাটকটি প্রথম বহুরূপী নাট্যসংস্থার দ্বারাই মঞ্চোপযোগিতা প্রমানিত হয়।
সূচক শব্দ: মন্বন্তর, গণনাট্য, তুলসী লাহিড়ী, শ্রেণী সংগ্রাম, সাংস্কৃতিক আন্দোলন।

সূচনা:

১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ শে মে' 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংঘের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও আশা-আকাঙ্খা পূরণের দাবী সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলা। ক্ষুদা,দারিদ্র্য,সামাজিক পরাঙ্মুখতা ও রাজনৈতিক পরাধীনতা – এসবই ছিল এই সংঘের নবীন সাহিত্য স্রষ্টাদের মূল বিষয়। 'ছেঁড়া তার' নাটক এবং সমসাময়িক অন্যান্যদের নাটক ও সাহিত্যে সময়ের চিত্র ধরা পড়েছে।স্বাধীনতার

অব্যবহিত পূর্বের দশক অত্যন্ত কঠিন সময়। মানুষের প্রাণ যেন ওষ্ঠাগত। প্রাকৃতিক কারণের থেকেও মানুষের সৃষ্ট কৃত্রিম সমস্যাই সাধারণ মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল। কি নির্মম এই স্বার্থান্বেষী ক্ষমতালোভী আগ্রাসি মানুষরা! মুষ্টিমেয় কিছু রাষ্ট্রনেতা, অসাধু ব্যবসায়ী, সুদখোর মহাজন আর দালালদের চক্রান্ত গোটা সমাজকে অচল করে দিয়েছিল। একদিকে চার্চিলের কঠোর সিদ্ধান্ত, কোনোভাবেই ভারতে খাদ্যদ্রব্যের আমদানী বা সাহায্য আসা চলবেনা যুদ্ধের স্বার্থে, আর সেই সঙ্গে কাল-বাজারীদের মুনাফা লোটার জন্য তাদের হিংস্র দাঁত-নখ উন্মোচিত হল।ফলে মন্বন্তর অনিবার্য হয়ে উঠল। অথচ তৎকালীন বাংলার অসামরিক সচীব মন্বন্তরের মূল কারণ হিসেবে পুরোপুরি মিথ্যে কারণ দেখিয়েছেন। কিন্তু বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ীদের মত মানুষরা এই মিথ্যা কী করে সহ্য করবেন। তাই তাঁরা এই মিথ্যার বিরুদ্ধে তাঁদের নাট্য মাধ্যমের সাহায্যে মানুষের দরবারে বাস্তব চিত্র তুলে ধরলেন। তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' নাটক দেশের শত্রু,ঘাতকদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদের দলিল।

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী রচনা করলেন তার শ্রেষ্ঠ নাটক ‘ছেঁড়া তার’, যার প্রেক্ষাপট ১৯৪৩ এর অবিভক্ত বাংলাদেশের ভয়ংকর মন্বন্তর যা কিনা পঞ্চাশের মন্বন্তর নামে খ্যাত, এই দুঃসময়কে এবং ক্ষতকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল বহু সাহিত্য। সাহিত্যকারেরা কবিতা, নাটক, গল্প, উপন্যাসে নানাভাবে পঞ্চাশের মন্বন্তরকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। কেউ দুর্ভিক্ষের কারণ বিশ্লেষণ করেছেন, কেউ তার ছবি, আবার কেউ দুর্ভিক্ষের ফলাফল কে চিত্রিত করেছেন। কোন কোন সাহিত্যে দুর্ভিক্ষের পেছনে যে সমস্ত চক্রান্তকারীরা রয়েছে তাদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ তার চিত্র তুলে ধরেছেন । ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ-- এই ছয় বছর কাল ধরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে বাংলায় যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ মানুষকে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল সেই ক্ষত শুকাতে অনেক সময় লেগেছিল। অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন এই দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে জানিয়েছেন—“স্বাধীনতার কিছুদিন আগেই, ১৯৪৩-এ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের গ্রাসে পড়তে হয় দেশকে এবং অবিভক্ত বাংলায় ঐ ‘পঞ্চাশের মন্বন্তরে’ প্রায় ৩০ লাখ মানুষ প্রাণ হারায়। এটা সত্যি যে ওই দুর্ভিক্ষের সময় দেশে খাদ্যের বিশেষ অভাব ছিল না। কিন্তু বাংলার এই কুখ্যাত দুর্ভিক্ষ প্রমাণ করে গেছে, অর্থনৈতিক উত্থান-পতনের খেলায় ভারতবর্ষে একশ্রেণীর মানুষ কি ভয়ানক ভাবে অসহায়”। ---এই অসহায় মানুষের বাস্তব চিত্র এঁকেছেন তুলসী লাহিড়ী তাঁর ‘ছেঁড়া তার’ নাটকে। এই নাটকে আছে যেমন সময়ের দর্পণ তেমনি সমাজের দর্পণ। ‘ছেঁড়া তার’ নাটকের প্রধান চরিত্র রহিমুদ্দিন এবং ফুলজানের দাম্পত্য জীবনের বিচ্ছেদ এবং শেষ পর্যন্ত রহিমের আত্মহত্যা ---এসব কিছুর মূলে রয়েছে আর্থসামাজিক চক্রান্ত। অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্ত জানিয়েছেন--- “ধান চালের উৎপাদন সেভাবে খুব কমেনি, বরং সারা ভারতে উৎপাদন যথেষ্ট হয়েছিল। দুর্ভিক্ষ হল সরকারি ‘বঞ্চণা’, ‘পোড়ামাটির’ নীতির ফলে। জাপানি সৈন্য ভারত সীমান্ত পর্যন্ত এসে গিয়েছে। তারা

যদি ঢুকে পড়ে তাহলে যেন কোনো খাদ্য না পায় তার জন্য বহু খাদ্যশস্য নষ্ট করা হল। শস্যের চলাচল বন্ধ করতে মালবাহী নৌকা গুলি করে ডুবিয়ে দেওয়া হল। খাদ্যের অভাবে গ্রামের লোক চলে এলো কলকাতা শহরে। দেখা যেত এখানে ওখানে মৃতদেহ এবং মৃতপ্রায় শীর্ণদেহ। সরকারি হিসাব অনুসারে এই দুর্ভিক্ষে প্রায় ১৪ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। বেসরকারি হিসাবে সংখ্যাটি প্রায় 35 লক্ষ"। (প্রসঙ্গ অর্থনীতি)

নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী কিন্তু সরকারি ভ্রান্ত নীতিটিকে অগ্রাহ্য করেননি, শিল্পীত কৌশলে সমকালীন ঘটনার মূল কারণ অর্থনীতিবিদের বিশ্লেষণী পন্থায় উল্লেখ করেছেন—

"প্রেসিডেন্ট: ভাই সাইব। বুদ্ধিতে আর কুলায় না। চাইরো পাকে হাহাকার. এই যুদ্ধে দ্যাশটাক্ খাইবে। কোঠে লড়াই কোঠে কি ধাম ধুমীত হামরা মইনো। এতে তো আকালের শোরগোল, ওত্তি ফির সহরে ফিসফাস শুনি আইনো, জাপান যুদ্ধে নাইমেছে তাত সরকার পোড়ামাটি কইরবার চায়।" সরকারপক্ষের দ্বিচারিতা তুলসী লাহিড়ীর মত বহু সচেতন মানুষের বিশ্লেষণে সেদিন ধরা পড়েছিল।

সরকারের পরোক্ষ সহযোগিতায় কিংবা প্রশাসনের নজরকে ধুলো দিয়ে শোষক শ্রেণী বা মহাজন শ্রেণির লোকেরা লঙ্গরখানার দায়িত্ব নিয়ে শোষণ করে তেমনি মজুদ করে থাকে ধান এবং নানা খাদ্য। হাকিমুদ্দিনের মত গ্রামীণ মজুদ্দারদের সঙ্গে ছিল অসাধু ব্যবসায়ীরা। এরা অনিয়ন্ত্রিত মূল্যে খাদ্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে মজুদ করতে থাকে খাদ্যশস্য। কিন্তু এই অসাধু মজুদ্দারেরা সরকারের কাছে গোপন রাখে এই খাদ্যশস্যের কথা। গ্রামের ক্ষুধার্ত মানুষেরা যখন নিরুপায় হয়ে সিদ্ধান্ত নেয়, যদি মহাজন হাকিমুদ্দিন ধান ধার না দেয় তাহলে তারা লুট করবে। ক্ষুধার্ত মানুষদের এই সিদ্ধান্ত চতুর হাকিমুদ্দিন জেনে যায় এবং লুঠের বিষয়টিকে সে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে।

" হাকিমঃ আসল খবর পালু?

কুদরতঃ মোক কাঁয়ো কিছু তো কয় না। মুই চ্যাংড়াগুলাকে তাতাইনো ভালো মতো।কইনো ধনির বাড়ী হামলা কর।"

হাকিমুদ্দিরা হামলার পূর্বে ধান সরিয়ে রাখে ফলে একইসঙ্গে সরকারকে ফাঁকি দেওয়া যাবে এবং তারা যাদের শত্রু মনে করে তাদের লুঠের মামলায় জেলে পাঠিয়ে শোষণের পথ প্রশস্ত করবে। মন্বন্তরে তাদের আরও একটা সুবিধা হল ধান ঋণ দিয়ে পরবর্তীতে বেশি মুনাফার সুযোগ করে নিল আর সর্বস্বান্ত হল গ্রাম্য কৃষক এবং শ্রমিকরা।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নানা অবস্থান সম্পর্কে নাট্যকার জানান, "মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর দল লড়াইয়ের মাতনে মেতে গেল , কেউ মাল যোগান দিয়ে শাঁসালো হলো, কেউ কেউবা নূতন নূতন চাকরি পেয়ে রকম রকম উর্দী পরে জাক জমকে চমকে দিয়ে ভাবল এমনি করেই দিন কেটে যাবে" (২/২)। কিন্তু নাট্যকার সচেতন নাগরিক। তার মত সচেতন মানুষরা কেউ কেউ সক্রিয় রাজনীতিতে সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ

করেছিলেন। এই নাটকে গোবিন্দ'র কলকাতার বাবুদের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা, আকাল পিড়ীত মানুষদের দেখতে আসা বাবুদের সম্পর্কে গোবিন্দ বলে– "কয়টা বাবু ওইসব দেখাইবার আসিল। তারা সব মানুষগুলোর দুঃখের কথা আল্লাপন করে। একজন কয়, ইয়ারা সব মরে গেল। কোনটা করি যদি বাঁচিয়া থাকে ওগুলোর মনের আসল মানুষটা যেটা এই ভীষণ দুঃখ পায়া মরি গেইছে, সেটা আর বাইচবারে নয়। ইয়ারা মাইনষের কাছে যে লাঞ্ছনা পাইল মাইনষের কারও ভালো ইয়ারা দেইখবার পাইরবার নয়। আরও কত ভালো ভালো কথা বাবুগুলা কইলে" (৩/২)।

এই শ্রেণীর মানুষরা শুধু ভালো কথা বলেই ক্ষান্ত থাকেন। তারা জানেন মানুষকে ভিক্ষে দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। গোবিন্দ কাজ চাইলে তার দক্ষতা অনুযায়ী কাজ দেবার প্রয়াস নিয়ে যায়। গোবিন্দ বলে– "ফিরাদিন খাওয়াইলে, আর ভালো একনা গান শিখেয়া দিলে। কইলেন এই গান গায়া ঘুরেন, মানুষ পইসা দিবে।" গোবিন্দ এই গান শুনিয়ে এই কমাসে তিন কুড়ির বেশি টাকা জমিয়েছে। এইসব মানসিকতার মধ্যবিত্তরা তাদের বিবেকবোধে সাধ্য অনুসারে মানুষের ভালো করার চেষ্টা করেছেন মন্বন্তরের সময়। আবার কেউ বিপর্যস্ত পৃথিবীর অবক্ষয়ের রূপ দেখে অসহায় বোধ করলেন নিজস্ব অক্ষমতার কারণে। শেষোক্ত শ্রেণীতে মহিমকে রাখা গেলেও তার বন্ধু সুশান্ত কিন্তু নির্বিকার। তর্কের তরঙ্গ বা কথার মসৃনতায় নিজস্ব ব্যর্থতা গোপন করার প্রয়াস রয়েছে। এদের মধ্যে 'ছেঁড়া তার' নাটকে গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার চিত্র অত্যন্ত জীবন্ত করে দেখিয়েছেন নাট্যকার। ১৯৪৩ এ দুর্ভিক্ষ শুরু হয় এবং মানুষ খাদ্যাভাবে মরতে শুরু করেছে। আসলে দুর্ভিক্ষের ব্যপ্তিকাল ছিল ১৯৪২ এর শুরু থেকে ১৯৪৪ এর শেষ পর্যন্ত।এই সময় সীমাকে তিনটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে। প্রথম পর্বে ১৯৪২ এর শুরু থেকে ১৯৪৩ এর মার্চ পর্যন্ত।এই সময় দুর্ভিক্ষ না হলেও বাংলার মানুষ দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছে। দ্বিতীয় পর্বে ১৯৪৩ এর মার্চ থেকে নভেম্বর পর্যন্ত, এই সময় মানুষ ক্ষুধায় মরতে শুরু করেছে। তৃতীয় পর্ব ১৯৪৩ এ নভেম্বর থেকে ১৯৪৪ এর শেষ পর্যন্ত দুর্ভিক্ষের সংকটকাল ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেলেও এ সময় মানুষের মৃত্যুর হার বেড়েই চলেছে। অবিভক্ত বঙ্গভূমির প্রায় পুরোটাই যেমন চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, নোয়াপুর, ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগনার হাবড়া, হুগলী চূড়ান্তভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। প্রাথমিক পর্বে খাদ্যাভাব হলে চাষিরা বীজ ধান খেয়ে ফেলে। বীজ ধান ফুরিয়ে গেলে নানা অখাদ্য শাঁক পাতা কন্দ ইত্যাদি খেয়ে বেঁচে থাকতে চায়। ফলে জনস্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে, লোক মরতে থাকে ।কেউ কেউ জমি জমা বন্ধক বা বিক্রি করে মহাজনের কাছে। তাতেও যখন শেষ রক্ষা হয় না তখন শহরের অভিমুখে আসতে থাকে আশ্রয় পাওয়া যাবে এই ভরসায়। গ্রামকে গ্রাম কলকাতা ছুটতে থাকে । গ্রামগুলি জন মানব শূন্য শ্মশানে পরিণত হয় , শহরের দরজায় দরজায় একটু ফ্যানের প্রত্যাশায় তারা অধীর আগ্রহে ঘুরে বেড়াতো। ডাস্টবিন থেকে খাবার খুঁটে খেতো মান সম্মান বিবেক ধর্ম সব জলাঞ্জলি দিয়ে পথের ভিখারিতে

পরিণত হলো। প্রত্যক্ষদর্শী জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র লিখেছেন, "রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতাম চৌরঙ্গী, কালীঘাট, লেক মার্কেটের মোড়, বালিগঞ্জ, শিয়ালদা, শ্যামবাজার মোড়–সর্বত্র এক দৃশ্য–শত-সহস্র কঙ্কাল যেন ফ্যান দাও ফ্যান দাও বলে চিৎকার করছে। পেটের জ্বালায় গ্রাম উৎখাত করে শহরে এসে অন্নদাতা কৃষক ও জগদ্ধাত্রি কৃষাণী অন্ন ভিক্ষা চাইতেও সাহস পায় না। বলে ফ্যান দাও । মনুষ্যত্বের কি অবমাননা গরু ছাগলের খাদ্য নিয়ে মানুষে মানুষে কাড়াকাড়ি।(চিত্ত প্রসাদ রচিত 'ক্ষুধার্ত বাংলা')।

'স্টেটসম্যান' পত্রিকা বাংলার এই দুর্গতির চিত্র বিশ্বের সামনে নিয়ে এলো। সরকার সুনাম নষ্ট হবার ভয়ে নড়েচড়ে বসে লন্ডনের টাইমস পত্রিকার সম্পাদকীয়তে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতি ধিক্কার জানিয়ে দুর্গতদের জন্য জনমত গঠনের চেষ্টায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ফলে নানা জায়গা থেকে সাহায্য আসতে শুরু করে বোম্বাই,করাচি ,কাশি ,পাটনা, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। এমনকি সুদূর লন্ডন আয়ারল্যান্ড থেকেও দূর্গতদের জন্য সাহায্য এসেছিল। কিন্তু এসব সাহায্য কলকাতার অধিবাসীদের মধ্যেই বন্টন করা হয়েছিল সেদিন। বহু অন্নসত্র বা লঙ্গরখানা খোলা হয়েছিল। এইসব লঙ্গরখানায় খিচুড়ি চাল ডাল ইত্যাদি দেওয়া হতো কিন্তু এই সামান্য পরিমাণ খাদ্যতে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না এবং সব থেকে বড় কথা অনেক মুনাফা লোভী মাতব্বরেরা এইসবের দায়িত্ব পেয়েছিল। ফলে সাধারণ দুর্গতদের কাছে সেই ত্রাণ খুবই কম পৌঁছাত। 'ছেঁড়া তার' নাটকের প্রথম অংকের তৃতীয় দৃশ্যে শ্রীমন্তের সংলাপ থেকেই জানা যায়– "এই আকালের দিনে আসল বাঘশিয়ালের চেয়ে মানুষরূপী বাঘ শেয়াল গুলি অধিকতর হিংস্র ।" আকালের আভাস এবং যুদ্ধে তার পরিনাম নিয়ে নাটকে স্পষ্টই দুটি দল দেখা যায় । আকালের একদিকে তিন গোলা ধানের মালিক হাকিমুদ্দিন অন্যদিকের সমবেতভাবে গ্রামের হিন্দু মুসলমান সকলে। অনাহারে রহিমের মা মারা গেছে। তার ধান, একজোড়া বলদ ও যেটুকু জমি ছিল মায়ের চিকিৎসায় তাও গেছে। সে এখন নিঃস্ব। যুদ্ধ ফুটিয়ে তুলতে নাট্যকার একদিকে যেমন একটি পরিবারকে অন্যদিকে সম্মিলিতভাবে গ্রামবাসীর অবস্থানটি নির্দেশ করেছেন, যে গ্রামে দিনের বেলাতেই শেয়ালের উৎপাত বেড়ে গেছে তারা আর মানুষ দেখে ভয় পায় না। এই কঠিন সময়ে সামাজিক মূল্যবোধ বা সামাজিক বন্ধন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। মাত্র পাঁচ টাকায় দোলু তার যুবতী স্ত্রীকে শীতু পাইকার এর কাছে বেচে দেয়।শোলাগাড়ির সানুল্ল্যা পাইকার এক টাকা শেরদরে গরু বাছুর কিনে লালমনির হাটে চালান করে দিচ্ছে মিলিটারির খোরাক যোগানোর জন্য।তমিজও দুলুর অনুসরণে স্ত্রী কে বেচে দিতে চায়। গোবিন্দ জানায়, "যুয়ান বেটি ছাওয়াল দিয়েও নাকি মিলিটারির কাম হয়।'' গোবিন্দ'র গানে এই ভাবনার প্রকাশ দেখি, "প্যাট না থাকিলেরে মানুষ সুখী হইল হয়।" পেটের তাগিদে মানুষ তার মান সম্মান সব বিক্রি করে দেয়। শ্রীমন্ত এই কারণে রহিমকে বলে, আকালে সব এক হয়ে গেল, আদর্শের আর কোন মূল্য থাকে না। রহিম আক্ষরিকভাবে

দুর্ভিক্ষকে দুর্ভিক্ষ বলে স্বীকার করে না। তার মতে দেবতা মানুষকে বিপদে ফেলে পরীক্ষা করে মানুষের মনুষ্যত্বের পরিমাণ করে, আবার মানুষও দেবতার পরীক্ষা নেয়। রহিম বলছে," আইজ মাইনাসের পরীক্ষা আর মালিকেরও পরীক্ষা"। কিন্তু এই কঠিন পরীক্ষায় রহিম পরাভূত স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তার প্রাণ বাঁচাতে চেয়েছে, চক্রান্তকারীদের চক্রান্তের বিপরীতে বুদ্ধি খাটিয়ে মোকাবিলা করতে চেয়েছে। কিন্তু তার শেষ রক্ষা হয়নি। তার জীবনের চরম পরিণতি ঘটেছে সে আত্মহত্যা করেছে, সংসারে দিলরুবার তার ছিড়ে গেছে।যুদ্ধজাত,মন্বন্তরজাত মনুষ্যসমাজের ট্রাজিডি এখানেই নিহিত। 'ছেঁড়া তার' তাই শুধু রহিম -ফুলজানের জীবনের চরম সত্য নয়, সমগ্র মানব সমাজের বোঝাপড়ারও এক চরম পরিণতি।

উপসংহার:

তুলসী লাহিড়ী আসলে একজন আশাবাদী মানুষ ।যতই অন্ধকার থাক না কেন এক সময় সূর্য উঠবেই, নতুন আলোয় আলোকিত হবে সবদিক।তাই তাঁর নাটকে তিনি সমস্যার উত্তরণ দেখিয়েছেন। তাঁর 'দুখীর ইমান', 'পথিক', 'ছেঁড়া তার', 'বাংলার মাটি', 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার ', 'ঝড়ের মিলন' –প্রত্যেকটি নাটকেই তিনি পরিনামে সমস্যার উত্তরণের দিকে নিয়ে গেছেন ।নাটকের প্লট তিনি একেবারেই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে গ্রহণ করেছেন। তাঁর এই পর্বের নাটকগুলির প্রত্যেকটিতে কৃষক, মজুর, কয়লা শ্রমিক, হিন্দু -মুসলমান নির্বিশেষে সকলকে এক শোষিত শ্রেণীতে এনে দাঁড় করিয়েছেন।এবং সেই ক্ষেত্রেই তিনি এও দেখিয়েছেন যে, গ্রাম্য সমাজে খেটে খাওয়া মানুষ কঠিন সংগ্রাম করে জীবনশালায় কিন্তু তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত নিশ্বাস নেই।অভাব অনটনে সবাই মিলেমিশে থাকে আত্মীয়ের মত।সমস্যা এলে সকলে একজোট হয়ে,কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে ।আমরা দেখি তুলসী লাহিড়ীর প্রবন্ধ 'নাট্যকারের ধর্ম' সেখানেও তিনি অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমাজকে সচেতন করার এবং সেই সঙ্গে মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণগুলির প্রকাশে নাট্য চরিত্র নির্মাণের ঐকান্তিক চেষ্টা করেছেন ।সব শেষে তিনি আশায় বুক বেধে থাকেন–"আজও যারা বেঁচে আছে তারা রাত্রির সাধনা করে, প্রভাতকে বরণ করে আনবে এই আশায় উন্মুখ হয়ে দিগন্তে চেয়ে আছে,–কবে এ মেকী সভ্যতার দম্ভ দূর হবে–কবে শাসন সংরক্ষণের নামে হৃদয়হীন শোষনের অবসান হবে–কবে মানব সত্য সত্যই হৃদয়ধর্মী হবে–সেই আশায় ।"(সূত্র–'নাট্যকারের ধর্ম' প্রবন্ধ, তুলসী লাহিড়ী,১৯৬০)।

সহায়ক গ্রন্থ:-

১) তুলসী লাহিড়ীর নাট্য সমগ্র, ড সনাতন গোস্বামী, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, ২০১২।

২) তুলসী লাহিড়ী: ছেঁড়া তার,ভূমিকা, ড নির্মলেন্দু ভৌমিক,ভারতী,কলকাতা ।

৩) বাংলা সাহিত্য পরিচিতি, ড পার্থ চট্টোপাধ্যায়, তুলসী প্রকাশনী,কলকাতা, ২০১৩।

৪) গণনাট্য আন্দোলন, দর্শন চৌধুরী, অনুষ্টুপ, কলকাতা ২০০৯।

৫) বাংলা নাটকের ইতিহাস,ড অজিতকুমার ঘোষ,দে'জ,কলকাতা, ২০০৫।

৬) প্রবন্ধ সংকলন(পঞ্চাশের মন্বন্তর) ,শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৪৪।

‘রস’–রসিক–রহস্য - আখ্যানের নবনির্মাণ

মধুরা চক্রবর্তী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বিবেকানন্দ কলেজ

সারসংক্ষেপ: বাংলার গ্রাম্য প্রকৃতির মাঝে বেড়ে ওঠা নরেন্দ্রনাথ মিত্র আপাত সারল্যের মাঝেই সন্ধান করেছিলেন মানবমনের অনিবার্য জটিলতার। যা পরবর্তীকালে স্থাপন করল তাঁর সাহিত্যরচনার ভিত্তিপ্রস্তর। ‘রস’ তেমনই এক গল্প। প্রকৃতি আর মানবমন যেখানে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল দেশভাগের বছরে। অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে। ‘চতুরঙ্গ’ পত্রিকায়। নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যায়। তবে কাহিনির পটভূমি যেন আরও অতীতচারী। লেখকের শৈশবের। বিভিন্ন বৃত্তিজীবি মানুষের ভীড় প্রত্যক্ষ করলেন লেখক। আর এই কাহিনিতে উপস্থাপিত হল ‘গাছি’ মোতালেফ- মাজুখাতুন- ফুলবানুর সম্পর্কের বহুমাত্রিক অভিঘাত। যার আধার হিসেবে উপস্থাপিত ‘রস’। বলা বাহুল্য, এই প্রয়োগ বহুমাত্রিক। পেশা- প্রবৃত্তির দোলাচলতায় মথিত হয়েছে এই তিন নর-নারীর যাপনপর্ব। আমাদের আলোচনা ঘিরে থাকে এই পর্বকে।
সূচক শব্দ : রস, প্রকৃতি, দাম্পত্য, রূপাসক্তি, জীবিকা, দ্বান্দ্বিকতা,ঘর।

গ্রামবাংলার প্রায় নিস্তরঙ্গ শান্ত পরিবেশে বড় হয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-১৯৭৫)। তবু সেখানকার আপাত-জটিল গ্রামীণ জীবনে তিনি যেন সন্ধান পেয়েছিলেন বহুমাত্রিকতার। যা তাঁকে প্রভাবিত করেছে আজীবন। পরবর্তীকালে ঠাঁইনাড়া হয়ে নাগরিকজীবনে ক্রম-অভ্যস্ত হতে থাকার পরেও। ‘রস’ এমনই এক গল্প। যার পটভূমির রসদ তিনি সংগ্রহ করেছেন নিজস্ব যাপিত জীবন থেকেই। প্রাসঙ্গিকভাবে তিনি জানিয়েছিলেন,’ ‘এ গল্পের যে পটভূমি তা আমার খুবই পরিচিত। পূর্ববঙ্গে আমাদের গ্রামের বাড়িতে পূব দিকে ছিল একটি পুকুর। আর সেই পুকুরের চারধারে ছিল অজস্র খেজুর গাছ। ছেলেবেলা থেকে দেখতাম আমাদের প্রতিবেশী কৃষাণকে সেইসব খেজুর গাছের মাথা চেছে মাটির হাঁড়ি বেঁধে রাখত। বাঁশের নল বেয়ে সেই হাঁড়িতে সারারাত ধরে ঝির ঝির করে রস পড়ত। সেই রস কড়াইতে করে,বড় বড় মাটির হাঁড়িতে করে জ্বালিয়ে গুড় তৈরি করতেন আমাদের মা-জ্যেঠীমারা। শীতের দিনে রস থেকে গুড় তৈরির এই প্রক্রিয়া মায়ের পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে রোজ দেখতাম। আমার চিরচেনা এই পরিবেশ থেকে রস গল্পটি বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু রসের যে কাহিনি অংশ মোতালেফ মাজুখাতুন আর ফুলবানুকে নিয়ে যে হৃদয়দ্বন্দ্ব, খেজুর রসকে ঘিরে রূপাসক্তির সঙ্গে যে জীবিকার সংঘাত তা কোনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আসেনি। ... তা মনের মধ্যে যেন আপন থেকেই বানিয়ে উঠেছে।’[১] অর্থাৎ ‘রস’ গল্পের পটভূমি

খানিকটা এইরকম। কিন্তু তা বহিরঙ্গের কথা। তার 'আঁতের কথা' আমাদের ভাববার বিষয়।

এই গল্প প্রকাশিত হয়েছিল চারের দশকে। ১৯৪৭ সালে ত্রৈমাসিক 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যায় এটি মুদ্রিত হয়েছিল। তবে এই কাহিনির শিকড় খুঁজতে গেলে আমাদের আরও একটু পিছিয়ে যেতে হয়। পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার বৃহৎ একান্নবর্তী সচ্ছল পরিবার। সাহিত্য এবং সংস্কৃতিচর্চা ছিল যে পরিবারের জীবনচর্যার অঙ্গ। আসলে এই গ্রামে ছিল বিভিন্ন বৃত্তিজীবি মানুষের ভিড়। পরিবারে বহিরাগত মানুষের সংখ্যাও যথেষ্ট। ফলে সেই পরিবারের সন্তান নরেন্দ্রনাথ বালককাল থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন বিচিত্র মানুষের ভিড়। পরবর্তীকালে পড়াশুনোর জন্য কলকাতায় তাঁর আসা। প্রথম গল্পগ্রন্থ 'অসমতল' প্রকাশ পেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর উত্তাল সময়ে। অর্থাৎ মানসিক অবক্ষয় এবং স্থিতিহীনতা যেন সেই পর্বের যুগচরিত্র। 'রস' গল্প সেই দ্বন্দ্বকাতরতা ও স্থিতিহীনতার কথা আমাদের জানায়।

কাহিনির গোড়া থেকেই যেন সরাসরি বিষয়ে প্রবেশ করলেন লেখক। এবং পরপর দুটি গুরুত্বপূর্ণ বাক্যের মাধ্যমে যেন কাহিনির মূল ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করলেন তিনি। 'কার্তিকের মাঝামাঝি চৌধুরীদের খেজুর বাগান ঝুরতে শুরু করল মোতালেফ। তারপর দিন পনের যেতে না যেতেই নিকা করে নিয়ে এল পাশের বাড়ির রাজেক মৃধার বিধবা স্ত্রী মাজুখাতুনকে।' অর্থাৎ প্রথমে তথ্য পরিবেশন এবং পরবর্তী অংশে তার নেপথ্য স্তরের ক্রম উন্মোচন। গল্প বলার জন্য এহেন ভঙ্গির মধ্য দিয়ে পাঠকের উৎকণ্ঠাকে যেন বজায় রাখলেন তিনি। মাজু খাতুন এবং মোতালেফের এই 'অসম' বিবাহে 'সমাজ' নামক প্রতিষ্ঠানের ভ্রু কুঞ্চিত হয়েছিল যথেষ্ট। এক বিবাহিতা কন্যার মা মাজুর কেবল রয়েছে কাঠাখানেক জমি,পড়তে থাকা শনের কুঁড়ে। আর রয়েছে তাঁর 'আঁটসাঁট শক্ত গড়ন'। বিপরীতে তাঁর স্বামী মোতালেফের চোখ অন্বেষণ করে বেড়ায় সৌন্দর্য। 'সুন্দর মুখের খোঁজ করে ঘোরে তার চোখ।' এখান থেকেই সুত্রপাত মোতালেফের যাবতীয় দ্বান্দ্বিকতার। সাধ আর সাধ্যের। ফুলবানু তার সাধ। সাধের নারী যেন। তবু সাধ্যের নয়। পাঁচকুড়ির বিনিময়ে এই নারী তার হতে পারে। যার জন্য মোতালেফ বছরভর পরিশ্রম করতে রাজি। পাঠকের মনে এই সম্পর্কের জাল যেন ক্রমশ জট পাকাতে থাকে। মাজুখাতুনের সঙ্গে বিয়ের সংবাদ দিয়ে যে কাহিনির সূচনা হয়েছিল একটি আকস্মিকতায়, সেখানেই ঘটে গেল ফুলবানুর অনুপ্রবেশ! যার সম্পর্কে মোতালেফের প্রাথমিক অভিব্যক্তি ছিল খানিকটা এইরকমের – 'রসে টলমল করছে সর্বাঙ্গ, টগবগ করছে মন।' কিংবা 'একহাত ঘুরে এসেছে বলে কিছু ক্ষয়ে যায়নি ফুলবানুর, বরং চেকনাই আর জেল্লা খুলেছে দেহের, রসের ঢেউ খেলে যাচ্ছে মনের মধ্যে'।

সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের লেখকসত্তার তুলনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন, 'সমাজনীতি ও রাজনীতির পরিবর্তমান

মূল্যবোধের পটভূমিতে মানিক মানুষকে দেখেছেন। নরেন্দ্রনাথ সেদিকে না গিয়ে মানুষকে বারবার ঘুরিয়ে দেখেছেন। তাঁর এই দেখা ক্লান্তিহীন,বিরামহীন। গরীব,নিম্নবিত্ত,মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের নানা মানুষকে, তাঁদের বিভিন্ন সম্পর্ককে,পারম্পরিক সংঘাত ও অন্তর্ঘাতকে নরেন্দ্রনাথ গল্পে ধরেছেন। কেবল সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সংঘাত নয়,ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির জীবনের জটিলতা নরেন্দ্রনাথের সূচীমুখ বিশ্লেষণে ধরা পড়েছে। দুর্জ্ঞেয় মনের রহস্য উন্মোচনে তাঁর দৃষ্টি প্রখর। তিনি হৃদয়ের নিপুণ *বিশ্লেষক, জীবনের জটিল রূপকার।' 'রস' গল্পটি যথার্থই হয়ে উঠেছে 'দুর্জ্ঞেয় মনের রহস্য উন্মোচনের এক* ক্ষেত্র'।[২] স্পষ্টতই বোঝা যায় এ কাহিনিতে রসের ব্যবহার একরৈখিক নয়। গল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দেখি 'গাছি' মোতালেফ 'বন্দোবস্ত' পায় চার পাঁচ কুড়ি কেজুর গাছের। এবং সেখান থেকে 'রস' বার করার পদ্ধতিটিও রীতিমত পরিশ্রমসাধ্য শুধু নয়, এর জন্য প্রয়োজন অশেষ যত্নও। আর এই সূত্রেই পাঠক ঘনিষ্ঠতর ভাবে পরিচিত হয় মাজুখাতুনের সঙ্গে। কাহিনির সূচনা যে বিন্দুতে হয়েছিল, এই অংশ যেন স্পর্শ করেছে সেই বিন্দুকে, মাজু খাতুনকে এই পরিসরে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার সময় মোতালেফের আবেদনে আবারও ফিরে এসেছে সেই রসের অনুষঙ্গই। - 'কম বয়সী মাইয়া পোলা অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু শত হইলেও, তারা কাঁচা রসের হাঁড়ি'। অর্থাৎ নারীদেহ উপমিত হল রসের অনুষঙ্গে। মোতালেফের এ ইঙ্গিত যে পরবর্তীপর্বে তার ভবিতব্য হয়ে উঠবে, এ অংশ যেন তারই ইঙ্গিত। এই দাম্পত্যে প্রণয়ের আপাতলক্ষণ চোখে পড়ে না। তবে দুজনেই যেন 'রসের ব্যাপারী'। ঘর আর ঘরণীর দিকে আর নজর নেই মোতালেফের। তার বসত তখন 'গাছে গাছে'। একজন রসের সংগ্রাহক আর অন্যজন তাকে জ্বাল দিয়ে বিক্রিয়োগ্য করে তুলতে সদাব্যস্ত। লেখক মোতালেফের মনের খবর না দিলেও মাজু খাতুনের সংবাদ আমাদের কাছে এসে পৌঁছোয়। ' অনেকদিন পর মনের মত কাজ পেয়েছে মাজুখাতুন, মনের মত মানুষ পেয়েছে ঘরে'। লক্ষণীয় এই বাক্যটি। 'মনের মত কাজ' আর 'মনের মত মানুষ' যেন মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছে। দুটিই যেন তার কাছে সমার্থক। নাকি বাক্যের বিন্যাস অনুযায়ী আগে কাজ এবং পরে মানুষ! প্রথমটিই তার কাছে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ নয় কী! কিন্তু এই বিষয়ে মোতালেফের দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র। 'গাছ কাটা অবশ্য মনের মত কাজই মোতালেফের, কিন্তু পছন্দসই মনের কি সত্যিই এল ঘরে?' অর্থাৎ একই বিষয়ে এই দুই নরনারীর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মোতালেফের রয়েছে সংশয়, মাজুখাতুনের নেই। মননের এহেন বৈষম্যই আমাদের কাছে হয়ে ওঠে কাহিনির পরিণতি সম্পর্কে ইঙ্গিতবাহী। তাই এই অংশে দুটি পরিচ্ছেদের মাঝে বিরতি নিয়ে আসেন লেখক। এই দাম্পত্যের 'রস'-এর আস্বাদ নিতে নিতেই পাঠককে লেখক নিয়ে যান মোতালেফের কাছে। সে তখন অন্য নারীর দুয়ারে। ফুলবানুকে বিয়ের পরিকল্পনায় সে তখন মগ্ন। আর তার অজ্ঞাতসারেই 'রস' –এর সঙ্গে কখন যেন এক সূত্রে গ্রথিত হয়ে গিয়েছে মাজুখাতুন। 'গাছে রস যদ্দিন আছে, গায়ে শীত যদ্দিন আছে , মাজুখাতুনও

তদ্দিন আছে আমার ঘরে'। অর্থাৎ 'রস' ও মাজুখাতুন পরষ্পর যেন সম্পৃক্ত হয়ে যাচ্ছে যেন মোতালেফের চোখে। এইভাবেই 'গাছি' মোতালেফের সঙ্গেও যে 'রস'-এর অনিবার্য সংযোগ রয়ে গেছে, তার এক সূক্ষ্ম ইঙ্গিত যেন রয়ে গিয়েছে এই অংশে।

এই সংযোগের অনিবার্যতার মাঝেই আমরা জেনে যাই মোতালেফ আর মাজুখাতুনের ঘর ভাঙ্গার কথা। এবং মোতালেফের আকাঙ্খিতা নারী ফুলবানুর তার জীবনে আগমনের কথা। প্রেয়সীর সঙ্গে নিশ্ছিদ্র সুখের ঘর গড়তে গড়তেই নবদম্পতির একটি সংলাপ আমাদের কাছে বড় তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। 'ফুলবানু হাসে,'... এ কয়মাস কাটাইলা কি কইরা মেঞা?' মোতালেফ জবাব দেয়, 'খেজুর গাছ লইয়া'। 'নিবিড় বাহুবেষ্টনের মধ্যে দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসে ফুলবানুর,একটু নিঃশ্বাস নিয়ে হেসে বলে,'তুমি আবার সেই গাছের কাছেই ফিরা যাও।'গাছি'র আদর গাছেই সইতে পারে।' যার উত্তরে মোতালেফের প্রতিক্রিয়া ছিল এইরকম, 'কিন্তু গাছির কাছেও যে গাছের রস দুই-চাইর মাসেই ফুরায় ফুলজান, কেবল তোমার রসই বছরে বার মাস চোঁয়াইয়া চোঁয়াইয়া পড়ে'। লক্ষণীয়, এই পর্বে মোতালেফ কৃষক। গাছের সঙ্গে এই সময়ে তার প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই। তবে তার বাইরে মোতালেফের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে কী! এ বিষয়ে আমাদের প্রশ্ন জাগে। তাই তার গায়ে কেবলই গাছের গন্ধ। রূপাসক্তি বা দেহজ কামনার গ্রাসে গ্রস্ত মোতালেফ হয় ঠিকই, তবু তার বাইরেও রয়ে গিয়েছে তার এক পৃথক সত্তা। যার জেরে সে একক।

'রস' গল্পে রয়েছে প্রকৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বসন্ত আর শীতে যেমন একদিকে যথাক্রমে এসেছে মোতালেফ আর ফুলবানুর দাম্পত্যে মাধুর্য এবং শৈত্য। ঠিক তার মাঝখানে রয়েছে মোতালেফ আর মাজুখাতুনের দাম্পত্য। কাহিনিতে রয়েছে এই এক বছরের ঘটনাক্রম। ইতিমধ্যে মাজুখাতুন ঘর বেঁধেছে নাদিরের সঙ্গে। পার হয়েছে নদীর পার। মোতালেফ নামক নদীর পার। এই কূল ছাড়িয়ে অন্য কূলে। 'রস'-এর ব্যাপারে তার এখন তীব্র অনাগ্রহ। এর পরেই আবার পৌষের আগমন। কাহিনির উত্তরপর্যায়। ফুলবানুর মাজুখাতুনের মতো রস জ্বাল দিতে না পারার অক্ষমতা এবং সেখান থেকেই যেন সেই দাম্পত্যে ভাঙ্গনের ইঙ্গিত। শীতের প্রাবল্য। পটভূমিতে এবং দাম্পত্যেও। তাই মোতালেফের মনেও এখন 'কোথাও ছিটেফোঁটা নেই রসের'। 'রসবতী নারী' তার ঘরের আনাচে কানাচে ঘোরাফেরা করলেও রসের সন্ধান সেখানে মেলে না। মোতালেফের দ্বান্দ্বিকতা এই জায়গায়। এই কাহিনি তাই কেবলমাত্র তার জীবন আর জীবিকার সংঘাত নয়- কোথাও নিজের অন্তর্গত সত্তার দ্বিমাত্রিকতার আবিষ্কার- বা নিজেকে অন্বেষণ করারও পালা। তাই সেভাবেই কাহিনির ক্লাইম্যাক্স নির্মাণ করেন গল্পকার।

'রস'-এর অন্বেষণে আবার মাজুখাতুনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে মোতালেফ। লেখক সে কাহিনি আমাদের জানিয়েছেন এইভাবে –'দিন কয়েক পরে একদিন ভোরবেলায় দু'টি সেরা গাছের সবচেয়ে ভালো দু' হাঁড়ি রস নিয়ে নদীর ঘাটে গিয়ে

খেয়া নৌকায় উঠে বসল মোতালেফ'। 'রস' মোতালেফের কাছে নিজের অস্তিত্বের নামান্তর। তার নির্যাসটুকু নিয়ে যেন তার প্রত্যাবর্তন মাজু খাতুনের কাছে। তাই সেই নারীর ধিক্কার মোতালেফের কাছে তীব্রভাবে এসে পৌঁছোয় না। পৌঁছোয় হাহাকার হিসেবে। সেখানেও আবার ঘুরে ফিরে এসেছে রসের অনুষঙ্গ। 'মাজুখাতুনের তীব্র কর্কশ গলার ভিতর থেকে আহত বঞ্চিতা নারীর অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠের আমেজ আসছে – যেন একটু একটু। ছ্যানের খোঁচায় নলের ভিতর দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়েছে রস'। অর্থাৎ প্রাপ্তি আর অপ্রাপ্তি – প্রেম বা বিরহ – প্রতিটি অনুভূতির প্রকাশে রসানুভূতি হয়ে উঠেছে তার ক্ষেত্রে অনিবার্য সত্য। তবে কাহিনির সমাপ্তিকেও এই সূত্রে মেলানো যায়। সেখানে রয়েছে এক চূড়ান্ত চমক। গল্পের অন্তিম বাক্যটি এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। 'হুঁকোতে মুখ দিতে দিতে মোতালেফ বলল, 'না মেঞাভাই, নেবে নাই'। দুটি শব্দের মধ্য দিয়ে কাহিনির সমাপ্তি ঘোষণা করলেন লেখক। যে সমাপ্তি আসলে কোন ফুরিয়ে যাওয়ার কথা বলে না। নেভেনি মোতালেফের দ্বন্দ্বময়তা – আত্মানুসন্ধানের পালা – তার জীবনের 'রস'-এর রসদ। 'রস', যাকে সুপ্রাচীনকাল থেকে আলঙ্কারিকেরা স্বীকৃতি দিয়েছেন 'ব্রহ্মস্বাদসহোদরতুল্য' এক অলৌকিক অনুভূতি হিসেবে, তা আসলে 'নিত্য আনন্দের হেতু'--- মোতালেফের জীবন তা থেকে বঞ্চিত হয় কেমন করে! 'মাজুখাতুন' নামক আলম্বন বিভাব ব্যতীত মোতালেফের 'রস'-এর অনুভাব জাগরূক হয় কী করে!

তথ্যসূত্র:

১। নরেন্দ্রনাথ মিত্র, 'গল্পমালা ১', চতুর্দশ মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০২২, পৃষ্ঠা ১০

২। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, 'মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে : বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস', সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, দেজ পাবলিশিং ,কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০৯, পৃষ্ঠা ১৬১

স্বস্তিমৃত্যু : একটি নৈতিক আবেদন

শিল্পা দাস
স্নাতকোত্তর, দর্শন বিভাগ
দ্য সংস্কৃত কলেজ এ্যান্ড ইউনিভার্সিটি

সারসংক্ষেপ : আত্মহত্যার মতো স্বস্তিমৃত্যুও একটি বিতর্কিত নৈতিক আলোচনার বিষয়। আত্মহত্যা ও স্বস্তিমৃত্যু প্রকারন্তে দুটি বিষয়েই ব্যক্তির মৃত্যু তথা হত্যা হলেও, আত্মহত্যা যেখানে নিন্দনীয় ও অপরাধ বলে গণ্য হয়, স্বস্তিমৃত্যু সেখানে নির্দ্বিধায় অপরাধ বলে গণ্য হয় না বরং রাষ্ট্রের আইন তাকে মান্যতা দেয়। এমনকি স্বস্তিমৃত্যুকে 'Good Death' বা সহজ ও শান্তিপূর্ণ মৃত্যু বলেও উল্লেখ করা হয়- যেখানে করুণা বশত রোগক্লিষ্ট যন্ত্রণাকাতর মানুষের যন্ত্রণা লাঘব করতে জীবনের অবসান ঘটানো হয়। এখন প্রশ্ন ওঠে স্বস্তিমৃত্যু আসলে তো একপ্রকার হত্যারই সামিল। সুতরাং অন্যান্য হত্যা অন্যায় রূপে বিবেচিত হলে স্বস্তিমৃত্যুর নৈতিক-মূল্যায়ন কীহবে? বর্তমান প্রবন্ধটিতে সেবিষয়েরই আলোচনার প্রয়াস করা হয়েছে।
মূল শব্দ: জীবন, জীবন-যন্ত্রণা, যন্ত্রণা, মৃত্যু, মুক্তি, অধিকার, নৈতিকতা।

মূল আলোচনা:
'Euthanasia' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে 'eu' যার অর্থ 'good' (ভালো) এবং 'thanatos' যার অর্থ 'death' (মৃত্যু) নামক দুটি গ্রিক শব্দ থেকে। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে 'Euthanasia' শব্দটির অর্থ হলো 'good death' অর্থাৎ সুন্দর বা শান্তিপূর্ণ মৃত্যু। অক্সফোর্ড অভিধানে 'Euthanasia' শব্দটির যে অর্থ পাওয়া যায় তা হল– 'a quiet and easy death' (শান্ত ও সহজ মৃত্যু), অথবা 'the means of procuring this' (এইভাবে মৃত্যু ঘটানোর উপায়), অথবা 'the action of inducing a quiet and easy death' (শান্ত ও সহজ মৃত্যু ঘটানোর ক্রিয়াটি)। কিন্তু আভিধানিক বা উৎপত্তিগত অর্থের কোন কিছুর মধ্যেই 'Euthanasia' শব্দটির যে ব্যবহারিক অর্থ করা হয় তা প্রতিফলিত হয়নি। কেননা, 'Euthanasia' নিছক শান্তিপূর্ণ মৃত্যু নয় বরং তা একপ্রকার হত্যা জনিত মৃত্যু। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে স্বস্তিমৃত্যু, করুণাহত্যা, নিষ্কৃতিমৃত্যু প্রভৃতি শব্দতে Euthanasia-র আক্ষরিক অর্থ বর্ণিত হলেও, বর্তমান পরিসরে 'স্বস্তিমৃত্যু' শব্দটি এই আলোচনায় ব্যবহৃত হবে।

যদিও স্বস্তিমৃত্যু বা Euthanasia-র একমাত্র উদ্দেশ্য হলো হত্যার মাধ্যমে রোগগ্রস্ত মানুষের কষ্টের অবসান ঘটানো। আপাত দৃষ্টিতে হত্যার মধ্যে বীভৎসতা থাকলেও, এখানে হত্যার ক্ষেত্রে কৃপা করা হয়। হত্যার মধ্যে দিয়ে একজন মানুষ এখানে শারীরিক কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ করে। তাই 'Euthanasia' কে বলা হয়েছে

'good death' বা 'স্বস্তিমৃত্যু'। হত্যা-জনিত মৃত্যু হলেও স্বস্তিমৃত্যু মূলত শান্তি ও মুক্তির বার্তা বহন করে যে ব্যক্তির মৃত্যু হয় তার কাছে। এই হেতু অনেক সময় ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ এরূপ স্বস্তিমৃত্যু প্রার্থনা করে। অধ্যাপক *Peter Singer* তাঁর *Practical Ethics* গ্রন্থে স্বস্তিমৃত্যুর সংজ্ঞায় বলেছেন – "...It is now used to refer to the killing of those who are incurably ill and in great pain or distress, for the sake of those killed, and in order to spare them further suffering or distress."[১] অর্থাৎ অনারোগ্য ব্যাধি গ্রস্থ একজন মানুষকে যখন তার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য হত্যা করা হয় তখন তাকে স্বস্তিমৃত্যু বলা হয়।

স্বস্তিমৃত্যু হলো অনারোগ্য ব্যাধিতে জর্জরিত মানুষকে কৃপাবশত মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া। সাধারণত গর্ভের ভ্রূণ বিকলাঙ্গরূপে জন্ম নেওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, কিংবা গর্ভস্থ অবস্থায় শিশুর কোন অঙ্গের পূর্ণ বিকাশ না হলে, অথবা দুর্ঘটনার ফলে সুস্থ জীবন যাপন ব্যহত হলে বা বয়সকালে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে জীবন-যাপন যখন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে সেরূপ অবস্থায় স্বস্তিমৃত্যুর প্রয়োগের প্রসঙ্গ আসে।

কিন্তু বর্তমান জীবনধারাতে স্বস্তিমৃত্যু'র প্রয়োজনীয়তা যে আছে সে বিষয়ে তেমন প্রশ্নচিহ্ন না থাকলেও স্বস্তিমৃত্যুর ব্যবহারের ক্ষেত্র প্রসঙ্গ বিষয়ে নৈতিক বিতর্ক ও আলোচনা আবশ্যক হয়ে পড়ে। স্বস্তিমৃত্যু সমর্থনযোগ্য হয় একজন দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্থ মৃত্যুকামী ব্যক্তির জীবন-যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য। কিন্তু আমাদের জীবন-সৃষ্টির কারক আমরা নিজে নই। কাজেই যে জীবনের সৃষ্টিকর্তা আমি বা আমরা নই, তা শেষ করা অর্থাৎ স্বস্তিমৃত্যু ঘটানোকে অনেকেই সমর্থন করেন-না। তেমনই নিজের জীবনের উপর অধিকার আছে প্রতিটি মানুষেরই, তাই অনেক সময় দেখা যায়- যার ওপরে স্বস্তিমৃত্যু প্রয়োগ হবে সেই রোগী বা ব্যক্তি স্বয়ং মরতে রাজি নাও হতে পারে বা নিজে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অবস্থায় নাও থাকতে পারে। সুতরাং এই পরিসরে স্বস্তিমৃত্যু প্রয়োগের ক্ষেত্র গুলি আলোচনা অবশ্যক হয়ে পড়ে। অধ্যাপক পিটার সিঙ্গার তাঁর *Practical Ethics* গ্রন্থে তিন রকমের স্বস্তিমৃত্যুর কথা উল্লেখ করেছেন-

(ক) ঐচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যু (voluntary euthanasia)
(খ) অনৈচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যু (involuntary euthanasia)
(গ) ইচ্ছা-নিরপেক্ষ স্বস্তিমৃত্যু (non-voluntary euthanasia)

এখন এই তিনপ্রকার স্বস্তিমৃত্যুর আলোচনা আবশ্যক-

(ক) ঐচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যুঃ *Practical Ethics* গ্রন্থে অধ্যাপক পিটার সিঙ্গার ঐচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যুর সংজ্ঞায় বলেছেন– "Voluntary euthanasia is euthanasia carried out at the voluntary request of the person killed, who must be, when making the request, mentally competent and adequately informed."[২] অর্থাৎ যখন চরম যন্ত্রণা ক্লিষ্ট রোগীকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে তারই সম্মতি ও অনুরোধে যখন তার মৃত্যু ঘটানো হয়, তখন সেই হত্যা জনিত

মৃত্যুকে ঐচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যু বলা হয়।[৩] এপ্রসঙ্গে Derek Humphry তাঁর *Jean's Way* নামক গ্রন্থে এই প্রকার ঐচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যুর একটি উদাহরণ দিয়েছেন- তাঁর অর্থাৎ Derek Humphry'র স্ত্রী কর্কট রোগে ভুগছিলেন। ওই রোগের প্রচণ্ড যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তাঁর স্ত্রী এরূপ জীবন-যন্ত্রনা থেকে মুক্তির জন্য Humphry-কে অনুরোধ করেন। Humphry কিছু প্রাণনাশক ঔষধ সংগ্রহ করে স্ত্রীকে দেন এবং তাঁর স্ত্রী সেগুলো খেয়ে মারা যান।

এখানে আরও একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যায়, যদি কোনো রোগী তার মৃত্যুর ইচ্ছা ঠিক সময়ে বোঝাতে নাও পারে, সেই সময় যদি তার মৃত্যু ঘটানো হয় তবে সেই স্বস্তিমৃত্যুকে ঐচ্ছিক বলা হবে। এক্ষেত্রে রোগী যদি সুস্থ অবস্থায় এমন কোনও অনুরোধ রেখে যান যে তিনি কোনদিন যদি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন এবং জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোনটা ঠিক তা বুঝতে না পারেন, তাহলে যেন তার মৃত্যু ঘটানো হয়। বর্তমানকালে বিভিন্ন দেশে ঐচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যুকে আইনি স্বীকৃতি দেবার দাবি তোলা হয়। তবে অনেক বিতর্ক থাকলেও দীর্ঘদিন আন্দোলনের পরে ১৯৮০ সালে স্বস্তিমৃত্যু ঘটানোর অনুমতি পেয়েছেন নেদারল্যান্ডের চিকিৎসকেরা। এখন তারা সহজ ভাবেই মৃত্যুকামী ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাতে পারেন এবং মৃত্যু পত্রে তা লিখতেও পারেন।

(খ) **অনৈচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যুঃ** অধ্যাপক পিটার সিঙ্গার অনৈচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যুর প্রসঙ্গে বলেন– "I shall regard euthanasia as involuntary when the person killed is capable of consenting to her own death, but does not do so either because she is not asked, or because she is asked and chooses to go on living."[৪] অর্থাৎ অনৈচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যু বলতে সেইরূপ স্বস্তিমৃত্যুকে বোঝায় যেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার প্রাণনাশের ব্যাপারে সম্মতি দিতে সমর্থ কিন্তু বাস্তবে তিনি সম্মতি দেননি।[৫] এখানে দুটি বিষয়ের একত্রে সমাবেশ ঘটেছে- যে ব্যক্তি বেঁচে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে তাকে হত্যা করা এবং যে ব্যক্তি মৃত্যুর জন্য সম্মতি দেয়নি তাকে হত্যা করার মধ্যে পার্থক্য আছে। তবে শেষের ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলে হয়তো সে সম্মতি দিতে পারতো, কিন্তু তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি। এখানে প্রশ্ন হল- কেন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি? যদি একজন ব্যক্তি স্বস্তিমৃত্যুর স্বপক্ষে সম্মতি দিতে পারতো তাহলে তার স্বস্তিমৃত্যু কেন গ্রহণ করা হয়নি তার কোন কারণ জানা যায় না। আবার এমন কোন ব্যক্তি যে তার নিজের মৃত্যুতে সম্মতি দেয়নি, কিন্তু অসহ্য যন্ত্রণা থেকে তাকে মুক্তি দেওয়ার জন্য তাকে হত্যা করা হয়েছে, তবুও এরূপ হত্যাজনিত মৃত্যুকে স্বস্তিমৃত্যু বলা হচ্ছে। যদিও যে ব্যক্তির স্বস্তিমৃত্যু ঘটানো হচ্ছে তার ইচ্ছাকে উপেক্ষা করা অস্বাভাবিক। এ-থেকে মনে করা হয় সাধারণত অনৈচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যুর দৃষ্টান্ত অতিবিরল বা নেই বললেই চলে।

(গ) **ইচ্ছা-নিরপেক্ষ স্বস্তিমৃত্যুঃ** *Practical Ethics* গ্রন্থে অধ্যাপক পিটার সিঙ্গার ইচ্ছা-নিরপেক্ষ স্বস্তিমৃত্যুর স্বরূপ আলোচনাতে বলেছেন– "If a human being is not capabel of understanding the choice between life and death, euthanasia would be neither voluntary, nor involuntary, but non-voluntary."[৬] অর্থাৎ কোন মানুষ যখন জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করতে অক্ষম তখন ওই ব্যক্তির স্বস্তিমৃত্যু আয়োজন করা হলে তা হবে ইচ্ছা-নিরপেক্ষ স্বস্তিমৃত্যু।[৭]

যে সকল ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে রোগগ্রস্থ আছেন, যারা জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোনও পার্থক্য বুঝতে পারেন-না তাদের ক্ষেত্রে এরূপ স্বস্তিমৃত্যু প্রয়োগ করা হয়। যেমন- প্রতিদ্বন্দ্বী শিশু, দুর্ঘটনায় ভীষণভাবে আহত অথবা বার্ধক্যের কারণে বোধশক্তি লুপ্ত হয়েছে এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইচ্ছা-নিরপেক্ষ স্বস্তিমৃত্যুর অনেক ঘটনা আমরা সচরাচর দেখতে পাই। এই পরিসরে একটি উদাহরণ উল্লেখ করা যায়-

লুই রিপাওলির একটি পুত্র সন্তান ছিল যে জন্ম থেকেই শয্যাশায়ী, জড় বুদ্ধিসম্পন্ন ও অন্ধ। রিপাওলির দেয়া বর্ণনা অনুযায়ী- "He was just like dead all the time... he couldn't do anything."[৮] পাঁচ বছর বয়সী ঐ শিশুকে রিপাওলি প্রাণ নাশক ঔষধ প্রয়োগ করে স্বস্তিমৃত্যু বা হত্যা ঘটান।

আরও একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়, ১৯৮৮ সালে স্যামুয়েল লিনারেস নামে এক শিশু কিছু একটা গিলে ফেলে, ফলস্বরূপ তার শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। চিকাগোর হাসপাতালে কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্রের মাধ্যমে মৃতপ্রায় অবস্থায় তাকে আট মাস বাঁচিয়ে রাখা হয়। তারপর চিকিৎসকরা সেখান থেকে তাকে পরিবর্তিত করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তার পিতা কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্র খুলে দিয়ে তাকে কোলে নিয়ে দোলাতে থাকে যত সময় পর্যন্ত না তার মৃত্যু হয় এবং এক সময় সে জীবন তথা মৃত্যু-যন্ত্রনা থেকে মুক্তি পায়।

আমরা স্বস্তিমৃত্যুর বিভিন্ন প্রকার লক্ষ্য করলাম। এখন স্বস্তিমৃত্যু কিভাবে প্রয়োগ করা হবে তার ভিত্তিতে স্বস্তিমৃত্যুর আরও দুটি ভিন্ন প্রকার আছে-

১. সক্রিয় স্বস্তিমৃত্যু (active euthanasia)
২. নিষ্ক্রিয় স্বস্তিমৃত্যু (passive euthanasia)

১. সক্রিয় স্বস্তিমৃত্যুঃ সক্রিয় স্বস্তিমৃত্যু বলতে বোঝায় যেখানে রোগগ্রস্ত মানুষটিকে চরম কষ্ট ভোগের হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য প্রাণঘাতী ঔষধ প্রয়োগ করে সোজাসুজি তার মৃত্যু ঘটানো। যেমন- ক্যান্সার আক্রান্ত কোন ব্যক্তি যখন তার জীবন-প্রান্তসীমায় উপস্থিত হন তখন চিকিৎসক একটি প্রাণঘাতী ঔষধ প্রয়োগ করে তাকে মুক্তি দিতে পারেন। পিটার সিঙ্গার তাঁর *Practical Ethics গ্রন্থে* একটি উদাহরণের উল্লেখ করেছেন। উদাহরণটি নিম্নরূপ –

১৯৭৩ সালে George zygmaniak নামে নিউ জার্সির একজন বাসিন্দা মোটর-সাইকেল দুর্ঘটনায় গুরুতর ভাবে আহত হয়। তার আপাদমস্তক পক্ষাঘাতের কবলে

চলে যায়। এই অবস্থায় তার বাঁচার ইচ্ছা ছিল না। এমনকি সে বাকশক্তিও হারিয়ে ফেলে। এরকম পরিস্থিতিতে সে ডাক্তার ও তার ভাই লেস্টারের কাছে মৃত্যু ভিক্ষা চায়। লেস্টার হাসপাতালে খবর নিয়ে জানতে পারে যে জর্জের সুস্থ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। লেস্টার একটি বন্দুক নিয়ে হাসপাতালে আসে ও জর্জকে জিজ্ঞেস করে যে সে পিস্তলের গুলিতে তার মৃত্যু ঘটাবে কিনা। জর্জ সম্মত হলে লেস্টার পিস্তলের গুলিতে জর্জের মৃত্যু ঘটায়।

সক্রিয় স্বস্তিমৃত্যু বহু দেশে বেআইনি বলে ঘোষিত হয়েছে, কারণ সাধারণভাবে মেরে ফেলা ও সক্রিয় স্বস্তিমৃত্যুর মধ্যে তেমন কোন তফাৎ নেই। এমনকি সক্রিয় স্বস্তিমৃত্যুর নামে অনেক হত্যাকান্ড হবার আশঙ্কা থেকেই যায়। কাজেই সক্রিয় স্বস্তিমৃত্যু আইনসম্মত করা বিতর্কের বিষয়।

২. নিষ্ক্রিয় স্বস্তিমৃত্যুঃ নিষ্ক্রিয় স্বস্তিমৃত্যু বলতে বোঝায় যেখানে রোগীর সব ধরণের চিকিৎসা বন্ধ করে দিয়ে তার মৃত্যুর পথ প্রশস্থ করা হয়, যেখানে সাক্ষাৎ ভাবে কারো কর্মের ভূমিকা থাকে না। যেমন, চিকিৎসক রোগীর শরীরের সঙ্গে যুক্ত শ্বাসযন্ত্র প্রভৃতির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে রোগীর মৃত্যুকে সহজ করে তোলে।

‘স্পাইনা-বাইফিডা’ (spina bifida) নামক রোগে আক্রান্ত শিশুদের এভাবে চিকিৎসা বন্ধ করে দিয়ে নিষ্ক্রিয় স্বস্তিমৃত্যুর কথা বলেছেন প্রখ্যাত ইংরেজ চিকিৎসক John Lorber। দেশের স্বাস্থ্যবিধি মেনেই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে সব শিশুর বিকৃতি পরিমাণ বেশি, চিকিৎসাতে তাদের বিশেষ সাড়া দেওয়া সম্ভাবনা নেই, মানবিকতার খাতিরে তাদের চিকিৎসা বন্ধ করে তাদের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করাই নৈতিকভাবে উচিত কাজ হবে।[৯]

এখন প্রশ্ন হল স্বস্তিমৃত্যু সমর্থনযোগ্য কিনা? এককথায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকে চিকিৎসকগণ এই স্বস্তিমৃত্যুর বিরোধিতা করে আসছেন পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক হিপোক্রেটারসের শপথ বাক্য অনুসরণ করে। শপথ বাক্যটি হল– ‘কোন ব্যক্তি প্রাণঘাতী ঔষধ চাইলেও তাকে তা দেয়া যাবে না এবং এইরূপ ঔষধ ব্যবহার করবার জন্য কোন ব্যক্তিকে পরামর্শ দেওয়া চলবে না’।[১০] প্রসঙ্গত আমরা বিভিন্ন প্রকার স্বস্তিমৃত্যু লক্ষ্য করেছি। যদিও প্রত্যেক ক্ষেত্রে মানুষকে মুক্তি দেওয়ায় স্বস্তিমৃত্যুর লক্ষ্য। কিন্তু বর্তমানকালে এই প্রশ্ন নিয়ে বিভিন্ন বিতর্ক লক্ষ্য করা যায়।

স্বস্তিমৃত্যুর পক্ষে আমরা মোটামুটি তিন ধরনের যুক্তি ও বিপক্ষে চারধরনের যুক্তি দেখতে পাই। এই দুই পক্ষই মূলত দুটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন। একটি হল- স্বস্তিমৃত্যু কোন পরিস্থিতিতে নীতি-ধর্মের বিচারের সমর্থনযোগ্য হবে? এবং অন্যটি স্বস্তিমৃত্যুকে কি আইনসম্মত করা উচিত? সুতরাং স্বস্তিমৃত্যুর নৈতিকতা এবং আইনের সুরক্ষা দুটিই বিতর্কের বিষয়।

পক্ষের যুক্তি- প্রথমত, নীতিধর্মের দিক থেকে দেখলে, কোন কিছুকে স্বাধীনভাবে বেছে নেওয়া (right of free choice) মানুষের মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে। মানুষের এই স্বেচ্ছাকৃত কাজে রাষ্ট্র তখনই বাধা দিতে পারে যখন তা অন্যের ক্ষতি করবে। কিন্তু এ জাতীয় ক্ষতি ঘটানোর কোন আশঙ্কা স্বস্তিমৃত্যুর ক্ষেত্রে থাকে না। যে স্বেচ্ছায় নিজের মৃত্যু ঘটাতে চায় সেক্ষেত্রে সে অন্যের ক্ষতির কারণ হয় না। সুতরাং ব্যক্তি স্বাধীনতার একটি অনুমোদন যোগ্য (permissible) কর্মধারা হিসেবে স্বস্তিমৃত্যুকে দেখা উচিত। কোন ভাবে স্বস্তিমৃত্যুর পথে আইনি বাধ্যবাধকতা বাধা হওয়া উচিত নয়।

দ্বিতীয়ত, অনেক মৃত্যু পথযাত্রীর কাছে আত্মমর্যাদা রক্ষার প্রশ্ন একটা বড় প্রশ্ন। তারা যে ক্রমশ সংসারে বোঝা হয়ে উঠছে সেটা তারা বুঝতে পারেন। একদিকে অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণা ও অন্যদিকে মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে তারা যদি স্বস্তিমৃত্যু প্রার্থনা করেন এবং তা যদি মঞ্জুর না করা হয় তবে তা নির্দয় কাজ হবে।

তৃতীয়ত, কোন কোন রোগের মৃত্যু যন্ত্রণা এত বেশি যে রোগীর কাছে ও তার আত্মীয় পরিজনের কাছে তা সহ্যের বাইরে চলে যায়। এমন ক্ষেত্রে স্বস্তিমৃত্যু মঞ্জুর না হলে নিষ্ঠুর কাজ হবে।

বিপক্ষে যুক্তি- প্রথমত, স্বস্তিমৃত্যু এক ধরনের প্রাণনাশের ঘটনা, যা কোন যুক্তিতেই মেনে নেওয়া যায় না; তাই স্বস্তিমৃত্যু অযৌক্তিক।

দ্বিতীয়ত, স্বস্তিমৃত্যু একবার আইনের চোখে অনুমোদন পেয়ে গেলে সেই সূত্র ধরে অনেক প্রাণনাশের ঘটনা অনুমোদিত হয়ে যাবে। যেমন- 'বাকশক্তিহীন চলচ্ছক্তিহীন চিররুগ্ন শিশুর ক্ষেত্রে কিংবা দীর্ঘকাল ধরে কোমায় আচ্ছন্ন রুগীর ক্ষেত্রে এভাবে চলতে থাকলে একটা সময় শিশু হত্যার মতো গুরুতর অপরাধও আইনের দৃষ্টিতে পার পেয়ে যেতে পারে। সুতরাং প্রথম থেকেই সাবধান হওয়া ভালো। অর্থাৎ কোন ধরনের স্বস্তিমৃত্যুকে স্বীকৃতি না দেওয়া ভালো'।[১১]

তৃতীয়ত, এখন যদি সমস্ত মৃত্যুকে আইনি স্বীকৃতি দেয়া হয়, তাহলে এর যে অপব্যবহার হবে না- তার কোন নিশ্চয়তা নেই, কেননা সর্বক্ষেত্রেই যে করুণাবশত স্বস্তিমৃত্যু দেয়া হবে তা নাও হতে পারে। চিকিৎসক বা আত্মীয় পরিজন আর্থিক লোভ বা সম্পত্তির লোভে স্বস্তিমৃত্যুর নামে অন্যায় কাজ করতে পারেন। তাই স্বস্তিমৃত্যুকে আইনের স্বীকৃতি দেয়া ঠিক হবে না।

চতুর্থত, তাছাড়া এমনও হতে পারে চিকিৎসক ঠিকমতো রোগ নির্ণয় করতে পারেনি। এমন অবস্থায় রোগীর স্বস্তিমৃত্যু ঘটিয়ে দিলে তা অনৈতিক কাজ হবে। সুতরাং কোন-ভাবেই স্বস্তিমৃত্যুকে আইনি-স্বীকৃতি দেওয়া উচিত নয়।

এছাড়াও স্বস্তিমৃত্যুর সমর্থন যোগ্যতার ব্যাপারে উপযোগবাদীদের (utilitarianism) কিছু বক্তব্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

১. বেন্থাম এবং মিলের উপযোগবাদ (Classical utilitarianism) অনুসারে, যেহেতু আত্মসচেতন ব্যক্তির মৃত্যুর ভয় আছে সেহেতু তাদের কোন একজনকে হত্যা করলে জীবিতদের মধ্যে তার খারাপ প্রভাব পরে।

২. অগ্রাধিকারমূলক উপযোগবাদ (Preference utilitarianism) অনুসারে মৃত্যুবরণ অপেক্ষা জীবিত থাকা প্রিয়তর- এই মনোভাব ব্যাহত হয় যদি কোন আত্মসচেতন বিচারশীল ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়। তাই বিচারশীল ব্যক্তিকে হত্যা করা ঠিক হবে না।

তবে উপরোক্ত যুক্তিগুলিকে খণ্ডন করা যায় –

১. বেন্থাম এবং মিলের যুক্তিটি ঐচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। দুর্বিষহ যন্ত্রণার জন্য যে ব্যক্তি জীবিত থাকার থেকে মৃত্যুকে বেশি গুরুত্ব দেন, তার ভয় মৃত্যুকে নিয়ে নয় বরং জীবিত থাকাকে কেন্দ্র করে। রোগী যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য হত্যা করার ব্যাপারে সম্মতি দিলে তবেই তার মৃত্যু ঘটানো হয়; না হলে নয়। তাই জীবিতদের উপর তার ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে না। বরং ঐচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যু সমর্থিত হলে মানুষের মধ্যে মৃত্যুভয় থাকবে না।

২. অগ্রাধিকারমূলক উপযোগবাদেও ঐচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যু সমর্থিত হয়, তার কোন বিরোধিতা করা হয় না। অগ্রাধিকারমূলক উপযোগবাদ অনুসারে ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা যদি মূল্যবান হয় তাহলে জীবিত ব্যক্তির কাছে জীবিত থাকা যেমন মূল্যবান মরণে-ইচ্ছুক ব্যক্তির কাছে মরণও তেমনই মূল্যবান। বরং তার ইচ্ছাকে অবহেলা করা খারাপ কাজ হবে। তাই মৃত্যুকামী ব্যক্তিকে স্বস্তিমৃত্যু বা হত্যা করা অন্যায় কাজ নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে যদিও স্বস্তিমৃত্যুর বিরুদ্ধে অনেক বাধা বা আপত্তি আছে, তবুও অনেক ক্ষেত্রেই তা প্রয়োগ যোগ্য করা হয়। তবে এক্ষেত্রে কিছু শর্ত আরোপিত হয়। শর্তগুলি নিম্নরূপ –

১. কেবল চিকিৎসকই এই প্রকার হত্যার জন্য যোগ্য ব্যক্তি।

২. মৃত্যুর কামনাকে রোগী সরাসরি ভাবে প্রকাশ করবেন, যাতে তার সম্মতি সম্পর্কে কারো কোন সংশয় না থাকে।

৩. রোগীর মৃত্যু সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থায়ী হতে হবে।

৪. অনারোগ্য ব্যাধিতে রোগীকে আক্রান্ত হতে হবে এবং শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা হবে সহ্যের বাইরে।

৫. মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকবে না রোগীকে যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করার।

৬. রোগীর মৃত্যু সম্পর্কে সিদ্ধান্ত তাঁর চিকিৎসক অন্য কোন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলোচনা করবেন এবং তারপর সিদ্ধান্ত নেবেন।

উপসংহারঃ স্বস্তিমৃত্যুর যে সংজ্ঞা বা অর্থ করা হয় (সহজ ও শান্ত মৃত্যু) তা অনুযায়ী সক্রিয় স্বস্তিমৃত্যু অপেক্ষা নিষ্ক্রিয় স্বস্তিমৃত্যু বেশি বাঞ্ছনীয়। কেননা এখানে স্বস্তিমৃত্যুর

প্রকৃত অর্থই প্রকাশ পেয়েছে। এখন সক্রিয় স্বস্তিমৃত্যুর আইনি-দাবি বা গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে বিতর্ক থাকলেও, যে সকল স্থানে নিষ্ক্রিয় স্বস্তিমৃত্যুর সম্মতি পায়নি সে সকল স্থানে সম্মতি দেওয়ার প্রসঙ্গ আসে এবং এই নিষ্ক্রিয় অর্থেই রোগীকে তার অশেষ রোগ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য হত্যা-জনিত মৃত্যু অর্থাৎ স্বস্তিমৃত্যু ঘটানো হলে বরং তা তার কাছে হবে শান্তির এবং নীতি-সম্পন্ন। সুতরাং স্বস্তিমৃত্যুর আইনি-দাবি বিষয়ে একটি নৈতিক আবেদন থেকেই যায়।

তথ্যসূত্র:

১. Singer, Peter, *Practical Ethics*, Cambridge University Press, America, Third Edition- 2011, Page- 157.
২. ঐ।
৩. ধর, বেনুলাল, *ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা*, মিত্রম, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ২০১৭, পৃষ্ঠা- ৫৮।
৪. Singer, Peter, *Practical Ethics*, Cambridge University Press, America, Third Edition- 2011, Page-158.
৫. পাল, সন্তোষ কুমার, *ফলিত নীতিশাস্ত্র* (প্রথম খন্ড), লেভান্ত বুকস, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ- ২০২১, পৃষ্ঠা- ১১৪।
৬. Singer, Peter, *Practical Ethics,* Cambridge University Press, America, Third Edition- 2011, Page- 158.
৭. পাল, সন্তোষ কুমার, *ফলিত নীতিশাস্ত্র* (প্রথম খন্ড), লেভান্ত বুকস, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ- ২০২১, পৃষ্ঠা- ১১৪।
৮. গুপ্ত, দীক্ষিত, *নীতিশাস্ত্র*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ– ২০১৭, পৃষ্ঠা- ২২৪।
৯. সরকার, স্বারা, *নীতিবিদ্যা: ফলিত পরিবেশ ও অধিনীতিবিদ্যা*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ২০২২, পৃষ্ঠা- ৮১-৮২।
১০. ধর, বেনুলাল, *ব্যবহারিক নীতিদর্শন,* মিত্রম, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ২০১৭, পৃষ্ঠা- ৫৭।
১১. চক্রবর্তী, সোমনাথ, *কথায় কর্মে এথিক্স,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ- ২০২০, পৃষ্ঠা- ১৮৮।

গ্রন্থপঞ্জি:

- গুপ্ত, দীক্ষিত, *নীতিশাস্ত্র*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ- ২০১৭।
- চক্রবর্তী, সোমনাথ, *কথায় কর্মে এথিক্স,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ- ২০২০।

- ধর, বেনুলাল, *ব্যবহারিক নীতিদর্শন,* মিত্রম, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ২০১৭।
- পাল, সন্তোষ কুমার, *ফলিত নীতিশাস্ত্র,* লেভান্ত বুকস, কলকাতা, প্রথম খন্ড, তৃতীয় সংস্করণ- ২০২১।
- সরকার, স্বপ্না, *নীতিবিদ্যা : ফলিত পরিবেশ ও অধিনীতিবিদ্যা,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ২০২২।
- Singer, Peter, *Practical Ethics,* Cambridge University Press, America, Third Edition- 2011.

অনুসন্ধানে বাঁকাউল্লা : অপরাধ-কাহিনির নানা দিক

সৌপ্তিক কুমার মান্না
গবেষক, আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ,
দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য বললেই সবার প্রথমে মনে আসে প্রাইভেট ডিটেকটিভদের কথা, বইয়ের পাতায় কিংবা সিনেমার পর্দায় তাদের অসামান্য কীর্তিকলাপের কথা। যাদের ক্ষুরধার বুদ্ধি, দৃষ্টি, অপরাধী শণাক্তকরণের ক্ষমতার কাছে দাঁড়াতে পারেনা সরকারি পুলিশ। কিন্তু, ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় অতীত কাল থেকে উনিশ শতকের বেশ কিছুটা সময় পর্যন্তও রাজশক্তি মনোনীত সরকারি গুপ্তচর, আরক্ষক, দারোগা, সশস্ত্র বাহিনী-ই সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায়, অপরাধ বিনাশে এবং আপরাধী চিহ্নিতকরণে মূল ভূমিকা পালন করতো। এই প্রবন্ধে মূলত তেমনই এক দুঁদে, তুখোড় বুদ্ধি সম্পন্ন বাঙালি দারোগা বাঁকাউল্লার কাহিনির দিকে ফিরে তাকানোর চেষ্টা করা হয়েছে। যেখানে ঘটনার সাপেক্ষে গোয়েন্দার বৈচিত্র্যময় কার্যকলাপের পাশাপাশি তৎকালীন সমাজ, সমাজের বিভিন্ন মানুষ, তাদের অবস্থান, অপরাধ ও অপরাধী ইত্যাদি সম্পর্কে একটা সম্পূর্ণ চালচিত্র আমরা খুঁজে পাই। এমনকি বেশ কিছু কাহিনিতে অপরাধী ও দারোগার সহকারী উভয় ভূমিকাতেই মহিলাদের সক্রিয় ভূমিকার কথা জানা যায়। এছাড়াও, *বাঁকাউল্লার দপ্তর*এর কাহিনিগুলির মধ্যে দিয়ে সেই সময়ে শাসনতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় ও আইনি কাজে ব্যবহৃত শব্দ, ভিন্ন ভিন্ন পেশার মানুষের মুখের ভাষার সাথে নতুন করে পরিচিত হতে পারা যায় – যা আজকের দিনে বিশেষ এক সাহিত্য মূল্য বহন করে। তাই, এই প্রবন্ধে ক্রম অগ্রসরমান বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের ধারায় প্রায় বিস্মৃত এই দারোগার কাহিনি বিচার-বিশ্লেষণ করে স্থান-কাল-সমাজ-ইতিহাস-রাজনীতি-অর্থনীতির পরিবর্তনের সাথে সাথে অপরাধ ও অপরাধীর বিভিন্ন দিককে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে।
সূচক শব্দ : প্রাচীন রক্ষী-সংস্থা, পুলিশি ব্যবস্থা, বাঁকাউল্লা, ইতিহাস, সমাজ, অপরাধ ও অপরাধী, প্রথম দুঁদে বাঙালি গোয়েন্দা, মহিলাদের ভূমিকা, সাহিত্য মূল্য।

মূল আলোচনা :

মনুষ্য সমাজের মধ্যে অপরাধ ও অপরাধী আবহমান কাল ধরে বিরাজ করছে। সময়ের সাথে সাথে শুধু বদলেছে অপরাধের মাত্রা, চরিত্র। তাই, সেই অতীত কালেই সমাজের কল্যাণার্থে অপরাধ নির্মূল করতে, আপরাধী শণাক্তকরণে, শাস্তি বিধানের জন্য থানা, পুলিশ, গোয়েন্দারও গোড়াপত্তন হয়েগিয়েছিল। মনুস্মৃতিতে উল্লেখ পাওয়া যায় গ্রামীণ রক্ষী-সংস্থার, যার কর্মীরা ‘গুল্ম’ নামে পরিচিত ছিল (বসু ৭)। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে

আরক্ষকগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই আরক্ষকগণের অধীনে নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষিত গুপ্তচর নিযুক্ত থাকত। যারা অপরাধীদের গতিবিধি সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করত। আবার, ‘স্তোভক’ নামের স্বেচ্ছাসেবক গুপ্তচর বা ‘সূচক’ নামাঙ্কিত রাজ গুপ্তচরেরা রাজকার্যের সুবিধার্থে অপরাধীদের বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহ করতো (বসু ৯)। এছাড়াও ‘স্থানপাল’ ও ‘স্থানিক’র কথা আছে যারা আঞ্চলিক রক্ষাকেন্দ্রের দপ্তর পরিচালনা করতেন (বসু ৭)। পরবর্তীতে আকবরের রাজত্বকালেও আমরা দেখি সুবেদার বা নাজিম পদ্ধতির উদ্ভব হতে, যাদের অধীনে থাকত একাধিক ফৌজদার (Adhav 2)। অর্থাৎ, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখে রাজকার্য পরিচালনা করার ক্ষেত্রেই মূলত এই সমস্ত পদ বা সংস্থার উৎপত্তি হয়েছিল। এমনকি, ব্রিটিশ কোম্পানির শাসন কালেও ভারতে সরকারি ভাবে পুলিশি ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও উন্নততর করা হয়েছিল এই একই কারণে। লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসের হাত ধরে ভারতে পুলিশি ব্যবস্থার সূচনা হলেও তা সুদৃঢ় হয়েছিল লর্ড কর্ণওয়ালিশের সময়ে (Adhav 3)। তিনিই প্রথম জমিদারের হাত থেকে প্রশাসনিক দায়িত্ব সরিয়ে নিয়ে প্রত্যেক জেলাকে কয়েকটি থানায় ভাগ করেন ও ভারতীয়দের নিযুক্ত করেন দারোগা হিসেবে। এই দারোগা এবং তার অধীনস্থ সশস্ত্র বাহিনীই উনিশ শতকের বাংলায় খুন, লুটতরাজ, ডাকাতি ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান চালাত এবং অপরাধী শণাক্ত করত। মূলত বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য-ধারায় প্রাইভেট ডিটেক্টিভ, সখের গোয়েন্দা আসার অনেক আগে থেকেই যে সমস্ত ক্রাইম-কাহিনি প্রচলিত ছিল তার কেন্দ্রে ছিল এই সমস্ত সরকারি ভারতীয় দারোগারাই। এই প্রবন্ধে তেমনই এক বাঙালি দারোগা এবং তার কাহিনিকে ফিরে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে, যাকে হাজার মতপার্থক্যের সত্ত্বেও বাংলার প্রথম সার্থক গোয়েন্দা বলে ধরে নেওয়া যায়।

একুশ বাইশ বছরের ‘চালাক চতুর ছোকরা’, হঠাৎই হয়ে উঠল কোম্পানির শাসনাধীনে বাংলার দারোগা। যে পদের মান-সম্ভ্রম-খ্যাতি-প্রতিপত্তি সম্পর্কে না জানে এমন কেউ নেই। আর তার প্রথম চাকরির প্রথম অনুসন্ধানই এনে দিল সুখ্যাতি, পুরস্কার। কিন্তু, কালের নিয়মে ইতিহাসের পাতায় আজ প্রায় বিস্মৃত এক নাম। বাঙালি তার মগজাস্ত্রে শাণ দিতে দিতে কখন যে শুধুমাত্র ২১, রজনীসেন রোড আর ৬৬, হ্যারিসন রোডের গোলক ধাঁধাঁয় নিজেকে আটকে ফেলেছে তা হয়তো নিজেরাও খেয়াল করতে পারে নি। তাই উনিশ শতকের সেই ক্রান্তিকালীন পরিস্থিতিতেও একজন বাঙালি যুবক দারোগার তুখড় বুদ্ধি, মানসিক দৃঢ়তা ও সাহসের সঙ্গে আজকের বাঙালি ততটা পরিচিত নয়। বিস্মৃত এই বাঙালি যুবকের নাম বাঁকাউল্লা। অবশ্য তার নাম নিয়ে মতপার্থক্য আছে - সুকুমার সেনের মতে এই বাঁকাউল্লা আসলে বরকতউল্লা খাঁ (*বাঁকাউল্লার দপ্তর* ১১) আবার অধ্যাপক মৃণালকুমার বসু’র মতে বাঁকাউল্লা ও বরকতউল্লা এক ব্যক্তি নন বরং মুনশী বাঁকাউল্লা নামে একজন একস্ট্রা এসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব পুলিশ-এর সন্ধান পাওয়া যায় যিনি পদোন্নতির আগে দারোগা ছিলেন

(*বাঁকাউল্লার দপ্তর* ১৫)। আবার, *বাঁকাউল্লার দপ্তর*-এর রচয়িতা নিয়েও দ্বন্দ্ব আছে। সুকুমার সেন-এর মতে এটি প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের পক্ষেও লেখা সম্ভব, যদিও তিনি নির্দিষ্ট করে কিছু বলেননি (*বাঁকাউল্লার দপ্তর* ১৩)। অন্যদিকে শ্রী অশোক উপাধ্যায়ের মতে এর রচয়িতা বটতলা-যুগের সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (*বাঁকাউল্লার দপ্তর* ১৫)।

কিন্তু প্রায় সার্ধশতবর্ষের অধিক সময় অতিক্রম করে এসে গবেষণার এই পর্যায়ে বিখ্যাত ইংরেজ কবি ও নাট্যকার শেক্সপিয়ারের 'রোমিও এন্ড জুলিয়েট' নাটকের একটি সংলাপ মনে আসছে "What's in a name?" (Shakespeare 912), যার বহুল প্রচলিত বাংলা তর্জমাটি হল 'নামে কি আসে যায়'। হ্যাঁ, এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে উপযুক্ত প্রমাণ ও উপাদানের অপ্রতুলতাকে উপেক্ষা করে এখন লেখক-দ্বন্দ্ব বা নাম-দ্বন্দ্ব ঘোঁচানো বোধ হয় সম্ভবপর নয়। কিন্তু এই মত পার্থক্যকে সরিয়ে রেখে আমরা বাঁকাউল্লার সময় ও সেই সময়ের নিরিখে ইতিহাস ও সমাজের বাতাবরণের মধ্যে তার বর্ণিত ঘটনাগুলির দিকে পুনরায় ফিরে তাকাতে পারি। আসলে একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত গোয়েন্দা গল্প বা উপন্যাসকে মূল সাহিত্যধারার আঙিনায় এনে বিচার করা হবে কিনা সেটা নিয়েই একটা প্রশ্ন ছিল। গোয়েন্দা গল্প 'পাঠকের মন পায়, তবু মান পায় না' (*গোয়েন্দা আর গোয়েন্দা*) এমন কথাও প্রচলিত ছিল। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় *ব্যোমকেশের ডায়েরী*র ভূমিকায় লিখেছেন "ডিটেকটিভ গল্প সম্বন্ধে অনেকের মনে একটা অবজ্ঞার ভাব আছে যেন উহা অন্ত্যজ শ্রেণীর সাহিত্য..."। তবে, এই ধারণার পরিবর্তন হতে বেশ কিছুটা সময় লেগেছে। কিন্তু, উনিশ শতকের চল্লিশের দশক বা তার পরবর্তী সময়ে যে সমস্ত গোয়েন্দা কাহিনি পাওয়া যাচ্ছে সেগুলি মূলত ছিল দারোগা-কাহিনি। সেখানে নিছক গল্প বা উপন্যাসের আদল ছিল না, ফলত সেই কাহিনিগুলিকে প্রাথমিক ভাবে সাহিত্যের মূল ধারার সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারা না গেলেও ব্রিটিশ শাসিত বাংলা তথা ভারতের অপরাধ ও অপরাধী জগতের যে খণ্ডচিত্র উঠে আসছে তার মধ্যে থেকে সেই সময়ের মানুষের জীবনযাপন, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর একটা পরিচয় পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, গোয়েন্দা কাহিনি রচনার অনেক আগে থেকেই বাংলায় উনিশ শতকীয় বাবু-কালচার এবং কলকাতার সংস্কৃতি নিয়ে নকশা জাতীয় রচনার ধারা শুরু হয়েছিল ১৮২১ সাল থেকে *কলিকাতা কমলালয়*-এর মধ্য দিয়ে। যেখানে কাহিনিগুলির মধ্যে নিরেট কোনো গল্প পাওয়া না গেলেও বাংলার সমাজ, হঠাৎ বড়লোক হয়ে ওঠা পাশ্চাত্য শিক্ষিত বাবুদের সমাজ-সংস্কৃতি ও সেই সময়টাকে জানার-বোঝার জন্য এগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব যেমন আছে, পাশাপাশি রচনাভঙ্গি, শব্দ ব্যবহার ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তার একটা সাহিত্যিক মূল্যও উঠে আসছে। একইরকম ভাবে বাংলার প্রাচীন গোয়েন্দা কাহিনির নিদর্শন হিসেবে বাঁকাউল্লার কাহিনিগুলিতেও আমরা সমাজের খণ্ডচিত্র খুঁজে পাচ্ছি, যা সেই সময়ের অপরাধ জগতের ক্যানভাস স্বরূপ।

প্রথম দিকেই বলেছি *বাঁকাউল্লার দপ্তর*-এর রচনাকাল সম্পর্কে সঠিক মন্তব্য করা যায় না, অনুমান করা যায় মাত্র। কিন্তু, 'পূর্বাভাষ-আত্মকথা' অংশ লক্ষ্য করলে একটা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কালপর্ব পাওয়া যায়। যে কালপর্বের কথা বাঁকাউল্লা নিজেই উল্লেখ করেছে "বেন্টিঙ্ক বাহাদুরের আমলেই কড়াকড়ির সূত্রপাত। ঠগী কমিস্যনর দেশে দেশে, নগরে নগরে... ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন..." (*বাঁকাউল্লার দপ্তর* ২০)। অর্থাৎ, এখানে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে বেন্টিঙ্ক ১৮৩৫ সালে যে 'ঠগী এন্ড ডেকয়েটি ডিপার্টমেন্ট' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার কথা বলা হচ্ছে এবং এই বিভাগের কমিশনার উইলিয়াম স্লীম্যান-এর নেতৃত্বে (১৮৩৫-১৮৩৯) এই সময়েই শিক্ষিত-চালাক-চতুর-বনেদি বংশজাত ছেলেদের দারোগাগিরির কাজে নিযুক্ত করা হচ্ছিল। এবং বাঁকাউল্লাও এই সময়ে একুশ-বাইশ বছর বয়সে দারোগার চাকরি পায়। অন্য দিকে হার্ডিঞ্জের (ভারতের গভর্নর জেনারেল, ১৮৪৪-১৮৪৮) কথা (*বাঁকাউল্লার দপ্তর* ১৯) উল্লেখ করায় বলা যায় মোটামুটি ভাবে বাঁকাউল্লা কোম্পানি শাসিত ভারতে দারোগাগিরির কাজে যুক্ত ছিল আনুমানিক ১৮৩৫-১৮৪৮ সালের এই কালপর্বে।

এখন আমরা *বাঁকাউল্লার দপ্তর*-এ বর্ণিত কাহিনিগুলির বিষয়ের দিকে নজর দিতে পারি। ঘটনাগুলি পাঠ করতে গেলে বোঝা যায় মূলত ঠগীদের দমন করার উদ্দেশ্য নিয়েই পুলিশি ব্যবস্থা বা গোয়েন্দা বিভাগের সূত্রপাত করা হলেও ঘটনাগুলির মধ্যে শুধুমাত্রই তা নেই, বরং আরো বিচিত্র ধরনের ঘটনা পাওয়া যায়। 'গহনাভোজী কুমীর', 'নিস্তার', 'মামুদ হাতি', 'হারানী' নামাঙ্কিত কাহিনির মধ্যে নিছক ডাকাতি বা ঠগীদের কার্যকলাপের কথা আছে। এছাড়াও আছে প্রণয় বা প্রেমের ব্যর্থতা থেকে প্রতিহিংসা ('হাতকাটা হরিশ', 'হরিদাস বনাম কৃষ্ণদাস'), সরকারি নথি জাল করা ('নবীন নবেসেন্ধা'), সম্পত্তি হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্যে জমিদারি ষড়যন্ত্র ('রায় মহাশয়'), নীলকর-মহাজন-গণআন্দোলন এবং হত্যা ('দেওয়ানজি', 'উমোকান্ত') ইত্যাদি প্রসঙ্গ। কাহিনিগুলির মধ্যে থেকে আমরা সেই সময়ের সমাজ ব্যবস্থার একটা ছবি পাচ্ছি, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে পাচ্ছি যারা অপরাধের সঙ্গে জড়িত। 'রায় মহাশয়' কাহিনিতে দেখা যাচ্ছে ব্রজবল্লভ রায়ের মতলবে গ্রামের লোক জমিদার রামতারণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাঁর বিধবা ভগ্নী সৌদামিনীকে গর্ভপাতের দোষে দোষী করছে এবং প্রমাণের জন্য কবর থেকে মুসলমান শিশুর মৃতদেহ তুলে আনছে। এই কাহিনিতেই আমরা তদন্তের সূত্রে জানতে পারছি গর্ভপাতের কলঙ্ক দূর করতে বড়লোকেরা নৌকাযোগে অভাগিনীকে কাশি পাঠিয়ে দেন কিন্তু কোনো দরিদ্র ঘরে এই কাজ হলে তাদের অর্থাভাবে কলঙ্কিনী হয়েই জীবন কাটাতে হত। এখানে আমরা পুলিশি ব্যবস্থার মধ্যেও দ্বন্দ্ব দেখতে পাচ্ছি। খ্যাতি, পুরস্কারের আশায় দারোগাদের তদন্তে গাফিলতি। বাঁকাউল্লার কথায় "দারগাবাবু ক্রমেই চটিতেছেন। এমন প্রমাণী মামলা, চালান দিতে আর বিলম্ব কেন?... তদন্তের খ্যাতিটা পাছে আমার একায়িকের ভাগ্যে ঘটিয়া যায়, এজন্য বড়ই বিরক্ত হইতেছেন..." (*বাঁকাউল্লার দপ্তর* ৬৯)। 'হারানী'

কাহিনির মধ্যে আমরা পাচ্ছি মাহত (মাহাতো) বৈশ্য জাতের কথা। যেখানে জীবনা মাহাত ডাকাতের হাতে মারা যায় এবং সমস্ত ধন সম্পত্তি লুট হয়ে যায়। সীতামাড়ির উত্তর দিকের ইতর পাড়ার উল্লেখ আছে, যেখানে ইতর শ্রেণির মানুষ ছাড়াও বাবু শ্রেণির মানুষরাও গোপনে যাতায়াত করে বলে জানা যায়। যে ইঙ্গিত মূলত সমাজের অবৈধ সম্পর্ককে নির্দেশ করে। কিন্তু, এই ইতর পাড়ার মধ্যে থেকেও উঠে আসে অপরাধ ও অপরাধীর সূত্র, যা থেকেই জীবনা মাহাত'র খুনের কিনারা হয়। আবার 'বহুরূপী' - কাহিনির মধ্যে আমরা পাই তাঁতি জাতের কথা, তারণ তাঁতির ছেলে গোপালের অপরাধী দলের সঙ্গে জড়িত হওয়ার কথা। 'মামুদ হাতি' ও 'গহনাভোজী কুমীর'-এর কাহিনি ঠগীর কাহিনি হলেও 'জলপন্থী ঠগী'র কথা এখানে নতুন ভাবে উঠে আসছে।

আবার বেশ কিছু কাহিনির মধ্যে আমরা ভেকধারী-ভক্তিভাবের আড়ালে অপরাধ ও অপরাধীদের খুঁজে পাচ্ছি। বাঁকাউল্লার প্রথম অনুসন্ধানেই আমরা 'হরিশভট্ট'র কথা পাই। যার বিবরণ দিতে গিয়ে বলা হয় "...সংসার বিবাগী পরিব্রাজক। ...বহুদেশ পর্যটনে ব্রাহ্মণের প্রচুর বহুদর্শিতা জন্মিয়াছে। ... অতি সদালাপী, অতি অমায়িক, অতি মিষ্টভাষী... অতি দিব্যকান্তি।" (*বাঁকাউল্লার দপ্তর* ২৭) কিন্তু, তার এই বাহ্যিক সাধুবেশী ভাবমূর্তির আড়ালে ছিল চার-চারটে খুনের ষড়যন্ত্র। পরবর্তী কাহিনি 'নবীন নবেসেন্ধা'-তেও আমরা 'নবীন'-এর বিবরণে পাই "...বেশ বাবাজিয়ানা চেহারা। গলায় মালা, উপর হাতে ইষ্ট কবচ, পায়ে খড়ম, হাতে গাড়ু..." (*বাঁকাউল্লার দপ্তর* ৫২)। যে কিনা দারোগাবাবুর কাছে বাগানবাড়িতে নির্জনে সাধন-ভজন করার কথা বললেও পরে প্রমাণিত হয়ে যায় এ সবের আড়ালেই চলত সরকারি নথি জাল করার কাজ। 'কেঁচো খুঁড়িতে সাপ' ও 'হরিদাস বনাম কৃষ্ণদাস' কাহিনি দুটিতেও বোষ্টম গুরু, বোষ্টমী পিসি, হরিদাস প্রমুখের অপরাধ ধরা পড়েছে। 'হরি বল্ মন হরি বল্' (*বাঁকাউল্লার দপ্তর* ১০১) বুলি ভ্রুণ হত্যাকারী, গারদ ভাঙা, খুনে আসামীকে পুলিশি হেফাজত থেকে রক্ষা করতে পারছে না। 'বহুরূপী' কাহিনির মধ্যেও 'গোপাল' ও তার দলের লোকদের সাধু বেশে কাশি উদ্দেশ্যে নৌকা যাত্রা, সেখানে ডাকাতি ও খুনের প্রসঙ্গ আছে।

বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয় উনিশ শতকের কালপর্বেও *বাঁকাউল্লার দপ্তর*-এর বেশ কিছু কাহিনিতে অপরাধী হিসেবে ও অপরাধী শনাক্তকরণে মহিলা চরিত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। 'কেঁচো খুঁড়িতে সাপ' ও 'হরিদাস বনাম কৃষ্ণদাস' কাহিনি দুটিতে হরিদাসের প্রণয়ী 'প্রেমদা' ও পিসি 'শ্রীমতী বিদুমুকী' চরিত্র দুটি পাওয়া যাচ্ছে যারা প্রাণবল্লভ সেনের বাড়িতে টাকা চুরি, ভ্রূণ-হত্যা, ফেরারি আসামীকে আত্মগোপনে সাহায্য করা ইত্যাদি অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিল। আবার 'নিস্তার' কাহিনিতে রাধানাথের আট-নয় বছর বয়সী পৌত্রীর জন্যেই ডাকাতদলের একজন হিসেবে কেশবকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছিল। এই একই কাহিনিতে কেশবের ভগ্নী 'নিস্তারিনী'র কথা জানা যায়, যে কিনা হরি স্যাকরার কাছে ডাকাতির সোনা পাচার করতো। 'গহনাভোজী কুমীর'

কাহিনিতে আলাদা করে নামোল্লেখ না থাকলেও প্রথম তিনজন মহিলা সহকারী গোয়েন্দার কথা পাওয়া যায়, যার একজনকে 'বিবিজান' বলে উল্লেখ করা হয়েছে - "বিবিজান বড় বুদ্ধিমতী। সুন্দরীও বটে।" (*বাঁকাউল্লার দপ্তর* ১৪০) উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে কোনো পুরুষ কর্তৃক কোনো মহিলার রূপের জায়গায় সর্বাগ্রে বুদ্ধির তারিফ করা হচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে সেই বিবিজান ও তার স্বামী একই সাথে সরকারি গোয়েন্দা বিভাগে কর্মরত। আবার, 'উমোকান্ত' কাহিনিতে 'বামা' নামের এক ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকের কথা আছে যাকে গোয়েন্দার কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল তার বুদ্ধির জন্য। সুতরাং, অপরাধ নিবারণে মহিলাদের সক্রিয় উপস্থিতি সমসাময়িক বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে ব্যতিক্রমী একটা ভাবনা বলেই মনে হয়।

শুধুমাত্র ঐতিহাসিক সময়কে নির্ধারণ করাই নয়, কাহিনিগুলির মধ্যে এমন কিছু তথ্যের উল্লেখ আছে বা যা ভিত্তি করেই মূলত কাহিনি অগ্রসর হয়েছে। যেগুলির ঐতিহাসিক সত্যতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে দ্বিমতের কোনো জায়গা নেই। যেমন, বেশ কয়েকটা কাহিনিতে ভ্রূণ-হত্যার প্রসঙ্গ আছে। ১৯৭১ সাল থেকে ভারতে ভ্রূণ-হত্যা আইনানুগ করা হলেও তার আগে পর্যন্ত এই অপরাধের জন্য অপরাধীর তিনবছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের শাস্তি বহাল ছিল (*বাঁকাউল্লার দপ্তর* ১২৩)। 'দেওয়ানজি', 'উমোকান্ত' গল্প দুটিতে যে নীলকর মহাজন, গণ-আন্দোলনের প্রসঙ্গ আছে তারও প্রমাণ ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায়। নীলকর সাহেব বা দেশীয় মহাজনদের কাছে কৃষক শ্রেণী অত্যাচারিত হত। জানা যায়, ১৮৫৯ সালে নীলচাষ বিরোধী গণ-আন্দোলন শুরু হয়েছিল নদীয়া, যশোহর জেলায় (*বাঁকাউল্লার দপ্তর* ৮৪)। এছাড়াও ঠগীর অত্যাচার, দেওয়ানি ব্যবস্থা, ডিক্রি জারি ইত্যাদি বিষয় তো আছেই।

সমাজ-ইতিহাসের বাইরেও প্রথম বাঙালি গোয়েন্দা হিসেবে বাঁকাউল্লা পরবর্তী যেকোনো গল্প উপন্যাসের গোয়েন্দা চরিত্রের থেকে অনুসন্ধানের ক্ষিপ্রতায়, বুদ্ধিতে, দক্ষতায়, সাহসে কোনো অংশে কম নয়। মাদ্রাসায় শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান এই দারোগা অনুসন্ধানের জন্য নির্দ্বিধায় হিন্দু ভ্রমণকারীর বেশে মাঘী পূর্ণিমার দিন নবদ্বীপের আড্ডায় রাত কাটাতে পারে, আবার বাবাজিয়ানা চেহারার নবীন নবেসেন্ধাকে গড় হয়ে প্রণাম করতেও পারে। কখনও কখনও তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহের জন্য একদম সাধারণের বেশে তাড়িখানায় রাত কাটায়, কখনও বা গোপনে ইতর পাড়ায় যেতে বা জমিদার বাড়ির অন্তঃপুরে ঢুকতেও দ্বিধা করে না। বিশেষ করে 'হাতকাটা হরিশ', 'রায় মহাশয়', 'কেঁচো খুঁড়িতে সাপ' ইত্যাদি গল্পে একের পর এক প্রশ্ন জাল রচনা করে, প্রমাণ সংগ্রহ করে আপরাধীদের যে ভাবে ধাওয়া করেছে তাতে বাঁকাউল্লার ক্ষুরধার বুদ্ধির পরিচয়ই পাওয়া যায়। শুধু তাইই নয়, 'নবীন নবেসেন্ধা', 'বহুরূপী', 'নিস্তার' কাহিনিগুলিতে নিজের প্রাণ সংশয়ের কথা জেনেও শেষ না দেখে ছাড়েনি। 'বহুরূপী' কাহিনিতে গোয়েন্দা বাঁকাউল্লা গোপালকে অপরাধী দলের হাত থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে নিজেই অপরাধী হিসেবে মিথ্যে অপবাদে জড়িয়ে পড়েছে এবং হুকুমনামা দেখাতে

না পারার দরুন তাকেও তিন মাস কারাবাস করতে হয়েছে। অর্থাৎ, বোঝা যাচ্ছে পরবর্তী সময়ের বাংলা সাহিত্যের ডিটেকটিভরা বিশেষত প্রাইভেট ডিটেকটিভরা যতটা পরিচিতি লাভ করেছিল বলে গল্প বা উপন্যাসের মধ্যে জানা যায় বাস্তবের দারোগা বা পুলিশি গোয়েন্দাদের অবস্থা যে ততটাও খ্যাতির জায়গায় ছিলনা এ যেন তারই প্রমাণ স্বরূপ। এমনকি, 'নিস্তার' কাহিনির শেষে দেখা যায় প্রমাণের অভাবে জামাতার বিরুদ্ধে নবীন কোনো সাক্ষ্য না দেওয়ায় ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত থাকার কথা বাঁকাউল্লা বুঝতে পারলেও শুধু মাত্র প্রমাণের অভাবে শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দিতে হয়। অর্থাৎ, বাস্তবে দারোগাদের কাজের মধ্যে একটা যে সীমা-পরিসীমা থেকে যায়, যেখানে দুঁদে দারোগাকেও ব্যর্থ হতে হয় – সেখানে সেই ব্যর্থতা কাহিনিকে, চরিত্রকে আরও বেশি যেন বাস্তব করে তোলে।

এছাড়াও যেহেতু মাদ্রাসায় শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান গোয়েন্দার বয়ানে ঘটনাগুলি বর্ণিত হয়েছে তাই আমরা প্রচুর পরিমাণে আরবি-ফারসি শব্দের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করি এবং সেই সময়ে আইনি ও পুলিশি কাজে ব্যবহৃত এমন অনেক শব্দ (বহালী পরওয়ানা, হিকমতি, হুকুমনামা, খানামসরা, জালসেচা, মজকুরা, হরফান তজদিক, রোকা, জাবেদা নকল, ফৌতি ইত্যাদি) পাওয়া যাচ্ছে, যা আজকের দিনে আর প্রায় ব্যবহারই করা হয় না। এমনকি তখনকার দিনেও যে দানপত্র বা উইল লিখে রাখার চল ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'হারানী' কাহিনির মধ্যে। এই কাহিনির মধ্যে যাকে 'লিখন পঢ়ন কুঞ্জি' (*বাঁকাউল্লার দপ্তর* ৮৭) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যা থেকে দুম্‌কা অঞ্চলের "আধা বাঙালা আধা হিন্দি ভাষা"র (*বাঁকাউল্লার দপ্তর* ৮৯) কথা জানা যায় –

"মম সবহ ধনদৌলত হারাণী মাহসীকে দিনু
... ...
এক অষ্ট মুটী ধন বহা আরু তিন গোটা রূপা
ঐহি ধনমুটী সুজনা মাহত ভাই রাখিলা
হারাণী পাইবা..." (*বাঁকাউল্লার দপ্তর* ৯২, ৯৩)

এছাড়াও আমরা 'নিস্তার' কাহিনিতে 'নিতাই' পাগলার গান পাচ্ছি, যা আদতে আপরাধীদের মধ্যে সংকেত দেওয়ার একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে –

"একটা কাকের পাছু ফিঙ্গে লেগেছে
ফিঙ্গে উড়ে উড়ে কাকের বাসায় বোসেছে।" (*বাঁকাউল্লার দপ্তর* ১৬৫)

অর্থাৎ, আপরাধ জগতের যে *কোড ল্যাঙ্গুয়েজ*-এর সঙ্গে আমরা পরিচিত তাই আগে ছড়া বা গান আকারে ব্যবহার করা হত। যার মধ্যে দিয়েও কিন্তু লোকজ-সংস্কৃতির অন্য একটা রূপকে লক্ষ্য করা যায়। ফলে বলা যেতে পারে, গোয়েন্দা কাহিনিতে ঘটনা-ইতিহাস-সমাজের বাইরে গিয়েও বাংলা ভাষার মধ্যে অন্যান্য ভাষার শব্দের অনায়াস

ব্যবহার, গানের ব্যবহার ইত্যাদি *বাঁকাউল্লার দপ্তর*কে একটা সাহিত্যিক গুরুত্বও আরোপ করেছে।

তাই প্রবন্ধের একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে বলতে হয়, ইউরোপীয় ধাঁচে গড়ে ওঠা বাংলার পপুলার গোয়েন্দা গল্প-উপন্যাসই শুধু নয় বরং ফিরে দেখার সময় এসেছে ফেলে আসা অতীতের দিকেও। বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বারবার তার শিকড়কে খোঁজার চেষ্টা করেছে, ঐতিহ্যের অনুসন্ধান করেছে। কিন্তু, বর্তমানে আমরা সেই ধারাবাহিক ইতিহাসকে ভুলতে বসেছি। ফলে, বর্তমানে গোয়েন্দা গল্প-উপন্যাস পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়েও মূল সাহিত্য ধারার অন্তর্গত হতে পারছেনা। কারণ, গোয়েন্দা কাহিনি পড়তে গিয়ে গোয়েন্দার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তি-বুদ্ধির অস্ত্রে ধার দিয়ে, নিছক একটা গল্প পড়েই আমরা খান্ত হয়ে থাকছি। কিন্তু, এর বাইরেও একটা গোয়েন্দা কাহিনির মধ্যে যে সমাজ-সময়-ইতিহাস-বিজ্ঞানের ছোটো ছোটো পাঠ বা সূত্র লুকিয়ে আছে তার অনুসন্ধান পাঠকমহল করছে না। ফলত, গল্পকাহিনির বাইরে বেরিয়ে গোয়েন্দা কাহিনি তার সামাজিক-ঐতিহাসিক এমনকি সাহিত্যিক গুরুত্ব পর্যন্ত হারিয়ে ফেলছে, সেই সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে অজানা অখ্যাত বাঙালি গোয়েন্দারা ও তাদের কীর্তিকলাপ।

গ্রন্থপঞ্জি:

ক। আকর গ্রন্থ

পাল, সৌম্যেন, প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত, সম্পাদনা। *বাঁকাউল্লার দপ্তর* (সটীক সংস্করণ)। চর্চাপদ, চর্চাপদ সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১৩, কলকাতা।

খ। সহায়ক গ্রন্থ

১. গুপ্ত, ক্ষেত্র। *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)*। গ্রন্থনিলয়, চতুর্থ প্রকাশ : আগস্ট ২০১৩, কলকাতা।
২. ঘোষাল, পঞ্চানন। *অপরাধ-তত্ত্ব (অপরাধ-বিজ্ঞান)*। বাক্-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৬৩, কলকাতা।
৩. চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জিত ও সিদ্ধার্থ ঘোষ, সম্পাদনা। *গোয়েন্দা আর গোয়েন্দা*। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬, কলকাতা।
৪. দাশগুপ্ত, অরিন্দম, সম্পাদনা। *সেকালের গোয়েন্দা কাহিনি*। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, চতুর্থ মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০১৯, কলকাতা।
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু। *ব্যোমকেশের ডায়েরী*। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, চতুর্থ মুদ্রণ : চৈত্র ১৫৫৯, কলকাতা।
৬. বসু, সুকুমার। *অপরাধ ও অপরাধী*। রূপা, প্রথম সংস্করণ : ১৩৭২, কলকাতা।
৭. সরকার, পি। *সমাজবিরোধী (অপরাধ বিজ্ঞান)*। তুলি-কলম। কলকাতা।
৮. সেন, সুকুমার। *ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি*। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পঞ্চম মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০১৯, কলকাতা।

৯. Shakespeare, William. *Romeo and Juliet. William Shakespeare: The Complete Works,* edited by Peter Alexander, The English Language Book Society and Collins, 1964, London and Glasgow.

গ। সহায়ক প্রবন্ধ

- Adhav, Sunita. “Police System In India - Issues And Challenges - A Critical Study”. *Pimpri Law Review Journal.* vol. 2, iss. 2, 2023.
- Sen, Arunima. “A Literary History of the Detective Genre in Bengali Literature: From the Rig Veda to Byomkesh Bakshi”. *The Criterion: An International Journal in English.* vol. 8, iss.VIII, July 2017.

ইরাবতী কার্ভের মহাভারত-চিন্তন ও দুই বাঙালি সমালোচক

শিবনাথ দত্ত
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
ভাষা-ভবন, বিশ্বভারতী

সারসংক্ষেপ: মারাঠি লেখিকা ইরাবতী কার্ভের 'যুগান্ত' গ্রন্থটি মহাভারত-চর্চার ধারায় একটি নতুন দিগন্তের সূচনা করে। প্রকাশের পর থকেই সারা পৃথিবীব্যাপী এই গ্রন্থটি প্রচুর অভিনন্দিত ও সমালোচিত হয়। সেই সঙ্গে শ্রীমতী কার্ভের যে-সব ভাবনাচিন্তা এখানে প্রকাশিত হয়েছে, তা প্রভাব বিস্তার করতে থাকে পরবর্তী সময়ের মহাভারত চর্চার ক্ষেত্রে। ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের বাইরে বিভিন্ন লেখকের রচনাকে তাঁর যুক্তি ও ভাবনাগুলি প্রভাবিত করেছে। বাঙালি লেখকরাও এর ব্যতিক্রম নন। ইরাবতী কার্ভের যুক্তিগুলি যেমন মৌলিক সাহিত্যস্রষ্টাকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে, তেমনি মননশীল রচনাকেও উদ্বুদ্ধ করেছে সমানভাবে। বাংলা ভাষায় মহাভারত আলোচনার ধারায় বুদ্ধদেব বসু ও প্রতিভা বসু নাম দুটি যথেষ্ট পরিচিত। বুদ্ধদেব বসুর 'মহাভারতের কথা' আর প্রতিভা বসুর 'মহাভারতের মহারণ্যে' গ্রন্থ দুটি মননশীল বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এই দুই সমালোচক তাঁদের গ্রন্থ রচনা করেছেন ইরাবতী কার্ভের 'যুগান্ত' প্রকাশিত হওয়ার পরে। দুজনেই তাঁদের গ্রন্থে শ্রীমতী কার্ভের গ্রন্থের নাম ও তাঁর যুক্তিগুলি উল্লেখ করেছেন এবং আলোচনা করেছেন। তাঁর যুক্তির মধ্যে নিজের ভাবনার সমর্থন খুঁজে পেয়েছেন অথবা সমালোচনা করে ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। ইরাবতী কার্ভের মহাভারত-চিন্তা এইভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যেও।

সূচক শব্দ: ইরাবতী কার্ভে, বুদ্ধদেব বসু, প্রতিভা বসু, মহাভারত, প্রভাব।

মূল আলোচনা:

১৯৬৭ সালে ইরাবতী কার্ভের 'যুগান্ত' নামক গ্রন্থটি মারাঠি ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয় এবং তা ওই বছরেই আকাদেমি পুরস্কার লাভ করে।[১] ১৯৬৯ সালে দেশমুখ প্রকাশন থেকে এর ইংরেজি ভাষায় অনুবাদটি বের হয়।[২] তাঁর এই গ্রন্থ মহাভারত আলোচনার ধারায় একটি নতুন দিগন্ত যেন উন্মোচন করে। পরবর্তী মহাভারত আলোচনায় তাঁর গ্রন্থে উল্লিখিত বক্তব্যগুলির নানা প্রভাব লক্ষ করা যায়। বাঙালি আলোচকদের মধ্যে তাঁর যুক্তিগুলি নিয়ে নানা প্রতিক্রিয়া তৈরি হতে দেখি। ১৯৭৪ সালে বুদ্ধদেব বসুর 'মহাভারতের কথা' এবং ১৯৯৭ সালে প্রতিভা বসুর 'মহাভারতের মহারণ্যে' গ্রন্থ দুটি প্রকাশিত হয়। উভয়েই তাঁদের পূর্বতন আলোচক ইরাবতী কার্ভের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর যুক্তিগুলির উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন।

ইরাবতী কার্ভে তাঁর গ্রন্থে নানা যুক্তি-বিশ্লেষণের মাধ্যমে মহাভারতের বিভিন্ন প্রক্ষিপ্ত অংশকে চিহ্নিত করেছেন, সেখানে তাঁর ধর্মদর্শনের তুলনায় ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। অন্যদিকে বুদ্ধদেব বসু সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে মহাভারতের আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁর 'মহাভারতের কথা' গ্রন্থের মুখবন্ধে বলেছেন, "আমি পণ্ডিত নই, প্রেমিক-মাত্র, এই আলোচনা এক রসভোক্তার আনন্দবোধের নিঃসরণ।"[৩] প্রতিভা বসুও তাঁর 'মহাভারতের মহারণ্যে গ্রন্থের প্রাক্কথন অংশে বলেছেন, "প্রথমেই সবিনয়ে পাঠকদের নিকট নিবেদন করা প্রয়োজন, আমি পণ্ডিতও নই, বিদ্যাও সীমিত। তথাপি মহাভারত বিষয়ে আমার নিজস্ব মতামত প্রকাশে যে সাহসী হলাম তার প্রধান কারণ, এই মহাগ্রন্থ বিষয়ে চিন্তা করবার, আলোচনা-সমালোচনা করবার অধিকার, বিদ্বান পণ্ডিতদেরও যতোটা আছে, সাধারণ পাঠকেরও ততোটাই।"[৪] এদিক থেকে আমরা সহধর্মিতার আভাস পেলেও বুদ্ধদেব বসু ও প্রতিভা বসুর আলোচনার মধ্যে স্বাতন্ত্র্যই বেশি। বুদ্ধদেব বসু প্রক্ষিপ্ত বর্জনের পক্ষপাতী নন। তাঁর আলোচনা মহাভারতের প্রচলিত ঐতিহ্যের অনুসারী। অন্যদিকে প্রতিভা বসু প্রক্ষিপ্ত বর্জনের কথা বলেছেন এবং তার উপর ভিত্তি করেই তাঁর বক্তব্য নির্মাণ করেছেন। এই দুই সমালোচকের দৃষ্টিতে ইরাবতী কার্ভের মহাভারত-চিন্তন আমাদের বর্তমান আলোচনার মূল বিষয়। সেই সঙ্গে তাঁর গ্রন্থ 'Yuganta: The end of an epoch' বাংলা মহাভারত-চর্চায় কীরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে, নির্বাচিত দুটি গ্রন্থ অবলম্বনে আমরা তা দেখার চেষ্টা করব।

প্রথমে বুদ্ধদেব বসুর মহাভারত চিন্তার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি দেখে নেওয়া যেতে পারে। 'মহাভারতের কথা' গ্রন্থের 'এক অন্তহীন অরণ্য' শীর্ষক অধ্যায়ে তিনি মহাভারতের উপর 'খড়্গাঘাত' অর্থাৎ প্রক্ষিপ্ত বর্জনের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর বক্তব্য হল বহু কবির রচনাই এই সংহিতার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছে— "সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায় যে গ্রন্থটি এমন বহু কবির সমাবায়কর্ম, যাঁদের রচনাশক্তি দুস্তরভাবে অসমান, উপাস্য দেবতা ও ধ্যান-ধারণা বিভিন্ন, এবং জীবৎকাল বহু শতাব্দীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত।"[৫] যুধিষ্ঠিরকেই তিনি মহাভারতের নায়ক বলে মনে করেন। কৃষ্ণের ভগবৎ-সত্তায় তিনি বিশ্বাসী। পরবর্তিকালে ধীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী প্রমুখ তাঁর বক্তব্যের বিরোধিতা করলেও বাংলা ভাষায় মহাভারত আলোচনায় তাঁর গুরুত্ব অবিসংবাদিতভাবে স্বীকৃত। প্রতিভা বসু বুদ্ধদেব বসুর মহাভারত ভাবনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, "যদিও আমার মতামত তাঁর একেবারেই বিপরীত, এমন বই ক্ষণজন্মা ব্যক্তিদের লেখনী থেকে দুর্লভক্ষণেই জন্মায়।"[৬]

ইরাবতী কার্ভে তাঁর গ্রন্থে মহাভারত সম্পর্কে যে বিভিন্ন মন্তব্য ও যুক্তি প্রকাশ করেছেন, বুদ্ধদেব বসু তার মধ্যে বিশেষ দু'একটি প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন। 'মহাভারতের কথা' গ্রন্থের 'পিতৃপরিচয়' শীর্ষক অধ্যায়ে আমরা তা দেখতে পাই। শ্রীমতী কার্ভে বিভিন্ন যুক্তি সহযোগে বিদুরকে যুধিষ্ঠিরের জৈবিক পিতা হিসেবে

উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। বিদুর হলেন ধর্মের অবতার এবং যুধিষ্ঠির হলেন ধর্মপুত্র। দুর্যোধনের মন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও যুধিষ্ঠিরের প্রতি পক্ষপাত বিদুরের মধ্যে বরাবর লক্ষ করা গেছে। ইরাবতী কার্ভে এগুলি উল্লেখ করে প্রশ্ন তুলেছেন, "All these things taken together suggest a question: were Vidura and Dharma father and son? There is much in the Mahabharata to support this suspicion."[৭] 'Father and Son' শীর্ষক অধ্যায়ে সন্তান উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন দেবতাকে নিয়োগের বিষয়ে কুন্তী এবং পাণ্ডুর কথোপকথন সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "When they were planning to call all gods to father the children, it is very curious that the first god Kunti called was Yamadharma, the god of death. Vidura was said to be an incarnation of Yamadharma, so we can surmise that she did not call the god, but her husband's brother Vidura."[৮] জতুগৃহে পাণ্ডবদের হত্যা করার যে পরিকল্পনা দুর্যোধন করেছিলেন, সেখান থেকে তাঁদের উদ্ধার করতে বিদুরের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া এই অধ্যায়ে তিনি আরও কিছু উদাহরণের সাহায্যে যুধিষ্ঠিরের প্রতি বিদুরের পক্ষপাতের বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন। আশ্রমবাসিকপর্বে বিদুরের যুধিষ্ঠিরের দেহে অনুপ্রবেশের বিষয়টি সম্পর্কেও তিনি ইঙ্গিত করেছে— "Vidura gave Dharma everything— his life, his organs, his brilliance. This behaviour at the time of death is like that it of a father towards his son."[৯] এ-বিষয়ে তিনি উপনিষদে উল্লিখিত মৃত্যুর পূর্বে সন্তানের মধ্যে পিতার অনুপ্রবেশের বিশেষ 'ritual'-এর দিকেও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

বুদ্ধদেব বসু তাঁর গ্রন্থে ইরাবতী কার্ভের এই যুক্তিগুলির উল্লেখ করে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে এই যুক্তিগুলি 'ভেবে দেখবার মতো'[১০] হলেও তা 'অনুমিতি'— "শ্রীমতী কার্ভের অনুমিতিটি মনোরম তাতে সন্দেহ নেই, আমাদের কল্পনা কিছুক্ষণ খেলা করতে পারে তা নিয়ে, এমনকি বিদুর-কুন্তীর গোপন প্রণয় অবলম্বন ক'রে একটি সুন্দর নাট্যরচনার সম্ভাবনাও আমাদের মনে প্রতিভাত হয়; পাণ্ডবদের বনবাস ও অজ্ঞাতবাসের তেরো বছর কুন্তী যে হস্তিনাপুরে বিদুরের গৃহে কাটিয়েছিলেন, এর মধ্যে প্রণয়স্মৃতির অনুরঞ্জন দেখাও কোনো আধুনিক কবির পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু কল্পনাবিলাসের প্রথম কয়েকটি সুখকর মুহূর্ত কেটে যাবার পরেই বিরুদ্ধ যুক্তিগুলি ঝাঁকে ঝাঁকে আমাদের আক্রমণ করে।"[১১] তিনি যে বিরুদ্ধ যুক্তিগুলি উপস্থাপন করেছেন, সেগুলি হল প্রথমত, "কুন্তীর অন্য তিন পুত্র দেববীজোদ্ভুত— নগণ্য মাদ্রীতনয়েরাও তা-ই— এ অবস্থায় যিনি সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই যুধিষ্ঠির যদি মনুষ্যপুত্র হতেন, তাহলে সেটা হ'তো সমগ্র মহাভারতের পক্ষে একটি দূরপ্রসারী-ইঙ্গিতপূর্ণ প্রধান ঘটনা— কাহিনীবিন্যাসের দিক থেকে সেটাকে গোপন রাখা কোনমতেই সম্ভব হ'তো না, ধ'রে নেয়া যায় কর্ণের জন্ম কথার মতোই সেটা উল্লিখিত ও বর্ণিত

হ'তো বহুবার, একবার হয়তো কুন্তীর মুখেই আমরা তার বিবরণ শুনতাম।"[১২] দ্বিতীয়ত, কুন্তী চাইলেই যে কোনো দেবতার অঙ্কশায়িনী হতে পারতেন। অতএব শূদ্রযোনিজ বিদুরকে আহ্বান করা অসংগত।[১৩] তৃতীয়ত, যুধিষ্ঠিরকে বিদুর যোগবলে উৎপন্ন করেছিলেন এমন কথা মহাভারতে বলা হলেও তারপরেই বলা হয়েছে "যো হি ধর্মঃ স বিদুরো যঃ স পাণ্ডবঃ।"[১৪] অর্থাৎ "যিনি ধর্ম তিনিই বিদুর, যিনি বিদুর তিনিই যুধিষ্ঠির।" বুদ্ধদেব বসুর মতে, "ব্যাসের এই কথাগুলো আমাদের কানে হেঁয়ালির মতো শোনাচ্ছে; কিন্তু আসলে তিনি হয়তো বিদুর-যুধিষ্ঠিরের মধ্যে পিতাপুত্র সম্বন্ধের ইঙ্গিত করেননি— শুধু বলতে চেয়েছেন যে উভয়েই ধর্মাত্মা, উভয়েই মূর্তিমান সাধুতা ও সদাচার— এবং এটা তথ্য হিসেবে আমরা অনেক আগে থেকেই জেনে আসছি।"[১৫] ইরাবতী কার্ভে উপনিষদের সংস্কারের বিষয়টি বিশদে উল্লেখ না করলেও বুদ্ধদেব বসু তা আলোচনা করেছেন। অন্ত্যটীকা অংশে উল্লেখ করেছেন যে এটি বৃহদারণ্যক উপনিষদের **১:৫:১৭** থেকে গৃহীত।[১৬] কিন্তু বিদুরের যুধিষ্ঠিরের দেহে লীন হয়ে যাওয়ার মধ্যে পিতা-পুত্রের সম্পর্কের ইঙ্গিত আছে বলে তিনি মনে করেন না। পরবর্তী সময়ে সমালোচক শামিম আহমেদও একটি আলোচনা প্রসঙ্গে অনুরূপ মতামত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, মহাভারত কোনো কিছুই গোপন করে না। যুধিষ্ঠির বিদুরের পুত্র হলে মহাভারতের কবি তা গোপন করতেন না।[১৭] চতুর্থত, বুদ্ধদেব বসু একটি সাহিত্যিক কারণের কথা বলেছেন— "যুধিষ্ঠির বিদুরের পুত্র হ'লে সমগ্র মহাভারতকে হ'তে হ'তো সম্পূর্ণ ভিন্ন এক গ্রন্থ— এমন বহু অংশ স্থান পেতে পারতো না যার উপর আমাদের পরিচিত মহাভারতের মহনীয়তা নির্ভর করে আছে।"[১৮]

পূর্বতন আলোচক হিসেবে ইরাবতী কার্ভের রচনার অনুষঙ্গ আমরা বুদ্ধদেব বসুর রচনায় লক্ষ করতে পারি। কিছু ছোটো ছোটো সাদৃশ্যও উভয়ের মধ্যে দেখা যায়। যেমন ইরাবতী কার্ভে সেই যুগ বা সময়টাকেই মহাভারতের নায়ক বলে মনে করলেও প্রধান চরিত্র হিসেবে যুধিষ্ঠিরকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। বুদ্ধদেব বসু যুধিষ্ঠিরকেই মহাভারতের প্রধান চরিত্র তথা নায়ক বলে মনে করেন। মহাভারতের বিভিন্ন প্রসঙ্গের ব্যাখ্যায় উভয়েই নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ অবলম্বন করেছেন। দুজনেই মাঝে মাঝে রামায়ণের প্রসঙ্গ তুলে পারস্পরিক তুলনা করেছেন। সুতরাং, তাঁর রচনায় ইরাবতী কার্ভের ভাবনার প্রতিফলন আছে এ-কথা বলা যায়। কিন্তু মূল পার্থক্য হল দৃষ্টিভঙ্গির জায়গায়। ইরাবতী কার্ভে তাঁর গ্রন্থের 'The Final Effort' অধ্যায়ে মহাভারত সম্পর্কে যে মন্তব্যগুলি করেছেন, তা থেকে মনে হয় পাশ্চাত্য ট্রাজেডি বিচারের মতো করে তিনি এই মহাকাব্যটিকে দেখতে চেয়েছেন।[১৯] অন্যদিকে বুদ্ধদেব বসু ভারতীয় দর্শন, বিশ্বাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের দিক থেকে মহাকাব্য হিসেবেই এর বিচার করতে চেয়েছেন। ইরাবতী কার্ভে তাঁর সমগ্র গ্রন্থে বহুবার মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে 'later impolation', 'later addition' ইত্যাদি শব্দবন্ধগুলি ব্যবহার করেছেন। বুদ্ধদেব বসুর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন। তিনি বিভিন্ন অলৌকিকতাকে স্বীকার

করেছেন মহাভারতের মহনীয়তা ও সৌন্দর্যের খাতিরে। এই মত-বিরোধিতার সুবাদে বিশ শতকের মহাভারত-চর্চা ও বিশ্লেষণ হয়েছে সুদুরপ্রসারী।

প্রতিভা বসুর 'মহাভারতের মহারণ্যে' গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় মহাভারত-চর্চার ধারায় এক ব্যতিক্রমী সৃষ্টি। তিনি দুর্যোধনকে এই মহাকাব্যের নায়ক বলে মনে করেন। কৃষ্ণ তাঁর কাছে 'ভেল্কিদক্ষ'। আর মহাভারতের সমস্ত ঘটনার মূলে রয়েছেন সত্যবতী, এই তাঁর ধারণা। এর মূল দ্বন্দ্বের জায়গাটিকে তিনি নির্দেশ করতে চেয়েছেন— "...মহাভারতের বিশাল প্রেক্ষাপটে বিধৃত এক অনস্বীকার্য সাদা-কালোর দ্বন্দ্ব। সংঘাত বৈধ-অবৈধের, আর্য-অনার্যের।"[২০] কর্ণ এবং দুর্যোধনের বন্ধুত্বের দিকটি তিনি সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন। অন্ধভাবে পাণ্ডবপক্ষ সমর্থন করার পরিবর্তে যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন মহাভারতকে।

ইরাবতী কার্ভের ভাবনার প্রভাব প্রতিভা বসুর মধ্যে লক্ষ করা যায়। গ্রন্থের প্রাক্কথনেই তিনি এ-প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেছেন। প্রভাবের দিকে এখন আমরা দৃষ্টিপাত করতে পারি। প্রথমত, প্রতিভা বসুও ইরাবতী কার্ভের মতো প্রক্ষিপ্ত বর্জনের পক্ষপাতী। দ্বিতীয়ত, যুধিষ্ঠিরকে বিদুরের পুত্র বলে তিনিও মনে করেন— "মহাভারতে একথা স্পষ্ট করে বলা না হলেও একের পর এক ঘটনা আমাদের বিশ্বাস করতে বাধ্য করে যে এই পুত্র বিদুরের ঔরসেই কুন্তীর গর্ভজাত পুত্র।"[২১] তৃতীয়ত, ইরাবতী কার্ভে তাঁর গ্রন্থের 'The Palace of Maya' শীর্ষক অধ্যায়ে রাজসূয় যজ্ঞের সময় দুর্যোধনের অসম্মানের বিষয়টিকে পরবর্তী দ্যূতসভার কারণ হিসেবে নির্দেশ করেছেন। তিনি মনে করেন দুর্যোধনের এই অসম্মান ছিল পাণ্ডবদের পূর্বপরিকল্পিত— "It is no wonder that their derisive laughter cut him to the quick. Dharma's very act of helping him up from the water and ordering dry clothes seem to be a part of the plot to humiliate him."[২২] প্রতিভা বসুও তাঁর গ্রন্থে বলেছেন, "যুধিষ্ঠিরের দীপ্যমান রাজলক্ষ্মী, যার গর্বে গর্বিত হয়ে সবাই মিলে তাঁকে এতোখানি যন্ত্রণায়, লজ্জায়, অপমানে দগ্ধ করেছে, সেই রাজলক্ষ্মীকেই বা কেন তিনি কেড়ে নেবেন না?... সভাচত্বরে জলভ্রমে পরিচ্ছদ উৎক্ষিপ্ত করলে, ওরা তাঁকে শত্রুসম্পত্তি দর্শনে বিভ্রান্ত ও রত্নানভিজ্ঞ মনে করে উপহাস করেছিলো। সেই উপহাসের শাস্তি তাদের দিতেই হবে।"[২৩] প্রতিভা বসুর 'মহাভারতের মহারণ্যে' গ্রন্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হল ইরাবতী কার্ভের এই যুক্তিগুলি। এগুলিকে আশ্রয় করে তাঁর চিন্তাজগতের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র সাদৃশ্য কিংবা প্রভাব নয়, তাকে অতিক্রম করে বিভিন্ন নতুন মতামত তিনি প্রকাশ করেছেন। নতুন নতুন দিক তিনি উত্থাপন করেছেন— "একলব্যের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কেটে অর্জুনকে সর্বাপেক্ষা বড়ো তীরন্দাজ হিশেবে গণ্য করার নামও বীরত্ব, কর্ণের নিকট অর্জুন দ্বন্দ্বযুদ্ধে হেরে যাবেন ভয়ে জন্মবৃত্তান্তের দোহাই দিয়ে কর্ণকে ঠেকিয়ে রাখার নামও বীরত্ব। আর যে মানুষটি লোভে কামে অক্ষমতায় সাধারণের অপেক্ষাও সাধারণ, তিনি মহাত্মা। সমস্ত মহাভারতে একমাত্র

যিনি একবার হোক, দুবার হোক, স্বীয় স্বার্থে অনৃতভাষণের দোষে দুষ্ট, তিনিই সত্যবাদী যুধিষ্ঠির।"[২৪] প্রতিভা বসুর বিভিন্ন মৌলিক চিন্তাভাবনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পাণ্ডু এবং মাদ্রীর মৃত্যুকে বিদুর এবং কুন্তীর ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখার চেষ্টা, ভীমকে দুর্যোধনের বিষদানের বিষয়টির অন্যভাবে ব্যাখ্যা, জতুগৃহদাহের পরিকল্পনাটি যুধিষ্ঠিরের রাজনৈতিক চক্রান্ত বলে মনে করা, দ্রৌপদীর পঞ্চপতিত্বের বিষয়টির রাজনৈতিক বিশ্লেষণ প্রভৃতি।

প্রতিভা বসুর কন্যা মীনাক্ষী দত্ত তাঁর 'ম্যাজিক লণ্ঠনে কয়েকটি মুখ' গ্রন্থে 'মহাভারতের মহারণ্যে'-এর সংক্ষিপ্ত মূল্যায়নে বলেছেন, "অনেকের কাছেই মহাভারত একটি ধর্মগ্রন্থ ও শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ দেবতা। মা সমস্ত প্রচলিত ধারণা একেবারে উলটে দিয়েছেন। তিনি পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে, কৌরবদের পক্ষে। দুর্যোধন ট্র্যাজিক নায়ক, যুধিষ্ঠির খল-নায়ক (বুদ্ধদেব বসুর মহাভারতের কথা-র নায়ক যুধিষ্ঠির)। কৃষ্ণ শয়তান। সত্যবতী, কুন্তী কেউই মহিয়সী নন। তাঁরা ক্ষমতালোভী, নিষ্ঠুর, বহুপুরুষগামী। যুধিষ্ঠির বিদুরের ছেলে। আমরা এতদিন জেনেছি গ্রিক কাব্যে ও নাটকে নায়িকারা সবাই অসতী, কিন্তু ভারতীয় পুরাণ বন্দিত নারীরা সবাই সতী, পতিব্রতা, একনিষ্ঠ, মূর্তিমতী নীতি ও সততা। প্রতিভা বসু মহাভারত-এর যেসব নায়িকাদের দেখিয়েছেন তাঁরা ক্ষমতালোভী শক্তির পিপাসায় পুরুষকে ব্যবহার করেন। সবই তিনি প্রমাণ করেছেন আগাথা ক্রিস্টির মিস মার্পলের মতো, মহাভারত থেকেই উদ্ধৃতি দিয়ে।"[২৫] পরবর্তী সময়ে ধীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী প্রমুখের হাতে এই ধরণের বক্তব্যগুলিকে কঠোরভাবে সমালোচিত ও বিদ্রূপবিদ্ধ হতে দেখা যায়। যেমন, নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী তাঁর 'কৃষ্ণা কুন্তী এবং কৌন্তেয়' গ্রন্থে বলেছেন, "দুই-একজন অতিপক্ক বুদ্ধিজীবী কুন্তী আর বিদুরের সম্পর্ক নিয়ে কিঞ্চিৎ সরসও হয়ে পড়েন দেখছি। তবে তাঁদের কথাবার্তার মধ্যে মহাভারতীয় যুক্তি-তর্কের থেকে আত্ম-হৃদয়ের প্রতিফলনই বেশি।"[২৬] ধীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য যুধিষ্ঠির ছাড়া অন্য কাউকে নায়ক বলে মনে করার বিষয়টিকে 'অজ্ঞানতা' আখ্যা দিয়েছেন।[২৭] অন্যদিকে আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে ইরাবতী কার্ভে কিংবা প্রতিভা বসুর বক্তব্যের প্রতিফলন ও সমর্থন আমরা লক্ষ করতে পারি। শাঁওলী মিত্রের 'নাথবতী অনাথবৎ', 'কথা অমৃতসমান'; মল্লিকা সেনগুপ্তের বিভিন্ন কবিতা প্রভৃতির কথা এ-প্রসঙ্গে বলতে পারি।

১৯৬৯ সালে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত 'Yuganta: The end of an epoch' গ্রন্থটি বাংলা ভাষার মহাভারত আলোচনাকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে, নির্বাচিত গ্রন্থ অবলম্বনে আমরা তা দেখতে পেলাম। এই গ্রন্থে উল্লিখিত বিভিন্ন বক্তব্যকে ঘিরে সমালোচকমহলে নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। প্রকাশের কিছু সময় পরেই বুদ্ধদেব বসু এবং আরও কিছু পরে প্রতিভা বসু তাঁর বক্তব্যগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। প্রচলিত ঐতিহ্যের অনুসরণে সাহিত্যিক যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করলেও এগুলি বুদ্ধদেব বসুর ভাবনার আকর হিসেবে কাজ করেছে বলা যায়। অন্যদিকে প্রতিভা বসু যেন ইরাবতী কার্ভের

যুক্তিগুলির উপর ভিত্তি করেই তাঁর বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রভাব এবং সাদৃশ্যকে অতিক্রম করে নতুন বক্তব্যের প্রতিষ্ঠা অবশ্য তাঁর গ্রন্থকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। অনুকরণের পরিবর্তে এই অনুসরণ তাঁকে মহাভারত আলোচনায় ইরাবতী কার্ভের প্রকৃত উত্তরসূরী করে তুলেছে।

আলোচনার শেষপ্রান্তে এসে মহাভারতের কবির একটি উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে—

আচুখ্যঃ কবয়ঃ কেচিৎ সম্প্রত্যাচক্ষতে পরে।
আখ্যাস্যন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিমং ভুবি।।
(২৬। অনুক্রমণিকা ও পর্বসংগ্রহ পর্বাধ্যায়)

মহাভারত-চর্চা আবহমান কালের। ব্যাসদেবের অমরত্বের রূপকটির ব্যাখ্যাও আমরা এর মধ্যে পেতে পারি। সময়ের সাপেক্ষে বদলায় দৃষ্টিভঙ্গি। উঠে আসে নতুন নতুন পাঠ। ইরাবতী কার্ভের আলোচনা মহাভারতের চর্চার ধারায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক বলা যেতে পারে, উত্তরসূরী আলোচকদের মধ্যে যার প্রভাব উল্লেখযোগ্য। যুক্তি-বিশ্লেষণ, গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে বিশ শতকের বাঙালি মহাভারত আলোচকদের মধ্যে তাঁর গ্রন্থ যেন আকর হিসেবে কাজ করেছে। মহাভারত আলোচনায় ইরাবতী কার্ভের 'যুগান্ত' যেন নতুন যুগের সূচনা করেছে। পরবর্তিকালের মহাভারত-চর্চার গতিপ্রকৃতির উপর প্রভাবই এর গুরুত্বকে নির্দেশ করে। ভবিষ্যতেও তার ক্রমবিকাশের কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

তথ্যসূত্র :

১। Karve, Irawati, 2021, 'Yuganta: The end of an epoch', Hyderabad, Orient BlackSwan Private Limited, Page no.- v.
২। Karve, Irawati, 2021, 'Yuganta: The end of an epoch', Hyderabad, Orient BlackSwan Private Limited, Page no.- v.
৩। বসু, বুদ্ধদেব, ২০১৮, 'মহাভারতের কথা', কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা সংখ্যা অনুল্লিখিত।
৪। বসু, প্রতিভা, ২০১৯, 'মহাভারতের মহারণ্যে', কলকাতা, বিকল্প প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-১১।
৫। বসু, বুদ্ধদেব, ২০১৮, 'মহাভারতের কথা', কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা-৭।
৬। বসু, প্রতিভা, ২০১৯, 'মহাভারতের মহারণ্যে', কলকাতা, বিকল্প প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-১২।
৭। Karve, Irawati, 2021, 'Yuganta: The end of an epoch', Hyderabad, Orient BlackSwan Private Limited, page no.- 74.

৮। Karve, Irawati, 2021, 'Yuganta: The end of an epoch', Hyderabad, Orient BlackSwan Private Limited, Page no.- 75.

৯। Karve, Irawati, 2021, 'Yuganta: The end of an epoch', Hyderabad, Orient BlackSwan Private Limited, Page no.- 76.

১০। বসু, বুদ্ধদেব, ২০১৮, 'মহাভারতের কথা', কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা- ৫২।

১১। বসু, বুদ্ধদেব, ২০১৮, 'মহাভারতের কথা', কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা- ৫২।

১২। বসু, বুদ্ধদেব, ২০১৮, 'মহাভারতের কথা', কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা- ৫২।

১৩। বসু, বুদ্ধদেব, ২০১৮, 'মহাভারতের কথা', কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা- ৫৩।

১৪। সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস, ১৪০০, 'মহাভারত' (৪৩ তম খণ্ড), কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, পৃষ্ঠা- ১৬৭।

১৫। বসু, বুদ্ধদেব, ২০১৮, 'মহাভারতের কথা', কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা- ৫৩।

১৬। বসু, বুদ্ধদেব, ২০১৮, 'মহাভারতের কথা', কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা- ৫৬।

১৭। https://youtu.be/Iczlvbc_3i8

১৮। বসু, বুদ্ধদেব, ২০১৮, 'মহাভারতের কথা', কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা- ৫৩।

১৯। Karve, Irawati, 2021, 'Yuganta: The end of an epoch', Hyderabad, Orient BlackSwan Private Limited, Page no.- 8.

২০। বসু, প্রতিভা, ২০১৯, 'মহাভারতের মহারণ্যে', কলকাতা, বিকল্প প্রকাশনী, পৃষ্ঠা- ১৫।

২১। বসু, প্রতিভা, ২০১৯, 'মহাভারতের মহারণ্যে', কলকাতা, বিকল্প প্রকাশনী, পৃষ্ঠা- ৩৯।

২২। Karve, Irawati, 2021, 'Yuganta: The end of an epoch', Hyderabad, Orient BlackSwan Private Limited, Page no.- 118.

২৩। বসু, প্রতিভা, ২০১৯, 'মহাভারতের মহারণ্যে', কলকাতা, বিকল্প প্রকাশনী, পৃষ্ঠা- ১২৮।

২৪। বসু, প্রতিভা, ২০১৯, 'মহাভারতের মহারণ্যে', কলকাতা, বিকল্প প্রকাশনী, পৃষ্ঠা- ৭৬।

২৫। দত্ত, মীনাক্ষী, ২০২০, 'ম্যাজিক লণ্ঠনে কয়েকটি মুখ', কলকাতা, প্রতিভাস, পৃষ্ঠা- ১৭।
২৬। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, ২০১৮, 'কৃষ্ণা কুন্তী এবং কৌন্তেয়', কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা- ৪৪।
২৭। ভট্টাচার্য, ধীরেশচন্দ্র, ২০০৫, 'নায়ক যুধিষ্ঠির', কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা- ১৯।

উনিশ শতকের কলকাতা : প্রসঙ্গ মদ্যপান

অদিতি ব্যানার্জী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, খড়গপুর-২

উনিশ শতক বাঙালির জীবন-ইতিহাসে এক আলোকিত অধ্যায়। এক মাহেন্দ্রক্ষণ। এই সময়েই ঘটে অতীতের ঐতিহ্যের অন্ধ অনুসরণ থেকে মুক্তি আর রক্ষণশীলতা থেকে আধুনিকতায় উত্তরণ। নিস্তরঙ্গ বঙ্গজীবনে ওঠে নতুন প্রাণের হিল্লোল। আসে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির ছোঁয়ায় বাঙালি জীবনে যুগান্তর। ঘটে এতকালের প্রচলিত অর্থনীতির দিন বদল, অভিজাততন্ত্রের উদয়-অস্ত, নতুন যুগের পৃষ্ঠপোষকতায় নতুন সংস্কৃতির সৃষ্টি-স্থিতি-লয়। সব মিলে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ ভাঙাগড়ায় উদ্বেল। সেই ভাঙা-গড়ার পটভূমি হয়ে ওঠে সদ্যোজাত একটি নগর, কলকাতা। প্রথমে মূলত বাণিজ্যিক প্রয়োজনেই এই নগরের সার্বিক বিস্তার ঘটে, পরে তা হয়ে ওঠে প্রশাসনের মূলকেন্দ্র। তাকে কেন্দ্র করেই এক ভিন্নমাত্রিক নাগরিক জীবনের সূচনা হয়। কালক্রমে ইংরেজ ঔপনিবেশিক এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিমণ্ডলে ক্রমশ বেড়ে উঠতে থাকা নতুন মহানগর কলকাতার পরিবর্তনশীল সমাজের নানা স্তরে নতুন নাগরিকতার বিকাশ লক্ষিত হয়। আর বাঙালি জীবনে নতুন নাগরিকতার সংজ্ঞা নির্ধারণে কলকাতা নগরীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত সন্ধানকারী প্রখ্যাত গবেষক বিনয় ঘোষ (১৯১৭-১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ) যথার্থই বলেছেন :

> ‘বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে কলিকাতার প্রাধান্য ও গুরুত্ব কোনো সমাজবিজ্ঞানীই অস্বীকার করতে পারেন না। কলিকাতা মহানগরই বাংলার নতুন জীবনধারার প্রধান কেন্দ্র। তাই কলিকাতাই বাংলার নতুন ভাবধারা, নতুন মানস প্রকৃতি ও নবজাগৃতির উৎস।’[১]

কলকাতা ব্রিটিশ বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে ক্রমশই নিজের গুরুত্ব বৃদ্ধি করতে শুরু করেছিল। তার প্রাকৃতিক অবস্থানও এক্ষেত্রে সহায়ক হয়ে উঠেছিল। ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার লিখছে কলকাতাকে বাংলার ব্রিটিশ বাণিজ্যের কেন্দ্র রূপে নির্বাচন করার পেছনে অনেক কারণ ছিল। গবেষক সুনীলকুমার মুনশি জানাচ্ছেন :

> ‘হুগলি নদী গাঙ্গেয় উপত্যকার সমৃদ্ধশালী বাণিজ্যকে ধরে রেখেছিল এবং কলকাতার অবস্থান ছিল সর্বোচ্চে যেখান থেকে হুগলি নদী সমুদ্র পর্যন্ত যথেষ্ট নাব্য ছিল।’[২]

মনে রাখতে হবে ইতিমধ্যে সরস্বতী নদী তার নাব্যতা হারানোয় পর্তুগীজদের ‘পোর্ট পিকানো’ অর্থাৎ ছোট স্বর্গ হিসেবে পরিচিত সপ্তগ্রামের অপমৃত্যু ঘটেছিল। সুতরাং সপ্তগ্রামের শ্রীহীনতার ফলস্বরূপ সেখানকার বস্ত্র ব্যবসায়ীরা ক্রমশ কলকাতা অভিমুখে

এগিয়ে আসছিল। 'কলিকাতা কল্পলতা' থেকে জানা যাচ্ছে সপ্তগ্রামের বিখ্যাত ব্যবসায়ী শেঠ ও বসাকরাও 'সপ্তগ্রাম ও হুগলীর প্রতিভা হ্রাস হইলে কলিকাতায় আসিয়া বড়বাজারে বসবাস করিতে লাগিলেন--অভিপ্রায় এই যে সরস্বতী মন্দা পড়িয়া গেলে ভাগীরথী প্রবলা থাকায় ইউরোপীয়েরা সেই নদী হইয়া আগমন পূর্ব্বক বাণিজ্য-ব্যবসা করিবেন--সুতরাং যত অগ্রসর হইয়া থাকা হয় ততই উভয় পক্ষের মঙ্গল।'[৩] প্রাথমিক পর্বে নানা প্রতিকূলতা ছিল, তবে সুতানুটি-কলকাতা চার্নকের দূরদৃষ্টিকে ব্যর্থ হতে দেয়নি। ১৬৯২ খ্রিস্টাব্দে চার্নকের মৃত্যু হলেও সুতানুটির সমৃদ্ধি দেখে উল্লসিত হয়ে কোম্পানির ডিরেক্টরদের পরে লিখতে হয় :

> 'We are glad to hear your town of Chuttanuttee increses so exceedingly.'[৪]

সেই থেকে ক্রমে 'এই নগরের শোভা ও প্রতিভা পদ্মবনের ন্যায় অতি অল্পকালের মধ্যে বর্ধিত হইয়া উঠিল।'[৫]

নগরে বেশিমাত্রায় প্রাপ্ত স্বাচ্ছন্দ্যের আশায় গ্রাম থেকে শহরমুখী হচ্ছিল মানুষের মন। নবাবি আমল আর ইংরেজ আমলের সামাজিক প্রতিবেশের ঐতিহাসিক পার্থক্য উপলব্ধি করতে মানুষের খুব একটা অসুবিধা হয়নি। নতুন কলকাতার নতুন হাওয়ার মধ্যে ছিল সেই পার্থক্যের আমেজ এবং নতুন জীবন উপভোগের হাতছানি।

কোম্পানির দপ্তর যত বাড়ছিল ততই নতুন কর্মচারীর প্রয়োজনও পড়ছিল। শহরে ছিল নতুন সামাজিক মর্যাদার স্বাদ, যা বর্ণ বা বৃত্তিগত ততটা নয়, যতটা বিত্তগত। মুদ্রা-প্রধান অর্থনীতি মধ্যযুগের বংশ-প্রধান দুর্ভেদ্য শ্রেণি-প্রাচীর ভেঙে টুকরো করে দিয়েছিল। টাকাই হয়ে উঠেছিল নতুন নাগরিক মর্যাদার অনিবার্য এবং একমাত্র মাপকাঠি। সেই সময়ের কলকাতা 'মুদ্রা-রূপ অপেয় অগাধ জলে পরিপূরিতা'[৬] হয়ে উঠেছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। ইস্ট ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য ফুলে ফেঁপে উঠছিল এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ফলে দেশে তখন আর্থিক সমৃদ্ধির একটা ঢেউ উঠছিল। প্রখ্যাত সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯২-১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ) বলছেন :

> 'বাঙালি বেনিয়ান এদেশে ইংরেজের পণ্যদ্রব্য প্রচলিত করিয়া ও ইংরেজের বাণিজ্য-বিস্তারের জন্য কাঁচামাল যোগাইয়া তাহাদের বিপুল লাভের কিছু কিছু অংশ পাইতেছিল। এই অপ্রত্যাশিত ধনাগমের অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া এই বৈদেশিক-প্রসাদপুষ্ট ব্যক্তিগুলি এক নতুন অভিজাত সম্প্রদায় গঠন লইয়া, কেহ বা ইংরাজের রাজস্ব-সংগ্রহ ব্যবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া ইংরাজের সৌভাগ্যলক্ষ্মী যে স্বর্ণপদ্মের উপর আসীনা হইয়াছিলেন, তাহার দুই-একটা পাপড়ি নিজ ধনভাণ্ডারে সঞ্চয় করিতেছিল...মহানগরী সমুদ্রগর্ভোত্থিতা ঐশ্বর্যদেবীর ন্যায়

> আকাশস্পর্শী অট্টালিকাশ্রেণীতে নিজ সমৃদ্ধির দীপ্তি প্রতিফলিত করিয়া জন্মলাভ করিল।'[৭]

সামন্ততন্ত্র ও বণিক-তন্ত্রের মিলনের ফলে জন-জোয়ারের স্রোত কলকাতাকে ভরিয়ে ফেলছিল। অষ্টাদশ শতকে অর্থের আকর্ষণেই কলকাতায় এসেছিলেন পঞ্চানন ঠাকুর, গোবিন্দরাম মিত্র, নবকৃষ্ণ দেব, রামদুলাল দে প্রমুখেরা। ইংরেজের সংস্পর্শে এসে যাঁরা রাতারাতি বড়লোক হয়েছিলেন তাঁদের প্রভাবেই গড়ে উঠেছিল বাবু সমাজ। বংশগরিমা নয়, ধনের অভিমান ও অহংবোধের ওপরেই এই সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এই ধনাগমে প্রধান সহায় ছিল ইংরেজরা। অর্থ উপার্জনের অভাবিত সুযোগের সঙ্গে সেকালে ছিল বংশানুক্রমিক উন্নতির প্রতিশ্রুতি :

> 'সদ্বিবেচক ইংরাজ কোম্পানী বাহাদুর অধিক ধনী হওনের অনেক পন্থা করিয়াছেন এই কলিকাতা নামক মহানগরে আধুনিক বাবুদিগের পিতা কিংবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া...বেতনোপভুক হইয়া কিংবা রাজের সাজের কাঠের খাটের ঘাটের মাঠের ইটের সরদারী চৌকিদারী জুয়াচুরি পোদ্দারী করিয়া অথবা...কোম্পানীর কাগজ কিংবা জমিদারী ক্রয়াধীন বহুতর দিবসাবসানে অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন।'[৮]

কলকাতাবাসীদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির হার দেখে অন্য জায়গা থেকেও দলে দলে লোকজন কলকাতায় বসতি করতে লাগল। ফলে যে কলকাতা একদিন 'ভয়াবহ ব্যাঘ্র নক্রাদির সজল জঙ্গলময় বসতীস্থলী ছিল'[৯] সেই কলকাতাই মাটির গন্ধ মুছে ফেলে দ্রুত নিজের স্বরূপ বদলে ফেলতে শুরু করল।

গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৩২-১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ) কলকাতা শহরকে নতুন রাজধানী করার পরিকল্পনা করে কোম্পানির ডিরেক্টরদের কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন (নভেম্বর ১৭৭৫) তাতে বলেছিলেন কলকাতা রাজধানী হলে অনেক দিক থেকে সুফল ফলার সম্ভাবনা আছে। কলকাতার জনসংখ্যা বাড়বে, ধনসম্পদ বাড়বে এবং তার ফলে হেস্টিংস এর মতে এই হবে যে :

> 'Which will not only add to the consumption of our most valuable manufacture imported from home but will be the means of conveying to the native a more intimate knowledge of our customs and manners and of conciliating them to our policy and Government.'[১০]

বিনয় ঘোষের মতে হেস্টিংস এর এই উক্তির গভীর তাৎপর্য আছে। রেভারেন্ড ফারমিঙ্গার-এর কথাই ঠিক যে 'বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে যদি কলকাতার পত্তন করে থাকেন যোব চার্নক, তাহলে হেস্টিংস 'political capital' হিসেবে কলকাতার প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।'[১১] সমস্ত প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক দফতর কলকাতায় স্থাপিত হয়েছিল। ইংলিশ আইন অনুযায়ী বিচারব্যবস্থা সাজানো হয়েছিল। কলকাতার গুরুত্ব

সবদিক থেকেই ক্রমশ বাড়বে তা অনুভব করতে অসুবিধা হয়নি শাসনকর্তাদের। ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে সেখানে স্থাপিত হয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। হেস্টিংসের সময় থেকেই কলকাতা রাজনীতির প্রধান কেন্দ্রে অর্থাৎ রাজধানীতে পরিণত হয়েছিল। তখন স্বাভাবিকভাবেই 'অখ্যাত ক্ষুদ্র পল্লীসমষ্টি রাজধানীতে রূপান্তরিত হইয়া রূপের উচ্ছলতায়, লক্ষ লক্ষ নবাগত জনসংঘের সম্মিলিত হৃদস্পন্দনে, বিরাট ঐক্যের সচেতনতায় যেন নব যৌবনের দৃপ্ত শক্তিমত্ততায় চঞ্চল হইয়া'[১২] উঠেছিল।

ইতিমধ্যে অষ্টাদশ শতকের সূর্য অস্ত গেল, আবির্ভূত হল উনিশ শতকের নতুন দিন। ঔপনিবেশিক নাগরিক সমাজে কলকাতার 'বাবু' হয়ে উঠল এক বিশেষ প্রজাতি। কোম্পানির সঙ্গে বাণিজ্যে অথবা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এদের হাতে সঞ্চিত হয়েছিল বিপুল অর্থসম্পদ। এই পর্বে সহসা ধনী হয়ে ওঠা কলকাতার বাবুরা চূড়ান্ত ভোগসুখে দিনযাপন করত। তাদের সাজসজ্জা আর জীবনযাপনের অসামান্য সব চিত্র আছে সমকালের রচনায়। সেই বাবুদের সাজসজ্জার একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

> 'মুখে, ভ্রূ পার্শ্বে ও নেত্রকোলে নৈশ অত্যাচারের চিহ্নস্বরূপ কালিমা রেখা, শিরে তরঙ্গায়িত বাউরি চুল, দাঁতে মিশি, পরিধানে ফিনফিনে কালাপেড়ে ধুতি, অঙ্গে উৎকৃষ্ট মসলিন বা কেমরিকের বেনিয়ান, গলদেশে উত্তমরূপে চুনট করা উড়ানী ও পায়ে পুরু বগলস সমন্বিত চিনের বাড়ীর জুতা। এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া...রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইত।'[১৩]

নিখিল সুর জানাচ্ছেন তখন 'কলকাতার ধনীদের হাতে যে সম্পদ ছিল তা সমগ্র বাংলার সম্পদের থেকে বেশি।'[১৪] এই বিপুল সম্পদের একটা বড় অংশ ব্যয় হত বাবুদের আমোদ-প্রমোদে নেশার উপকরণে। আর এই নেশায় সর্বপ্রথমে উঠে এসেছিল মদ বা সুরা। উনিশ শতকের বাবু কালচারের অন্যতম অঙ্গ ছিল মদ্যপান। বাবুরা নিজেদের বৈঠকখানায় বা বাগানবাড়িতে ইয়ারদোস্ত সমেত আসর বসাতেন। সেই আসরে মদের ফোয়ারা ছুটত। আর অর্থবান মদ্যপ বাবুর দলে ভিড়ে যেতে পারলে বিনা খরচে মদ খাওয়ার সুরাহা হয়ে যেত একদল অকর্মণ্য, নেশাগ্রস্ত লোকের। দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একাদশী নাটকে নিমচাঁদের উক্তি মনে করা যেতে পারে : "এক ব্যাটা বড় মান্‌সের ছেলে মদ ধল্লে দ্বাদশটি মাতাল প্রতিপালন হয়।" [১৫]

এর চেয়ে সত্য সেকালে দুর্লভ। বাবুদের মোচ্ছবে নেশার বস্তুর প্রভূত আয়োজন থাকতো। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় 'আপনার মুখ আপুনি দেখ্' তে এক বাবুর বড়দিন উদযাপন প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন : "সকল মানুষ এক রকম নেশা করে না, আবগারির বিষয়ে সকল রকমই রাখ্‌তে হবে। (মদ) স্যাম্পেন, লিকর, ব্রাণ্ডী ও বিয়ারই অধিক চাই, চেরি সেরি না রাখ্‌লেও চল্‌বে না, জিনও দু-তিন বোতল রাখ্‌তে হবে, ধাড়ী পাড়বার জন্য নডেলাম প্রভৃতি রাখাও খুব কর্তব্য।...লোকে যেন কোনো জিনিশ চেয়ে

'পেলুম না' না বলে।"[১৬] হুতোমের নকশায় মদ্যপ বাবুদের মজলিশের রকমারি বিবরণ মেলে। যেমন শ্যামবাজারের এক বনেদী বাবুবাড়িতে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় মেজবাবু ইয়ারদের সঙ্গে যাত্রা দেখতে বসেছেন : "মজলিসে রূপোর গ্লাসে ব্রাণ্ডি চল্‌চে— বাড়ির টিক্‌টিকী ও সালগ্রাম ঠাকুর পর্যন্ত নেশায় চুরচুরে ও ভো!" এমতাবস্থায় পালা অনুসারে কোটাল মালিনীকে বেঁধে মারতে শুরু করলে মালিনীর কান্নায় "বাবুর চম্‌কা ভেঙ্গে গ্যালো; দেখ্‌লেন কোটাল মালিনীকে মাচ্চে, মালিনী বাবুর দোহাই দিচ্চে অথচ পার পাচ্চে না। এতে বাবু বড় রাগত হলেন "কোন ব্যাটার সাধ্যি আমার কাছ থেকে মালিনীকে নিয়ে যায়" এই বলে সামনের রূপোর গেলাসটি কোটালের রগ ত্যেগে ছুড়ে মাল্লেন।"[১৭] এছাড়া বড় পালা-পার্বণে বাবুদের বাড়িতে মহাধূমধাম হত। কলিকাতার ইতিবৃত্ত থেকে জানা যাচ্ছে কালীকিঙ্কর ঘোষের বাড়ির কালীপূজাতে তান্ত্রিকতার প্রাবল্যহেতু সুরাপান ব্যতীত আহ্নিক হত না। সে বাড়ির পূজায় "গুরু পুরোহিত কর্ত্তা প্রভৃতি পুরুষ, অন্দরে গৃহিণী এবং সমস্ত পুরনারী মায় দাস দাসীকে পর্যন্ত সুরাপান করিতে হইত।"[১৮] এমনকি নেশার ঘোরে দুর্গাপ্রতিমার সিংহ ভেঙে ফেলার পর জনৈক সিংহবাবুর সারারাত প্রতিমার পদতলে সিংহের স্থানে বসে থাকার গল্পও সেকালের কলকাতার বাতাসে ভেসে বেড়াত। মদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কলকাতার বাবুরা এক ভিন্নমাত্রিক জগৎ গড়ে তুলেছিলেন।

এরই পাশাপাশি উনিশ শতকে আরেকটি শ্রেণির দ্রুত উত্থান ঘটেছিল। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। পাশ্চাত্যের শিক্ষা এবং সভ্যতার আলোকে নিজেদের আলোকিত করে তোলার একটা প্রয়াস লক্ষিত হচ্ছিল। নতুন যুগের নতুন শিক্ষার বিস্তারে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'হিন্দু কলেজ' (১৮১৭ খ্রিস্টাব্দ)। এই সময়ের শিক্ষার আন্দোলন প্রধানত হিন্দু কলেজের মধ্যে দিয়েই অগ্রসর হয়েছিল। তরুণ শিক্ষক ডিরোজিওর (১৮০৯-১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ) অনুগামী একদল নব্য যুবক এই তন্দ্রাতুর জাতির নানা কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করেছিল। তারাই উনিশ শতকের বিখ্যাত 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠী। এরা সমাজের নানা অচলায়তনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। আর প্রাচীন সংস্কারের শিকল ছিঁড়ে ব্যক্তিস্বাধীনতার উল্লাস ঘোষণা করতে তাঁরা যে উপায়টি সর্বাগ্রে অবলম্বন করেছিলেন তা হল মদ্যপান। পাশ্চাত্যের ঔপনিবেশিক প্রভুর অনুকরণের মোহে এর কুফল তাঁদের চোখে পড়েনি। বিশেষত ইংরেজ প্রভুদের মধ্যে এই মদ্যপানের প্রচলন তাঁদের সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত করেছিল। এই বিভ্রান্তির ছিদ্রপথে উনিশ শতকের শিক্ষিত বঙ্গজীবনের সামাজিক রীতিনীতিতেও মদ্যপান সহজেই অনুপ্রবিষ্ট হবার সুযোগ লাভ করেছিল। নিতান্ত আমোদের সামগ্রী থেকে তা পরিণত হয়েছিল সভ্যতার মানদণ্ডের সূচকে। কার্তিকেয়চন্দ্র রায় নিজের আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে : "আমাদের মনে এই স্থির হইল যে, যখন এমন বুদ্ধিমান বিদ্বান ও সভ্যজাতীয়েরা ইহা আদরপূর্ব্বক ব্যবহার করিতেছেন, তখন ইহা অহিতজনক কখনই

নহে। অতএব ইহা পান না করিলে, সভ্যতাই বা কিরূপে হইবে আর পূর্ব্ব কুসংস্কারই বা কিরূপে যাইবে?”[১৯]

ফলে সেকালে মদ্যপান সভ্যতার অঙ্গ হিসেবেই পরিগণিত হত। এমনকি তথাকথিত শিক্ষিত বাবুরাও মনে করতেন মদ্যপানই সভ্যতার অন্যতম চিহ্ন। ‘আত্মচরিত’এ রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ) লিখেছেন :

> ‘তখন হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা মনে করিতেন যে, মদ্যপান করা সভ্যতার চিহ্ন, উহাতে দোষ নাই।’[২০]

‘আপনার মুখ আপুনি দেখ’ তেও মদ্যপান রাজপুরুষদের প্রথা হিসেবে সমাজে ক্রমশ গুরুত্ব পাচ্ছে তা দেখা যায়। সেখানে বলা হয়েছে :

> ‘যখন যে দেশ যে জাতীয় রাজার অধিকারে ভুক্ত হয়, সেই ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন হইয়া থাকে। রাজপুরুষদিগের সুরা অত্যন্ত আদরণীয়া, অতএব রাজ প্রথানুসারে আমরা সুরাপান করিতে পারি।’[২১]

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে উল্লিখিত হয়েছিল : “ইংরাজ জাতির এ দেশ অধিকার হইবার পূর্ব্বে সাধারণরূপে মদ্য ব্যবহার কতিপয় নীচ জাতির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল; কিন্তু এইক্ষণে উচ্চশ্রেণীর লোকেরদের মধ্যেও সুরাপান অধিক দৃশ্য হয়; বিশেষত নব্য সম্প্রদায়ি প্রায় তাবৎ বিদ্বান্ ও ধনি যুবককে ইহাতে সাতিশয় লিপ্ত হইতে দেখা যাইতেছে।”[২২]

শুধু তাই নয়, মদ্যপায়ীরা নিজেদের পক্ষে যুক্তি সাজাতেও ছিল ওস্তাদ।

‘কলিকাতার নুকোচুরি’ তে বলা হয়েছে :

> ‘মদে যে কি মজা হয়, তা যারা খায়, তারাই জানে। মন প্রফুল্ল করে, Mind enlarge করে, Ideas নতুন নতুন হয়, ভাব নানা প্রকার আসে, ও ভক্তির উদয় হয়।’[২৩]

মদের সঙ্গে স্বাস্থ্যহানির ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, মদ শরীরের অপূরণীয় ক্ষতি করে। কিন্তু মদ খেলে শরীর ধ্বংস হবে এমনটা স্বীকার করতেও মদ্যপায়ীরা মোটেই রাজি ছিল না। আরেকবার এই প্রসঙ্গে নিমচাঁদের স্মরণ নেওয়া যেতে পারে। তার বক্তব্য : “মদ খেলেই যে রোগ জন্মিবে এমন কিছু নিদান শাস্ত্রে লেখা নাই— যদি জন্মায় তা বলে কি, যে মহাত্মাকে একবার সহায় কল্যেম, যে মহাত্মার অনুকূলতায় জাতিভেদ উঠ্য়ে দিলেম, তাঁতি সোনার বেণে কামার কুমারকে নিয়ে একাসনে আহার কল্যেম...সেই মহাত্মাকে বিনশ্বর শরীরের অসুস্থতা হেতু পরিত্যাগ কর্‌বো? পীলের অনুরোধে মদ ছাড়া কাপুরুষের কাজ...মদের বিচ্ছেদে মনকে কেন ক্ষোভিত কর্‌বো?”[২৪]

‘কলিকাতার নুকোচুরি’তে এক বেশ্যা এক মাতালকে যখন বলেছে মদ খেলে নরকে যেতে হবে, তখন মাতাল প্রশ্ন করেছে :

> ‘বাবা, মদ খেলেই যদি নরকে যায়, তবেত নরক আজকাল ভারি গুলজার, কলিকাতার বড় বাবুরা যাঁরা মদ খেতেন তাঁরা তবে কোথা

> গ্যাচেন? অবিদ্যা তখন বলেছে “যিনি২ ও কাজ কোরেছেন সকলেই নরকে গ্যাচেন।” তখন মাতালের বক্তব্য “তবে সেখানে গেলেমই বা, তাতে দোষ কি? আমি একাকি স্বর্গে গিয়ে কি কোরবো”?’[২৫]

রসিকতার ছলে ব্যক্ত হলেও নেশাখোরের অভিপ্রায় বুঝতে দেরি হয় না এখানে। অনেকে আবার অনেকে পরিমিত মদ্যপানের পক্ষে সওয়াল করতেন। কিন্তু পরিমিতির সীমা লঙ্ঘিত হলে মদ্যপায়ীর ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হয়ে যেত তা বলাই বাহুল্য। আর নেশার কবলে পড়লে পরিমিতির জ্ঞান প্রায়সই লুপ্ত হয়ে যেত। রাজনারায়ণ বসু যথার্থ বলেছেন : “পানদোষ পরিমিত মানরূপ ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া পরিশেষে মনুষ্যের সর্বনাশ করে।”[২৬] ফলে এই স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করতে গিয়েই বহু প্রতিভার এবং সম্ভাবনার অপমৃত্যু ঘটেছিল মদের বোতলে তলিয়ে গিয়ে। রাজনারায়ণ বসু তাঁর ‘সে কাল আর এ কাল’ রচনায় বলেছেন :

> ‘ব্রাণ্ডিরূপ অগ্নিময় পানীয় দ্বারা এ দেশের কত অনিষ্ট সাধন হইতেছে, তাহা অনেকেই বুঝিতে পারিতেছেন।...এই অগ্নিতে কত ধনী, মানী ও বিদ্বানের প্রাণ আহুতিস্বরূপ নিক্ষিপ্ত হইল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।’[২৭]

মদ্যপানের কুফল তাই ক্রমশই সমাজ-সচেতন মানুষকে চিন্তিত করে তুলতে লাগল। তাঁরা দেখছিলেন সে সময়ে নেশার কবলে পড়ে একটা প্রজন্ম রীতিমতো উচ্ছন্নে চলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। ফলে শুরু হল মদ্যপান বিরোধী প্রচার। টেকচাঁদ ঠাকুর ওরফে প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ) এই বিষয়ে লিখেছিলেন ‘মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়’। সেই রচনার শুরুতেই তিনি আক্ষেপ করেছেন :

> ‘কলিকাতায় যেখানে যেখানে যাওয়া যায় সেইখানেই মদ খাইবার ঘটা। কি দুঃখী, কি বড় মানুষ, কি যুবা, কি বৃদ্ধ সকলেই মদ্য পাইলে অন্ন ত্যাগ করে।’[২৮]

‘একেই কি বলে সভ্যতা’, ‘সধবার একাদশী’র মত রচনাতেও এই সমস্যার কথা উঠে আসছিল। ভদ্রঘরের যুবকেরা মদ্যপ হয়ে পরিবার, সামাজিক সম্মানের কথা ভুলে পথে ঘাটে পড়ে থাকছিল। ব্যাপারটা চরম সীমায় পৌঁছলে এদেশের সংস্কারকরা সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ইংল্যান্ডের টেম্পারেন্স মুভমেন্টের আদলে সুরাপান বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। এসবের প্রতিকার হিসেবে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুরে ‘মদ্যপান নিবারণী সভা’ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে প্যারীচরণ সরকার কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ‘বেঙ্গল টেম্পারেন্স সোসাইটি’র মত সংগঠন, যার কাজই ছিল মদ্যপানের বিরুদ্ধে প্রচার চালানো। এই সভায় নাম লেখালে সদস্যরা প্রতিজ্ঞা করে মদ ত্যাগ করবেন, এই ছিল নিয়ম। কিন্তু নেশার দাস অনেকেই নাম লেখানোর পরেও প্রতিজ্ঞা রাখতে পারতেন না, আড়ালে মদ্যপান করতেন। সধবার একাদশীতে

নিমচাঁদ স্পষ্টই তার উল্লেখ করেছে : "প্রকাশ্যরূপে খাওয়া কম্‌চে, গোপনে খাওয়া বাড়চে।"[২৯] শুধু বাবুসম্প্রদায়ের মধ্যেই এই নেশার কুফল আবদ্ধ ছিল না, কলকাতার শ্রমজীবী সম্প্রদায়ও এই নেশার কবলে পড়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ছিল। হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর অবসর বিনোদনের পথ হিসেবে তারাও মদের আশ্রয় নিচ্ছিল। ব্রাহ্মনেতা শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রমিকদের মাদকদ্রব্য বিমুখ করার কাজে মনোনিবেশ করেছিলেন। ব্রাহ্মরা আরও অনেকেই এই নেশামুক্তির বিষয়ে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কেশবচন্দ্র সেন 'মদ না গরল', 'সুলভ সমাচার', 'বিষবৈরী' ইত্যাদিতে মদ্যপানের কুফল নিয়ে প্রচার শুরু করেন। মানুষকে মদের সর্বনাশা নেশা থেকে মুক্ত করতে শুরু করেন ইংল্যান্ডের 'Band of Hope'এর অনুকরণে 'আশা দল'। কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁর 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা মারফৎ খোলাভাঁটির সমালোচনা করে জনগণকে সচেতন করার জন্য আবেদন করেছিলেন। আবগারী রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য ব্রিটিশ সরকার এই বিষয়ে শিথিলতা প্রদর্শন করছে বলেও সেখানে তীব্র সমালোচনা হয়েছিল।

তথাকথিত মূলধারার পাশাপাশি নেশা সম্পর্কে বটতলা থেকেও প্রচুর বইপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। 'কি মজার শনিবার' থেকে জানা যাচ্ছে কলকাতার আমোদপ্রিয় বাবুরা কেমনভাবে মদের স্রোতে ভেসে চলত সপ্তাহান্তে : "ধন্য কল্কেতার সহর ধন্য শনিবার।/ বোতল ধরে আচ্ছা করে দিচ্ছে ক্যাবাহার।"[৩০] বিভিন্ন নকশা, নাটক, প্রহসন, ছড়া, গান নানা ধারায় এই সমস্যাটির ওপরে আলোকপাত করা হয়েছিল। এখানে নেশার কুফল তুলে ধরার সম্যক প্রয়াস দেখা যায়। যেমন মহেশচন্দ্র দাস দে লিখেছিলেন 'নেশাখুরি কি ঝক্‌মারি', প্রিয়শঙ্কর ঘোষ লিখেছিলেন 'সুরাপান কি ভয়ঙ্কর!!!', 'সুরাপান বিষয়ক প্রস্তাব' ইত্যাদি। 'সুরাপান বিষয়ক প্রস্তাব' জানাচ্ছে : "এদেশের হতভাগ্য মদ্যপায়ীগণ কি বিচিত্র বুদ্ধি সম্পন্ন, তাঁহারা মদ্যপানের এবম্বিধ নানা প্রকার দোষ দেখিয়াও তদর্থে জীবন দিবেন, তাহাও স্বীকার, তথাপি সুরা ছাড়িবেন না।"[৩১] অন্যদিকে 'নেশাখুরি কি ঝক্‌মারি' তে তো স্পষ্টই বলা হয়েছে নেশা মাত্রই ভাল নয়। কেবল মদ্যপানই যে মন্দ তা নয়, সকল নেশাই মন্দ। সেখানে সাবধান করা হয়েছে গাঁজা যদি খায় তাহলে লক্ষ্মী ছাড়ে, গুলি খেলে হাড় কালি হয়, চণ্ডু পান করলে তার গৃহে ঘুঘু চরে, আফিম পানে মৃত্যু হতে পারে। 'কৌতুক শতক' এর মত রচনার মধ্যে মজার ছলেও সমাজসত্য রূপে মদ্যপান ও মদ্যপায়ীদের বেহিসাবি পান এবং মাতলামির বিবরণ আছে। তাছাড়া সমাজের উচ্চবর্গ, শিক্ষিত, অর্থ এবং ক্ষমতাবান বাবু আর ভদ্রলোকদের মদ্যপান বিষয়ক দ্বিচারিতার প্রসঙ্গেও বটতলা ছিল মুখর। সভাসমিতিতে নাম লেখানো ভদ্রলোকেরাই যে সুবিধামত মদের সাগরে ভেসে যেতে প্রস্তুত তা বটতলার দৃষ্টি এড়ায়নি। সে তার নিজের বাচনে সমস্যাটির সম্পর্কে কাটাছেঁড়া করেছিল। উনিশ শতকের কলকাতা একই সঙ্গে আলো এবং অন্ধকারের জন্ম দিয়েছিল। এই অন্ধকারের বন্ধগলিতে মাথা কুটে মরছিল নেশায় মত্ত প্রজন্ম। স্বনির্মিত স্বেচ্ছাচারের অধঃপতনে ভ্রষ্ট একটি প্রজন্মের ইতিহাসই উনিশ শতকের

কলকাতার মদ্যপানের ইতিহাস। পরিশেষে একথা বলা যেতে পারে যে উনিশ শতকের কলকাতায় আমোদের উপকরণ হিসেবেই হোক বা সভ্যতার চিহ্ন হিসেবেই হোক, মদ এবং মদ্যপায়ীদের উল্কাবেগে উত্থান আদতে এক বৃহত্তর সামাজিক ধ্বংসলীলাকেই আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। বিপুল বিত্তবৈভব বা নবজাগৃতির আলো নগর কলকাতাকে বহিরঙ্গে সাজিয়ে তুলেছিল ঠিকই, তবে প্রদীপের তলার এই অন্ধকারকে সম্পূর্ণ দূর করতে পারেনি।

তথ্যসূত্র:

১. ঘোষ, বিনয়, *বাংলার নবজাগৃতি,* ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, কলকাতা, পরিবর্ধিত সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৮৬,পৃ ২

২. Munsi, Sunil Kumar, *dynamics of Urban Growth in Eastern India,* Kolkata (2011) Preface, তথ্যটি গৃহীত হয়েছে নিখিল সুরের *কলকাতার নগরায়ণ রূপান্তরের রূপরেখা,* সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৫, *পৃ ৩৭* থেকে।

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল, *কলিকাতা কল্পলতা, দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ (২),* রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০৪, পৃ ৫০৮

৪. ঘোষ, বিনয়, *মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ,* ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৯, পৃ ১৪

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল, *কলিকাতা কল্পলতা, দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ (২),* পৃ ৫০৬

৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ, *কলিকাতা কমলালয়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সংগ্রহ,* (সম্পা.) রমেন কুমার সর, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৩, পৃ ৩২

৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা,* মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ ২০১৫-১৬, পৃ ১৬

৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ, *নববাবু বিলাস, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সংগ্রহ,* পৃ ১৭২

৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল, *কলিকাতা কল্পলতা, দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ (২),* পৃ ৫০৫

১০. ঘোষ, বিনয়, *মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ,* পৃ ৩

১১. ওই, পৃ ৩

১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা,* পৃ ১৬

১৩. শাস্ত্রী, শিবনাথ, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,* নিউ এজ পাবলিকেশন প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারি ২০০৩, পৃ ৩৭

১৪. সুর, নিখিল, *কলকাতার নগরায়ণ : রূপান্তরের রূপরেখা,* পৃ ৫৪

১৫. মিত্র, দীনবন্ধু, *সধবার একাদশী, সধবার একাদশী পুনর্বিচার,* মলয় রক্ষিত (সম্পা.), অক্ষর প্রকাশনী, ২০১৫, পৃ ৫৯

১৬. মুখোপাধ্যায়, ভোলানাথ, *আপনার মুখ আপুনি দেখ* , কাঞ্চন বসু (সম্পা.),*দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ (২),* পৃ ৬২

১৭. সিংহ, কালীপ্রসন্ন, *হুতোম প্যাঁচার নকশা,* অরুণ নাগ (সম্পা.) সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, বৈশাখ ১৪০৩, পৃ ৯৪

১৮. দত্ত, প্রাণকৃষ্ণ, *কলিকাতার ইতিবৃত্ত,* কলকাতা, ১৯০৩, পৃ ১৩৩

১৯. শাস্ত্রী, শিবনাথ, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,* পৃ ৬০-৬১

২০. বসু, রাজনারায়ণ, *আত্মচরিত,* ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৮৫, পৃ ২৬

২১. মুখোপাধ্যায়, ভোলানাথ, *আপনার মুখ আপুনি দেখ, দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ (২),* পৃ ৩৮

২২. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, শ্রাবণ ১৭৭২ শক, সংখ্যা ৮৪, বিনয় ঘোষ (সম্পা.) *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ৫ম খণ্ড,* পৃ ১২৭

২৩. ঠাকুর, টেকচাঁদ (জুনিয়ার), *কলিকাতার নুকোচুরি, দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ (১),* রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০৪, পৃ ২২৪-২২৫

২৪. মিত্র, দীনবন্ধু, *সধবার একাদশী, সধবার একাদশী পুনর্বিচার,* মলয় রক্ষিত (সম্পা), অক্ষর প্রকাশনী, ২০১৫, পৃ ৫৮

২৫. ঠাকুর, টেকচাঁদ (জুনিয়ার), *কলিকাতার নুকোচুরি,* পৃ ১৯৯

২৬. বসু, রাজনারায়ণ, *সে কাল আর এ কাল, দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ (৩),* রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০৪, পৃ

২৭. ওই, পৃ ১৪৩

২৮. মিত্র, প্যারীচাঁদ, (টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে রচিত), *মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়, দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ (৩),* পৃ ১৬৯

২৯. মিত্র, দীনবন্ধু, *সধবার একাদশী, সধবার একাদশী পুনর্বিচার,* মলয় রক্ষিত (সম্পা.), পৃ ৫৭

৩০. শিকদার, চন্দ্রকান্ত, *কি মজার শনিবার,* অদ্রীশ বিশ্বাস সম্পাদিত *বটতলার বই ১,* গাঙচিল, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১, পৃ ৩১৩

৩১. সুরাপান বিষয়ক প্রস্তাব, *বটতলার বই (২),* গাঙচিল, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১, পৃ ৬৭-৬৮

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে ক্রীড়াপ্রসঙ্গ : একটি অনুসন্ধান

রাহুল পণ্ডা
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বালুরঘাট মহিলা মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: বর্তমান আলোচনায় প্রাগাধুনিক বাংলাসাহিত্যে ক্রীড়াপ্রসঙ্গের অনুসন্ধান করা হয়েছে। আধুনিক খেলার যে চিত্র সমকালীন উপমহাদেশে দেখতে পাওয়া যায় তা বিশেষভাবেই ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের অবদান। ইউরোপীয় খেলাগুলির দাপটে অনেকক্ষেত্রে মুছে গেছে দেশজ ক্রীড়াচর্চার ইতিহাস। বর্তমান প্রবন্ধে চেষ্টা করা হয়েছে সেই প্রাগাধুনিক খেলাধুলোর চিহ্ন, যা লেগে রয়েছে প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের আনাচেকানাচে, তাকে খুঁজে দেখার।
সূচক শব্দ: প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য, ক্রীড়াপ্রসঙ্গ, শারীরিক কসরত, বিভিন্ন ইন্ডোর গেমস্, খেলাধুলো এবং বাঙালি মন।

রাজশেখর বসু তাঁর অভিধানগ্রন্থ ‘চলন্তিকা’-য় ক্রীড়া শব্দের অর্থ করেছিলেন খেলা, তামাশা, আমোদপ্রমোদ, মল্লযুদ্ধের মতো কৌতুকাবহ অনুষ্ঠান।[১] প্রসঙ্গত ক্রীড়া শব্দটিকে আধুনিক ভাষাজ্ঞানে যে ধরনের অভিধার্থে দেখা হয়, অর্থাৎ ঘেরা আঙিনায় নির্দিষ্ট কিছু নিয়মকানুন অনুসৃত শারীরিক কসরত; প্রাগাধুনিক আমলে কিন্তু তেমন ছিল না। তখন ক্রীড়ার অর্থ ছিল অনেক বেশি ব্যাপ্ত এবং বহুমাত্রিক। হাসিঠাট্টা, রঙ্গ-চটুলতা, বিবিধ খেলাধুলো, ইন্ডোর গেমস্ থেকে যুদ্ধকলা, রণকুশলতা সবই ছিল এর অন্তর্গত।[২]

অভিধান থেকে ঐতিহাসিক সূত্রে সরে এলে দেখা যায়, প্রাচীন ও মধ্যযুগে উপমহাদেশের অভিজাত রাজন্যবর্গের প্রধান শখ ছিল শিকার বা মৃগয়া। বাঙালি অভিজাত সম্প্রদায়ও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। শুধু অভিজাত নয়, বাংলাদেশে বসবাসরত বিপুল সংখ্যক অস্ট্রিক জনগোষ্ঠীর মানুষেরও (অন্ত্যজ, ম্লেচ্ছ, শবর, পুলিন্দ, চণ্ডাল, ব্যাধ ইত্যাদি) প্রধান উপজীব্য ছিল শিকার। পাহাড়পুর এবং ময়ানামতীর ফলকগুলিতে যে কারণে প্রচুর শিকারচিত্র পাওয়া গেছে।[৩] নীহাররঞ্জন রায়ের ‘বাঙ্গালীর ইতিহাস’ গ্রন্থ থেকে জানা যায় শিকারের পাশাপাশি এই গুহাচিত্রগুলিতে মেলে ‘কুস্তী বা মল্লযুদ্ধ এবং নানাপ্রকার দুঃসাধ্য শারীর ক্রিয়া’-র ছবি। এমনই একটি উদাহরণ কৈলান লিপি। সমতটেশ্বরের রাজা শ্রীধারণের আমলে রচিত এই লিপিতে মহারাজের প্রশংসাসূচক স্তুতিবাক্যে লেখা হয়েছে, ‘গজতুরগ-সতত-পীড়ন-ক্রমোচিতশ্রম বলিততনুবিভাগ – রম্যদর্শন’, অর্থাৎ নিয়মিত হস্তী এবং অশ্বক্রীড়ায় রত থাকার ফলে শ্রীধারণের দেহ ছিল পেশীসমৃদ্ধ এবং সুদর্শন।[৪] এই শ্লোকগুলি থেকে তৎকালীন অভিজাতবর্গের মধ্যে প্রচলিত হাতি এবং অশ্বক্রীড়ার সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ পাওয়া

যায়। অন্যদিকে বাংলার অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের খেলাধুলো সম্পর্কে নীহাররঞ্জন জানিয়েছেন মল্লযুদ্ধ এবং কষ্টসাধ্য শারীরিক কসরতগুলি মূলত প্রচলিত ছিল নিম্নবর্ণের মানুষজনের মধ্যেই।[৫] নিম্নকোটির মহিলাদের মধ্যে প্রচলিত একগুচ্ছ গৃহক্রীড়ার কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি – 'নিম্নকোটি স্তরে এবং নারীদের মধ্যে কড়ির সাহায্যে নানপ্রকার খেলা, যথা গুঁটি বা ঘুন্টিখেলা, বাঘবন্দী, ষোলঘর, দশপঁচিশ, আড়াইঘর প্রভৃতি তখন হইতেই সুপ্রচলিত ছিল, এমন অনুমানে কিছু মাত্র বাধা নাই।'[৬] এছাড়া নীহাররঞ্জনের প্রদেয় তথ্য অনুসারে পাশাখেলা এবং দাবাখেলা ছিল জনসাধারণের প্রধান মনোরঞ্জন। পাশা খেলা বিবেচিত হত বিবাহোৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ হিসেবে।[৭] অন্যদিকে সর্বানন্দের 'টীকাসর্বস্ব' থেকে জানা যায় 'অড়ঢ' বা 'আঢ' (ভেড়া, মুরগির লড়াই) নামে একটি খেলার কথা, যাতে বাজি রেখে তখনকার দিনের নিম্নবিত্ত মানুষ জুয়া খেলতেন।[৮] সন্ধ্যাকর নন্দীর দ্ব্যর্থক গ্রন্থ 'রামচরিত'-এ কৈবর্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে পাওয়া যায় বাইচ খেলার কথা।[৯]

এখন প্রশ্ন হল, বাংলা সাহিত্যে এই ধরনের ক্রীড়াপ্রসঙ্গগুলির উল্লেখ কোন সময় থেকে পাওয়া যাচ্ছে? এখনও পর্যন্ত যা বিদ্যায়তনিক প্রমাণ, তাতে কাহ্নপাদ রচিত চর্যাপদের ১২ নম্বর পদটি বাংলাভাষায় রচিত প্রথম সাহিত্যিক উদাহরণ, যেখানে খেলার কথা রয়েছে। সুকুমার সেন এই পদটি সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'একটি চর্যাগানে চতুরঙ্গ খেলার ভালো বর্ণনা আছে'।[১০] তবে চতুরঙ্গ বা দাবা খেলার উত্তেজনা বোঝাতে পদটি রচিত হয়নি, বা বাঙালি জীবনে তার অবস্থান বোঝাতেও লিখিত হয়নি। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রচিত চর্যার পদগুলি অধিকাংশ তাঁদের গুহ্যসাধনপ্রণালীর রূপকাকারে বিবৃতি। কাহ্নপাদের পদটিও তার ব্যতিক্রম নয়। পদের খানিকটা উদ্ধৃত করা যেতে পারে, 'করুণা পিহাড়ি খেলহুঁ নয়বল/ সদগুরু বোহেঁ জিতেল ভববল/ ফীটউ দুআ মাদেসিরে ঠাকুর/... পহিলেঁ তোড়িআ বড়িআ মারিউ/ গঅবরেঁ তোলিআ পাঞ্চজনা ঘালিউ/ মতিএঁ ঠাকুরক পরীনিবিত্তা/ অবশ করিআ ভববল জিতা।'[১১]লক্ষণীয় পদটি জুড়ে দাবার বিবিধ অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হলেও নিয়মকানুনের বিশেষ তোয়াক্কা করা হয়নি। 'ভববল', বা 'গঅবরেঁ তোলিআ পাঞ্চজনা ঘালিউ', বা 'মতিএঁ ঠাকুরক পরীনিবিত্তা' ইত্যাদির মধ্যে সেই কানুনগত উল্লঙ্ঘনের আন্দাজ মেলে। দাবা এখানে রূপকমাত্র। ডঃ নির্মল দাশ যে কারণে পদটি সম্পর্কে যথার্থ বিশ্লেষণ করেছেন, 'আলোচ্য চর্যায় দাবাখেলার রূপকে সংসার-মুক্তি ও মহাসুখলাভের তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে'।[১২]

চর্যাপদের উত্তরকালে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায় কৃষ্ণের গেণ্ডুয়া নিয়ে খেলার কথা। গেণ্ডুয়া কীধরনের খেলা সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আভিধানিক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন গেণ্ডুয়া সংস্কৃত শব্দ কন্দুক থেকে রূপান্তরিত। কন্দুকের অর্থ হল 'বালকদিগের ক্রীড়নকবিশেষ', বা 'বলখেলা'।[১৩] বংশীখণ্ডে বিরহাতুর রাধা যখন বারংবার বড়াইকে অনুরোধ করেছেন কৃষ্ণকে খুঁজে এনে দেওয়ার জন্য, উত্যক্ত বড়াই জানিয়েছিল, কৃষ্ণ চঞ্চলমতি, সে কখনো যমুনার

তীরে বসে থাকে, কখনো বা গেণ্ডুয়া খেলে গোকুলের অভ্যন্তরে, 'গেণ্ডুয়া খেলাএ খনে গোকুল ভিতরে'।[১৪] যদিও কৃষ্ণের এহেন গেণ্ডুয়া খেলার বিবরণ 'ভাগবত'-এ পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে 'ভাগবত'-এ বিস্তৃত বিবরণ মেলে কৃষ্ণের দৈহিক ক্ষমতা এবং মল্লযুদ্ধের মতো রণক্রীড়ায় পারঙ্গমতার, যার ভাববস্তু ধরা পড়েছে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এর অনুবাদে।

উপমহাদেশের সামাজিক যাপনে এবং সংস্কৃতিতে দাবা, পাশা, বা টাকা বাজি রেখে জুয়া খেলার প্রবণতা বেশ সহজলভ্য। বাংলাসাহিত্যে ইতস্ততঃ এর বেশ কিছু নমুনা পাওয়া যায়। যেমন বিজয় গুপ্ত রচিত মনসামঙ্গল কাব্য 'পদ্মাপুরাণ'-এ 'রাখাল বাড়ীর পূজা' অংশে গোচারণে রত বালকদের কথা রয়েছে, যারা লাটিক নামে জনৈক কিশোরের নেতৃত্বে মেতেছিল জুয়াখেলায়, 'সকল রাখালে মিলি খেলায় জুয়াখেলা'।[১৫] অন্যদিকে মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল'-এর দ্বিতীয়ার্ধে অর্থাৎ বণিকখণ্ডে বিবরণ মেলে খুল্লনার এবং ধনপতির পাশা খেলার। বিবাহ বাসরে নববধূকে আয়ত্ত করার জন্য ধনপতি পেতেছিল পাশার দান। অবৈধ মন্ত্রবলে এবং কূট নিয়মের প্রয়োগে সে খেলায় ধনপতি জয়ী হয়, 'পাশাতে জিনিল সাধু মন্ত্রের বলে'।[১৬] কবিবর মুকুন্দ যে কারণে ভাবীকালেপ্রশংসিত, তাঁর নিখুঁত তথ্যদানের ক্ষমতা, তা এই পাশাখেলার বর্ণনার মধ্যে ধরা পড়েছে। 'পাঁচনি', 'পাঁচার', 'বামঞ্চ', 'দুই পাঁচে বান্ধে রামা করিআ সুসঞ্চ', 'বিদু পেল্যা সদাগর পেলিল চৌয়ার', 'পাটী পড়ে দুয়া চারি' ইত্যাদি বাক্যাংশ এবং উপযুক্ত পরিভাষার ব্যবহারে পাশাখেলার সমকালীন প্রয়োগ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি।[১৭] পাশাখেলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আরও পাওয়া যায় দৌলত কাজীর 'লোরচন্দ্রাণী' গ্রন্থে। সেখানে দেখা যায় সতী স্ত্রী ময়নাকে ত্যাগ করে রাজা লোরক রাজ্যের নির্বাচিত তরুণ রাজপুরুষদের সঙ্গে বনে গেছেন 'কানন বিহারে' এবং সেখানে মজে আছেন পাশা খেলায়, 'নিত্য সভা করি, খেলে পাশা সারি, লইয়া পাত্রসমাজ'।[১৮]

পক্ষান্তরে সৈয়দ আলাওলের 'পদ্মাবতী' গ্রন্থে তৎকালীন রাজা-বাদশাদের মনোরঞ্জনের উপাদান হিসেবে বিস্তৃত উল্লেখ মেলে শতরঞ্জ, চৌগান এবং অশ্বক্রীড়ার। 'চিতোরগড় বর্ণন খণ্ডে' পাওয়া যায় শতরঞ্জের কথা, 'এত বুলি সাহা সতরঞ্জ খেলা আনি/ নৃপ আমি খেলিয়া বিশ্রাম করি খানি'।[১৯]তবে এর থেকে আরও বিস্তৃত বিবরণ মেলে চৌগানের, যা আধুনিক ক্রীড়াসংজ্ঞায় পরিচিত পোলো হিসেবে। বস্তুত চৌগানের জন্য আলাওল বরাদ্দ করেন একটি আস্ত অধ্যায় 'চৌগান খণ্ড'। একটি পুরোদস্তুর চৌগান ম্যাচের ধারাভাষ্য এই অধ্যায়ে পাওয়া যায়। রত্নসেন সিংহলে পৌঁছানোর পরে সেখানকার নির্বাচিত ক্রীড়াবিদদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়েছিলেন চৌগানের ময়দানে। সিংহলের রাজপুরুষরা কুশলতার নিরিখে ন্যূন না হলেও, রত্নসেনের সঙ্গে এঁটে উঠতে সক্ষম হননি। খেলায় টানা তিনবার জয় লাভ করেন রত্নসেন। চৌগান বিষয়ে আলাওলের মনোগ্রাহী বিবরণের খানিকটা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, 'চৌগান খেলিতে হৈল অশ্বে আরোহণ/ দুই দিকে চারি খুঁটি আনিয়া গাড়িল/ মধ্যভাগে আরোপিয়া গেডুয়া ফেলিল/ মিশামিশি হইয়া তবে লাগিল খেলিতে... চৌগান ঠেলিয়া

যোগী গুলি পলটায়/ গেড়ুয়া বেড়িয়া শব্দ শুনি ঠনাঠনি/ দূরে থাকি দেখে রত্নসেন নৃপমণি/ ঈষৎ হাসিয়া নৃপ আসিয়া তুরিত/ গেড়ুয়া মারিয়া দিল সিংহলের ভিত'।[২০]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মুসলমান শাসনে উত্তর ভারত সহ উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে চৌগান সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। মুঘল যুগেরও আগে আফগান আমলে চৌগানের প্রচলনের শুরু। শোনা যায় তৈমুর লঙের হাত ধরে এটি সিল্করুট হয়ে উপমহাদেশে পা রাখে। কবি হাফিজ নাকি সেসময় আশা প্রকাশ করতেন শত্রুদের কাটা মাথা তৈমুরের পোলো বলের কাজ করবে।[২১] ভারতের প্রথম মুসলিম সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবক রীতিমতো পক্ষপাতী ছিলেন চৌগানের এবং বিভিন্ন মহলের তথ্য অনুসারে চৌগান খেলতে খেলতেই ঘোড়ার উপর থেকে ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। তবে চৌগানের আসল সমৃদ্ধি আকবরের আমলে। সভাকবি আবুল ফজলের বিবরণ অনুযায়ী আকবর নিজে চৌগানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, এবং মনে করতেন চৌগান বা অন্যান্য খেলা নিছক বিনোদনের বিষয় নয়, বরং সেগুলি মানুষের মধ্যে নেতৃত্বদানের ক্ষমতা, বন্ধুত্ব ও দায়িত্ববোধ তৈরি করে, '...it means of learning promptitude and decision. It tests the value of a man, and strengthens the bond of friendship.'[২২]খেলা সম্পর্কে আকবরের এই দৃষ্টিভঙ্গি কোথাও গিয়ে আধুনিক ক্রীড়ামানসিকতার সমকক্ষ।

প্রাগাধুনিক বাংলাসাহিত্যের মধ্যে যে যৎসামান্য বাহুবল এবং যুদ্ধরীতির উদাহরণ মেলে তার মধ্যে বিশিষ্ট জায়গা জুড়ে রয়েছে 'ধর্মমঙ্গল'। বিশেষত এই গ্রন্থের চতুর্থ পালা, অর্থাৎ 'আখড়া পালা'-তে লাউসেন এবং কর্পূরধবলের মল্লবিদ্যার যে পরিচয় মানিকরাম গাঙ্গুলি, ঘনরাম চক্রবর্তী প্রমুখ কবিরা রেখে গেছেন, তা থেকে সেকালীন শক্তিচর্চার আভাস পাওয়া যায়। অনুশীলনের প্রথম ধাপ আখড়া নির্মাণ। কামারকে ডেকে নির্মাণ করা হল সুরম্য আখড়া, 'অপূর্ব আখড়া ঘর করিল নির্মাণ/ সন্নিধানে প্রাঙ্গণে পুতিল মালকাট/ দুপাশে দুসর রাখে দিব্য করে ঠাট'।[২৩] আখড়ার পরের ধাপে আসে গুরুর খোঁজ। মণিপুর থেকে সেসময় প্রশিক্ষক হিসেবে মল্লবীরদের আনা হতো, এছাড়া আনা হতো গৌড় থেকেও। কিন্তু কাহিনিতে তাদের অযোগ্যতা এবং হাতে সময় কম থাকার কারণে বাতিল করা হয়, 'মণীপুরে মল্ল ছিল মনোনীত নয়/ মল্ল সারেঙ ধর আছে গোউড় নগরে/... সেন কন সেকথা সম্প্রতি রাখ হাতে/ বিলম্বে সে বিস্তর হবেক যাতায়াতে'।[২৪] অবশেষে নিরঞ্জনের আদেশে হনুমান মর্ত্যে অবতীর্ণ হয়ে দায়িত্ব নেন প্রশিক্ষকের। সাতদিনের শিক্ষায় ক্রমশ পরিপক্ব মল্লবীর হয়ে ওঠে দুই ভাই। প্রথমে শেখে শ্বাসের বিদ্যা, 'শ্বাসের হরণ'।[২৫] তারপর ধাপে ধাপে শেখে 'মানকাট', 'বাহু কসাকসি', শূন্যে উঠে 'উড়া পাক', 'লোহার বাটুল' নিয়ে কারসাজি ইত্যাদি।[২৬] প্রশিক্ষণ যে যথার্থ হয়েছিল, তা বোঝা যায় যখন গৌড়ের মল্লবীর সারেঙধর সহ আরও সাত মল্লযোদ্ধাকে একাহাতে লাউসেন কুপোকাত করতে সক্ষম হয়।

মধ্যযুগের টেক্সটে সাধারণত যে খেলাগুলির কথা পাওয়া যায়, যেমন শতরঞ্জ, জুয়া, পাশা, মল্লযুদ্ধ ইত্যাদি; সেগুলি পরিচিত এবং প্রচলিত। কিন্তু এই প্রথাগত খেলার বাইরে গ্রামবাংলার নিজস্ব দু'একটি খেলার কথাও আকস্মিকভাবে উঁকি মেরে যায় কোথাও কোথাও। যেমন 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'-য় মহুয়া পালায় খোঁজ পাওয়া যায় বেদের দলের, যারা ওস্তাদ ছিল পোষা প্রাণী থেকে দৈহিক কসরত পর্যন্ত বিভিন্নধরনের খেলা দেখানোয়। আমন্ত্রণ পেয়ে নদের চাঁদের বাড়িতে বেদের দল হাজির হয় 'তাম্‌সা' দেখানোর জন্য। সেখানে সুন্দরী মহুয়ার বাঁশবাজী ('যখন নাকি বাইদ্যার ছেড়ী বাশে মাইলো লাড়া') এবং দড়ির খেলা ('দড়ি বাইয়া উঠ্যা যখন বাশে বাজী করে') দেখার জন্য আসর ভেঙে পড়েছিল।[২৭] মহুয়ার বিপজ্জনক খেলা দেখতে দেখতে কারও কারও মধ্যে আশঙ্কাও তৈরি হচ্ছিল বুঝি বা সে বাঁশ থেকে পড়ে যাবে ('নইদ্যার ঠাকুর উঠ্যা কয় পইর্‌য়া নাকি মরে')।[২৮]

মোটের উপর কিছুটা এমনই ছিল প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে ক্রীড়াপ্রসঙ্গের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা। প্রসঙ্গত দু'টি পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে এই আলোচনার ইতি টানা যেতে পারে। প্রথমত, ভারতের অন্যান্য অংশের তুলনায় বাঙালি মোটেই ক্রীড়ামোদী জাতি নয়। যে কারণে মধ্যযুগের অজস্র পুঁথি-পাতড়া, মঙ্গলকাব্য, কৃষ্ণকীর্তন হাতড়ে ফেললেও সহজলভ্য নয় শারীরিক খেলার নমুনা। ধর্মমঙ্গলে যতই যুদ্ধবিগ্রহ থাক, মেয়েদের প্রকাশ্য অসি হাতে লড়াই থাক, রাঢ়-বঙ্গের মানুষ সমরে বা ক্রীড়ায় কোনোকালেই স্বচ্ছন্দ নয়। 'চণ্ডীমঙ্গল'-এর বণিক খণ্ডে মুকুন্দ চক্রবর্তী দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন শ্রীমন্তের পাঠ্যসূচীর, অথচ কোনোরকম শারীরিক শ্রমের উল্লেখ করেননি।[২৯]চৈতন্যদেবের সমকালীন নবদ্বীপের ঘনিষ্ঠ বিবরণ পাওয়া যায় বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এ। সেখানে ব্যাকরণ, অলঙ্কারশাস্ত্র, নব্যন্যায়ের কথা থাকলেও, ক্রীড়াচর্চার উল্লেখ নেই। সাহিত্যের পাতায় যেটুকু যা লভ্য সবই প্রায় অক্ষ, দাবা, কড়ির মতো ইন্ডোর গেমস্‌। স্বভাবতই সেন আমল থেকে কোনো রকম বাধা না পেয়ে বৈদেশিক শক্তি ক্রমাগত টপকে এসেছে ছোটোনাগপুরের মালভূমি, বিপরীতে বাঙালিও তাদের পদানত হয়েছে নির্বিবাদে। এর পিছনের কারণ অনেকরকম হতে পারে, কিন্তু শারীরিক বলের খামতি যে অন্যতম, তা অস্বীকার করার জায়গা নেই।

দ্বিতীয়ত, খেলাধুলোর টেকনিক্যাল দিক নিয়ে প্রায় কোনো লেখকই চিন্তিত ছিলেন না। তৎকালীন সময়ে খেলা ছিল হয় মনোরঞ্জন, নয় বীর্যবত্তার প্রকাশ। কিন্তু একমাত্র 'ধর্মমঙ্গল'-এর দু-একটি উল্লেখ বাদ দিলে সেই প্রকাশভঙ্গির মধ্যেও যে লুকিয়ে থাকতে পারে খেলার খুঁটিনাটি, ক্রীড়াবিদদের পুরুষকার, প্যাঁচপয়জারের বিবরণ, নিয়মকানুনের উল্লেখ বা প্রয়োজন মতো উত্তেজনা, তা এই লেখাগুলির মধ্যে অনুপস্থিত। আলাওল 'পদ্মাবতী' গ্রন্থে একটি পুরো অধ্যায় ব্যয় করেছিলেন চৌগান প্রসঙ্গে। অথচ চৌগানের বৈশিষ্ট্য বা স্বকীয়তার প্রায় কোনোকিছুই সেখানে ধরা পড়েনি। এটা লেখকদের প্রতিভাগত দুর্বলতা ভাবলে ভুল হবে, তাঁদের বক্তব্যের গতিমুখটাই

ছিল ভিন্ন। ঈশ্বরলীলা এবং মানবলীলার মধ্যে একটি দ্বন্দ্বমুখর সাঁকো নির্মাণ করার কাজে তাঁরা এতটাই লিপ্ত ছিলেন যে খেলা নিয়ে বিশেষ ভাবনার অবকাশ তাঁরা পাননি।

আসলে বাঙালি জীবনে খেলা বিষয়ক আধুনিক মননটি, সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও, ক্রমশ তৈরি হয়েছে উপমহাদেশে ইংরেজরা আসার পর। স্বভাবতই ইংরেজদের আগমনের পূর্বতন প্রাগাধুনিক টেক্সটগুলিতে পয়ার এবং প্রত্নকলাবৃত্তের ফাঁকে যে খেলাধুলোর নমুনা পাওয়া যায়, সেগুলি ক্রীড়াপ্রসঙ্গ মাত্র, তাদের ক্রীড়াসাহিত্য বলে দাবি করা বাতুলতার নামান্তর। তাছাড়া খেলার গল্প বলার জন্য সেসব লেখাও হয়নি। কোথাও রূপক, কোথাও রতিক্রিয়া পূর্ববর্তী মনোরঞ্জন, কোথাও বা শরীরচর্চার উপাদান হিসেবে খেলার উল্লেখ আছে। তা সত্ত্বেও বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর জাতীয় এবং সাংস্কৃতিক পরিসরে খেলাধুলোর অবস্থান বোঝার জন্য এই প্রসঙ্গগুলি জরুরি, এবং বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রে নিবিড় চর্চার দাবি রাখে।

তথ্যসূত্র এবং প্রাসঙ্গিক মন্তব্য:

১। বসু, রাজশেখর, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, 'চলন্তিকা', কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স লিঃ, পৃ – ১২৭

২। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' গ্রন্থে 'ক্রীড়া' শব্দের অর্থ করেছেন অন্তত ছয়রকম – খেলা, লীলা, পরিহাস, রতি, কেলি, রণ।' খেলা' শব্দের অর্থের তালিকা আরও দীর্ঘ – ক্রীড়া (তাস, দাবা, পাশা, জুয়া এবং পুতুল - মূলত এই পাঁচটি ইন্ডোর গেমস্), লীলা (দেবতার লীলা এবং সংসার লীলা), কামক্রীড়া ও বিহার, শিশূচিত ক্রীড়া, অস্ত্রাদির কৌশলপূর্বক সঞ্চালন (অসি, লাঠি, তলোয়ার এবং শড়কি – মূলত এই চারটি), কৌতুককর অঙ্গভঙ্গি ও হস্তাদির চালনকৌশল (ব্যায়াম), ছুটোছুটি, নৃত্য, রঙ্গতামাশা, কোনো বিষয়ে আসক্তি। [বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ, 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' (প্রথম খণ্ড), দিল্লি, প্রথম প্রকাশ, সাহিত্য অকাদেমী, পৃ – ৬৯৭, ৭৪৭]

৩। রায়, নীহাররঞ্জন, ১৪২০ বঙ্গাব্দ, 'বাঙালীর ইতিহাস' (আদি পর্ব), কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, পৃ – ৪৪৯

৪। ঐ, পৃ – ৪৫০

৫। ঐ, পৃ - ৪৪৯

৬। ঐ, পৃ - ৪৫০

৭। ঐ, পৃ - ৪৫৯

৮। ঐ, পৃ - ৪৫০

৯। নন্দী, সন্ধ্যাকর, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ, 'রামচরিত', সম্পাদনা – ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড, পৃ - ১০৪

১০। সেন, সুকুমার, ১৯৫৮, 'বঙ্গভূমিকা', কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, পৃ – ৩০৬
১১। দাশ, নির্মল, ১৯৯৭, 'চর্যাগীতি পরিক্রমা', কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ - ১৪৩
১২। ঐ, পৃ – ১৪৫
১৩। 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' (প্রথম খণ্ড), পৃ – ৫৩৫
১৪। বড়ু চণ্ডীদাস, ১৯৬৯, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', সম্পাদনা - অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, কলকাতা, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, জিজ্ঞাসা, পৃ - ২৭৫
১৫। গুপ্ত, বিজয়, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ, 'পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল', সম্পাদনা – বসন্তকুমার ভট্টাচার্য, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, শুধাংশু সাহিত্য মন্দির, পৃ - ৫০
১৬। চক্রবর্তী, মুকুন্দ, ২০১৭, 'চণ্ডীমঙ্গল' ('কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল'), সম্পাদনা – সুকুমার সেন, দিল্লি, সপ্তম মুদ্রণ, সাহিত্য অকাদেমি, পৃ - ১৬৯
১৭। ঐ, পৃ - ১৭০
১৮। কাজী, দৌলত, ১৯৯৫, 'লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না', সম্পাদনা – দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, সাহিত্য সংসদ, পৃ - ১৫
১৯। আলাওল, সৈয়দ, ২০১৭, 'পদ্মাবতী' (২য় খণ্ড), সম্পাদনা – দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পৃ - ৩১৪
২০। ঐ, পৃ – ১৫৭
২১। 'The legendary poet hafiz blessed Timur by hoping that his enemies' heads would become his polo balls and Timur apparently fulfilled the poet's wish.' (Sen, Ronojoy, 2015, 'NATION AT PLAY', Gurugram, 1st edition, Penguin Viking, p - 11)
২২। Ibid, p – 28
২৩। গাঙ্গুলি, মানিকরাম, ১৯৬০, 'ধর্মমঙ্গল', সম্পাদনা – বিজিতকুমার দত্ত এবং সুনন্দা দত্ত, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ - ১১৬
২৪। ঐ
২৫। ঐ, পৃ - ১১৯
২৬। ঐ, পৃ - ১১৯, ১২০
২৭। দীনেশচন্দ্র সেন সংকলিত, ১৯৫৮, 'মৈমনসিংহ গীতিকা' [পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা], কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ - ৯
২৮। ঐ
২৯। 'চণ্ডীমঙ্গল', পৃ - ২২৩

কাজী নজরুল ইসলামের রাজনৈতিক চেতনার অনুসন্ধান

পুলক কুমার দাস
সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
কালিনগর মহাবিদ্যালয়, উত্তর ২৪ পরগণা

সারাংশ (Abstract) : প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে পৃথিবীব্যাপী হতাশা, মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পরিবেশে বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) যেন এক ধূমকেতুর নাম। রাজনীতি সচেতনতা ও জনমূল-সংলগ্নতা নজরুলের কবি-চৈতন্যে এনেছিল নতুন মাত্রা। পূর্ববর্তী কবিদের তুলনায় তাঁর রাজনীতি - মনস্কতা অনেকটাই বেশি ছিল। নজরুল রাজনীতির সংস্পর্শে যে উদ্দীপ্ত হতেন, কিশোর বয়সেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) যোগ দিতে চলে যাওয়া তার একটি প্রমাণ। কংগ্রেসের রাজনীতি, সাম্যবাদের আদর্শ, সশস্ত্র বিপ্লববাদের লক্ষ্য - এই তিনের প্রতিই বিভিন্ন সময়ে আকর্ষণ দেখা গেছে নজরুলের। শান্তিকামী মানুষের মাথার ওপরে ইংরেজ শাসকদের দুঃশাসন, লুটপাট ও এ দেশেরই পদলেহী দালালরা অশান্তি ও রক্তের প্লাবন নামিয়ে দিয়েছিল যখন, সেই সময়ে ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বনকারী কবির কবিতায় উচ্চারিত হয়, 'জাগো অনশন বন্দী ওঠ রে যত, জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত জাগো'। সর্বপ্রথম 'ধূমকেতু' পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। আর আবেদন-নিবেদনে এই পূর্ণ স্বাধীনতা মোটেই সম্ভব নয়। নজরুল একেবারে এই খাঁটি সত্যটা চাঁছাছোলা ভাষায় ঘোষণা করেছেন। 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতাটি তারই একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। তাই দেশে দেশে বিপ্লবী, প্রতিবাদী ও সংগ্রামী কবিদের মধ্যে নজরুলের মত সমতুল্য বিদ্রোহী ও মুক্তিকামী কবি আর একজনকেও খুঁজে পাওয়া যায় না।

শব্দসূচক (Keywords) : রাজনীতি মনস্কতা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দেশপ্রেম, পত্র-পত্রিকা, বিদ্রোহের বাণী, সাম্যবাদের আদর্শ, কবিতা, পূর্ণ স্বাধীনতা, প্রতিবাদী, সংগ্রামী, মুক্তিকামী, নির্বাচন, জনজাগরণ।

ভূমিকা (Introduction) :

সৃষ্টির ধ্বংসাত্মক সুর মানব ইতিহাসের পরতে পরতে পরাধীনতার বিষবাষ্প ছড়িয়েছে। শাসনের তাবেদারিতে শোষণের আলিঙ্গনে মোহাবিষ্ট করেছে মানুষ নামের শ্রেষ্ঠ জীবকে। আর এই শ্রেষ্ঠত্বের চিরায়ত কাঠামো ভেঙে সৃষ্টির শুরু থেকেই আদিম ছন্দের দোলায়িত রূপে নিজেকে দগ্ধ করেছেন কেউ কেউ। যিনি শৈশব থেকেই ছেলের হাতের মোয়ার মতো দীনতাকে পেয়েছিলেন নিত্যসঙ্গী হিসাবে। দৈন্যের দরজায় দাঁড়িয়ে যিনি একদম শিশু বয়সে লেটো দলের বাদক, আবার রুটির দোকানের শ্রমিক হয়ে পার করেছেন তাঁর শৈশব ও কৈশোর। পরে অবশ্য কাজ করেছেন সৈনিক হিসাবে, সাংবাদিকতা করেছেন, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন নেমেছেন রাজপথে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে

প্রতিবাদ করে হয়েছেন কারারুদ্ধ, কিন্তু মাথা নত করেননি কোথাও। তিনি আমাদের বিদ্রোহী কবি, স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় কবি-কাজী নজরুল ইসলাম। সাম্যবাদ, গণজাগরণ, রেনেসাঁসে তিনি ছিলেন বিদ্রোহী একজন রণক্লান্ত যুগপুরুষ। যিনি শোষিত-বঞ্চিত-নিপীড়িত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা ও কূপমণ্ডূকতার বিরুদ্ধে একজন রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি হিসাবে আপোসহীনতার সঙ্গে কলম ধরেছেন। পরাধীনতার নাগপাশ থেকে বাঁচার মন্ত্র তিনি দিয়েছেন তাঁর কবিতায়। ঔপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খল ভাঙার মন্ত্র দিয়ে তিনি চেয়েছিলেন ব্রিটিশদের শাসন-শোষণ-নির্যাতন আর লুটপাটের শৃঙ্খলকে গুঁড়িয়ে দিতে। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে লেখেন "আমি বেদুইন, আমি চেঙ্গিস/আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ"।

গবেষণা পদ্ধতি (Research methodology) :

প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক প্রমাণ বা ঐতিহাসিক নথিপত্রের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সমসাময়িকক পত্র-পত্রিকা ও আত্মজীবনী প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আধুনিক গবেষকদের রচিত নানাবিধ তথ্যসমৃদ্ধ রচনাবলীও গবেষণাকর্মটি প্রস্তুত করতে সাহায্য নেওয়া হয়েছে। প্রবন্ধটি রচনায় গবেষণা ক্ষেত্রে অনুসরণযোগ্য পর্যালোচনামূলক এবং তথ্যনিষ্ঠ অনুসন্ধান রীতিকে অনুসরণ করার চেষ্টা বিশেষভাবে রয়েছে। এখানে বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই এই গবেষণা প্রবন্ধটি গুণগত গবেষণা হয়ে উঠেছে।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and objectives of the Reasearch) :

১। কাজী নজরুল ইসলামের রাজনৈতিক চেতনা গঠনের কারণ অনুসন্ধান করা।

২। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সম্পাদনের মাধ্যমে ও লেখনীর দ্বারা জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রচার ও জনগণের ব্রিটিশ বিরোধী মানসিকতা গঠনে তাঁর ভূমিকা অন্বেষণ করা।

৩। কিভাবে তাঁর সাহিত্য কর্ম ও গান জনজাগরণ তৈরি করেছিল, তা নির্ণয় করা।

৪। প্রত্যক্ষ ও নির্বাচনমূলক রাজনীতিতে তাঁর অংশগ্রহণের ধরণ অনুসন্ধান করা।

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ (Interpretation and Analysis) :

১৮৯৯ সালের ২৪শে মে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন কাজী নজরুল ইসলাম। পিতামহ কাজী আমিন উল্লাহের পুত্র কাজী ফকির আহমেদের দ্বিতীয় স্ত্রী জাহেদা খাতুনের ষষ্ঠ সন্তান তিনি। কাজী নজরুল ইসলামের ডাক নাম ছিল 'দুখু মিয়া'। মক্তবে কুরআন, ইসলাম ধর্ম, দর্শন এবং ইসলামী ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন শুরু করেন। ১৯০৮ সালে পিতার মৃত্যুর পর নজরুল উক্ত মক্তবেই শিক্ষকতা শুরু করেন। একই সাথে হাজী পালোয়ানের কবরের সেবক এবং মসজিদের মুয়াযযিন (আযান দাতা) হিসাবে কাজ শুরু করেন। মক্তব,

মসজিদে ও মাজারের কাজে নজরুল বেশি দিন ছিলেন না। বাল্য বয়সেই লোকশিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে একটি লেটো দলে যোগ দেন। এই দলের সাথে তিনি বিভিন্ন স্থানে যেতেন, তাদের সাথে অভিনয় শিখতেন এবং তাদের নাটকের জন্য গান ও কবিতা লিখতেন। সেই অল্প বয়সেই তাঁর নাট্যদলের জন্য বেশ কিছু লোকসঙ্গীত রচনা করেন। এর মধ্যে রয়েছে 'চাষার সঙ', 'শকুনীবধ', 'রাজা যুধিষ্ঠিরের সঙ', 'দাতা কর্ণ', 'আকবর বাদশাহ', 'কবি কালিদাস', 'বিদ্যাভূতূম', 'রাজপুত্রের গান', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং 'মেঘনাদ বধ'। নজরুল কালীদেবিকে নিয়ে প্রচুর শ্যামা সঙ্গীত রচনা করেন। নজরুল তাঁর শেষ ভাষণে উল্লেখ করেন-

"কেউ বলেন আমার বাণী যবন,
কেউ বলেন কাফের।
আামি ও দুটোর কোনটাই না।
আমি শুধু হিন্দু-মুসলিমকে
এক জায়গায় ধরে নিয়ে
হ্যাণ্ডশেক করানোর চেষ্টা করেছি,
গালাগালিকে গলাগলিতে
পরিণত করার চেষ্টা করেছি"।

১৯১০ সালে নজরুল লেটো দল ছেড়ে ছাত্র জীবনে ফিরে আসেন। এই নতুন ছাত্রজীবনে তাঁর প্রথম স্কুল ছিল রানীগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ স্কুল, এরপর ভর্তি হন মাথরুন উচ্চ ইংরাজি স্কুলে। আর্থিক সমস্যা তাঁকে বেশী দিন এখানে পড়াশোনা করতে দেয়নি। ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর তাঁকে আবার কাজে ফিরে যেতে হয়। আসানসোলের চা-রুটির দোকানে রুটি বানানোর কাজ নেন। দোকানে কাজ করার সময় আসানসোলের দারোগা রফিজউল্লাহ্-র সাথে তাঁর পরিচয় হয়। তিনিই নজরুলকে ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালের দরিরামপুর স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি করে দেন। ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আবার রানীগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ স্কুলে ফিরে যান এবং সেখানে অষ্টম শ্রেণী থেকে পড়াশোনা শুরু করেন। এই স্কুলের শিক্ষক নিবারন চন্দ্র ঘটক ছিলেন প্রকৃত পক্ষে নজরুলের রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু। নিবারন চন্দ্র ঘটক স্কুল জীবনে নিখিল ভারত বিপ্লবী সংগঠনের কর্মী ছিলেন। তাঁর মাসিমা ছিলেন প্রথম নারী বিপ্লবী। তাঁর নাম ছিল দু কড়ি বালা দেবী। নিবারন চন্দ্র ঘটক দেশের স্বাধীনতা ও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখতেন। সেই স্বপ্নের বীজ নজরুলের মধ্যে বপন করেছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) পরবর্তী ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে শাসক গোষ্ঠীর হাতে সাধারণ নাগরিক যে কতটা নিপীড়িত, নিগৃহীত ও শোষিত ছিলেন তা সে সময় পর্বের ইতিহাসের দিকে তাকালে স্পষ্ট বোঝা যায়। সামাজিক এই ভঙ্গুর অবস্থা সত্যসন্ধানী ও ন্যায়ের পথে লড়াকু নজরুলের চেতনায় গভীর অভিঘাতের সৃষ্টি করে। অন্যদিকে, এ সময়পর্বে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে

ঘটে যাওয়া আন্দোলন, যেমন — ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব, আয়ারল্যাণ্ড-এর স্বাধীনতা সংগ্রাম, তুরস্কে কামাল পাশার নেতৃত্বে নবজাগরণ, ভারতে ১৯১৯ সালের রাওলাট আইন, ১৯১৯ সালের মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার রিপোর্ট, ১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, ১৯২০-এর দশকে অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন ইত্যাদি রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ নজরুলকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলে এবং তাঁর বিদ্রোহী সত্ত্বাকে ব্যাপকভাবে আলোড়িত করে।

১৯১৭ সালের শেষ দিকে নজরুল ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। করাচি সেনানিবাসে তিনি সৈনিক জীবন কাটাতে শুরু করেন। এই সময় তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ফার্সি কবি হাফিজের কিছু বই ছিল। নজরুলের কাগজপত্রের তলায় সিডিশান কমিটির রিপোর্ট চাপা থাকত। গোপনে তিনি সেসব পড়তেন। এসব কিছুই ছিল কাজী নজরুলের রাজনৈতিক সচেতনতার বহিঃপ্রকাশ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে (১৯১৮) কলকাতায় এসে নজরুল বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির অফিসে বসবাস শুরু করেন। এখান থেকেই তাঁর সাহিত্য-সাংবাদিকতার জীবনের মূল কাজগুলো শুরু হয়। খিলাফৎ আন্দোলন ও অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ১৯২০ সালের ১২ জুলাই 'নবযুগ' নামক একটি সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিককার সম্পাদক ছিলেন এ. কে. ফজলুল হক। বেশ চড়া মেজাজের লেখা 'নবযুগ' পত্রিকায় প্রকাশিত হত। লেখাগুলির সুর ছিল প্রবল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিরোধী।এই পত্রিকায় 'মুহাজিরীন হত্যার জন্য দায়ী কে'— শিরোনামে একটিপ্রবন্ধ লিখলে নজরুলের ওপর পুলিশের নজরদারি শুরু হয়। সাংবাদিকতার মাধ্যমে নজরুল তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন এবং জাতীয় ভাবধারা প্রচার করেন।

কাজী নজরুল সম্পাদিত পত্রিকাগুলি সমকালীন রাজনীতি, বাঙালী জাতীয়তাবাদ, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের মুখপত্র হয়ে উঠেছিল। ১৯২২ সালের আগষ্ট মাসে কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদনায় আত্মপ্রকাশ করে 'ধূমকেতু' পত্রিকা। কমরেড মুজফফর আহমেদ ও কবি কাজী নজরুল দুজনেই স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক বক্তব্য প্রচারের লক্ষ্যে এই অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ঐতিহাসিক দিক থেকে এই পত্রিকাটি ভারতবর্ষের এক অমূল্য দলিল। ১৯২০ এর দশকে অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলন এক সময় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এর পরপর স্বরাজ গঠনে যে সশস্ত্র বিপ্লববাদের আবির্ভাব ঘটে, 'ধূমকেতু' পত্রিকার তাতে বিশেষ অবদান ছিল। প্রাণের প্রবলতা ঘোষণা এবং অন্যায় ও অত্যাচারেরর বিরুদ্ধে দেশবাসীদের সচেতন করার কঠিন দায়িত্ব নেয় 'ধূমকেতু'। এই পত্রিকাকে আশীর্বাদ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন -

"কাজী নজরুল কল্যাণীয়েষু,
আয় চলে আয় রে ধূমকেতু।
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,

দুর্দ্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন”!

নজরুল ‘ধূমকেতু’-তে অনেকগুলি অগ্নিবর্ষী প্রবন্ধ লিখে জাতির স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রেরণা যুগিয়েছেন। সেগুলির চরিত্র বোঝাবার পক্ষে দু-একটি উদাহরণই যথেষ্ট। ১৩২৯ সালের ১৪ই কার্তিক তারিখে ‘ধূমকেতু’-র সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ‘আমি সৈনিক’-এ নজরুল লেখেন, “আমাদের বিজয় পতাকা তুলে ধরবার জন্য এসো সৈনিক। পতাকার রং হবে লাল, তাকে রং করতে হবে খুন দিয়ে। বল আমরা পেছাব না। বল আমরা সিংহশাবক, আমরা খুন দেখে ভয় করি না। আমরা খুন দিয়ে খেলা করি, খুন দিয়ে কাপড় কোপাই, খুন দিয়ে নিশান রাঙাই। বল আমি আছি পুরুষোত্তম জয়। বল মাভৈঃ মাভৈঃ জয় সত্যের জয়”। পত্রিকার ১৯২২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় নজরুলের কবিতা ‘আনন্দময়ী আগমনে’ প্রকাশিত হয়। এই কবিতার মধ্যে দিয়ে তিনি শাসকশ্রেণীর অত্যাচার ও শোষণ তুলে ধরেন এবং জনগণকে ব্রিটিশ বিরোধী করে তোলেন।

১৯২৫ সালের নভেম্বর মাসে আত্মপ্রকাশ ঘটে ‘লাঙল’ পত্রিকাটির। সম্পাদক হিসেবে নাম থাকতো নজরুলের সৈনিক জীবনের বন্ধু মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের, যদিও সম্পাদনার কাজটি প্রকৃতপক্ষে কাজী নজরুল ইসলাম করতেন। ‘লাঙল’ পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় লেবার স্বরাজ পার্টির সংবিধানের নীতি সম্বলিত ইশতেহারটি পূর্ণাঙ্গ রূপে মুদ্রিত হয়েছিল এবং ছাপা হয়েছিল নজরুলের বিখ্যাত কবিতা ‘সাম্যবাদী’। মাত্র দুটি দীর্ঘ স্তবকে সম্পূর্ণ সাম্যবাদী কবিতাটি বত্রিশটি পংক্তিতে লেখা। এই কবিতায় দুটি পর্যায় স্পষ্ট চেনা যায়। প্রথম পর্যায়ে কবি পুঁথির ভারকে উপেক্ষা করেছেন এবং জীবন্ত হৃদয়কে গুরুত্ব দিয়েছেন। সেই সঙ্গে ধর্ম-বর্ণগত ভেদ অস্বীকার করেছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে হৃদয়ের মহত্ত্ব প্রচারিত হয়েছে। হৃদয়ের তথা প্রেমের কোনো জাতি ধর্ম নেই বলেই সেইখানে মিশে যায় হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীশ্চান। ১৯২৫-এর ভারতবর্ষে বিভেদ ভাবনা মাথাচাড়া দিলে নজরুল এই মানবপ্রীতির কথা ঘোষণা করে বলেন -

“গাহি সাম্যের গান-
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান”।

‘লাঙল’ পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকে প্রতিটি সংখ্যাতেই সম্পাদকীয় লিখতেন নজরুল নিজেই। নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুষের প্রতি সহমর্মিতা এবং তাদের একাত্মতার প্রকাশ ঘটতো তাঁর প্রতিটি সম্পাদকীয়তে। ১৯২৬ সালের আগষ্ট মাসের 'লাঙল' বদলে ‘গণবাণী’ হয়। কাগজের দায়িত্ব নেন মুজফফর আহমেদ। ‘গণবাণী’-তে লেখা হয় বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল গণবাণীর প্রকাশ ভার গ্রহণ করেছে। ‘লাঙল’-এর তুলনায় গণবাণী অধিক মাত্রায় রাজনৈতিক ছিল। সম্পাদনার দায়িত্বে না থাকলেও ১৯২৭ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত নজরুল এই পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। ১৯২৬ সালের দাঙ্গার পটভূমিতে গণবাণী পত্রিকার প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল নজরুলের লেখা প্রবন্ধ ‘মন্দির ও মসজিদ’। পরবর্তী সংখ্যায় ছাপা হয় নজরুলে লেখা ‘হিন্দু-

মুসলমান' নামক প্রবন্ধটি। এইভাবে সাংবাদিকতার ও পত্রিকার সম্পাদনের সূত্রে রচিত তাঁর অগ্নিক্ষরা রচনাবলী জাতীয় ভাবধারা প্রচার, জনজাগরণ ও জনগণের ব্রিটিশ বিরোধী মানসিকতা গঠন করেছিল।

নজরুস ইসলামের প্রতিবাদী সাহিত্য অর্থাৎ কাব্য ও প্রবন্ধসমূহ ভারতবর্ষেরর গণজাগরণে ব্যাপক ভূমিক গ্রহণ করে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' কাব্যের অন্তর্গত 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। বঙ্গভঙ্গ, খিলাফৎ আন্দোলন, অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-১৯২২) ও বিপ্লববাদের পটভূমিতে নজরুলের কবিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর বিদ্রোহ ছিল রাষ্ট্রের, শাসকের ও শোষকের বিরুদ্ধে। 'বিদ্রোহী' কবিতা শুরু হয়েছে এক বীরকে সম্বোধন করেন। এই বীর কেবলমাত্র বাহুবলে বীর নয়, শ্রেষ্ঠ মানুষ বলেও সে বীর। সে অ-দাহ্য, অব্যয়, অক্ষয়। সেই সত্তাকে কবি নিজের মধ্যে যেমন অনুভব করেছেন, তেমনি সমস্ত জাতির মধ্যে সেই বীরকে তিনি দেখতে চেয়েছেন। আত্মজাগরণকে গুরুত্ব দিয়ে কবি বলেছেন-

"বল বীর
বল উন্নত মম শির
শির নেহারি আমারি নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির"।

১৯২৬ সালের ৮ই জানুয়ারি 'লাঙল' পত্রিকায় নজরুলের 'সব্যসাচী' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এই কবিতায় আত্মবোধন ও আত্মশক্তির জাগরণী গান কবি গেয়েছেন। কবির মনে হয়েছে যে, মহাত্মাজীর পথে দেশের স্বাধীনতার আসবে না, শুধু লক্ষ লক্ষ প্রাণ বলি হবে। তাই সশস্ত্র সংগ্রামকে কবি বরণ করতে উৎসুক হন। বিস্ফোরণের মতো তিনি জাগরণ চান, সেই জাগরণের প্রাণ পুরুষ হল 'সব্যসাচী'। যোগ্য নেতৃত্ব পেলে দেশ ও জাতি নিজেকে পুনর্নির্মাণ করতে পারে-কবির এই বিশ্বাস এখানে ধ্বনিত হয়েছে। তাঁর উদ্দিষ্ট 'সব্যসাচী' কে তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। তবে অনুমান করা যায় যে, সুভাষচন্দ্র সেই নবীন বীর, যাঁকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নতুন যুগের আশা, স্বপ্ন ও যৌবনশক্তি রূপে জনগণের নেতা হিসাবে অভিনন্দিত করেছিলেন। নজরুলও বলেছেন-

"নবীন মন্ত্রে দানিতে দীক্ষা আসিতেছে ফাল্গুনী,
জাগরে জোয়ান। ঘুমোয়ো না ভুয়ো শান্তির বাণী শুনি"।

কাজী নজরুলের প্রবন্ধে গভীরভাবে উঠে আসে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের চেতনা। সাধারণের মধ্যে তীব্র হতে থাকে ইংরেজ বিরোধী অবস্থান। তাঁর 'যুগবাণী' গ্রন্থে রয়েছে ২১টি প্রবন্ধ।প্রবন্ধগুলোতে পরাধীনতার গ্লানি দূর করার প্রত্যক্ষ চেতনা ও প্রতিরোধের প্রবল সুর স্পন্দিত হয়েছে। 'নবুযগ'-এ তিনি বলেন- "মারো অত্যাচারীকে। ওড়াও স্বাধীনতা-বিরোধীর শির। ভাঙো দাসত্বের নিগড়। এ বিশ্বে সবাই স্বাধীন। মুক্ত আকাশের এই মুক্ত মাঠে দাঁড়াইয়া কে তাহার অধীনতা অস্বীকার করিবে, এই খোদার উপর খোদকারী শক্তিকে দলিত কর"। কাজী নজরুল এই গ্রন্থের 'গেছে দেশ দুঃখ নাই', 'আবার তোরা মানুষ হ' - প্রবন্ধে মনুষ্যত্ব, বিবেক ও কর্তব্যকে সবার ওপরে স্থান

দিতে বলেছেন। শেষোক্ত প্রবন্ধটিতে জাতিকে জাগিয়ে তোলার তীব্র চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে। নজরুল বলেছেন –

“বাহিরের স্বাধীনতা গিয়াছে বলিয়া অন্তরের
স্বাধীনতাকেও আমরা বিসর্জন না দেই।
আজ যখন সমস্ত বিশ্ব মুক্তির জন্য
শৃঙ্খল ছিঁড়িবার জন্য উন্মাদের মত
সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতেছে,
স্বাধীনতা যজ্ঞের হোমানলে
আবাল, বৃদ্ধ-বণিতা দলে দলে আসিয়া
নিজের হৃদপিণ্ড উপড়াইয়া দিতেছে,
তাহাদের মুখে শুধু এক বুলি;
মুক্তি-মুক্তি-মুক্তি”।

১৯২৬ সালে আটটি প্রবন্ধ নিয়ে নজরুলের ‘রুদ্র মঙ্গল’ এবং সাতটি প্রবন্ধ নিয়ে ‘দুর্দিনের যাত্রী’ গ্রন্থ দুটি প্রকাশিত হয়। এসব প্রবন্ধেও ইংরেজ শাসকের অত্যাচারে উৎপীড়িত জনগণকে রুখে দাঁড়াবার আহ্বান এবং সর্বহারা মানুষের অধিকার চেতনার নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে। এই দুইটি গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধ অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে নৈরাজ্য, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য, ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হওয়ার প্রেরণা ও জাতীয় জাগরণের বিভিন্ন দিক অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তিনি ‘রুদ্র মঙ্গল’ গ্রন্থের এক প্রবন্ধে দেশের দুর্দশা মোচনে ভয়ঙ্করের বেশে সুন্দরের আহ্বান করেছেন-“জাগো জনশক্তি! হে আমার পদপিষ্ট কৃষক, আমার মুটে মজুর ভাইরা! তোমার হাতের এ লাঙল আজ বলরাম স্কন্ধে হলের মত ক্ষিপ্ত তেজে গগনের মাঝে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠুক, এই অত্যাচারীর বিশ্ব উপড়ে ফেলুক-উলটে ফেলুক। আন তোমার হাতুড়ি, ভাঙ ঐ উৎপীড়কের প্রাসাদ-ধুলায় লুটাও অর্থ পিশাচ বলদর্পীর শিব”। এই সব প্রবন্ধের মাধ্যমে কাজী নজরুল বাঙালী জাতিকে জাগিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন এবং তাদের প্রবল ব্রিটিশ বিরোধী মানসিকতা তৈরি করেছেন।

মানব মুক্তির কথা ও শৃঙ্খল ভাঙার কথা ধ্বনিত করে কাজী নজরুল স্বদেশের গান রচনা করেন। মাতৃরূপা জন্মভূমির প্রতি গভীর ভালোবাস হল তাঁর স্বদেশমূলক গানের মূল প্রেরণা। ১৯২৪ সালে প্রকাশিত ‘বিষের বাঁশী’-তে নজরুলের যে সমস্ত গান অন্তর্ভুক্ত হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- ‘আজ রক্ত-নিশি ভোরে’, ‘জাতের নামে বজ্জাতি’, ‘এ কোন পাগল পথিক ছুটে এলো’ প্রভৃতি। দেশাত্মবোধ মানুষের চেতনাকে প্রখরতা দিয়েছিল, বিপ্লবী চেতনাকে গতিময় করেছিল। স্বদেশ প্রেমে বিভোর হয়ে নজরুল গেয়ে উঠলেন -

“ও ভাই সোনার চেয়ে খাঁটি

আমার দেশের মাটি।।
এই দেশেরই মাটি জলে
এই দেশেরই ফুলে ফলে
তৃষা মিটাই মিটাই ক্ষুধা পিয়ে এরি দুধের বাটি।।
এই মায়েরই প্রসাদ পেতে
মন্দিরে এর এঁটো খেতে
তীর্থ করে ধন্য হতে আসে কত জাতি"।

নজরুল ইসলামের সংগ্রামমূলক গানে একদিকে যেমন পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা রয়েছে, তেমনি শোষণের বিরুদ্ধেও সংগ্রামের কথা রয়েছে। তাঁর এ সকল গানে সমূহে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) - উত্তর বাংলাদেশে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের মানসরূপটি প্রতিফলিত হয়। কিছু গানে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণজাগরণের আহ্বান ধ্বনিত করা হয়েছে। আবার কিছু গানে জেল-জুলুম মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কথা বলা হয়েছে। ১৯২৪ সালে প্রকাশিত 'ভাঙার গান' কাব্যে পরাধীনতার থেকে মুক্তির গান গাওয়া হয়েছে এভাবে -

"কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল কর রে লোপাট রক্ত-জমাট
শিকল-পূজার পাষাণ-বেদী!
ওরে ও তরুণ ঈশাণ!
বাজা তোর প্রলয়-বিষাণ! ধ্বংস-নিশান
উঠুক প্রাচী-র প্রাচীর ভেদি।।
…………………
…………………
নাচে ঐ কাল-বোশেখী, কাটারি কাল ব'সে কি?
দেবে দেখি ভীম কারার ঐ ভিত্তি নাড়ি।
লাথি মার, ভাঙরে তালা! যত সব বন্দী-শালায়-
আগুন জ্বালা, আগুন জ্বালা, ফেল উপাড়ি"।

১৯২৫ সালে কাজী নজরুল প্রত্যক্ষ রাজনীতি শুরু করেন এবং তাঁর রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা শহর ও মফঃস্বলে পরিব্যাপ্ত হয়। বিপ্লবীরা বোমা মেরে, গুলি করে ইংরেজদের দেশ ছাড়া করতে চায়। ব্রিটিশ সরকার তাদেরকে সন্ত্রাসবাদী বলে চিহ্নিত করে। নজরুলকে এ দলের লোকেরা বেশি ভালোবাসত। নজরুলও তাদের ভালোবাসতেন। ব্রিটিশদের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন - "এ দেশ ছাড়বি কি না বল/নইলে মারের চোটে হাড় করিব জল"। তবে, কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতা ব্রিটিশদের সরাসরি আঘাত করাটা পছন্দ করতেন না। তাঁরা ব্রিটিশদের এক ধরণের তোষামোদি করতেন। নজরুল এই তোষামোদি পছন্দ করতেন না। তাই জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি তাঁর আস্থা ছিল না। নজরুল উপলব্ধি করেন যে, গান্ধীজীর আন্দোলনে

দেশে স্বাধীনতার পথ সুগম হবে না। কারণ, তিনি বিপ্লববাদী আন্দোলনকে ইংরেজদের সুরে গণ্য করেন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন হিসাবে। কেবলমাত্র তাই নয়, বিপ্লবী ভগৎ সিংয়ের ফাঁসির বিরুদ্ধে গান্ধীজী কোন প্রতিবাদ করেননি। নজরুল তখন গান্ধীজীর সমালোচনা করেন। গান্ধীজী চান স্বরাজ অর্থাৎ স্বায়ত্ত্বশাসন, স্বাধীনতা নয়। কিন্তু নজরুল চেয়েছিলেন ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা। তিনি গান্ধীজীর পথকে পরিহার করে 'ধূমকেতু' পত্রিকার মাধ্যমে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করেন।

১৯২৫ সালের শেষের দিকে কাজী নজরুল ইসলাম, হেমন্তকুমার সরকার, কুতুবুদ্দিন আহমদ ও শাসমুদ্দীন-এর উদ্যোগে কলকাতায় ‘শ্রমিক প্রজা স্বরাজ দল’ গঠিত হয়। কাজী নজরুলের স্বাক্ষরে দলটির প্রথম ইশতেহার প্রকাশিত হয়েছিল। দলের মুখপাত্র হিসাবে ‘লাঙ্গল’ পত্রিকার প্রধান পরিচালকও নজরুল ছিলেন। দলটির বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচী নিয়ে তিনি সারা বাংলায় ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। অধিকার বঞ্চিত -নিপীড়িত সাধারণ মানুষকে রাজনৈতিক ভাবে সচেতন করতে তিনি বিভিন্ন সম্মেলনে বক্তৃতা, গান, কবিতা, আবৃত্তি করতেন। দেশ মাতৃকার স্বাধীনতা অর্জনে তরুণদের উৎসাহিত করতে এবং মুক্তি অর্জনের শক্ত ভিত তৈরির উদ্দেশ্যে নজরুল ১৯২৬ সালে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদ বিভাগে মুসলামনদের জন্য সংরক্ষিত আসনের নির্বাচিত প্রার্থী হলেন। তৎকালীন স্বরাজ দলের নেতা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের দেওয়া তিনশত টাকা নিয়ে নির্বাচনের কাজে নেমেছিলেন। নির্বাচনে ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, ও ময়মনসিংহ। এই বিরাট এলাকা নিয়ে গঠিত আসনে মোট ভোটার ছিল ১৮,১১৬ জন। নভেম্বর মাসে তিনি নির্বাচন এলাকায় নির্বাচনী জনসংযোগ করেন।

ডা: বিধানচন্দ্র রায় নজরুলের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ও ভাবমূর্তিকে ব্যবহার করে নির্বাচনের বৈতরণী পার হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নবীন এই প্রার্থীকে লড়াইয়ে টিঁকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও লোকবলে পর্যাপ্ত কোন ব্যবস্থা রাখেননি। নির্বাচনে কবি বাদে বাকি প্রার্থীরা হলেন ইসমাইল হোসেন চৌধুরী, আব্দুল হালিম গজনবী, ঢাকার নবার খাজা আব্দুল করিম ও তমিজ উদ্দিন আহম্মেদ। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের বেশিরভাগই প্রভাবশালী ও অবস্থাপন্ন ছিলেন। নজরুল প্রচারকার্য চালানোর জন্য তেমন কাউকে পেলেন না। এসব বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও নির্বাচনে জয়ের বিষয়ে কাজী নজরুল ইসলাম প্রচণ্ড আশাবাদী ছিলেন। ভোট গ্রহণকালে জসীম উদ্দিন কবি নজরুলকে ভোট প্রাপ্তির আশায় একটি ভোট কেন্দ্রের পোলিং অফিসারের কাছে বসিয়ে দেন। তবে ভোটের ফলাফলে দেখা গেল যে, পাঁচজন প্রার্থীর মধ্যে কবি নজরুল ১০৬২টি ভোট পেয়ে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছেন। ভোটের ফলাফলে পরাজিত হলেও নির্বাচনে কবির অংশগ্রহণে রাজনৈতিক ফলাফল সুদূরপ্রসারী ছিল। সকল শ্রেণী-পেশার মানুষকে রাজনীতি মুখী করতে ও তরুণ প্রজন্মকে নেতৃত্ব আগ্রহী করতে কাজী নজরুল ইসলামের এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।

উপসংহার (Conclusion) :

মূলত, উনবিংশ শতকের শেষে বা বিংশ শতাব্দী দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকের বিস্তৃত রাজনৈতিক পটভূমিতে কাজী নজরুল লালিত হন এবং তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তির বিকাশ ঘটে। বিশেষ করে, মহাযুদ্ধোত্তর বিভিন্ন আন্দোলন নজরুল ইসলামকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এর ফলে তিনি কিছু সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। ১৯২০ সালে খিলাফৎ আন্দোলনে একনিষ্ঠভাবে কাজ করেন। পাশাপাশি রাজনৈতিক আদর্শ ও তাঁর দাবি প্রকাশ করার জন্য সাংবাদিকতায় নিয়োজিত হন। তাঁর সম্পাদিত 'ধূমকেতু', 'লাঙল' প্রভৃতি পত্রিকার মাধ্যমে শোষণকারী ও অত্যাচারী ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহী সত্ত্বার বিকাশ ঘটে। তিনি জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের অগ্রনায়ক লোকমান্য তিলক, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র প্রমুখদের নিয়ে কবিতা প্রবন্ধ ও গান রচনা করেন। তাঁর কাব্যে বেজে ওঠে বিদ্রোহের অগ্নিবীণা। 'বিষের বাঁশি' কাব্যগ্রন্থের প্রায় সব কটি কবিতা ও গানের মাধ্যমে নজরুল ইসলাম পরাধীন ও শৃঙ্খলিত ভারতবাসীকে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম ও যুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছেন। এসব কিছু তাঁর রাজনৈতিক চেতনার ফসল। এই রাজনৈতিক চেতনার ফলে নজরুল নির্বাচনমূলক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন, নির্বাচনে কবির অংশগ্রহণ সকল শ্রেণীর মানুষকে রাজনীতিমুখী করে তোলে, তরুণ প্রজন্মকে নেতৃত্ব দানে আগ্রহী করে তোলে; ব্রিটিশ বিরোধী মুক্তি সংগ্রামে জনজাগরণ ঘটে যায়।

তথ্যসূত্র :

- Alam, Abu Yusuf (2005), Muslim and Bengal Politics, Raktakarabee, Dhaka, P-256
- Behera, Dr. Santosh Kumar and Nag, Prof. Gouri Sarkar (E.D)-(2022), Kazi Nazrul Islam:Unlocking the Works and Thoughts of The Rebel Poet, Red'Shine Publication Pvt. Ltd, London, P-76
- Bose, Sugata (2009), A Hundred Horizons : The Indian Ocean in the Age of Global Empire, Harvard University Press, P-299.
- Chakravarty, Basudha (2022), Kazi Nazrul Islam, National Book Trust, New Delhi, PP - 2-3.
- Chakravarty, Radha (ED) (2024), Selected Essays : Kazi Nazrul Islam, Penguin Random House India Pvt. Ltd., Haryana, PP-81-85.
- Chandra, Bipan and Others (1989), India's Struggle for Independence, Penguin Books India, Haryana, P-297.
- Goswami, Karunamaya (1990), Aspects of Nazrul Songs, Nazrul Institute, Dhaka, P-80.

- Halder, Gopal (1973), Kazi Nazrul Islam, Sahitya Akademi, New Delhi, P-41.
- Huda, Nurul (ED) (2000), Nazrul: An Evaluation, Nazrul Institute, Dhaka, P-80.
- Langeley, Wiston (2007), Kazi Nazrul Islam : The Voice of Poetry and the Struggle for Human Wholeness, University of Minnesota, P-5.
- Sarkar, Sumit (1983), Modern India (1885-1947), Macmillan Publishers India Limited, Chennai, PP-251-252.
- আহম্মদ, মুজাফফর (১৯৯৮), কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, পৃষ্ঠা-২৭৭.
- ইসলাম, কবি নজরুল (চতুর্থ সংস্করণ-২০০৯), সঞ্চিতা, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, পৃষ্ঠা-২১, ৮৩.
- ইসলাম, রফিকুল (১৯৯৭), কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন ও সৃষ্টি, কে.পি.বাগচি অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৫৭৮
- গুপ্ত, ড: সুশীল কুমার (1997) নজরুল - চরিতমানস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা-২৯৭.
- মুখোপাধ্যায়, ড. তরুণ (২০১০), নজরুল ও সঞ্চিতা, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১১২-১১৪.
- মুখোপাধ্যায়, ধ্রুবকুমার (১৯৯৬), নজরুল ইসলাম: কবি মানস ও কবিতা, রত্নাবলী, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৬৭-১৬৮.
- মুখোপাধ্যায়, সুভাষ (১৯৯৯), বাঙালির ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমি, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৫.
- মল্লিক, অধ্যাপক সমর কুমার (২০০০-২০০২), আধুনিক ভারতের রূপান্তর (১৮৫৭-১৯৪৭), ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৪৬.

কিন্নর রায়ের ছোটগল্প : সময় ও সমাজের শিল্পরূপ

উজ্জ্বলা সূত্রধর
গবেষক, বাংলা বিভাগ
ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, সূর্যমনিনগর

সারসংক্ষেপ : কিন্নর রায়ের জন্ম ১৯৫৩ সালের ৬ নভেম্বর, চেতলায়। সত্তরের দশকের শেষ দিকে কিন্নর রায় সাহিত্য জগতে পদার্পণ করেন। কিন্নর রায়ের অধিকাংশ গল্পের প্লট নির্মিত হয়েছে বাস্তব জীবনের সংগ্রাম মুখর মানুষের সত্য মূর্তি নির্মাণের মাধ্যমে। জীবনকে ও জগতকে মুক্ত করতে প্রথম তারুণ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুলিশের অনেক অত্যাচার একসময় দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করেছিলেন তিনি। সেই অভিজ্ঞতাতে তিনি সময় ও সমাজকে ফোকাস হিসাবে ব্যবহার করে তাঁর গল্পে। গল্প নিয়ে রোমান্টিকতা করতে তিনি হাতে কলম তুলে নেননি, পরিবর্তে গল্পকে ভাঙেন, ভেঙে গড়েন, সত্যকে ধরেন এবং শেষ পর্যন্ত পাঠককে নিক্ষেপ করেন সেই সময়ের বিস্তৃত ভূমিখন্ডে, সময়ের অন্তর্দ্বন্দ্বে। বিহারী অচ্ছুতিয়া চামার-ধানুক-দোসার-সদাইদের জীবনে শোষণের নানা চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'রথযাত্রা', 'ভোজ', 'পরচারক' প্রভৃতি গল্পে। গল্পকার কিন্নর রায়ের অগাধ গতিবিধি বাঙালি জীবনের হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের অন্দরমহলে। এইক্ষেত্রে 'খড়ের বাছুর', 'ধর্মসংকট', 'ধর্ম' গল্পগুলির কথামনে করিয়ে দেয়। আমরা এই আলোচনায় কিন্নর রায়ের কোন কোন ছোটগল্পে সময় সমাজ ও রাজনৈতিক দিকগুলি উঠে এসেছে এবং কিন্নর রায় কীভাবে এই দিকগুলিকে তাঁর গল্পের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন তা বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।
সূচকশব্দ : ছোটগল্প, সময়, সমাজ, অত্যাচার, ধর্ম, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি।

মূল আলোচনা :

সত্তরের দশকের অস্থির পরিস্থিতিতে যাঁরা কলম ধরেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম সাহিত্যিক হলেন কিন্নর রায়। গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ এই ত্রয়ী ধারাতেই তাঁর অবাধ বিচরণ। গল্প লেখা শুরু সত্তরের দশক থেকে। আশির দশকের শেষার্ধে প্রকাশ পায় তাঁর প্রথম গল্প সংকলন 'রথযাত্রা' (১৯৮৭)। সে সময় থেকেই তাঁর লেখায় বিষয়-বৈচিত্র্য প্রকাশ পেতে শুরু করে।কিন্নর রায় এখনো পর্যন্ত শতাধিক গল্প রচনা করেছেন। তাঁর প্রকাশিত গল্প গ্রন্থের সংখ্যা ১৯টি। এর মধ্যে রয়েছে – ‘রথযাত্রা’, ‘অন্যধারার গল্প’,'ধর্মসংকট','এন্টারটেইনমেন্ট আওয়ার', 'কুরোশাওয়া ভিজে যাচ্ছে', 'অরূপকথা', 'জ্যোৎস্নায় শঙ্খচিল', 'হুজুরের ঘোড়া', 'বিদ্যাধরীর ঘুঙুর', 'সরস্বতী', 'তুলসীচরিতমানস', 'চন্দ্রভিসার', 'শব্দযান', 'স্কাইপেকৃষ্ণ' প্রভৃতি।

গল্পের বিষয় সম্পর্কে কিন্নর রায় 'সেরা ৫০ টি গল্প'-এর ভূমিকায় নিজেই বলেছেন –

ধর্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি আমার লেখায় বারবার উঠে এসেছে। [১]

তবে ধর্ম বলতে তিনি কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে বোঝাননি, তাঁর কাছে ধর্ম হল মানুষের সেবা করা, মানুষের জন্য কাজ করা, মানুষকে ভালোবাসা। হোক সে হিন্দু, হোক সে মুসলিম, বৌদ্ধ কিংবা খ্রিষ্টান। মানুষকে কেবল তিনি মানুষ হিসেবেই দেখেছেন। এজন্যই ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ভেঙে দেওয়া ওঁনার মনে প্রবল আঘাত ফেলে। সময়ের এই মর্মান্তিক ঘটনা বারবার করে উঠে এসেছে তার বিভিন্ন গল্প গুলিতে। 'খড়ের বাছুর', 'ধর্মসংকট', 'ধর্ম', 'মরুমায়া' প্রভৃতি গল্পগুলো এরই সাক্ষ্য রাখে।

'ধর্মসংকট' গল্পগ্রন্থের গল্পগুলোতে কোনো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ব্যাপার নেই, আছে সাম্প্রদায়িকতার উৎস খোঁজার চেষ্টা। আসলে আমাদের ঘৃণাটা কোথায়? অবিশ্বাস কোথায়? কোথায় আমাদের ভেতরের ফারাক? এই গোটা ব্যাপারটা একটা আবহ হিসেবে 'ধর্মসংকট' গল্পগ্রন্থে উঠে এসেছে। কিন্নর রায় 'ধর্মসংকট' গল্পগ্রন্থের ভূমিকা অংশে লিখেছেন—

> আশির দশকের প্রায় শেষ লগ্ন থেকেই প্রায় সারা দেশ জুড়েই 'রামশিলা' নির্মাণ, 'রাম রাম', 'রাম রথযাত্রা' ইত্যাদি নানা সাম্প্রদায়িক উস্কানি চলতেই থাকে। এমনকি প্রগতিবাদী, বামপন্থী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্রভূমি পশ্চিমবাংলাও এই তথাকথিত 'রামশিলা' ইত্যাদির ব্যাপারে খানিকটা হলেও অংশভাগী হয়ে ওঠে, যার বিবরণ সেই সময়কার সংবাদপত্রের পাতা ঘাঁটলে পাওয়া যাবে। তথাকথিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে অনেক অনেক কথা, বক্তৃতা, সেমিনার, সিম্পসিয়াম, তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে বহু গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ। তৈরি হয়েছে চলচ্চিত্র, নাটক, পথনাটক। আঁকা হয়েছে ছবি। কিন্তু শুভবুদ্ধির এই সামগ্রিক আয়োজনে সাম্প্রদায়িক শক্তি কতটা পিছু হটেছে, তা নিয়ে সংশয় তো আছেই।......'ধর্মসংকট'-এ যে আখ্যানমালারা আছে, তাদের নির্মাণ প্রায় আশির শেষ লগ্ন থেকে যখন বাবরি ভাঙার তাত্ত্বিক নেতৃত্বের কেউ কেউ মোটরবাইকে চড়ে উত্তরপ্রদেশের পুলিশের 'চোখ এড়িয়ে' পৌঁছে যাচ্ছে বাবরি মসজিদের কাছাকাছি। আক্রমণ করা হচ্ছে বাবর সেনাপতি মির-বাকির তৈরি চাচায়। এই

> কাল খণ্ডেই ধর্মসংকট-এর আখ্যানমালারা জেগে ওঠে স্বদেশ, সমাজ, জাতি ও সমগ্র মানব সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে।[২]

কিন্নর রায়ের একটি উল্লেখযোগ্য গল্প হল 'ধর্মসংকট'। গল্পটিতে আছে সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়ের বিপন্নতার গভীর চিহ্ন। গল্পে মনজুল হাসান ভারতবর্ষের মুসলমান হওয়ার শাস্তি পেয়ে আসছে ছোটবেলা থেক। দেশভাগের সময় ওপার বাংলা থেকে আসা মানুষজন তাদের বাড়ি ঘর দখল করে বসে। ধর্ম বাঁচাতে তারাও চলে যায় পূর্ব পাকিস্তানে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেশের টানে বাড়িঘর ছেড়ে সর্বস্বান্ত হয়ে আবার দেশে ফিরে আসে। শুধু তাই নয় তার ভালোবাসার মানুষ শ্রেষ্ঠাও তার হয়নি কেবল সে মুসলমান বলে। ভারত পাকিস্তানের ক্রিকেট হলে সবাই ভাবে যে সে পাকিস্তানের সমর্থক, শুধুমাত্র তার ইসলামী নামটুকুর জন্য সবাই তাকে ভাবে মহমেডানের সাপোর্টার। এসব অপমান তার রোজকারের। আসল গল্প তো তখন ঘনিয়ে আসে যখন বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলা হয়। একজন লোক খুশিতে লাড্ডু এনে তার মুখে দিয়ে দেয়। কোন মুসলমান পেলে জেনে এখনই মেরে ফেলবে এমন উৎসাহিত তারা। তখন মনজুল তার প্রাণ বাঁচাতে ভাবতে বাধ্য হয় –

> তার মুখে কোথাও মুসলমানি-চিহ্ন নেই তো ! আমি কোথাও কি চিহ্নিতকরণের সূত্রে সংখ্যালঘু হয়ে যেতে পারি ! আমার লাড্ডু খাওয়া, মসজিদ আক্রমণের খবরে সহজ থাকা, হাসায় - কোথাও কোন ফাঁক ছিল না তো ! সবমিলিয়ে আমি ঠিক ঠিক 'ভারতীয়'ই ছিলাম তো ! হিন্দুস্থানের অধিবাসী ! কেউ টের পায়নি তো আমার নাম মনজুল হাসান ![৩]

মনজুল তো দেশকে মনেপ্রাণেই ভালবেসেছে তবুও কেন দেশ তাকে আপন করে নিতে পারল না। কেন তাকে নিজের পরিচয় গোপন রাখতে হলো।

> কেন গৌরিক আর সবুজের অকারণ রক্তক্ষয়ী তরজায় আমরা মেতে থাকি ! এত কি দেশ থাকে ! থাকবে![৪]

এই প্রশ্নটা যেন কাটার মত ভিতরে থাকে মনজুলের সাথে সাথে পাঠকদের মনেও।

কিন্নর নিজেকেও একজন বিপন্ন, প্রান্তিক এবং সংখ্যা লঘু মানুষ মনে করেন। আর সেই চৈতন্য থেকেই সদা সন্ত্রস্ত প্রান্তিক মানুষদের বারবার তাঁর লেখার বিষয় করে তোলেন।পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু-মুসলমান আপাতদৃষ্টিতে একটি বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বসবাস করলেও ধর্মীয় জীবনযাপনের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক আচার আচরণ মেনে চলেন। ঐতিহাসিক কারণে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমরা অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মানুষ। তাই অবহেলারও শিকার। কিন্নরের বহু গল্পে উন্মোচিত হয়েছে সংখ্যালঘু মুসলিম জীবনের বিচিত্র স্বরূপ। তাঁর ‘ধর্মসংকট' গল্প সংকলনটির প্রায় সবকটি লেখায়ই এসেছে সেই মুসলিম প্রসঙ্গ।

ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হওয়া অত্যাচারের একটা দিক স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে কিন্নর রায়ের লেখা 'খড়ের বাছুর' গল্পটিতে।মুসলিম ধর্মের মানুষদের কাছে ঈদই হল বছরের সবচেয়ে বড় উৎসব আর কুরবানির মাংস হলো মহাপ্রসাদ, তাদের আবেগ-ভালোবাসা অতিথি আপ্যায়নের বিশিষ্ট খাবার। ওই জায়গায় সুপ্রিমকোর্ট থেকে কোরবানী বন্ধ করার রায় আসে। এদিকে বাজারে

> গরু ছাগলের থেকি দালাল বেশি। যা তা দর হাঁকছে। হাজার আড়াই টাকার কমে একটা গরু হয় না। তাও তিন-চারজন মিলে ভাগে। বাড়িতে বাচ্চারা কদিন মাংসের মুখ দেখে। রিসতেদারদের বাড়ি যায়। ফেতরায় ফকির-মিশকিন। সেই কোরবানি বন্ধ হলে খাসি কিনতে গেলে তো পাঁচ থেকে ছ হাজার, আর তার কতটুকুই বা মাংস ![৫]

যখন বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল তখন তো সুপ্রিমকোর্ট কিছু করেনি, কোরবানির বেলায় শুধু আইন –

> মসজিদ ভাঙল, কী কালাটা করল আইন ! তুমি মসজিদের বেলা সুপ্রিম কোর্টের রায় মানবে না, কোরবানি আটকানোর বেলা মানবে - বা রে আইন ![৬]

শানাজের মতো লোকেরা বুক বেঁধে বসে আছে এই ভেবে যে এ দেশটা তাদেরও, কিন্তু দেশের আইন যেন একতরফা বক্তব্য শুনায় যা শানাজের মতো মানুষদের মনে প্রবল আঘাত ফেলে। আইন কে হতে হয় জাতি ধর্মের ঊর্ধ্বে, নিরপেক্ষ, কিন্তু আইন ব্যবস্থা যেন সেই কথা ভুলেই গেছে তা গল্পকার চোখে আঙুল দিয়ে যেন পাঠককে বুঝিয়ে দেন।

সেই সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের ইঙ্গিত পাওয়া যায় কিন্নর রায়ের লেখা 'ধর্ম' গল্পের মধ্যেও।গল্পে দেখা যায় একটা সময় ছিল যখন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে দুর্গাপূজার আনন্দে মেতে উঠত। দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের সময় হিন্দু হৃদয়ের পাশাপাশি কেঁপে উঠলো মুসলমানের প্রাণও। সমাজের মধ্যে ছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সবকিছু পরিবর্তন হয়ে যায়। যে খান পরিবারের কাঁঠাল ছাড়া মায়ের পূজা হতো না। খানেদের কাঁঠাল পাকার গন্ধে মানুষ খবর পেতো মায়ের পূজার সময় এসেছে, সেই সলিল খানের পরিবার মুসলিম পরিবার হয়ে দুর্গাপূজায় অংশগ্রহণ করার জন্য তাদের বিরোপ সমালোচনার মুখে পড়তে হয়। লোকের মুখে শোনা যায় –

> আগে যা হয়েছে হয়েছে, এখন আর খানেদের রাজবাড়ি থেকে পাঠানো কাঁঠাল, আম, সিধে - কিছুই নেয়া হবে না। ওরা গোমাংস খায়।.... ওদের পুজো, সিধে কেন সিদ্ধেশ্বরী-মা নেবেন ?[৭]

ধর্মের গোড়ামী করতে গিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে সম্প্রীতি নষ্ট হচ্ছে এটাই গল্পের মূল সুর।

কিন্নর রায়ের অধিকাংশ গল্পের প্লট তৈরি হয়েছে বাস্তব জীবনের সংগ্রাম মুখরতা থেকে।অসহায় মার খাওয়া মানুষদের প্রতি তাঁর অত্যন্ত সহানুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর 'অন্যধারার গল্প'-এর কথামূলে গল্পকার বলেছেন –

> ঘাম-রক্তের বিনিময়ে যে সত্য অর্জিত না হয়, তা কখনই বোধ হয় শিল্প হতে পারে না - এমন সত্যটি জীবনসত্য হিসেবে ধরা না পড়লে শিল্পের টিকে থাকা মুশকিল।[৮]

এই উক্তি প্রমাণ করে কিন্নর রায় তাঁর গল্পে শুধু শৌখিনতা দেখাবেন না। তিনি ঘাম-রক্তের খোঁজ করবেন এবং সেই ঘাম রক্তে মানুষের ভেতরকে ফুটিয়ে তুলবেন। জীবন ও জগৎকে মুক্ত করতে প্রথম জীবনে ঝাপিয়ে পড়ে পুলিশের অনেক অত্যাচার একসময় তিনি সহ্য করেছেন। সেসব নানা অভিজ্ঞতাতে তিনি সমাজের অসহায় মানুষগুলিকে কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ব্যবহার করেন তাঁর গল্পে। এরকমই একটা গল্প হল 'রথযাত্রা'।

'রথযাত্রা' গল্পে সাম্প্রদায়িক ভারতবর্ষের ছবি, তার ধর্মীয় আবেগ ও সেন্টিমেন্ট, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষদের উপর শোষণের নানান চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।রাই, ধানুক, চামার, খোদাই ইত্যাদি অচ্ছুতিয়া জাতির মানুষ কেমন করে অত্যাচারের রথতলে মৃতদেহে পরিণত হয় তার অনন্য রূপায়ণ গল্পটি। ভোলা চামার ও মৌলি চামার সারারাত ধরে পরিশ্রম করে ঘাম ঝরায়, রক্ত জল করে।মালিক রঘুনন্দন মিশ্রের খামারে তারা ধান ঝাড়ার কাজ করে। এই মালিকই ভোটে দাঁড়ানোর আগে হিন্দুত্বের আবেগ আর মায়া ছড়ায় অচ্ছুতিয়াদের মধ্যে। আর সেই মায়ায় অচ্ছুতিয়ারা বিশ্বাস করে মালিকও হিন্দু, তারাও হিন্দু।

> ভারতমাতার মূর্তির সামনে যজ্ঞের আগুন জ্বলে। ঢাক কাঁসি বাজে, আগুন পোড়া ঘি, কাঠের ধোঁয়ায় প্রতিমার মুখ কিছু আবছা ও অপার্থিব। মৌলি, ভোলা এবং দোসাদ, চামার ধানুক, ধোবি টোলির ভুখা- নাঙা মানুষেরা বিশ্বাসের আলোয় তাকে জীবন্ত দেখে। ধূপের সুগন্ধ খুব আস্তে মেশে বাতাসে। রঘুনন্দন মিশ্র আর ইন্দিরা কংগ্রেসের লোকাল লিডার অনন্ত ঝা 'একাত্মতা যজ্ঞ', 'পবিত্র জল' ও 'জাতীয় সংহতি'র ওপর ভারী ভারী কথা উগরে দেয়। ভোলা মৌলিরা আবার ভাবে ওরা হিন্দু।[৯]

কিন্তু এই হিন্দু ভোলা মৌলিরা তখনও জানে না বর্ণহিন্দুর হিংস্র নখ ও দাঁতকে। তারা জানল শুদ্ধ হয়ে বাড়ি ফেরার কিছু পরে। মালিকের খামারে মৃত কুকুরের রক্তাক্ত শব সরানোর ডাক আসে ভোলা ও মৌলির। অস্বীকার করায় নেমে এলো রঘুনন্দন মিশ্রের

বারুদ-বাহিনী। ভোলা ও মৌলিকে মারা হলো হিংস্র শুয়োরের খোঁয়াড়ের মধ্যে ঢুকিয়ে হিংস্র শুয়োর লেলিয়ে দিয়ে। গল্পকারের বনর্ণায় –

> বারুদ, রক্ত, পোড়া গন্ধে বাতাস ভারী। আধমরা মৌলি আর ভোলাকে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হয় শুয়োরের খোঁয়াড়ের সামনে, ডোম পাড়ায়। দু'জনেরই হাত-পা বেঁধে গড়িয়ে দেয়া হয় ভিতরে। বাইরে ঝাঁপ বন্ধ। খোঁয়াড়ে চারটি শুয়োরকে বাইরের ফাঁক থেকে খোঁচায় চুনচুনেরা।.... দাঁতে-খুরে ছিন্নভিন্ন দুটি শরীর। খোঁচা খাওয়া জান্তব চিৎকার আর আহত মানুষের গুঙানি জট পাকায়। এভাবে চলে বেশ কিছুক্ষণ তারপর আস্তে আস্তে সব চুপ। রক্ত, কাদা, ধুলো মেখে পড়ে থাকে প্রাণ হীন দুজন মানুষ।[১০]

ঘাম-রক্ত ঝরানো মানুষ দেখতে পায় সত্য। জীবন। জীবনের রূপ। গল্পকার কিন্নর রায় আমাদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে যেন দেখিয়ে দেন সমাজে সেই নিপীড়িত মানুষগুলোর অবস্থান।

কিন্নর রায়ের গল্পগুলির দিকে তাকালে দেখা যায় তাঁর বেশিরভাগ গল্পে নায়ক-নায়িকা বা প্রধান চরিত্র বলে কিছু নেই। আদপেই যদি কোন প্রধান চরিত্র থাকে তাহলে তারা কেউ ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, ছ'ফিট লম্বা, টানটান মেদহীন চেহারার হয় না। তারা বেশিরভাগই মারখাওয়া, নিরুপায়, হতমান মানুষ। তবে তাঁর গল্পগুলিতে সময়ই যেন নায়কের ভূমিকা পালন করে।উদাহরণ হিসেবে 'ভোজ' গল্পটিকে আলোচনার জন্য বেছে নেওয়া হল।

'ভোজ' গল্পটির কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। দুটি বিশেষ সময় কেমন করে মানুষকে ও মানুষের জীবনকে জাঁতাকলের মতন পিষে মারে তার তীক্ষ্ণ তীব্র রূপায়ণ ঘটেছে গল্পে । 'ভোজ' গল্পে দেখা যায় জমিদার ধনিকলাল মিশ্রর মায়ের শ্রাদ্ধে খেতে চলছে অনেক অচ্ছুতিয়ার সাথে মোতিরাম চামারও - যার ছেলে কিছুদিন আগেই ওই জমিদার তনয়ের গুলিতে প্রাণ দিয়েছে। গল্পের কাহিনিতে এটা বাইরের ঘটনা, আসল মজাটা অন্যখানে। হাভাতে মানুষরা খেতে বসে সবার শেষে। অনেকদিন পর তারা ভরপেট খেতে পায়। এরপরই জমিদার শুরু করেন সময়ের খেলা।তিনি ঘোষণা করেন, এরপরও যারা একটা করে কচুরি খাবে তারা পাবে কচুরি প্রতি ৫০ পয়সা,খাজা প্রতি ১ টাকা, লাড্ডু প্রতি ২ টাকা। এতদিনের উপোসি পেটে পয়সার লোভে অনেকরাত পর্যন্ত তারা খেতে থাকে। এবং তারপর

> গভীর রাতে বাড়ি ফেরার পথে জন তিনেক মানুষ রাস্তায় পড়ে ও মারা যায়। উপোসি পেটে পয়সার লোভ, অনেক বেশি খাবার তাদের মৃত্যুর কারণ হয়। মোতি মারা যায়। ওর বমি, থুতু, মলমাখা শরীর সারা রাত আগলে বসে থাকে লালপরী মালখন। চোখের জল,

> হিম, এক হয়। মোতির ট্যাঁক হাতড়ে টাকা আর খুচরো হাতিয়ে নেয় মালখন। বুড়ো মোতির এই ছিল শেষ রোজগার।[১১]

সময়ের ফাঁক কী নিষ্ঠুর ! কী ভয়ংকর ! কিন্তু এখানেই সময় তার খেলা জমায় না, কেননা, পরের দিন ভোরে উঠে ধনিকলাল যখন শুনতে পায় তাঁর মায়ের শ্রাদ্ধের ভোজ খেয়ে মাত্র ৪ জন মানুষ মারা গেছে, তখন তিনি বিমর্ষ হয়ে পড়েন। বিমর্ষ কেননা, তিনি ভোজের জৌলুসে হেরে গেছেন। কারণ তাঁর ঠাকুরমার শ্রাদ্ধে প্রায় পাতের উপরেই ১১ জন বমি করতে করতে মারা গেছিল। গল্পকার কিন্নর রায়ের এখানেই জিৎ।তাঁর আকাঙ্ক্ষিত সত্যকে ভয়ংকরভাবেই যেন তিনি ধরে ফেলেন। সময়ের গর্ভ কী নিদারুন !দুই সময়ের মাঝখানে যেন ১১ জন বনাম ৪ জন মৃত মানুষ খেলা করে বেড়ায়।

ঠিক একই রকম ভাবে সময়ের গর্ভে পড়ে রক্তাক্ত ও ক্ষতাক্ত হতে দেখি, ‘বলরাম’ গল্পের ছোটোখাটো বই-স্টলের মালিক ও গোপন লেখক বলরামকে, কিংবা ‘মায়ামূষিক’ গল্পের রবীনকে।

সাম্প্রদায়িকতা আজকে আমাদের সামনে একটা বড় বিপদের চিহ্ন হিসেবে প্রকাশ পাচ্ছে। একজন লেখকের কাজ লেখা এবং লিখে সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত শেকড়কে কীভাবে উৎপাটন করা যায় বা মানুষকে যতটা সম্ভব শুদ্ধতার দিকে, শুচিতার দিকে, সাম্প্রদায়িক ভেদভাবের বিরুদ্ধে নিয়ে যাওয়ার কাজটা করতে পারেন, একজন আখ্যানকার হিসেবে কিন্নর রায় তা করে চলেছেন। কিন্নর রায়ের সাহিত্য যাত্রাটা কিন্তু স্বদেশ যাত্রাই। তাঁর কাছে দেশ মানে কোনো মানচিত্র নয়, দেশ মানে কোনো কাঁটাতার নয়, দেশ মানে একটা বিপুল চেতনা, ভাবনা – পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু, রাজা রামমোহন রায়, ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে স্বদেশ চৈতন্যের কথা ভেবেছেন, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম যে ভাবনায় আমাদের ভাবিত করতে চেয়েছেন, সেই ভাবনারই একটা আলোর ইশারা কিন্নর রায়ের জীবনের নানা ক্ষেত্রে আছে। তাই সমাজ-রাজনীতি-অর্থনৈতিক বিপর্যয়জনিত মানুষ এবং সময়ের নানা ছবি উঠে এসেছে তাঁর গল্পে। গল্পে উপস্থাপিত লেখকের সমাজ-সচেতন মন্তব্যগুলি পাঠককে বিচলিত করে। সমাজ-সময় সম্পর্কে সচেতনও করে।

তথ্যসূত্র :

১. রায় কিন্নর, সেরা পঞ্চাশটি গল্প, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, পৃ. ১৬

২. রায় কিন্নর, ধর্মসংকট, প্রথম প্রকাশ, ২০১৯, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, পৃ. ১০

৩. রায় কিন্নর, সেরা পঞ্চাশটি গল্প, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, পৃ. ৪২৬

৪. তদেব, পৃ. ৪২৮

৫. তদেব, পৃ. ২৮৫

৬. তদেব, পৃ. ২৮৬

৭. তদেব, পৃ. ৭৪

৮. রায় কিন্নর, অন্যধারার গল্প, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭, প্রতিক্ষণ, কলকাতা,পৃ. ৩

৯. রায় কিন্নর, সেরা পঞ্চাশটি গল্প, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩,পৃ. ৫৫৩

১০. তদেব, পৃ. ৫৫৩ – ৫৫৪

১১. তদেব, পৃ. ৫৫৯

কল্লোলের আড্ডায় সম্পর্কের রসায়ন

সুতৃষ্ণা ঘোষ
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: 'কল্লোল' পত্রিকার দপ্তরে এক বিরাট জমজমাট আড্ডা গড়ে উঠেছিল। 'কল্লোল'-এর আড্ডা বিখ্যাত হয় তাঁদের চিন্তা চেতনার আলোকে ও নিজের মধ্যে খুব সুন্দর একটা পারস্পারিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্যে। সেই আড্ডার আড্ডাবাজগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন ছিল, কীভাবে আড্ডার পরিবেশ জমে উঠত, সাহিত্যালোচনা কেমন হত—এসবের বিস্তারিত আলোচনা করার উদ্দেশে এই নিবন্ধ।
মূলশব্দ: কল্লোল পত্রিকা, সাহিত্য আড্ডা, সম্পাদক-প্রকাশক-লেখকের মধ্যেকার সম্পর্ক, আড্ডার পরিবেশ, মনের রসদ, হাসি-মজা।

মূল আলোচনা:

মাইকেল মধুসূদন দত্ত যখন বলেছিলেন 'রচিবো মধুচক্র' তখন তিনি শুধুমাত্র নিজের প্রয়াস সাধনা ও প্রতিভার দিয়ে মধুচক্র রচনার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু আমরা জানি একটি মাত্র মক্ষিকার পক্ষে মৌচাক রচনা করা সম্ভব নয়। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথও মধুসূদনের উক্তিটি উল্লেখ করে বলেছিলেন, সাহিত্যের মধুচক্রটি বড় নির্জন, সেখানে একটি মাত্র মক্ষিকার আনাগোনা। তাঁর কথা মতো দল বেঁধে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না, সেটা সাহিত্যিকের একলার নিজস্ব সাধনা। কাব্য সাহিত্য তো বটেই কোন সৃষ্টির নিজস্ব প্রতিভা ছাড়া সম্ভব নয়। মৌচাকে মধু যেমন আপনি সঞ্চয় হয় না, তেমন সৃজন কাজে না হলেও সঞ্চয়ন কার্যে সচেতন কিংবা অচেতনে অপরের সাহায্য নিতেই হয় স্রষ্টাকে। আসলে এই সাহিত্যিকের মনটিই একটি মৌচাক। যাদের সঙ্গে থাকেন, রসালাপ করেন তাদের থেকে মধু সংগ্রহ করেন সঞ্চয়নের জন্য। সাহিত্যিক মনের রসদ যোগায় সমবেত আড্ডাগুলো।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অনেকগুলো আড্ডার কথা তেমনই জড়িয়ে রয়েছে অনেকগুলো পত্রিকার কথা। কিছু পত্রিকার উদ্ভব হয়েছে বিখ্যাত সব আড্ডার থেকে, আর কিছু পত্রিকা বিখ্যাত হয়েছে আড্ডা দেওয়ার জন্যই—'কল্লোল' পত্রিকা তেমনই। আড্ডাকে ঘিরে যে আড্ডাবাজগোষ্ঠী গড়ে ওঠে তাদের দিকে তাকালেই দেখা যায় কেউ সাহিত্যিক, কেউবা সম্পাদক, কেউ প্রকাশক। তবে সাহিত্যিক আড্ডায় উপস্থিত সকলেই যে সাহিত্যিক-সম্পাদক-প্রকাশক থাকতেন তা নয়। সাহিত্যবোদ্ধা বা সাহিত্য-রসিক হলেই সাহিত্যিক আড্ডার রূপ-রস আস্বাদন করতে পারতেন।

অন্যান্য পত্রিকার সাহিত্য আড্ডার দেখাদেখি ‘কল্লোল’ পত্রিকাও একটি আড্ডা গড়ে তুলেছিল। সেই আড্ডা বসত পটুয়াটোলা লেনের পত্রিকার দপ্তরে ও কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের পাবলিশিং হাউসের কার্যালয়ে। এই আড্ডা অন্যান্য আড্ডার থেকে আলাদা হয়ে উঠেছিল নিজ স্বভাবগুণে। মণিলালের আসরের মতো এ আসরের কোনও উচ্চতর সাহিত্য ব্যক্তিত্ব বা সাহিত্য পৃষ্ঠপোষক ছিল না। কিন্তু মণিলালের আসরের আড্ডাধারীদের মধ্যে অনেকেই সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ও সাহিত্যক্ষেত্রেও কম বেশি প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁদের। তাই তাঁদের আড্ডা-আলোচনার মধ্যে থাকত একটা বয়স জনিত অভিজ্ঞতার ছাপ। কিন্তু ‘কল্লোল’-এ যাঁরা যাতায়াত করত তাঁদের প্রায় সকলেই ছিলেন ছাত্র বা ছাত্রোপম। বয়সের দিক থেকে দীনেশরঞ্জন দাস ও মুরলীধর বসুকে বাদ দিলে সবাই ছিলেন অতিতরুণ। আর সে কারণেই কল্লোলের আড্ডা ছিল লাগামহীন তারুণ্যের উৎসাহে প্রাণবন্ত। আড্ডাবাজদের অনেকেরই সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা ছিল না। যা ছিল তা শুধু সাহিত্য প্রীতি।

কেউ হয়তো নামকরা পত্রিকাগুলোতে মাসের পর মাস লেখা পাঠিয়ে দুই-একটা ছাপা হওয়ার আশায় বসেছিলেন। আবার কেউ হয়তো একেবারে নিরাশ হয়ে দিন কাটাচ্ছেন। কেউ কেউ বৃহত্তর সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশের মুখ দেখছেন সবেমাত্র। এমন সময় ‘কল্লোল’-এর ডাক তাঁদের নিজস্ব অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার নতুন ঠিকানা দেয়। প্রেমেন্দ্র মিত্র ‘কল্লোলের কাল’-এ স্মৃতিচারণ করে বলেছেন—

> “এ পর্যন্ত সাহিত্যের সঙ্গে যা কিছু সংযোগ আর পরিচয় তা শুধু ছাপানো অক্ষরেরই মাধ্যমে। দু-একজন তখনকার নামী সাহিত্যিককে সভায় সমিতিতে কখনো সখনো দেখেছি বটে কিন্তু সত্যিকার সাক্ষাৎ পরিচয় কারুর সঙ্গেই হয়নি।
>
> ছাপানো হরফের ওপারে সাহিত্যের মানুষের যে কি আশ্চর্য অপরূপ হতে পারে তা আবিষ্কারের বিস্ময় সেদিন থেকেই শুরু।”[১]

আড্ডা বেশিরভাগ বসত বিকেলের দিকে। রাত আটটা দশটা পর্যন্ত আড্ডা হত। পকেটে পয়সা নেই, হেঁটে বাড়ি ফিরতে হবে জেনেও ‘কল্লোল’-এর অফিসে হাজির হতো সকলে। বিকেলের দিক খিদেয় পেট জ্বলছে, পকেটে বিশেষ কিছু নেই, হয়তো কখনও সখনও বড়োজোর এক কাপ চা ও বাড়ির ভেতর থেকে আসা কমলা বৌদির রুটি-তরকারি থালা। কখনও কখনও অফিসের পাশেই ফেভারিট কেবিনে ডবল হাফ চায়ের কাপ নিয়ে জোর আড্ডা জমাতেন তাঁরা। কোনওদিক থেকে কোনও বিলাসিতা ছিল না। তবুও আসরের আকর্ষণ ছিল দুর্নিবার। ‘কল্লোল’ লেখকদের অর্থ দিতে পারেনি ঠিকই কিন্তু আতিথ্য দিয়েছিল অপরিমিত। চপ কাটলেট নয়, আড্ডা জমত পারস্পরিক অন্তরঙ্গতায়। তবে অধিকাংশ দিনই শুধু চা সিগারেটই আড্ডা গড়িয়েছে দুপুর থেকে রাত। গোকুলচন্দ্র অচিন্ত্যকুমারকে সঙ্গী করে ‘কল্লোল’-এর অফিস থেকে এসপ্লানেট পর্যন্ত হেঁটেছেন ট্রাম ভাড়া বাঁচাতে। সেই তিনিই আবার

আড্ডার ফাঁক-ফোকরে লোকচক্ষুর আড়ালে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের অভাবনীয় অভাব আঁচ করে বুক পকেটে কিছু টাকা দিয়েছেন গুঁজে। দীনেশরঞ্জনের দাক্ষিণ্য পেয়েছেন হতদরিদ্র শৈলজানন্দও। অচিন্ত্যকুমার সুন্দর করে বলেছেন,

> "আমাদের তখন এমন অবস্থা একজনের পুরো আস্ত একটা সিগারেট খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল কাঁচি এবং আরও কাঁচি চললে পাসিং শো। সিগারেট বেশিরভাগ জোগাত অজিত সেন, জলধর সেনের ছেলে। 'কল্লোল'-এর একটি নিটুট খুঁটি, তক্তপোশের ঠিক এক জায়গায় গ্যাঁট হয়ে বসা লোক। কথায় নেই হাসিতে আছে, আর আছে সিগারেট বিতরণে। কুণ্ঠা আছে একটু কিন্তু কৃপণতা নেই। সবাই দাদা বলতাম তাকে। ...নিয়ম ছিল সিগারেট টানতে গিয়ে যেই গায়ের লেখার প্রথম অক্ষরটুকু এসে ছোঁবে অমনি আরেকজনকে বাকি অংশ দিয়ে দিতে হবে। পরবর্তী লোক জিতলো বলে সন্দেহ করার কারণ নেই, কারণ শেষের দিকের খানিকটা ফেলা যাবে অনিবার্য। তবে পরবর্তী লোক যদি টিন ফুটিয়ে ধরে টানতে পারে শেষাংশটুকু, তবে তাঁর নির্ঘাত জিত।"[২]

আড্ডা সম্পর্কে হরিহর চন্দ্র তাঁর স্মৃতির এক জায়গায় লিখেছেন যে পটুয়াটোলা লেনের সেই ঘরের আকর্ষণ যে কি প্রবল তার প্রবলতায় স্বেচ্ছায় ও পরমানন্দে দিনের পর দিন ঘন্টার পর ঘন্টা সেই ছোট্ট ঘরে তাঁদের জীবনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দিনগুলি কীভাবে যে কেটে গেছে তার কোন হিসেব-নিকেশ তাঁরা রাখেননি। দীনেশরঞ্জন ও গোকুলচন্দ্র 'কল্লোল' সম্পাদনার ফাঁকে ফাঁকে আড্ডা দিতেন। কাজ ফাঁকি দিয়ে আসর জমানো তাঁদের উদ্দেশ্য নয়। দীনেশরঞ্জন দিতেন উত্তপ্ত বন্ধুত্বের পরশ। আর ভাবুক গোকুলচন্দ্র কথা কম বললেও আন্তরিকতায় সবকিছু পূরণ করে দিতেন। আড্ডাধারীরা সকলেই যে 'কল্লোল'-এর জন্মলগ্ন থেকেই আছেন তা নয়, তাঁরা এসেছেন নানা পর্যায়ে।

সাত বছরের কাল পরিধিতে যাঁরা কল্লোলে কলরোল তুলেছিলেন তারা হলেন— অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, পবিত্র গাঙ্গুলী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, ভূপতি চৌধুরী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, মুরলীধর বসু, অজিত সেন, সতীপ্রসাদ সেন ওরফে গোরাবাবু, সুবোধ দাশগুপ্ত, হরিহর চন্দ্র, নির্মল সিংহ, সোমনাথ সাহা, নজরুল ইসলাম, প্রবোধকুমার সান্যাল, সুবোধ রায়, হেমেন্দ্রলাল রায়, বুদ্ধদেব বসু, অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়, সুরেশ চক্রবর্তী, অমলেন্দু বসু, বিষ্ণু দে, সুকুমার ভাদুড়ী, বিজয় সেনগুপ্ত, মণীশ ঘটক, সনৎ সেন, ভবানী মুখোপাধ্যায়, সরোজ কুমার রায়চৌধুরী, হেমচন্দ্র বাগচী, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পাঁচু গোপাল মুখোপাধ্যায়, সুরেশ মুখোপাধ্যায়, সত্যেন দাস, শিবরাম চক্রবর্তী প্রমুখ। এঁরা অবশ্য সকলেই যে সমান দরের আড্ডাধারী ছিলেন তা নয়। সকলে রোজ রোজ আসতেনও না। মোহিতলাল মজুমদার মাঝে মাঝে আসতেন। তারাশঙ্করও কয়েকবার এসেছিলেন। অতুল বসু, যামিনী রায়, দেবীপ্রসাদ

রায়চৌধুরী প্রমুখ শিল্পীরাও মাঝে মাঝে আসতেন আসর সরগরম করতে। 'সর্ব ঘাটের কাঁঠালি কলা' পবিত্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন 'কল্লোল'-এর জন্মলগ্ন থেকে, গোকুলচন্দ্র এবং দীনেশরঞ্জন-এর সঙ্গে বন্ধুত্বতার সুবাদে। সবুজসভা থেকে কল্লোলের আড্ডা সবখানেই ছিল তাঁর অবাধ আনাগোনা। তিনি শৈলজানন্দ ও নজরুলকে 'কল্লোল'-এ নিয়ে আসেন। এক-আধদিন পত্রিকা কেনার অছিলায় আড্ডায় এসে বসতেন সজনীকান্ত দাস।

ভূপতি চৌধুরীর 'কল্লোলের দিন'-এ কল্লোলের আড্ডাবাজদের সম্পর্কে বিস্তারিত বলেছেন। অজিতকুমার সেন ও সতীপ্রসাদ সেন একদিনও লেখেননি, কিন্তু 'কল্লোল'-এর অফিসে বসে নিয়মিতভাবে গল্পগুজব করে গেছেন। অজিতবাবু মাঝেমধ্যে দু-একটা কথা বলতেন। গোরাবাবু ছিমছাম মানুষ। কলকাতার হালচালের খবর তাঁর সব নখদর্পণে। বিশেষ করে রঙ্গমঞ্চের। শিশির ভাদুড়ী থেকে শুরু করে অহীন্দ্র চৌধুরী—সকল অভিনেতাদের নতুন ব্যবস্থার কথা, কোন থিয়েটারে কী হচ্ছে, কে কী রকম অভিনয় করছে সব খবর। নিয়মিত বন্ধুদের মধ্যে হরিহর চন্দ্র, নির্মল সিংহ ও সোমনাথ সাহার নাম না বললেই নয়। হরিহর চন্দ্র বেশ ফর্সা লম্বা চেহারার, কাজের মানুষ। এসে কিছুটা সময় থেকে চলে যেতেন। দরজার কাছেই নির্মলবাবুর সঙ্গে ঠোকাঠুকি। নির্মলবাবু অধ্যাপনা করলেও অধ্যাপকসুলভ আড়ষ্টতা তাঁর স্বভাবের বাইরে। সোমনাথবাবু হৃদপুষ্ট দোহারা চেহারার অধিকারী, চালচলনে শান্ত সমাহিত ভাব—যিনি আড্ডার আসরে এককোণে বসে থাকতেন।

ভূপতি চৌধুরী আরও বলছেন যে, কাজী নজরুল ইসলাম মুক্তি পাবার পর পবিত্রবাবুই তাঁকে 'কল্লোল'-এর অফিসে নিয়ে আসেন। তারপর কত দিন যে কাছে বসে আসর জমিয়েছে তা আর বলার দরকার হয় না। গান-গল্পে উচ্চহাসিতে প্রাণ রসে উচ্ছল মানুষ। 'দে গরুর গা ধুইয়ে' বলে কল্লোলের দরজায় হানা দিতেন। ঘরে ঢুকেই চৌকিতে বসে বার করতেন ঝুলি। ঝুলি আরশি, চিরুণী, স্নো-তে ঠাসা। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া অসংযত চুলকে চিরুণীর সাহায্যে সুবিন্যস্ত করে মুখের স্নো লাগিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে শুরু করতেন আড্ডা। সকলে কাজকর্ম বন্ধ করে কবির গান-গল্প-হল্লা শুনতেন। তিনি চলে গেলে আবার সবাই চুপচাপ। যেন এক ঝড়ের পরের স্তব্ধতা বিরাজ করত 'কল্লোল' অফিসে। সুকুমার ভাদুড়ী ফর্সা চেহারার যুবক। ভারী লাজুক প্রকৃতির। চোখে মুখে সবসময় একটা ক্লান্ত ফূর্তিহীন ছায়া তাঁর। সুবোধবাবু মাঝেমধ্যে আসতেন। তিনি থাকতেন নৈহাটিতে। খানিকটা গল্পগুজব বিশেষ করে রাজনীতির খানিকটা ধুলো উড়োতেন। এভাবেই 'কল্লোল' পরতে পরতে কত যে স্মৃতি জমিয়ে তুলেছিল, তা পরবর্তী কালের তাঁদের স্মৃতিচারণ থেকেই বোঝা যায়। নতুন লেখকদের মধ্যে এলেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। হাতে একগাদা বই। কণ্ঠে মন্দাক্রান্তা ছন্দে বেদনার ধ্বনি বাজত। বিজয়বাবু সুকুমারের বন্ধু, মাঝেমধ্যে 'কল্লোল'-এ আসতেন। লেখার হাত ছিল বেশ ভাল। যেদিন 'কল্লোল'-এর অফিসে আসতেন, সকলকে হাসিয়ে অস্থির করে

তুলতেন। 'দা গোঁসাই' বলা হত সুরেশ মুখোপাধ্যায়কে। তিনি হাজির হতেন সাইকেল চড়ে। মনীশ ঘটক বা যুবনাশ্ব পাতলা চেহারার লম্বা মানুষটি গল্প গুজবে সকলকে মশগুল করে রাখতেন। কথার মধ্যে পূর্ববঙ্গীয় টান ইচ্ছে করেই প্রকাশ করার চেষ্টা ছিল তাঁর। বুদ্ধদেববাবু ও অজিতকুমার দত্ত এঁদের দুজনকে একসঙ্গেই দেখা যেত তখন। মোহিতলাল মজুমদার দেবেন সেনের কবিতা ভারি চমৎকার আবৃত্তি করতেন। তারাশঙ্করবাবু ও সরোজবাবু মাঝে মাঝে 'কল্লোল'-এ এসে আড্ডা দিতেন। প্রবোধকুমার সান্যালের আড্ডায় কথাতে ভারী চমৎকার একটা শ্লেষ থাকত। জগদীশ গুপ্ত, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এঁরা কখনও 'কল্লোল' অফিসে এসেছে কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে।

'কল্লোল'-এর সম্পাদক গোকুল নাগ। এই গোকুল নাগ লেখক ও বন্ধু হিসেবে শৈলজানন্দর মন তাড়াতাড়ি জয় করে নিয়েছিলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র 'কল্লোলের কাল'-এ গোকুল নাগের একটি মজার সম্পাদকীয় চাল উল্লেখ করেছেন। সেটি অনেকটা এরকম—এক নবীন লেখক আগের দিন একটা গল্প 'কল্লোল'-এ দিয়ে গিয়েছিলেন। কল্লোলিয়ানরা অনেকেই উপস্থিত ছিলেন সেই সময় লেখক এসেছিলেন গল্পের পরিণাম জানতে। একেবারে নতুন লেখক সে নয়। এর আগে তাঁর গল্প 'কল্লোল'-এ ছাপা হয়েছে। তিনি গোকুলনাগকে জিজ্ঞাসা করলেন 'পড়েছেন গল্পটা?' গোকুল নাগ বললেন 'পড়েছি!' তারপরে সে গল্প সম্বন্ধে আর কোনও মন্তব্য না করেই সকলকে উদ্দেশ্য করে টেবিলের ড্রয়ার খুলে অন্য একটি গল্পের পান্ডুলিপির গুচ্ছ বার করে পড়ে শোনালেন। গল্পটা খুব একটা বড় ছিল না বলে পড়তে বেশিক্ষণ সময় লাগেনি। কিন্তু গল্পটা সত্যিই উপাদেয়। গোকুল নাগ পড়া শেষ করে গল্পটি আবার ড্রয়ারে রেখে দিয়েছিলেন। আগের দিন যে লেখক গল্প রেখে গিয়েছিলেন তিনি বললেন, 'আমার গল্পটা নিয়ে যাব গোকুলদা। ওটা এখানে আছে?' তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'আছে।–বলে গোকুলদা ড্রয়ার থেকে গল্পটি বার করে প্রসন্ন মুখেই লেখককে ফেরৎ দিয়ে শুধু বলেছিলেন— আর একটা এনেছো নাকি?' সেই লেখক তখন প্রসন্ন মুখে স্বাচ্ছন্দের সঙ্গে বলেছিলেন 'না আনেনি আনবো'। তারপরও সেদিন সেখানে সহজ ভাবে আড্ডা জমেছিল। কোথাও চির খায়নি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বড় অদ্ভুত লেগেছিল সেদিন গোকুল নাগের এই সহৃদয় সম্পাদনার ধরনটি।' এমনটাই তো কাম্য। সম্পাদক হবেন বিচক্ষণ ও সহানুভূতিশীল।

'কল্লোল'-এ সম্পাদক কিন্তু একা গোকুলনাগ নন। আর একজনও আছেন। নীরব কেউ নন সম্পূর্ণ সরব, সজাগ। প্রায় গোকুলনাগের বিপরীত চরিত্র। তিনি হলেন দীনেশরঞ্জন দাস। সুদর্শন এই সম্পাদককে সাহিত্য-পথিক দলের চেয়ে তখনকার সৌখিন সমাজেই তাঁকে বুঝি বেশি মানাত। কিন্তু 'কল্লোল'-এর পক্ষে তিনি ছিলেন অপরিহার্য। গোকুল নাগ 'কল্লোল'-এর মূল প্রেরণা হলেও সেই প্রেরণা উজ্জীবনের জন্য প্রত্যক্ষভাবে তিনি বেশিদিন উপস্থিত থাকতে পারেননি। দীনেশরঞ্জন দাস ছিলেন 'কল্লোল'-এর লেখকদের উদার আশ্রয়ের জায়গা। আগেই বলেছি 'কল্লোল' লেখকদের

অর্থ দিতে পারেনি, এমনকি মান মর্যাদাও বিশেষ কিছু দিতে পারেননি। তখন সভ্য পাড়ায় 'কল্লোল'-এর সঙ্গে সম্পর্কটা সুনজরে দেখা হত না। এতকিছু সত্ত্বেও 'কল্লোল'-এর অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়েছিল যে গোষ্ঠী, তা শুধুমাত্র দীনেশরঞ্জন দাসের প্রসন্ন ব্যক্তিত্বের চুম্বক শক্তিতে।

লেখক সংখ্যা বহু হলেও 'কল্লোল'-এর অন্তরতম দলটি কিন্তু খুব যে একটা ভারী ছিল তা কিন্তু নয় না। অন্তরতম দল বলতে একই শপথ নেওয়া, গোপন খাতায় একসঙ্গে নাম লেখান—এসব একদমই নয়। এই অন্তরতম দলের সবার সঙ্গে সম্বন্ধও ঠিক এক সময়ে হয়নি। কেউ আগে থেকেই ছিলেন, কেউ পরে এসেছেন। আবার তাঁদের মধ্যে যে সকলের প্রতিদিন নিয়মিত দেখাশোনা হত এমনটাও নয়। তাঁরা সবাই মার্কামারা সাহিত্যিকও ছিলেন না সেসময়ে। 'কল্লোল'-এর সূচিপত্রে একবার কি দু'বারের বেশি নাম ছাপা হয়নি এমন মানুষও তার মধ্যে ছিলেন। আবার এমনও ছিলেন যাঁরা সাহিত্যের সার্থক কলম হাতে নিয়েও শেষ পর্যন্ত অন্য পেশায় চলে গিয়েছিলেন। সম্পর্ক শুধু লেখার হোক বা না হোক—কোনও উপলক্ষ হলে সবার আগে অদৃশ্য অশ্রুত সংকেতে সেই দলে ডাক পৌঁছে যেত। নিতান্তই অসাধ্য না হলে সকলেই উপস্থিত হতেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কথায়—

> "এমনি অন্তরতমদের সমাবেশ দেখেছি কাজী নজরুলের হুগলির বাড়িতে তার প্রথম সন্তানের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে। কল্লোলের তখন দ্বিতীয় বছর চলছে। লেখক সূচিতে নামের তালিকা খুব কম দীর্ঘ নয়। কিন্তু নজরুলের নিমন্ত্রণে তার সেই একতলার সেকেলে ধরনের বাড়িতে দুপুর থেকে সারারাত যারা আনন্দেরহাট বসিয়েছিল তাদের সংখ্যা কিন্তু বেশি নয়। সম্পাদক দীনেশ দাস ও গোকুল নাগের সঙ্গে পবিত্র গাঙ্গুলির নৃপেন চট্টোপাধ্যায় ভূপতি চৌধুরী ত ছিলই। তারা কল্লোলের জন্মসাথী। শৈলজানন্দও এক হিসেবে তাই। কল্লোল এর প্রথম সংখ্যা থেকে শুধু লিখছে না, এই পত্রিকার সঙ্গে নিজের নিয়তি মিশিয়েছে। এছাড়া ছিলেন মুরলিধর বসু আর সুবোধ রায়। সম্পূর্ণ নতুনদের মধ্যে অচিন্ত্য, সুকুমার ভাদুরি আর আমি ছাড়া আর কেউ সে দলে ছিল না।"[৩]

সমবেত হয়ে স্বাতন্ত্রের সাধনা করতে চেয়েছে 'কল্লোল'। 'কল্লোল' শুধু লেখা চাইতো না চাইতো পুরো লেখককেই। ফলে 'কল্লোল'-এর পাতা যেমন ভরেছে নিত্যনতুন লেখায়, তেমনই আড্ডাটিও মজবুত হয়েছে হরেক রকম মানুষের উপস্থিতিতে। বুদ্ধদেব বসু 'আমার যৌবন'-এ লিখেছেন,

> "তাঁর (দীনেশরঞ্জন দাশ) সবচেয়ে বড় গুণ এই যে তিনি খুব সহজে কাছে টানতে পারেন মানুষকে। ধরে রাখতেও পারেন—আমি যেদিন প্রথম এসেছিলাম তার কাছে, আই.এ. পড়ুয়া অজাতশ্মশ্রু আমি তখনও, তিনি যেরকম সাবলীলভাবে শুধু প্রথম বাক্যটিতে আপনি তো বলে,

> আমাকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে 'তুমি' পেরিয়ে 'তুই'-এর স্তরে অবনত বা উন্নত করেছিলেন, আমি তাতে চমৎকৃত হয়েছিলাম। এবং এটাই কারণ, সেজন্যে কল্লোল দলটি এমন আঁটোসাঁটো মজবুত হতে পেরেছিল।"[৪]

শৈলজানন্দ মাঝে বছর দুই 'কালি-কলম'-এ মন দিলেও 'কল্লোল'-এই বাধা ছিল তাঁর আত্মা। ভূপতি চৌধুরী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর সঙ্গে কিছু ভুল বোঝাবুঝির জন্য 'কালি-কলম'-এর সময়টুকু বাদ দিলে প্রেমেন্দ্র মিত্র ও মুরলীধর বসু ছিলেন 'কল্লোল'-এর অনিবার্য অংশ।

কল্লোলিয়ানেরা যে আড্ডা দিত, তা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বাঁক বদলে সাহায্য করেছে। আড্ডা তাঁদের ক্ষেত্রে সৃষ্টির পথে অনুপ্রেরণার কাজ করেছে। 'কল্লোল' তাঁদের নতুন করে ভাবিয়েছে, তাঁদের ভাবনা প্রকাশের প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দিয়েছে। 'কল্লোল' ছিল তাঁদের কাছে বেপরোয়া ফূর্তির জায়গা। তাইতো তাঁরা চাদরে ঢাকা তক্তপোশে বসে আওড়ে গেছে সাহিত্য পাড়ার নানান খুচরো খবর, যেগুলো উড়ে বেড়াতো মুখ থেকে মুখে। আবার কখনও কখনও এমন কিছু কথা যেগুলো ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করা যায় না। মনীশ ঘটক কপাল ঠুকে যাওয়ার ভয়ে মাথা নিচু করে ঢুকত আড্ডায়। কখনও প্রবোধ সান্যাল এমনভাবে ভ্রমণ কাহিনি বলতে শুরু করতেন যে সেটাই তাঁর শেষতম কাহিনি। 'উত্তরা'-র সম্পাদক সুরেশ চক্রবর্তী কখনও কখনও তাঁর ভাঙ্গা গলায় মেল ট্রেনের গতিবেগে গল্প বলে যেতেন কে শুনছে কে শুনছে না তাতে তিনি গ্রাহ্য করেন না। বলার আনন্দে বলে যেতেন। প্রতিদিন যিনি উপস্থিত থাকতেন, আর যাঁর গলার আওয়াজ সবচেয়ে বেশি জোরালো শোনাত, 'কল্লোল' চালনায় যিনি দীনেশ চক্রবর্তীর ডান হাত তিনি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। প্রেমেন্দ্র মিত্রকে আর শৈলজানন্দকে একসঙ্গে দেখা যেত প্রায়ই। আর 'সবুজপত্র'-এর গালগল্প সমেত উপস্থিত হতেন পবিত্র গাঙ্গুলী মহাশয়। 'পূরবী'-র কবিতা নিয়ে আসা-যাওয়া করতেন নিপেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। কোনও কোনও সন্ধ্যায় হাসির গানের আসর জমিয়ে তুলতেন নলিনীকান্ত সরকার। ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কখনও কখনও আসর মধ্যে কিছুটা সময় কাটিয়ে, মন ভাল করে ফিরতেন। বুদ্ধদেব বসু, যিনি ঢাকা থেকে এসে মাঝে মাঝে এই আসরের মজা উপভোগ করে ফিরে যেতেন। অবারিত দ্বার, আসেন বসেন মনের সুখে আড্ডা দিয়ে রসদ নিয়ে ফিরে যান সকলে। কী এক উত্তেজোনায় উদ্বুধ হয়ে এক সঙ্গে এক স্রোতে গা ভাসিয়ে দেন তাঁরা। আজকের এন্ড্রেয়েডের যুগে বসে আমরা ভাবতেও পারি না।

আধপোড়া চুরুট মুখে দিয়ে হাসতে হাসতে এসে উপস্থিত হতেন সনৎ সেন। যাঁকে সকলে 'সান-ইয়াৎ-সেন' বলতেন। বিজয় সেনকে সকলে ডাকত কোবরেজ বলে, তাঁর চাদরে জড়ানো বুড়োটে ভাব দেখে। তিনি সহজে ধরা দিতে চাইতেন না জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকতেন কিন্তু 'কল্লোল'-এর ঘরে সেটা সম্ভব ছিল না। আস্তে

আস্তে তাঁকে তাঁর গাম্ভীর্যের গুহা থেকে বের করে নিয়ে এলো তাঁরই বন্ধুরা। সুকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে তাঁর একটা বেশ আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

শুধু একজনকে দেখতে পাওয়া যায়নি এই আসরে—তিনি হলেন জীবনানন্দ দাশ। তিনি 'কল্লোল'-এর একান্তই আপনজন হওয়া সত্ত্বেও তিনি কল্লোলে অবগাহন করতে পারেননি বলে বুদ্ধদেব বসু জানিয়েছেন। তাছাড়া বাকিরা সকলেই তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছেন কল্লোলের আড্ডার আনন্দ। আপাতভাবে মনে হয় যে, 'কালি-কলম' চিড় ধরিয়েছিল কল্লোলিয়ানদের মধ্যে। কিন্তু কল্লোলিয়ানদের চিঠিতে স্মৃতিকথায় এ কথার সমর্থন পাওয়া যায় না। বরং সেগুলো দেখে আমাদের মনে হয় 'কালি-কলম' ছিল 'কল্লোল'-এর পরিপূরক বা পরিপূর্ণতার সাথী। তৈরি হল কল্লোলিয়ানদের আরেকটি আড্ডার আখড়া। অচিন্ত্যকুমারের কথায় "কল্লোল আর কালি-কলম একই মুক্ত বিহঙ্গের দুই দীপ্ত পাখা।"[৫]

তথ্যসূত্র:

১. মিত্র প্রেমেন্দ্র, ১৩৮১, 'কল্লোলের কাল', দেশ সাহিত্য সংখ্যা, পৃ: ৮০

২. সেনগুপ্ত অচিন্ত্যকুমার, একাদশ প্রকাশ: আশ্বিন, ১৪২১, 'কল্লোল যুগ', কলকাতা-৭০০ ০৫৪ এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ: ৫১

৩. মিত্র প্রেমেন্দ্র, ১৩৮১, 'কল্লোলের কাল', দেশ সাহিত্য সংখ্যা, পৃ: ৮৪

৪. বসু বুদ্ধদেব, ২০ মে ২০০৫, 'আমার যৌবন', বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ সমগ্র, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমি, পৃ: ৮৬

৫. সেনগুপ্ত অচিন্ত্যকুমার, একাদশ প্রকাশ: আশ্বিন, ১৪২১, 'কল্লোল যুগ', কলকাতা-৭০০ ০৫৪ এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ: ১১২

জাতীয়তাবাদ ও রাণী রাসমণি

সুকুমার ষন্নিগ্রহী
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
সিকম স্কিলস্ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : জাতীয়তাবাদ হল একটি স্থানে বসবাসকারী মানুষজনের মানসিকতা, অনুভূতি ও চেতনার ফল। স্বদেশিকতা এর প্রধান অবলম্বন। ইতিহাসের পাতার কালো হরফের দিকে নজর দিলে জাতীয়তাবাদের নানা দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে। পাশ্চাত্যে এই ধারণাটি ব্যাপকভাবে দেখা যায়। ষোড়শ শতকের গোড়াতে জাতীয়তাবাদের বিকাশ শুরু হয়। অষ্টাদশ শতকে জাতীয়তাবাদ অনেক বেশি মজবুত হয়। ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ, আলোচনায় দেখা যায় স্বাদেশিকতা জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রধান অবলম্বন। বিদেশি শক্তির হাত থেকে দেশবাসীকে রক্ষা জাতীয়তাবাদের মূল কথা। এককথায় স্বদেশপ্রেম, দেশাত্মবোধ, জনগণের মঙ্গল সাধনই হল জাতীয়তাবাদের প্রধান ভাবনা। তবে জাতীয়তাবাদ কেবলমাত্র স্বাদেশিকতার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে তা নয়- স্বাদেশিকতা জাতীয়তাবাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও এর বাইরেও জাতীয়তাবাদের নানা উপাদান রয়েছে। একটি দেশ গঠিত হয় জনগণের মধ্য দিয়ে, তাই জনগণই হল দেশের সর্বময়কর্তা। জনগণের মঙ্গলেই দেশের মঙ্গল। আর এই জনগণ কেবল বিদেশি শক্তির দ্বারা লাঞ্ছিত, যন্ত্রণার শিকার হয় এমন নয় দেশীয় শক্তির দ্বারাও তারা নানাভাবে অত্যাচারিত হয়। তাই জনগণের মঙ্গল কার্যে যিনি এগিয়ে আসেন তিনিই আসল জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিত্ব। ভারতবর্ষে এরকম জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিত্ব অনেকেই আছেন তাঁদের মধ্যে রাণী রাসমণি (১৭৯৩ খ্রি. - ১৮৬১ খ্রি.) ছিলেন অনন্যা। তিনি ছিলেন প্রজ্ঞা, বোধ, বুদ্ধি, যুক্তিসিদ্ধ মন, দার্শনিক জিজ্ঞাসা, ঈশ্বরবিশ্বাসী ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন আপামর জনগণের রক্ষাকবচ। এইজন্য তিনি জলকর রোধ, নীলকরদের উৎপীড়ন রোধ, গোরা সৈন্যদের অত্যাচার রোধ করেছেন। তিনি নিজের অর্থ ব্যয় করে জনসাধারণের কল্যাণের জন্য বহু রাস্তাঘাট, বাজার, খাল তৈরি করেছেন। মূল প্রবন্ধে উক্ত বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ : জাতীয়তাবাদ, স্বাদেশিকতা, ইতিহাস, প্রজ্ঞা, দার্শনিক জিজ্ঞাসা, ঈশ্বরবিশ্বাসী, উৎপীড়ন, অত্যাচার।

মূল আলোচনা :

ড. বিপান চন্দ্র 'Modern India' গ্রন্থে লিখেছেন — "The root of the matter lay in the clash of the interest of the Indian people with British interest in India."[১] অথাৎ জাতীয়তাবাদ উন্মেষের মূলে ছিল ভারতীয় ও ব্রিটিশ

স্বার্থের সংঘাত। ড. এ.আর. দেশাই 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি' গ্রন্থে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষের মূল কারণ হিসেবে ওই একই কথা বলেছেন। এমনকি শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় 'পলাশী থেকে পার্টিশান' গ্রন্থে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ বিষয়ে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। একই সঙ্গে তিনি জাতীয়তাবাদের দুটি কাজের কথা বলেছেন — "প্রথমে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা এবং তারপরে আত্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবি করা।"[২] উক্ত তিন মনীষীর বক্তব্যে পরিষ্কার হয় যে, জাতীয়তাবাদ স্বাদেশিকতার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।

এ তো গেল ভারতীয় জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদীকে কি একক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা যায়?— এ প্রশ্ন স্বভাবতই এসে যায়। অধ্যাপক ক্লাইডার জাতীয়তাবাদ বিষয়ে জানিয়েছেন —"জাতীয়তাবাদ হল ইতিহাসের এক বিশেষ পর্যায়ে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ভাবপ্রবণতার ফল। একটি সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনসাধারণের মানসিকতা, অনুভূতি ও চেতনার ফল"। জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যায় – এটি হল একটি স্থানে বসবাসকারী মানুষজনের মানসিকতা, অনুভূতি ও চেতনার ফল। স্বাদেশিকতা এর প্রধান অবলম্বন। অধ্যাপক লাস্কি এবং হ্যানস কোহন জাতীয়তাবাদ বিষয়ে উক্ত ধারণাটিকে সমর্থন করেছেন।

ইতিহাসের পাতার কালো হরফের দিকে নজর দিলে জাতীয়তাবাদের নানা দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে। ১১৯১ খ্রিস্টাব্দে রাজপুত রাজ পৃথ্বীরাজ চৌহান বিদেশী শক্তি মহম্মদ ঘোরির হাত থেকে রাজপুতের স্বাধীনতা ও সার্বভৌম রক্ষার জন্য তরাইনের প্রথম যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে তিনি জয়ী হন, যদিও পরের বৎসর অর্থাৎ ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ ঘোরির সাথে তিনি পুনরায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং পরাজিত হন। কিন্তু পরাজিত হলেও বিদেশি শক্তির হাত থেকে রাজপুত জাতিকে রক্ষা করার পৃথ্বীরাজ চৌহানের এই প্রয়াস জাতীয়তাবাদের মূল দিকটিকে চিনিয়ে দেয়। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে মেবাররাজ রানা প্রতাপসিংহের সঙ্গে মোঘল সম্রাট আকবর হলদিঘাটের প্রান্তরে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন — যা ইতিহাসে হলদিঘাটের যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই মহাসংগ্রামে রানা প্রতাপসিংহ পরাজিত হন। তবে মেবারের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য তার প্রচেষ্টা জাতীয়তাবাদের অন্যতম উদাহরণ। জাতীয়তাবাদ বিষয়ে আলোচনা করলে স্বভাবতই শিবাজীর নাম উঠে আসে। ভারতবর্ষে হিন্দু সাম্রাজ্য গড়ার স্বপ্ন তিনি শৈশব কাল থেকে দেখতেন। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের মতো বীরগাথা শুনে তাঁর অন্তরে স্বদেশপ্রেম ও বীরত্বের জাগরণ হয়। মোঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে তাঁর লড়াই ইতিহাসে বড়ো জায়গা জুড়ে রয়েছে। ইতিহাসবিদ এম.জি. রানাডে "শিবাজীর রাজনৈতিক জীবনকে মারাঠা জাতীয়তাবাদের প্রতীক ও দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলে চিহ্নিত করেছেন।"[৩] পরবর্তী পর্বে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য ভারতীয়দের সংগ্রাম জাতীয়তাবাদী চিন্তা-ধারার পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রকাশ পেয়েছে।

ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদের নানা দৃষ্টান্ত রয়েছে। পাশ্চাত্যে এই ধারণাটি ব্যাপকভাবে দেখা যায়। ষোড়শ শতকের গোড়াতে জাতীয়তাবাদের বিকাশ শুরু হয়। ইতালির দার্শনিক ম্যাকিয়াভেলী জাতীয়-রাষ্ট্রের নীতি জাতীয়তাবাদের গতি সঞ্চার করে। অষ্টাদশ শতকে জাতীয়তাবাদ অনেক বেশি মজবুত হয়। ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে গৌরবময় বিপ্লব হয়, এর মধ্য দিয়ে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা স্বাধীনতা লাভ করে। বিদেশি শক্তির হাত থেকে দেশে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য আমেরিকার যুদ্ধ জাতীয়তাবাদের মূল সুরটিকে চিনিয়ে দেয়। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হয় — যা ইতিহাসে যুগান্তকারী অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত। এই বিপ্লবের মূলনীতি ছিল — সাম্য–মৈত্রী–স্বাধীনতা। এই মহান বিপ্লবের ফলে জাতীয়তাবাদের চেতনা পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ফরাসি বিপ্লব যে দেশপ্রেমের জন্ম দেয় — তা কালের আবর্তনে জাতীয়তাবাদের রূপ ধারণ করে, ইতিহাসবিদ হ্যান্স কোহন জানিয়েছেন ফরাসি বিপ্লবের অনুপ্রেরণায় জাতীয়তাবাদের চেতনা একটি সুশৃঙ্খল রূপ নেয়। এই বিপ্লবের ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে যোগাযোগ তৈরি হয়। তারা নিজের মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। এর ফলে তারা একে–অপরের কাছাকাছি চলে আসে। তাই বলা যায়, ফরাসি বিপ্লব অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে ঘটলেও এর মধ্য দিয়ে জনগণের অস্তিত্ব এবং তাদের মূল্য গুরুত্ব পায়। ফরাসি দার্শনিক রুশো তাঁর 'Contract Social' গ্রন্থে লিখেছেন — "Man is born free, but everywhere he is in chains"[৪] অর্থাৎ মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করলেও কিন্তু সে সর্বত্র শৃঙ্খলাবদ্ধ। এই শৃঙ্খলাবদ্ধ করে- সমাজ, রাষ্ট্র। শাসনকর্তা শাসনের মধ্য দিয়ে জনগণকে পরাধীন করে। রুশো এই শাসনব্যবস্থার তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি জানান রাজা বা সম্রাট নয়, জনগণই সর্ব ক্ষমতার অধিকারী। এভাবে দেখলে বলা যায়, ফরাসি বিপ্লব জাতীয়তাবাদের প্রকৃত নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ আলোচনা করতে গেলে বিসমার্কের নাম উঠে আসে, তিনি জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করতে রক্ত ও লৌহ নীতি গ্রহণ করেন। তাঁরই উদ্যোগে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে জার্মানি একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ আলোচনায় দেখা যায়, স্বাদেশিকতা জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রধান অবলম্বন। বিদেশী শক্তির হাত থেকে দেশবাসীকে রক্ষা জাতীয়তাবাদের মূল কথা। এক কথায় স্বদেশপ্রেম, দেশাত্মবোধ, জনগণের মঙ্গলসাধনই হল জাতীয়তাবাদের প্রধান ভাবনা। তবে জাতীয়তাবাদ কেবলমাত্র স্বাদেশিকতার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে তা নয়। স্বাদেশিকতা জাতীয়তাবাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও এর বাইরেও জাতীয়তাবাদের নানা উপাদান রয়েছে। একটি দেশ গঠিত হয় জনগণের মধ্য দিয়ে, তাই জনগণই হল দেশের সর্বময়কর্তা। জনগণের মঙ্গলেই দেশের মঙ্গল। আর এই জনগণ কেবল বিদেশি শক্তির দ্বারা লাঞ্ছিত, যন্ত্রণার শিকার হয় এমন নয় দেশীয় শক্তির দ্বারাও তারা নানাভাবে অত্যাচারিত হয়। তাই জনগণের মঙ্গলকর্মে যিনি

এগিয়ে আসেন তিনিই আসল জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিত্ব। ভারতবর্ষে এরকম জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিত্ব অনেকেই আছেন তাঁদের মধ্যে রাণী রাসমণি (১৭৯৩–১৮৬১) ছিলেন অন্যন্যা।

রাণী রাসমণির উপর চর্চা করলে দেখা যাবে, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্ব অসীম। তবে দুঃখের বিষয় হলো ইতিহাসবিদরা বা ইতিহাস আলোচকগণ তাঁর বিষয়ে তেমন আলোচনা করেননি। এ প্রসঙ্গে মালা দত্তরায় 'রানী রাসমণি' গ্রন্থের 'আমার কথা' অংশে লিখেছেন— "তাঁকে জানতে গিয়ে মনে হয়েছে যুগের থেকে অনেক এগিয়ে থাকা ব্যক্তিত্বসম্পন্না, স্বকীয়তায় উজ্জ্বল মহতী হৃদয় এই মানবীর বিশাল কর্মকাণ্ড কেন বাংলার ইতিহাসে স্থান পায়নি? কেন ইতিহাসে তিনি উপেক্ষিত থেকে গেছেন? তাঁর বিভিন্ন কাজকর্ম নিয়ে নানান গল্পকথা প্রচলিত রয়েছে, কিন্তু কখনও গভীরভাবে তাঁর এই কার্যবলী বিশ্লেষিত হয়নি।"[৫] ইতিহাসে স্থান পাওয়ার যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও কোনো এক অজানা কারণে ঐতিহাসিকগণ তাঁকে ইতিহাসের বইয়ে তেমন গুরুত্ব দেননি। রাণী রাসমণি "প্রবল প্রতাপশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে বারবার বিদ্রোহের ডাক দিয়েছেন"।[৬] একই সঙ্গে "বাঙালি জাতিকে রক্ষা করার প্রবণতাও তাঁর মধ্যে ছিল"।[৭] এহেন ব্যক্তিত্বকে ইতিহাসে আলোকপাত না করা সত্যই আশ্চর্যের বিষয়। এই আলোচনায় রাণী রাসমণির কর্মকাণ্ডের সূত্র ধরে তাঁর মধ্যে জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনা কেমন প্রকাশ পেয়েছে তা উল্লেখ করব। কয়েকটি কাজের কথা আলোচনার মধ্য দিয়ে তাঁর জাতীয়তাবাদী চিন্তা-ধারা দেখানো যেতে পারে।

১৮৩৮ সালে রাণী রাসমণির জানবাজারের বাড়িতে মহাসমারোহে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। মহাষষ্ঠীর দিন শঙ্খ, ঢাক, কাঁসর ঘন্টা ইত্যাদি বাদ্য সহযোগে গঙ্গার বাবুঘাটে কলাবউ স্নান এর শোভাযাত্রা হয়। অনেক বাদ্যের কারণে শব্দ জোরালো হয়। এতে বাবু রোডের এক সাহেবের ভোর রাতের ঘুমের সমস্যা হয়। তিনি দলনেতা রাণী রাসমণির জামাতা মথুরামোহনকে বাজনা বাজানো বন্ধ করতে বলেন। বলাবাহুল্য, মথুরামোহন সাহেবের কথায় কর্ণপাত না করে নবপত্রিকা স্নানের শেষে একইভাবে জানবাজারে ফিরে এলেন। এই ঘটনায় সাহেব অত্যন্ত রুষ্ট হন এবং তিনি এর প্রতিবিধানের জন্য পুলিশের কাছে দরখাস্ত করেন। পরের দিন দুপুরে ফাঁড়ি থেকে পুলিশ এসে জানবাজারে রাণীর বাড়িতে হাজির হয় এবং তারা জানায় যে, পুনরায় এরকম শোভাযাত্রার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। এরপর মথুরবাবু একথা জানালে রাণী মা চিকের আড়াল থেকে তাদের উদ্দেশ্যে বলেন "শোভাযাত্রা বন্ধ হবে না। প্রয়োজনের সরকার আদালতে যেতে পারে, তখন মামলা লড়তে আমি প্রস্তুত আছি। আমার স্বামী তাঁর খাস জমিতে নিজের খরচে রাস্তা তৈরি করেছেন। তাই আমার রাস্তায় আমি খুশীমতো চলব, তাতে সরকারের কী?"[৮] একথা শুনে ইংরেজ পুলিশ রাগে গরগর করতে করতে চলে গেল। বিসর্জনের সময় আরো বেশি বাদ্য বাজিয়ে শোভাযাত্রা বাবুঘাটে যায়। আসলে হিন্দুদের উৎসবে ইংরেজদের বাধা-নিষেধ রাণী ভালো চোখে নেননি। এরপর ইংরেজ পুলিশ রাণীর বিরুদ্ধে শান্তি ভঙ্গের মামলা করে এবং রাণীর

৫০ টাকা জরিমানা হয়। রাণী সেই টাকা মথুরামোহনকে সরকারের ঘরে পৌঁছে দেওয়ার আদেশ দেন। তারপর রাণী এ ঘটনার প্রতিশোধ নিতে মথুরকে বলেন—"বাবা মথুর, এখন তোমাকে একটা কঠিন কাজ করতে হবে। একটু বেশি সংখ্যক লোক লাগিয়ে তুমি আমাদের জানবাজার থেকে বাবুঘাট পর্যন্ত রাস্তার দুধারে গড়ান কাঠের খুঁটি পুঁতে তাতে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে দাও। খুব তাড়াতাড়ি কাজটি করতে হবে। তখন দেখবো কোথাকার জল, কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।"[৯] এরপর সাহেবদের চলাচলে খুব অসুবিধা হয় এবং তাঁরা আবার রাণীর বিরুদ্ধে মামলা করেন, বিচারক রাণীর উকিলের কাছে এভাবে রাস্তা আটকানোর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান – "হুজুর এই রাস্তাটি আমার মক্কেলের নিজস্ব রাস্তা, সন্দেহ হলে এই দেখুন স্বর্গীয় রাজচন্দ্র দাসের নামে গ্যারিসন অফিসারের মঞ্জুর করা সেই দলিল। তাই তাঁর রাস্তা তিনি বন্ধ করে দিতে পারেন।"[১০] বিচারক দলিলটি ভালো করে দেখে রায় দেন রাণীর জরিমানার ৫০ টাকা ফেরত দেওয়া হবে, ধর্মীয় শোভাযাত্রা বন্ধ করা যাবেনা। রাণীর কাছে আবেদন রইল তিনি যেন জনসাধারণের জন্য রাস্তাটি উন্মুক্ত করেন। এভাবে রাণী মামলায় জয়লাভ করেন প্রতাপশালী ইংরেজদের বিরুদ্ধে রাণীর এরূপ মনোভাব সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে এবং একইভাবে জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার দিকটি প্রকাশ পায়।

রাণী রাসমণি জনহিতকর কাজে ব্যাপক অবদানে রেখেছেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রক্তচক্ষু ও প্রতাপশালী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে তিনি সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছেন। তিনি যথার্থ অর্থেই বীরাঙ্গনা ও বুদ্ধিমতী নারী ছিলেন। তিনি নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধাচারণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ড. অখিল মজুমদার "পুণ্য শিলা রানী রাসমণি" গ্রন্থে লিখেছেন— "রানীমা-র মাকমপুর পরগনাতে একবার নীলকর সাহেবের উপদ্রব হয়েছিল। তখন সেখানকার অত্যাচারিত চাষিরা রাণীমা-র কাছে এসে কান্নাকাটি শুরু করে। তাই রাণীমা দীপ্ত তেজের সঙ্গে এই দুর্দশা থেকে তাদের উদ্ধার করেন। সেসময় ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়নি, কিন্তু রাণীমা-র এরকম উদ্যোগের মধ্য দিয়ে দেশ থেকে রাহু মুক্তির সুপ্ত বীজ অঙ্কুরোদম হতে থাকে।"[১১] ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে নীল বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। আর এই বিদ্রোহের সলতে পাকানোর কাজটি করেছিলেন রাণীরাসমণি। রাণীর দোর্দান্ত প্রতাপের কারণে তাঁর জমিদারী এলাকায় কোথাও আর নীলকর সাহেবেরা নীল চাষ করতে অগ্রসর হয়নি। ফলস্বরূপ রাণীর এলাকার চাষীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

নীলকর সাহেবদের পর জেলেদের জলকর বন্ধের উদ্দেশ্যে ইংরেজদের সঙ্গে রাণীর বিরোধ তৈরি হয়। ইংরেজ সরকার নিয়ম করেন গঙ্গায় মাছ ধরতে গেলে জেলেদের জলকর দিতে হবে, হতদরিদ্র জেলেরা মহাবিপদের সম্মুখীন হয়। এই বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য তারা নানা জমিদারের কাছে কাতর আবেদন জানায়। তাদের দুঃখে কোন জমিদার কর্ণপাত করেননি। তারপর তারা রাণী রাসমণির শরণাপন্ন হয়,

রাণী তাদের দুঃখ অনুধাবন করেন। এক্ষেত্রে তিনি বিচক্ষণতার পরিচয় দেন— "রানী ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে গঙ্গার শুধু সেই অংশটুকুই ইজারা নিলেন যেখানে জেলেরা মাছ ধরত। জায়গাটা ছিল গঙ্গার উত্তর অংশের ঘুসুড়ি থেকে দক্ষিণের মেটিয়াবুরুজ পর্যন্ত। নগদ ১০ হাজার টাকা দিয়ে সরকারের থেকে নদীর এই অংশ লিজ নিলেন। লিজ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রানী প্রস্তুতি নিলেন গরিব জেলেদের অত্যাচার করার সমুচিত শিক্ষা ইংরেজদের দিতে। তাঁর নির্দেশে তাঁর কর্মচারীরা বাঁশ, দড়ি ও লোহার শিকল দিয়ে নদীর ওই ইজারা নেওয়া অংশটি পুরোপুরি ঘিরে দিল। জেলেরা এই ঘেরা অংশে নির্বিধায় মাছ ধরতে থাকে। শুধু তাই নয় রাণী এই এলাকা দিয়ে জাহাজ ও নৌকা চলাচল বন্ধ করে দিলেন। সওদাগড়ি কোম্পানি গুলির ব্যবসা বন্ধ হওয়ার জোগাড়। ইংরেজরা রেগে গেলেন।"[১২] এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজ সরকার রাণীর কাছে জবাবদিহির জন্য নোটিশ পাঠান, ইংরেজ সরকার রাণীকে জলপথ খুলে দেওয়ার আদেশ দেন। রাণী তাতে কোনো তোয়াক্কা করেননি, রানী উত্তর দিলেন— "আমি টাকা দিয়ে গঙ্গার ওই অংশ ইজারা নিয়েছি। কাজেই আইনগতভাবেই আমি এই জলপথ বন্ধ করতেই পারি, আমার প্রজারা (জেলেরা) এ অঞ্চলে মাছ ধরে। এখানে সর্বদা জাহাজ চলাচল করলে জাহাজের বিকট শব্দে মাছেরা ভয়ে গঙ্গায় আসবে না। ফলে নদীতে আর কোন মাছেই থাকবে না। প্রজাদের চরম ক্ষতি হবে। গরিব জেলেদের এই ক্ষতি যাতে না হয় তার জন্যই আমি নদীতে জাহাজ চলাচল বন্ধ করেছি।"[১৩] বলাবাহুল্য ইংরেজ সরকার রাণীর আসল অভিসন্ধি বুঝতে পারে এবং তারা রাণীর কূটনৈতিক বুদ্ধির কাছে নত স্বীকার করে। তারা রাণীর লিজ বাবদ দেওয়া ১০ হাজার টাকা ফেরত দেয় এবং গঙ্গা নদী থেকে জলকর তুলে নেয়। জেলেরা অবাধে মাছধরতে থাকে। এরপর রাণী জলপথ খুলে দেন। রাণীর দেখানো পথ ধরে সারা বিশ্বে ধীবরদের জলকর বন্ধ হয়।

ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে রাণীর ১৮৫৮ সালে সরাসরি সংঘর্ষ হয়। গোরা সৈন্যরা রাণীর জানবাজারের প্রাসাদের কাছেই রাস্তায় মদ খেয়ে রাস্তার পথচারীদের সঙ্গে প্রায়শই দুর্ব্যবহার করত। একদিন সন্ধ্যেবেলায় মাত্রাতিরিক্ত হলে রাসমণির দারোয়ানরা থাকতে না পেরে প্রতিবাদ করেন। গোরা সৈন্যরা জোরপূর্বক রাণীর প্রাসাদে ঢোকার চেষ্টা করলে দারোয়ানরা তাদের মারধোর করে তাড়িয়ে দেন। এ ঘটনায় তারা অপমান বোধ করে, এরপর রাত্রি দশটার দিকে প্রায় ১০০ জন গোরা সৈন্য এসে রাণীর দুইজন দারোয়ানকে হত্যা করে প্রাসাদে প্রবেশ করে। তারা ক্রোধে অন্ধ ছিল তারা অন্তঃপুরে লুটপাট চালায় এমনকি রাণীর একান্ত বিশ্বস্ত পরিচারক গোবিন্দ কে রাণীর চোখের সামনে হত্যা করে। অবস্থার বেগতিক দেখে "অসীম সাহসী রানী রাসমণি ঠাকুরের খড়্গা হাতে রণরঙ্গিনী মূর্তি ধরে তার গৃহ দেবতা রঘুনাথ জীউয়ের মন্দিরের দরজায় দাঁড়িয়ে পড়লেন। গোরা সৈন্যরা যখন হই হই করতে করতে মন্দিরের দিকে ধেয়ে আসতে থাকে তখন তিনি এক গোরা সৈন্যর গায়ে খড়্গা দিয়ে সজোরে এক কোপ

বসান। তাঁর রূপ তখন ভয়ঙ্কর। তাঁকে এইরূপে দেখে গোরা সৈন্যরা একটু থমকে যায়। তারপর সেখান থেকে সরে যায়। আর এগোতে সাহস করে না।"[১৪] রাণীর জামাতা মথুরামোহন এসে এই অবস্থা দেখে স্থানীয় থানায় জানায়, তারপর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এসে গোরা সেনাদের নিরস্ত্র করেন। এবং রাণীর কাছে এ ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। এ ঘটনায় রানীর অসীম সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সময় অর্থাৎ ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় এ ঘটনার জন্য ইংরেজদের প্রচণ্ড নিন্দা করে। প্রজা ও সাধারণ মানুষের স্বার্থে ইংরেজদের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে যেতেও রাণী কখনো পিছুপা হননি।

সন্তান-সম প্রজাদের রক্ষার জন্য রাণী রাসমণি কেবল ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষ করেছেন এমন নয়, দেশীয় জমিদারদের সঙ্গেও তিনি সংগ্রামে লিপ্ত হন। যশোর জেলার নড়াইলের জমিদার রামরতন সরকার রাণীমার প্রজাদের উপর উৎপীড়ন করেন। এই খবর শুনে রাণী প্রচণ্ড রেগে যান। তিনি মথুরামোহনকে বলেন, লেঠেল মহাবীরকে সেখানে যেন পাঠানো হয়। তারপর দুই পক্ষের যুদ্ধ হয় এবং মহাবীরকে গুপ্ত হত্যা করে রামরতনের লেঠেল বাহিনী। "এবার রানী রাসমণির স্থির করলেন, তাকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নেমে পড়তে হবে। নায়েব মশায়ের এর কাছে সংবাদ পৌঁছে গেল, ২৪ পরগনা, বর্ধমান, হুগলী, আরও অন্যান্য জেলা থেকে বাছাই করা পাইক ও লেঠেলদের নিয়ে আসার ব্যবস্থা করলেন রাণী রাসমণি। প্রত্যেকের হাতে লাঠি, সড়কি, বল্লম, কুঠার, আর টাঙ্গি।"[১৫] এতে রামরতনের লেঠেল বাহিনী ভয় পেয়ে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে মাথা নিচু করে নিজেদের বাসস্থানে ফিরে যায়। এভাবে রাণী দুষ্ট জমিদারের হাত থেকে তাঁর প্রজাদের রক্ষা করেন।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে রাণী রাসমণি নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। রাণী এই বিদ্রোহের মূল ভাবনাকে স্বীকার করতে পারেননি। রাণীর এই মনোভাব 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রশংসা করেছেন। রাণী ছিলেন প্রখর বুদ্ধি সম্পন্না নারী। তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন ভারতবর্ষের বুক থেকে ইংরেজদের উৎখাত করতে গেলে সিপাহী বিদ্রোহের মত বিক্ষিপ্ত আন্দোলনে কিছু হবে না — এর জন্য সঙ্গবদ্ধ সুপরিকল্পিত আন্দোলন প্রয়োজন। এ সময় রাণী ইংরেজদের সংস্পর্শে থেকে প্রজাদের মঙ্গল কামনাকেই বড়ো করে দেখেছিলেন।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, জাতীয়তাবাদী চিন্তা ধারাতে রাণী রাসমণি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি দোর্দান্ত প্রতাপশালী ইংরেজ সরকারের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে লড়াই করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজ সরকার তাঁর নিকট হার মানতে বাধ্য হয়েছে। সন্তানসম প্রজাদের যখনই কোন অসুবিধা হয়েছে তখনই রাণী তার প্রতিকার করেছেন। জাতীয়তাবাদের মূল ভাবনা হল স্বাদেশিকতা। এই স্বাদেশিকতার মূল ভিত্তি হল জাতির মঙ্গল কামনা। আর জাতির মঙ্গল কামনায় রাণী

ছিলেন পুরোধা। তাই বলতে পারি রাণী রাসমণি ছিলেন জাতীয়তাবাদী ভাবধারার অন্যতম প্রধান কারিগর।

তথ্যসূত্র :

১. মুখোপাধ্যায়, জীবন, ভারতের ইতিহাস (১৫২৬-১৯১৪) শ্রীধর পাবলিশার্স, কলকাতা, আগস্ট ২০০৯, পৃষ্ঠা - ৪৩২
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, পলাশী থেকে পার্টিশান, ওরিয়েন্ট লংম্যান প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৬, পৃষ্ঠা - ২২৪
৩. মুখোপাধ্যায়, জীবন, ভারতের ইতিহাস (১৫২৬ -১৯১৪), শ্রীধর পাবলিশার্স, কলকাতা, আগস্ট ২০০৯, পৃষ্ঠা - ১৪৯
৪. মুখোপাধ্যায়, জীবন, আধুনিক ইউরোপ, শ্রীধর পাবলিশার্স, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০১৩, পৃষ্ঠা - ৫৩
৫. দত্ত রায়, মালা, রানী রাসমণি, পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৮
৬. সেন, পৃথ্বীরাজ, করুণাময়ী রানী রাসমণি, কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ১৪২৪, পৃষ্ঠা - ৩
৭. মজুমদার, ড. অখিল, পুণ্যশীলা রাণী রাসমণি, গিরিজা লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৪২৭ পৃষ্ঠা - ৫
৮. প্রাগুক্ত সুত্র-৭, পৃষ্ঠ - ১৪৩
৯. প্রাগুপ্ত সূত্র-৭, পৃষ্ঠা - ১৪৩
১০. প্রাগুপ্ত সূত্র -৭, পৃষ্ঠা - ১৪৩
১১. প্রাগুপ্ত সূত্র-৭, পৃষ্ঠা - ১৪৫
১২. প্রাগুপ্ত সূত্র- ৫, পৃষ্ঠা - ৪০
১৩. প্রাগুপ্ত সূত্র-৫, পৃষ্ঠা - ৪০
১৪. প্রাগুক্ত সুত্র-৫, পৃষ্ঠা - ৪৩-৪৪
১৫. প্রাগুপ্ত সূত্র-৬, পৃষ্ঠা - ৭৮

গ্রন্থপঞ্জি:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, নীহারেন্দু, আধুনিক ইউরোপ ও বিশ্ব, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা, জুলাই ২০০৭।
২. পাঠক, দেবাশিষ, রানী রাসমণি এক মহীয়সী নারী, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৪২৫।
৩. দেবী, অন্নপূর্ণা, রানী রাসমণি, পলাশী প্রকাশনা, ১৩৭৪।
৪. রায়, নির্মল কুমার, রানী রাসমনির জীবনবৃত্তান্ত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ৫ই জানুয়ারী ২০০২
৫. দেবী, মহামায়া, করুণাময়ী রাণী রাসমণি, বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৬৭

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে সমাজভাবনা : প্রাক্‌স্বাধীনতা পর্ব

অপর্ণা সেনগুপ্ত
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
মুরলীধর গালর্স কলেজ

সারসংক্ষেপ: বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন ক্রান্তিলগ্নে। সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন মৃত্তিকা সংলগ্ন সুস্থ, সহজ, মানবিক জীবন প্রত্যয়ের প্রসন্ন স্বীকৃতি নিয়ে। তাঁর কথাসাহিত্যের সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে তাঁর স্বভূমি রাঢ়বঙ্গ। রাঢ়বঙ্গের বিশেষত বীরভূমের জনজীবন, ভাষা, সংস্কৃতি, বিশ্বাস, চিন্তার জগত, লোকায়ত চেতনা, অন্ত্যজ সম্প্রদায়, ধর্ম-অর্থ-রাজনীতিগত চেতনা তাঁর উপন্যাসে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে উপস্থাপনার কৌশলে, ভাষার বলিষ্ঠ ও সুদক্ষ প্রয়োগে। জন্মসূত্রে, পেশার সূত্রে এবং ব্যক্তিগত তাগিদে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ছিল, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনবাস্তবতাকে খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে জানবার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবনযন্ত্রণার যে সুর তিনি উপলব্ধি করেছিলেন তাকেই রূপ দিয়েছিলেন তাঁর কথাসাহিত্যে। বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন লেখকের বিশিষ্ট কালতত্ত্ব ও দেশতত্ত্ব। তাঁর বিপুল কথাসাহিত্যসম্ভারের মধ্যে প্রাক্‌স্বাধীনতাপর্বে লিখিত পনেরোটি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে যে সমাজবাস্তবতা ও জীবনচেতনা প্রতিবিম্বিত এই প্রবন্ধে রয়েছে তারই অনুসন্ধানের প্রয়াস।

সূচক শব্দ: সমাজবাস্তবতা, আঞ্চলিকতা, দেশতত্ত্ব, কালতত্ত্ব, মানবমহিমা, ভাষা, রাঢ়বঙ্গ।

মূল আলোচনা:

সাহিত্য জীবনের দর্পণ। সাহিত্যের উপকরণ স্বভাবতই মানুষ, তার সমাজ, সংস্কৃতি, ভাষা, রাজনৈতিক-ধর্মীয়-অর্থনৈতিক চেতনা, পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশ ইত্যাদি জীবন-সম্পর্কিত যাবতীয় উপাদান। বাংলা কথাসাহিত্যের এই উপাদানগুলি বারবার প্রতিবিম্বিত হয়েছে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বকীয় চেতনার উপস্থাপনাগত বৈচিত্র্যে। বস্তুত বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক বাংলা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি পরিবর্তনের যুগ। মহাযুদ্ধোত্তর বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দার অনিবার্য প্রতিক্রিয়া সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যে অস্তিত্ব সংকট সূচীত করেছিল তার করাল অগ্নি গ্রাস করেছিল একান্নবর্তী পরিবার, মানুষের মূল্যবোধ, সুস্থ জীবন প্রত্যয়, সমাজবিন্যাস সব কিছুকে। সমাজ-মানুষের অস্থিরতা, সংশয়, বিপর্যস্ত মূল্যবোধ, হতাশা, ক্লান্তি, অবিশ্বাস, ক্ষোভ,

ব্যক্তিকেন্দ্রিক চেতনা, অবদমিত বাসনা, জৈবিকতা, নৈতিক অধঃপতন এ যুগের সাহিত্যে প্রকটভাবে প্রকাশিত। স্পষ্টত বিভাজন দেখা গেল সাহিত্যক্ষেত্রে। একদিকে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-প্রভাতকুমারদের মতো সাহিত্যিকদের প্রতিষ্ঠিত পেলব অস্তিবাদী লেখন শৈলী, অন্যদিকে পাশ্চাত্য ভাবধারণা, জীবন চেতনা ও বিভিন্ন সাহিত্যের প্রভাব এবং জীবন সম্পর্কে তরুণ প্রজন্মের অবক্ষয়িত, দিশাহারা, নেতিবাচকতা এ যুগের সাহিত্যে উগ্রতা, বিতৃষ্ণাবাদ, নাগরিক বৈষম্য, দেহাশ্রিত জটিল জৈবিকতা, প্রবল বস্তুবাদ সঞ্চার করেছিল। সাহিত্য সাধনার এই ক্রান্তিলগ্নে বাংলা সাহিত্যে লেখক রূপে প্রবেশ করেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ততদিনে পরিবর্তনের প্রাথমিক অভিঘাত কিছুটা স্তিমিত হয়েছে, ক্রমে ক্রমে জগত ও জীবন সম্পর্কে চূড়ান্ত অবসাদ ও নৈরাশ্যের বলয় থেকে যুবসমাজ কিছুটা প্রাণিত হচ্ছেন নতুনতর জীবন চেতনায়। জীবনের পঙ্কিলতা, অসংযত উদ্দামতার বাইরে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে বাস্তব জীবনের বিশ্লেষণ তখন অনিবার্যভাবে বাহিত করতে শুরু করেছে বাংলা সাহিত্যকে। বাংলা সাহিত্যের এই পর্যায়ে মৃত্তিকা সংলগ্ন সুস্থ, সহজ, মানবিক জীবন প্রত্যয়ের প্রসন্ন স্বীকৃতি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর 'রূপসী বাংলা' কবিতায় বলেছিলেন—

'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি
পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর'[১]

আর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন—

'আমার বই বলুন আর যা-ই বলুন, সেটা হচ্ছে আমার এই রাঢ়দেশ।
এর ভেতর থেকেই আমার যা কিছু সঞ্চয়।'[২]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যের মূল সুর রাঢ়বঙ্গ— তাঁর স্বক্ষেত্র রাঢ়বঙ্গ। তিনি বলেছিলেন 'এ দেশের মানুষকে জানার একটা অহংকার ছিল।'[৩] এই জানার অধিকারেই তাঁর কথাসাহিত্যের বেশির ভাগ অংশ জুড়ে রয়েছে রাঢ়বঙ্গের জনপদজীবন, ভাষা, সংস্কৃতি, বিশ্বাস, চিন্তার জগত, ধর্ম, অর্থ, রাজনৈতিক চেতনা ইত্যাদি। এরই সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে লেখকের বিশিষ্ট দেশতত্ত্ব ও কাল চেতনা।

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণি' প্রকাশিত হয়। 'কালিকলম' পত্রিকায় 'শ্মশানের পথে' নামে একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীতে ঐ গল্পটিই 'চৈতালী ঘূর্ণি' রূপে প্রকাশিত হয়। এরপর একে একে প্রকাশিত হয় 'পাষাণপুরী' (১৯৩৩), 'নীলকণ্ঠ' (১৯৩৪), 'রাইকমল' (১৯৩৫), 'প্রেম ও প্রয়োজন' (১৯৩৬), 'আগুন' (১৯৩৭), 'ধাত্রীদেবতা' (১৯৩৯), 'কালিন্দী' (১৯৪০), 'গণদেবতা' (১৯৪২), 'কবি' (১৯৪২), 'মন্বন্তর' (১৯৪৪), 'পঞ্চগ্রাম' (১৯৪৬), 'ঝড় ও ঝরাপাতা' (১৯৪৬), 'সন্দীপন পাঠশালা' (১৯৪৬) এবং অভিযান (১৯৪৬)। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে রচিত এই পনেরোটি উপন্যাস তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাংলা কথাসাহিত্যে অনন্যসাধারণ করেছিল।

১৯২৮ সালে লেখা প্রথম উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণি'-তে লেখক সূচনায় দেখিয়েছেন কীভাবে অনাবৃষ্টির খরপ্রবাহে গ্রামের সমস্ত শ্যামলিমা যেমন ধূসর হয়ে গেছে তেমনি জীবনের সমস্ত লাবণ্য হারিয়ে ফেলেছে গোষ্ঠ আর দামিনী। চরম দারিদ্র, পয়সার জন্য কাবুলিওয়ালার নিরন্তর তাগাদা, অসম্মান, নিদারুণ অন্নকষ্ট, বাৎসল্যের কাছে পরাভব স্বীকার করে সুবল দাসের মতো বিকৃত মানসিকতার মানুষের কাছ থেকে হাতের পৈঁছার বিনিময়ে ছেলের জন্য কবিরাজ ডেকে লাঞ্ছনার শিকার হয়ে দামিনী বারংবার স্মরণ করেছে আগেরকার সম্পন্ন সংসারের কথা। একদিন যে সুবল দাস ছিল তার খেলার সঙ্গী পরবর্তীতে সেই সুবল দাসই মহান্ত খেতাব অর্জন করে, মহাজনী ব্যবসা ফেঁদে পয়সার গরমে আয়ত্ত করতে চায় দামিনীকে। উচ্চবর্গের শোষণ-বঞ্চনা-প্রতারণা কীভাবে গোষ্ঠ-দামিনীকে অবস্থাপন্ন থেকে সর্বস্বান্ত করে দিল 'চৈতালী ঘূর্ণি' উপন্যাসে সেই কাহিনি বয়ান করেছেন লেখক। নতুন করে বাঁচবার আশায় গ্রাম ছেড়ে শহরে আসে গোষ্ঠ-দামিনী। কৃষক থেকে পরিণত হয় শ্রমিকে। কিন্তু এখানেও অনুভব করে সেই বঞ্চনা-শোষণের পাশবিক উত্তাপ। ধীরে ধীরে তারা বুঝতে পারে অর্থনৈতিক শোষণযন্ত্রে জমিদারতন্ত্র-ধনতন্ত্র নির্বিশেষে দুটি শ্রেণি বিদ্যমান— ধনী এবং দরিদ্র, শোষক এবং শোষিত। এই সমাজ পরিকাঠামোয় ধনীর পেষণযন্ত্রে শোষিত, নির্যাতিত, লাঞ্ছিত হতে হতে বিত্তহীন এই সর্বরিক্ত খেটে খাওয়া মানুষগুলি জীবন্ত প্রেতে পরিণত। অন্তহীন টিকে থাকার দৈনন্দিন লড়াই শুষে নিয়েছে প্রাণের সমস্ত রসদ, পড়ে আছে শুধু চর্মশরীর। লেখক দেখিয়েছেন উদরের অসহ্য জ্বালা নৈতিক দৃঢ়তা, আদর্শ সবকিছুকেই জলাঞ্জলি দেয় আপোষের ভূমিতে। স্বাধীন মানুষ পরিণত হয় ধনতন্ত্রের দাসে। আন্দোলন, প্রতিবাদ পূর্ণরূপে পূর্ণরূপে সংগঠিত হয়ে ওঠার আগেই নতিস্বীকার করে জৈবিক তাড়নার কাছে। এটাই সমাজবাস্তবতা, সমাজের উপর কালের অভিঘাত।

পরবর্তী 'পাষাণপুরী' উপন্যাসের পটভূমি কারাগার। ব্যক্তিগত জীবনে দেশসেবাব্রতে আত্মনিয়োগের ফলস্বরূপ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কারারুদ্ধ হন। জেলে থাকাকালীন 'পাষাণপুরী' উপন্যাসের খসড়া তিনি রচনা করেন। জেলজীবনে তিনি অনুভব করেছিলেন কয়েদীদের বিচিত্র জীবন ও মানসিকতা। কেউ সত্যাগ্রহী, কেউ দৃঢ়চেতা, কারোর কোনো নৈতিক ভিত্তি নেই, কেউ বা জেলে বসেও ষড়যন্ত্রের ফন্দি আঁটে, কারোর স্বপ্ন ধনী হবার, কেউ স্বার্থান্বেষী, সুযোগ-সন্ধানী, ধূর্ত, কেউ বা আদর্শবাদী, কারোর মধ্যে মূল্যবোধের অবক্ষয় সুস্পষ্ট, কেউ বা মনুষ্যত্বহীন, বিবেকহীন, কেউ বা মানবিক হবার চেষ্টা করে। শুধু মানবচরিত্রেরই বৈচিত্র্য নয়, শাসকের অরাজকতা, নির্যাতন, জেলের নিরানন্দ বিষণ্ণ দমবন্ধকরা পরিবেশ, জীবনের বিপুল অপচয়, রাজনৈতিক নেতিবাচকতা, ঔপনিবেশিক রাজশক্তির অকারণ কঠোরতা, শাসনের নামে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বাধীনতার স্পৃহা স্থিমিত করে দেবার অপচেষ্টা ইত্যাদি জাতীয় জীবনের অনেক কিছুই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন মানবদরদী ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। বুঝেছিলেন সেখানে নরুর মতো

অনমনীয় দৃঢ়চেতা চরিত্র যেমন আছে, তেমনি আছে কালী কামারের মতো চিত্তবিকারগ্রস্থ চরিত্র। নরুর জীবনদর্শন সাময়িকভাবে কয়েদিদের মধ্যে নিগূঢ় অস্বস্তি-আত্মধিক্কারের অনুভব আনলেও তা তাৎক্ষণিক, ক্রমশ আবার গতানুগতিকতার স্রোতে নিমজ্জিত হয়ে যায়। মানুষগুলো যেন 'সরীসৃপের মত কিলবিল'[৪] করে বেড়ায় কর্দমাক্ত পঙ্কিল জীবনস্রোতে। সামাজিক অবক্ষয় যেন তাদের বিবর্তনের ইচ্ছেটাকেই নষ্ট করে দিয়েছে। কালী কামার লেখকের স্বচক্ষে দেখা চরিত্র। মনুষ্যত্বের এতটা অবনমন কোন্ পরিস্থিতি হয় সমাজমনস্ক উপন্যাসিক তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সিউড়ি আদালতের পথে তিনি দেখেছিলেন কালী কর্মকারকে। কোমরে দড়ি বাঁধা অবস্থায়, সারা শরীরে নির্যাতনের চিহ্ন নিয়ে জীর্ণবস্ত্রে আমোদপুরে বসে আছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ বন্ধুকে হাতুড়ি মেরে মাথা ফাটিয়ে গোটা গ্রামে আগুন লাগানোর। লেখক দেখেছিলেন কালীর কাহিনি যখন বলা হচ্ছে তখন সে অস্থির দৃষ্টিতে চতুর্দিক দেখছে আর স্বগতভাবে প্রশ্ন করছে—

'বাসিনীকে বেটা বামনা দিনরাত জ্বালাত কেন?
আমাকে পতিত করতে গেল কেন?
আমার ঘর আগে পুড়িয়ে দিলে কেন?'[৫]

স্পষ্টত বোঝা যায় সামাজিক অত্যাচারের স্বরূপ। পারিপাশ্বিকের অকারণ অত্যাচারের নির্মমতা শোষণের অসহনীয়তা কখনো কখনো অসহায় মানুষকে অপরাধীতে পরিণত করে তারই দৃষ্টান্ত কালী কামার। লেখক অনুভব করেছিলেন যে, রাষ্ট্রশক্তি বা সামাজিক অনুশাসনের নামে এই অধিকার হরণের প্রচেষ্টা, মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার ন্যুনতম উপকরণ ছিনিয়ে নেবার নারকীয়তা, অবাধে প্রতিনিয়ত জাতীয় জীবনকে বিপর্যস্ত করছে তার প্রতিকার হওয়া দরকার। প্রবল প্রতিরোধে গর্জে ওঠা দরকার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের।

> 'যদি কোন দিন মানুষের সাধনা বিধাতার শক্তির পরিমান নিরূপণ করতে পারে, সেদিন জেনো সে প্রতিবাদ নিশ্চয় করবে, তার সঙ্গে সে যুদ্ধ করবে।'[৬]

মানুষের এই সাধনাই সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন লেখক।

'নীলকণ্ঠ' (১৯৩৪) উপন্যাস দুটি স্বতন্ত্র কাহিনিবৃত্তের সংযোগে গড়ে উঠেছে। যোগসূত্র হরিলাল। চাষীর ছেলে শ্রীমন্ত স্বভাবে দৃঢ় হলেও সরল, পরিশ্রমী। হরিলাল শ্রীমন্তের ভগ্নীপতি। শ্রীমন্তের মা, মেয়ে রাধারানীর মৃত্যুর জন্য হরিলালকেই দায়ী করে এবং হরিলালের থেকে শ্রীমন্তের বাবার মধ্যে মধ্যে সাহায্য নেওয়ার জন্য স্বামীকে ভর্ৎসনা করেন। শ্রীমন্ত হরিলালের সংসর্গে পড়লে মায়ের তিরস্কার এবং গিরির দাম্পত্য প্রেম ক্রমশ তাকে হরিলালের থেকে সরিয়ে আনে। বস্তত শ্রীমন্তের বাবার মধ্য দিয়ে অভাবী বাৎসল্যের করুণ বাস্তবতা যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি শ্রীমন্ত-গিরির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে বাৎসল্যের অসহায়তা। শ্রীমন্ত-গিরির সুখী দাম্পত্য সমস্যা সন্তানহীনতা।

পরম স্নেহে তারা রাধারানীর কন্যা গৌরীকে সন্তানরূপে আপন করে নেয়। সুযোগ-সন্ধানী, সুবিধাবাদী, ধূর্ত হরিলাল মাঝে মধ্যেই পিতৃত্বের দাবী নিয়ে এসে শ্রীমন্ত আর গিরির থেকে নেশার টাকা জোগাড় করত। হরিলালের মধ্যে কোনো বাৎসল্য ছিল না, সে আগাগোড়া অসৎ, ফন্দিবাজ, সুযোগ-সন্ধানী, ধূর্ত। সেইজন্যই বাবা হয়েও সে টাকার জন্য গৌরীর জীবন বিপর্যস্ত করতে চেয়েছে। অথচ শ্রীমন্ত-গিরি নিজেদের জমি-জীবনের বিনিময়ে কন্যাসম গৌরীকে রক্ষা করতে চেয়েছে, প্রতিহত করার চেষ্টায় শ্রীমন্তর জেল হয়েছে। বিপিনের কু-নজরে ছারখার হয়ে গেছে গিরির জীবন, নারীত্বের মর্যাদা। সমগ্র উপন্যাসের মধ্য দিয়ে মানুষের বেঁচে থাকার তাগিদ, সংগ্রাম, বাৎসল্য, সমাজের ধূর্ত এবং উচ্চবিত্ত মানুষদের শঠতা, ফন্দিবাজি, লাম্পট্য স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরেছেন লেখক। স্পষ্টত অনুভব করা যায় লেখকের গভীর সমাজবীক্ষা।

১৯৩৫ সালে প্রকাশিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাইকমল' তাঁর কথাসাহিত্যের ধারায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। স্বল্পায়তনিক এই উপন্যাসের পটভূমি বৈষ্ণবীয় সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র রাঢ়বঙ্গের অজয় নদের তীরবর্তী অংশ। লেখকের কথায়— 'অতি প্রাচীন বৈষ্ণবের দেশ।'[৭] রাঢ়বঙ্গের ভূমিপুত্র হিসেবে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অনুভব করেছেন এই বিশিষ্ট মৃত্তিকার জনপদজীবনে সম্পৃক্ত বৈষ্ণবীয় প্রেমভাবনার অস্তিত্ব ও ঐতিহ্য। জয়দেব-চৈতন্যদেবের লীলাভূমি এই রাঢ়বঙ্গের সাধারন নরনারীর মনে রয়েছে কৃষ্ণচিন্তা আর মুখে রয়েছে হরিনাম। গলার মালা-তিলক, মুখে 'প্রভু' সম্ভাষণ, রাধে-কৃষ্ণ বলে ভিক্ষা সংগ্রহ, একতারা-খঞ্জনী সহযোগে বৈষ্ণবীয় বোল, সন্ধ্যায় বৈষ্ণবীয় আখড়ায় ধূমায়িত পদাবলী সংগীত, চণ্ডীমণ্ডপে নামসংকীর্তন— রাঢ়ের এই বিশিষ্ট সমাজজীবন অবলম্বনে গড়ে উঠেছে 'রাইকমল' উপন্যাস। রাঢ়ের সন্তান হিসাবে লেখক অনুভব করেছিলেন বৈষ্ণবীয় আখড়া-কেন্দ্রিক জীবনচর্যাকে। কালের অভিঘাতে এই আখড়া সংস্কৃতি কীভাবে তার ধর্মীয় সাধন-সংস্কৃতির ঐশ্বর্যমহিমা হারিয়ে ধর্মসাধনার নামে দেহাশ্রিত ব্যভিচার ও ভোগবাদের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল সেই সমাজ-ইতিহাসও এই উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। উপন্যাসের শেষে দেখা যায়, রাইকমল নিগূঢ় বৈষ্ণব সাধনার লোকায়ত ব্যভিচারী রূপটিকে অস্বীকার করে চৈতন্যদেব-কাঙ্ক্ষিত দেহকে আশ্রয় করে দেহাতীতের সাধনা— আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলনের সাধনায়, মহাভাব স্বরূপিনী রাধারানীকে স্মরণ করে পথে নেমেছে 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।'[৮] জ্ঞানদাসের এই অসামান্য পঙক্তি গলায় নিয়ে।

উপন্যাসটি সম্পর্কে স্বয়ং কবিগুরু লিখেছেন—

'তোমার রাইকমল আমার মনোহরণ করেছে।'[৯]

উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে বৈষ্ণবীয় সমাজের উৎসব, পর্ব, সংস্কৃতি যেমন উপস্থাপিত তেমনি মোহন্তদের ব্যভিচারী রূপটিও প্রকাশিত। এককথায় বলা যায় বীরভূমের সমাজজীবনে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত বৈষ্ণবীয় সহজিয়া সাধনার সমান্তরালে তন্ত্রসাধনার অস্তিত্বের কথা 'রাইকমল'-এ অঙ্কুরিত এবং 'রাধা' উপন্যাসে এই তত্ত্বের

পূর্ণ বিকশিত রূপ পরিস্ফুট। 'রাইকমল' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে রাঢ়বঙ্গের সমাজজীবন পূর্ণ রূপে প্রতিবিম্বিত।

'প্রেম ও প্রয়োজন' উপন্যাসে লেখক নলিনী, রমা, মহেন্দ্র, সঞ্জীব প্রভৃতি চরিত্রের মধ্য দিয়ে সেদিনের গ্রামজীবনের অর্থের দম্ভে সংঘটিত পাপ-অনাচার-ষড়যন্ত্র ও শোষণের কর্দমাক্ত রূপ তুলে ধরেছেন! কড়ি গাঙ্গুলী অর্থাৎ এককড়ি গাঙ্গুলী এই উপন্যাসে ভদ্র ভাষায় বলা যায় সুযোগ-সন্ধানী, ধূর্ত, দালাল। রমণদাসকে লোভ দেখিয়ে, ভুল বুঝিয়ে সেই নিয়ে এসেছিল বিধবা রমাকে মহেন্দ্রবাবুর দরবারে। ক্ষণে ক্ষণে বোল এবং ভোল পালটিয়েছে এককড়ি। জমিদার মহেন্দ্রবাবু চরিত্রের মধ্য দিয়ে অর্থ ও ক্ষমতার দম্ভ, অসহায় মানুষকে শোষণ, চারিত্রিক লাম্পট্য ও অত্যাচারী মনোভাব সুস্পষ্ট। স্পষ্টতই বোঝা যায় শ্রেণি চরিত্র অঙ্কনে লেখক বাস্তব সমাজ অভিজ্ঞতাকেই কাজে লাগিয়েছেন। নারীর দৃপ্ত রূপ প্রকাশিত সঞ্জীবের মায়ের মধ্য দিয়ে। ঠিক যেন লেখকের মাতৃরূপের প্রক্ষেপণ। সঞ্জীব চরিত্রের মধ্য দিয়ে সমকালীন তরুণ প্রজন্মের মানসিক দায়, দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা, সমাজ-সংশোধনের প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। প্রেম এখানে প্রয়োজনের মানদণ্ডে বিকিকিনির বস্তু। সমকালীন সমাজের পরিপূর্ণ দর্পণ 'প্রেম ও প্রয়োজন' উপন্যাসটি।

১৯৩৭ সালে রচিত 'আগুন' উপন্যাসটি দেশ পত্রিকায় 'কালপুরুষ' নামে প্রকাশিত হয়। পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে 'আগুন' নামটি দেওয়া হয়। 'আগুন' আসলে মানবমনের অন্তরে নিয়ত প্রজ্জ্বলিত প্রবৃত্তিরূপিনী লেলিহান শিখা। প্রবৃত্তি মানুষের মনের চালিকাশক্তি, যা নিয়তি রূপে মানবজীবনের গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। স্মৃতিচারণার রীতিতে বর্ণিত এই উপন্যাসের কথক নরেশ মুখোপাধ্যায়। নরেশের সহপাঠি হীরু, চন্দ্রনাথ এবং চন্দ্রনাথের দাদা নিশানাথ— এই তিনজনের প্রবৃত্তিতাড়িত জীবনপ্রবাহ এই উপন্যাসে বর্ণিত। চন্দ্রনাথের মন যশবহ্নির কাছে, নিশানাথের মন ধর্মবহ্নির কাছে আর হীরুর মন কামবহ্নির কাছে উদভ্রান্তের মতো আত্মসমর্পন করে পরশপাথর খোঁজার মতো আপন আপন কক্ষপথে শুধু ছুটে চলেছে, প্রাপ্তির তৃপ্তি কখনো পায় নি। কামনার চিতায় দাউ দাউ করে জ্বলেছে নিজেরা, জ্বালিয়েছে তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রত্যেকটি জীবনকে। মীরা, নিশানাথের পরিবার, যাযাবরীর মতো চরিত্রেরা এদের সংস্পর্শে এসে নিঃশেষ হয়ে গেছে তবুও তাদের মনের আগুন নির্বাপিত হয় নি, উভ্রান্ত কামনার কক্ষপথ থেকে তারা চ্যুত হয় নি। সমাজে থেকেও এরা সমাজের কোনো কাজে আসে না, গড়তে গিয়েও ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায় শুধুমাত্র কামনার মোহে। প্রবৃত্তিতাড়িত এই রূপটি লেখকের চেতনায় চিরনিন্দিত। 'আগুন' উপন্যাস যেন সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ লেখকের সারস্বত প্রচেষ্টা দেশীয় জনজীবনকে প্রবৃত্তি-রূপ দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত রাখার। উপন্যাসটি আজও প্রাসঙ্গিক। জীবনে এই অকারণ প্রবৃত্তির মোহে সারাজীবন প্রাপ্তির কামনায় উদ্দেশ্যহীন কক্ষপথে নিরন্তর ছুটে চলে মানুষ শুধু প্রাণশক্তির অপচয়ই করে, বহুমূল্যের এই মানবজীবন পরিবারের, সমাজের বা দেশের

কোনো কাজে আসে না, কিছু সৃজন করে না। সমগ্র উপন্যাসের মধ্য দিয়ে জীবনের এই সারসত্যই তুলে ধরেছেন লেখক।

১৯৩৯ সালে রচিত 'ধাত্রীদেবতা' তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য-ধারায় মাইলস্টোন বলে বিবেচিত। 'ধাত্রীদেবতা'-য় লেখকের স্বকীয় দেশতত্ত্ব, কালতত্ত্ব এবং রাঢ়ীয় জীবনভাবনা সংমিশ্রিত হয়ে জীবনের 'ধাত্রীদেবতা'-য় পরিগণিত হয়েছে। উপন্যাসের সূচনায় রাঢ়ের যে ভূমিপ্রকৃতিকে লেখক বলেছেন—

> 'রাজরাজেশ্বরী অন্নপূর্ণা ষড়ৈশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়া যেন ভৈরবীবেশে তপশ্চর্যায় মগ্ন।'[১০]

উপন্যাসের শেষে সেই দেশমাতৃকার উদ্দেশ্যেই প্রণত হয়েছেন, বলেছেন—

> 'জীবের ধাত্রী যিনি ধরিত্রী, জাতি মধ্যে তিনিই তো দেশ, মানুষের কাছে তিনি বাস্তু।'[১১]

দেশকে মাতৃরূপে বন্দনা করে, স্বভূমিকে ভালোবেসে মৃত্তিকার সঙ্গে, মৃত্তিকালগ্ন মানুষদের সঙ্গে বন্ধনে জড়িয়েছেন নায়ক শিবনাথ। 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে লেখকের আত্মপ্রক্ষেপণ সবথেকে বেশি। এই উপন্যাসে শুধু শিবনাথ চরিত্রেই যে তারাশঙ্করবাবুর আত্মপ্রক্ষেপণ ঘটেছে তা নয়, পিসিমা চরিত্রে লেখকের পিসিমা শৈলজাদেবীর, শিবনাথের মায়ের চরিত্রে লেখকের মা প্রভাবতী দেবীর, শিবনাথের স্ত্রী গৌরীর চরিত্রে লেখক-পত্নী উমা দেবীর, এবং শিবনাথ-গৌরীর দাম্পত্য জীবনে লেখকের ব্যক্তিক জীবনের প্রত্যক্ষ ছায়াপাত লক্ষ করা যায়। এই উপন্যাসের অধিকাংশ পাত্র-পাত্রী উচ্চবর্গীয়। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত বংশের সন্তান তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের জীবনে জমিদারীর অন্তঃসারশূন্য মর্যাদা ও আভিজাত্য, ক্ষমতার দম্ভ প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাই তাঁর সৃষ্ট উপন্যাসে পিসিমা শৈলজা দেবী অনায়াসে বলেন 'বিষয় বাপের না, বিষয় দাপের।'[১২] তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধি শিবনাথ কলকাতায় পড়তে গিয়ে বিপ্লবীমন্ত্রে প্রাণিত হয়। দেশ ও দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে চায়। দীপ্ত কণ্ঠে শিবনাথ ঘোষণা করে— 'না খাব উচ্ছিষ্ট ভাত, না দিব চরণে হাত।'[১৩] এই প্রবল আত্মসম্মানবোধ, ইস্পাতের মতো কঠিন, তীক্ষ্ণ, পৌরুষদীপ্ত প্রখরতা শিবনাথ চরিত্রে সঞ্চারিত হয়েছে তার মা ও পিসিমার থেকে। শিবনাথ স্পষ্ট ভাষায় গৌরীকে বলেছিল— 'এ মাটি ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারবো না।'[১৪] শিবনাথের মধ্যে জমিদারীর আভিজাত্য-মর্যাদাবোধ থাকলেও মায়ের শিক্ষাগত দেশপ্রেম ও জনহিতৈষণার চেতনাও ছিল। তাই সে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করে। ব্যবসায়ীর কন্যা গৌরীকে স্বামীর অধিকারে বলে— 'আমার জীবনে অর্থ উপার্জনটাই সবচেয়ে বড় জিনিস নয়। তার চেয়ে বড় কাজ আমি করতে চাই।'[১৫] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিনের তরুণ প্রজন্মের মর্মে উদ্রিত স্বাধীনতার আকাঙ্খা এবং স্বাধীনতার স্পৃহায় অনায়াসে দেশের সেবায় আত্মনিবেদনের উদ্দীপনা শিবনাথ চরিত্রের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। সামন্ততান্ত্রিক রূঢ় সমাজব্যবস্থার রূপ যেমন এসেছে, তেমনি এই উপন্যাসে এসেছে দেশের বাস্তবতা

ও অনিবার্যতা, সামাজিক জীবন বিন্যাস ইত্যাদি বিবিধ প্রসঙ্গ। সুশীল শিবনাথের বিবাহ হয়ে গেছে শুনে বিস্ময় প্রকাশ করেছে যে উপার্জনশীল না হয়ে বিয়ে কি করে সম্ভব— এই চেতনা একদিকে যেমন সমাজে বাল্যবিবাহের অস্তিত্বের জানান দেয়, অন্যদিকে কালের পরিবর্তনের তরঙ্গে তরুণ প্রজন্মের ক্রম পরিবর্তনশীল মানসিকতারও আভাস দেয়। ডোমপাড়া, বাউরীপাড়া, মুচিপাড়া প্রভৃতি বিভাজন, মহামারীর মারণ যজ্ঞ, কলেরা আক্রমণের মধ্যেও ফ্যালার ভাইদের মদ খাওয়ার জন্য পয়সা গোছানো, শবদেহ দাহ করার জন্য লোক-পরিজনের অপ্রতুলতা, প্রজাদের এই দুর্দিনে জমিদার শিবনাথের অন্ন-জল-ওষুধ-পথ্য-সেবা দানের সংকল্প এবং দলবল নিয়ে ভিক্ষা করে দেশসেবাব্রত গ্রহণ, শিবনাথের স্পর্শে পিসিমারও মন পরিবর্তন, মেডিকেল স্টুডেন্টদের স্বেচ্ছাসেবীব্রত, অন্যদিকে সামাজিক সংস্কার অনুযায়ী অমাবস্যায় রক্ষাকালীর পুজোর আয়োজন, শিবনাথের 'আজি দেশের সর্বত্র শ্মশান— তাই মা কঙ্কালমালিনী'[১৬]— কালীমাকে দেশমাতার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেখার উপলব্ধি, কালবৈশাখী ঝড়ের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়, জমিদারদের খাজনা আদায়ের কঠোরতা, কৃষকদের সমস্যা-মেয়েদের জীবনের বঞ্চনা, নগরজীবনের আপাত চাকচিক্য, কিছু সুবিধাবাদী মুষ্টিমেয় মানুষের অর্থলিপ্সা, স্বার্থান্ধতা, ইংরেজদের স্তাবকতা, কয়লার চোরাবাজারি, বিপ্লববাদ স্তব্ধ করার জন্য প্রশাসনিক তৎপরতা, ধরপাকড়, সহিংস বিপ্লববাদ থেকে সরে আসার প্রতিবন্ধকতা, মেয়েদের বহুকাল পর্যন্ত পিত্রালয়ে থাকার সামাজিক রেওয়াজ— এককথায় সেদিনের সামাজিক-রাজনৈতিক ও আর্থিক পরিকাঠামো বাস্তবনিষ্ঠ প্রাঞ্জল ভাবে তুলে ধরেছেন লেখক। বস্তুত এই উপন্যাস লেখকের সমাজ-সংস্কৃতি, দেশতত্ত্ব, কালতত্ত্ব ও বাস্তবতা বোধের সংমিশ্রিত দলিল। 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে রাঢ়বঙ্গ যেন স্বমর্যাদায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

'কালিন্দী' (১৯৪০) উপন্যাস লেখকের এই চেতনার রঙে রঞ্জিত আর এক অধ্যায়। 'কালিন্দী'-তে লেখক ফিরে তাকিয়েছেন সামন্ততন্ত্র-ধনতন্ত্র এবং প্রান্তিক মানুষের সনাতন দ্বন্দ্বের দিকে। উপন্যাসে শুরুতেই দেখা যায় 'কালিন্দীর ওপারে চর জাগিয়াছে'[১৭] এবং সমগ্র উপন্যাস আবর্তিত হয়েছে এই সদ্যোত্থিত চরের উপর অধিকার সাব্যস্ত করাকে কেন্দ্র করে পরস্পর যুযুধান জমিদার, চাষী-ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের নির্মমতা, ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার্থে পেশী শক্তির প্রয়োগ, বুদ্ধিদীপ্ত ষড়যন্ত্র, জটিল কুটিল স্বার্থান্ধ চক্রান্ত ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে। লেখক গভীর মমতায় দেখিয়েছেন অসহায় মানুষের শোষিত জীবনের চালচিত্র। নদীগর্ভে বিলীন জমি যতদিন সাপ-শ্বাপদ সংকুল জঙ্গলাকীর্ণ ছিল ততদিন জমিদার, মহাজন, চাষী, ব্যবসায়ী কেউ ফিরেও তাকায়নি। কিন্তু যখন দরিদ্র, অনার্য সাঁওতালেরা এসে তাদের অক্লান্ত শ্রমে জঙ্গল সাফ করে, অস্থায়ী বসতি স্থাপন করে, কৃষিকাজ শুরু করে এবং নদীগর্ভস্থ থাকার ফলে পলি-স্তরীয় মৃত্তিকা গুণে উর্বর হওয়ায় 'স্বর্ণ ফসলা' হয়ে ওঠে তখন এই সুবিধাবাদী শ্রেণি এসে পড়ে অধিকার সাব্যস্ত করতে। তাদের শোষণ লিপ্সার পেষণ যন্ত্রে শান্তির

লোকায়ত নীড় অশান্তি-ষড়যন্ত্র-মৃত্যুর কুরুক্ষেত্র হয়ে ওঠে। চির ভূমিহীন অনার্য কৃষ্ণকায় মানুষগুলি অর্থ-নারী-প্রাণ-গৃহ সবকিছু হারিয়ে রাতের অন্ধকারে আবার বেরিয়ে পড়ে অনিশ্চয়তার নতুন রাস্তায়। শ্রেণি-শোষণ, অকারণ খাজনা আদায়ের জুলুমবাজি, বিত্তবানের ক্ষমতা ও নারীলিপ্সা, গরীব নিরাশ্রয় মানুষগুলোকে প্রতারণা করে টিপছাপ লাগিয়ে তাদের সবকিছু থেকে বঞ্চিত করা, সাঁওতাল নারীদের বাসনার সামগ্রীতে পরিণত করা এবং অহিংসাবাদের অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে যুগের পরিবর্তনের বাস্তব চিত্র এই উপন্যাসে লেখক মানবিক প্রত্যয়ে তুলে ধরেছেন। 'কালিন্দী' লেখকের দেশতত্ত্ব ও কালতত্ত্বের নিজস্বতায় ভাস্বর।

১৯৪২ সালে প্রকাশিত 'কবি' উপন্যাস এক নতুন ভাবের পটভূমি সৃষ্টি করেছিল। রাঢ়বঙ্গের আনাচে কানাচে কান পাতলে শোনা যায় কবিগান, ঝুমুর গান, পাঁচালী, নগরকীর্তন ইত্যাদি পরম্পরা। সেদিনের সমাজজীবনে ছিল মেলা সর্বাধিক জনপ্রিয় গণমাধ্যম। মেলার মধ্য দিয়ে ভাবের, সংস্কৃতির আদান-প্রদান যেমন হতো তেমনি মেলার মধ্য দিয়ে জীবিকা সংস্থানও হতো। মেলা যেন গ্রামসমাজের সজীবতার প্রতীক। 'কবি' উপন্যাসে অট্টহাস গ্রামের মাঘী পূর্ণিমায় সংঘটিত চামুণ্ডা পুজো উপলক্ষ্যে আয়োজিত মেলায় বায়না করা কবিয়াল নোটনদাস যখন বেশী পয়সার বায়না পেয়ে অন্য মেলায় চলে যায় তখন আসরের অধৈর্য জনতার মনোরঞ্জনার্থে মোহান্ত মহাদেব কবিয়াল ও তার প্রধান দোয়ারের মধ্যে কবিগান হবে ঘোষণা করেন, এবং সেই আসরের দোয়ারকির দায়িত্ব পড়ে নিতাই বা নিতাইচরণের। নিতাই স্বভাব কবি। জন্ম তার ডোম বংশে। শিক্ষার সুযোগ তার সেভাবে হয়নি, তবু যৎসামান্য শিক্ষা সে লাভ করেছিল 'স্থানীয় জমিদারের মায়ের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত নৈশ বিদ্যালয়ে'[১৮] প্রায় বছর দুয়েক। এই ক'বছরে তার পাঠানুরাগ তাকে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণকাহিনী, কবিগান ইত্যাদি বিষয়মনস্ক করে তুলেছে। লেখক যে সময়ের কথা বলেছেন তখন বাংলার গ্রামসমাজে, নগর-জীবনে কবিগানের বিশেষ প্রাধান্য। বিশেষত 'বাংলার সমগ্র অশিক্ষিত সম্প্রদায়ই কবিগানের ভক্ত। কিন্তু সে ভক্তি তাহাদের অশ্লীল রসিকতার প্রতি আসক্তি।'[১৯] বস্তুত সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবিগান ছিল বিনোদন সংস্কৃতির জনপ্রিয় অধ্যায়। মুখে মুখে গান বেঁধে প্রতিযোগিতার আসরে দুই দল পরস্পর পরস্পকে শ্লেষমূলক বাদ-প্রতিবাদে, ব্যঙ্গে-বিদ্রুপে জর্জরিত করার সময় অনায়াসে ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করে শুধু যে খিস্তি-খেউর করত তাই নয়, জনমনোরঞ্জনার্থে বিকৃত আদিরসাত্মক স্থূল কামনার উদগ্র উন্মত্ত প্রকাশও ঘটাত। বীরভূমে এই ধারাটির অস্তিত্ব মিশে গিয়েছিল ঝুমুর দলের সঙ্গে— 'ঝুমুর না হলে মেলা হয় না। কবিও হয় না।'[২০] নিতাইও প্রথম প্রথম একা একা গান বেঁধেছে, পরবর্তীতে ঠাকুরঝিকে কেন্দ্র করে তার কবিয়াল সত্তা যেন সমৃদ্ধ হয়েছে। কিন্তু যখন সে অনুভব করেছে, ঠাকুরঝির প্রতি তার মনের টান এবং ঠাকুরঝির দাম্পত্যজীবনে অশান্তির কারণ এই পারস্পরিক অব্যক্ত চেতনা— তখন সে ঝুমুর দলকে কেন্দ্র করে কবিয়ালী

করতে গ্রাম ছেড়েছে। প্রথমে ঠাকুরঝি, পরে বসন্ত— এই দুজনকে কেন্দ্র করে নিতাইয়ের কবিয়াল সত্তা প্রাণ পেয়েছে। ধীরে ধীরে কবিগানের সূক্ষ্ম রসতত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রেখে আসরোপযোগী আদিরসাত্মক খিস্তি খেউরের মিশ্রণে দেহাত্মবাদী তীক্ষ্ণ শব্দের গান সে রচনা করতে শুরু করল। সময় ও আসরের চাহিদা মেটাতে নিতাই পঙ্কিল স্রোতে অবগাহন করেছে আর মনের ক্ষিদে মেটাতে লক্ষ্মীর পাঁচালী যেমন লিখেছে তেমনি লিখেছে— 'জীবন এত ছোটো কেনে'[২১] বা 'ভালবেসে মিটল না সাধ'[২২] ইত্যাদি অজস্র দার্শনিক জীবনসত্যের গান। 'কবি' উপন্যাসে মেলাসংস্কৃতি, ঝুমুর দলের জীবনযাত্রা, কবিয়াল হয়ে ওঠার জীবন সংগ্রাম, ঠাকুরঝি বা রাজা পয়েন্টম্যানের মতো সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের জীবনযাত্রার যে বর্ণনা আছে তা বাস্তব জীবনসঞ্জাত। লেখকের প্রখর সমাজবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী এই সব বর্ণনার মধ্য দিয়ে প্রতিভাত।

১৯৪২-১৯৪৪ এই কালপর্বে রচিত 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'মন্বন্তর', 'সন্দীপন পাঠশালা' উপন্যাসগুলিকে কেন্দ্র করে রাঢ়ের সমাজজীবন, সংস্কৃতি, গ্রামীন রাজনীতি, দলাদলি, অন্ধসংস্কার, কালচেতনা এবং সাধারণ মানুষ সম্পর্কে লেখকের ঋদ্ধ জীবনচেতনা প্রকাশিত হয়েছে। 'গণদেবতা' রাঢ়বঙ্গের এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বাঙালি জনজীবনের যুগান্তরের ইতিহাস। গণদেবতা কোনো লৌকিক বা পৌরাণিক দেবতা নয়, গণদেবতা গোষ্ঠীজীবনের গণশক্তির উত্থান— দেবু, বিলু, অনিরুদ্ধ, পদ্ম, পাতু, গিরিশ, সতীশ, দুর্গা, চৌকিদার, কামার প্রভৃতি চরিত্রগুলিই লেখকের গণদেবতা। উপন্যাসের কেন্দ্রে দেবনাথ ঘোষ চরিত্রটি থাকলেও লেখক এখানে প্রচলিত একনায়কতন্ত্রের রীতি ভেঙে বহুনায়কতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। গণদেবতা তাই সাধারণ মানুষের জীবনছন্দের চালচিত্র। রাঢ়ের সন্তান তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় গভীর মমতায় অনুভব করেছিলেন জাতীয় জীবনের রাজনৈতিক উত্থান-পতনের সমান্তরালে প্রবাহিত গ্রামীন জীবনের তথাকথিত রীতি-নীতি-জাত-ধর্ম সর্বোপরি ধনতন্ত্রের দম্ভ ও নির্যাতনের চণ্ডীমণ্ডপরূপ শাসনযন্ত্রের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যুযুধান সাধারন মানুষের বন্ধনশক্তির বাস্তব সংঘর্ষ। গণদেবতা সেই চিন্তারই ফসল। এই উপন্যাসে বাস্তবনিষ্ঠ ভাবে বর্ণিত হয়েছে গ্রামীন জীবনে চণ্ডীমণ্ডপের অবদান। এই চণ্ডীমণ্ডপেই বসে গ্রামীন বিচারসভা, পাঠশালা বসার অনুমতিও আছে, চণ্ডীমণ্ডপকে কেন্দ্র করেই আয়োজিত হর রোগীর সেবা প্রকল্প, পুজো-পার্বন প্রভৃতি। চণ্ডীমণ্ডপ আসলে গ্রামীন জীবনে যৌথ কর্তৃত্বের দাবী রাখত। কালের বিবর্তনে গ্রাম-সমাজের সনাতনী মূল্যবোধ যেমন বিপর্যস্ত হয়েছে তেমনি লেখক দেখিয়েছেন কীভাবে বিবর্তনের মুখে ধনের অসাম্যে সমষ্টিকেন্দ্রিক চণ্ডীমণ্ডপ ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে গেছে। ফসলের উত্থান-পতনে সাধারণ কৃষিজীবী মানুষের জীবনছন্দের তারতম্য, হাড়ি-বাউড়ি-ডোম-বায়েন প্রভৃতি নিম্নবর্গীয় মানুষগুলির দৈনন্দিন জীবনধারণের সংগ্রাম, তাদের মেয়ে-বৌদের মাছ ধরে নানারকম উঞ্ছবৃত্তির মধ্য দিয়ে সংসার পালন, আলু চাষ, বিনিময় প্রথা, ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্সের নামে শাসনযন্ত্রনা, যুদ্ধের বাজারে মূল্যবৃদ্ধি, একশ্রেণির মানুষের স্বার্থসিদ্ধির কৌশল, কঙ্কনার বাবুদের

হঠাৎ বাড়বাড়ন্ত, জলের দরে বহু জমি আত্মসাৎ করা, অসহায় মানুষদের অনায়াসে প্রবঞ্চনা করা, নারীর অবচেতন মনের হিংসা, হরিজনপল্লির মজলিস, ধর্মঠাকুরের গাজনতলা, গ্রামীন জাতিগত বিদ্বেষ, ধর্মের প্রতি-কুসংস্কারের প্রতি মানুষের অবিচল বিশ্বাস ও নিষ্ঠা, পৌষলক্ষ্মী পুজো ইত্যাদি নানা রকম প্রসঙ্গের বাস্তব জীবনালেখ্য এই উপন্যাসে আছে। সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে লেখক দেখিয়েছেন কীভাবে পরিবর্তনশীল অর্থনীতি মূল্যবোধকে বিপর্যস্ত করছে। সংসারের প্রয়োজনে অর্থ ও বলের কাছে নতি স্বীকার করে মা-শাশুড়িরাই মেয়ে-বৌদের পথভ্রষ্ট করে স্বৈরিনী করে, সমাজ-পরিবার সেই স্বৈরিনীর প্রতি যতই বিরূপ থাক, তারই উপার্জিত অর্থ-ক্ষমতা প্রয়োজনে পরিবার ও গ্রামসমাজে কাজে লাগায় মূল্যবোধের এই অবক্ষয় বিবেকের এই অবনমন মহাযুদ্ধোত্তর বিপর্যস্ত আর্থ-সামাজিক জীবন বাস্তবতা। গ্রাম-শহর সর্বত্র মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়েছিল এই অবক্ষয়িত বিপর্যস্ত, অবনমিত মূল্যবোধ। ‘গণদেবতা’-‘পঞ্চগ্রাম’ এই চেতনারই কথারূপ। নারীর কল্যাণময়ী প্রসন্নতা ও শক্তিরূপিনী বলিষ্ঠতা দুই-ই এই উপন্যাসে বিকশিত। বিংশ শতাব্দীর দেশীয় জীবনের ঘূর্ণাবর্ত, কলেরার মহামারণ রূপ, নানাধরনের গ্রামীন ব্রত-সংস্কারের বাস্তব রূপ এই উপন্যাসের বিশেষ সম্পদ। এককথায় বলা হয় রাঢ়বঙ্গকে কেন্দ্র করে সমগ্র জাতির সামাজিক জীবনের দর্পণ ‘গণদেবতা’।

‘পঞ্চগ্রাম’ ‘গণদেবতা’ উপন্যাসেরই উত্তরখণ্ড। ‘গণদেবতা’-র শেষ পঙ্‌ক্তিতে দেবু ন্যায়রত্ন বাড়ির রথযাত্রার ঢক্কনিনাদ শুনেছিল আর পঞ্চগ্রাম শুরুই হয়েছে আষাঢ় মাসে সংঘটিত হিন্দুদের সার্বজনীন উৎসব জগন্নাথদেবের রথযাত্রা দিয়ে। রথযাত্রা বাংলার বিশেষত গ্রামবাংলার প্রাণের উৎসব। সেই উপলক্ষ্যে আয়োজিত স্নানযাত্রা, সংকীর্তন, মেলা প্রভৃতির বিশদ পরিচয়ের মধ্য দিয়ে সমাজজীবনের পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়। প্রসঙ্গক্রমে এসেছে দুর্গাপুজো, বাসন্তী পুজো, ঝুলন যাত্রা প্রভৃতি ধর্মীয় জীবনের নানা প্রসঙ্গ। সেটেলমেণ্ট সার্ভে, খাজনা বৃদ্ধি, পরচা নিয়ে সংকট ইত্যাদির মধ্যে দুর্গত, বিব্রত জনজীবনের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন লেখক। খাজনা বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে প্রজাদের গণপ্রতিরোধ-শিবকালীপুরের প্রজাদের নিজেদের অস্তিত্বরক্ষার সমবেত প্রয়াস, প্রয়োজনে আইনরক্ষক বদলের দাবি, ধনতন্ত্রের সুযোগ সন্ধানী, ষড়যন্ত্রকারী রূপ, প্রলোভন, যুগের পরিবর্তনের ঢেউয়ে শতাব্দীপ্রাচীন ধর্মাচরণ-পুজো পদ্ধতি, আচার-বিশ্বাসের প্রতি মানুষের আস্থাহীনতা-ক্রমান্বয়ে কমিউনিজমের উত্থান, স্বার্থের মানদণ্ডে মানবিক বিবেক বুদ্ধির লোপ— সামগ্রিকভাবে সমাজ-মানুষের যুগানুগ এক অবক্ষয়ের চিহ্ন ‘পঞ্চগ্রাম’ উপন্যাসে বিধৃত। নিম্নবর্গীয় মানুষদের, বিত্তহীন মানুষদের জীবনসংগ্রাম, বেঁচে থাকার তাগিদে অপরাধ প্রবণতা, জমিদার-মহাজনদের অত্যাচার, ব্যবসায়ীদের আগ্রাসন সমাজের এই বিত্তহীন, মন্ত্রহীন মানুষগুলিকে কীভাবে নিরন্নতা, বিপন্নতা, নীতিহীনতার পথে ঠেলে দিয়েছিল এই উপন্যাসের পরতে পরতে ছড়িয়ে রয়েছে তারই

বাস্তবনিষ্ঠ পরিচয়। বস্তুত সমগ্র জাতীয় জীবনের বিপর্যয় এবং মানুষের প্রবল প্রতিরোধে ঘুরে দাঁড়ানোর ইতিহাস 'পঞ্চগ্রাম'।

'মন্বন্তর' তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম নগর কলকাতা কেন্দ্রিক উপন্যাস। রাঢ়ের জীবন যেমন তাঁর চেতনায় আবাল্য থেকে সম্পৃক্ত ছিল তেমনি কর্মসূত্রে কলকাতায় বসবাস তাঁকে নগরজীবনের সঙ্গেও সম্পৃক্ত করে তুলেছিল। তাই খুব সহজেই ক্রান্তদর্শী কথাসাহিত্যিক দেশের ক্রান্তিলগ্নে জাতীয় জীবনের আলোড়নের মধ্যেই তাঁর স্বভূমি তথা সমগ্র জাতির হৃৎস্পন্দন ও বিপর্যয় অনুভব করেছিলেন। 'মন্বন্তর' তারাশঙ্করের বন্দ্যোপাধ্যায় কালতত্ত্ব, ভারততত্ত্ব ও ইতিহাস বোধের সংমিশ্রিত রূপ। গভীর সমাজবীক্ষা জারিত করেছে তাঁর এই সংমিশ্রিত চেতনাকে। এই উপন্যাস আবর্তিত হয়েছে চারটি কলকাতাবাসী পরিবারের জীবন-পরিণতিকে কেন্দ্র করে। পরস্পর বিচ্ছিন্ন-অপরিচিত এই চারটি পরিবারের একমাত্র সংযোগ সূত্র কানাই চক্রবর্তী। ধনতন্ত্রের দম্ভ, ইন্দ্রিয়াসক্তি, ব্যভিচারী, উচ্ছৃঙ্খল জীবনের ব্যাধিগ্রস্ততার উত্তরাধিকারিত্ব কানাইকে বিকারগ্রস্ত করেছে, যৌথজীবনে যেতে সে ভয় পায়। কিন্তু কানাই আর গীতা সময়ের প্রেক্ষিতে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। গীতার বাবা প্রদ্যোত ধনের দম্ভে অনিয়মিত জীবন ও শঠতার পথে চলে আজ বিত্তহীন, বস্তীবাসী। কানাই, নীলা, নেপী দেশসেবাব্রতে, জনসেবাব্রতে আত্মনিয়োগ করেছে। কমিউনিস্ট আদর্শের প্রতীক বিজয়বাবুর সঙ্গে তাদের আদর্শগত সংযোগ। অমর কূটনৈতিক, লম্পট, বিলাসী, সুবিধাবাদী ধনতন্ত্রের প্রতীক। কালের বিনাশ শক্তিকে নিজের কর্মতৎপরতায় ব্যবসায়িক সমৃদ্ধির মূল উপকরণে পরিণত করেছে অমর, এর জন্য বিসর্জন দিয়েছে মানবিক মূল্যবোধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত জীবনের চরম বাস্তবতা অঙ্কন করেছেন ঔপন্যাসিক। যুদ্ধের বাজারে সাধারণ জনজীবনের অর্থকষ্ট, অন্নকষ্ট, নৈতিক অধঃপতন, খাদ্যবস্তুর অকারণ মূল্যবৃদ্ধি মানুষকে ক্রমান্বয়ে নিম্নবিত্ত থেকে বিত্তহীন এবং সর্বরিক্ত ভিক্ষুকে পরিণত করেছে; দেহব্যবসার দিকে, সধবা হয়েও বিধবা সেজে ভিক্ষা করার দিকে, কন্ট্রোলদরের চিনি ব্ল্যাক করার দিকে অর্থাৎ নানা ধরনের অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে। সমাজজীবনের এই সামগ্রিক বিপর্যয়ের বাস্তবনিষ্ঠ দলিল 'মন্বন্তর' উপন্যাস। ১৯৪২-৪৩ -এর কলকাতা মহানগরীর চরমতম বিপর্যয়, জাপানের বোমা বর্ষণ, ব্ল্যাকআউটের মতো দুর্দিনে, শহরের এই চরম সঙ্কটময় দিনে দলে দলে মানুষের ভিটেমাটি ছেড়ে প্রাণরক্ষার্থে পালিয়ে যাওয়া, বিপ্লবীদের অকারণে আগস্ট আইনে আটক করে স্বাধীনতা সংগ্রামের গতিপথ রুদ্ধ করার সরকারী অপচেষ্টা, যুদ্ধের ভয়াবহতা, দেশীয় রাজনীতির বাস্তবিকতা এই সব কিছুর বিশ্বস্ত চিত্র 'মন্বন্তর' উপন্যাসে বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন ঔপন্যাসিক। সমস্ত বিপর্যয়, সংঘর্ষ, মৃত্যু, বিভীষিকার পরেও মানুষ বেঁচে থাকবে মানবমুক্তির প্রত্যাশা নিয়ে— এই আশাবাদে জারিত উপন্যাসটি। ভারতের চিরন্তন অমৃত সাধনার পথে সূচিত হবে 'সত্যব্রতের'[২৩], 'নূতন কালের'[২৪], 'নূতন মনুর'[২৫] — এই ইতিবাচক

প্রত্যয়দীপ্ত আশ্বাসে শেষ হয়েছে ‘মন্বন্তর’ উপন্যাস। জয়যুক্ত হয়েছে লেখকের মানব-মহিমা প্রতিষ্ঠার চিরায়ত প্রয়াস।

সমকালীন যুগের বাস্তব ছবি, যুদ্ধের ভয়াবহতা, দেশীয় রাজনীতির বিভিন্ন পর্যায়, অহিংস আন্দোলন, সহিংস বিপ্লববাদের প্রতি অনাস্থা এবং ভারতের চিরন্তন কল্যাণ ও মঙ্গলের আদর্শের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস ‘সন্দীপন পাঠশালা’ উপন্যাসের গল্পবৃত্ত গড়ে তুলেছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্বভূমি রাঢ়বঙ্গকে সব থেকে বেশি জেনেছিলেন, খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন মৃত্তিকা সংলগ্ন মানুষগুলোকে, তাদের জীবনবাস্তবতাকে, প্রতিদিনের বেঁচে থাকার সংগ্রাম ও প্রতিকূলতাকে। ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবংশের সন্তান হওয়ার সূত্রে জমিদারদের বাহ্যিক আড়ম্বর-দম্ভ-বিলাসিতা-সাধারণ জনজীবনের প্রতি উন্নাসিকতাও তাঁর অজানা ছিল না। ঘনিষ্ঠ ভাবে অনুভব করেছিলেন ধনতন্ত্রের হাতছানিতে হঠাৎ বড়োলোক হওয়ার উন্মত্ততা এবং তারই সূত্রে অপসংস্কৃতি আয়ত্ত করার যুগগত প্রবণতাকে। উপলব্ধি করেছিলেন সমাজজীবনের এই ক্রম পরিবর্তন গ্রামীন উচ্চবর্গের মানুষদের যেমন বুদ্ধিনাশ করেছিল তেমনি খেটে খাওয়া মানুষদের সংগ্রামের পরিমান আরো বৃদ্ধি করেছিল। যুগের পরিবর্তনের ঢেউ মৃত্তিকালগ্ন এই খেটে খাওয়া মানুষগুলোর অবস্থানের কোনো পরিবর্তন ঘটায়নি। গ্রামীন সমাজে জাত-পাতকে কেন্দ্র করে বৈষম্য, নিম্নবিত্তের প্রতি উচ্চবিত্তের উন্নাসিকতা, নিম্নবর্ণের শিক্ষার্জনের পথে উচ্চবর্ণের অসন্তোষ-অনীহা-বাধাদান প্রতিমুহূর্তে লেখককে ব্যথিত করেছিল। ‘সন্দীপন পাঠশালা’ উপন্যাসে সেই চেতনাকে তিনি রূপদান করেছেন। পাশাপাশি দেখিয়েছেন জাতীয় জীবনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, দেশের সংকট, বিশ্বের সংকট গ্রামীন জীবনকে সেভাবে বিচলিত করতে পারেনি কিছুটা সমন্বয় বিধানের অভাবে। গ্রামজীবন আলোড়িত হয়েছে মূল্যবৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে। সীতারামের প্রচেষ্টা যেন লেখকেরই প্রচেষ্টা। তিনি বুঝেছিলেন, সর্ব শিক্ষার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষকে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানে সুস্থিত করতে না পারলে ভারতীয়ত্বের স্বরূপ তাদের অধরা থেকে যাবে। বৈষম্য-অসাম্য দূর করতে হবে রক্তাক্ত পথে নয়, অহিংস পথে কল্যাণ ও মঙ্গলের সনাতনী আদর্শ দিয়ে, মানুষকে ভালোবেসে আত্মার আত্মীয় করে। ‘সন্দীপন পাঠশালা’ উপন্যাসের মধ্য দিয়ে এই সমন্বিত জীবনচেতনার প্রকাশ ঘটেছে।

‘ঝড় ও ঝরাপাতা’ সম্পূর্ণতই ১৯৪৬ সালের ১১ ই ফেব্রুয়ারী সংঘটিত ‘রসিক আলি দিবস’-এর বিধ্বংসী ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে লিখিত। আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্যতম নায়ক ক্যাপ্টেন রসিদ আলি খাঁর সাত বছরের জন্য কারাদণ্ডের আদেশের প্রতিবাদে যে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন কলকাতাসহ অবিভক্ত বাংলাদেশে উত্তাল ঝড় সৃষ্টি করেছিল, যার পুরোভাগে ছিল— তরুণ প্রজন্ম-ছাত্র সমাজ এবং যে প্রতিরোধ দমন করতে ব্রিটিশ শক্তির নির্মম, নির্বিচার লাঠিচার্জ ও নারকীয় হত্যালীলায় ১১ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই পাঁচদিন রক্তস্নাত হয়েছিল শহর কলকাতা, অকালে ঝরে গিয়েছিল কত তরুণ প্রাণ সেই বাস্তব ঘটনার জীবন্ত দলিল এই

উপন্যাসটি। পরাধীন দেশের অক্লান্ত মুক্তিসংগ্রামের ক্ষিপ্রতা, ব্রিটিশের বিধ্বংসী রূপ এবং ছাত্র সমাজের অবিচল ভাবে আরও ‘ব্লাডবাথ’[২৬]-এর প্রস্তুতি নিয়েও দেশের জন্য এগিয়ে চলা, দাবী— ইংরেজের দেশ থেকে অপসরণ, হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্য, রাজবন্দীদের নিঃশর্তে মুক্তি ইত্যাদি এই উপন্যাসে প্রতিবিম্বিত। সেদিন ব্যর্থ হয়েছিল ১৪৪ ধারা, ট্যাঙ্ক ফোর্স, মিলিটারি ফোর্স, যাবতীয় নির্মমতা, শক্তির প্রয়োগ। কলকাতাবাসী যেন উন্মত্ত হয়ে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিল পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য। মেয়েরাও সেদিন পিছিয়ে থাকেনি। এই উপন্যাস একদিকে যেমন সমকালীন রাষ্ট্রনৈতিক প্রেক্ষাপটের বাস্তব দলিল, তেমনি প্রলয়ঙ্কারী ঝড় তার ধ্বংসাত্মক রূপের মধ্য দিয়েই ধরণীকে যাবতীয় অসাম্য-অন্যায়-অবিচার থেকে মুক্ত করে নবজীবনের পথে এই প্রত্যয়েরও জীবন্ত দলিল।

‘অভিযান’ উপন্যাসটি রাজনীতির পাশাপাশি জীবনবাস্তবতার এক নতুন রূপ তুলে ধরেছে। পেশায় ড্রাইভার নরসিং এর গিরিবরজার (গিরিব্রজ) জীবন বর্ণনার অনুষঙ্গে গ্রামীন জীবনে ধনতন্ত্রের আগ্রাসন যেমন পরিস্ফুট তেমনি চিত্রিত পলাশীর যুদ্ধের ভায়াবহ পরিণতি, কোম্পানি রাজ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত, গিরবরজার জীবনধারা, ছত্রীবংশ প্রভৃতির ইতিহাস। নরসিং ছত্রী-বংশোদ্ভূত হয়েও যখন অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-বাসস্থানের জন্য ইমামবাজারের ব্যবসায়ীদের কাছে আশ্রয় নেয় তখন শুধুমাত্র বংশকৌলিন্যের অজুহাতে তার বাপ-জ্যাঠারা তার সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করে দেয়। নরসিং জানকীকে বিবাহ করে, জানকীর ভাই রামের দায়িত্ব নেয়, জানকীর মৃত্যুর বহুকাল পর কটকির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে একটা সুস্থ জীবন নির্বাহ করতে চায় সৎ পথে। সমাজে ধনী-দরিদ্র এই দুই শ্রেণির বাস্তব অসাম্য ও বৈষম্যের বিশ্বস্থ দলিল ‘অভিযান’। লেখক দেখিয়েছেন দরিদ্র, মেহনতী, শ্রমজীবি মানুষ পরিশ্রম করে, রোজগার করে, নেশা, ব্যভিচারও করে কিন্তু ধনী তার ধনতন্ত্রের ধ্বজা আর দম্ভ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য যেভাবে মানুষকে শোষণ করে, নির্যাতন করে, বিক্রি পর্যন্ত করে চরম অসামাজিক বর্বরতার পরিচয় দেয়— দরিদ্র মানুষ এতটা অবনমিত হয় না। তাই মানুষ তার মানবিক ধর্ম দিয়েই জীবনের চলিষ্ণু ধর্মকে বজায় রাখে। তারই নাম অভিযান-জীবনের-মানবতার অভিযান।

বস্তুত প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে লিখিত উপন্যাসগুলির মধ্য দিয়ে লেখকের কালচেতনা, দেশচেতনা, রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবনার সমান্তরালে সংমিশ্রিত হয়েছে মৃত্তিকা সংলগ্ন মানুষকে বাস্তবিক অর্থে জানার গভীর প্রত্যয়। জন্মসূত্রে, পেশার সূত্রে, দেশসেবার সূত্রে, গ্রামজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় স্বরূপে অনুধাবন করেছিলেন দেশীয় সমাজবাস্তবতাকে, জনজীবনস্পন্দনকে। তাঁর কথাসাহিত্য সেই অনুভূতির উপলব্ধির সমৃদ্ধ ভাণ্ডার। রাঢ়বঙ্গের দর্পণে সমগ্র বঙ্গভূমি তথা ভারতভূমির সাধারণ মানুষের জীবন-সংস্কৃতি-সমাজ প্রেক্ষিত সার্থকভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কথাসাহিত্যে। রাঢ়বঙ্গ যেহেতু তাঁর কথাসাহিত্যের সিংহভাগের মুলাধার। স্বভাবতই তাঁর কথাসাহিত্য অনেকাংশেই 'আঞ্চলিক' রূপে অভিহিত। সংজ্ঞাগত বিচারে আঞ্চলিক উপন্যাস বলতে আমরা সেই জাতীয় কথারূপকে বুঝি যেখানে ভৌগোলিক সীমাসংহতি থাকবে, চরিত্র ও কাহিনির উপরে অঞ্চলের বিশেষ প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব থাকবে, আঞ্চলিক হয়েও লেখকের জীবনবোধে সম্পৃক্ত হয়ে সর্বজনীনতা অর্জন করবে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে রাঢ়বঙ্গ তাঁর স্বকীয়তায় প্রতিবিম্বিত। রাঢ়বঙ্গকে, বীরভূমের প্রত্যন্ত অঞ্চলকে নিবিড়ভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছিলেন জানার সেই অধিকার থেকেই রাঢ়বঙ্গের জনপদজীবন, সমাজবাস্তবতা, প্রান্তীয় মানুষজন-তাদের বিশ্বাস-সংস্কার-জীবনচর্যা-সংগ্রাম-ভাষা, কৃষিজীবি-পল্লিজীবনের সংস্কৃতি, উৎসব-অনুষ্ঠান, সামন্ততন্ত্রের আভিজাত্য-দম্ভ, ক্ষমতার প্রয়োগ, ধনতন্ত্রের দ্বন্দ্ব, দেশীয় রাজনীতির আবহে গ্রামজীবনের রাজনীতি-দলাদলি- সংকীর্ণতা তাঁর উপন্যাসের ক্যানভাসে সজীব হয়ে উঠেছে বর্ণনার গুণে, উপস্থাপনার কৌশলে, ভাষার সুদক্ষ প্রয়োগে। আঞ্চলিকতার দুটি রূপ— বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ। উপন্যাসের চরিত্র ও ঘটনায় যখন স্থানিক জীবন গভীরভাবে ছায়াপাত করে তখন আঞ্চলিকতার বাহ্যিক রূপ প্রতীতি প্রতিষ্ঠা পায়। আঞ্চলিকতা আভ্যন্তরীণ রূপে কালের পরিবর্তনের অভিঘাতে স্থানীয় জীবনের বিবর্তিত চালচিত্র প্রকাশিত হয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে আঞ্চলিকতার এই উভয়বিধ রূপকে আত্তীকৃত করেও মানবমাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার যে চিরন্তন প্রয়াস লক্ষিত তারই গুণে তাঁর কথাসাহিত্য 'আঞ্চলিক' ধর্ম স্পর্শ করেও চিরন্তন শাশ্বত আবেদনের জগৎ সৃষ্টি করেছে। দেশ-কাল-সমাজচেতনার মধ্য দিয়ে মানব মাহাত্ম্যের সন্ধান ও প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি। নীতিবোধ, আদর্শবোধ, দেশাত্মবোধ, বলিষ্ঠপ্রত্যয়, সমাজসেবার আদর্শ-পারিবারিকসূত্রে তিনি লাভ করেছিলেন। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর ব্যক্তিগত জীবনাভিজ্ঞতা, উপলব্ধি, রাঢ়বঙ্গকে তন্বিষ্ঠ ভাবে অনুভব করার সুযোগ ও অধিকার। ভাষায়, বর্ণনায় তাঁর কথাসাহিত্যে সেই দেশ-কাল-সমাজ ও মানুষ বর্ণাঢ্য সজীবতায় ভাস্বর হয়ে আছে। তাই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য আঞ্চলিক হয়েও আঞ্চলিকতার গুণ অতিক্রমী সমাজবাস্তবতার মানবিক দলিল। সমকালীন ক্রমবিবর্তমান দেশ-কাল-সমাজ বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় জনজীবনের অভিঘাতে তাঁর এই পর্বের উপন্যাসগুলি সঞ্জীবিত।

তথ্যসূত্র:

১. দাশ জীবনানন্দ, আশ্বিন ১৪১৩, রূপসী বাংলা, সিগনেট প্রেস কলকাতা-৭০০০২৩, পৃ-১২

২. জরাসন্ধ, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮, তারাশঙ্কর সংখ্যা, কালিকলম পত্রিকা, তারাশঙ্কর ও রাঢ়দেশ, পৃ-৫৮৪

৩. বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, ১৯৯৭, আমার সাহিত্যজীবন, প.বঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ-২০
৪. বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর মাঘ ১৪০১, পাষাণপুরী, তারাশঙ্কর রচনাবলী ২য় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলির্শাস প্রা.লি., ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ-৩৭৩
৫. বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, ১৯৯৭, আমার সাহিত্যজীবন, প.বঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ-৬৬
৬. বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, মাঘ ১৪০১ পাষাণপুরী, তারাশঙ্কর রচনাবলী ২য় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা.লি ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ-৩৮১
৭. বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, ভাদ্র ১৪০৬, রাইকমল, তারাশঙ্কর রচনাবলী ৩য় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা.লি ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ-৩৭৩
৮. ঐ, পৃ-৪৩৯
৯. বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, ১৯৯৭, আমার সাহিত্য জীবন, প.বঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ-৮৮
১০. বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, বৈশাখ ১৪০৭, ধাত্রীদেবতা, তারাশঙ্কর রচনাবলী ১ম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা.লি ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ-৬৭
১১. ঐ, পৃ-২৫৮
১২. ঐ, পৃ-৮২
১৩. ঐ, পৃ-২৮৩
১৪. ঐ, পৃ-২০৭
১৫. ঐ, পৃ-২০৪
১৬. ঐ, পৃ-১৪১
১৭. বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, মাঘ ১৪০১, কালিন্দী, তারাশঙ্কর রচনাবলী ২য় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা.লি ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ-৩
১৮. বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, অগ্রহায়ণ ১৪০০, কবি, তারাশঙ্কর রচনাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা.লি ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ-১৩
১৯. বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, অগ্রহায়ণ ১৪০০, কবি, তারাশঙ্কর রচনাবলী ৬র্থ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা.লি ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ-১৩

২০. বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, ১৯৯৭ আমার সাহিত্যজীবন, প.বঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ-১৯৫
২১. বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, অগ্রহায়ণ ১৪০০, কবি, তারাশঙ্কর রচনাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা.লি ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ-১৪১
২২. বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, অগ্রহায়ণ ১৪০০, কবি, তারাশঙ্কর রচনাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা.লি ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ-১৪০
২৩. বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, পৌষ ১৪০৬, মন্বন্তর, তারাশঙ্কর রচনাবলী ৫ম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা.লি ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ-২৮৯
২৪. ঐ, পৃ-২৮৯
২৫. ঐ, পৃ-২৮৯
২৬. বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, কার্তিক ১৪০৩, ঝড় ও ঝরাপাতা, তারাশঙ্কর রচনাবলী ৮ম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা.লি ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ-৯

দৃষ্টির ভিন্নতায় নন্দনতত্ত্ব

বিশ্বজিৎ দে
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: নন্দনতত্ত্ব শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ হল আনন্দিত (নন্দ+ণিচ+অন কর্তৃবাচ্য পরস্মৈপদী) বা আনন্দিত হওয়া অর্থাৎ শিল্পের উদ্দেশ্যের ইঙ্গিতবহ এই শব্দটি। যদিও এই ব্যাখাতে শব্দটি অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হয় যেমন দুষ্ট হয়েছে, 'নন্দনতত্ত্ব হল সুন্দরের দর্শন' (The philosophy of beautiful)। নন্দনতত্ত্ববিদ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত নন্দনতত্ত্বকে নির্ণয় করেছেন 'সৌন্দর্যতত্ত্ব'। অধ্যাপক প্রবাস জীবন চৌধুরীর কাছে 'সৌন্দর্য দর্শন'। অধ্যাপক হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক সাধন কুমার ভট্টাচার্যের মতে 'শিল্পতত্ত্ব'। প্রকৃতপক্ষে যেকোন রকম আনন্দ দেওয়া শিল্পের উদ্দেশ্য নয় আবার সৌন্দর্য প্রকৃত সৌন্দর্য নয়, শিল্পের সৌন্দর্য হওয়া চাই। বক্তব্য এই যে, শিল্প সৃষ্টি মূলত মনের ক্রিয়া। শিল্পের প্রেরণা এবং ভাববস্তু মনের মধ্যে আসতে পারে অবচেতন-অচেতন স্তর থেকে এবং Subliminal/ Super- Conciousness স্তর থেকে কিন্তু তাকে কার্যান্বিত করে শিল্প সৃষ্টি করে মন। মানুষের এই মন জড়বস্তু ও পশু প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র। মনের তিনটি প্রধান বৃত্তি হল মনন, সংকল্প এবং অনুভব। অনুভবের সাথেই শিল্প সৃষ্টির প্রত্যক্ষ যোগ যদিও মনন ও সংকল্পের ক্রিয়া শিল্প সৃষ্টিতে স্বল্পত অংশগ্রহণ করে। মনের বিকাশ ঘটে যুক্তির সাহায্যে চিন্তা করার মধ্যে, সংকল্প বা ইচ্ছার প্রকাশ ঘটে সেই ইচ্ছাকে কাজে রূপায়িত করার মধ্যে, অনুভবের প্রকাশ শিল্প সৌন্দর্য সৃষ্টির মধ্যে। মনের এই তিনটি উদ্দেশ্যকে আমরা বলি মূল্যবোধ। অর্থাৎ এই তিনটি কাজের পিছনে রয়েছে তিনটি Sense Value । চিন্তার লক্ষ্য যুক্তির সাহায্যে সত্যকে(Truth) জানা। সংকল্প রূপায়নের উদ্দেশ্য হল নিজের ও সমাজের মঙ্গল বিধান- এখানে Sense of value হল 'শিব'(Good), আর মনের অনুভূতির দিক থেকে সৃষ্টি হয় শিব এর উদ্দেশ্য সুন্দর (Beauty)। Truth + Good + Beauty= সত্যম্ - শিবম্ - সুন্দরম্ এই তিনটি ক্রিয়ার যে তত্ত্বকথা (Theory) বা বিদ্যা (Discipline) তা হল যথাক্রমে পরাবিদ্যা (Metaphysics) নীতিশাস্ত্র(Ethics) এবং নন্দনতত্ত্ব বা শিল্পতত্ত্ব (Aesthetics)।

মূল শব্দ: নন্দনতত্ত্ব, নাট্যরস, আনন্দলাভ, সহৃদয় হৃদয়সংবাদী, যৌনকর্মীর নাট্য, আত্মমর্যাদা।

মূল আলোচনা:
সৃষ্টির প্রবৃত্তি যেখান থেকে নিয়ন্ত্রিত হয় তার নাম মস্তিষ্ক নয় হৃদয়। নির্বিকল্প মনন দিয়ে পাঁপড়ির দল ছিন্ন ভিন্ন করা যায়, বৃন্তে কিছু উন্মত্ত আঘাত হানা যায়, কিন্তু তার পরও তাকে শুনতে হয় গোপনচারিণীর শব্দবিহীন ভুলে-

"তোরা কেউ পারবি নে গো,
পারবি নে ফুল ফোটাতে।"[১]

এতে মনে হতে পারে যে, ফুল ফোটানোর গভীর রহস্য একমাত্র সৃষ্টিকর্তার কাছেই লুকোন থাকতে পারে- "যে পারে সে আপনি পারে,/ পারে সে ফুল ফোটাতে।"[২] আসলে 'নিখিল কবি প্রতিভার নিঃশেষ পরিচয়' অথবা প্রজ্ঞা-প্রতিভার 'পারস্পারিক বন্ধন' বা 'Slumbering power' – যা বলেই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য উন্মোচন করা হোক না কেন মূল ব্যাপার হলো স্রষ্টার সঙ্গে সহিত বা পাঠকের মেল বন্ধনে যে রসপরিণাম তা উভয়ত আনন্দ লাভের সত্যে অনুভব্য হয়ে ওঠে। যদিও 'স্রষ্টা' না 'ভোক্তা' কার হৃদয়ে রসপরিণাম এই নিয়ে আলঙ্কারিকদের মধ্যে বিতর্ক আছে।

সাহিত্যের তত্ত্ব অনুসন্ধানের জন্য যে শাস্ত্র তাকে বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন। সূত্রাকারে নীচে সেগুলির উল্লেখ করা হলো-

১) শিল্পতত্ত্ব (Theory of Art)
2) সৌন্দর্যতত্ত্ব (Science of Beauty/ Philosophy of Beauty)
এই সৌন্দর্যতত্ত্বের আবার কতগুলি শ্রেণিবিভাগ লক্ষ্য করা যায় যেমন-
ক) আধ্যাত্মবাদী (The Absolute) (খ) ভাববাদী (গ) বস্তুবাদ (ঘ) Metaphysical (ঙ) Hedonistic (চ) Moral (ছ) Intellectual (জ) Psychological (ঝ) Expressionistic
৩) নন্দনতত্ত্ব/ আনন্দবাদ (Beauty is objectified Pleasure)
নন্দনতত্ত্বে আবার দুটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে-

(ক) আধ্যাত্মবাদ (সচ্চিদানন্দ আনন্দ স্বরূপ)
(খ) বস্তুবাদ (জৈবিক কামনা ও সামাজিক বাসনা)

৪) রস তত্ত্ব (Expression of Feeling)
৫) প্রকাশ তত্ত্ব বা প্রকাশ বিজ্ঞান বা কল্পনা তত্ত্ব
(Science of Expression and General Distinguistic)

ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য এর নামকরণ করেছেন Speritual Activity বা কল্পনাশ্রয়ী জ্ঞানের রূপ। শিল্প হচ্ছে imaginative knowledge- intuition- expression। প্রকাশতাত্ত্বিকেরা শিল্পীর প্রতিভার ওপর এবং নিরপেক্ষ কল্পনা শক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন অর্থাৎ মন্ময়তায় তারা বিশ্বাসী। বীক্ষণ বা অভিজ্ঞতাবাদীরা অভিজ্ঞতার তন্ময়তায় বিশ্বাসী।

৬) অভিজ্ঞতাবাদ বা বীক্ষণ

৭) সঞ্চার তত্ত্ব

মূলত সঞ্চার তত্ত্বের প্রবক্তা গোর্কি 'Art is the expression of heightened experience' বা একে অনেকে Sence-Perception বলেও অভিহিত করেছেন।

গ্রীলর্বাড মারে জানিয়ে ছিলেন পোয়েটিক্স এর দুটি খন্ড আছে। দ্বিতীয়টি পাওয়া যায়নি, প্রথমটিও অসম্পূর্ণ। অ্যারিষ্টটলের 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থের ছাব্বিশটি অধ্যায় এবং ভরতের নাট্যশাস্ত্র ও বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্য দর্পণ, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যে সাহিত্য তত্ত্ব অনুসন্ধানে শাস্ত্রের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এভাবেই সময়ের সাথে সাথে গড়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যেও শিল্প তত্ত্ব, নন্দন তত্ত্ব, ললিত কলা বিষয়ক তত্ত্ব, সাহিত্য তত্ত্ব বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির শ্রেণিকরণ লক্ষ্য করা গেছে। শোপেন হাওয়ার, ওয়াল্টার পেটার এরা যেমন সঙ্গীতকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন, হ্যাজলিট চিত্রকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন, অ্যারিষ্টটল নাটককে মহত্তর শিল্প বলেছেন; ভরতের নাট্যশাস্ত্র প্রসঙ্গে নাট্য শব্দটি থাকলেও কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষ্য করা গেছে যা বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাহিত্য দর্পণে'র টীকাতেও একই সুর ধ্বনিত করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শিল্পের নির্দিষ্ট শ্রেণিকরণে হেগেল, কান্ট প্রভৃতির মত মাইক্রো অ্যানালাইসিসে না গিয়ে স্পষ্ট করে জানিয়েছেন- 'শিল্পের সব ভাগ স্বতন্ত্র ও মর্যাদা বিশিষ্ট'। অ্যারিষ্টটলের পোয়েটিক্সে আমরা জানতে পারি থিয়েটার হচ্ছে কম্পোজিট আর্ট, ভরত মুনিও তার নাট্য শাস্ত্রে নাটকের মধ্যে শিল্পের বহু অনুকরণ ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ সঙ্গীত, চিত্র, নৃত্য, আবৃত্তি, বাচিক, কায়িক সব মিলে যখন থিয়েটার তখন নাট্যের নন্দন তত্ত্ব অবশ্যই বহুমুখী শিল্পের এক বিস্ফোরণ যার পরিণাম সামাজিক বীক্ষণের মধ্য দিয়ে আনন্দ পরিণামে।

শিল্পের ভাগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দার্শনিক ও সমালোচক বিভিন্নতা দেখিয়েছেন। পোয়েটিক্স এর ষষ্ঠ অধ্যায়ে অ্যারিষ্টটল জাতি-প্রজাতি সম্পর্ক দেখিয়ে শিল্পের যে শ্রেণিকরণ করেছেন, সেখানে শিল্পকে জাতিতে রেখে তার ভাগগুলি সাহিত্য, চিত্র, সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতিকে প্রজাতির অবস্থানে নির্দেশিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে না বললেও শিল্পতত্ত্ব-নন্দনতত্ত্ব-ললিতকলা এসবই তার কাছে একই আসনে উন্নীত হয়েছে। কারণ রবীন্দ্রনাথের কাছে 'ব্যক্তি' শব্দের অর্থ যিনি ব্যক্ত হন। এই ব্যক্তি সমষ্টির মধ্যে শিল্পী স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে তার সৃজন শক্তির কারণে। কবি (রবীন্দ্রনাথ) দার্শনিক কান্টের মতই বলেছেন, প্রয়োজনের মাপে মাপে যা তৈরী তা হল নির্মাণ। আর অপ্রয়োজনের আনন্দ হয়ে ওঠার মধ্যেই সৃষ্টি রহস্য। সাহিত্যের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনুসারে সাহিত্যতত্ত্ব হল সাহিত্যের মূল। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনই যে সাহিত্যের (শিল্পের) উদ্দেশ্য, সে কথা রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বাস করতেন- যার সাদৃশ্য লক্ষ্য করি সাহিত্যতত্ত্ব অনুসন্ধানের শাস্ত্রভাগের গোর্কির সঞ্চারতত্ত্ব('What is Art') প্রকাশ ভাবনায়। যা কিছু কল্পিত হয়েছে, যা কিছু সুন্দরের দাবি রাখে তার রসস্বাদন করবে গৌড়জন, গুণীজন, সহৃদয়-হৃদয় সংবাদী, দেশ-কাল অতিরিক্ত রসিকের দল। মধুসূদনের ভাষাতে বলা যায়-"গৌড় জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

কান্টের শ্রেণিভাগে রূপশিল্প, বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য শিল্প এগুলির সম্পৃক্ত সন্নিবেশ ঘটেছে নাট্যে। আবার হেগেলের শিল্পতত্ত্বে ক্লাসিক ও রোমান্টিক ভাগের সংশ্লেষ দেখা যায় থিয়েটারে। সাধন কুমার ভট্টাচার্যের উপভোগ্য বা চারুকর্ম অর্থাৎ 'অপ্রয়োজনের আনন্দ' নাটকে প্রকাশিত হয়ে সহিত অর্থাৎ সহৃদয় হৃদয়সংবাদী দর্শকের কাছে পরিণামে আনন্দের সেতুবন্ধন তৈরী করে সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে। অ্যারিষ্টটলের পোয়েটিক্সের চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনামঃ 'কাব্যসৃষ্টির প্রেরণা ও কাব্যের প্রধান দুই ভাগ'এ- জানিয়েছেন যে, শিল্পকলা হিসেবে নাটক মহত্তর ও উচ্চতর সৃষ্টি।

'দশ রূপক' এর রচয়িতা নাট্যবেদ, রসশাস্ত্র ও অলঙ্কার শাস্ত্রের আদি ব্যাখ্যাতা নাট্যাচার্য ভরতমুনি। পরবর্তীকালে অভিনব গুপ্ত ভরত মুনির গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করতে গিয়ে তার কাছে নাট্যরস ও কাব্যরস যে মূলত একই ছিল, সে কথা প্রচার করেছেন। ভরত মুনির কাল সম্পর্কে বিতর্ক থাকলেও খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যে কোন এক সময়ে ভরত মুনি আর্বিভূত হন। খ্রিষ্টীয় সপ্তম বা অষ্টম শতকে ভামহ ('কাব্যালঙ্কার') ভরত মুনির গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, কাব্যে নাট্যরস একজাতীয় অলঙ্কার এবং 'প্রেয়ঃ', 'রসবিৎ' ও 'ঊর্জ্বস্বি'- এই তিন প্রকার অলঙ্কারে তার আলোচনা সীমিত রেখেছেন। খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকে ভামহের সঙ্গে সহমত পোষণ করে আচার্য দন্ডী ('কাব্যাদর্শ') বলেছেন, নাট্যরস কাব্য অলঙ্কার হিসেবে গণ্য হওয়া উচিৎ। খ্রিষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতকে দেহাত্মবাদী কাব্যতাত্ত্বিক বামনাচার্য ('কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি') জানিয়েছেন, কাব্যের প্রধান গুন ক্রান্তি। আবার খ্রিষ্টীয় নবম শতকে দেহাত্মবাদী রুদ্রট আটটি নাট্য রসের কথা স্বীকার করে 'শান্ত' ও 'প্রেয়ঃ' নামে আরও দুটি রসের কথা উল্লেখ করেছেন। ঐ একই শতকে কাশ্মীরের অধিবাসী আনন্দবর্ধন 'ধ্বন্যলোক' গ্রন্থে ভরতের নাট্যরসকেই 'রসধ্বনি' হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং ধ্বনিবাদকে প্রতিষ্ঠা করেও রসবাদকে প্রাধান্য দিয়েছেন। দশম খ্রিষ্টাব্দে কাশ্মীরের অধিবাসী কাব্যতাত্ত্বিক অভিনব গুপ্ত 'ভরতের নাট্যশাস্ত্রের অভিনব ভারতী' গ্রন্থে নাট্যরস এবং কাব্যরসের অভিন্নতা প্রচার করেছেন। এমন কথাও বলেছেন যে, কাব্য প্রধানত দশরূপক বা নাট্য স্বভাব সম্পন্ন এবং কাব্য বস্তুত নাট্যই-

> "কাব্যং তাবন্ মুখ্যতো দশরূপকাত্মকমেব
> কাব্যং চ নাট্যমেব।"[৩]

নয়টি স্থায়ী ভাবকে কেন্দ্র করে নয়টি রসের বহতা সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়। বিভাব-অনুভাব-সঞ্চারীভাব যোগে তার রস পরিণাম ঘটে। ভরত ব্যাভিচারী ভাবের সংখ্যা তেত্রিশটি বললেও পরবর্তীতে আটটি সাত্ত্বিক ভাব যুক্ত হয়েছে। এই সৃজন প্রক্রিয়া এবং তার রস পরিণামজাত আনন্দ নিয়েই নন্দনতত্ত্বের ধারাপাত। পাশ্চাত্য কাব্যতত্ত্ব বা শিল্পতত্ত্ব এবং সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র প্রভৃতির তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গেই লক্ষ্য করা গেল সৃষ্টিকর্তা এবং ভোক্তার পারস্পারিক মনন বিনিময়ের মধ্যেই রয়েছে নান্দনিকতা।

যা আলোচিত হল তাতে স্পষ্ট করে বলা না হলেও নন্দনতত্ত্বের অর্থ যে সৌন্দর্যতত্ত্ব নয় তা প্রতীয়মান থেকেছে। যদিও সৌন্দর্যতত্ত্ব মানে সুন্দর নয় এর প্রকৃত ব্যাখ্যা (Objectified Pleasurer)। থিও ফিল গ্যোতিয়ে, বরিস পাস্তেরনাক এরা যে 'Art for Art sake' অর্থাৎ শিল্প শুধু আনন্দের জন্য এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু সমাজ ইতিহাস নিরপেক্ষ আনন্দকে কখনই সৌন্দর্যতত্ত্ব বলা হয় না। নন্দনতত্ত্ব মানে সৃষ্টিসুখের উল্লাস নয়। নন্দনতত্ত্বের সর্বজনীনতা স্থায়ীভাবকে কেন্দ্র করে যেখানে শৃঙ্গার, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস ইত্যাদি সমস্ত রসের অবলম্বন লক্ষ্য করা যায়। তাই এলিয়টের 'ওয়েস্ট ল্যান্ড' অথবা শেলীর 'প্রমেথিউস আনবাউন্ড' কিংবা শেক্সপীয়রের 'ওথেলো'কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রসসৃজনে নান্দনিকতা পাঠকের কাছে সহজেই ধরা পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র 'বিবিধ প্রবন্ধ' সংকলনের 'উত্তর চরিত' প্রবন্ধে জানিয়েছিলেন যে, সাহিত্যসৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য- (ক) মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি (খ) গৌণ উদ্দেশ্য চিত্ত শুদ্ধি। ক্লাসিস্ট ড. জনসন সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানিয়েছেন, (to instruct or to delite; to instruct and to delite). রবীন্দ্রনাথও সাহিত্যের সৌন্দর্যের মধ্যে মঙ্গল মূর্তির প্রতিষ্ঠা করেছেন অর্থাৎ শিল্প বা সাহিত্য যেমন রসসৃষ্টি করবে, পরিণামে আনন্দ সহৃদয় হৃদয়সংবাদী হয়ে উঠবে তেমনি পাশাপাশি সমাজের বা ইতিহাসের চলমানতাকে প্রশ্রয় দিয়ে দর্শকের অর্ন্তমূলে ধাক্কা দেবে। সাহিত্যের উদ্দশ্যের কথা এল এ কারণে যে, সেক্স ওয়ার্কারের থিয়েটারের যে প্রসঙ্গ সেখানে নাটক রচনার সঙ্গে নাট্যাভিনয়ের যে প্রকাশ এর মধ্যে সমাজের অবক্ষয়ী সত্য নিহিত রয়েছে। এরা ভালবেসে কেউ যৌন পেশা গ্রহণ করেন না। কখনো পাচারকারীর অথবা কখনো অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে বাবা-মা বিক্রি করে দেন। আবার কখনো প্রেমিক দ্বারা প্রতারিত হয়ে পরিবার এবং সমাজ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এরা যৌন পেশাতে আসতে বাধ্য হন। এরই পাশাপাশি উত্তরাধিকারের পথাবলম্বি হয়ে এদের যৌন পেশাতে অন্তর্ভুক্তি লক্ষ্য করা যায়। এই পেশা আমাদের সমাজের ক্ষেত্রে কী খুব আত্মমর্যাদা সম্পন্ন? –না খুব সম্মানীয়? অর্থনৈতিক মানদন্ডে যে কোনো পেশার মানুষদের কর্মী বলা হলেও এদের ক্ষেত্রে কর্মী শব্দের তাৎপর্য অন্তঃসার শূন্য। এতো গেল তাদের জীবনবেদ- তাদের জীবনের ধারাপাত আমার আলোচ্য নয়। আমার আলোচ্য হচ্ছে এই সেক্সওয়ার্কাররা বিশ্বের মে দিবসের আটঘন্টা লড়াই এর সূত্রে যখন আটঘন্টা কাজ, আটঘন্টা আমোদ-প্রমোদ এবং আটঘন্টা বিশ্রাম – এই চব্বিশ ঘন্টার সারণীতে আসতে চায়, তখন ঐ আটঘন্টা আমোদ-প্রমোদের সময় তাদেরই একটা অংশ সৃজনকর্মে নিয়োজিত হন। কেউ নাটক লেখেন, কেউ গান করেন, কেউ ছবি আঁকেন, কেউ ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে হাত দেন, আবার অনেকে মিলে থিয়েটার করেন। তাহলে তাদের এই সৃজনক্ষম প্রতিভার স্বীকৃতি দিয়েছেন কোন সাহিত্যতাত্ত্বিক কোন রসতাত্ত্বিকরা? সাধন ভট্টাচার্যের 'শিল্পতত্ত্ব' বইতে মনুষ্যকৃত যে শ্রেণিভাগ রয়েছে তার মধ্যে কি এরা পড়েন না? অবশ্যই এরাও শিল্পী আর এদের শিল্প প্রকাশে নন্দনতত্ত্বের বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা লক্ষ্য করা যায়। শুধুমাত্র

তাদের থিয়েটারের মধ্যে নিজেদের জীবনে করুণ রসের এফোঁড় ওফোঁড়ে নক্সীকাঁথা তৈরী হয় না। পাশাপাশি শৃঙ্গারের রসবোধে কখনো বা ভয়ানক আবার হাস্যের বিভিন্ন উর্মিমালাতে যৌনকর্মীদের থিয়েটার স্ট্রোমালাইটের আলোয় মঞ্চের চেতন-অবচেতনের নেপথ্যে আয়োজিত হয়- দর্শকের মর্মে, শ্রবণে, দৃষ্টিতে। যার পরিণামী আনন্দে দর্শক সচেতন সমাজের চাপিয়ে দেওয়া আভিজাত্যের মুখোশ খুলে রসিক হয়ে যান এদের একজন, শিল্পের উদ্দেশ্যমুখীনতায় সমাজকে নতুন করে চিনতে পারেন। এই পারম্পরিক নান্দনিকতার স্বরগ্রামে যৌনকর্মীর নাট্য হয়ে ওঠে সৃষ্টির মুখরা- যা নন্দনতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে।

বিনোদিনীর অভিনয় জীবন মাত্র বারো বছরের মধ্যে পঞ্চাশ থেকে ষাটটির মতো চরিত্রে তিনি অভিনয় করেছেন এবং মাত্র তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সে থিয়েটার থেকে অবসর নিয়েছেন। অভিনয় করেছেন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে (১৮৭৪-১৮৭৬), বেঙ্গল থিয়েটারে (১৮৭৬-১৮৭৭), ন্যাশনাল থিয়েটারে (১৮৭৭-১৮৮৩), স্টার থিয়েটারে (১৮৮৩-১৮৮৬)। অর্থাৎ মাত্র দুই দশকের সামান্য বেশী সময় ধরে অভিনয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে হঠাৎ করে নির্বাপিত করলেন। বেঙ্গলে তার অভিনয় জীবন মাত্র উনিশ মাস। কুঁড়ি যেমন আকুল হয়ে কাঁদে প্রস্ফুটনের জন্য বেঙ্গলে অভিনেত্রী বিনোদিনী গাম্ভীর্য ব্যক্তিত্বে অন্তদ্বন্ডদীর্ণ চরিত্রগুলি একের পর এক মঞ্চস্থ করলেন। এসময়ে তার নাট্যগুরু ছিলেন শরৎচন্দ্র ঘোষ। মৃণালিনীতে ‘মনোরমা’, কপালকুন্ডলায় ‘কপালকুন্ডলা’, দুর্গেশনন্দিনীতে ‘আয়েশা’ ও ‘তিলোত্তমা’ আর মেঘনাদ বধ নাটকে ‘প্রমীলা’ চরিত্র রূপায়ণ করলেন। বেঙ্গলের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে তার নাট্যবোধ, চেতনা, এবং অভিনয় প্রতিভা তাকে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীতে পরিণত করল। জটিল দ্বান্দ্বিক চরিত্র নির্মাণে বিনোদিনীর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল শহরের বুক জুড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র ‘মনোরমার’ অভিনয় দেখে বলেছিলেন-

> “আমি মনোরমার চিত্র পুস্তকেই লিখিয়াছিলাম, কখনো যে প্রত্যক্ষ দেখিব এমন আশা করি নাই। আজ বিনোদের অভিনয় দেখিয়া সে ভ্রম ঘুচিল।”[৪]

‘কপালকুন্ডলা’র অভিনয় দেখে গিরিশবাবু ১৮৭৭ খিষ্টাব্দের শেষ দিকে বিনোদিনীকে নিয়ে এলেন ন্যাশনাল থিয়েটারে। বলা চলে পাকানো সলতের আগুন জ্বলা গিরিশ চন্দ্রের হাতেই। ১৮৭৭ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে পরপর অভিনয় করলেন বিনোদিনী- ‘মেঘনাদ বধ’ এ ‘চিত্রাঙ্গদা’, ‘প্রমীলা’, ‘বারুণী’, ‘রতী’, ‘মায়া’,’মহামায়া’, এবং ‘সীতা’- একই সঙ্গে সাতটি ভূমিকা। ‘বিষবৃক্ষ’-এ কুন্দনন্দিনী, ‘সধবার একাদশী’তে কাঞ্চন, মৃণালিনী’তে মনোরমা, ‘পলাশীর যুদ্ধ’এ ব্রিটানিয়া এছাড়া আরও কয়েকটি নাটক ও প্রহসন। অভিনয় শিক্ষার মধ্য দিয়ে কিভাবে স্বতন্ত্র ব্যাক্তিত্বের উদ্দীপনায় জ্বলে ওঠা যায় তার প্রমাণ বিনোদিনী। ‘রেইজ এ্যান্ড রায়ত’ পত্রিকায় শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করলেন, ‘বিনোদিনী মনোহারিনী’।

অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় লিখেছেন:

> "ক্রমে বিনোদিনী গিরিশচন্দ্রের 'মোহিনী প্রতিমা', 'আনন্দরহো' প্রভৃতি নাটকে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করে খ্যাতির সোপান ধরে উঠতে লাগলেন।"[৫]

স্বয়ং গিরিশচন্দ্র বলেছিলেন:

> "আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে রঙ্গালয়ে বিনোদিনীর উৎকর্ষ আমার শিক্ষা অপেক্ষা তাহার নিজ গুনে অধিক।"[৬]

'তাহার নিজগুণে অধিক' অর্থাৎ নিজগুণ রসশাস্ত্রের প্রতিভাকে ইঙ্গিত করে। যে প্রতিভাকে রুশপন্থী দার্শনিক বলেছেন স্লামবারিং পাওয়ার তা বিনোদিনীর ছিল। এই শিল্পী যখন নিজ প্রতিভাগুনে সৃষ্টি প্রতিভাকে তার সৃষ্টিকর্ম সাধারণীকরণের মধ্য দিয়ে দর্শক মনে বিভিন্ন রসের আধার তৈরী করেছেন এবং পরিণামে একাধারে শিল্পী এবং ভোক্তা আনন্দলাভ হচ্ছে তা অবশ্যই নন্দনতত্ত্ব। যে নন্দনতাত্ত্বিক সুরে একশো বছরের পরও বিনোদিনী দাসী নাচমহল ভেঙ্গে রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রী হিসেবে রসবেত্তা পাঠকের কাছে স্মরণযোগ্য এবং স্মরণীয় তথাকথিত সমাজে আত্মমর্যাদাবোধ প্রয়াসে।

সালটা ১৮৯৮ তিনকড়ি পনেরো বছরের সুশীলাবালাকে নিয়ে এল ক্লাসিক থিয়েটারে। কিন্তু সেখানে অভিনয়ের কোন সুযোগ ঘটল না। পরবর্তীতে মিনার্ভাতে তারপর গেইটি থিয়েটারে কিন্তু সেখানেও তেমনভাবে সুশীলাবালা অভিনয়ের সুযোগ পায়নি। শুধুমাত্র গিরিশচন্দ্রের 'হারানিধি' নাটকে হেমাঙ্গিনী চরিত্রে অভিনয় দর্শকদের মন ভিজিয়ে দিল। সুশীলা ঘুরতে ঘুরতে এলেন এম্প্রেস থিয়েটার নামে এক প্রাইভেট থিয়েটারে। এখানে নাট্য শিক্ষক হিসেবে পেলেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফিকে। অর্ধেন্দুবাবু বুঝতে পেরেছিলেন- সুশীলা অন্ধকার খনির গর্ভে পড়ে থাকা উপেক্ষিত এক আকাটা হীরে। সুশীলার গান দর্শকদের মাতিয়ে দিল। বিশেষ করে শ্রীপুরের জমিদার নরেন্দ্রনাথ সরকার সুশীলার অন্যতম ভক্ত। ঘটনাবৃত্তে তাদের বিয়েও হল, সুশীলা সমাজের এঁটে দেওয়া বারাঙ্গনার লেবেল ছেড়ে ভদ্র পল্লীতে এলেন। সুশীলার অন্যতম নাট্যগুরু গিরিশচন্দ্র। দুর্গা দাস দে'র লেখা 'শ্রী' নাটকে নায়িকা হলেন সুশীলাবালা, সময়টা ১৮৯৯ সালের ২৭মে 'মদালসা', 'মাধবীকঙ্কন', 'ভ্রমর', 'পাণ্ডব-কৌরবাদি', 'প্রফুল্ল', 'মণিহরণ', 'নন্দদুলাল','জেরিনা', 'জুলিয়া', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'রাজা বসন্ত রায়' প্রভৃতি অজস্র অসংখ্য নাটকের বেশ কয়েক বছর ধরে নায়িকা সুশীলাবালা এবং মূলত তার দিকে লক্ষ্য রেখেই নাটকে গানের সংখ্যা বৃদ্ধি হল। যেমন 'মণিহরণ' নাটকে ২৮ টি গান সংযোজিত হয়েছিল। বঙ্গবাসী, স্টেটসম্যান প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় সুশীলাবালার অভিনয়ের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। ১৯০১ সালের ১৬ মার্চ 'বঙ্গবিজেতা', ৬ মে 'সাধের বাসর', ২২ জুন 'কপালকুণ্ডলা', 'আবু হোসেন' একটার পর একটা নাটকে তিনকড়ির সাথে সুশীলাবালা নিজেকে উজাড় করে দিলেন। অবিনাশ চন্দ্র প্রণীত 'গিরিশচন্দ্র' গ্রন্থে মন্তব্য করা হয়েছে-

> “সুবিখ্যাতা অভিনেত্রী এবং কোকিলকণ্ঠী গায়িকা শ্রীমতী সুশীলাবালা লক্ষ্মীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া সুমধুর সঙ্গীতে দর্শকগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।”[৭]

অবিনাশ চন্দ্র উপরের মন্তব্যটি করেছিলেন, 'শ্রী বৎস-চিন্তা' নাটকটি অবলম্বনে। শুধু তাই নয় ১৯০৫ সালের ৮ এপ্রিল 'বলিদান' নাটকে সুশীলাবালার জোবির অভিনয় দেখে এই অবিনাশ চন্দ্রই উক্ত গ্রন্থে লিখেছিলেন-

> “এধরনের একটি জটিল চরিত্রে অবতীর্ণ হয়ে সুশীলা প্রমাণ করে দিলেন যে, শুধু গায়িকা হবার জন্যে সুশীলা মঞ্চে আসেননি। সুশীলা এক পরিপূর্ণ অভিনেত্রী।”[৮]

মিনার্ভায় যখন ‘বিল্বমঙ্গল’ নাটকের আয়োজন করা হল তখন সুশীলা পেলেন পাগলিনীর ভূমিকা। আর স্টার থিয়েটারের ‘বিল্বমঙ্গলে’ বিনোদিনী, চিন্তামণি এবং পাগলিনী গঙ্গামনি অভিনয় করেন। ফলত অভিনয় জগতে এক পাল্লাপাল্লির প্রেক্ষাপট তৈরি হল। পরবর্তীতে গঙ্গামনির সেই ঐতিহাসিক চরিত্রে রূপ দিলেন সুশীলা। যদিও অভিনয়ে সুশীলা গঙ্গামনির সমকক্ষ না হলেও পাগলিনী চরিত্রে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে সুশীলার ভূমিকা সিরাজ পত্নী লুৎফাউন্নীসা। সময়টা বঙ্গভঙ্গের, সালটা ১৯০৫ এর ৯ সেপ্টেম্বর। এছাড়া 'বিম্বাবতী' চরিত্রে 'মীর কাসিম' এ বেগম চরিত্রে, মেহের চরিত্রে সুশীলার অভিনয় খ্যাতির শীর্ষ স্পর্শ করেছিল। একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন ১৯০৬ সালে ১৬ জানুয়ারি মিনার্ভায় নতুন নাটক 'মীর কাসিম' অসাধারণ সাফল্য সত্ত্বেও এই নাটক ইংরেজ সরকার বন্ধ করে দিয়েছিল। সেনাপতি তকি খাঁর হাতে তরবারি তুলে দিয়ে বেগম রূপী সুশীলাবালা যখন গান ধরতেন-

> “রুধির ঝলকে দামিনী দলকে
> বীর তরবারি খেলে হরষে।।”[৯]

তখন দর্শকরা দাঁড়িয়ে উঠে স্লোগান তুলত 'বন্দেমাতরম'। আমরা এর আগেও দেখেছি নিষিদ্ধ পল্লীর মেয়েরা 'নীলদর্পণ' নাটকের সময়, 'মীরকাসিম' নাটকের সময় এরকম অসংখ্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সামনে রেখে যে নাটকগুলো রচিত হয়েছিল সে সময় ইংরেজের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে, শুধু নাটকে অংশগ্রহণ নয় দর্শকদেরও মাতিয়ে তুলেছিল এ আন্দোলনের স্রোতে। তাহলে সুশীলাবালার মত নটী এবং শিল্পীরা নাটককে আশ্রয় করেই আত্মমর্যাদাবোধে উন্নীত এবং প্রতিষ্ঠাকরণে প্রয়াস চালিয়ে গেছে বারবার। সুশীলাবালার শেষ জীবন, মৃত্যু, হত্যা না আত্মহত্যা তা বাংলার রঙ্গমঞ্চের ঐতিহাসিকদের কাজ। আমার লক্ষ্য শিল্পীর শিল্প মাধুর্যে নান্দনিক যে সোনার তরীর প্রবহমানতা তার ঠিকানা আত্মমর্যাদা বোধের প্রতিষ্ঠার স্থায়ী বন্দরে।

তথ্যসূত্র:

১. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ- ‘খেয়া’, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, প্রকাশ-১৩১৩, পৃষ্ঠা-৭৬
২. তদেব- পৃষ্ঠা-৭৭
৩. দাশগুপ্ত ড. সুধীরকুমার- ‘কাব্যালোক’(প্রথম খন্ড), দ্বিতীয় সংস্করণ-১৩৬৫, পৃষ্ঠা-৬৭
৪. মৈত্র অমিত: 'রঙ্গালয়ে বঙ্গনটী', তৃতীয় মুদ্রণ-২০১৫, পৃষ্ঠা-৯২
৫. তদেব-পৃষ্ঠা-৯৩
৬. তদেব-পৃষ্ঠা-৯৩
৭. তদেব-পৃষ্ঠা-২৮২
৮. তদেব-পৃষ্ঠা-২৮৪
৯. তদেব-পৃষ্ঠা-২৮৫

গ্রন্থপঞ্জি:

১. নন্দী ড. সুধীর কুমার- ‘নন্দনতত্ত্ব’, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, প্রথম প্রকাশ-১৯৭৯, কলকাতা-৭০০০১৩।
২. ভট্টাচার্য ড. সাধন কুমার- ‘এরিস্টটলের পোয়েটিক্‌স্‌ ও সাহিত্যতত্ত্ব’, দে’জ পাবলিকেশন, কলকাতা-৭০০০৭৩, একাদশ সংস্করণ ২০১৭।
৩. চট্টোপাধ্যায় তপন কুমার- ‘সাহিত্যের রূপরীতি ও তত্ত্ব’, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ- ২০১১।
৪. মুখোপাধ্যায় তরুণ সম্পাদিত- ‘নন্দনতত্ত্ব - জিজ্ঞাসা’,দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৪
৫. জানা ড. স্মরজিৎ- ‘জীবন যৌনতা ও যৌনকর্মী’, দুর্বার প্রকাশনী, কোলকাতা – প্রথম প্রকাশ – ২০০৮
৬. দাশগুপ্ত ড. সুধীরকুমার- ‘কাব্যালোক’(প্রথম খন্ড), প্রকাশক- এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-১২, দ্বিতীয় সংস্করণ-১৩৬৫
৭. গুপ্ত দেবনারায়ণ- ‘বাংলার নট-নটী’ (প্রথম খন্ড), প্রকাশক – বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স, কলকাতা-৭০০০০৬, প্রথম প্রকাশ-শ্রাবণ ১৩৯২
৮. আচার্য নির্মাল্য (সম্পা)- ‘আমার কথা ও অন্যান্য রচনা। বিনোদিনী দাসী’, প্রকাশ-১৩৭৬, প্রকাশক- সুবর্ণরেখা, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯
৯. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ- ‘খেয়া’, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, প্রকাশ-১৩১৩, কলিকাতা-৭
১০. বিদ্যাভূষণ উপেন্দ্রনাথ- ‘বিনোদিনী ও তারাসুন্দরী’, প্রকাশ-১৩২৬, প্রকাশক- শিশির পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, কলেজ স্ট্রিট্‌ মার্কেট
১১. মৈত্র অমিত: 'রঙ্গালয়ে বঙ্গনটী', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭০০০০৯, তৃতীয় মুদ্রণ-২০১৫

ধর্মীয় অভিজ্ঞতায় মুক্তির পথ : দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ এর অভিমত

প্রতিমা ঢালী
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
পোলবা মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণকে আমরা মূলত একজন শিক্ষক হিসেবেই জানি। কিন্তু আমি এখানে দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ-এর ধর্ম বিষয়ক অভিমত নিয়ে আলোচনা করেছি। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ যেহেতু প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের দর্শন চিন্তার দ্বারা দীক্ষিত হন তাই তার দর্শনে আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একটা সমন্বয় লক্ষ্য করি। উক্ত প্রবন্ধে আমি মূলত এটা দেখার চেষ্টা করেছি যে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ ধর্ম বলতে কি বুঝিয়েছেন? প্রকৃত ধর্ম কি?তিনি ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে মুক্তির উপায় হিসেবে দেখিয়েছেন। এই ধর্মীয় অভিজ্ঞতার স্বরূপ কি? ধর্মের স্বরূপ কি বা ধর্মের সারসত্তা কি এবং ধর্মের পথ কি? কিভাবে ধর্মকে আমরা উপলব্ধি করতে পারব? এই বিষয়ে তার যে মতামত সেগুলোই এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এবং তার মত কতটা গ্রহণযোগ্য তা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।
শব্দাবলী : রাধাকৃষ্ণাণ, ধর্মীয় অভিজ্ঞতা, মুক্তির পথ, ধর্মের সারসত্তা, ধর্মের স্বরূপ।

মূল আলোচনা:

১৮৮৮ সালের ৫-ই সেপ্টেম্বর চেন্নাইয়ের তিরুতানি নামক একটি শহরে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে বড় হয়ে ওঠায় তার মধ্যে ভারতীয় দর্শন বোধ তীব্রভাবে লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে নানা পাশ্চাত্য গ্রন্থ পঠন পাঠনের দ্বারা তিনি পাশ্চাত্য দর্শনবোধ আয়ত্ত করেছিলেন। এই কারণে আমরা যখন তার দর্শন চিন্তা নিয়ে আলোচনা করব তখন দেখব যে তার দর্শন চিন্তা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের একটি সমন্বয় ঘটেছে। রাধাকৃষ্ণাণের দর্শন চিন্তা একদিকে যেমন অদ্বৈত বেদান্তের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় তেমনি আবার চরম ভাববাদও লক্ষ্য করা যায়। কারণ আমরা দেখি সত্তা হলো এক এই মতে তিনি বিশ্বাসী। আবার তিনি বলেন সব কিছুই সেই একেরই অবশ্যম্ভাবী দিক। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দর্শন ভাবনার সমন্বয় তার দর্শনে লক্ষ করা গেলেও তিনি লক্ষ্য করেছেন যে প্রাচ্যের দার্শনিকরা মূলত ত্যাগ ও নৈতিকতাকেই জীবনের মূল আদর্শ রূপে স্বীকার করেছেন।অপর দিকে পাশ্চাত্যে দার্শনিকরা সর্বজন গ্রহণযোগ্যতা এবং ব্যবহারিক দিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

রাধাকৃষ্ণানের দর্শনে ধর্মবোধ অন্য রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। তার দর্শনে ধর্ম প্রচলিত ধর্ম থেকে কিয়দ অংশে ভিন্ন স্থান লাভ করেছে। তিনি বলেন ধর্ম কখনোই কোন বিশেষ সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেনি। অসামাজিক এবং মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক কোন কর্ম যদি ধর্মের নাম দিয়ে চালানো হয় তাহলে তা কখনোই সমর্থন করা যাবে না। বর্তমানে বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ কখনো এটা মেনে নেবে না যে ধর্ম একতার পরিবর্তে সাম্প্রদায়িকতাকে বৃদ্ধি করছে। কারণ প্রকৃত ধর্ম সবসময় সাম্য ও একতার কথা বলে। রাধাকৃষ্ণানের মতে ধর্ম মানুষকে বন্ধনের দিকে নয় বরং মুক্তির পথে অগ্রসর করে।

রাধাকৃষ্ণাণ যেহেতু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুটি ভাবধারার সাথেই যুক্ত ছিলেন তাই তিনি লক্ষ্য করেছেন যে ভারতীয় ধর্মের প্রতি পাশ্চাত্যের অশ্রদ্ধা ও অনিহা রয়েছে। তার মূল কারণ হিসেবে তিনি দায়ী করেছেন অযৌক্তিকতা, কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাসকে। শুধু পাশ্চাত্যের জনগণই নয় প্রাচ্যের অধিবাসীরাও এই কারণে ভারতীয় ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা হারিয়েছেন। এজন্য ভারতীয় ধর্মে পরিমার্জন ও পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন তিনি।তথাকথিত ধর্মকে তিনি বৈজ্ঞানিক ও আধুনিকতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করে এটা দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে সমাজের উন্নতি ও বিকাশের দিক থেকে ধর্মের যথার্থ বিকল্প হল একমাত্র বিজ্ঞান। রাধাকৃষ্ণাণ এটা দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে তথাকথিত ধর্ম সমাজের যে বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করেছে তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। যেখানে ঈশ্বর নামে এক সত্তার কল্পনা করা হয় যা ত্রুটিহীন এবং নিঁখুদ যা রাধাকৃষ্ণাণ-এর মতে অবাস্তব। রাধাকৃষ্ণানের মতে ধর্ম হলো কতগুলি বিশ্বাস এবং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ জগত সম্পর্কিত ব্যাখ্যার সমন্বয়। যে ব্যাখ্যা গুলি যাচাই করার কোন সুযোগ নেই। এগুলি নির্ভর করে কেবল কতগুলি বিশ্বাসের উপর। রাধাকৃষ্ণাণ-এর মতে এই ধরনের ধর্মের সমর্থনে কোন যথাযথ কারণ না থাকায় 'An Idealist view of life' নামক গ্রন্থে প্রথম অধ্যায়ে তিনি ধর্মীয় তত্ত্ব গুলিকে ভ্রমাত্মক বলে স্বীকার করেছেন।

ধর্ম অবলম্বী মানুষরা সর্বদাই ধর্মভিত্তিক তত্ত্ব গুলিকে চরম এবং স্থায়ী বলে স্বীকার করেছেন। তারা এই তত্ত্ব গুলিকে প্রতিষ্ঠা করতে চান কিন্তু তা কোন রকম যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে নয় বরং কেবল বিশ্বাস এবং অভ্যাসের মাধ্যমে। তাই এরকম ধর্মের তত্ত্বের পরিবর্তন যদি না হয় তাহলে ধর্মের কোন ব্যবহারিকতা ও উপযোগিতা থাকবে না।রাধাকৃষ্ণাণ দেখিয়েছেন যে জ্ঞানের নিত্যতা, জীবনচক্রের প্রবাহমানতা এই সকল প্রত্যয়কে ধর্মের দ্বারা যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে তা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। এগুলি নিজ গুণেই মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। তথাকথিত ধর্মের প্রতি রাধাকৃষ্ণাণ-এর বিরূপ মনতার একটি অন্যতম কারণ হলো এই ধর্মে দেশ প্রেমের কোন স্থান নেই। এই ধর্ম ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ভালোবাসা ও স্বার্থত্যাগের কথা বলা হয়েছে ঠিকই কিন্তু সেই যেন

কেবলমাত্র একটা প্রথাসিদ্ধ প্রদর্শন মাত্র। প্রত্যেক ধর্মে ধর্মগুরু ধর্মপ্রচারক ধর্মীয় রীতি-নীতি অন্য ধর্মের মানুষ ও তাদের কল্যাণের দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে মানবতা ও মানবিকতার বিরুদ্ধে হয়ে উঠেছে। এক ধর্ম অন্য ধর্মের বিরোধী সেটা কিছু সামাজিক উন্নতির জন্য নয় কেবলমাত্র ধর্মীয় বিধি-নিষেধ এবং সামাজিক পরিকাঠামোর জন্য। এই ধর্মের প্রতি অন্য ধর্মের প্রতিহিংসার ফলে মানব সমাজের বুকে আঘাত নেমে এসেছে। এক ধর্মের প্রতি অন্য ধর্মের ঘৃণা যা মানবতার সব থেকে বড় শত্রু হয়ে উঠেছে। তাই মানব সমাজকে বাঁচাতে গেলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মের তথাকথিত অর্থের প্রয়োগ ভিন্নমাত্রায় করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে উঠেছে।

রাধাকৃষ্ণাণ তথাকথিত ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক যে যুক্তি গুলি ছিল তিনি সেই যুক্তি গুলিও স্বীকার করেননি। কিন্তু তার মানে এটা একদমই নয় যে তিনি ঈশ্বরকে অস্বীকার করেছেন। তিনি ঈশ্বরকে অস্বীকার না করে বরং বলেছেন ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। ঈশ্বরকে তিনি মঙ্গলের প্রতীক বলেছেন। ধর্মে ঈশ্বরকে মঙ্গলের বুদ্ধিমত্তার ও ভালোবাসার শ্রেষ্ঠ সমন্বয় রূপে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাই সেই ঈশ্বর কেন্দ্রিক ধর্মের দ্বারা অমঙ্গল ঘটে তা কখনোই স্বীকার করা যাবে না। ধর্ম হবে একতার ধর্ম।সারা বিশ্ব জুড়ে একই ধর্ম থাকবে। তিনি তাই বলেছেন এই বিশ্ব থেকে যদি সমস্ত ধর্ম সরিয়ে নেওয়া হয় তবে জন্ম নেবে প্রকৃত ধর্ম। রাধাকৃষ্ণাণ মূলত ধর্মকে বর্জন করেননি। তিনি এটা নির্দেশ করার চেষ্টা করেছেন যে কিভাবে ধর্ম সমাজে অনিবার্য ও আরো গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে। সেই ধর্মে ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকেই তিনি প্রধান বলে স্বীকার করেছেন। ধর্ম হবে সেই পথ যার মাধ্যমে মানুষ আস্থা, শান্তি ও আনন্দ লাভ করতে পারে। তাই রাধাকৃষ্ণাণ এর দর্শনে 'ধর্ম' এই প্রত্যয়টি একটু অন্যভাবে আমাদের কাছে উপস্থাপিত হয়েছে। রাধাকৃষ্ণাণ ধর্মকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলেছেন। তার মতে ধর্ম হল মানব মনের এক স্বনির্ভর কার্যকারীতা। মানব মন প্রকৃতিগত চরিত্র সবকিছুকে ত্যাগ করতে পারে কিন্তু ধর্মকে কখনো ত্যাগ করতে পারেনা। তার মতে ধর্ম আমাদের একপ্রকার সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তি দেয়। যার দ্বারা জীবনে অন্তরালে আছে যে সৃজনশীল নীতি যার সাথে আমাদের ক্রমাগত সম্বন্ধ স্থাপন করতে সাহায্য করে।রাধাকৃষ্ণাণ বলেন মানুষের লক্ষ্য হলো পরম আত্মার সঙ্গে একত্ব হওয়া অর্থাৎ মুক্তি। কিন্তু এই মুক্তি কোন একক ব্যক্তির মুক্তি নয়। সর্ব ব্যক্তির মুক্তি হল মূল লক্ষ্য। রাধাকৃষ্ণাণ মনে করেন এই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর একমাত্র উপায় হল ধর্মীয় অভিজ্ঞতা। যা মানুষকে পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করাতে পারে। এই ধর্মীয় অভিজ্ঞতাই মানুষকে ইহ জগতের মোহ অতিক্রম করে আধ্যাত্মিকতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন উত্থাপন হতে পারে যে রাধাকৃষ্ণাণ যে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন তার স্বরূপ কেমন? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা পেয়ে থাকি রাধাকৃষ্ণাণ-এর 'An Idealist View of Life ' নামক গ্রন্থে। এই গ্রন্থে তিনি ধর্মীয় অভিজ্ঞতা নিয়ে সুস্পষ্ট আলোচনা

করেছেন। ধর্মীয় অভিজ্ঞতা কিন্তু মানুষের দেহগত সংবেদনের দ্বারা সৃষ্ট নয়। এগুলি সৃষ্ট হয় মানুষ যখন চিরন্তন সত্যকে উপলব্ধি করার প্রচেষ্টা করে তার দ্বারা। মানুষ যখন তার সসীম সত্তাকে অসীম সত্তার দিকে নিয়ে যায় এবং অসীম সত্তার সঙ্গে একাত্ম বোধ অনুভব করে তখনই মানুষ এই ধরনের অভিজ্ঞতায় উপনীত হয়। মানুষের ধর্মীয় অভিজ্ঞতা সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে পৃথক কারণ সাধারণ অভিজ্ঞতার আমরা জ্ঞানের আকার পাই এবং সেখান থেকে আমরা জাগতিক বস্তুর জ্ঞান গঠন করে থাকি। কিন্তু ধর্মীয় অভিজ্ঞতা জাগতিক বস্তুর জ্ঞানের আকারকে অতিক্রম করে অতীন্দ্রিয় সত্তার অনুভূতি দেয়। এই কারণে বলা হয় ধর্মীয় অভিজ্ঞতা এক ধরনের অধিবিদ্যা অনুভূতি যা আমাদের আধ্যাত্মিকতার উপলব্ধি ঘটায়।

এই ধর্মীয় অভিজ্ঞতার কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা রাধাকৃষ্ণাণ বলেছেন সেগুলি হল :

১. ধর্মীয় অভিজ্ঞতা হলো এক ধরনের অভিজ্ঞতা। এটি কোন অতিপ্রাকৃতিক কিছু নয়। এমন অভিজ্ঞতা সকল মানুষেরই হয়ে থাকে এবং এর মধ্যে বস্তুগত সচেতনতাও থাকে।

২. ধর্মীয় অভিজ্ঞতা হল অবিচ্ছেদ্য ও অখন্ড চেতনা স্বরূপ। এই প্রকার অভিজ্ঞতার কোন রকম কর্তৃ ও কর্ম ভেদ থাকে না। অর্থাৎ এইরকম অভিজ্ঞতায় চেতনা ও সত্তা পরস্পর স্বতন্ত্র নয়। সকল চেতনা সত্তা রূপে আবার সকল সত্তা চেতনা রূপে প্রতিভাত হয়।

৩. এই অভিজ্ঞতা যেহেতু মনের স্বাধীন ক্রিয়ার অংশ তাই এটা কোন বাহ্যিক উপাদানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না।

৪. ধর্মীয় অভিজ্ঞতা হল মানুষের অন্তরে বিকশিত এক অভিজ্ঞতা যা ব্যক্তিগত।

৫. ধর্মীয় অভিজ্ঞতা আংশিক নয়। এটি জ্ঞাতার সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এটি সকল মানুষের বৌদ্ধিক, নৈতিক ও নান্দনিক সকল দিকের একটি সমষ্টি বদ্ধ প্রতিক্রিয়া।

৬. এই ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ফলে ইতিবাচক অনুভূতি লাভ করা যায়। বাহ্যিক দুঃখ কষ্টের মাঝে এক প্রশান্তি, আনন্দ অনুভব জন্মায় এই অভিজ্ঞতার ফলে। এই আনন্দ অনুভবের সাথে সাথে আবার মুক্তির অনুভব হয়। কারণ ধর্মীয় অভিজ্ঞতা মানুষকে দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তির অনুভূতি দিয়ে থাকে।

৭. এই অভিজ্ঞতার স্বরূপ বর্ণনা করার জন্য রাধাকৃষ্ণাণ 'স্বতপ্রতিষ্ঠিত', 'স্বতপ্রমাণ', 'স্বতপ্রকাশ' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার করেছেন।

যে জীবনে আগে থেকেই ধর্মীয় অভিজ্ঞতা এবং পরম সত্তাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে তাকে ধর্মীয় জীবন বলা হয়। এই কারণে জন্য ধর্মীয় অভিজ্ঞতার স্বরূপের ব্যাখ্যার দ্বারাই ধর্মের স্বরূপ নির্ধারিত হয়ে যায়।রাধাকৃষ্ণাণ বলেছেন ধর্ম কোন ধর্মমত বা বিধি নয় তা সত্তার প্রতি অন্তর দৃষ্টি। এই অন্তর দৃষ্টির ফলে মানুষ বুঝতে পারে যে

সে সর্বদা মানবাত্মার অন্তর্নিহিত তার নিজের থেকে মহত্তর কোন সত্তা বা পরম সত্তায়। এই সত্তাই অসীম ও সসীমের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত করে। এই ধরনের মতে ধর্ম হল তাই যা মানুষের মধ্যে যে ঐশ্বরিক সত্তা আছে তাকে প্রকাশের জন্য নিজের স্বরূপের পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করে থাকে। ধর্মের দ্বারাই পরম আধ্যাত্মিক মূল্যের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি বিশ্বাস গড়ে ওঠে। এই কারণের জন্য বলা হয় ধর্ম হলো ধর্মীয় অভিজ্ঞতার শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি।

রাধাকৃষ্ণাণ-এর মতে কেবল ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে মানুষ মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা লাভ করা খুব সহজসাধ্য নয়। তার জন্য নিজের মধ্যে সংগ্রামের প্রয়োজন। রাধাকৃষ্ণাণ-এর মতে এই সংগ্রাম দুই স্তরে করতে হয়। প্রথম স্তরকে বলা হয় প্রস্তুতির স্তর এবং দ্বিতীয় স্তরকে বলা হয় চূড়ান্ত আঘাতের স্তর। বৌদ্ধিক ও নৈতিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে প্রথম স্তর। এই স্তরে উপাসনা ও প্রার্থনা করা হয়। দ্বিতীয় স্তরটি হল ধ্যান ও ভালোবাসার স্তর। এই স্তরে আত্মত্যাগের মাধ্যমে এক পরম অন্তর মুখী বিশুদ্ধতা লাভ করা যায়। অহম হলো আমাদের অজ্ঞানের মূল কারণ। এটাই আমাদের বিশ্বাসকে উপলব্ধি করতে দেয় না। তাই অজ্ঞান দূর করে সত্যকে জানার জন্য অহং এর থেকে নিজেকে ভিন্ন করতে হবে। রাধাকৃষ্ণাণ একেই 'বৌদ্ধিক প্রগতি' বলেছেন। এই বৌদ্ধিক প্রগতি আমাদের মোহ,অজ্ঞান, দূর করতে সাহায্য করে। ব্যক্তি তার আত্মাকে বাহ্যিক সকল ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্তর মুখী হয়ে সমাধির পথে অগ্রসর হতে পারে। এই স্তরে আত্মা নিজেকে ইন্দ্রিয় ও অহং থেকে সরিয়ে নিয়ে পরমাত্মা বা পরম সত্তার ধ্যানে মগ্ন হতে পারে। এই নীরব ধ্যানকে রাধাকৃষ্ণাণ মৌলিক বিষয়ও বলেছেন। কারণ পূজা অর্চনা বিভিন্ন মানুষের কাছে বিভিন্ন হতে পারে কিন্তু নীরব ধ্যান একই। রাধাকৃষ্ণাণ নীরব ধ্যানকে চরম ও চূড়ান্ত বিষয়ে বলেছেন। তার মতে চোখ বন্ধ করে নিজের অন্তরের দিকে তাকালে গভীর ধ্যানের মাধ্যমে আমরা আমাদের অন্তর স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারি। আত্ম সংযোগের এমন নীরব মুহূর্তে যেভাবে ধর্মীয় জীবন গড়ে ওঠে তা প্রার্থনা বা আচার অনুষ্ঠানের দ্বারা সম্ভব নয়। এরকম নীরব ধ্যান আমাদের চরিত্র সংযম এবং ব্যক্তিত্ব গঠন করতে সাহায্য করে। ধর্মীয় পথ আমাদের আত্ম উন্নয়ন ঘটায়, আবেগকে সংশোধিত করে এবং চিন্তাকে প্রগাঢ় করতে সাহায্য করে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. Dr. S. Radhakrishnan, 2009,'An Idealist View of Life', Harper Collins publisher, India.

২. ঘোষ গোবিন্দ চরণ, ২০২০,সমকালীন ভারতীয় দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিকেশন, কলকাতা ৭৭, অক্টোবর

৩. সেন পৃথ্বীরাজ, ২০১৭, শিক্ষাগুরু ড: সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন , আদ্রিশ পাবলিকেশন, কলকাতা.

৪. ভট্টাচার্য সমরেন্দ্র ও মুখোপাধ্যায় গৌতম, ২০২১, স্নাতক সমকালীন ভারতীয় দর্শন, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা.

৫. চক্রবর্তী নির্মাল্য নারায়ণ, ২০২৩ ,বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দর্শন চর্চা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা।

৬. পান সংযুক্তা ও সেখ ইসমাইল, ২০২১, সমকালীন ভারতীয় দর্শন, রেডিয়ানস, কলকাতা

প্রান্তিক মানব-পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুজীবনের কথা : একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ পর্যালোচনা

রঘুনাথ রায়
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, তেহট্ট

সারসংক্ষেপ: প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী ছিলেন সেই ব্যতিক্রমী ঐতিহাসিকদের অন্যতম একজন যিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন বৃহত্তর পরিসরে পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদের সমস্যাকে তুলে ধরার কাজে। তাই বিগত শতকের শেষদিক থেকে দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যার ইতিহাস নিয়ে যে ব্যাপকচর্চা পশ্চিমবঙ্গের শুরু হয় তার অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী। ১৯৯০ সালে প্রকাশিত তাঁর 'দ্য মার্জিনাল ম্যান' বইটি দীর্ঘ গবেষণার ফসল। বইটির নায়ক-বিপুল উদ্বাস্তু বাঙালি জনগোষ্ঠীর কথা মাথায় রেখে বাংলা সংস্করন অর্থাৎ "প্রান্তিক মানব-পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুজীবনের কথা" ১৯৯৭ সালে দীপ প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। 'প্রান্তিক মানব-পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুজীবনের কথা' বইটির ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করা আমার আলোচনার মূল বিষয়। একাদশ অধ্যায়- এ বিভক্ত বইটিতে রয়েছে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষের স্থান থেকে স্থানান্তরে ভ্রাম্যমানতার ইতিবৃত্ত। অধ্যায়ভিত্তিক আলোচনায় উঠে এসেছে- বিভিন্ন পর্যায়ে উদ্বাস্তুদের আগমন, রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে, ক্যাম্পে, কলোনিগুলিতে উদ্বাস্তুদের নরক যন্ত্রণা ভোগ, উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সরকারী উদাসীনতার মর্মস্পর্শী বিবরণ, সংযুক্ত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ (UCRC)র নেতৃত্বে উদ্বাস্তুদের প্রতিরোধ আন্দোলন, এবং উদ্বাস্তু-বাম রাজনৈতিক বোঝাপড়ার পরিপেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পালা বদলের ইতিহাস। বইটি থেকে বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় যেগুলি বইটির বিশেষত্বকে উন্মোচিত করে। পাশাপাশি বেশ কয়েকটি ত্রুটি লক্ষণীয়। ত্রুটি সত্ত্বেও বইটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী নিজে উল্লেখ করেননি কিন্তু দেশভাগ পরবর্তী ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ আরও কিছু বিষয় আছে যা তাঁর বই থেকে উঠে এসেছে।

শব্দসূচক: প্রান্তিক মানব, উদ্বাস্তু বাঙালি, ভ্রাম্যমানতার ইতিবৃত্ত, সংযুক্ত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ, ইত্যাদি।

প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী-র জন্ম ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত ফরিদপুর জেলার মাদারীপুরে। পিতা ছিলেন ডাক্তার পরেশনাথ চক্রবর্তী এবং মাতা শোভাময়ী দেবী। মাদারীপুর হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে আর্টস ক্লাসে অধ্যায়ন করেন। ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে অনার্স ও এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এম এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উচ্চ স্থান অধিকার করেন। ১৯৫০ এর দাঙ্গার পর বাবা, মা, ছোট ছোট পাঁচ ভাই বোন ও স্ত্রীকে নিয়ে তিনি কলকাতায় আসেন। শিয়ালদহ স্টেশনে থেকে যাদবপুরের একটি ক্যাম্পে কিছুদিন থাকার পর এলিয়ট রোডের উল্টোদিকে বেনেপুকুর লেনে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন। এই সময় থেকেই উদ্বাস্তু জীবনের যাত্রা শুরু হয়েছিল। কর্মজীবনে প্রথমে চারুচন্দ্র কলেজ তারপর বিজয়গড় কলেজ-এ কিছু সময়ের জন্য পড়ানোর দায়িত্ব পান। এরপর পাঁচ বছর দার্জিলিং তারপর কৃষ্ণনগর, বারাসাত, মৌলানা আজাদ সহ বিভিন্ন সরকারি কলেজে অধ্যাপনার পর চন্দননগর কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তারপর কিছুদিন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। তাঁর কর্মজীবনও ছিল ট্রান্সফারের। হয়তো এই স্থানান্তর হওয়া এবং বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে মেশা তাদের সাথে একত্রিত হওয়া এখান থেকেই তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন সেটাই পরবর্তীকালে গবেষণার ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছিলেন। ভালোবাসায়, স্নেহে এবং প্রতিবাদে অধ্যাপক প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী ছিলেন এক বিরল মানুষ। নিজের নীতি ও বিশ্বাসে আপসহীন এই প্রতিবাদী মানুষটি ব্যক্তি জীবনের বহুবিধ অস্থিরতা, অনিয়ম এবং হতাশার মধ্যেও সাধারণ মানুষের সমস্যাদীর্ণ জীবনে নিজেকে নিয়ত নিযুক্ত রেখেছিলেন। রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপক এই মানুষটি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সুদীর্ঘকাল মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে একুশে নভেম্বর ২০০০ সালে প্রয়াত হন।

স্বাধীনতার ৭৭ বছর পর দেশভাগের গর্ভে জন্ম নেওয়া উদ্বাস্তু জীবন ও উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে ইদানিং গবেষনা বেড়েছে। কিন্তু ১৯৯০ সালে প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তীর লেখা বহু আলোচিত ও সমালোচিত "দ্য মার্জিন্যাল ম্যান" যার বাংলা অনুবাদ "প্রান্তিক মানব-পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুজীবনের কথা" বইটি পশ্চিমবাংলার উদ্বাস্তু জীবনের সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক দলিল। পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু ও উদ্বাস্তুজীবন নিয়ে প্রথমদিকে যাঁরা লিখেছেন তাঁদের রচনায় উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীর পূর্নাঙ্গ ইতিহাস রচিত হয়নি। সেই দিক থেকে বইটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। লেখকের অদম্য জেদ ও অনড় মানসিকতা্র সাথে ইতিহাসের অনুসন্ধানী মানসিকতা মিশ্রিত হয়ে নতুন তথ্য উন্মোচিত হয়েছে যেখানে গুরুত্ব পেয়েছে দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবাংলায় আগত রাস্তার ধারে, রেললাইনের পাশে ভবঘুরে সেইসব 'প্রান্তিক মানব'দের জীবন সংগ্রাম। উদ্বাস্তু কলোনি ও উদ্বাস্তু ক্যাম্পগুলিতে প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে উদ্বাস্তু জনসমষ্টির সাথে একাত্মবোধ গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের বেদনা, হাহাকার ও অমানসিক যন্ত্রনা অনুধাবনে শুধুমাত্র সহানুভূতি নয়, তিনি ছিলেন সমব্যাথী। লেখক মন প্রান দিয়ে উদ্বাস্তু মননকে উপলদ্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁদের সম্পর্কে তাঁর সম-অনুভূতি অর্থ্যাৎ সমানুভূতি ছিল। 'প্রান্তিক মানব'-দের দুইদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি বিশেষত ধর্মীয় কারণে বাস্তুহারা, ছিন্নমূল, উদ্বাস্তু, ও শরণার্থী পরিচয় পেতে হয়েছে। প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী তাঁর লেখায় বেশ কতগুলী দ্বন্দ্বমূলক সমস্যা ও সমস্যার কারন অনুসন্ধান করে

উদ্বাস্তুদের জীবন সংগ্রাম রচনা করেছেন। স্থানগত দিক থেকে পাঞ্জাব-বাংলা, জাতিগত দিক থেকে বাঙ্গালী–অবাঙ্গালী, ধর্মগত দিক থেকে হিন্দু-মুসলমান, রাজনৈতিক দিক থেকে কেন্দ্র-রাজ্য এবং বাম-ডানপন্থীদল- এই দ্বন্দমূলক সমস্যাগুলী দেখা দিয়েছিল এটা ঐতিহাসিক সত্য। এই সমস্যাগুলীকে রাজনীতি ও ধর্মের সঙ্গে মিশিয়ে ক্ষমতাসীন এবং ক্ষমতায় আগত শক্তি 'প্রান্তিক মানব' গোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানকে নিয়ন্ত্রন করেছে। বামপন্থী ও ডানপন্থী শক্তি তাদের পাশে দাঁড়ালেও উদ্বাস্তু আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি ছিল এই 'প্রান্তিক মানব'রাই। পাশাপাশি এই বইটির মূল নায়ক অর্থ্যাৎ 'প্রান্তিক মানব'' বা উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে গবেষনা করতে গিয়ে লেখককে যে সমস্যার সন্মুখীন হতে হয়েছে তা বহু গবেষককে হতে হয়। প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তীকেও অবজ্ঞাভরা উন্নাসিক উক্তি শুনতে হয়েছে, "কাদের (বাঙ্গালী উদ্বাস্তু) নিয়ে বই লিখছেন আপনি?" যদিও লেখকের হার না মানা মানসিকতা শেষ পর্যন্ত জয় লাভ করেছে। তবে বিষয় নির্বাচন লেখকের ব্যাক্তিগত জীবনচর্যাকে স্পর্শ করেছিল বলেই হয়তো মূল চরিত্রকে সকলের সামনে জীবন্ত করে তুলে ধরতে পেরেছিলেন। সম্ভবনা ছিল পক্ষপাতিত্বমূলক ইতিহাসের কিন্তু এখানেও ঐতিহাসিক নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেছেন। অপ্রিয় কিছু সত্য সেই কারনেই উঠে এসেছে। নিরপেক্ষতা যদি লঙ্ঘিত হয়ে থাকে তবে তা যৎসামান্য।

উদ্বাস্তুর সংজ্ঞা নিয়ে বির্তক আছে। তিনি কিন্তু বইটির নামকরনের ক্ষেত্রে, উদ্বাস্ত কথাটি ব্যবহার করেননি যদিও পুরো বইটির মূল বিষয়বস্তু কিন্তু উদ্বাস্তু আন্দোলনের ইতিহাস। উদ্বাস্তু আর প্রান্তিক মানব বা মার্জিন্যাল ম্যান কি একই নাকী এর পার্থক্য রয়েছে। বলা যেতে পারে সব মার্জিন্যাল ম্যান বা প্রান্তিক মানব, উদ্বাস্তু কিন্তু সকল উদ্বাস্তু মার্জিন্যাল ম্যান বা প্রান্তিক মানব নয়। এখানে এই নামকরনের ক্ষেত্রে উদ্বাস্তুদের মধ্যে শ্রেনীগতভাবে যারা ভবঘুরে, রাস্তার ধারে, রেললাইনের পাশে অবস্থান করছে তাদের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করেছেন। প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী উদ্বাস্তুদের তিনটি ভাগের মধ্যে যারা অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে তাদের কথা বেশী বলেছেন। প্রান্তিক মানবের ধারনা সেখান থেকেই।

প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তীর "প্রান্তিক মানব-পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুজীবনের কথা" বইটি দেশভাগ, উদ্বাস্তুজীবন, উদ্বাস্তু আন্দোলন নিয়ে বিপুল শ্রমসাধ্য লেখা। একাদশ অধ্যায়-এ বিভক্ত বইটিতে রয়েছে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষের স্থান থেকে স্থানান্তরে ভ্রাম্যমানতার ইতিবৃত্ত। পাশাপাশি ছিন্নমূল প্রতারিত উপেক্ষিত যে মানুষগুলি শুধুমাত্র হিন্দু হওয়ার কারণে পূর্ব বাংলা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল এবং এপার বাংলায় এসে উপেক্ষা ও প্রতারণা এবং সরকারি উদাসীনতার কবলে পড়ে শয়ে শয়ে মারা গিয়েছিল তাদের কথায় তিনি তুলে ধরেছেন।

বইটির মুখবন্ধে তিনি লিখেছেন, কেন তিনি 'দ্য মার্জিনাল ম্যান' বইটির বাংলা সংস্করন করেছিলেন। ১৯৯০ সালে দ্য মার্জিন্যাল ম্যান বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই বইটিতে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের দুঃসহ জীবনযন্ত্রনার ও আন্দোলনের কাহিনী বিবৃত। দেশ বিদেশের বহু পাঠক পাঠিকা বইটির উচ্ছ্বসিত প্রসংসা করে লেখকের কাছে চিঠি মারফৎ অনুরোধ জানিয়েছিল বইটির একটি সংক্ষিপ্ত বাংলা সংস্করন প্রকাশ করার। তাঁদের বক্তব্য ছিল এই যে, এই বইয়ের যারা নায়ক-বিপুল উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠী–ইংরাজিতে লেখা বইটি তাঁদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। বইটির নায়ক-বিপুল উদ্বাস্তু বাঙালি জনগোষ্ঠীর কথা মাথায় রেখে বইটির বাংলা সংস্করন অর্থাৎ "প্রান্তিক মানব-পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুজীবনের কথা" ১৯৯৭ সালে দীপ প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রথম অধ্যায়-এ দেশভাগের ফলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবাংলায় উদ্বাস্তুদের উদ্ভাসনের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়-এ সংখ্যা ও সময়কালকে চিহ্নিত করে দেখানো হয়েছে। প্রথম পর্যায় (প্রায় ১০ লক্ষ) ১৯৪৬ এর নোয়াখালী দাঙ্গার পর থেকে শুরু হয় এবং শেষ হয় ১৯৪৯ সালে। দ্বিতীয় পর্যায় (প্রায় ৩৫ লক্ষ) ১৯৫০-৫১ এবং তৃতীয় পর্যায় ১৯৬০-৬১-তে শুরু হয়। পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৯৬১-৬৫ -র মধ্যে ১০ লক্ষ উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে আসে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরও এই আগমন ক্ষীনমাত্রায় চলেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়-এ দেশভাগের পর পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তু হিন্দুদের দেশত্যাগের কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেখানে হিন্দুদের চলে আসার কারণ হিসেবে হিন্দু নারীদের নিরাপত্তা বোধ বিনষ্ট হওয়া, অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাব, মানসিক যন্ত্রণা, ধর্মীয় ও সামাজিক নির্যাতন প্রভৃতিকে তুলে ধরা হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান সরকার সংখ্যালঘুদের (হিন্দুদের) ধর্মীয় ও সামাজিক নির্যাতনের দিকে একেবারে চোখ বুজেছিল। সংখ্যালঘু বিদ্বেষী মুসলমানদের সঙ্গে পাকিস্তানের প্রশাসনের যোগ সাজস ছিল। এতে হিন্দুদের মনে পাকিস্তানের সরকারের প্রতি অনাস্থা জন্মে ছিল। যাই হোক ভিটেমাটি ছেড়ে উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গে অস্থায়ী বাসস্থান হিসেবে শিয়ালদা স্টেশনে ঠাঁই নিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিয়ালদা স্টেশন থেকে উদ্বাস্তু আশ্রয় শিবিরে বা সরকারি ক্যাম্পে তাদের থাকার ব্যবস্থা করেছিল যদিও ক্যাম্পে সকলের থাকার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। নিরবিচ্ছিন্ন উদ্বাস্তু প্রবাহ সমস্যা সমাধানকল্পে কেন্দ্র বা রাজ্য উভয় সরকারই যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারেনি। অধ্যাপক চক্রবর্তী তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করে বলেছেন পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুদের তুলনায় বাংলার উদ্বাস্তুদের সমস্যার সমাধানে কেন্দ্রীয় সরকার অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব দিয়েছেন।

তৃতীয় অধ্যায়-এ তিনি দেখিয়েছেন, যে সকল উদ্বাস্তু শিয়ালদহ স্টেশন ও ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়নি, যাদের আর্থিক অবস্থা তুলনায় উন্নত, যারা সরকারি ডোল ব্যবস্থায় আত্মমর্যাদার হানি হবে বলে তা নেয়নি, তারা কীভাবে কলকাতার শহরতলীতে ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র জবরদখল কলোনি প্রতিষ্ঠা করেছিল। প্রথম উদ্বাস্তুদের দ্বারা

গঠিত কলোনি ছিল বিজয়গড়। নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ করার তাগিদেই তারা প্রথমে নিখিলবঙ্গ বাস্তহারা কর্মপরিষদ এবং পরে কেন্দ্রীয় উদ্বাস্তু সংগঠন অর্থাৎ সংযুক্ত কেন্দ্রীয় বাস্তহারা পরিষদ (United Central Refugee Council যা ইউ.সি.আর.সি নামে পরিচিতি) নামে সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করে। বাস্তহারা কর্মপরিষদের নেত্রীবর্গ জবরদখল কলোনি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সোদপুরে দেশবন্ধু নগর, নৈহাটিতে বিজয়নগর কলোনি এবং কাঁচরাপাড়ায় শহীদ নগর কলোনী প্রতিষ্ঠা করে।

চতুর্থ অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে, একদিকে সরকারি প্রশাসনের উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসনের সমস্যা সমাধানের ব্যর্থতা অপরদিকে জবরদখল কলোনি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন উদ্বাস্তুদের একটি কেন্দ্রীয় উদ্বাস্তু সংগঠনের পথকে প্রশস্ত করেছিল। অম্বিকা চক্রবর্তী, অনিল সিংহ, গোপাল ব্যানার্জি প্রমুখদের উদ্যোগে সব উদ্বাস্তু কলোনি সংগঠন ও বিভিন্ন বামপন্থী দলগুলি মিলিত হয়ে ''সংযুক্তকেন্দ্রীয় বাস্তহারা পরিষদ" গঠন করে। সংযুক্ত কেন্দ্রীয় বাস্তহারা পরিষদের জন্ম পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। এরপর থেকে উদ্বাস্তুদের সভা সমিতি মিছিল ও বিক্ষোভের মাধ্যমে নতুন লড়াই শুরু হয়।

পঞ্চম অধ্যায় হল পশ্চিমবঙ্গে জবরদখল কলোনী প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিবরন। যেখানে শুরু হয়েছিল জমি মালিকের গুন্ডাবাহিনী ও পুলিশী হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মাধ্যমে জবরদখল কলোনিগুলোকে টিকিয়ে রাখার লড়াই। পরবর্তী পর্যায়ে জবরদখল কলোনি উচ্ছেদ আইনের বিরুদ্ধে লড়াই আদালত পর্যন্ত গড়ালো। এছাড়া দেখা দিয়েছিল উদ্বাস্তু কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন পরিষদ এবং সংযুক্ত কেন্দ্রীয় বাস্তহারা পরিষদের মধ্যে বিভেদ।

ষষ্ঠ অধ্যায়-এ রয়েছে উদ্বাস্তু কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন পরিষদ (ইউ সি আর সি)-এর নেতৃত্বে উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনের বিবরন। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতেও ইউ সি আর সি নায়কের ভূমিকা অবতীর্ণ হয়। তৎকালীন রাজনৈতিক দলগুলো উদ্বাস্তুদের দাবি-দাওয়ার পূরণে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে নির্বাচন অভিযানে ফায়দা তুলেছিল। অপরদিকে উদ্বাস্তুরাও পুনর্বাসন সহ বিভিন্ন দাবি-দাওয়া পূরণের আশায় কখনো ক্ষমতাসীন সরকার আবার কখনো বিরোধী বামপন্থী দলগুলোর সাথে সমঝোতা করেছিল। বলা চলে জবরদখল কলোনি উচ্ছেদ আইনের বিরুদ্ধে ইউ সি আর সির আন্দোলন সফল হয়েছিল।

সপ্তম অধ্যায়ে সর্বহারা হয়ে আসা উদ্বাস্তুদের সরকারি ত্রানশিবিরের বিবরন তুলে ধরা হয়েছে। সরকারি ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেওয়া উদ্বাস্তুদের অধিকাংশ ছিল কৃষক, জেল্ তাঁতি, মিস্ত্রি, গ্রামীন স্কুল শিক্ষক প্রভৃতি মূলত গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে সংযুক্ত মানুষ। শিয়ালদা স্টেশন থেকে তাদের স্থান হয়েছিল সরকারি ত্রাণ শিবির যেখানে তাদের "ডোল ব্যবস্থা"ই ছিল সম্বল। রানাঘাট কুপার্স ক্যাম্পে প্রায় ৭০ হাজার উদ্বাস্তুকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও ধুবুলিয়া ও কাশিপুর ক্যাম্প দুটোও ছিল

যন্ত্রণাদায়ক। ক্যাম্প জীবন কতটা দুর্বিষহ কতটা যন্ত্রণাদায়ক তার বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়-এ দেখানো হয়েছে, সরকারের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়ার সুচিন্তিত পরিকল্পনা না থাকায় পশ্চিমবঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ক্যাম্প উদ্বাস্তুরা কীভাবে সরকার বিরোধী সত্যাগ্রহ আন্দোলনের দিকে পা বাড়ায়। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সবচেয়ে বড় ক্যাম্প ছিল বিহারের চম্পারণের বেতিয়া। পশ্চিমবঙ্গে সরকারি ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের সমস্যা সমাধানের জন্য উড়িষ্যার দণ্ডকারণে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। উদ্বাসুদের জোর করে দণ্ডকারণে পাঠাবার সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে উদ্বাস্তুদের সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হয়। এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন নমঃশূদ্রদের নেতৃত্বে ও 'সারা বাংলা বাস্তুহারা সম্মেলন' এর সহযোগীতায় হয়েছিল। এই সময় থেকেই উদ্বাস্তু আন্দোলনের ক্ষেত্রে ইউসিআরসি এর সাথে নমঃশূদ্রদের বিভেদ শুরু হয়ে। দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করেই কংগ্রেস ও বামদলগুলির ভোটব্যাঙ্ক অটুট রাখার রাজনীতি উৎসাহ পেয়েছিল।

নবম অধ্যায়-এ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন নীতি প্রসঙ্গে ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিকল্পনাগুলি দেখানো হয়েছে। তথ্য সংগ্রহকারি কমিটি প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পুনর্বাসন প্রকল্পকে ১) গ্রামীণ পুনর্বাসন ২) কৃষি ৩) শহুরে পুনর্বাসন এবং ৪) শিক্ষা কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ -এই চারটি ভাগে বিভক্ত করে সহায়তা করা হয়েছিল। লেখক উদ্বাস্তু হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানী ও পশ্চিম পাকিস্তানি মানুষদের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের আচরণের পার্থক্য তথ্যসহ তুলে ধরেছেন। যেখানে তিনি দেখিয়েছেন ১) ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ব্যায়, ২) ক্ষতিপূরণ দান,৩) আবাসন নির্মাণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের সব ক্ষেত্রেই বঞ্চিত করা হয়েছে।

দশম অধ্যায়ে, দেখিয়েছেন উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানকল্পে কীভাবে বামপন্থী রাজনীতির উদ্ভব হয়েছিল। বাম দলগুলি নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে সরকার ও বাম দলগুলির মধ্যে ক্ষমতার লড়াইয়ের প্রেক্ষাপটে উদ্বাস্তু শক্তি ছিল এক নতুন প্রেরণা। বামপন্থী দলগুলির ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিরোধ আন্দোলনে উদ্বাস্তরাও অংশগ্রহণ করে। ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনেও উদ্বাস্তুদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

একাদশ অধ্যায়ে, লেখক পুনরবলোকন-এর ভিত্তিতে তিনি দেখিয়েছেন ১৯৭৭-এর নির্বাচনে বামপন্থী দলগুলির শক্তির উৎস ছিল রাজ্যের বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু। এছাড়া জেলাভিত্তিক জবরদখল কলোনি, সরকারি পুনর্বাসন কলোনি ও প্রাইভেট কলোনির পরিসংখ্যানসহ তালিকা তুলে ধরেছেন।

সবশেষে বইটির সংযোজন-এ ইংরেজিতে লেখা ‘দ্য মার্জিনাল ম্যান’ বইটি কিভাবে লেখা হয়েছিল তার উল্লেখ করেছেন। ‘কালান্তর’ পত্রিকায় তিনি ১৯৯৯ থেকে ২০০০ সালে ধারাবাহিকভাবে ‘একটি বইয়ের উৎস সন্ধানে’ নামক রচনাটি

লিখেছিলেন। যেখানে তিনি উদ্ভ্রান্ত, দিশেহারা, মৃত্যু পথযাত্রী উদ্বাস্তু মানুষগুলোর প্রতি অসম্ভব ভালবাসা থেকে লিখেছিলেন আসলে লেখক এই প্রত্যেকটি ক্লান্ত, পীড়িত মানুষের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পেয়েছিলেন। ঘরছাড়া, ক্লান্ত মানুষ গোষ্ঠীকে একটি বইয়ে ধরে রাখার দুঃসাধ্য পরিকল্পনা থেকে লিখেছিলেন। ১২ বছর ধরে বইটি লিখতে গিয়ে তিনি যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছিলেন সেটাই এখানে উল্লেখ করেছেন।

প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী উত্তরপ্রদেশে পুনর্বসতি প্রাপ্ত বাঙালি উদ্বাস্তুদের অবিসংবাদিতা নেতা পুলিন মণ্ডল-এর বিবরণ দিয়ে বইটি শেষ করেছেন। পুলিন মণ্ডল প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যতদিন না বাঙালি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্পূর্ণ হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত তিনি গায়ে জামা দেবেন না। তাঁর বাড়িতে থেকে, খেয়ে, অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের উপলব্ধি করে তিনি উদ্বাস্তু জীবনের যাপন- কথা লিখেছিলেন।

প্রান্তিক মানব বইটি থেকে বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় যেগুলি বইটির বিশেষত্বকে উন্মোচিত করে। প্রথমত, দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে নিজেদের খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান এবং অধিকার অর্জনের লড়াইএর ইতিহাস এই বইয়ের মূল বিষয়বস্তু। লেখক অত্যন্ত নিখুঁতভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের আগমন, রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে, ক্যাম্পে, কলোনিগুলিতে উদ্বাস্তুদের নরক যন্ত্রণা ভোগ, উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সরকারী উদাসীনতার মর্মস্পর্শী বিবরণ সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

দ্বিতীয়ত, এই বইটিতে উদ্বাস্তুদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। প্রথম শ্রেণির মানুষেরা দেশভাগের ফলে সম্পত্তি হারালেও দেশভাগের প্রচন্ড আজ তাদের গায়ে লাগেনি যাদের নিজের চেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গে নতুন বাসস্থান কেনা বা বিনিময়ের মাধ্যমে যোগাড় করা সম্ভব ছিল। এরা ছিল ভূমধ্যকারী এবং উচ্চবিত্ত। দ্বিতীয় শ্রেণি ছিল নিম্ন মধ্যবিত্তরা। তারা সরকারি ঋণ অথবা নিজেদের টাকা দিয়ে বসবাসের জায়গা কিনে নেয় নয়তো ফাঁকা বাড়ি, জমি, ব্যারাক দখল করে নেয় এবং শেষ পর্যন্ত জবর দখল কলোনি প্রতিষ্ঠা করে। জীবিকার প্রয়োজনেই এরা কলকাতার কাছাকাছি অঞ্চলকেই বেছে নেয়। কলকাতার স্থানীয় লোকেদের সাথে প্রাথমিক অবস্থায় দ্বন্দ্ব দেখা না দিলেও পরবর্তীকালে জবরদখল কলোনি প্রতিষ্ঠাতা কেন্দ্র করে লড়াই শুরু হয়েছিল। কলকাতার দক্ষিণ থেকে শুরু করে সারা উত্তর শহরতলী জুড়ে একেবারে নদীয়া জেলা পর্যন্ত এক এক করে গজিয়ে উঠেছিল বহু জবরদখল রিফিউজি কলোনি। ঘটি-বাঙাল দ্বন্দ্বের উৎপত্তিও এখান থেকেই আবার উদ্বাস্তু আন্দোলনের নেতৃত্ব ও রাজনীতি এই শ্রেণীর মধ্যে থেকেই উঠে আসে। তৃতীয় শ্রেণীটি হল কৃষিজীবী ও কারিগর যারা প্রথম দিকে সরকারি ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছিল। সেখানকার অবস্থা এবং অবস্তা দুটোই ছিল অকল্পনীয় পরে তাদের অনেককে দণ্ডকারণ্য পুনর্বাসনের জন্য পাঠানো হয়। আবার শেষ পর্বে কৃষিজীবী উদ্বাস্তুদের অনেককেই আন্দামানে পাঠানো হয়েছিল।

তৃতীয়ত, উদ্বাস্তুদের প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রধান দুটি সংগঠন ছিল সংযুক্ত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ (UCRC) ও সারা বাংলা বাস্তুহারা সম্মেলন। দুটির ক্ষেত্রেই পেছন থেকে সাহায্য করে বামপন্থী দলগুলি।

চতুর্থত, পশ্চিমবাংলার আগত এই উদ্বাস্তুরাই ছিল সমস্ত বামপন্থী আন্দোলনের ভিত্তি স্বরূপ। সেই আন্দোলনের সাংগঠনিক ইতিহাস, তার নেতৃত্বের চেহারা, ধীরে ধীরে সেই আন্দোলনের উপর বাম দলগুলোর যৌথ কর্তৃত্ব স্থাপন বিশদভাবে বর্ণিত। উদ্বাস্তু-বাম রাজনৈতিক বোঝাপড়াই পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পালা বদলের অন্যতম কারণ।

পঞ্চমত, প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তীকে এই বই লেখার জন্য উৎস সন্ধান করতে গিয়ে যে সমস্যা এবং সংগ্রামের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা অকল্পনীয়। যদিও এই সমস্যার সমাধানে লেখকের অদম্য জেদ ও অনর মানসিকতা বই লেখার ক্ষেত্রে বা গবেষণার ক্ষেত্রে যে কোন গবেষককে বা লেখককে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করবে।

ষষ্ঠত, লেখক প্রাথমিক উপাদানের অপতুলতার সম্মুখীন প্রতিনিয়ত হয়েছিলেন। তাই তিনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জীবন্ত উদ্বাস্তু মানুষের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। বইটি লেখার ক্ষেত্রে মৌখিক ইতিহাস পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

'প্রান্তিক মানব-পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুজীবনের কথা' বইটির বেশ কয়েকটি বিষয় নতুনভাবে আলোকপাত করা যেতে পারে। প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী উদ্বাস্তুদের অবস্থানকে শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখেছেন কিন্তু উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গির বাইরেও জাতি, বর্ণ ও লিঙ্গগত বিশ্লেষণ জরুরী। উদ্বাস্তুর শোষণ যন্ত্রণার মাত্রা জাতি, বর্ণ, লিঙ্গগত দিক থেকে ভিন্ন। পশ্চিমবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বেশ কয়েকটি উদ্বাস্তু পুনর্বাসন অঞ্চল সম্পর্কে তিনি বিস্তৃত বিবরণ দিলেও আন্দামান ও দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনকারি উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে আলোচনার পরিসর রয়েছে। প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তীর মতে, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বাম দলগুলির ক্ষমতা লাভের পেছনে শুধুমাত্র উদ্বাস্তু শক্তি কাজ করেছিল এই বিষয়টি বিতর্কিত। উদ্বাস্তু শক্তি অবশ্যই বাম দলগুলির ক্ষমতা লাভের পথ সহজ করেছিল কিন্তু এক্ষেত্রে রাজ্য কংগ্রেসের ব্যর্থতা এবং বাম দলগুলির জনকল্যাণমুখী কার্যকলাপও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। রাজনৈতিক দলগুলি উদ্বাস্তুদের ভোটব্যাংক হিসেবে কাজে লাগিয়েছিল একথা যেমন ঠিক তেমনি উদ্বাস্তুরাও নিজেদের প্রয়োজনে রাজনৈতিক দলগুলিকে সমর্থন করেছিল। লেখক নিজে উদ্বাস্তু জীবনযাপনকারী এবং তাঁর তথ্য সংগ্রহ উদ্বাস্তু জীবনযাত্রাকে দেখে মৌখিক ইতিহাস পদ্ধতিতে গৃহীত হয়েছিল। সেক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ যথার্থ হলেও তথ্য বিশ্লেষণে নিজস্ব ভাবাবেগ যুক্ত হওয়ায় নিরপেক্ষতা লঙ্ঘন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

দেশভাগ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের যত গবেষণা হয়েছে বা ভবিষ্যতে হবে সেখানে প্রাথমিক বই হিসাবে তার বইটিকে রাখতে হবে। এই বইটি বাদ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সংক্রান্ত আলোচনা করা সত্যিই শক্ত। অধ্যাপক চক্রবর্তী বক্তব্যের সাথে একমত

বা দ্বিমত হতেই পারেন কিন্তু তাকে উপেক্ষা করা খুবই কঠিন। তিনি লেখার শুরুতে অনুভব করতে না পারলেও পরবর্তী সময়ে উদ্বাস্তু ছিল তাঁর কাছে একটি আইডিয়া। যে আইডিয়ার কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন বাঙালি উদ্বাস্তুরা এখন আর শুধু উদ্বাস্তু নয়, আমার উদ্বাস্তু। প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী উদ্বাস্তুদের দোরে দোরে ঘুরতেন ওদের সঙ্গে থাকতেন ওরা যা খায় তাই খেতেন। আসলে তিনি তিনি তখন অধ্যাপক পরিচয় মুছে দিয়ে পরিণত হয়েছিলেন উদ্বাস্তুদের মতন কপর্দকহীন একটি মানুষ, যে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, যে গৃহহীন উদ্বাস্তু, যার খিদে পেলে উদ্বাস্তুদের কাছে চেয়ে খায়। যার একমাত্র বিশেষত্ব কাঁধে ঝুলানো একটি টেপ রেকর্ডার ও একটি ক্যামেরা। ‘প্রান্তিক মানব’দের জীবনকে চাক্ষুষ পাঠ করেছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী এবং সমব্যাথী হয়ে তাদের সাথে জীবন-যাপন করেছেন। শুধু তাঁদের সম্পর্কে সহানুভূতিসম্পন্ন নয় সমান-অনুভূতি অর্থ্যাৎ সমানুভূতিশীল ছিলেন। নিজের মানবীকসত্তা দিয়ে উদ্বাস্তুদের পার্টিশনের দ্বারা বিভক্ত মানসিক সত্তাকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এইখানেই প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তীর ‘মার্জিন্যাল ম্যান’ বা ‘প্রান্তিক মানবে’র বিশেষত্ব।

বাংলা ভাষাচর্চায় উইলিয়ম কেরী : প্রসঙ্গ ‘কথোপকথন’

রোহিত মণ্ডল
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ,
পি. আর. এম. এস. মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : উইলিয়ম কেরীর ‘Dialogues’ পুস্তকখানি ‘Colloquies’ নামে প্রসিদ্ধ। বাংলা ভাষায় ‘কথোপকথন’ নামে পরিচিত। পুস্তকটি ১৮০১ সালের আগস্ট মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানিতে কেরীর নাম উল্লেখ না থাকলেও ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ব্যাকরণের চতুর্থ সংস্করণের সঙ্গে একত্রে ‘কথোপকথন’ নামে প্রকাশিত হয় এবং সেই সময় থেকেই ভূমিকায় সংকলক ও ইংরেজি অনুবাদক রূপে স্বয়ং কেরী আত্মপরিচয় দিয়ে আসছেন। পুনঃপুন সংশোধন, পরিমার্জন ও সংযোজনারগুণে গ্রন্থটি ভাষাগত উন্নতি ও ব্যাকরণ ত্রুটিমুক্ত রূপে ১৮১৮ সালের june Serampore, 1818 পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭-১১৩, তৃতীয় সংস্করণ রূপে গ্রন্থিত হয়।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ‘কথোপকথন’ (১৮০১) এক যুগান্তকারী সৃষ্টি। মৌখিক ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে সে যুগের বিশেষ উপযোগিতা ছিল গ্রন্থটির। কেরী সংকলিত ‘কথোপকথন’ গ্রন্থে কথন ও উপকথনের সূত্রে সমসাময়িক কলকাতা ও শ্রীরামপুর অঞ্চলের সকল স্তরের মানুষ, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, সামাজিক রীতিনীতি, ধর্মীয় আচার-বিচার নানান্ প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। ঐ অঞ্চলের মৌখিক ভাষার আদর্শ ছিল গ্রন্থের ব্যবহৃত ভাষা। আর এই ভাষাই পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যের চলতি ভাষার আদর্শ হয়ে দাড়িয়েছে। ভাষাবিদ উইলসনের মতে, ‘পুস্তকটি বাংলা ফ্রেজ ও ইডিয়মের বৈচিত্র্যে পূর্ণ।’ কাজেই ভাষাশিক্ষার অমূল্য গ্রন্থ হিসেবে রচনাটি শিক্ষার্থীদের সহযোগী। গ্রন্থটি রচনার নেপথ্যে রয়েছে কেরীর বাংলা ভাষার প্রতি প্রীতি ও ভাষাশিক্ষার উদ্দেশ্যময়তা।

মূলশব্দ : বাংলা ভাষাশিক্ষা, সমাজ ভাষাবিজ্ঞান প্রসঙ্গ, ভাষা-বৈচিত্র্য, বাংলা ফ্রেজ ও ইডিয়মের বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহার, Grave style, friendly style।

মূল প্রবন্ধ :

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সূতিকাগার ফোর্টউইলিয়ম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশনারী সম্প্রদায়ের উদ্যোগে গদ্যসাহিত্যের প্রচার ও প্রসারের যে ঐতিহাসিক আয়োজন শুরু হয়েছিল – উইলিয়ম কেরী তার নেপথ্য নায়ক। তিনি ছিলেন একজন খ্রিস্টধর্ম প্রচারক পাদরি, শিক্ষক ও সমাজ-সংস্কারক এবং বহুভাষাবিদ। বহুকীর্তি ও খ্যাতির উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত এই ব্যাপটিস্ট মিশনারি ধর্মে ও কর্মে, কৃতিত্ব ও কর্তব্যে, অধ্যপনা ও অধ্যয়নে, সাধনা ও মনীষার গৌরবে তাঁর

ব্যক্তিজীবন ও কর্মজীবন সাহিত্য পাঠকের কাছে কৌতূহলের বিষয়। বিশেষত; এই বৈদেশিক ইংরেজ মানুষটির বাংলা ভাষার প্রতি আগ্রহ, নিষ্ঠা এবং বাংলা ভাষার সহায়ক রূপে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পরিচিত সাহিত্য পাঠকদের কাছে একমাত্র আশ্রয়স্থল। এস. পিয়ার্স কেরী তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে : "রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলে ছিলেন যে কেরী বাংলা ভাষার উৎসাহ জাগাবার কাজে প্রধান পথিক।"[১]

বাংলা ভাষাপ্রীতি এবং ভাষাচর্চার ইতিহাসে কেরী সাহেবের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর 'Dialogues' বা 'কথোপকথন' (১৮০১ খ্রি.) গদ্যসাহিত্যের কথামুখ তথা প্রথম ঐতিহাসিক সংযোজন। 'Dialogues' পুস্তকখানি 'Colloquies' নামেও প্রসিদ্ধ। বাংলা ভাষায় 'কথোপকথন' নামে পরিচিত। কেরী সংকলিত ও সম্পাদিত এই দ্বিভাষিক গ্রন্থটির নাম ছিল '*Dialogues,/ Intended/ to facilitate the acquiring of/The Bengali Language*'. পুস্তকটি **১৮০১** সালের আগস্ট মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানিতে কেরীর নাম উল্লেখ না থাকলেও **১৮১৮** খ্রিস্টাব্দে বাংলা ব্যাকরণের চতুর্থ সংস্করণের সঙ্গে একত্রে 'কথোপকথন' নামে প্রকাশিত হয় এবং সেই সময় থেকেই ভূমিকায় সংকলক ও ইংরেজি অনুবাদক রূপে স্বয়ং কেরী আত্মপরিচয় দিয়ে আসছেন। পুনঃপুন সংশোধন, পরিমার্জন ও সংযোজনার গুণে গ্রন্থটি ভাষাগত উন্নতি ও ব্যাকরণ ত্রুটিমুক্ত রূপে **১৮১৮** সালের তৃতীয় সংস্করণ রূপে গ্রন্থিত হয়। তৃতীয় সংস্করণটি শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'কথোপকথন' (১৮০১ খ্রি.) এক যুগান্তকারী সৃষ্টি। মৌখিক ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে সে যুগের বিশেষ উপযোগিতা ছিল গ্রন্থটির। কেরী সংকলিত 'কথোপকথন' গ্রন্থে কথন ও উপকথনের সূত্রে সমসাময়িক কলকাতা ও শ্রীরামপুর অঞ্চলের সকল স্তরের মানুষ, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, সামাজিক রীতিনীতি, ধর্মীয় আচার-বিচার নানান্ প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। ঐ অঞ্চলের মৌখিক ভাষার আদর্শ ছিল গ্রন্থের ব্যবহৃত ভাষা। আর এই ভাষাই পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যের চলতি ভাষার আদর্শ হয়ে দাড়িয়েছে। ভাষাবিদ উইলসনের মতে, পুস্তকটি বাংলা ফ্রেজ ও ইডিয়মের বৈচিত্রে পূর্ণ। তিনি লিখেছেন ".... It presents in many respects a curious and lively picture of the manners, feelings and notions of the natives of Bengal"[২] কাজেই ভাষাশিক্ষার অমূল্য গ্রন্থ হিসেবে রচনাটি শিক্ষার্থীদের সহযোগী। গ্রন্থটি রচনার নেপথ্যে রয়েছে কেরীর বাংলা ভাষার প্রতি প্রীতি ও ভাষাশিক্ষার উদ্দেশ্যময়তা। সংকলনের কাজে ব্যাকরণগত দিকটি অনুধাবন করে ফোর্টউইলিয়ম কলেজের পাঠযোগ্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে, ব্যাকরণের বিশেষত্বের দিকটি গ্রন্থকার গ্রন্থখানির মুখবন্ধে তুলে ধরেছেন। সে যুগের সামাজিক ও ব্যবহারিক রীতি-নীতির পরিচয় ও স্বরূপটিও গ্রন্থটিতে ধরা পড়েছে। এই কারণেই গ্রন্থটির গুরুত্ব অপরিসীম। কেরী রচিত 'কথোপকথন' পুস্তকটির ঐতিহাসিক সত্যতা

এখানেই যে, পাঠ্যপুস্তকের সীমা অতিক্রম করে সে যুগের বাংলা ভাষার দলিল রূপে আজও সগর্বে স্বীকৃত হয়ে আসছে।

১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে লিসবনে মুদ্রিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এ ভাওয়াল পরগণার প্রাদেশিক মৌখিক ভাষার সর্বপ্রথম ব্যবহার দেখি। এর বিষয়বস্তু সংকীর্ণ এবং শব্দকোষ সীমিত; তুলনায় 'কথোপকথন' বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনায় অসামান্য –এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কথোপকথন রীতিকে আশ্রয় করে একত্রিশ'টি (৩১) অধ্যায়ে তৎকালীন সামাজিক রীতি-নীতি, সমাজসচেতনতা, চরিত্র-চিত্রণ নাটকীয়তা-সমসাময়িক যুগপরিবেশে সৃজনশীল গদ্যসাহিত্যের লক্ষণগুলিকে অন্যতর মাত্রা দিয়েছে। সকল অধ্যায়ের শিরোনামে বিষয়বস্তুর বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়। গ্রন্থটির শেষ অধ্যায় 'কথোপকথন'-এ বিবাহ, ঘটকালি, পণ, বিবাহরাত্রির খাওয়া-দাওয়া ও রোশনাই–এর কথা স্থান পেয়েছে। উদ্দেশ্যমূলকতাকে সামনে রেখে যে গ্রন্থের সূচনা, পাঠ্যপুস্তক রূপে যে গ্রন্থের প্রণয়ন, আজ ভাবতে অবাক লাগে উদ্দেশ্যমূলকতাকে ছাপিয়ে, পাঠ্যপুস্তকের সীমা অতিক্রম করে গ্রন্থটি সার্থকধর্মী বাংলা ভাষাশিক্ষার ঐতিহাসিক নিদর্শন ও সৃষ্টিশীল সাহিত্যরূপে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত।

গ্রন্থে বাংলা ভাষা দক্ষতা, ফারসি শব্দের বহুলতা, ভাষাভেদ, ভাষা-বৈচিত্র, ভাষার বিভিন্ন উপাদান ও ব্যবহারের তারতম্য কেরীর ভাষা ওয়াকিবহাল তথা সচেতনতাকে স্মরণ করায়। সাহেব বা খানসামা যে ভাষায় কথা বলে, একজন মৎস্যজীবি বা ভূমিজীবি সে ভাষায় কথা বলে না। আবার স্ত্রী-জাতির দৈনন্দিন কার্যকলাপে ব্যবহৃত গৃহস্থালি ভাষা ছাঁদটিও কেরী সাহেবের ভাষা পারদর্শিতারই সাক্ষ্য দেয়। 'কন্দল' ও 'মাইয়া-কন্দল' রচনা দুটিকে অনেকে কেরী কীর্তির নিন্দাবাদের প্রধান দিক বলে মনে করলেও সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের পরিসরে এর গুরুত্ব ততোধিক এবং কেরী সাহেবের ভাষা গবেষণার উল্লেখযোগ্য দিক। 'কথোপকথনে'র আখ্যাপত্রে লেখাছিল-

D I A L O G U E S

INTENDED

TO FACILITATE THE ACQUIRING

OF

T H E B E N G A L E E L A N G U A G E.

THIRD EDITION

By W. CAREY, D. D.

Professor of the Sungskrita and Bengalee Languages,

in the College of Fort William.

PRINTED AT THE MISSION PRESS.

1818.

চিত্র : কথোপকথন গ্রন্থের নামপত্র

আখ্যাপত্রের কোথাও গ্রন্থকার হিসেবেও নাম ছিল না। তথাপি আখ্যাপত্রে তাঁর নাম না থাকা সত্ত্বেও গোড়া থেকেই গ্রন্থখানি তাঁর নামে প্রচলিত তার কারণ গ্রন্থের ভূমিকায় কেরী সংকলকরূপে ও ইংরেজি অনুবাদক রূপে স্বীকার করেছিলেন- 'That the work might be as complete as possible, I have employed some sensible natives to compose dialogues upon subjects of a domestic nature, and to give them precisely in the natural style of the persons supposed to be speakers।'[৩] বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি প্রসঙ্গে গৌরবান্বিত কেরী পুনশ্চ লিখেছিলেন : "The great want of books to assist in acquiring this language, which is current through an extent of country nearly equal to Great Britain, and which, when properly cultivated, will be inferior to none, in elegance and perspicuity, has induced me to compile this small work; and to undertake the publishing of two or three more, principally translations from the S*a*ngskr*i*to. These will form a regular series of books in the Bengalee, gradually becoming more and more difficult, till the student is introduced to the highest classical works in the language."[৪]

বাংলা গদ্যসাহিত্যের আলোচনায় ও কেরী চর্চায় যারা মনোনিবেশ করেছেন তাঁদের 'কথোপকথন' সম্পর্কিত মন্তব্যগুলি প্রসঙ্গত স্মরণীয়। তাঁদের অভিমতগুলি নিম্নে সূত্রাকারে উল্লেখ করা হল --

১। "এই পুস্তক সম্পর্কে কেরীর কৃতিত্ব সংকলনের ও সম্পাদনের, এবং এই কার্য্যে তিনি যে সাহস, বিচক্ষণতা ও বিবেচনাবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, সেকালের একজন মিশনারীর পক্ষে তাহা সত্যিই বিস্ময়কর। গ্রন্থের রচনা সম্পর্কে শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পন্ডিতদের কৃত্বিত অস্বীকার করা যায় না।"[৫]

২। "কথোপকথন দ্বিভাষিক, এক পৃষ্ঠায় বাঙ্গালা অপর পৃষ্ঠায় ইংরেজী। দেশের নানা অঞ্চলে নানা রকম সামাজিক ও বৈষয়িক ব্যাপারের উপযুক্ত কথন ভঙ্গির সহিত বিদেশি শাসকদের পরিচিত করাইবার উদ্দেশ্যে এই সংকলন। এই সংকলনে

কেরী ইংরেজি অনুবাদক মাত্র। বাঙ্গালা মূল একাধিক অঞ্চলের ভাষার সহিত সুপরিচিত ব্যক্তির অথবা ব্যক্তিদের সংগ্রহ।"[৬]

৩। "কেরীর নিজস্ব বাংলা রচনার গুণগত উৎকর্ষ সম্পর্কে মতভেদের অবকাশ রয়েছে। তাঁর অনুবাদিত বাইবেলের ভাষার অসংগতির পরিচয় আগে লক্ষ্য করা গেছে। তাঁর নামে প্রচলিত, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রকাশিত বই দুটি তাঁর নিজের রচনা নয় বলেই অনেকে মনে করেন। "[৭]

৪। 'কথোপকথন'-এর ভাষা সম্পর্কে শক্তিব্রত ঘোষ বলেছেন – "কথোপকথন গ্রন্থটির একাধিক সংস্করণ হয়েছিল, সংস্কার থেকে সংস্কান্তরে তিনি পরিবর্তন ও সংশোধনের যে ভূমিকা নিয়ে ছিলেন; কথোপকথন গ্রন্থটিতে তাঁর যথার্থ ভূমিকা বা কৃতিত্বের কথা স্মরণ করায়। তিনি একজন সংকলকই নন, একজন সম্পাদকও। ভাষা চিন্তার ক্ষেত্রে ব্যকরণ সম্মতভাবে তিনি ভাষাকে ঢেলে সাজিয়েছেন।"[৮]

'কথোপকথন' গ্রন্থটিকে কেরীর ভাষাচিন্তা তথা ভাষা সম্পর্কিত সচেতনতা লক্ষ্য করার মতো। মূলত ভাষাকে সরল ও প্রাঞ্জল ভাবে ভাষাশিক্ষার্থীদের কাছে সহজবোধ্য করে পরিবেষণ করে তোলাতেই গ্রন্থখানির সার্থকতা। এই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই কেরীর 'কথোপকথন' বা 'Colloquies'-এর পরিকল্পনা। গ্রন্থের ভূমিকাংশে এ বিষয়ে কেরী কথোপকথন পাঠকদের কাছে তাঁর অনুবাদকর্মের প্রয়োজনীয়তা তথা উদ্দেশ্যমূলকতাকে তুলে ধরেছেন -- "When the following Dialogues were first begun, I did not intend to add a Translation: but I soon perceived, that if they were so extended as to include the most common conversations of the country people, it would be necessary to translate them, and to add a few observations".[৯] কেরী সাহেবের এই observations-গুলি থেকেই আমরা উক্ত গ্রন্থের ভাষা-প্রসঙ্গে কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি –

১। এদেশীয় বাংলা ভাষা-ভাষীদের মধ্যে প্রচলিত, দৈনন্দিন ব্যবহৃত মৌখিক কথাবার্তাগুলিকে লক্ষ্য করা এবং লক্ষণগুলিকে তুলে ধরা।

২। কেরীর মতানুসারে একজন ভাষাশিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে উচিত ঐ ভাষার প্রতিটি শব্দাবলীর সাথে তার পরিচিত হওয়া এবং ঐ শব্দগুলির প্রয়োগ সম্পর্কে সচেতন হওয়া। শিক্ষার্থীরা যতক্ষণ পর্যন্ত না, শব্দাবলীর সঙ্গে পৃথকভাবে পরিচিত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার না প্রয়োগ হবে অর্থহীন এবং ভাষাশিক্ষাও হবে অসম্পূর্ণ।

৩। বিশেষ কিছু শব্দের ব্যবহার, তার অর্থদ্যোতনা, প্রয়োগ ও বিন্যাস অর্থাৎ Idiomatic জ্ঞান না থাকলে শিক্ষার্থীদের কাছে শব্দাবলীর অর্থপ্রকাশের ক্ষেত্রে দুর্বোধ্যতা থাকবে এবং তা হবে অর্থহীন কিংবা অসঙ্গতিপূর্ণ। ভাষাশিক্ষার্থীদের এই সচেতনতার উদ্দেশ্যেই কেরীর 'কথোপকথন'-এর অনুবাদকর্ম।

৪। উক্ত গ্রন্থে সংকলিত ‘Dialogues’গুলি অবশ্যই ব্যাকরণ সম্মত। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও আছে। উদাহরণ স্বরূপ কেরী উল্লেখ করেছেন ভাষাবৈচিত্র কিংবা তারতম্যের কথা। ক্ষেত্র বিশেষে বিভিন্ন সামাজিক পরিসরে ভাষাপ্রকাশ কিংবা শব্দের প্রয়োগ-বিন্যাসে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সে ক্ষেত্রে Difference Idioms এবং Daily Conversationsগুলিই নিম্নস্তরের কথাবার্তায় বিভেদ আনে।

বিষয়বস্তুর নিরিখে কথোপকথনগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে –

ক) সাহেব সুবাদের কথোপকথন

খ) মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন কথোপকথন

গ) চাষবাস, কৃষি উৎপাদনশীলতা, খাতক-মহাজন প্রসঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্ত কথোপকথন

ঘ) সাধারণ বিষয়ক কথোপকথন যেমন খাওয়া-দাওয়া, ভ্রমণ, পরামর্শ, যাত্রা, পরিচয়, পরামর্শ ইত্যাদি।

ঙ) সমাজের নিম্নস্তরের মানুষদের যেমন শ্রমিক, মজুর, জেলে, ভিক্ষুক প্রজাতির কথোপকথন

চ) মহিলা সমাজের একান্ত বা অন্তরঙ্গ কথোপকথন

ছ) নিতান্ত সাধারণ বা গ্রাম্যলোকের কথোপকথন

জ) গৃহস্থালি সম্পর্কিত কথোপকথন

ঝ) সাংসারিক জীবনবিষয়ক কথোপকথন

ঞ) সমাজ, সংসার, অর্থনীতি ও সমকালীন জীবন-যাত্রা সংক্রান্ত কথোপকথন

ড. সুশীল কুমার দে তাঁর History of Bengali Literature গ্রন্থটিতে কথোপকথন প্রসঙ্গে লিখেছিলেন – “ ... the book is indeed a rich quarry of the *idioms* (and even of *slang;* the class or professional shibboleth) of the spoken dialect of Bengal; and in age of mere or main translation, or tentative accumulation of vocabulary and experimental adaptation of arrangement its value is very great.”[১০] কেরীর ‘কথোপকথন’ গ্রন্থের ‘চাকর ভাড়াকরণ’, ‘সাহেবের হুকুম’, ‘সাহেব ও মুনসি’, ‘পরামর্শ’, ‘ভোজনের কথা’, ‘পরিচয়’, ‘ভূমির কথা’, ‘মহাজন আসামি’, ‘বাগান করিবার হুকুম’ প্রভৃতি পরিচ্ছেদে কথোপকথন প্রসঙ্গে আমরা খানসামা বা সিরকার-এর সঙ্গে ইউরোপিয়ানদের কথাবার্তায় মিশ্রভাষার ব্যবহার লক্ষ করি, অর্থাৎ এক্ষেত্রে তারা আরবী, পার্সি, পর্তুগীজ এবং কিছু ত্রুটিপূর্ণ ইংরেজি ভাষার শব্দাবলী ব্যবহার করে। যেমন- হাজামত, হুকুম, তাগাদা, হাজির, মেরামত, মাফিক, খোরাক, গোলাম,তকসির, মেহেরবানী, মাহিনা, আন্দাজ, মুনসিচাকর ইত্যাদি।

সাধারণ জনজীবনের সামাজিক চালচিত্রে যেগুলি লক্ষ্যকরা গেছে, সেই কথ্য ও সাধারণ কথোপকথনগুলি কেরী কথিত ‘Grave style’। অর্থাৎ ভদ্রলোকে ভদ্রলোকে, প্রাচীনে প্রাচীনে, ঘটকালী, যাজোক ও যজমান কথোপকথন নামাঙ্কিত কথোপকথনগুলিতে গ্রাম্য সাধারণ জনজীবনের সামাজিক চালচিত্রের উপর কেরীর যথাযথ আলোকপাত। এগুলির মধ্যে সর্বাংশে ‘ঘটকালী’ শীর্ষক পরিচ্ছেদটি শ্রেষ্ঠ। এই পরিচ্ছেদে দুই ঘটকের কথোপকথনের রামনারায়ণ তর্করত্নের ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’ নাটকের ঘটকদের কথা আমাদের মনে পড়ে।

কেরী সংকলিত ‘কথোপকথন’-এর কিছু কিছু কথোপকথনে সাহেব ভদ্রলোক যখন তার চাকর-বাকরদের সঙ্গে কথা বলেন তখন পার্সি শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয় রূপে দৃষ্ট হয় না। বরং এক্ষেত্রে কথোপকথনগুলি অনেকবেশী কথ্য ও সাবলীল রূপেই ধরা পড়েছে। আবার ব্যবসা সংক্রান্ত কথোপকথনগুলিতে যেমন খাতক-মহাজন, সাধু-খাতকি শীর্ষক পরিচ্ছেদে পার্সি শব্দের ব্যবহারের দৃষ্টান্ত প্রচুর। মালিক, দণ্ডকর্তা, খাতিরজমা, একরার, সবুর, জামিন, নজর, এলাম, তকসির, থোড়া ইত্যাদি। স্মরণ রাখতে হয় যে, সে সময় পার্সি যেমন রাজভাষা ছিল ঠিক তেমনি আদালতের ভাষা হিসেবে পার্সির শব্দের প্রচলন ছিল প্রচুর। উক্ত গ্রন্থে নিম্নশ্রেণির কিছু মানুষদের মধ্যে প্রচলিত কথোপকথনগুলি খুবেই আকর্ষণীয়; যদিও তা সংখ্যায় কম। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ‘তিয়ারিয়া কথা’ বা জেলে সমাজের কথা।

> “হাড়ে ভেগো মাচকে যাবি কি না আতিতো কোয়া২ করছে।
> মুই ফুকারছি তুই ঘুমাইছিস।”

গ্রন্থমধ্যে মহিলাদের যে কথোপকথন রয়েছে তা খুবেই বিশ্বাসযোগ্য এবং বাস্তব উপযোগী। তাদের এই অন্তরঙ্গ কথোপকথনগুলি মধ্যবিত্ত মহিলা সমাজের আন্তরিক আলাপনের সঙ্গে তুলনীয় :

> “তোমরা কয় যা।
> আমি সকলের বড় আমার আর তিন যা আছে।”

এই কথোপকথনগুলিকে friendly style বলা চলে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে এগুলি অশ্লীললাত্মক রূপে ‘billingsgate’-এর পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে।

গ্রন্থটিতে একটি বিশেষ অঞ্চলের গ্রাম্য জনজীবনের দৈনন্দিন ব্যবহৃত মুখের ভাষা, তার কথ্যরূপ, ঐ ভাষার শব্দাবলীর প্রয়োগ ও বিন্যাস, ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত নানান পেশার মানুষদের কথোপকথনের যে অন্তরঙ্গ অনুভূতি; তাদের ধারণা, আচার, সংস্কার, রীতি-নীতি বিশেষ ভাবে ফুটে উঠেছে। বাংলা ভাষা যাদের মাতৃভাষা বিশেষত তাদের পক্ষে এ ভাষা বোঝা যে কঠিন কিংবা অসুবিধের হবে না সে কথা বলাই বাহুল্য। পরবর্তী কালে দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতি প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। জাতির শ্রেণি ও ব্যক্তভেদে ভাষা-ভেদের এই বৈচিত্র্যটিও এক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

কথোপকথনের কোন কোন অংশের কথ্যভাষা ও ভঙ্গিকে সুশীল কুমার দে, টেকচাঁদ ও হুতোমের ভাষার 'spiritiual father' বলেছেন।

'কথোপকথন'-এ ব্যবহৃত ভাষার ব্যাকরণগত দিকগুলি আলোচনা করা যেতে পারে: --

ক) শব্দের সংক্ষেপণ অর্থাৎ ইয়া > এ, আ রূপে ব্যবহার। শব্দের শেষে ক্রিয়াপদে 'ই'-ধ্বনি বাদ, বর্গীয় 'জ' ধ্বনি 'চ'-ধ্বনিতে রূপান্তরিতকরণ-এর দৃষ্টান্ত। বেশ কিছু শব্দে এগুলি লক্ষ্য করা গেছে।

খ) নঞর্থক ক্রিয়াপদের অশুদ্ধিগত প্রয়োগ। যা বাক্যের অর্থসংগতি বিপর্যস্ত করে। অবশ্য পরবর্তী সংস্করণে এ বিষয়ে কেরী সংশোধনে মনোযোগী হয়েছেন।

গ) ক্রিয়াপদের শেষে 'ক' বা 'হ'-এর প্রত্যাহার প্রবণতা লক্ষণীয় রূপে ধরা পড়েছে। যেমন করিবেক, আসিবেক, হবেক, জানহ, ইত্যাদি।

ঘ) বানানের ক্ষেত্রে কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করা গেছে, যা পরবর্তীকালে 'ইতিহাস-মালা' রচনায় স্থির এবং শুদ্ধরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কায়স্ত/কায়স্থ, সোধ/ শোধ, অতীথি/অতিথি ইত্যাদি।

ঙ) ব্যক্তি বাচক সর্বনামের যথাযথ ব্যবহার। আমি, মুই, তুমি, তুই, আপনি, সে, তিনি।

মুই – উত্তম পুরুষ বাচক সর্বনাম (গ্রাম্য অঞ্চলে প্রচলিত)। গ্রন্থে মজুর, জেলে প্রভৃতি শ্রেণির কথাবার্তায় ব্যবহৃত হয়েছে।

তুই—মধ্যম পুরুষ বাচক সর্বনাম। এক্ষেত্রে শ্রেণি বা স্তরভেদে নয় বরং ঘনিষ্ঠ বা তুচ্ছতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তুমি – মধ্যম পুরুষ বাচক সর্বনাম। গ্রন্থ মধ্যে সম্মান বা গৌরবার্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কেরী বিরচিত 'কথোপকথন' গ্রন্থটির ভাষা প্রসঙ্গে বলা চলে রচনাটির ভাষা এবং রচনারীতি, ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থময় প্রয়োগ, বৈচিত্র ও বিন্যাসের ভূয়সী প্রশংসা করে অধ্যাপক সুশীল কুমার দে লিখেছেন, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের মতই সাবলীল এবং রচনাংশে উৎকৃষ্ট ---"....cary had fine dramatic instincts, which if developed would have borne better bruits, and that he was more than a mere compiler, has been put beyond all doubts by the colloquies which. To the student of Bengali, is more than a mere treatise "intended to facilitate the acquiring of the Language."[১১] কেরী কীর্তির অসামান্যতা এবং অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই।

উৎস নির্দেশ :

১। S.Pearce Carey, William Carey (Landon 1923) p.202, Rabindranath Tagore told the author in 1921.

২। ঘোষ শক্তিব্রত, উইলিয়ম কেরী সাহিত্য সাধনা, ১৯৮০, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা-২৭৭
৩। Carey, D.D., 'Dialogues, Intended to Facilitate The Acquiring of Bengali Language', Third Edition, Printed at The Mission Press, 1818, পৃষ্ঠা-মুখবন্ধ অংশ
৪। তদেব, পৃষ্ঠা-মুখবন্ধ অংশ
৫। বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা (সপ্তম খণ্ড),বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃষ্ঠা-৩৫
৬। সেন সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড), ১৩৫০; আনন্দ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা-১৩
৭। চৌধুরী ভূদেব, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, দ্বিতীয় পর্যায়,১৩৯১, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা-৭৪
৮। ঘোষ শক্তিব্রত, উইলিয়ম কেরী সাহিত্য সাধনা, ১৯৮০, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা-২৮৩
৯। Carey, D.D., 'Dialogues, Intended to Facilitate The Acquiring of Bengali Language', Third Edition, Printed at The Mission Press, 1818, পৃষ্ঠা-মুখবন্ধ অংশ
১০। Dr. Sushil kumar De, History of Bengali Literature(19th century), University of Calcutta, Calcutta ,1921, P-137
১১। তদেব, p-147

বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও লোক ঐতিহ্য

তপনকুমার বালা
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম মহাবিদ্যালয়, কেশবপুর, আরামবাগ

আদিবাসী কথাটি নতুন। বর্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের কতকগুলি শ্রেণি ও সমাজের নতুন নামকরণ হয়েছে। সাধারণত যাঁদের আদিম অধিবাসী বলা হত, আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক পরিভাষায় তাঁদেরই আদিবাসী বলা হয়েছে। আদিবাসী কথাটি সাধারণত ইংরেজি 'aboriginal' অথবা 'tribe' শব্দের বাংলা হিন্দি অথবা দেশীয় প্রতিশব্দ হিসাবেই ব্যবহার করা হয়। লক্ষণীয় বিষয় হল বাংলাদেশের আদিবাসীদেরও যে একটি সংস্কৃতি আছে, সে সম্বন্ধে কোনো সশ্রদ্ধ ধারণা সাধারণ আধুনিক মানুষেরা পোষণ করেন না, এমনকি সে সম্বন্ধে কোনো খোঁজও কেউ রাখেন না। অথচ বাংলাদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে ওঠার পেছনে আদিবাসী জনগণের ভূমিকা ও অবদান অনস্বীকার্য।

যুগ যুগ ধরে সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের মাধ্যমেই একে-অপরকে সমৃদ্ধশালী করতে সহায়ক হয়েছে। বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এদের জীবন প্রবাহিত। বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যেও যে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের আদিবাসী সমাজ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বিরাজমান তার মূল কারণ আদিবাসী সংস্কৃতির দৃঢ় ভিত্তিক এবং পরস্পরের সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব, হীনমন্যতার অভাব এবং স্বাধীন সুস্থ জীবনবোধ। বহু প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এদের স্বাতন্ত্র্য ও জীবনীশক্তি; অনড় প্রাচীন ব্যবস্থা ও বিধানের মধ্যে আজও আছে স্বকীয় জাতিসত্ত্বায় বহমান।

১৯৪১ সালের সেনসাস রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলার আদিবাসী ও উপজাতীয় সমাজের জনসংখ্যা হলো:

বাংলার সমস্ত জেলায় ১৬৫৫৯৯৭
পার্বত্য চট্টগ্রাম ২৩৩৩৯২
কোচবিহার রাজ্য ২৪৩৫
ত্রিপুরা রাজ্য ৩৩৬৩৩
সিকিম ৬৩২০৬

সমগ্র ভৌগোলিক পূর্ববঙ্গ ধরলে উক্ত প্রাদেশিক হিসেবের সঙ্গে পার্বত্য জনসংখ্যাও যুক্ত হবে। এই হিসাব ধরলে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত পূর্ববঙ্গের সমগ্র আদিবাসী ও উপজাতীয়দের জনসংখ্যা দাঁড়ায় পাঁচ লক্ষের কিছু অধিক। আর মাত্র কোচবিহার রাজ্য নিয়ে সমগ্র ভৌগোলিক পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী ও উপজাতীয়ের জনসংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১৪ লক্ষ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন -----

> “বাংলার বাইরে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু আদিবাসী সমাজ বাংলায় এসে বসতি স্থাপন করেছে। বাংলার আদিবাসী বললে মূলত তাদেরই বোঝায়। এক-একটি অঞ্চলের আদিবাসী গোষ্ঠী বিশিষ্ট এক এক ধরনের সংস্কৃতির অধিকারী।”[১]

আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় বাংলাদেশের আদিবাসী সমাজের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় তুলে ধরা। বাংলাদেশে বহু ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বসবাস রয়েছে। তারা ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা ও ধর্মীয় পরিচয়ে পরস্পর পৃথক।লক্ষণীয় বিষয় হলো—

> “ভারতের অন্যান্য অংশের মতো বাংলাদেশেও এমন অনেক গোষ্ঠী আছে, যারা বংশের দিক দিয়ে উপজাতীয় আদিবাসী, কিন্তু তাদের মাতৃভাষা বর্তমানে প্রাদেশিক ভাষা হয়ে গেছে। সুতরাং বাংলাদেশের প্রকৃত আদিবাসী সমাজের জনসংখ্যার হিসেব নিতে হলে শুধু ভাষাগত বিচার করলেই চলবে না। ভাষা যা-ই হোক সামাজিকভাবে যারা উপজাতীয় গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপন করছে, তাদের আদিবাসী বা উপজাতি বলেই গ্রহণ করা উচিত। কারণ সাধারণ নিম্নশ্রেণির হিন্দুসমাজ এবং আদিবাসী সমাজের অর্থনৈতিক পার্থক্য খুব বেশি নয়। এমনকি ধর্ম বিশ্বাসের দিক দিয়েও উভয়ের মধ্যে খুব বেশি উৎকর্ষ বা অপকর্ষের তারতম্য দেখা যায় না। পার্থক্য হলো উভয়ের সামাজিক গঠনের পার্থক্যের মধ্যে।” [২]

বলাবাহুল্য, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রায় পাঁচ হাজার নৃগোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে ৩০ কোটি আদিবাসী রয়েছে। তারমধ্যে ২০ লাখের অধিক আদিবাসী বাংলাদেশে বাস করে। তবে এ সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। প্রতিটি আদিবাসী স্বতন্ত্র সংস্কৃতির অধিকারী।

১৯৯১ সালের এক সরকারী হিসাব অনুযায়ী দেখানো হয়েছে যে, বাংলাদেশে মাত্র ২৭টি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নৃতাত্ত্বিক অন্তর্ভূক্ত মানুষ বাস করে।বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে ৪৪টি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর উল্লেখ করা হয়েছে।অসম (অসমিয়া), বম, বেদিয়া, বাগদি, চাকমা, গারো, হাজং, খাসিয়া, খিয়াং, ঘুমি, খারিয়া, কোচ, কুলে, কর্মকার, ক্ষত্রিয়, বর্মণ, কন্দ, কুসাই, মারমা, ম্রো, মণিপুরী, মাহতো, মুণ্ডা, মালো, পাংখো, ওরাঁও, পাহাড়িয়া, পাহান, পাত্র, রাখাইন, রাজুয়ার, রাই, রাজবংশী, সাঁওতাল, তংচঙ্গ্যা, ত্রিপুরা প্রমুখ।আবার উল্লেখ্য বাংলাদেশে এমন কয়েকটি সমাজ আছে—

> “যারা কোনোকালে গোষ্ঠীবদ্ধ আদিবাসী বা উপজাতি সমাজই ছিল, কিন্তু বর্তমানে তাদের মধ্যে উপজাতীয় এবং গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের কোনো নির্দশননেই এবং তারা ধর্মে, ভাষায় ও সামাজিক আচারে সাধারণ হিন্দু হয়ে গেছে। সুতরাং নৃতত্ত্বের দিক দিয়ে এরা আদিবাসী হলেও সামাজিক দিক দিয়ে আজ এরা হিন্দু।”[৩]

সুতরাং একথা বলা যায়, বিভিন্ন উপজাতীয় আদিবাসী সমাজ এবং বৃহত্তর হিন্দু সমাজ-- উভয়ের সংমিশ্রণের মাধ্যমে যে ঐতিহাসিক ধারাটি দীর্ঘকাল ধরে কমেনি, সেই ধারার বিভিন্ন অপরিণত ও পরিণত রূপ হলো বাংলাদেশের বিভিন্ন আদিবাসী সমাজ।

বংশ হিসেবে আদিবাসী, যাদের ভাষা উপজাতীয়, সমাজ ও উপজাতীয় অর্থাৎ গোষ্ঠীবদ্ধ তাদের বসবাস চট্টগ্রাম, বগুড়া, দিনাজপুর, গাজীপুর, পটুয়াখালী, ময়মনসিংহ প্রভৃতি সমতল ও পাহাড়ি অঞ্চল।

সংস্কৃতি মানুষের সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা। সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রতিটি জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশের প্রতিটি আদিবাসীর নিজস্ব সংস্কৃতি ঐতিহ্য রয়েছে। বলাবাহুল্য –

> “সংস্কৃতি মানবজীবনের একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা। সংস্কৃতি শব্দে ইংরেজী প্রতিশব্দ ‘Culture’। তার সঙ্গে Cultured uncultured শব্দগুলিও প্রচলিত। ‘Culture’ বলতে বুঝি সংস্কৃতিবান মার্জিত, পরিশিলিত, নিঃসন্দেহে Uncultured শব্দটি তার বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে।অর্থাৎ সংস্কৃতির মধ্যে নিহিত আছে কতকগুলি বস্তুসামগ্রী, রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি।আবার সংস্কৃতির এক-একটি অংশকে বলা হয় সংস্কৃতিরেণু (Cultured trait) এবং সমন্বিত সংস্কৃতিরেণুই (Trait complex) সংস্কৃতির সামগ্রিক কৃতি।”[৪]

বলা ভাল আদিবাসীদের সংস্কৃতি কিন্তু অন্য ভাষাভাষীদের মতোই লোকসংস্কৃতি। উভয় গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার লৌকিক ভিত্তিতে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। যে সংস্কৃতির মূলে লোক, তাই লোকসংস্কৃতি। যদিও অনেকে আলগাভাবে লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি উচ্চারণ করে থাকে। বাংলাদেশের আদিবাসীসহ সকল গ্রামীণ মানুষের সংস্কৃতিই লোকসংস্কৃতি। হাসিম শেখ, রামা কৈবর্ত, স্টিফেন, মণ্ডল কিংবা রাসমণিটুডু সকলের শেকড়ের সংস্কৃতি লোকসংস্কৃতি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন--

> “প্রখ্যাত অষ্ট্রিক ভাষাবিদ্ ও ছান্দসিক শ্রী সুহৃদকুমার ভৌমিক একটি প্রবন্ধে বাঙালির সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনা করে দেখিয়েছেন, আদিবাসী সংস্কৃতি কত ব্যাপকভাবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বাংলাভাষীদের আচার, সংস্কার, ভাষাভাণ্ডার, ছড়ার ছন্দ প্রভৃতিকে পুষ্ট করেছে। তাদের সংস্কৃতি উন্নত বলেই প্রভাব বিস্তার সম্ভব হয়েছে। অন্য একটি প্রবন্ধে শ্রী ভৌমিক আদিবাসী সংস্কৃতিতে অরণ্যের ভূমিকা আলোচনা করেছেন। অরণ্য শুধু আদিবাসীদের অর্থনৈতিক স্থিতি দেয়নি, তাদের আচার-পালা -পার্বন ও মানসিকতাকেও নিয়ন্ত্রিত করেছে।” [৫]

আর সেই কারণেই আমরা বলতে পারি- “The true history of the foiling people cannot be learnt without a knowledge of the Folklore.”

যুগের ব্যবধানে ভারতের ভূমিতে এসেছে আর্য, গ্রীক, আরব এবং মোঙ্গলদের মতো অজস্র জাতি।সেই অর্থে সাঁওতালরাও বহিরাগত। এদের কেউ কেউ নিজেদেরকে মহাভারতে বর্ণিত বীর একলব্যের বংশধর মনে করেন। উল্লেখ্য, অষ্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ এক সময়ে উত্তর ভারত থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের ইস্টার আইল্যাণ্ড অব্দি বিস্তৃত ছিল। তাদের ছিল নাক চওড়া ও চেপ্টা, গায়ের রঙ কালো এবং মাথার চুল ঢেউ খেলানো। আনুমানিক ৩০ হাজার বছর আগেই তারা ভারত থেকে অষ্ট্রেলিয়া যায়। সেই অষ্ট্রিক গোষ্টীরই উত্তরাধিকারী বর্তমানের সাঁওতাল। খুব সম্ভবত সাঁওত বা সামন্তভূমিতে বাস করার কারণে সাঁওতাল নামে পরিচিত হয়েছে।

বঙ্গভূমিতে মানবজাতির আগমন ১২/১৩ হাজার পূর্বে, প্রাচীন প্রস্তর যুগে। সে যুগ আদি বন্যযুগ (PALAEOTHTLIC)।যৌথবদ্ধভাবে বসতি স্থাপন করে এর দু' হাজার বছর পর (NEOTHTLIC)।অর্থাৎ বৃহত্তর বঙ্গদেশে আদি সভ্যতা আজ থেকে আট হাজার বছর পূর্ব থেকে। বৃহত্তর বঙ্গদেশ বলতে বোঝায় আজকের বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, ঝাড়খন্ড, ত্রিপুরা, আসাম, মেঘালয়, মিজোরাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড ও অরুণাচল।

অপেক্ষাকৃত সত্য বলা হয়ে থাকে আর্যজাতিকে। তাদের আগমন খ্রিষ্টপূর্ব দু' হাজার সালে। আর্যদের আগমনের পূর্বসূরী দ্রাবিড় জাতি। তাদের আগমন আরো চারহাজার বছর পূর্বে।অর্থাৎ আট হাজার বছরেরও পুরনো সভ্যতার ঐতিহ্যবাহী 'প্রাচীন বঙ্গদেশ'।

প্রথমে আর্য, পরবর্তীতে গ্রীক আলেকজান্ডার ও তারও পরে মুসলমানের আগমনে অনার্য (নিম্নবর্ণ) দ্রাবিড় এক সংকর জাতিতে পরিণত হয়।তথাপিও সেই দ্রাবিড় যুগের অনার্য আদিবাসীরা নিশ্চিহ্ন বা বিলীন হয়ে যায়নি।কৃষ্টিও লোকাচারে তাদের স্বকীয়তা অদ্যাবধি বিদ্যমান। অঞ্চলভেদে দ্রাবিড় আমল থেকে এই আদিবাসীরা কালের পরিক্রমায় বহু জাতি বা গোত্রে বহুধাবিভক্ত। অন্যূন দু'শ গোত্র বা জাতিতে বিভক্ত বৃহত্তর বঙ্গদেশে।বাংলাদেশে বর্তমানে ৭৬টি জাতিসত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৬১ সালে বাংলাদেশের আদিম শুমারিতে সাঁওতালদের সংখ্যা দিনাজপুরে ৪১,২৪২ জন, রংপুরে ৪,২৯২ জন, রাজশাহীতে ১৯, ৩৭৬ জন, বগুড়ায় ১,৮৬১ জন এবং পাবনায় ১৭০ জন।২০০১ সালের এক হিসাব মতে, বাংলাদেশে মোট সংখ্যা ১,৫৭,৬৯৮ জন। বর্তমানে এই সংখ্যা ২ লাখ অতিক্রম করেছে বলে অনুমান করা হয়।

বলা ভাল বাংলাদেশে সাঁওতালদের মানচিত্র, image source researchgate.net সমাজ ও বিচারিক কাঠামো যুগ যুগ ধরে হিন্দু ও মুসলিমদের সাথে বসবাস করার পরেও সাঁওতালরা তাদের সামাজিক স্বাতন্ত্র্য হারায়নি। বস্তুত রাষ্ট্রীয় বিধানাবলির চেয়ে সামাজিক প্রথার প্রতি তাদের আনুগত্য অধিক।তার অন্যতম প্রমাণ বিচার ব্যবস্থা। সাঁওতাল গ্রামের বিশেষ পাঁচজনকে নিয়ে গঠিত হয় গ্রামপঞ্চায়েত।সাঁওতাল সমাজে দেশ বলতে নির্দিষ্ট এলাকাকে বোঝান হয়।

বাংলার আবহাওয়া গোত্রব্যবস্থায় অনুকূল।ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্রে বিভক্ত হিন্দু সমাজের দেখাদেখি এখানকার মুসলমান সমাজও বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল সৈয়দ, শেখ, পাঠান ও দেশি মুসলিম হিসাবে।তবে তাদের কারোরই প্রভাব সাঁওতাল সমাজে পড়েনি।সাঁওতাল সমাজ মূলত ১২টি ভাগে বিভক্ত।তারা হলো – কিস্কু, হাঁসদা, মুর্মু, হেমব্রম, মান্ডি, সরেন, টুডু, বাস্কি(বাস্কে), গুয়াসোরেন, বেসরা, পাউরিয়া এবং চোঁড়ে।পুর্বে বেশ কিছু উপগোত্রের কথা শোনা গেলেও বর্তমানে বাংলাদেশে এই বারোটি গোত্রের কথাই জানা যায়।

গোত্রের ভিন্নতায় আচারেও ভিন্নতা আসেনি সাঁওতালদের খাদ্য তালিকা বাঙালি হিন্দু কিংবা মুসলমানের খাদ্য তালিকার মতোই। ভাত, মাছ, নিরামিষ, কিংবা বিভিন্ন ধরনের মুখরোচক পিঠা তাদের খাবার হিসেবে বিদ্যমান। নেশা জাতীয় খাদ্যের মধ্যে হাড়িয়া বা ভাত পচানো মদ প্রধান।এছাড়া আছে ভাঙ, তাড়ি, হুকা এবং গাঁজা। অনেক মেয়ে হাড়িয়া ও ধূমপানে অভ্যস্থ থাকলেও সব সাঁওতাল ধূমপান করে না।অতি উৎসাহী অনেকেই তাদের খাদ্যাভাসে কাঠবেড়ালি, গুইসাপ এবং কাঁকড়ার নাম উল্লেখ করেন, যা সর্বৈব মিথ্যা এবং দুঃখজনক।

বলাভাল এদের কোনো বর্ণমালা নেই। এরা কথা বলে নাগরী ভাষাতে। বাঙালিদের সাথে মেলামেশার কারণে বর্তমানে এদের নিজস্ব ভাষা লুপ্ত হতে চলেছে। শিক্ষার হার অত্যন্ত নগণ্য। এন্‌জিওদের সহায়তায় বর্তমানে তাদের মধ্যে, স্কুল-শিক্ষার প্রবণতা বাড়ছে।

সাঁওতাল বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ নৃগোষ্ঠী। তাঁদের বাসস্থান মূলত উত্তরাঞ্চলে। এরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এই অঞ্চলের রাজশাহী,নওগাঁ, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বগুড়া, রংপুর, জয়পুরহাট, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমণিরহাট, নীলফামারী, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে।তবে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে আদিমশুমারীতে দেখা যায় যে, পাবনা, যশোর, খুলনা এমনকি চট্টগ্রাম জেলাতেও অল্পসংখ্যক সাঁওতালদের বসতি ছিল।বছরে বিভিন্ন সময়ে তাদের উল্লেখযোগ্য পূজা-পার্বন ছাড়াও অনেকগুলো সামাজিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে।বারো মাসে তেরো পার্বনের দেশ বাংলাদেশ।এ প্রচলিত কথাটি সাঁওতালী সমাজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।সুতরাং একথা বলা আবশ্যিক--

> "জীবন-ঘনিষ্ট উৎসব বলতে যা বোঝায়, তা সাঁওতালী সংস্কৃতিতে বিদ্যমান।তাদের নৃত্য, গীত, কোমর জড়াজরি করে সম্মিলিত নাচ, ঢোল, মাদল-বাঁশির সুর সবই যেন জীবনের মূর্ত প্রতীক।জীবন থেকে উঠে আসা এই সংস্কৃতি আজও অমলিন।তাদের উল্লেখযোগ্য পূজা-পার্বনের মধ্যে ফাল্গুন মাসে বাহা উৎসব, চৈত্র মাসে বোঙ্গাবুঙ্গি উৎসব, বৈশাখ মাসে হোম, জৈষ্ঠ মাসে এরোরা সার্দার, আষাঢ় মাসে হাড়িয়া, ভাদ্র মাসে সোহরাই উৎসব অনুষ্টিত হয়।" [৬]

বলা ভাল বাংলাদেশে সাঁওতালদের শিক্ষার হার নিম্নপর্যায়ে অবস্থানের মূল কারণ ভাষা সমস্যা। তবুও একথা সত্য তারা আত্মবিশ্লেষণে উন্মুখ হতে শুরু করেছে। তাই সাঁওতাল ছেলেমেয়েরা দলবেঁধে নিজেদের গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায়। দেশের বিভিন্ন উচ্চ প্রতিষ্ঠানেও আজ খুঁজে পাওয়া যায় সাঁওতাল শিক্ষার্থী। অন্যান্য আদিবাসীদের সঙ্গে সাঁওতালী ভাষারও কোনো লিখিত বর্ণমালা নেই। তথাপিও --

> "তাদের ওরাল লিটারেচার বংশ পরম্পরায় মুখে মুখে চলে এসেছে এবং সগর্বে তার অস্তিত্ব ঘোষণা করেছে।সাঁওতালী ভাষাকে লিখিত রূপ দেয়া, অভিধান অন্যান্য ভূমিকা পালন করছে ।ভারতের পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতালী ভাষার ওপর 'অলৌকিক' নামে বর্ণমালা তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবতার কারণেই বর্ণমালা প্রসারতা লাভ করে নি।" [৭]

বর্তমানে বাংলাদেশের সাঁওতাল সমাজ অনেকটাই দ্বিভাষী হয়ে উঠেছে।সাঁওতালী ভাষা ছাড়াও তারা বাংলা বলতে অসুবিধা করে না। এমনকি তাদের ভাষাতেও অসংখ্য বাংলা শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

প্রতিটি আদিবাসী স্বতন্ত্র সংস্কৃতির অধিকারী। তারা মাতৃ ও পিতৃতান্ত্রিক প্রথা মেনে চলেন।**১৯৯১** সালের এক সরকারি হিসাবে দেখানো হয়েছে যে, বাংলাদেশে মাত্র **২৭**টি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন নৃতাত্ত্বিক অন্তর্ভূক্ত মানুষ বাস করে। তাদের বসবাস চট্টগ্রাম, বগুড়া, দিনাজপুর, গাজীপুর, পটুয়াখালী, ময়মনসিংহ প্রভৃতি সমতল ও পাহাড়ি অঞ্চলে। সাংস্কৃতিক মানুষের সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা। সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করাপ্রতিটি জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য।বাংলাদেশের প্রতিটি আদিবাসীর নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন --

> "আদিবাসী সমাজে ব্যক্তির চেয়েও সমষ্টিই প্রধান। যে কারণে আদিবাসী সাংস্কৃতিক পরিচায়ক পূজাপার্বণ, উৎসব, নৃত্য, গীত, যাত্রা, নাটক, লোককথা ইত্যাদি সমষ্টি দ্বারা কৃত লোককেন্দ্রিক বা সমষ্টিকেন্দ্রিক। এখানে দর্শক শিল্পী একে অপরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান, কথোপকথন করেন একে অপরের সঙ্গে অন্তর দিয়ে। এই সব নৃত্যগীতি; লোকযাত্রা লোকগাথার উপজীব্য দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ঘটে যাওয়া আশেপাশের ঘটনাসমূহ থেকেই আহরণ করে যুগ পরম্পরায় প্রবাহিত হয়ে আসছে। প্রাকৃতিক ও আর্থসামাজিক পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন এসেছে আদিবাসী জনজীবনে এবং আদিবাসী সংস্কৃতিতে, কিন্তু তাঁদের সংস্কৃতির মূল একাত্মবোধের প্রবণতা সমষ্টিগত প্রেরণা এবং পরিবেশের মধ্যেই এখনও বহুলাংশে সংযোজিত, আবদ্ধ এবং সংঘটিত হয়ে আসছে। এই কারণে কোনো এক আদিবাসী শিল্পীকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা বেশ কষ্টকর। বর্তমানে যদিও নানান কর্মশালার মাধ্যমে

> এবং লোকসংস্কৃতির উৎসব ও মেলার মাধ্যমে এই সব লোকশিল্পীকে চিহ্নিত প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।” [৮]

জল আর জঙ্গল –এই দুটোই আদিবাসীদের কাছে বাঁচার মূল মন্ত্র সাঁওতাল-মুণ্ডা –লোধা – শবর - কোল গোষ্ঠীভুক্ত প্রসিদ্ধ লোকসংস্কৃতি সমৃদ্ধি প্রাচীন উপজাতির অন্তর্গত নরশাখা। শিকার ও জঙ্গল আশ্রীত জীবন এদের।অরণ্যের মধ্যেই এদের লোকসংস্কৃতির বিষয়গুলো সভ্য সংস্কৃতি ও সভ্য মানুষের দৃষ্টি থেকে দূরে ছায়াঘন পরিবেশ সংগুপ্ত আছে। সেই অর্থে ওরাঁও নরশাখাটি উপজাতি ঠিকই এবং এরা লোকসংস্কৃতি সমৃদ্ধ মানব শাখাও বটে। কিন্তু কোল গোষ্ঠীভুক্ত নয় -- এরা দ্রাবিড় গোষ্ঠীভুক্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন --

> “No signs at Mongalian affinities can be detected in the relative positions of the nasal and malar bonex, and average naso-malar index for a hundred oraons measured on the system recommended by Mr. Old field Thomas.” [৯]

ওরাঁ ওদের চেহারা কালো, নাক খাঁদা ও চ্যাপ্টা, চুল প্রায়শ কোঁকড়ানো, মাথার খুলি গোলাকৃতি এবং দেহের উচ্চতা মাঝারি ধরনের।কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, ওরাঁওদের সঙ্গে মোঙ্গলীয়গোষ্ঠীভূক্ত মলিয়ী বা চীনাদের কোনো সাদৃশ্য নেই। কোনো কোনো গবেষক মনে করেন ওরাঁওরা দ্রাবিড় ভাষী, কুড়ুক জাতির উত্তর পুরুষ এবং ওরাঁও শব্দটি কুড়ুক শব্দের অপভ্রংশজাত।যেমন --

> “Kudukh is derived from Koakan which is supposed to have been the cradle of the Oraons.” [১০]

বাংলাদেশের ওরাঁওরা নিজেদের উরাঁও বলে পরিচয় দিতে এবং উরাঁও লিখতে অধিক আগ্রহী।

ওরাঁও উপজাতির প্রধান দেবতা হলেন ধরমেশ।বড়াম(লোধা), মারাংবুরু (সাঁওতাল), সিংবোঙার (মুণ্ডা) মতো আর এক জনজাতির পূজিত দেবতা হলেন ধরমেশ।ধরমেশ ছাড়া ওরাঁওরা জঙ্গলের দেবী চণ্ডী ও সরণ বুড়িয়াকে (গ্রামের দেবী) আরাধনা করে থাকে।লোধাদের দেবস্থান যেমন গরাম, ওরাঁওদের তেমনি চান্ডীটাঁড়।মূল শব্দ হল চণ্ড।যার অর্থ পাথর। এই চণ্ড থেকে এসেছে ‘চাণ্ডী’।এই ‘চাণ্ডী’ শব্দ ভেঙে এল চাঁই। যার অর্থ পাথরের বড় বড় নুড়ি।অন্য অর্থে ‘চাঁই’ হল শক্তিমান (তিনি দলের চাঁই)।এ থেকে এটাই প্রমাণিত চণ্ডী/ চাণ্ডী আসলে শক্তিরই পূজা। শবর লোধাদের জঙ্গলের দেবতা যেমন বড়াম, তেমনি ওরাঁওদের কাছে সরণ বুড়িমা জাগ্রত দেবী।গোষ্ঠীগত বিচারে ওরাঁওরা বিপরীত সাঁওতাল গোষ্ঠী থেকে আলাদা নয়।

বাংলাদেশের কোল জনগোষ্ঠী হল ঝাড়খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম, উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশের একটি উপজাতি, যারা প্রায় পাঁচ শতাব্দী আগে

মধ্যভারতের ছোটনাগপুর থেকে স্থানান্তরিত হয়েছিল। বেশিরভাগই ভূমিহীন এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল। এদের জীবন কাটে বেঁদে সম্প্রদায়ের মতো রাস্তায় রাস্তায়। অন্যের জায়গায় তাদের বসবাস। কালের প্রবাহে তারা তাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের অনেক কিছু হারিয়ে ফেললেও ঐতিহ্যবাহী বাঁশ ও বেত শিল্পের পৈত্রিক পেশা আঁকড়ে ধরে আছে এখনো। কোল সম্প্রদায়ের বসত স্থাপন চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, জয়পুরহাট, রাজশাহী ও দিনাজপুর কোতোয়ালি ও কাহারোল উপজেলা। বাংলাদেশের প্রথম জনসম্প্রদায় হচ্ছে কোল জনগোষ্ঠী। দু'শ বছর আগেও কোলবাসীরা কিছু কিছু জমির মালিকানায় ছিল। কাগজপত্র, দলিল না থাকায় নিজ ভূমিতে এখন এরা ভূমিহীন, কৃষিজীবী এবং দিনমজুর। এদের মধ্যে গোত্র বিভাগ নেই। কোনো বর্ণমালা নেই। বাংলা মিশ্রণে কোল ভাষা এক সংকর ভাষায় রূপান্তরিত।শিক্ষার হার খুবই কম।তবে বহুকাল আগে থেকে পাশাপাশি বসবাসের ফলে দেওয়া-নেওয়ার পালাটি অনেক গভীর শিকড় চারিয়ে দিয়েছে।প্রসঙ্গত উল্লেখ করা হলো--

> "কোল গোষ্ঠীর সমাজে লিঙ্গ পূজা ছিল না। এখনও নেই।মারাংবুরু সাঁওতালদের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও পাথররূপী দেবতা।কিন্তু মিশ্রণের শুভলগ্নে এসে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল।দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ওরাঁওরা লিঙ্গ পূজা করেন।সাঁওতালদের পাথরকল্পিত দেবতা ওরাঁওদের এই লিঙ্গরাজ (এও পাথর) একাকার হয়ে গেল।এই মিশ্রিত ধারণাই পরবর্তী অধ্যায়ে বোধ হয় কৈলাসবাসী শিবের জন্ম দিয়ে থাকলেও থাকতে পারে। যাই হোক, এখন শিবলিঙ্গকে পূজা করলে শিব পূজা হয়-- এতে আর দ্বিমত নেই। এভাবেই দ্রাবিড়ীয় লিঙ্গ পূজা আর কোলদের প্রস্তর খন্ড কল্পিত দেবতা-- একাকার হয়ে সৃজন করল নতুন দেবতা লিঙ্গরাজ শিবের।" [১১]

বলা ভাল দেবতার সামনে অগ্নি বা হোমের পূজা কোল গোষ্ঠীর মানুষের কাছ থেকেই এসেছে। 'অগ্নি' কোনো মৌলিক শব্দ নয়। কথাটা এসেছে 'অগ্র' থেকেই। আরাধ্য শক্তির কাছে আমাদের প্রার্থনা ও মন্ত্র-ঘৃতাদির বহন করে নিয়ে যায় বলে এর নাম হয়েছে বহনি। এই বহনি (van) হল বহ্নি। এইভাবে প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতীয় হিন্দু সমাজে দেব-দেবীর আরাধনার ক্ষেত্রে এই ত্রিধারা --ত্রিবেণী সঙ্গমের সৃষ্টি করেছে।

মনে রাখা দরকার, বিভিন্ন উপজাতীয় আদি সমাজ এবং বৃহত্তর হিন্দু সমাজ – উভয়ের মধ্যে সংমিশ্রণের যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া বহুকাল ধরে চলে আসছে, তাদের বিভিন্ন অপরিণত, অর্ধপরিণত ওপরিণতরূপ হলো বাংলার বিভিন্ন আদিবাসীসমাজ।

মুণ্ডা, সাঁওতালদের পরই এক বৃহৎ আদিবাসী গোষ্ঠী।এই উপজাতিটি তাদের সৃষ্টিকর্তারূপে বিশ্বাস ও আরাধনা করে বুরুবোঙাকে।'বোঙা' হল আদিবাসী সমাজে পাথরকল্পিত Supreme God। সাঁওতাল, হো, শবর, লোধারাও এই বোঙায় বিশ্বাস

করে।ইনি সর্বমঙ্গলময়, সর্বজীবে বিরাজমান। সাঁওতালদের মতো এরাও এই ঈশ্বর বা বোঙাকে পুজা করার জন্য থান নির্মাণ করেন। আসলে তিনিতো সর্বক্ষেত্রে এই সকল বস্তু, সকল প্রাণী, জলে-স্থলে সব ক্ষেত্রেই বিরাজমান। মুণ্ডারাও মাতৃদেবতার আরাধনা করে। এই মাতৃদেবী হলেন চাণ্ডীবোঙা।এই দেবীর আবাহনের জন্য মুণ্ডাপল্লীতে রয়েছে চাণ্ডীটাঁড়। এখানেই বছরের নানা সময় বা পরব উপলক্ষে এঁর পূজার ব্যবস্থা থাকে। পূজার দায়িত্ব থাকেন পাহান।

নগর সভ্যতার চাপে লোকরীতি ক্রমশই বিলীয়মান।তথাপিও এই আদিবাসী সমাজে লোকচর্যার বহু উপাদান এখনো খুঁজে পাওয়া যায়।তারা বাংলাদেশে বহুকালই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এবং প্রতিবেশী হিসেবে অন্যান্য সমাজের সঙ্গে অনেকখানি একাত্ম।তাদের লোকচর্যার অনেক কিছুই সমাজের অন্যান্য শ্রেণির লোকেদের মধ্যে পাওয়া যাবে।

আদিবাসী সমাজ যা মূলত কৃষিনির্ভর। এখনো তাদের প্রাচীন আচার পদ্ধতি কিছু কিছু আঁকড়ে ধরে আছেন এবং হাটে গঞ্জে অন্যান্য সমাজের লোকেদের সঙ্গে নিরন্তর সংস্পর্শে এসে লোকচর্যার বহমান ধারার মধ্যে তারাও আন্দোলিত।একদা বিচ্ছিন্ন বিশ্লিষ্ট হয়ে থাকলেও বৃহত্তর জনমানস বা অন্যান্য শ্রেণির কৃষক সমাজের থেকে তাদের পৃথক অস্তিত্ব বহুলাংশেই লুপ্ত। এখন তারা অন্যান্য সমাজের অনেক পুজো, উৎসব নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করেছেন – কথায়, চলায়-বলায় পুত্র-কন্যাদের নামকরণে অন্যান্য সমাজকে অনুসরণ করেছেন-- কাজেই এখন তাদের পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন বলা যায় না, তাদের লোকচর্যাও সে কারণে বৃহত্তর জনমানসের অঙ্গীভূত এবং যুগে যুগে রূপান্তরের মাধ্যমে নবায়নের দীক্ষায় দীক্ষিত।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য--

> "পরিবর্তনশীল জগতে আদিবাসী সংস্কৃতি অপরিবর্তনীয় রয়ে গেছে ভাবা ঠিক নয়।পরিবর্তন এসেছে যুগ যুগ ধরে সামাজিক আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, চিন্তাধারায়, কিন্তু সেগুলিকেই খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে।তাই আজও আদিবাসী সম্প্রদায়গুলির বৈচিত্র্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের সুন্দর রূপ আমাদের চোখে অনায়াসেই ধরা পরে।" [১২]

অধিকাংশ আদিবাসীদের রয়েছে নিজস্ব ভাষা।একটি জাতির ভাষা-সংস্কৃতি বিকাশসহ সার্বিক উন্নয়নের জন্য তার মাতৃভাষা চর্চা অপরিহার্য।পাহাড়ি আদিবাসীরা ঝুমচাষ করে কৃষিকাজের মাধ্যমে।তাদের পোশাক-পরিচ্ছন্ন, ভাষা, ধর্ম, আচার, প্রথার পরিবর্তন ঘটেছে। আদিবাসী নারীরা সৌন্দর্যপ্রিয়।বিভিন্ন উৎসবে অনুষ্ঠানে তারা পুষ্পভরণে সজ্জিত হয়।কোনো কোনো জনগোষ্ঠীর মেয়েরা শিমুল, পলাশ, চম্পা, রক্তকরবী ফুল খোঁপায় গুঁজে রূপসজ্জা করে থাকে।তারা কানে ফুল, নাকে নথ ও মাকড়ি, সিঁথেয় সিঁথেপাটি, হাতে বালা, চুড়ি, বটফল, বাহুতে বাজু পরে থাকে।

আদিবাসীরা অতীতকাল থেকেই বাংলা ভাষাভাষী বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পাশাপাশি বসবাস করছে। আদিবাসী জাতিসত্তাসমূহের জাতিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এবং বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে বৈচিত্র্যময় করেছে।তবে ঔপনিবেশিক সময়ে রাজনৈতিকভাবে এদেশে অন্যের সংস্কৃতি যে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল তার প্রভাব সব জাতিগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে রয়ে গেছে। সংস্কৃতির রূপান্তরও ঘটেছে।

স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশে বাঙালিদের মধ্যে একটি উচ্চারিত; উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠলেও আদিবাসীদের মধ্যে তেমনটি গড়ে ওঠেনি।শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং সার্বিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এরা বৃহত্তর বাঙালি জনগোষ্ঠীর তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে।ফলে বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামোতে সৃষ্টি হয়েছে এক দুর্লংঘ্য ব্যবধান এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে যুক্ত হয়েছে জাতিগত সমস্যার মতো উপাদান।শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের সংবিধানে তাদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির কোনো কথাই উল্লেখ নেই।জাতি সংঘের পক্ষ থেকে ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দকে ‘বিশ্ব আদিবাসী বর্ষ’ ঘোষণা করা হলেও বাংলাদেশ সরকার তা পালন করেনি।এমনকি সরকার থেকে ঘোষনা করা হয়েছে ‘বাংলাদেশে কোনো আদিবাসী নেই, যাহারা আছেন উপজাতি।’ অথচ আদিবাসীরা তাদের উপজাতি বলতে নারাজ, তারা চান আদিবাসী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হোক এবং দেওয়া হোক তাদের উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত বিধানাবলী।

মনে রাখা দরকার, দেশের সকল ক্ষুদ্র সম্প্রদায়কেই তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে বিকশিত হতে দেওয়া উচিত। আদিবাসী সামাজিক উন্নয়নে রাষ্ট্র ও সরকারের ভূমিকা অনাস্বীকার্য। প্রথমত, সরকারী ঘোষণায় এদেরকে সুস্পষ্টভাবে মেনে নিতে হবে-- এরা আদিবাসী সম্প্রদায়, উপজাতি নয়। শিক্ষা বিস্তার, স্বাস্থ্যবিধান, নতুন পথনির্মাণ ইত্যাদির দ্বারা বাংলাদেশ সরকারকে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকে প্রাগৈতিহাসিক দশা থেকে উদ্ধার করে বিংশ শতাব্দীর যোগ্য জনপদে অবশ্যই পরিণত করার দৃঢ় প্রয়াস থাকতে হবে। এছাড়া এই সম্প্রদায়ের মানুষদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে হলে জাতীয় সংহতিকরণের সাথে তাদের মুক্তি তথা ভাগ্যোন্নয়নের প্রক্রিয়াকে সম্পৃক্ত করতে হবে।তা না হলে সমগ্র দেশ ও জাতির সঙ্গে আদিবাসী সমাজের ঐক্যবোধ ও সংস্কৃতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে না।

তথ্যসূত্র:

১) ঘোষ, সুবোধ, ভারতের আদিবাসী, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, মার্চ – ২০১৮, পৃঃ ২৭৭।

২) তদেব, পৃঃ ২৬৮-২৬৯।

৩) তদেব, পৃঃ -২৬৯।

৪) রায়, বিপ্রজিৎ, (সম্পাদনা), লোকায়ত সমাজ ও ঐতিহ্য, রেণু প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৫, পৃঃ ৪৩।

৫) মজুমদার, দিব্যজ্যোতি, (সম্পাদনা), আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতিকেন্দ্র (তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার), কলকাতা, ২০০৪, পৃঃ ২৪।

৬) তরু, ড.মামহারুল ইসলাম, বাংলাদেশের আদিবাসী সংস্কৃতি, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩, পৃঃ ৪৪।

৭) দ্রং, সঞ্জীব, বাংলাদেশের বিপন্ন আদিবাসী, ঢাকা, ১৯৬৬, পৃঃ ২৫৩।

৮) মজুমদার, দিব্যোজ্যোতি, (সম্পাদনা), আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি, প্রাগুক্ত; পৃঃ ৪২-৪৩

৯) Risely, sir H.H., Tribes and castes of Bengal, Calcutta, 1891, P-139.

১০) Arupa, SR Aomani, The Oraon Habited-A study is cultural geography, Ranchi, 1989, P-28.

১১) হালদার, ড. মৃনালচন্দ্র, জনজাতি লোধা একটি লোকসাংস্কৃতিক নিরীক্ষা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১৪, পৃঃ ১৪২।

১২) মজুমদার, দিব্যজ্যোতি, (সম্পাদনা), আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি, প্রাগুক্ত; পৃঃ ৩৪।

বাঁকুড়া জেলা : ইতিহাসের প্রেক্ষিতে

প্রদ্যোৎ কুমার হোতা
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
সিকম স্কিলস্ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : রুক্ষভূমির স্থান হল বাঁকুড়া জেলা। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা থেকে এই জেলার অধিবাসীরা আচার-আচরণ, কথা-বার্তায়, সংস্কারে, খাদ্যাভাসে প্রভৃতি দিক দিয়ে এক স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করেছে - যার সূত্রে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার মানুষেরা বাঁকুড়া জেলার মানুষদের শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। ভৌগোলিকভাবে এই জেলার অবস্থান পূর্ববঙ্গীয় সমভূমি ও ছোটনাগপুর মালভূমির মধ্যেকার সংযোগসূত্র রূপে। বহু শতাব্দীব্যাপি লোকশ্রুতি, কাব্য, ইতিহাস, পরম্পরা অনুসারে যে অঞ্চল জঙ্গলমহল নামে খ্যাত, বর্তমান বাঁকুড়া জেলার অবস্থান সেই অঞ্চলেই। রাজনৈতিক, প্রশাসনিক প্রয়োজনে বারে বারে জঙ্গলমহল অঞ্চলের নানা পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। পরিবর্তনের পথ ধরেই বর্তমান বাঁকুড়া জেলার বিকাশ ঘটেছে। জঙ্গলমহল থেকে একটি স্বতন্ত্র জেলা হিসাবে বাঁকুড়া জেলার জন্ম হয় **১৮৮১** সালে। এই জন্মের ইতিহাস অর্থাৎ কীভাবে বাঁকুড়া জেলার জন্ম হল তা আলোচনার বিষয়। ইতিহাসবিদরা সেই দিকটি যতটাসম্ভব প্রকাশ করেছেন। বাঁকুড়া নামের উৎপত্তি বিষয়ে নানা অভিমত রয়েছে। যেমন - ড. অতুল সুর 'বাংলার সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন জাতক কাহিনিতে এরকম বর্ণনা রয়েছে যে, ভগবান বুদ্ধ তার পূর্বজন্মে বঙ্কগিরিতে ছিলেন। এই বঙ্কগিরি নাম থেকে বাঁকুড়া নামের উৎপত্তি হয়েছে। বাঁকুড়া শহরের উত্তর-পশ্চিম কোনে অবস্থিত শুশুনিয়া পাহাড়ের অঞ্চলকে বঙ্কগিরি বলা হয়। মূল প্রবন্ধে বাঁকুড়া জেলার সৃষ্টির ইতিহাস এবং বাঁকুড়া নামকরণের কারণ - এই বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

সূচক শব্দ : রুক্ষভূমি, সংস্কার, খাদ্যাভাস, ভৌগোলিক, ইতিহাস, জঙ্গলমহল, পূর্ববঙ্গ, বঙ্কগিরি।

মূল আলোচনা:

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের অন্যতম একটি জেলা হল বাঁকুড়া। ভৌগোলিকভাবে যার অবস্থান পূর্ববঙ্গীয় সমভূমি ও ছোটনাগপুর মালভূমির মধ্যেকার সংযোগসূত্র রূপে। বিস্তীর্ণ মালভূমি অঞ্চলের পূর্বাংশে অবস্থিত বাঁকুড়া জেলা। বহু শতাব্দী ব্যাপী লোকশ্রুতি, কাব্য, ইতিহাস, পরম্পরা অনুসারে যে অঞ্চল জঙ্গলমহল নামে খ্যাত, বর্তমান বাঁকুড়া জেলার অবস্থান সেই অঞ্চলেই। রাজনৈতিক, প্রশাসনিক

প্রয়োজনে বারে বারে জঙ্গলমহল অঞ্চলের নানা পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। পরিবর্তনের পথ ধরেই বর্তমান বাঁকুড়া জেলার বিকাশ ঘটেছে।

প্রাক ঐতিহাসিক যুগেও এই জেলায় যে জনবসতি ছিল তার নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রাচীন জৈনশাস্ত্র আচারঙ্গসূত্রে ভগবান মহাবীরের 'লাড়' বা 'রাঢ়' দেশ ভ্রমণের উল্লেখ রয়েছে। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে বাঁকুড়া জেলার ইতিহাসে সিংহবর্মার পুত্র মহারাজ চন্দ্রবর্মনের উল্লেখ পাওয়া যায় - যার ঐতিহাসিক নিদর্শন শুশুনিয়া পাহাড়ে অবস্থিত শুশুনিয়া লেখ। বাস্তবিক পক্ষে বাঁকুড়া জেলা হিসাবে পরিচিত এলাকাটিতে যে সু-প্রাচীনকাল থেকেই জনবসতি ছিল এবং কালের অগ্রগতিতে তার বিবর্তন ঘটেছে তা বলাই যায়।

অধ্যাপক রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী তাঁর 'বাঁকুড়া জনের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন ভবিষ্য পুরাণের যুগে অর্থাৎ পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে বাঁকুড়া জেলার অধিকাংশ অঞ্চলই ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। বন্য জীবজন্তুর অবাধ বিচরণ ছিল। জনবসতির ঘনত্ব ছিল খুবই কম। L.S.S.O Malley সাহেবের বিবরণ থেকেও জানা যায় জেলার অধিকাংশ এলাকা গহন অরণ্যাবৃত ছিল। সম্রাট আকবরের সভাসদ আবুল ফজল রচিত আইন-ই-আকবরী (১৫২৫-১৫৯৫) গ্রন্থ থেকে জানা যায় রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের সুবিধার জন্য সুবা বাংলাকে ৩৪ টি সরকারের বিভক্ত করেন - যার মধ্যে জলেশ্বর সরকারের অধীনে ছিল অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশ এলাকা, বালেশ্বর, ময়ূরভঞ্জ, সিংভূম, মানভূম এবং বর্তমান বাঁকুড়া জেলার সমস্ত এলাকা। শুধুমাত্র ঘাটাল, চন্দ্রকোনা, প্রভৃতি এলাকা বাংলার মূল ভূখণ্ড ছিল।

১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে বাংলার নবাব মীরকাশিমের সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চুক্তি মোতাবেক মেদিনীপুর চাকলার রাজস্ব আদায় এবং প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনার ক্ষমতা লাভ করে। এই চাকলার পশ্চিমপ্রান্তে গোয়ালপাড়া সরকারের অধীনে অনেকগুলি পরগনা ছিল যেমন - ফুলকুশমা, রাইপুর, অম্বিকানগর, সূপুর, মানভূম, বরাভূম, ছাতনা, ঘাটশিলা, ধলভূম। বাস্তবিক পক্ষে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের বনাঞ্চল, ছোটনাগপুর মালভূমির অংশ হিসাবে পাহাড় পর্বত যুক্ত অঞ্চলগুলির সঠিক সীমানা নির্ধারণ তৎকালীন সময়ে যথেষ্ট জটিল ছিল। ফলে প্রশাসন পরিচালনা, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে কালেক্টরদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ও পারস্পরিক দোষারোপ লেগেই থাকত।

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে। কিন্তু দেওয়ানির দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার মত প্রশাসনিক জ্ঞান ও দক্ষতা তখন কোম্পানির ছিল না। তাই তারা বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের পথে অগ্রসর হয়েছিল। ড. নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ তাঁর 'Agrarian History of Bengal' গ্রন্থে বলেছেন দেওয়ানী লাভের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকমন্ডলী মূলত যে উদ্দেশ্যের দ্বারা চালিত হয়েছিলেন তা হল সামাজিক উদ্বৃত্তের

পুরোটা নিশ্চিতভাবে শোষণ। এটা করতে গিয়ে জমি জরিপের পর খাজনা আদায় শুরু করলে ব্যাপক সংঘর্ষ শুরু হয়। কারণ খাজনা দেওয়ার বিষয়ে কোনো পূর্ব ধারণা এই এলাকার মানুষের ছিল না। অনুর্বর জঙ্গলময় পাহাড় এলাকায় জমি হাসিল করে বসবাস করলে স্থানীয় সামন্তপ্রভু, যাদের পরিচিতি ছিল রাজা হিসেবে তারা এবং প্রজাবর্গ উভয়ই শান্তিতে ছিলেন। পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল। জমিতে উৎপাদন প্রায় ছিল না বললেই চলে, তাই খাজনার কোনো পরিমানও নির্দিষ্ট ছিল না। উৎপাদিত ফসল সংগৃহীত ফলমূল ও অন্যান্য দ্রব্যাদির এক অংশ জমিদার বাড়িতে পৌঁছানোর রীতি ছিল। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মিল সম্পর্ককে দৃঢ় করেছিল।

এমতাবস্থায় কোম্পানী খাজনা আদায় করতে এলে স্থানীয় মানুষ প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, শুরু করেছিলেন বিদ্রোহ। কারণ মণ্ডল, মুখিয়া, প্রধান, খাটওয়ালী প্রভৃতি ব্যবস্থার মধ্যে থেকে যে সামাজিক সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন গড়ে উঠেছিল কোম্পানির গৃহীত পদক্ষেপ তাতে আঘাত করেছিল। এ কারণে ১৭৬৬-৬৭ থেকে শুরু করে ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বারে বারে বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কোম্পানির কর্তা ব্যক্তিরা যার নামকরণ করেন চূয়াড় বিদ্রোহ। কারণ তাদের মতে এলাকার মানুষজন ছিল দুর্বিনীত বা চূয়াড়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম বিদ্রোহ ছিল এই চূয়াড় বিদ্রোহ। প্রাথমিক পর্বে অর্থাৎ ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুরের রেসিডেন্ট জন গ্রাহাম জঙ্গলমহলে সামরিক অভিযান শুরু করার জন্য লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফার্গুসনকে নির্দেশ দেন। ফার্গুসন সাফল্যের সঙ্গে ইউরোপীয় এবং দেশীয় কিছু শাসকের সৈন্যকে নিয়ে বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করেন। বহু জমিদার আত্মসমর্পণ করেন। অনেকে জঙ্গলে আত্মগোপন করেন। তবে অসন্তুষ্ট বা কোম্পানির প্রবর্তিত ব্যবস্থা না মেনে নেওয়ার পক্ষপাতী স্থানীয় শাসকের সংখ্যাও নেহাত কম ছিল না। কারণ অনাদি কাল থেকে যে স্বাধীনতা তারা বংশ পরম্পরায় ভোগ করে আসছিলেন সেই স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার জন্য কোম্পানির কর্তা ব্যক্তিরা যখন শৃঙ্খলার নামে শৃঙ্খল পরাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন তখনই দেখা দিয়েছিল বিদ্রোহ। স্বাধীন প্রকৃতি সহজে শৃঙ্খল পরেনা - প্রকৃতির নিয়মেই এই সূত্রটি নিহিত রয়েছে। তাই বলা যায় চুয়াড় বিদ্রোহ ইতিহাসের অনিবার্য প্রক্রিয়ার ফল - যার মধ্যে বাঁকুড়া জেলা সৃষ্টির প্রাথমিক পদক্ষেপ খুঁজে পাওয়া জটিল নয়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর খাজনা আদায় সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায়েই ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রবর্তিত হয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত - যার একটি ধারা ছিল সূর্যাস্ত আইন। বছরের নির্দিষ্ট দিনের সূর্যাস্তের মধ্যে খাজনা জমা না দিলে জমিদারি নিলামের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। এই আইনের যাঁতাকলে পড়ে বহু জমিদারি নিলাম হয়ে যায় - যার সুযোগ নেন নব্য বেনিয়া সম্প্রদায়। পঞ্চকোট, ঝালদা, পাতকুম, বরাভূম, ধলভূম, মানভূম, রাইপুর প্রভৃতি এলাকায় যুগ যুগ ধরে রাজকার্য সম্পাদনের মজুরি হিসাবে নিষ্কর বা নামমাত্র খাজনায় যে পাইকগণ জমি ভোগ, দখল করেছিলেন তাতেও

সরকারি হস্তক্ষেপ ঘটে। ফলে পাইক সর্দাররা ক্ষেপে ওঠেন। শুরু হয় বিদ্রোহ। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে যোগ দেয় অধিকারচ্যুত পাইকরা এবং তাদের বাহিনী। রাইপুরের অধিকারচ্যুত জমিদার দুর্জন সিং, বগড়ীর জমিদার ছত্র সিং, বরাভূমের বিখ্যাত মিলিশিয়া বাহিনী, কর্ণগড়ের রাণী শিরোমনী এবং অন্যান্য অঞ্চলের অসন্তুষ্ট প্রজাবর্গ। বিদ্রোহীদের বিশাল বাহিনী নির্বিচারে লুণ্ঠন, হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে মেদিনীপুরের কালেক্টরেট পর্যন্ত পৌঁছায়। ঘটনার আকস্মিকতায় ও ভয়াবহতায় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিযুক্ত পুলিশ বাহিনী বিপর্যস্ত ও বিমূঢ় হয়ে পড়ে। বিদ্রোহ দমনের জন্য কালেক্টর সামরিক ফৌজ তলব করেন। ঘটনার পূর্ণ বিবরণ ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুরের সেটেলমেন্ট অফিসার জে. সি. প্রাইস চূয়াড় বিদ্রোহ নিয়ে যে বিবরণ লেখেন তাতে তুলে ধরেছেন - যার উপর ভিত্তি করে ম্যালি সাহেব তাঁর 'Bengal Districts Gazetteers Bankura, 1908' লেখেন। জেলা কালেক্টরেট কার্যত স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে চূয়াড়দের আক্রমণ প্রতিহত করা এবং এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য সরকারের যা আশু প্রয়োজন তা হল পুলিশ ও প্রশাসনকে নতুনভাবে সুবিন্যস্ত করা।

সমগ্র জঙ্গলমহল জুড়ে ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে যে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল তা কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলীকেই যারপরনাই ভীত সন্ত্রস্ত করেছিল। ভবিষ্যতে যাতে এরূপ পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্য বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুরের বনাঞ্চলগুলিকে নিয়ে একটি পৃথক প্রশাসনিক জেলা গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য জঙ্গলমহল অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে পুলিশ চৌকি স্থাপন করা হয়। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিদ্রোহীদের ব্রিটিশ প্রশাসনের অনুগত শ্রেণিতে পরিণত করার প্রয়াসও চলতে থাকে। যেমন জমিদারদের পাইকদের স্বীকৃতি প্রদান, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় জমিদারদের ভূমিকাকে স্বীকার করা প্রভৃতি। অবশেষে ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে রেগুলেশানের মাধ্যমে (Regulation XVII of 1805) নতুন জঙ্গলমহল জেলা গঠনের কথা ঘোষণা করা হয় জেলার সদর শহর হয় বাঁকুড়া। প্রথম ম্যাজিস্ট্রেট এবং কালেক্টর হিসাবে নিযুক্ত হন আলেকজান্ডার বুয়েরর টড্।

পৃথক জঙ্গলমহল জেলা গঠনের পিছনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মূল উদ্দেশ্য ছিল জঙ্গলমহল অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় বসবাসকারী আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলি - যারা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লাগাতার বিদ্রোহ করে আসছিলেন তা দমন করা, সমগ্র এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করে কোম্পানির নিরঙ্কুশ রাষ্ট্র ক্ষমতা তথা প্রশাসনিক ক্ষমতাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা। নতুন এই জেলায় মোট ২৩ টি পরগনা ছিল। মেদিনীপুর থেকে ৭টি যথা - ছাতনা, বরাভূম, মানভূম, সুপুর, অম্বিকানগর, সিমলাপাল, ভেলাইডিহি, বর্ধমান জেলা থেকে ৩টি পরগনা যথা - সেনপাহাড়ী, শেরগড় ও বিষ্ণুপুর এবং বীরভূম জেলা থেকে ১৩ টি পরগনা যথা - পঞ্চকোট, বোগান, কাউদান, তরফবাহাদুর, কাটলাশ, ঝালদা, ঝরিয়া, জয়পুর, মুকুন্দপুর, নয়াগড়, চাণ্টলি,

পাতকুম, নগর বিয়াসি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ বর্তমান ঝাড়গ্রাম জেলার যে অরণ্য সমৃদ্ধ অঞ্চল জাম্বনী, দিগপারুই, বেলিয়াবাড়া, শিলদা, রামগড়, লালগড়, রোহিনী প্রভৃতি এলাকা জঙ্গলমহলের বাইরে রাখা হয়েছিল।

১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে সে ঘটনার ফলশ্রুতিতে জঙ্গলমহল জেলার বিলোপ ঘটে তা হল গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামা। বরাভূমের শেষ স্বাধীন রাজা বিবেক নারায়ণের রাজ্য ত্যাগের পর উত্তরাধিকার লড়াইয়ের ফলশ্রুতি ছিল এই হাঙ্গামা। রাজা বিবেক নারায়ণ প্রথম চূয়াড় বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। দীর্ঘ সংগ্রামের পর পরাজিত হয়ে নিজে সন্ন্যাস নিয়ে রাজ্য ত্যাগ করেন। লছমন সিং ছিলেন পাটরানীর ছেলে, আইন অনুযায়ী তিনিই সিংহাসনের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু কোম্পানি অন্যায় ভাবে রঘুনাথ নারায়নকে রাজা হিসাবে স্বীকৃতি দেয় ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে। কোম্পানির এই পদক্ষেপ এর বিরুদ্ধে লছমন সিং বিদ্রোহ করেন এবং বন্দী হন। বন্দি অবস্থায় তার মৃত্যু হয় তারই পুত্র ছিলেন গঙ্গানারায়ণ। রঘুনাথ নারায়ন সিংহের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার প্রশ্নে মেদিনীপুর কোর্টে মামলা হয়। মামলার ফলে গঙ্গাগোবিন্দ রাজা হন। অন্য ভাই মাধব সিং হন হিকিম। গঙ্গানারায়ণ যিনি পঞ্চসর্দারী তরফ নিয়ে মোটামুটি শান্তিতেই ছিলেন। মাধব সিং হিকিম হওয়ার পর গঙ্গা নারায়ণের পঞ্চসর্দারী তরফও কেড়ে নেন। ফলে অসন্তোষ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। গঙ্গা নারায়ণ স্ত্রী পুত্রদের হিকিম মাধব সিং এর নিকটে রেখে তীর্থদর্শনে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখেন মাধব সিং তার স্ত্রী পুত্রদের তাড়িয়ে দিয়েছেন। অসন্তোষের আগুনে ঘি পড়ে ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে এপ্রিল মাসে গঙ্গানারায়ণ এক কোপে মাধব সিং এর মাথা ধড় থেকে আলাদা করে দেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও প্রত্যক্ষ করলেন গঙ্গানারায়ণের রুদ্ররূপ। নিজের বাহিনীকে সুসংহত করে কোম্পানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। অম্বিকানগর, বরাবাজার, শ্যামসুন্দরপুর, ফুলকুশমা, রাইপুর প্রভৃতি এলাকা দখল করে। প্রাথমিকভাবে কোম্পানির প্রশাসকরা বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করা দূরস্ত কোনো প্রকার হদিশ করতেই পারেনি। প্রতিহিংসাবশত তারা বরাভূম সংলগ্ন এলাকাগুলোতে অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন, ধানের গোলা পুড়িয়ে দেওয়ার মতো কাজে লিপ্ত হয়। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল জুডিশিয়াল বোর্ডের কার্য বিবরণীতে লেফটেন্যান্ট বার্ড যে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন তাতে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল - "we destroyed as much as we could two sugarcane plantation and during the morning endeavour do all harm we could : (Ref : proceeding of the Bengal Judicial Board, dated 6th February 1833)[১] প্রায় নয় মাস যুদ্ধ করার পর গঙ্গানারায়ণ পরাজিত ও নিহত হন। স্বাভাবিকভাবেই বিদ্রোহী ভূমিজ সর্দার ও অন্যান্য অংশগ্রহণকারীরা আত্মসমর্পণ করেছিলেন।

ভূমিজ বিদ্রোহের অবসানের পরেই জঙ্গলমহল জেলাকে ভেঙে দেওয়া হয়। বিভিন্ন জেলার সঙ্গে জঙ্গলমহলের বিভিন্ন এলাকাকে জুড়ে দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে রেগুলেশন (Regulations XVII 1833) জারি করা হয়। বাঁকুড়া

জেলা গ্যাজেটিয়ারে ও ম্যালি সাহেব যেভাবে বিষয়টির উল্লেখ করেছেন সেটি হল – "as a result of these disturbances a change of administration was determined upon and by Regulation XIII of 1833, the district of Jungle Mahal was broken up. The court of Dewany Adalat of Jungle Mahal was abolished, the estates of Senpahari, shergarh and Bishnupur transferred to Burdwan, and the remainders with estates of Dhalbhum which were detached from Midnapore, were formed into the present district of Manbhum. At the same time the country was withdrawn from regular system of administration and was placed under an officer called the principle assistant to the agent to the Governor General for the southwest Frontier. The effect of this measure was that practically the whole of the west of the present district of Bankura was included within Manbhum and a map of 1844 shows the eastern boundary of the South west Frontier agency has extending close to Bankura town. The remainder of the district as now constituted was formed into the district known as West Burdwan upto 1835 - 36. The later had its headquarter at Bankura and extended so far East to kotulpur, while to the west Chatna supur and Ambikanagar formed part of the South-west Frontier agency" (Ref. : Bengal District Gazetteers, Bankura, 1908 by L.S.S.O Malley. I.C.S.)[২]

ভূমিজ বিদ্রোহের পর ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে রেগুলেশনের মাধ্যমে জঙ্গলমহল জেলার অবলুপ্তি ঘটে। জঙ্গলমহলের এলাকাগুলিকে বর্ধমান, মানভূম ও সিংভূম জেলার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি নূতন বাঁকুড়া জেলাও গঠিত হয়েছিল। মানভূম জেলা গ্যাজেটিয়ার (১৯১১) রচয়িতা H.Coupland উল্লেখ করেছেন জঙ্গলমহল জেলার যে এলাকাগুলি নবগঠিত মানভূম জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সেগুলি হল সুপুর, রাইপুর, শিমলাপাল, ভেলাইডিহি, ফুলকুশমা, শ্যামসুন্দরপুর, অম্বিকানগর ও ধলভূম। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে মহাবিদ্রোহের পর ধলভূম পরগনাকে সিংভূম জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। তাছাড়া মানভূম জেলা ও বর্ধমান জেলার সীমানা পূনর্বিন্যাস করে নূতন বাঁকুড়া জেলা গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। যেহেতু পূর্বতন জঙ্গলমহল জেলার সদর কার্যালয় হিসেবে বাঁকুড়ার প্রশাসনিক পরিকাঠামো তৈরি হয়েছিল তাই সদর শহর হিসাবে বাঁকুড়াকেই নির্ধারণ করা হয়েছিল।

১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে 'Statistical and Geographical report of the District of Bankura gastrail report' রচিত বাঁকুড়া জেলা নামটি পাওয়া গেছে। L.S.S.O

Malley রচিত গেজেটিয়ার থেকে জানা যায়, বাঁকুড়া শহরের পূর্ব দিকের ভূখণ্ডই ছিল বাঁকুড়া জেলার ভৌগোলিক পরিসীমা। পশ্চিম দিকের শেষ প্রান্ত ছিল বাঁকুড়া শহর। জেলার বাঁকুড়া - রানীগঞ্জ রোডের পশ্চিম দিকের সমগ্র এলাকা, বাঁকুড়া - খাতড়া রোডের পশ্চিম প্রান্তের সমগ্র এলাকা মানভূম জেলার অংশ ছিল। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে সোনামুখী, ইন্দাস, কোতুলপুর, শেরগড় ও সেনপাহাড়ী পরগনাকে বর্ধমান জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ছাতনা পুলিশ থানাকে মানভূম থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাঁকুড়া জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে জেলার পরিসংখ্যান সংক্রান্ত পুস্তক (Statistical Account of Bengal : Bankura) প্রকাশিত হয়। তখন বাঁকুড়া জেলার আয়তন ছিল মাত্র ১৩৪৬ বর্গমাইল। কিন্তু ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে মানভূম জেলার অংশ হিসেবে থাকা সুপুর, অম্বিকানগর, রাইপুর, শ্যামসুন্দরপুর, ফুলকুশমা, সিমলাপাল, ভেলাইডিহি প্রভৃতি পরগনাগুলিকে বাঁকুড়া জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। তাছাড়া সোনামুখী, কোতুলপুর ও ইন্দাস থানা এলাকাকে বর্ধমান জেলা থেকে বিমুক্ত করে বাঁকুড়া জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মার্চ বাঁকুড়া পূর্ণাঙ্গ জেলার মর্যাদা পায়। আয়তন হয় ৬৮৮২ বর্গকিমি।

ভৌগোলিকভাবে উত্তর গোলার্ধের ২২^{0}৩৮' উ: অক্ষাংশ থেকে শুরু করে ২৩^{0}৩৮' উ: অক্ষাংশ এবং ৮৬^{0}৩৬' দ্রাঘিমাংশ থেকে শুরু করে ২৭^{0}৪৫' পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে বাঁকুড়া জেলার অবস্থান। জেলার উৎপত্তির ইতিহাস বর্ণনায় নামকরণের বিষয়টিরও আলোচনা প্রয়োজন। বাঁকুড়া নামের উৎপত্তি নিয়ে মতভেদ রয়েছে। প্রচলিত ধারণা হলো মুন্ডারি শব্দ 'ড়া' যার অর্থ জনজাতি, বক্র বা বাঁকা বা বাঁকু এর সঙ্গে ড়া যুক্ত হয়ে বাঁকুড়া শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। মল্লরাজ বীর হাম্বিরদের পুত্র বাঁকুড়া দেবের নামানুসারে এই নামের উৎপত্তি। লোককাহিনি হতে জানা যায় মল্লরাজ বীর হাম্বিরের ২২ জন পুত্রের মধ্যে রাজ্য ভাগ হয়। তার মধ্যে বীর বাঁকুড়া দেব গভীর জঙ্গলে তার রাজধানী স্থাপন করেছিলেন।

L.S.S.O Malley এর মতে বদড়ার রায় পরিবারের মূখ্য সামন্ত বা সর্দার বাঁকুড়া রায় এর নামানুসারে বাঁকুড়া নামকরণ হয়েছিল। মঙ্গলকাব্য ধর্মমঙ্গল-এর বর্ণনায় ধর্ম ঠাকুরের আর এক নাম বাঁকুড়া রায় যা থেকে এই নামের উৎপত্তি। বাংলা ভাষার প্রখ্যাত গবেষক ড. ক্ষুদিরাম দাস বলেছেন মূল শব্দ বক্র থেকেই বাঁকুড়া শব্দের উৎপত্তি। তার মতে মল্লরাজ কুমারের নাম থেকে বাঁকুড়া নামের উৎপত্তি।

‘বাংলার সামাজিক ইতিহাস’ গ্রন্থে ড. অতুল সুর বলেছেন জাতক কাহিনিতে এরকম বর্ণনা রয়েছে যে ভগবান বুদ্ধ তার পূর্বজন্মে বঙ্কগিরিতে ছিলেন। এই বঙ্কগিরি নাম থেকে বাঁকুড়া নামের উৎপত্তি হয়েছে। বাঁকুড়া শহরের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত শুশুনিয়া পাহাড়ের অঞ্চলকে বঙ্কগিরি বলা হয়েছে।

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন সংস্কৃত বক্র শব্দ থেকে বাঁকু কথাটির উৎপত্তি। বক্র শব্দের অর্থ সর্পিল বা আঁকাবাঁকা, অপর অর্থে সুন্দর। আশ্চর্য সুন্দর ধর্ম

ঠাকুর যাকে পূজো দিতে হয়। ধর্ম ঠাকুরের পূজায় এ ধরনের প্রশস্তিও উচ্চারণ করা হয়। তার অপর নাম বাঁকুড়া রায় যা থেকে বাঁকুড়া জেলার নামটি এসেছে বলে মনে করা যেতে পারে। এইভাবে বলা যেতে পারে দীর্ঘ ঐতিহ্যের পরিক্রমায় বাঁকুড়া নামের উৎপত্তি এবং সদর প্রশাসনিক কেন্দ্র এবং জেলা হিসাবে বাঁকুড়ার বিকাশ ঘটেছে।

তথ্যসূত্র :

১. দ্রষ্টব্য - মাহাত, দেবেন্দ্রনাথ, চুয়াড় বিদ্রোহ ও সমকালীন ভূমিব্যবস্থা, কলকাতা ২০১৫, পৃষ্ঠ - ১২২

২. প্রাগুক্ত সূত্র-১, পৃষ্ঠ - ১২৫

গ্রন্থপঞ্জি

১. মাহাত, দেবেন্দ্রনাথ, চুয়াড় বিদ্রোহ ও সমকালীন ভূমিব্যবস্থা, কলকাতা ২০১৫
২. গোস্বামী, দীলিপ কুমার, মানভূমের স্বাধীনতা আন্দোলন, ২০১২
৩. পশ্চিমবঙ্গ (বাঁকুড়া জেলা সংখ্যা) তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, 2009.
8. কর, রামানুজ, বাঁকুড়া জেলার বিবরণ, 1332 বঙ্গাব্দ।
৫. চৌধুরী, রথীন্দ্রমোহন, নয়া বাঁকুড়ার গোড়াপত্তন ও বিকাশ 2007.
৬. মুখোপাধ্যায়, লীলাময়, জেলার নাম বাঁকুড়া, বাঁকুড়া 2019
৭. H.Coupland, Bengal District Gazetteer, Manbhum, 1911
৮. L.S.S.O. Malley, Bankura District Gazette (1908)

বিমল করের ‘যদুবংশ’- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সামাজিক অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে চার যুবকের আত্মার মৃত্যু ও পুনর্জন্মের আখ্যান

শঙ্খ দত্ত
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: ‘যদুবংশ’ উপন্যাস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সামাজিক অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে দিকভ্রষ্ট, বিভ্রান্ত চার যুবকের আখ্যান। সূর্য, বুললি, অভয় ও কৃপাময় অল্প শিক্ষিত এবং উপার্জনহীন। সূর্য ও বুললির বাবা চূড়ান্ত দূর্নীতিগ্রস্ত, দারিদ্র্য ও মায়ের কঠোর গঞ্জনা অভয়ের নিত্যসঙ্গী, পিতৃহীন কৃপাময় নিজের বাড়িতে আশ্রিতের মত বেড়ে ওঠে জীবন্মৃত, উন্মাদ মাকে নিয়ে- ফলে নিজেদের পরিবারে তারা যেমন অবাঞ্ছিত হয়ে ওঠে তেমনই তারাও পরিবারের মায়া কাটিয়ে একে অপরকে আঁকড়ে ধরে টিঁকে থাকে। দূর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া আদর্শহীন সমাজে তারা অনুকরণযোগ্য কাউকে পায়না ফলে অভিভাবকত্ব ও সহানুভূতির অভাবেই তারা উচ্ছৃঙ্খল, উদ্দেশ্যহীন জীবনযাপন করে। কিন্তু গণনাথের মৃত্যু তাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় এখনও এই সমাজে সততা, আদর্শ- এই শব্দগুলো কেবল বইয়ের পাতাতেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়নি। ফলে তাদের অনুশোচনা, তাদের জীবনের মূলস্রোতে ফিরে আসবার একটি সম্ভবনা তৈরি করে।

সূচক শব্দ : যুদ্ধোত্তর অবক্ষয়, দূর্নীতি, নৈতিক অধঃপতন, প্রজন্ম ব্যবধান, দিশাহীন যুবসমাজ, প্রেম, যৌনতা, মৃত্যু।

মূল আলোচনা:

বিমল কর ‘যদুবংশ’ লেখা শুরু করেন খানিকটা জেদের বশে। আনন্দবাজার পূজাবার্ষিকীতে লেখার দায়িত্ব পেয়ে তিনি যখন প্লট হাতড়াচ্ছেন তখনই তাঁর মনে হয় “কিছু রাফ, পাজি, নচ্ছার টাইপের ছেলে”[১] নিয়ে একটি উপন্যাস লেখার কথা- যাদের তিনি কিছুটা চেনেন, বাকিটা কল্পনা করে লিখবেন। কিন্তু তাঁর সাহিত্যিক বন্ধু বরেন আশঙ্কা প্রকাশ করেনযে এই প্রজন্মের প্রতি অনভিজ্ঞতা ও অজ্ঞতাবশত বিমল কর বোধ হয় সফল হবেন না। মূলত তাঁর সঙ্গে বাজি ধরেই বিমল কর লিখে ফেললেন ‘যদুবংশ’ উপন্যাস যা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ তে।

এই প্রসঙ্গে বিমল কর তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ ‘উড়োখই’ দ্বিতীয় পর্বে স্বীকার করেছেন একটি স্প্যানিশ ও একটি ইতালিয়ান উপন্যাস যথাক্রমে হুয়ান

গোয়াটিসোলোর 'দি ইয়াং অ্যাসাসিনস' ও প্রাটোলিনির 'আ হিরো অব আওয়ার টাইম'-এর কথা যেখান থেকে তিনি তাঁর ভাবনাবীজ সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু তবু 'যদুবংশ' যে দেশকালের মাটিতে তার শিকড় নামাতে সক্ষম হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। স্বয়ং লেখক বলছেন,

> "...যুদ্ধোত্তর কালে আমাদের দেশেও ক্রমশ এক অবক্ষয় দেখা দিচ্ছিল। অবক্ষয়, উচ্ছৃঙ্খলতা, ক্রোধ, ঘৃণা, বিদ্রোহ। সেই অবক্ষয় যে বিশ- পঁচিশ বছরের মধ্যে অতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তাতে আর সন্দেহ কী। 'যদুবংশ' লেখার সময় এই কথাগুলি আমি মনে রেখেছিলাম।"[২]

গোয়াটিসোলোর উপন্যাসের পটভূমি ছিল জেনারেল ফ্রাঙ্কোর আমলের স্পেন, প্রাটোলিনির উপন্যাসে তা মুসোলিনির ইতালি কিন্তু বিমল করের উপন্যাসের পটভূমি কলকাতার মত বড় শহর থেকে অনেক দূরে। উপন্যাসে নির্দিষ্ট স্থাননাম না থাকলেও তাঁর মনের মধ্যে ছিল আসানসোলের মত একটি শহর যা নিত্যদিন বাড়ছে, বাইরের সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটছে, কিছুটা রেলশহর, কিছুটা কারখানা শহর- এবং যার এখনও একটি মফস্বলি চরিত্র আছে। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর'-এ মন্তব্য করেছিলেন,

> "এ- শতকে বর্তমান শতাব্দীর পাঁচের ও ছয়ের দশকের অনন্বয় তথা বিবিক্ততাবোধের কারণে অনায়ক- নায়ক কল্পনা আরো বেশি প্রাধান্য পেল।"[৩]

'যদুবংশে'র কাহিনী আবর্তিত হয়েছে সূর্য, বুললি, অভয় ও কৃপাময়কে কেন্দ্র করে। চারবন্ধুর কেউই কলেজের গণ্ডী পেরোয়নি- সূর্য 'টেকনিকাল কোর্স' পড়তে গিয়ে পড়া অসম্পূর্ণ রেখেই ফিরে এসেছিল, কৃপাময় শেষ পর্যন্ত কলেজের পরীক্ষা দিলেও পাশ করতে পারেনি, অভয় কিছুদিন পড়ে কলেজ ছেড়ে দেয় এবং বুললি কলেজে ভর্তি হয়নি। তারা বর্তমানে সমাজের যেকোনো গঠনমূলক কাজের থেকেই বিচ্ছিন্ন। উচ্চশিক্ষিত নয় বলেই তারা কেউ চাকরির আশাও করে না। তবু আমরা একমাত্র অভয়কেই উপন্যাসে চাকরির চেষ্টা করতে দেখি অ্যাকাউন্টস বিভাগের সাহেবের পি.এ. চারু দত্তগুপ্তের বাড়ি গিয়ে। নিজেদের বাড়ি ও পরিবারের প্রতিও তাদের টান উপন্যাসে বিশেষ চোখে পড়ে না ফলে কর্মহীনতার বিপুল অবসর তাদের আরো বিপথগামী করে তোলে। প্রথম পরিচ্ছেদ থেকেই চারবন্ধুর মদ্যপানের প্রসঙ্গ বারবার এসেছে। মতিলালের লাইসেন্সহীন দোকানে পিনকি তাদের সস্তা, দিশি মদ পরিবেশন করে আর গভীর রাতে চারবন্ধু নেশাগ্রস্ত অবস্থায় টলতে টলতে বাড়ি ফেরে। চাকরি পাওয়ার আশা যেমন তারা করে না তেমনই সৎপথে অন্যভাবে উপার্জনের তাগিদও তাদের মধ্যে দেখা যায় না বরং তারা স্বপ্ন দেখে তারা একদিন শহরের নতুন 'ড্রীম' বারে মদ খেতে যাবে কিন্তু তারা পিছিয়ে যায় দুটি কারণে- প্রথমত তাদের সামান্য হাতখরচ এবং

দ্বিতীয়ত তাদের অনেক পরিচিত ওই বারে যাতায়াত করে। সুতরাং আমরা বুঝতে পারি চারবন্ধু নিজেদের যতই বেপরোয়া দেখানোর চেষ্টা করুক, তারা এখনও সমাজকে পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারে না বা বলা ভাল নিজেদের পুরোপুরি 'সমাজচ্যুত' দেখানোর সাহস করে উঠতে পারে না।

শুধু সিগারেট বা সস্তা দিশি মদ খেয়ে ঔদ্ধত্যের প্রকাশই নয়, সমাজমান্য যাবতীয় শালীনতা, ভদ্রতা ও আচরণবিধির প্রতিই তারা শ্রদ্ধা ও আস্থাহীন। তথাকথিত এই 'সমাজ' তাদের যত দূরে ঠেলেছে, ততই এই সমাজকে তারা নিজেদের প্রতিপক্ষ ভাবতে শুরু করেছে, ফলে সূর্যর বাবা এলাকার পৌরসভার চেয়ারম্যান হলেও সূর্য গভীর রাতে গুলতি দিয়ে ল্যাম্পপোস্টের বাল্ব ফাটিয়ে বন্ধুদের তারিফ কুড়োয়। প্রায় প্রতি কথায় তারা অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ করে- সবসময় গালাগাল দেওয়ার উদ্দেশ্যেও নয়, বরং এটা যেন তাদের মুদ্রাদোষ বা কথার লবজে পরিণত হয়েছে। পরস্পরকে 'মাইরি' বা 'শালা' সম্বোধন তো বটেই এমনকি তারা নিজেদের মা- বাবা, বন্ধুর মা সম্পর্কে কথা বলার সময়ও শালীনতার ধার ধারে না। উপন্যাসের গোড়ার দিকে সূর্য বুললিকে 'দারোগার বাচ্চা' বলে সম্বোধন করে, অভয় সূর্যকে টিটকিরি দিয়ে বলে,
"আমি তো শালা দিলদারের বাচ্চা নই, আমার বাপ বয়লারে কয়লা মারে।"[৪]

তুলসীর মা সম্পর্কে তারা অশ্লীল রসিকতা করে বলে-

> "নিজের তিনটে। তিনটেই যেন সমুদ্রমন্থন থেকে উঠে এসেছে... কোন সমুদ্র? ক্ষীরসমুদ্র-!"[৫]
>
> অভয়, বুললিকে ব্যঙ্গ করে-
>
> "তোর বাপ সাধুপুরুষ নয়। শালা যুধিষ্ঠিরের বাচ্চা আমার!"[৬]
>
> বুললি আবার নিজেদের বাবাদের সম্পর্কে বলে-
>
> "বুড়োরা খুব রসে আছে"[৭]

অভয়কে চাকরির মিথ্যা আশ্বাস দেওয়ায় তারা চারুর সিগারেট চুরি করে, মেয়ের বিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দেয়, ট্রের ঢাকনা দিয়ে জুতো মোছে, কাপ ভেঙ্গে ফেলে এবং ঘর থেকে বেরোনোর সময় অশ্লীল ভঙ্গি করে নাচে। মহিলাদের প্রতি তাদের আচরণে সৌজন্যের ছিঁটেফোটাও আমরা দেখি না। অভয় নিজমুখেই স্বীকার করে যমুনার গালে সিদ্ধি খেয়ে 'টোনা' মারার কথা। ষষ্ঠীর দিন ঝিলের ধারে লুকিয়ে মদ খেয়ে তারা সন্ধেবেলা মেয়েদের গা ঘেঁষে সাইকেল চালিয়ে যায়, শিস দেয় এবং সূর্য চেঁচিয়ে বলে-

> "রাস্তা ছেড়ে পাগলী, রাস্তা ছেড়ে, দমকল যাচ্ছে"[৮]
>
> বুললি তাকে সঙ্গত দিয়ে বলে, "আমি অ্যামবুলেন্স"[৯]

তারা নিজেদের মধ্যেও যৌনইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলে ইয়ার্কি মারে, মেয়েদের অন্তর্বাস নিয়ে রসিকতা করার চেষ্টা করে। পনেরো বছরের বড় দিদি বিজয়াকে সূর্যর মনে হয় 'ধুমসী মাগী'। তার সম্পর্কে সে বন্ধুদের কাছে বলে-

> "বাবা মরে যাক, দেখ ওই দিদির আমি কি করি! কুত্তা দিয়ে খাওয়াব"[১০]

বিরক্ত হলে নিজের বড় ভাগনেকে সে লাথি পর্যন্ত মারে। বুললি তার দাদাবৌদির প্রেমের বিয়েকে ব্যঙ্গ করে বলে ‘গববা মেরে বিয়ে’ কিংবা বৌদিকে ঝগড়ার সময় আক্রমণ করে ‘বি.এ. পড়া ছুঁড়ি’ বলে। এমনকি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপিকা জয়ন্তী সম্পর্কেও কুমন্তব্য করতে তাদের বাধে না-

“জিনিসটা আগুন... পেট্রল মাইরি... কলকাতার নিউ মডেল”[১১]

এছাড়াও অভয় সম্পর্কে সূর্যর কদর্য ঠাট্টা, “আমি কি ওর মাগীতে মই চড়াব?” অথবা স্টেশনে মহিলা টিকিট কালেক্টর দেখে ‘ওপন’ হওয়া শব্দটি নিয়ে অভয় ও বুললির রসিকতা, চারুবাবুর কন্যাপ্রসবিনী স্ত্রী সম্পর্কে কৃপাময়ের কুরুচিকর মন্তব্য, “চারুর গিন্নী মেয়েস্কুলের বাস যে”-ইত্যাদি থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে শুধু নিজের পরিবার- পরিজনই নয়, চেনা, আধচেনা বা সমাজের যেকোনো স্তরের মহিলা সম্পর্কেই তারা অশোভন ও কুরুচিকর মন্তব্য করতে পিছপা হয়না।

সূর্য, বুললি, অভয় ও কৃপাময় বন্ধু হলেও তাদের মধ্যেও আমরা স্তরভেদ লক্ষ্য করতে পারি। সূর্য ও বুললির বাবার আর্থিক অবস্থা বেশ ভাল। তারা জানে তাদের বাবারা দূর্নীতিগ্রস্ত এবং তারা এখনও যেটুকু খাতির পায় তা তাদের বাবাদের দৌলতেই- সেটাও তারা জানে। কিন্তু অভয়ই একমাত্র দরিদ্র পরিবারের ছেলে, তাই তাকে মদ- সিগারেটের জন্য প্রায়ই বন্ধুদের উপর নির্ভর করতে হয়। সেই ক্ষোভ তাকে পিতৃহীন, বনেদি বাড়ির ছেলে কৃপাময়ের প্রতি বেশি ঘনিষ্ঠ করে তোলে। তবু তারা সকলেই একটা যৌথ হতাশায় ভোগে এবং একে অপরকে আঁকড়ে ধরে থাকে, কারণ অন্য কোথাও তারা কোনো আশ্রয় খুঁজে পায়না।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্বোক্ত বইতে তাই মন্তব্য করেছিলেন বিমল করের উপন্যাসে-

“আধুনিক অস্তিত্বগত যন্ত্রণার দেখা পাই”[১২]

সূর্যদের যে বিকৃত আত্মপ্রকাশ তা কি তাদের অস্তিত্ব জানান দেওয়ার তাগিদে? কিন্তু বিমল কর কেবল যুবসমাজের বিকৃত, কদর্য চেহারার কাঠামোটুকুই খাড়া করেননি, বরং খুঁজতে চেয়েছেন সমাজ থেকে তাদের স্বেচ্ছানির্বাসনের কারণগুলোও। কোন মানসিক ও পারিপার্শ্বিক অবক্ষয় তাদের আত্মঘাতী প্রজন্মে বদলে দিল, সেই রূপান্তরে পূর্ববর্তী প্রজন্মের ভূমিকা কী ছিল- তাও এসেছে যদুবংশে।

“প্রজন্ম ব্যবধান বিমল করের উপন্যাস ভাবনার একটি স্থায়ী প্রসঙ্গ”[১৩]– সমালোচকের এই মন্তব্য যথাযথ।

আলোচ্য উপন্যাসে সূর্যদের আগের প্রজন্মের নৈতিক অধঃপতন সূর্যদের বেড়ে ওঠাকে নিশ্চিতভাবেই প্রভাবিত করেছিল- তাদের সমাজবিমুখতার এটাও অন্যতম কারণ।

চারবন্ধুর পারিবারিক চেহারার বিশ্লেষণে আমরা তাদের মনোজগতের সন্ধান পেতে পারি। আপনজনের কাছে প্রাপ্য ভালোবাসা না পাওয়া এবং অভিভাবকস্থানীয়দের

নীতিহীনতা ও স্বার্থপরতা সূর্যদের বিভ্রান্ত করে তোলে কর্তব্য- অকর্তব্য সম্পর্কে। উপন্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখি ছোটবেলায় মার মৃত্যুর পর বাবা কামাখ্যাবাবুর সঙ্গে দূরত্ব সূর্যর ক্রমশই বেড়েছে এবং সেই সঙ্গেই বেড়েছে তার প্রাপ্য আদরের অভাব। বিধবা দিদি বিজয়ার পোশাক আশাক, হাল ফ্যাশনের শৌখিনতা সূর্যর নোংরামি বলে মনে হয়। তার বিসদৃশ ভাবে পা ফাঁক করে শোওয়া, সাধনচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, তার আলমারিতে পাওয়া অশ্লীল ছবির বই এবং সর্বোপরি সূর্যের সঙ্গে তার স্নেহহীন ব্যবহারে সূর্য তার প্রতি রুষ্ট হয়ে ওঠে। তাদের প্রাত্যহিক বচসা একদিন হাতাহাতিতে গড়ায় এবং সূর্য তাকে শাসায়-

> "বাবা মরে গেলে আমি তোমায় লেংটো করে বাড়ি থেকে তাড়াব, মনে রেখো।"[১৪]

শুধু বিজয়াই নয়, দূর সম্পর্কের মাসি মালা বা মালাদির সূর্যর প্রতি ইঙ্গিতপূর্ণ অশোভন আচরণও সূর্যকে মহিলাদের প্রতি বিতৃষ্ণ করে তোলে। সম্পর্কে মাসি হলেও মালা সূর্যর সঙ্গে ব্যবহারে সেই ব্যবধান রাখে না বরং তার সামনে বারবার তার পোশাক অসম্বৃত হয়-

> "প্রায় আধখানা আঁচল বুকের পাশ দিয়ে টেনে মালা ভিজে মুখের সিক্ত ভাবটা মুছতে মুছতে ড্রেসিং টেবিলের সামনে গেল।"[১৫]

কিংবা "মালা কাঁধের পাশ থেকে আঁচল সরিয়ে ফেলল"[১৬]

মালার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যবহার সূর্যর মনে প্রবল কামনার জন্ম দেয়। মালার উর্ধাঙ্গের পোশাক থেকে সেফটিপিন খুলে নেবার জন্য তার হাত কাঁপতে থাকে। মালার সংলাপেও আমরা সূর্যর প্রতি তার যৌনইঙ্গিতপূর্ণ ইশারা লক্ষ্য করি-

> "সে আমি একদিন ওকে টেস্ট করিয়ে দেব, পুরনো খাবার, ও কি আর একেবারে না খেয়েছে।"[১৭]

বা

> "আমাদের ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ে যে কিরকম সব মেয়ে আসে। এটা বলো, ওটা বলো, এটা শেখাও, ওটা শেখাও..."[১৮]

জয়ন্তীর অনুপস্থিতিতে পুজোর সময় মালা তাকে একসাথে বেরোনোর ও সময় কাটানোর প্রস্তাব দেয়। কিন্তু মালার প্রতি এই নিষিদ্ধ কামনা বিতৃষ্ণায় বদলে যায় যখন সূর্য, মালা ও জয়ন্তীর সমকামী সম্পর্কের আভাস পায়, মালার সিগারেট খাওয়ার অভ্যাসের কথা জানতে পারে। ছয়ের দশকের সাপেক্ষে সূর্যর মধ্যবিত্ত মূল্যবোধে মালা বা বিজয়ার মত নারীদের গ্রহণ না করতে পারার মধ্যে দিয়েই আমরা বুঝতে পারি সে বেপথু হয়েও এখনও তার সব সংস্কার বিসর্জন দিতে পারেনি। সূর্যের স্বপ্নদৃশ্যেও তাই সে মালাকে অপদস্থ করে।

বুললির দাদা চাকরিসূত্রে বর্ধমানে গিয়ে মৃদুলার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে এবং মৃদুলার গর্ভসঞ্চার হওয়ায় বুললির বাবা দারোগা গুহমশাই তাদের বিয়ে

দিতে বাধ্য হন। কিন্তু কোনোভাবে তার গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যু হলে বুললির মা সন্দেহ করেন মৃদুলা ইচ্ছাকৃত ভাবে গর্ভপাত করেছে। 'যদুবংশ' আলোচনার সময় আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন উপন্যাসটি যে সময়ের প্রেক্ষাপটে লেখা তখন বিধবা মেয়ের শৌখিনতা বা প্রাকবিবাহ যৌনতা কিংবা গর্ভপাত ইত্যাদি মধ্যবিত্তের কাছে গ্রহণযোগ্য প্রায় ছিলনা বললেই চলে। ফলে সমবয়সী বৌদির সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে বন্ধুত্ব থাকলেও দাদাবৌদির এই 'পদস্খলন' বুললির মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। বুললি নিজে কলেজে না পড়লেও উচ্চশিক্ষিত পরিবারের মেয়ে, বি.এ. পাশ বৌদি যখন দাদার অনুপস্থিতিতে বুললির সঙ্গে কথা বলার সময় ব্লাউজের বোতাম নিয়ে নাড়াচাড়া করে বা হাঁটু পর্যন্ত কাপড় সরিয়ে রাখে তখন তা চার বন্ধুর মধ্যে সবথেকে কম সংবেদনশীল বুললির চোখেও বিসদৃশ লাগে।

বনেদি বাড়ির ছেলে কৃপাময় দেখে তার বাবা সংসারের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করে মারা যাবার পর তার মা উন্মাদে পরিণত হয়। আজকের সফল কাকা বা পিসি কারুরই অভিভাবকত্ব ছাড়াই একা একা অযত্নে বড় হয় সে। এই বাড়িতে তার একমাত্র বন্ধু ছোটকাকি প্রতিমা, কিন্তু অর্থলোলুপ ছোটকাকা তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দেননা। কৃপাময় বুঝতে পারে তিনি বাইরে নারীসঙ্গ করেন, মদ খান, নিজে উকিল হয়েও বেনামি জমি কেনেন, ট্যাক্সি কিনে ভাড়া খাটান- যেভাবে হোক প্রচুর উপার্জন করাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। নিজেরই বাড়িতে আশ্রিতের মত বাস করে সে এবং ক্রমশ পরিবার থেকে মানসিক ভাবে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

অভয় চেষ্টা করেও চাকরি পায় না ফলে তার মায়ের সাথে তার তিক্ততা দিনদিন বেড়ে চলে। সাইকেল সারানোর জন্যও তাকে মায়ের কাছে হাত পাততে হয়, মাকে ডিঙিয়ে সে বাবার কাছেও পৌঁছতে পারে না ফলে তারও সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা বাড়তে থাকে। সূর্য ও বুললি অবাক হয়ে লক্ষ্য করে কিভাবে তাদের বাবাদের প্রতি মানুষের এত আক্রোশ ও ঘৃণা সত্ত্বেও তারা দিব্যি ক্ষমতা ভোগ করে চলেন।

সমালোচক মন্তব্য করেন, "একালের নায়ক নিজের বিপন্ন ব্যক্তিসত্তার বিষণ্ণ ধূসরতার দর্পণেই বিশ্বাবলোকন করে"[১৯]

ফলে যা কিছুই সাদা চোখে দেখেই অন্যায় বলে চেনা যায়, আজকের সমাজে তারই প্রতিষ্ঠা সূর্যদের সমাজের তথাকথিত নিয়মকানুনের প্রতি আস্থাহীন করে তোলে।

তারা কেউই পরিবারের থেকে সহানুভূতি না পেয়ে একসাথে মেস করে থাকার কথা ভাবে, বিষণ্ণ হয় ও বিষণ্ণতাকে চাপা দিতে আরও বেশি করে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে। তবু তাদের আপাত রুক্ষতার আড়ালে যে ভালো হবার, ভালোবাসা পাবার বাসনা আছে তাও আমরা বুঝতে পারি যখন সূর্য মালার নিষিদ্ধ আহ্বানে সাড়া দেয় না কিন্তু চারুবাবুর মেয়ে সুমির সঙ্গে নিজের পুরনো ছবি দেখে বয়ঃসন্ধির নিষ্পাপ প্রেমের স্মৃতিতে তার মন ভিজে যায়, 'চারুর' বদলে আনমনে 'চারুকাকা' সম্বোধন করে ফেলে। বুললি আভার প্রেমে পড়ে তার জন্য সোয়েটারের ডিজাইনের বই কেনে,

কৃপাময় তাদেরই বন্ধু অথচ ভিন্ন পথের পথিক তুলসীর উদারতার পরিচয় পেয়ে তার জন্য মমত্ব ও আনন্দ অনুভব করে। এই প্রসঙ্গেই আমরা উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র গণনাথের তাৎপর্য বিচার করতে পারি। উপন্যাসের নামকরণে মহাভারতের প্রসঙ্গ যখন পাঠকের মনে গণনাথের সঙ্গে কৃষ্ণের সাদৃশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন তৈরি করে, তখন লেখক স্বয়ং একটি সাক্ষাৎকারে জানান-

> “না, গণনাথ খুব রিয়েল চরিত্র। ওর মধ্যে কোন মিথ্ নেই।... কৃষ্ণের চিন্তাটা আমার মধ্যে ইদানিং এসেছে। ‘যদুবংশ’ যখন লিখি তখন এসব চিন্তা কিছু ছিল না।”[২০]

একসময়ে তাদের আদর্শ, পরোপকারী, সব কাজে নেতৃস্থানীয়, ভালোবাসা ও সম্মানের পাত্র গণাদা আজ মাঠকোটার বাড়িতে নয়না ও তার দুই বোনের সঙ্গে একলা থাকে। নয়নার অতীতের চারিত্রিক কলঙ্কের জন্যই তার গণনাথের অভিভাবকত্বের সুরক্ষার প্রয়োজন হয়, আবার রেলের চাকরি ছেড়ে স্বাধীন ব্যবসা করে উপার্জনের স্বপ্ন দেখে ব্যর্থ হওয়া গণাদাও মেসের রান্না থেকে জীর্ণ শরীরকে রেহাই দিতেই নয়নাদের সহবাসী হয়। সূর্যর পারিবারিক সম্পত্তি পঞ্চমুখী সোনার প্রদীপ সে গণনাথকে দেয় বিক্রির জন্য কিন্তু গণনাথ তার অভাবের মধ্যেও প্রদীপটি রক্ষা করার জন্য সূর্যকে টাকা দিয়ে চলে। এখানে প্রদীপটি হয়ে ওঠে এই প্রজন্মের চরম অবক্ষয়ের মধ্যে পুরনো ঐতিহ্যের, মহত্ত্বের একমাত্র প্রতীক। কিন্তু সেই প্রতীকটি যমুনা চুরি করলে গণনাথকে তারা চোর সাব্যস্ত করে। গণনাথের শেষ ভরসা ছিল তার অতীতের সুনাম ও সম্মান যা সেদিন সূর্যদের আক্রমণে ধূলিস্যাৎ হয়ে যায়। কিন্তু আমরা দেখি গণনাথের আফিম খেয়ে আত্মহত্যার খবরে চারবন্ধুই বিচলিত হয়। কৃপাময় কেঁদে ফেলে, একদিন গণাদার হাতে চড় খেয়েও আজ অভয় মৃত্যু সংবাদ দিতে এসে বিহ্বল হয়ে যায়, সূর্য আপ্রাণ চেষ্টা করে স্বাভাবিক থাকার কিন্তু সেও অবচেতনে স্বীকার করে তাদের অপমানেই গণাদা আত্মহত্যা করেছে। সুতরাং গণাদা চোর নয়।

গণনাথের মৃত্যু যেন তাদের আত্মাকে জাগিয়ে দিয়ে যায়। তুলসীর মহত্ত্ব তারা সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছে কিন্তু একসময়ের আদর্শস্থানীয় গণাদার এহেন অবনতি কল্পনা করে তারা বর্তমান যুগের প্রতি পুরোপুরি বিমুখ, আশাহীন হয়ে উঠেছিল। আজ যখন তারা মৃত্যুর পরে সেই পুরনো গণনাথকে আবিষ্কার করল তখন অনুশোচনায় প্রথমে কৃপাময়, তারপর অভয়, বুললি ও শেষে সূর্যও তার শবদেহে কাঁধ দিল। গণনাথ তার মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে যেন তাদের আশ্বস্ত করে গেল এখনো সব আশা ফুরিয়ে যায়নি। ফলে উপন্যাসের শেষে বিমল কর গণনাথের মৃত্যু দেখালেও, আমরা অনুমান করতে পারি এই মৃত্যু সূর্যদের এক ইতিবাচকতার আশ্বাসই দিয়ে গেল, তৈরি হল তাদের সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসবার সম্ভাবনা।

তথ্যসূত্র:

১। কর বিমল, এপ্রিল ১৯৯৮, ‘উড়ো খই’ (২য় খন্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পৃঃ ১৩৪

২। তদেব পৃ: ১৩৬

৩। বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ, জুলাই ২০১৯, ‘বাংলা উপন্যাসের কালান্তর’, অষ্টম সংস্করণ, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং,পৃঃ ৩২৭

৪। কর বিমল, ১৯৬৮, ‘যদুবংশ’, কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ,পৃঃ ৫

৫। তদেব পৃ:৩

৬। তদেব পৃ:৮৪

৭। তদেব পৃ:১০৮

৮। তদেব পৃ:১৪১

৯। ঐ

১০। তদেব পৃ:১৩৮

১১। তদেব পৃ:১১

১২। বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ,প্রাগুক্ত গ্রন্থ,পৃঃ ৩৩২

১৩। ঐ

১৪। কর বিমল, ১৯৬৮,‘যদুবংশ’, কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পৃঃ ১২৮

১৫। তদেব পৃ:৬৪

১৬। তদেব পৃ:৬৮

১৭। তদেব পৃ:৬৭

১৮। তদেব পৃ:৭০

১৯। বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩২৭

২০। দাস সুর সুমনা,জানুয়ারি ২০০৯, ‘বিমল করের কথা সাহিত্য’, কলকাতা, এবং মুশায়েরা, পৃঃ ৩৮০-৩৮১

ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে গৌতম বুদ্ধের আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ : একটি পর্যালোচনা

জয়ন্ত বায়েন
স্টেট এডেড কলেজ টিচার (বিভাগ-১), দর্শন বিভাগ,
রামপুরহাট কলেজ, বীরভূম

সারসংক্ষেপ : মহামানব গৌতম বুদ্ধের একঅভূতপূর্ব আবিষ্কার হলো ‘দুঃখ নিরোধের মার্গ’ বা ‘আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ’। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ হচ্ছে ইহজাগতিক দুঃখ নিবৃত্তির পথ। অষ্ট অঙ্গ সমন্বিত বলে এটিকে অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলা হয়।এটি ব্যক্তির চারিত্রিক উন্নয়ন ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের সাথে সাথে আর্থিক কল্যাণ ও পারস্পরিক সামাজিক সুসম্পর্ক গঠনে ভূমিকা রাখে। অষ্টাঙ্গিক মার্গের অঙ্গগুলি হচ্ছে নৈতিক জীবন ও আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের উপায়। অষ্টাঙ্গিকমার্গের অঙ্গগুলি অনুশীলন করলে সাংসারিক জীবন সৎ, সুন্দর ও মনোময় হয় এবং সকল প্রকার দুঃখের অবসান ঘটিয়ে নির্বাণের পথ প্রশস্ত হয়। এই প্রবন্ধের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, কিভাবে অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুশীলনের ফলে ব্যক্তি নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও শান্তিপূর্ণ জীবন গঠন করতে পারে এবং সমাজের বিভিন্ন ধরনের ব্যাধি যথা- চুরি, হত্যা,মাদকতা,কটু, অবৈধ কামাচার ইত্যাদির মত ভয়ংকর ব্যাধির হাত থেকে সমাজ রক্ষা পেতে পারে।

মূল শব্দ : গৌতম বুদ্ধ, অষ্টাঙ্গিক মার্গ, ব্যক্তি, সমাজ, নৈতিকতা, প্রজ্ঞা, শীল, সমাধি।

মূলআলোচনা :

যশস্বী গৌতমবুদ্ধ ছিলেন মুখ্যত জীবন-নীতি নির্ধারক,ধর্ম প্রবক্তা এবং সংস্কারক। বুদ্ধদেব মানুষের জীবনের দুঃখ ও দুঃখ নিবৃত্তির উপায় নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তিত ছিলেন। দুঃখ দুর্দশা উত্তরণের পথ নির্দেশই তাঁর প্রধান অবদান। তত্ত্বালোচনায় তিনি আগ্রহী ছিলেন না। জগতের প্রতি বুদ্ধদেবের এক বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। সমগ্র মানবজাতির দুঃখ মুক্তির দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে গণ্য করে তিনি জীবনের সমস্যাবলীর সমাধান করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

মহামানব গৌতম বুদ্ধ গভীর সাধনার মধ্য দিয়ে যে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভ করেন তা বৌদ্ধ দর্শনে 'চত্বারি আর্য সত্যানি' বা 'আর্যসত্য চতুষ্টয়' নামে পরিচিত। আর্য সত্যের শব্দগত অর্থ হলো 'শ্রেষ্ঠ সত্য'। আর্যসত্য চতুষ্টয়কে বৌদ্ধ দর্শনের উপক্রমণিকা বলা হয়। আর্যসত্য চতুষ্টয় বুদ্ধের বৌদ্ধ দর্শনের মূল চাবিকাঠি, মানুষকে চারটি সত্য সম্বন্ধে অবহিতকরণ করাই হলো বুদ্ধের মহান শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। আর্যসত্য

চতুষ্টয় গুলি হলো যথা-দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ সমুদয় আর্য সত্য, দুঃখ-নিরোধ আর্য সত্য এবং দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্য। নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো-

দুঃখ আর্যসত্য: অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিকদের ন্যায় বুদ্ধদেবও দুঃখকে চরম বাস্তব সত্য বলে মনে করতেন। বুদ্ধের মতে, জীবন ও জগত সংসার দুঃখময়।'সর্বম দুঃখ'। সবই দুঃখময়। জন্ম দুঃখ, জড়া দুঃখ, মরণ দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, প্রিয় বিচ্ছেদ দুঃখ, যা কিছু আসক্তি থেকে জাত তাই দুঃখ। এই জগত সংসার নিরবচ্ছিন্ন দুঃখে পূর্ণ । এ জগতে অবিমিশ্র সুখ বলে কিছুই নেই, সুখ সর্বদা দুঃখ মিশ্রিত।

দুঃখ সমুদয়আর্যসত্য: 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' বা কার্যকারণ সম্পর্কের ভিত্তির উপরই বুদ্ধদেবের দ্বিতীয় আর্যসত্যটি প্রতিষ্ঠিত। 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' নিয়ম অনুসারে এই জগতে বিনা কারণে কিছু ঘটে না, প্রত্যেক ঘটনা বা কার্য তার পূর্ববর্তী কারণ নির্ভর। সুতরাং দুঃখও বিনা কারণে ঘটে না। দুঃখেরও কারণ আছে। এই দুঃখের কারণ কি এ বিষয়ে বুদ্ধদেব যা উত্তর দিয়েছেন তা দ্বিতীয় আর্য সত্য বা 'সমুদয়' নামে পরিচিত। বুদ্ধদেব দুঃখের মূল কারণ হিসেবে অবিদ্যাকে উল্লেখ করেছেন। তিনি দুঃখের উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে একটি কারণ শৃঙ্খলের উল্লেখ করেন, যা পরস্পর কার্য-কারণ সম্বন্ধে যুক্ত। এই কার্যকারণ শৃঙ্খল হল,যথা-অবিদ্যা-সংস্কার-বিজ্ঞান- নামরূপ-ষড়ায়তন-স্পর্শ-বেদনা- তৃষ্ণা-উপাদান-ভব-জাতি-জরামরণ। দুঃখের এই কার্যকারণ শৃঙ্খলে মোট দ্বাদশটি নিদান আছে, তাই একে দ্বাদশ নিদান বলা হয়। এই দ্বাদশ নিদানের ক্রিয়ার জন্যই মানুষ জন্ম-জন্মান্তর প্রবাহে আবর্তিত হয়। তাই এই কারণ-শৃঙ্খলকে ভবচক্রও বলা হয়।

দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য: দুঃখের উৎপত্তি রোধ ও দুঃখের বিনাশ সাধনই দুঃখ নিরোধ। এ সত্যটি দ্বিতীয় আর্যসত্য থেকে নিঃসৃত। দুঃখের যেসব কারণ রয়েছে সেগুলিকে রোধ করতে পারলেই দুঃখ নিরোধ সম্ভব।সুতরাং তৃষ্ণা,অবিদ্যাকারণগুলিকে নিঃশেষে বর্জন করে, দুঃখের মূলোৎপাটন করাই হলো দুঃখ নিরোধ এবং একেই বলে নির্বাণ। ভোগ স্পৃহা দূর হলে, যখন আর বিষয়ের প্রতি আসক্তি থাকে না, তখন মানুষের পুনঃজন্ম গ্রহণের সম্ভাবনাও আর থাকে না।তখন মানুষ এই সংসার থেকে মুক্ত হয়ে জরা- মরণের অধীনে আর ঘূর্ণয়মান হয় না[১]।

দুঃখ নিরোধ মার্গ আর্য সত্য: চার্বাক ভিন্ন সকল ভারতীয় দর্শনে অবিদ্যা বা মিথ্যা জ্ঞানকে জীবের সর্ব দুঃখের মূল কারণ হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে। দুঃখের যেমন কারণ আছে,তেমনি তার নিবৃত্তিও আছে। কি উপায় অবলম্বন করে আমরা দুঃখ নিরোধ করতে পারি তা ভগবান বুদ্ধদেব চতুর্থ আর্যসত্যে বলেছেন। এই চতুর্থ আর্যসত্যকে বৌদ্ধ নীতিদর্শনের মূল ভিত্তি বলা হয়। বৌদ্ধ মতে, দুঃখের কারণ অপসারণ করার পথই হচ্ছে দুঃখ নিবৃত্তির উপায়। দুঃখ নিবৃত্তির উপায় হলো অষ্টাঙ্গিক মার্গ।

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের পরিচয়: বুদ্ধের অষ্টাঙ্গিক মার্গ হলো জাগতিক দুঃখ নিবৃত্তির উপায় বা পথ। যে পথ অনুসরণ করে দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। বুদ্ধদেব স্বয়ং এই পথ অবলম্বন করে নির্বাণ বা দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করেছিলেন। বৌদ্ধ দর্শনে এই পথকে অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অষ্টঅঙ্গ সমন্বিত বলে একে অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলা হয়। এই মার্গকে বৌদ্ধ দর্শনে 'মধ্যপন্থা' বা মধ্যম পথ বলা হয়েছে। কেননা, এই পথ একদিকে ভোগবিলাস ও অন্যদিকে শারীরিক কৃচ্ছ্রতাসাধন- এই দুটি চরম পন্থার মধ্যবর্তী। এই পথই হলো সাধনার উৎকৃষ্ট ও সহজতর পথ। অসংযত ইন্দ্রিয় ভোগের পথ হল নিম্নতর,অসম্মানজনক, আধ্যাত্মিকতা বর্জিত; তেমনি আবার অনাবশ্যক শারীরিক কৃচ্ছ্রতাসাধনের পথ হলো দুঃখ যুক্ত, অনর্থ-সংযুক্ত ও অবাস্তব। এজন্য ভগবান বুদ্ধ দুঃখ নিবৃত্তির জন্য চরমপন্থা বর্জন করে মধ্যমপন্থা অনুসরণের উপদেশ দিয়েছেন। এই মধ্যমপন্থায় যেমন অসংযত ইন্দ্রিয় সম্ভোব নেই তেমনি অনাবশ্যকভাবে কৃচ্ছ্রসাধনও নেই। এই মার্গ সাধনার সহজ পথ, যা সকল মানুষ অনুসরণ করতে পারে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে উপেক্ষা না করে সাধারণ মানুষ কিভাবে জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়ে ধীরে ধীরে নির্বাণের পথে অগ্রসর হতে পারে অষ্টাঙ্গিক মার্গে তার একটি সুপষ্ট দিক নির্দেশিত হয়েছে।

অষ্টাঙ্গিক মার্গের অষ্ট অঙ্গ সমূহ: ভগবান বুদ্ধের এক অভূতপূর্ব আবিষ্কার হলো অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গই হল বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্রের মূল ভিত্তিভূমি। বস্তুতঃ এই অষ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্যেই বৌদ্ধ-নীতি তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অঙ্গ গুলি হল,যথা- সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি। নিম্নে অষ্টাঙ্গিক মার্গ গুলি আলোচিত হলো-

সম্যক দৃষ্টি (Right view): 'সম্যক দৃষ্টি' শব্দের অর্থ 'যথার্থ জ্ঞান'। আর্যসত্য চতুষ্টয় এবং জীব ও জগত সম্পর্কে অবিদ্যা দুঃখের মূল কারণ। অবিদ্যা বা মিথ্যা জ্ঞানের জন্য জীব আর্যসত্য চতুষ্টয় এবং আত্মা ও অনাত্মার সম্পর্কে প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না। বৌদ্ধমতে, এই অবিদ্যা দূরীভূত হয় সম্যক দৃষ্টি বা যথার্থ দৃষ্টির সাহায্যে। অবিদ্যা দূর হলে দুঃখেরও বিনাশ ঘটে। চারটি আর্যসত্যের যথার্থ উপলব্ধিই হলো 'সম্যক দৃষ্টি', যা জীবকে নির্বাণের পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করে।

সম্যক সংকল্প (Right thought): সম্যক দৃষ্টি সম্যক সংকল্পের জনক। বৈরাগ্য, বিশ্বপ্রেম যথার্থ মানবতার সংকল্পই 'সম্যক সংকল্প'। সম্যক দৃষ্টি অনুসারে সকলের প্রতি ভালোবাসা, কারুর সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব না রাখা, কারুর ক্ষতি করা থেকে বিরত হবার সংকল্প করতে হয়। অন্যথা, নির্বাণ প্রার্থীর পক্ষে সম্যক বৃষ্টি ব্যর্থ হয়ে পড়ে। এক কথায়, নৈষ্কাম্য, অবিদ্বেষ ও অহিংসার সংকল্পই সম্যক সংকল্প[২]।

সম্যকবাক (Right speech): 'সম্যক বাক'কথাটির অর্থ হল 'যথার্থ ভাষণ'। সম্যক সংকল্প কর্মে রূপায়িত করার জন্য প্রথমেই দরকার বাক সংযমের। বাক সংযম

না হলে নৈতিক উন্নতি সম্ভব হয় না। আমাদের উচিত সর্বদা সত্য বাক্য বলা। সত্য কথা বলা, মিথ্যা কথা, পর নিন্দা, কর্কশ বাক্য পরিত্যাগ করাই 'সম্যক বাক'। সংযত বাক্যের মাধ্যমে অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

সম্যক কর্মান্ত (Right action): শুধুমাত্র বাক সংযমের মাধ্যমে সম্যক সংকল্প সার্থক হয়ে ওঠে না, তার জন্য সম্যক কর্মান্ত অর্থাৎ যথার্থ আচরণ বা সদাচারের প্রয়োজন হয়। মুক্তিকামী ব্যক্তির কর্মেও সম্যক সংকল্প প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। প্রাণী হত্যা, চৌর্যবৃত্তি, অবৈধ ইন্দ্রিয় সম্ভোগ থেকে বিরত হওয়াই হলো 'সম্যক কর্মান্ত'। যে ব্যক্তি নির্বাণ লাভ করতে ইচ্ছুক তাঁকে অহিংসা, অস্তেয় ও ব্রহ্মচর্য- এই তিনটি কর্মব্রত করা আবশ্যক।

সম্যক আজীব (Right livelihood) : ব্যবহারিক জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য যা কিছু দরকার সেগুলো সৎ পথে উপার্জিত হতে হবে। অসৎ উপায়ে অর্জন করা বস্তু দিয়ে জীবনধারণ করা অনুচিত। মিথ্যা কথা ও অসদাচার থেকে বিরত হয়ে সৎ ভাবে জীবিকা নির্বাহ করাই নৈতিক কর্তব্য। প্রবঞ্চনা,কপটতা, চুরি,ডাকাতি প্রভৃতি অসৎ উপায়ে পরিত্যাগ করে সদুপায়ে জীবিকা নির্বাহ করাই হলো 'সম্যক আজীব'। জীবিকা হিসাবে এমন কিছু নির্বাচন করা উচিত যা সমাজের হিতার্থে হয়, নির্বাণ লাভে সহায়ক হয়। শঠতা, প্রবঞ্চনা, মাদকদ্রব্য বিক্রয়,অস্ত্রাদি বিক্রয়, চুরি ইত্যাদি জীবিকা নির্বাহ নির্বাণ লাভে সহায়ক নয়। এজন্য নির্বাণ লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে এইসব অসৎ উপায় বর্জন করা আবশ্যক।

সম্যক ব্যায়াম (Right effort): 'ব্যায়াম' শব্দের অর্থ 'শ্রম' বা 'চেষ্টা'। সম্যক ব্যায়ামে মানুষের মনকে শুদ্ধ ও পবিত্র রাখার জন্য সদা সতত সজাগ থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মন থেকে যাবতীয় অসৎ চিন্তা দূর করে সৎ চিন্তা পোষণের দ্বারা নৈতিক উন্নতির রক্ষা করা একান্ত কর্তব্য। এছাড়া সৎ চিন্তার দ্বারা মনকে সর্বদা পূর্ণ রাখা এবং সৎ চিন্তাকে মনের মধ্যে সর্বদা ধারণ করাই হলো সম্যক ব্যায়াম বা সম্যক প্রচেষ্টা। মূলত যেসব সৎ চিন্তার উদয় হয়নি যেন মনের মধ্যে উদিত হতে পারে এবং যে সব চিন্তা মনের মধ্যে যাতে স্থায়ী হতে পারে তার জন্য নিরন্তর চেষ্টার নামই সম্যক ব্যায়াম[৩]।

সম্যক স্মৃতি (Right mindfulness): সম্যক স্মৃতি শব্দের অর্থ হলো 'যথার্থ স্মরণ'। প্রতি মুহূর্তে কায় ও মনে যে সকল অবস্থা উৎপন্ন হয়, অতি সজাগ দৃষ্টিতে সন্তর্পণে সেগুলোকে মনে মনে পর্যবেক্ষণ করাই সম্যক স্মৃতি। এটা পর্যবেক্ষণের দ্বারাই যোগী জানতে পারেন উৎপন্ন ধর্মসমূহের মধ্যে কুশল, অকুশল, দোষযুক্ত, নির্দোষ, ভালো-মন্দ, হিতকর ও অহিতকর কর্ম সম্পর্কে। ঐ স্মৃতিবান ব্যক্তিগণই সেবনীয় ধর্ম সেবন করেন,গ্রহণীয় ধর্ম গ্রহণ করেন, অসেবনীয় ধর্ম পরিহার করেন, অগ্রহণীয় ধর্ম গ্রহণ করেন না[৪]। বুদ্ধ উপদিষ্ট নিরন্তর স্মৃতির বিষয় হলো-১)ভ্রমণ, উপবেশন, শয়ন, অশন, বাককথন প্রভৃতি শারীরিক ব্যাপার, ২)সুখ-দুঃখমূলক সকল অবস্থা, ৩) রাগ,

দ্বেষ, মোহ প্রভৃতি চিত্তবিষয়ক অবস্থা, ৪)পঞ্চীকরণ: ক) কাম,দেহ- মনের জড়তা,ঔদ্ধত্য, কুকর্ম পরায়ণতা, বিচিকিৎসা (আলস্য গোপনের আবরণ),খ) পঞ্চস্কন্ধ- রুপ,বেদনা,সংজ্ঞা, সংস্কার,বিজ্ঞান, গ) ছয়টি আয়তন- চক্ষু,শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বাকায়,মন, ঘ) বোধির ছটি অঙ্গ-স্মৃতি ধর্ম,অনুসন্ধান,বীর্য,প্রীতি,প্রশান্তি,সমাধি, ঙ) আর্যসত্য চতুষ্টয়[৫]।

সম্যক সমাধি (Right concentration) : 'সম্যকসমাধি' শব্দের অর্থ 'যথার্থ ধ্যান'। বুদ্ধ নির্দেশিত এটি অষ্টাঙ্গিক মার্গের সর্বশেষ স্তর। অষ্টাঙ্গিক মার্গের প্রথম সাতটি মার্গ সমাধির সহায়ক। এজন্য তাদের 'সপ্ত- সমাধি-পরিষ্কার' বলা হয়। যিনি প্রথম সাতটি কর্মবিধি অনুসরণ করে সব রকম কুচিন্তা ও কুভাবনা থেকে মনকে মুক্ত করতে পেরেছেন, নিজের আচরণকে সংযত করে ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করতে পেরেছেন,তিনিই সমাধির মাধ্যমে নির্বাণ লাভের অধিকারী। সমাধির প্রধান স্তর চারটি। প্রথম স্তরে, নির্বাণার্থী সত্য সম্বন্ধে বিচার- বিতর্কের মাধ্যমে এক সুখকর ও আনন্দময় অবস্থান করেন। দ্বিতীয় স্তরে, নির্বাণার্থীর চিত্ত বিচার বিতর্ককে অতিক্রম করে আর্যসত্য চতুষ্টয়ে পূর্ণবিশ্বাস স্থাপন করে। তৃতীয় স্তরে,নির্বাণার্থীর আনন্দের বোধকে অতিক্রম করেন। এর ফলে তার মধ্যে বস্তু বিষয়ে এক উপেক্ষাভাব ও দৈহিক স্বস্তিভাব সঞ্চারিত হয়। চতুর্থ স্তরে, সমাধি গভীরতর হয় এবং সর্বপ্রকার অনুভূতি বিলুপ্ত হয়ে নির্বাণার্থী এক প্রকার নির্লিপ্ত ও উদাসীন অবস্থা প্রাপ্ত হন। এমনকি এই স্তরে পূর্বস্তরের স্বস্তিবোধও অন্তর্হিত হয়। এই অবস্থাতেই সাধক নির্বাণ লাভ করেন[৬]।

অষ্টাঙ্গিক মার্গের বিভাগ: যশস্বী গৌতম বুদ্ধ যে অষ্টাঙ্গিক মার্গের উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্রের স্বরূপ পরিলক্ষিত হয়। অষ্টাঙ্গিক মার্গ তিনটি স্কন্ধে বিভক্ত, যথা- প্রথম স্কন্ধ হল -প্রজ্ঞা, দ্বিতীয় স্কন্ধ হলো- শীল এবং তৃতীয় স্কন্ধ হল সমাধি।

প্রথমস্কন্ধ-প্রজ্ঞা:-'প্রজ্ঞা' শব্দটির অর্থ হল ‘বৌদ্ধিক ব্যাপার সমূহের সংযম’। চারটি আর্যসত্য সম্বন্ধে সমস্ত রকমের সন্দেহ মুক্ত জ্ঞান হল প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা অবিদ্যাকে বিনাশ করে এবং অবিদ্যা থেকে উৎপন্ন ভ্রান্তি ও মিথ্যা চিন্তার ধ্বংস করে। প্রজ্ঞা দ্বিবিধ যথা - সম্যক দৃষ্টি এবং সম্যক সংকল্প। দুঃখ বিষয়ক জ্ঞান, দুঃখ সমুদয় বিষয়ক জ্ঞান,দুঃখের নিবৃত্তি বিষয়ক জ্ঞান ও দুঃখের নিরোধ করার উপায় বিষয়ক জ্ঞানইহলো সম্যক দৃষ্টি। আর সম্যক সংকল্প শব্দের অর্থ যথার্থ মানসিক দৃঢ়তা। কোনো আর্যসত্য সমন্ধে যথার্থ বোধ হলেই চলে না, ঐ সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের জীবন গঠন করাও কর্তব্য। তাই প্রয়োজন জাগতিক বস্তুর প্রতি আসক্তি বর্জন করা, অন্য ব্যক্তির প্রতি খারাপ মনোভাবাপন্ন না হওয়া এবং সমস্ত খারাপ আচরণ থেকে বিরত থাকা এগুলিরই সম্যক সংকল্প[৭]।সম্যক সংকল্প ত্রিবিধ যথা-নৈষ্কাম্য সংকল্প ,অব্যাপাদ সংকল্প এবং অবিহিংসা সংকল্প। বিষয় ভোগ-বাসনা পরিত্যাগ করে বৈরাগ্যের মার্গ অনুসরণে যে সংকল্প তা হল নৈষ্কাম্য সংকল্প। চিত্তের অকুশল ভাব ত্যাগ করে কুশল চিন্তায়

মনোসংযোগ করাই হলো অব্যাপাদ সংকল্প। সর্ব প্রকার হিংসা ভাব ত্যাগ করে সকল জীবের প্রতি মৈত্রী ও করুণা প্রদর্শন করাই হলো অবিহিংসা সংকল্প।

বুদ্ধ বলিয়াছেন," যেমন মেঘ বায়ুর দ্বারা উদ্ধত রজকেপ্রশাংত করে, তেমন সংকল্প সমূহ, যখন প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করে, শাংত হয়। 'সর্ব সংসকারসমূহ অনিত্য'-ইহা যখন প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করে, তখন দুঃখে নির্বিন্ন হয়; ইহা বিশুদ্ধির মার্গ। 'সর্ব সংস্কার সমূহ দুঃখ'- 'সর্ব ধর্মসমূহ অনাত্মা'-ইহা যখন প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করে, তখন দুঃখে নির্বিন্ন হয়; ইহা বিশুদ্ধির মার্গ[৮]।

দ্বিতীয়স্কন্ধ-শীল:শীলহলোনীতি-নৈতিকতা, সদাচার, শিষ্টাচার, নীতিপরায়ণতা, চারিত্রিক আদর্শ, বিনয়, নম্রতা,ভদ্রতা প্রভৃতি। শীল হলো চরিত্র বিশুদ্ধির উত্তম নীতি সমূহ। তত্ত্বে ও ধর্ম দর্শনে আদি কল্যাণকারী শীল এবং অপ্রকাশকারীও বটে। গৌতম বুদ্ধ শ্রামন, ভিক্ষু ও গৃহী জনগণের চরিত্র বিশুদ্ধের জন্য যে সমস্ত নিয়ম বিধিবদ্ধ করেছেন সেগুলো 'শীল' নামে অভিহিত[৯]। শীল পালনের মধ্য দিয়েই মানুষের নৈতিক চরিত্র অত্যন্ত দৃঢ় হয়। এরূপ দৃঢ় চরিত্রের মাধ্যমেই মানুষের চিত্ত শুদ্ধ হয় ও এর ফলে মানুষ সমাধির পথে এগিয়ে যেতে সমর্থ্ হয় এবং নির্বাণ লাভে ধন্য হয়। শীলই মানুষের মধ্যে নির্মল সুখের সোপান রচনা করে এবং নির্বাণ লাভে সহায়ক হয়। তাই শীলকে বৌদ্ধ ধর্মের মূল ভিত্তি রূপে স্বীকার করা হয়।

পঞ্চশীল বা গৃহীশীল: বৌদ্ধ দর্শনে বিভিন্ন প্রকার শীল স্বীকার করা হয়েছে মানুষের চরিত্র ভেদে। তবে বহু সংখ্যক শীলের উল্লেখ থাকলেও শ্রামণ বা ভিক্ষুর জন্য যেসব শীল পালনের উপদেশ দেওয়া হয়েছে তা গৃহস্থ সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে সেগুলি আবশ্যক নয়। বুদ্ধদেব সাধারণ গৃহীদের জন্য পাঁচটি শীলের উল্লেখ করেছেন। এই পাঁচটি শীলই বৌদ্ধ দর্শনে 'পঞ্চশীল' নামে পরিচিত। এই সমস্ত শীলগুলি সাধারণ গৃহীদের পক্ষে পালনীয় বলে এগুলিকে গৃহীশীলও বলা হয়। এই পাঁচটি শীলকে নিম্নে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো-

প্রথমশীল: প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকা: বুদ্ধ মতে, সর্বপ্রকার প্রাণীহতা থেকে দূরে থাকতে হবে। প্রাণী যত ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হোক না কেন তা হত্যা করা অনৈতিক। এতে মানুষের হিংসায়ই প্রশ্রয় পায়। আর হিংসার দ্বারা কখনো সমাজের কল্যাণ হয় না। এমনকি হিংসা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধক রূপে গণ্য। অহিংসাই হলো বৌদ্ধ ধর্মের মূল মন্ত্র।

দ্বিতীয়শীল: চৌর্যবৃত্তি থেকে বিরত থাকা:বৌদ্ধ ধর্মে চৌর্যবৃত্তিকে অত্যন্ত নিন্দনীয় ও পাপকর্ম রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। বৌদ্ধমতে, নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য চৌর্যবৃত্তি থেকে বিরত থাকতে হবে। যে বস্তু অপরের দ্রব্য জ্ঞাত, তাহা যাহাই হউক এবং যেকোন স্থানেই হউক,উহা অদত্ত হইলে শ্রাবক উহা পরিবর্তন করিবেন, তিনি অপরকে চৌর্যে প্রবৃত্ত করবেন না। চৌর্যের অনুমোদন করিবেন না। সর্বপ্রকার অদত্ত বস্তু তাহার বর্জনীয় হইবে[১০]।

তৃতীয়শীল:অবৈধ কামাচার থেকে বিরত থাকা: গৌতম বুদ্ধ অবৈধ কামাচার হতে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। বৌদ্ধমতে, কামকে হতে হবে সংযত, সংযত কামই মানুষকে চরিত্রবান করে তোলে। চরিত্রবান ব্যক্তিই প্রশংসার পাত্র। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত নিজেকে চরিত্রবান করে তোলা, চরিত্রহীন নয়। একজন গৃহস্তকে নিজ স্ত্রীকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। সংযত কামই মানুষকে মোক্ষের পথে চালিত করে।

চতুর্থশীল: মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকা: বৌদ্ধমতে, প্রত্যেক মানুষের মিথ্যা কথন পরিহার করা আবশ্যক। প্রত্যেকটি মানুষ নিজেও যেমন মিথ্যা কথা বলবে না,তেমনি অপর কোন ব্যক্তিকেও মিথ্যা বাক্য বলতে উৎসাহিত করবে না। সর্বত্র মিথ্যা কথন পরিত্যাজ্য।প্রত্যেক গৃহস্থকে এই শীলটিকে থেকে সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে।

পঞ্চমশীল: মাদকদ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকা: এই শীলের মাধ্যমে গৌতম বুদ্ধ সুরা, মদ প্রভৃতি নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করা থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিয়েছেন। নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবনের ফলে ব্যক্তি তার স্বাভাবিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, যার ফলে ব্যক্তির পক্ষে নৈতিকতা সম্পন্ন কাজ করা সম্ভব হয় না। তাই মানুষের উচিত নিজেকে নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন করা থেকে বিরত রাখা এবং অপর ব্যক্তিকেও মাদকদ্রব্য সেবন করা থেকে বিরত রাখা।

তৃতীয় স্কন্ধ- সমাধি: 'সমাধি' শব্দটির অর্থ হল 'ধ্যানমগ্নতা', যা চিত্তকে সংযত ও নির্বাণমুখী করে তোলে। শীলের দ্বারা আমাদের বহিরিন্দ্রিয়গুলি সংযত হয়। কিন্তু সামগ্রিক সংযমের জন্য কেবল বাহ্যইন্দ্রিয়ের সংযত করলেই হয় না, অন্তরিন্দ্রিয় গুলিকেও সংযত করা প্রয়োজন। চিত্তের সংযমের জন্য যে সমস্ত আচরণ উপদেষ্টা হয়েছে তাদেরই 'সমাধি' বলে[১১]। বৌদ্ধমতে, সমাধি ত্রিবিধ,যথা-সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, এবং সম্যক সমাধি। মন থেকে সব কুচিন্তা প্রকৃষ্টরূপে বিদূরিত করার সচেতনতাই হলো সম্যক ব্যায়াম। দৈহিক ও মানসিক সকল প্রকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষণ করে স্মরণ রাখাকে বৌদ্ধ পরিভাষায় 'স্মৃতি' বলে। এবং চিত্তের একাগ্রতাই হলো সম্যক সমাধি। এই সম্যক সমাধির মধ্যে ব্রহ্মবিহার ভাবনা নিহিত।

ব্রহ্মবিহার ভাবনা:'ব্রহ্মবিহার' ভাবনার অর্থ হচ্ছে ব্রহ্মে বিহারের বা ভ্রমণের ভাবনা। লোভ, দ্বেষ,মোহ,ঈর্ষা প্রভূতি ঘৃণ্যতম চিত্তবৃত্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে গৌতম বুদ্ধ চারটি মহৎ গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন, যথা -মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এবং উপেক্ষা। এই চারটিকে একত্রে 'বহ্মবিহার' বলা হয়।

মৈত্রী: মৈত্রীর সমার্থক শব্দ হলো শুভেচ্ছা, হিতাকাঙ্খা, সৌহার্দ্য, পরোপকারিতা ইত্যাদি। মৈত্রী হলো মিত্রতা বন্ধুত্ব,যেখানে প্রেম বা ভালোবাসার স্পর্শ থাকে, নির্মল প্রেম থাকে। মৈত্রীর মাধ্যমে হিংসা-বিদ্বেষ প্রভৃতিকে জয় করা যায়। সর্বদা জীবের কল্যাণ কামনা করাই হলো মৈত্রী। মৈত্রী জাতি-ধর্ম- বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য সম্প্রীতি ও সদ্ভাব সম্প্রসারণে এক অভিনব ভূমিকা রাখে।

করুণা: অপরের দুঃখ দেখে মনে দুঃখ উৎপন্ন হয় এবং দুঃখ মোচনের অভিপ্রায় জাগ্রত হয়, যাকে করুণা বলা হয়। অন্য কথায়, পীড়িত সন্তানের প্রতি মাতার যেরুপ স্নেহ,প্রেম, মায়া সেরুপ জগতের সর্ব প্রাণীর প্রতি দয়া,কৃপা ও সহানুভূতিবশত চিরশাশ্বত অনুকম্পা প্রদর্শন করাই হলো করুণা।

মুদিতা: মুদিতা মানে আনন্দিত হওয়া, তুষ্ট হওয়া। মুদিতা প্রফুল্লতারই বহিঃপ্রকাশ। অপরের সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি, আনন্দ-প্রশংসা,যশ-ঐশ্বর্য ইত্যাদিতেপ্রতিবোধ উৎপন্ন করার নাম হলো 'মুদিতা'। অপরের সুখ-সৌভাগ্যের আন্তরিকতা অনুমোদনই মুদিতার অন্যতম লক্ষণ। এ মুদিতা শুধু সহানুভূতি নয়,এটাকে প্রশংসাসূচক আনন্দ বলা হয়। মুদিতার দ্বারা মনের আবিলতা তিরোহিত হয়, ব্যক্তি বিশেষ থেকে শুরু করে প্রাণীজগতের কল্যাণ কামনায় মুদিতার প্রয়োগিক ব্যবহার অত্যাবশ্যক[১২]।

উপেক্ষা:'উপেক্ষা'-এর একার্থবোধক শব্দ গুলি হলো- সাম্য এবং সমচিত্ততা, ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার করা, নিরপেক্ষভাবে দেখা প্রভৃতি। 'উপেক্ষা' বলতে বোঝায় নিজের সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে মানব সমাজের মঙ্গল চিন্তা। নিরপেক্ষভাব বা নিরপেক্ষতা উপেক্ষার প্রধান লক্ষণ। এ নিরপেক্ষতা হল আপন সাধনা ও চর্চার কারণে অর্জিত এক স্বভাব বৈশিষ্ট্য, যা চিত্তকে পরহিতে কর্মে স্থিত রাখে। নিন্দা-প্রশংসা, লাভ-ক্ষতি, যশ-অযশ, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি কোন বিষয়ে আকর্ষণ ও চঞ্চলতা হেতু চিত্তকে বিচলিত করতে পারে না।
বুদ্ধ আবারবলিয়াছেন, “মৈত্রী ভাবনা করিলে ব্যাপাদ(=দ্বেষ) ছুটিয়া যায়, করুণা ভাবনা করলে বিহিংসা(=হিংসাবৃত্তি)ছুটিয়া যায়; মুদিতা ভাবনা করিলে অরতি ছুটিয়া যায়; এবং উপেক্ষা ভাবনা দ্বারা প্রতিঘ(= প্রতিহিংসাবৃত্তি) ছুটিয়া যায়”[১৩]।

মন্তব্য: বর্তমান সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে, সৎ জীবন গঠন ও সৎ জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে গৌতম বুদ্ধ নির্দেশিত 'আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ' মানব জীবনের এক অমূল্য সম্পদ। অষ্টাঙ্গিক মার্গ ব্যক্তির ব্যবহারিক ও পারিবারিক জীবনে যেমন আবশ্যক তেমনি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর অনিবার্যতা আমরা লক্ষ্য করি। এর প্রত্যেকটি বিশুদ্ধ নীতি দিয়ে আমরা যদি আমাদের জীবন গঠন করি, আমরা যদি সমাজে এর প্রত্যেকটিকে যথার্থ রূপে ব্যবহার করতে পারি তবে আমরা কোনদিন কারো অশুভ, অমঙ্গল ও ক্ষতিসাধন করতে পারিনা। সমাজ, রাষ্ট্র বা বিশ্বের ক্ষতি সাধনের চিন্তা আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করতেও পারে না। অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুশীলন ফলে সমাজ ও দেশের মানুষ সুখে,শান্তিতে বসবাস করতে পারে, এমনকি সমাজ ও দেশ থেকে নানা ধরনের দুর্নীতি, অপরাধ, হিংসা, নৈরাজ্য দূরীভূত হবে। বিশেষ কোনো রকম যুদ্ধ, বিগ্রহ ও দ্বন্দ্ব সংঘাতও থাকবে না। সুতরাং এ সুন্দর মানুষ সমাজে সামাজিক সংহতি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য, নীতিবোধ ও মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার জন্য এবং মানব জীবনের পরম লক্ষ্য নির্বাণ লাভের ক্ষেত্রে বৌদ্ধের আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য। তাই আমরা বলতে

পারি যে, বুদ্ধের অভিনব আবিষ্কার আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের জন্য মানবজাতি তাঁর নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে।

তথ্যসূত্র:

১। বড়ুয়া, ডঃ সুকোমল, ২০২১, ত্রিপিটকে বৌদ্ধ নীতি-সমীক্ষা ও ধর্ম-দর্শন এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ, ঢাকা, মেরিটফেয়ার প্রকাশন, পৃষ্ঠা-২১৬।

২। সেন, দেবব্রত, ২০০১, ভারতীয় দর্শন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃষ্ঠা-৭০।

৩। বড়ুয়া, ডঃ সুকোমল, ২০২১, ত্রিপিটকে বৌদ্ধ নীতি-সমীক্ষা ও ধর্ম-দর্শন এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ, ঢাকা, মেরিটফেয়ার প্রকাশন, পৃষ্ঠা-২২০।

৪। চৌধুরী, ডঃ সুকোমল, ২০২১, গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন, কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সী,পৃষ্ঠা-৫৭-৫৮।

৫। সেন, দেবব্রত, ২০০১, ভারতীয় দর্শন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃষ্ঠা- ৭১-৭২।

৬। মন্ডল, প্রদ্যোতকুমার, ২০০৮, ভারতীয় দর্শন, কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা-৭৭।

৭। চ্যাটার্জী , অমিতা (সম্পাদিকা), ১৪০৫ বঙ্গাব্দ, ভারতীয় ধর্মনীতি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, সেন্টার অফ অ্যাডভান্স স্টাডি ইনফিলোসফি, পৃষ্ঠা- ২৭৪।

৮। থেরগাথা, ৬৭৫-৮।

৯। বড়ুয়া, ডঃ সুকোমল, ২০২১, ত্রিপিটকে বৌদ্ধ নীতি-সমীক্ষা ও ধর্ম-দর্শন এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ, ঢাকা, মেরিটফেয়ার প্রকাশন, পৃষ্ঠা-৮১।

১০। স্বামী, বিদ্যারণ্য, ১৯৯৯, বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পৃষ্ঠা -৬৬।

১১। গুপ্ত, দীক্ষিত, ২০০৭, নীতিশাস্ত্র, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে পুস্তক পর্ষৎ, পৃষ্ঠা-৪৮।

১২। বড়ুয়া, ডঃ সুকোমল, ২০২১, ত্রিপিটকে বৌদ্ধ নীতি-সমীক্ষা ও ধর্ম-দর্শন এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ, ঢাকা, মেরিটফেয়ার প্রকাশন, পৃষ্ঠা-২১১-১২।

১৩। মজ্ ঝিমনি, মহারাহুলোবাদসুত্ত (৬২), (১খং), পৃষ্ঠা-৪২৪।

ভারতবর্ষে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বৈদ্যুতিন প্রশাসনের ভূমিকা

প্রভাস মন্ডল
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
নেতাজি নগর ডে কলেজ, কলকাতা

সারসংক্ষেপ: ভারতবর্ষের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বৈদ্যুতিকরণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে অর্থাৎ বৈদ্যুতিন প্রশাসন বা ই-গভর্নেন্স বিকশিত হচ্ছে। বর্তমানে বৈদ্যুতিন প্রশাসনের বিকাশ একটি শাসনব্যবস্থার উন্নয়ন তথা ইতিবাচক প্রভাব প্রতিষ্ঠার পরিচয় বহন করে। তবে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিন প্রশাসনের সম্প্রসারণের প্রধান বাধা হলো ভৌগোলিক, সামাজিক, সংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবধান। এছাড়া অন্যান্য আরো অনেক বাধা বা সীমাবদ্ধতা আছে, যেমন নিরক্ষরতা, উপযুক্ত পরিকাঠামোর ঘাটতি, নিরাপত্তা হীনতা, ব্যক্তিগত এবং অর্থনৈতিক তথ্যের নানান গোপনীয়তা প্রভৃতি। ভারত বর্ষ বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, এবং জনসংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয়। এখানে ভৌগোলিক বৈচিত্র্যময়তা সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করে বৈদ্যুতিন প্রশাসনের সাফল্য লাভের ক্ষেত্রে। তা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ বৈদ্যুতিন প্রশাসনের সাফল্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে সমস্ত পরিকাঠামোগত পরিষেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং তা যেভাবে কাজ করে চলেছে তা আলোচনা এবং বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তার সাফল্যের মূল্যায়ন করা যেতে পারে। এই আলোচনায় প্রচলিত বৈদ্যুতিন পরিষেবা গুলির বৈশিষ্ট্য এবং বিবিধ সীমাবদ্ধতাগুলি চিহ্নিত করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। সেই সাথে একটি তাত্ত্বিক পটভূমি নির্মাণ করা হয়েছে। বৈদ্যুতিন প্রশাসনের সাফল্যের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে তার কিছু কিছু দিক সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে।
সূচক শব্দ: বৈদ্যুতিন প্রশাসন (ই-গভর্নেন্স), সুশাসন, দুর্নীতি, অংশগ্রহণ, স্বজন পোষণ, পরিকাঠামো, নিরক্ষরতা, কার্যক্রম।

মূল আলোচনা:

সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য একটি দক্ষ, কার্যকরী এবং গণতান্ত্রিক সরকারের প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক সরকার সুশৃঙ্খলিত সমাজ প্রতিষ্ঠার সহায়ক। বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে ভারতবর্ষ ক্রমশ বৈদ্যুতিন পরিচালন ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে চলেছে। এই বৈদ্যুতিন পরিচালন ব্যবস্থা যত সম্প্রসারিত হবে শাসনব্যবস্থার গুণগত মানের ততই উন্নতি হবে। সরকারি পরিষেবা জনগণের কাছে সহজে পৌঁছে দেওয়া, সরকারি কার্যকলাপ স্বচ্ছতার সঙ্গে সম্পন্ন করা, দুর্নীতি কমানো, অনেক কম খরচে সরকারের কাছে জনগণের দাবি পৌঁছানোর জন্য বৈদ্যুতিন প্রশাসনের সদর্থক ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য হলো জনগণের কাছে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠা

তথা জনগণের কাজে সমন্বয়ে সাধন করা এবং জনপরিষেবা সহজলভ্য করে তোলা। সুশাসনের (good governance) অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল পারদর্শিতা, কার্যকারিতা, আইনের অনুশাসন, জনঅংশগ্রহণ, গণতান্ত্রিকীকরণ, স্বচ্ছতা, দায়িত্বশীলতা, মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রভৃতি। বাজার বা পুরো সমাজ কখনোই রাষ্ট্রের মতো প্রত্যক্ষভাবে বা সক্রিয়তামূলক ভূমিকা পালন করতে পারে না। তাই গ্রামীণ বা পৌর ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিন প্রশাসনকে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে গেলে শক্তিশালী রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন। যাইহোক সামাজিক, অর্থনৈতিক বা ভৌগোলিক বিভিন্নতা, বৈদ্যুতিন প্রশাসনকে সফলভাবে কার্যকরী করার অন্যতম অন্তরায়। সরকারের প্রয়োজন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (Information and communication technologies) যথাসাধ্য উন্নয়ন ঘটানো। বিশেষ করে গ্রামীণ ক্ষেত্রের জন্য এই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

বিশ্বব্যাপী বৈদ্যুতিন প্রশাসন এবং সুশাসন নিয়ে বিতর্ক চলছে, ভারতবর্ষ তার বাইরে নয়। এই গবেষণাধর্মী আলোচনার মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষে বৈদ্যুতিন প্রশাসন কার্যকরী করার জন্য কতটা উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হয়েছে সে বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। সেই সাথে যে সমস্ত বাধা এবং চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে তা চিহ্নিত করা হয়েছে। যদি বৈদ্যুতিন প্রশাসনকে উপকরণ (input) হিসেবে ধরা হয়, তাহলে সুশাসন হলো উপপাদ (output)। আর প্রধান প্রধান উপাদান হল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা, ভালো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, কার্যকরী আইন ব্যবস্থা, মুক্ত সংস্কৃতি, উপযুক্ত যান্ত্রিক পরিকাঠামো প্রভৃতি। কয়েকটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন সামনে রেখে যদি বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে সমসাময়িক অবস্থা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা তুলে ধরা যাবে। যেমন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (ICT) ব্যবহারের ফলে ভারতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হচ্ছে কিনা, সুশাসনের সঙ্গে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (ICT) সরাসরি কোন সম্পর্ক আছে কিনা প্রভৃতি। উল্লেখ্য উন্নত দেশে (developed country) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিন সরকার তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে কিন্তু ভারতের মতো উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সে কথা সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। ভারতে বৈদ্যুতিন প্রশাসন ব্যবস্থা কতটা কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে তা বিশ্লেষণ করার জন্য এখানকার স্থানীয় পর্যায়ে, প্রাদেশিক পর্যায়ে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তা বিশ্লেষণ করার মধ্য দিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

বৈদ্যুতিন প্রশাসন বিষয়ে আলোচনার পূর্বে সুশাসন (good governance) বলতে কি বোঝায় সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন। Governance বা প্রশাসনিক ব্যবস্থা, পরিবার থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত প্রতিটা বিষয়কে বুঝিয়ে থাকে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা প্রশাসনিক প্রতিটা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের ক্রিয়া-কলাপকে ইঙ্গিত করে। একটা দেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সম্পদের উন্নতির লক্ষ্যে পরিচালিত করাকে প্রশাসন ব্যবস্থা বা পরিচলন ব্যবস্থা বলা হয়ে থাকে। এই পরিচালন

যখন মহতী হয়ে ওঠে তখন তাকে সুশাসন (good governance) বলা হয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব কোফি আন্নান- এর মতানুযায়ী, "In practice, good governance is ensuring respect for human rights and rule of law, strengthening democracy, promoting transparency and capacity in public administration. " রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং জনপ্রশাসন শাস্ত্রে এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা, তুলনামূলকভাবে অনেকটা পরের দিকের বিষয়। আজকের দিনে এই বিষয় গণতন্ত্র, পুরোসমাজ, জনঅংশগ্রহণ, মানবাধিকার প্রভৃতি ধারণার সঙ্গে পাশাপাশি আলোচিত হয়। জন্ রলস্ এর “Social Justice as fairness”, অমর্ত্য সেনের “Development of freedom” প্রভৃতির কথা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসেও এই বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন- কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বিশেষ করে উল্লেখ আছে একজন রাজার বিশেষ গুণাবলীর কথা। যেখানে তিনি বলেছেন, জনগণের খুশি হলো একজন রাজার খুশি হওয়া। তাই একজন রাজা সর্বদা জনগণের কল্যাণের জন্য, জনগণের সমৃদ্ধশালী করার চেষ্টায় মগ্ন থাকবেন।

একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের কল্যাণার্থে অর্থনৈতিক, সামাজিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষ এবং কার্যকরী ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার প্রয়াসের নাম সুশাসন (good governance)। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, সংবিধানিক পরিকাঠামের মধ্য দিয়ে এই প্রয়াস চলে থাকে। সময়ের সাথে সাথে আর্থসামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। আবার কিছু প্রতিষ্ঠান আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। সুশাসন এই বিষয়টার দিকে খেয়াল রাখে এবং প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সংবিধানের প্রস্তাবনা, মৌলিক অধিকার, মৌলিক কর্তব্য, এবং রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহ হলো সুশাসনের অন্যতম উপাদান। সংবিধান অনুযায়ী ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের তিনটি স্তম্ভ হল- সংসদ, শাসন বিভাগ, এবং বিচার ব্যবস্থা। এ ছাড়া নাগরিক সমাজের ব্যাপক অংশগ্রহণ, যুবশক্তির অংশগ্রহণ এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রতি উদ্যোগ সুশাসন অগ্রসর করে তোলে। সুশাসন গণমাধ্যমগুলির নৈতিকতা, এবং দায়বদ্ধতার সহিত ভূমিকা পালনকে কামনা করে। ভারতবর্ষের সংসদ কর্তৃক ‘তথ্য জানার অধিকার আইন’ (RTI) পাশ হওয়ার ফলে, নাগরিকের শুধুমাত্র অধিকার নয়, দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি সচেতন থাকতে হয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যে বিষয়গুলো আবশ্যিক থাকা প্রয়োজন তা হলো আইনের অনুশাসন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনঅংশগ্রহণ, দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা, দায়িত্বশীলতা, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ, সাম্যতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থা। সুশাসন মূলত ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করতে চায়। 73 তম এবং 74 তম সংবিধান সংশোধনের মধ্যে দিয়ে স্থানীয় সরকারের সাংবিধানিক মর্যাদা লাভের পর ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। সরকারি উদ্যোগ এবং জনগণের সদিচ্ছা যদি স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানকে

শক্তিশালী করে তুলতে পারে এবং জনঅংশগ্রহণ সুনিশ্চিত হয় তাহলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে।

এতদিনকার সরকারি প্রশাসনিক ব্যবস্থায় পরিষেবা প্রদানের যে বন্দোবস্ত ছিল তার নানান ধরনের সীমাবদ্ধতা সামনে আসতে শুরু করে। ভারতবর্ষের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় যে আমলাতান্ত্রিক কাঠামো ছিল তার বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে ভাবনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। বর্তমান সময়ে এসে সরকারি প্রশাসনের কাছে যে সমস্ত দাবিদাওয়া উঠতে থাকে তা পূরণে অনেকাংশে ব্যার্থ হওয়ার কারণে বৈদ্যুতিন প্রশাসনের প্রয়োজনীয়তা প্রকট হতে শুরু করে। উল্লেখ্য এক্ষেত্রে বেসরকারি ক্ষেত্রের পরিচালন ব্যবস্থায় বৈদ্যুতিন মাধ্যমের ব্যবহার এবং পরিষেবা প্রদান স্বতঃস্ফূর্ত হওয়ার অভিজ্ঞতা উৎসাহ প্রদানকারীর ভূমিকা পালন করে। বৈদ্যুতিন মাধ্যমের ব্যবহার জনগণকে অধিক উৎসাহী, সক্ষম এবং অংশগ্রহণের ব্যাপারে উদ্যোগী করে তোলার বিষয়টি আরো গুরুত্ব পেতে শুরু করে। এক্ষেত্রে তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকারি প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বিশেষ কিছু বিষয়ে নতুন করে গুরুত্ব পেতে শুরু করে। ভারতবর্ষে তথ্যপ্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব 1990 সালে বিশেষভাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

জনপ্রশাসনের আলোচনায় সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গির জায়গায় নতুন এক ধারা অধিক গুরুত্ব পেতে শুরু করে। আর সেটা হলো সরকারি পরিষেবার ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের ব্যবহারের সাহায্যে জনগণের কাছে আরো সহজে পৌঁছে যাওয়া। এই নতুন পর্বে এসে পরিষেবার গুণগত মান নিয়ে ভাবনা-চিন্তার পরিসর তৈরি হয়। বৈদ্যুতিন মাধ্যমের ব্যবহার, পরিচালন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা, সময় বাঁচানো, পদ্ধতিগত সরলতা, দুর্নীতি হ্রাস, কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, নথি সংরক্ষণ প্রভৃতিতে অনেক সাফল্যের দিক নির্দেশ করে। ভারতবর্ষে এই বৈদ্যুতিন পরিচালন ব্যবস্থা সরকারি ক্ষেত্রে পরিষেবা প্রদানের মানের উন্নয়ন, জনঅংশগ্রহণের উৎসাহদানের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভারতবর্ষে 1980 সালে জাতীয় তথ্য কেন্দ্রের (National Information Center) উদ্যোগে সমস্ত জেলা সদরের (District Headquarters) যোগ স্থাপনের কথা বলা যায়। 2002 সালে একটা পোর্টালের মাধ্যমে জনগণের কাছে সরকারি বিভিন্ন কার্যকলাপের বিষয়ে তথ্য সহজলভ্যের কথা বলা যেতে পারে। বৈদ্যুতিন পরিচালন ব্যবস্থা সরকারি ক্ষেত্রে পরিষেবার সক্রিয়তা এবং দায়বদ্ধতার বিষয়টি সুনিশ্চিত করে। বৈদ্যুতিন সরকার (e-government) এবং বৈদ্যুতিন পরিচালন ব্যবস্থা (e-governance) বিষয়দুটি পারস্পরিক নির্ভরশীল ক্ষেত্র। বৈদ্যুতিন সরকার (e-government) যেখানে সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) ব্যবহার করে এবং সরকারি পরিষেবা ক্ষেত্রে কার্যকরিতা এবং জনগণের কাছে তথ্যের সহজলভ্যতা, দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করে, সেখানে বৈদ্যুতিন পরিচালন ব্যবস্থা (e-governance) অনেক বিস্তৃত এক অর্থ বহন করে। যার মূল বিষয় হলো- রাষ্ট্র

প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি, কোনো নীতির বাস্তবায়নের সক্ষমতা, এবং জনগণের সাথে সরকারি আধিকারিকদের সম্পর্কের দিক নির্দেশ করে। বৈদ্যুতিন পরিচালন ব্যবস্থা (e-governance) হলো সরকার (government) কর্তৃক তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার, পুরোসমাজ (civil society) এবং অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে (others political institution) বৈদ্যুতিন মাধ্যমে জনগণকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং জনগণের থেকে মতামত (feedback) সংগ্রহ করে তা পুনরায় বাস্তবায়নের প্রয়াস। এইভাবে বৈদ্যুতিন পরিচালন ব্যবস্থার (e-governance) মাধ্যমে বৈদ্যুতিন সরকার (e-government) দৃষ্টিগোচর হয়, এবং প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি হয়, আর প্রশাসনিক দুর্নীতি হ্রাস পায়।

পরিচলন ব্যবস্থায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (ICT) ব্যবহার, জনগণের পরিষেবা প্রদানের মানের এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। বৈদ্যুতিন সরকারের, পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রের পরিসর অনেক বৃদ্ধি পায়। মূলত চারটি পৃথক ক্ষেত্র দিয়ে সেগুলিকে বোঝানো যেতে পারে। যেমন- government to government (G to G), government to citizen (G to C), government to business (G to B)এবং government to employees (G to E)। এক্ষেত্রে কিছু সাধারণ বিষয় আছে যা প্রতিটা গোষ্ঠী বা ক্ষেত্রের জন্য প্রাসঙ্গিক। যেমন- সক্ষমতা, বিশ্বাসযোগ্যতা, এবং পরিষেবা প্রদানের মানের উন্নয়ন প্রভৃতি। 'G to G' বিভিন্ন সরকারি সংস্থার (government agency) মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান এবং বিভিন্ন প্রযুক্তিগত বিনিময়কে বুঝিয়ে থাকে। এর অনেক সুফল আছে, যেমন- ব্যয় সংকোচ, অতি দ্রুত বিনিময়ে সংঘটিত হওয়া, অনেক কম সংখ্যক কর্মী দিয়ে কাজ চলতে পারে এবং ধারাবাহিক সুফল লাভ সম্ভবপর হয়। এছাড়া সরকারি সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনা হয়ে থাকে। 'G to C' এর মাধ্যমে জনগণের সহজে সরকারের সাথে যোগাযোগকে বোঝানো হয়। যেটি একটি বৈদ্যুতিন সরকারের (e-government) প্রধান লক্ষ্য। এই উদ্যোগ কিছু বিষয়কে সহজ করে তোলে। যেমন- কর প্রদান, লাইসেন্সের পুনর্নবীকরণ করা, কিছু সরকারি সুযোগকিছু সরকারি সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য আবেদন করা, যেকোনো পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অযথা সময়ের অপচয় না হওয়া এবং সহজ ভাবে প্রতিটা ক্ষেত্র পরিচালনা করা প্রভৃতি। 'G to B' এর মাধ্যমে সরকার কর্তৃক একদিকে যেমন মালপত্র (goods) এবং পরিষেবা (services) আহরণ কে বোঝানো হয়, তেমন সরকার যখন প্রযুক্তির সাহায্যে উদ্বৃত্ত সরকারি মালপত্র (goods) জনগণের কাছে বিক্রয় করে সেটাকে ও বোঝানো হয়ে থাকে। 'G to E' হল এমন এক পদ্ধতি যেখানে সরকার এবং কর্মচারীদের মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদান কে বোঝানো হয়। এক্ষেত্রে তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) ব্যবহারের ফলে কর্মচারীদের সাথে সরকারের কোন বিষয়ে খুব দ্রুততার সহিত আদান-প্রদান হয় এবং কর্মচারীদের সন্তুষ্টির বিষয়টিও খুব দ্রুততার সঙ্গে হয়ে থাকে। ভারত সরকার 2006 সালে জাতীয়

বৈদ্যুতিন পরিচালন পরিকল্পনা (national e-governance plan) নিয়ে আসে। যেখানে সাফল্য লাভের আশায় আর্থিক সম্পদের বরাদ্দ অনেক বৃদ্ধি করা হয়। একাদশতম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে যেখানে বরাদ্দ ছিল এগারো হাজার কোটি টাকা। সেটি দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তে বৃদ্ধি পেয়ে হয় তিরিশ হাজার কোটি টাকা। এক্ষেত্রে বলা যায় পরিকল্পনা এবং বরাদ্দকৃত সম্পদ কাজে আসবে যদি বৈদ্যুতিন পরিচালন ব্যবস্থার গুরুত্ব, তাৎপর্য, লক্ষ্য, সঠিকভাবে বোধগম্য হয় এবং জাতীয় বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়।

ভারতবর্ষের প্রশাসনিক কাঠামো একটা স্বচ্ছ, সক্রিয় এবং কার্যকরী প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কতটা সফল তা নিয়ে নানান ধরনের বিশ্লেষণ আছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভারতবর্ষ কতটা অগ্রসর হতে পেরেছে সেখানে কি কি বাধা বা সীমাবদ্ধতা আছে, তা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে। এখানে যে সাংবিধানিক ব্যবস্থাদি গৃহীত হয়েছে তা কতটা সফলতার সঙ্গে কাজ করছে তা নিয়ে আলোচিত হয়েছে। বর্তমানে রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটেছে। এখন রাষ্ট্র হল জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র (welfare state)। সেই জনকল্যাণ সুনিশ্চিত করতে গিয়ে বা সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বৈদ্যুতিন পরিচালন ব্যবস্থার সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিচ্ছে। ভারত সরকার গৃহীত তথ্য প্রযুক্তি (IT) ব্যবস্থার বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করেছে। যেমন জাতীয় বৈদ্যুতিন পরিচালন ব্যবস্থা কার্যকরী প্রকল্প (National E-governance Action Plan), এটি গৃহীত হয় 2003- 2007 সালে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে। এই প্রকল্পটি গৃহীত হয় দেশের অভ্যন্তরে বৈদ্যুতিন পরিচালন ব্যবস্থার দীর্ঘকালীন উন্নয়নের লক্ষ্যে। এছাড়া গৃহীত আরো কিছু প্রকল্প এবং আইন হলো- (I) 2000 সালে গৃহীত Information Technology (IT) Act (II) 1998 সালে প্রতিষ্ঠিত- National Task force of Information Technology and Software Development. (III) কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের ব্যবহারের জন্য - Centre for e-governance. (IV) বিভিন্ন মন্ত্রক এবং বিভাগের জন্য e-governance office solution. (V) তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের সাহায্যে প্রশাসনিক পারদর্শিতা বৃদ্ধির জন্য ক্যাবিনেট সচিবালয়কে সাথে নিয়ে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন। (VI) সমস্ত মন্ত্রক এবং বিভাগের জন্য ওয়েবসাইট তৈরি করা প্রভৃতি।

বৈদ্যুতিন প্রশাসনের সফল প্রয়োগ এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের তরফে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু পদক্ষেপ এবং প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। যা আলোচনার মধ্যে দিয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভারতবর্ষ কতটা অগ্রণী তার মূল্যায়ন করা যায়। উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু উদ্যোগ হলো- Gyandoot, e-seva, SETU, SUDA প্রভৃতি। কর্ণাটক সরকার গৃহীত 'Bhoomi', মধ্যপ্রদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প 'Gyandoot', অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার সাধারণ নাগরিকের সরল, মানবিক, দায়িত্বশীল, স্বচ্ছ পরিচালন ব্যবস্থা প্রদানের জন্য গ্রহণ করে 'Smart Government',

তামিলনাড়ু সরকার গ্রহণ করে- ‘Sustainable Access in Rural India’ (SARI), চন্ডীগড় প্রশাসন তথ্যপ্রযুক্তির যথাযোগ্য ব্যবহারের জন্য প্রতিষ্ঠা করে- 'IBM e-governance solution centre', গুজরাট সরকার প্রতিষ্ঠা করে- 'Sampark Centers' প্রভৃতি। সুতরাং এই বিষয়গুলি আলোচনার মধ্যে দিয়ে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বৈদ্যুতিন সরকার প্রতিষ্ঠা এবং তার সার্বিক সাফল্যের জন্য ভারত বর্ষ সামগ্রিকভাবে অনেকটা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে।

নাগরিকদের সরকারি পরিষেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিন পরিচলন ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ, আবার এক বড় বাধাও বলা যেতে পারে। ভারতবর্ষের মতো একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের জন্য বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতা বা বাধা আছে। বৈদ্যুতিন পরিচালন ব্যবস্থার (e-governance) সাফল্য বা সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম সমস্যা গুলি হল- জনসংখ্যা, বিকেন্দ্রীকরণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া প্রভৃতি। এছাড়া আইন পদ্ধতি, তথ্যের স্বচ্ছতা, আইনগত সমস্যা, পরিকাঠামো, দক্ষতা এবং সচেতনতা, তথ্যের অধিকারের সহজলোভ্যতা, আন্তঃবিভাগীয় যোগসাজুয্য, কর্মসংস্কৃতি পরিবর্তনে বাধা প্রভৃতির কথা বলা যায়। এটা খুবই জটিল কাজ হবে এই বহু ভাষাভাষী, বহু সংস্কৃতি, বহু ধর্মীয়, বা বহু নৃকুল গোষ্ঠীর সামগ্রিক কল্যাণের জন্য সর্বজনগ্রাহ্য কোন সাধারণ সূত্র তৈরি করা। ভারতবর্ষে গ্রামীণ এলাকার চিত্র খুবই দুর্বিষহ। বৈদ্যুতিন প্রশাসন কার্যকরী করার ক্ষেত্রে সেখানে নানান সীমাবদ্ধতা বর্তমান। যেমন- কম্পিউটার সম্পর্কে ধারণা বেশিরভাগ মানুষের নেই। সামাজিক, অর্থনৈতিক ভিন্নতা, কার্যকলাপ সম্পর্কে সচেতনতার অভাব প্রভৃতি। এছাড়া রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন, দুর্নীতি, অশিক্ষা, পরিকাঠামোর অভাব প্রভৃতি আছে। যদি এই সমস্ত সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করা যায় তাহলে যে কোন পরিষেবা অতি সহজে সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে। বৈদ্যুতিন প্রশাসন যদি সাফল্যের সাথে কাজ করে তাহলে প্রশাসনিক উন্নয়ন অতি সহজে সুনিশ্চিত করা সম্ভব এবং সুশাসন সাফল্যের সঙ্গে সুনিশ্চিতকরণ হতো। মানুষের যেগুলি প্রাথমিক চাহিদা যেমন- অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রভৃতি প্রদান এবং অন্যান্য পরিকাঠামগত দুর্বলতা কাটিয়ে যদি সেগুলির উন্নয়ন হয় তাহলে সুশাসন আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে যাবে।

বৈদ্যুতিন প্রশাসনকে সফল করে তুলতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যথোপযুক্ত ব্যবহার খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে যে সমস্ত কর্মী এই কাজের জন্য বরাদ্দ আছে তাদের সঠিক শিক্ষা এবং উপযুক্ত পরিবেশ দেওয়া প্রয়োজন। ভারত সরকারের প্রয়োজন একটি নির্দিষ্ট মানের জাতীয় পর্যায়ের ওয়েবসাইট (website) তৈরি করা, যাতে করে প্রতিটা রাজ্যের জন্য এটা আবশ্যিক অনুকরণীয় হয়। এছাড়া হার্ডওয়ার (hardware) এবং সফটওয়্যার (software) উভয় ক্ষেত্রের জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা, কর্মীদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা, প্রযুক্তিগত পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উপযুক্ত ভারসাম্য বজায়

রাখা প্রয়োজন। উল্লেখ্য ভারতবর্ষে জাতীয় তথ্য কেন্দ্র (National Information Centre-NIC) সারাদেশের জন্য গঠিত হয়েছে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (ICT) সঠিক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তবে ভারতবর্ষের মতো রাষ্ট্রে যেখানে স্বাক্ষরতার হার এখনো এত কম, সেখানে বৈদ্যুতিন প্রশাসনের সঠিক বাস্তবায়ন এত সহজ কাজ নয়। তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষাদান, সচেতনতা বৃদ্ধি, বাস্তব জীবনে এর প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে উপযুক্ত ধারণা লাভ করতে পারলে এই বিষয়ে স্বতঃস্ফূর্ততা অনেক বৃদ্ধি পাবে। সরকারিভাবে সমস্ত রকমের ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করতে হবে যাতে করে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে বিস্তৃত জ্ঞান লাভ হয়। যেহেতু তথ্যপ্রযুক্তি (IT) হল বৈদ্যুতিন প্রশাসনের মেরুদন্ড, তাই এই বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। সরকারি সমস্ত ক্ষেত্রে, সে বিচারবিভাগ থেকে শুরু করে অন্যান্য বিভাগ এবং প্রশাসনের সর্বস্তরে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের উপর জোর দিতে হবে। তাহলে বৈদ্যুতিন প্রশাসন সাফল্যের সঙ্গে তার কাজের সম্প্রসারণ ঘটাতে পারবে। ভারতবর্ষে যেহেতু একটা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো আছে, যদিও কারো কারো মতে আধা যুক্তরাষ্ট্রীয়, সেক্ষেত্রে বৈদ্যুতিন প্রশাসনের বাস্তবায়নের সময়ে সে বিষয়টা গুরুত্ব দিতে হবে। প্রতিটা নাগরিকের জন্য উপযুক্ত তথ্যক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যেমন- সুনির্দিষ্ট আইডি নাম্বার (Id. Number) এবং পাসওয়ার্ড (Password), যেগুলির সাহায্যে নাগরিক তার নিজস্ব তথ্য এবং বিনিময়ে সম্পন্ন করতে পারবে। যা অন্য কোন নাগরিক তার সম্মতি ছাড়া ব্যক্তিগত তথ্য জানতে পারবেনা। উদাহরণস্বরূপ প্রতিটা নাগরিক তার বিদ্যুতের বিল, ব্যাংকের হিসাব, ফোন বিল প্রভৃতি সহজে পরিচালনা করতে পারবে। বায়োমেট্রিক (biometric,) ফিঙ্গারপ্রিন্ট(fingerprint), ফেসিয়াল(facial) বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বৈদ্যুতিন প্রশাসনে ব্যবহৃত বিভিন্ন দিক। একটি বৈদ্যুতিন সরকার সফলভাবে বাস্তবায়িত করার জন্য কয়েকটি বিশেষ দিকের প্রতি নজর দেওয়া যেতে পারে, যেমন- (I) কম্পিউটার ভিত্তিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বিশেষ নীতি প্রণয়ন। (II) সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক এবং বিভাগের মধ্যে সুদৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলা, যাতে করে বিভাগগুলোর মধ্যে খুব সহজে তথ্য এবং ফাইল আদান-প্রদান করা যেতে পারে। (III) জনগণের মধ্যে যেকোনো তথ্য মাতৃভাষায় অনুবাদ করলে সেগুলি তাদের কাছে খুব সহজে বোধগম্য হবে। (IV) অর্থ দপ্তর থেকে সেই সংস্থাকে কিছুটা ছাড় দেওয়া যারা কম্পিউটারিকরনের দায়িত্ব পাবে। (V) সকল স্তরের কর্মচারীদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ওয়ার্কশপ (workshop), সেমিনার (seminar) এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণের (training) ব্যবস্থা করা। (VI) জনসাধারণের জন্য সাইবার সংক্রান্ত আইন তৈরি রাখা। (VII) গ্রামীণ (rural) এবং শহুরে (urban) ক্ষেত্রের মধ্যে যোগসাজুয্য বজায় রাখার জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরি করা প্রভৃতি।

References:

- Barthal,C.P.(ed.), (2005), Good Governance in India, New Delhi, Deep and Deep Publication
- Bhatnagar, s., (2004), E-Government from Vision to Implimentation, New Delhi, sage Publication
- Bhattacharya, M., (2018), New Horizon of Public Administration, New Delhi, Jahar Publishers and Distributors
- Dwipedi, O.P. and Mishra, D.S., (Oct.- Dec., 2005), A Good Governance Model for India: IIPA,
- Hughes, O. E., (1998), Public Management and Administration: An Introduction, Houndsmills, Basingloke, Macmillan
- Madon, S., (2009), E-Governance for Development: A Focus on Rural India, London, Palgrave Macmillan
- Malick, M. H. and Murthy, A.V.K., (April- June, 2001), The Challenges of E-Governance: IIPA
- Sing, D.P., (Jan- March, 2004), Good Governance and Development: IIPA

মধ্যযুগের রোমান্টিক প্রণয়কাব্য কোরেশী মাগন ঠাকুর বিরচিত ‘চন্দ্রাবতী’ : একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন

হুমায়ুন কবির
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কটন বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি, অসম

সারসংক্ষেপ: রোমান্টিক প্রণয়কাব্য মূলত ভারতীয় হিন্দি, অবধি ভাষায় রচিত সাহিত্য বা আরব ইরানীয় সাহিত্য থেকে অনুবাদ। সেই অনুবাদ কখনও আক্ষরিক, স্বাধীন কিংবা ভাবানুসরণ, সমন্বয় ঘটত দেশীয় পৌরাণিক এবং কথাশ্রেণির উপকথা, রূপকথা প্রভৃতির। কোরেশী মাগন ঠাকুরের ‘চন্দ্রাবতী’ রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান কাব্যটি দেশীয় রূপকথা ভিত্তিক। নায়িকা চন্দ্রাবতীর রূপ ও নায়ক বীরভানের শৌর্যবীর্যে পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বাধাবিপত্তি পেরিয়ে তাঁদের মিলন কাহিনি কাব্যের বিষয়। প্রণয় আখ্যান কাব্যটিতে রোমান্স রসের সমন্বয়ে রাক্ষস, ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমি, সর্পমণি, মন্ত্রবলে তোতা পাখিতে রূপান্তর প্রভৃতি অলৌকিক ঘটনা পুরোপুরি রূপকথাধর্মী। রূপকথার অলৌকিক কল্পনাশ্রিত ইতিকথায় ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দ বা পঙ্ক্তিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরি করে উদার মনের পরিচয় দিয়েছেন কবি। শাস্ত্রজ্ঞানের অধিকারী মাগন ঠাকুর প্রথম সারির কবি না হলেও ছন্দ অলংকারের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে মণ্ডনকলা গুণের পরিচয় দিয়েছেন।
সূচকশব্দ : প্রণয়োপাখ্যান, চন্দ্রাবতী, রূপকথাধর্মীতা, সম্প্রীতি, মধ্যযুগের সমাজ ও সংস্কৃতি।

মূল আলোচনা :

‘চন্দ্রাবতী’ রোমান্টিক প্রণয়কাব্যটি রচনা করেন কোরেশী মাগন ঠাকুর। ‘পদ্মাবতী’ কাব্য রচয়িতা সৈয়দ আলাওলের রচনাতেও পৃষ্টপোষকরূপে মাগন ঠাকুর নামের উল্লেখ ও প্রশস্তি রয়েছে। এখন আলাওলের পৃষ্টপোষক মাগন ঠাকুর এবং এই কাব্য রচয়িতা কোরেশী মাগন একই ব্যক্তি কিনা তা নিয়ে কোনো প্রামাণিক নথিভুক্ত তথ্য পাওয়া না গেলেও আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৭১-১৯৫৩ খ্রি.), মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০২-১৯৮২ খ্রি.) ও আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯ খ্রি.) কোরেশী মাগন এবং মাগন ঠাকুর একই ব্যক্তি বলে প্রমাণ করেছেন। তাঁরা কয়েকটি বিষয়কে সামনে রেখে এই সিদ্ধান্ত করেছেন—

(ক) ‘চন্দ্রাবতী’ কাব্যে কবি ভণিতা দিয়েছেন ‘কোরেশী মাগন’ নামে, আলাওলের পৃষ্টপোষক মাগন ঠাকুরের উপাধি কোরেশী, তিনি কোরেশ বংশজাত।

(খ) 'চন্দ্রাবতী' কাব্যে কবি ভণিতায় বলেছেন 'কোরেশী মাগন গুণনাম' অর্থাৎ 'মাগন' তাঁর পোশাকি নাম নয়, 'গুণনাম' বা ডাকনাম। অন্যদিকে সৈয়দ আলাওল তাঁর 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল' কাব্যেও বলেছেন 'মাগন' নামটি কবির ডাকনাম, পিতামাতা 'প্রভুস্থান' অর্থাৎ ঈশ্বরের কাছে 'মাগি' বা প্রার্থনা করে সন্তান পেয়েছিলেন বলেই নাম 'মাগন' রেখেছিলেন। এই নাম সাদৃশ্যে তাঁদের অভিন্ন ব্যক্তি বলে মনে করা হয়।

(গ) উভয়ে চট্টগ্রামের বাসিন্দা ছিলেন, সেই দিক থেকেও অভিন্ন হিসেবে ধরা হয়।

রোসাঙ্গ রাজসভায় বাংলা ভাষায় সভাপণ্ডিতদের সাহিত্য চর্চার প্রচলন ছিল না কিন্তু রাজআমত্যদের সভায় বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা হত। সৈয়দ আলাওল রোসাঙ্গ রাজ আমত্যদের পৃষ্টপোষকতায় সাহিত্য রচনা করেছেন। রোসাঙ্গের শ্রেষ্ঠ আমত্য মাগন ঠাকুরের পৃষ্টপোষকতায় আলাওল তাঁর সর্বপ্রথম কাব্য 'পদ্মাবতী' (১৬৪৫ খ্রি.-১৬৫২ খ্রি. মধ্যে রচিত) এবং 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল' (১৬৬৯ খ্রি.) কাব্য রচনা করেন। স্বাভাবিক কারণে এইসব কাব্যে আলাওল আদেষ্টা আমত্যের প্রশস্তি বিভিন্ন পঙ্‌ক্তিতে তুলে ধরেছেন—যা মাগন ঠাকুরের ব্যক্তি পরিচয় জানতে সাহায্য করে।

আলাওল 'পদ্মাবতী' কাব্যে মাগন ঠাকুরের বিদ্যোৎসাহীতা, গুণগ্রাহিতা প্রভৃতি গুণের পরিচয় দিয়েছেন। 'স্তুতিখণ্ড'-এর 'মাগন প্রশস্তি' অংশে আলাওল বলেছেন—

"আরবী ফারসী আর মগী হিন্দুআনী।
নানাগুণে পারগ সঙ্কেত জ্ঞাতা গুণী।।
কাব্য অলঙ্কার জ্ঞাত হস্তক নাটিকা।
শিল্পগুণ মহৌষধি মন্ত্রবিধি শিক্ষা।।"[১]

অর্থাৎ তিনি এইসব ভাষা জানার পাশাপাশি শাস্ত্রেও পণ্ডিত ছিলেন। গুণীর পৃষ্টপোষক এই শাস্ত্রজ্ঞানী আমত্য নিজেও সাহিত্য চর্চা করেছেন—তিনি রচনা করেন 'চন্দ্রাবতী' নামে রোমান্টিক প্রণয় আখ্যান কাব্য। এই একটিমাত্র কাব্য ছাড়া আর কোনো কাব্য রচনার কথা জানা যায় না।

- **কাব্যের কাহিনি-নির্যাস :**

আদ্যে, মধ্যে এবং অন্ত্যে খণ্ডিত স্বল্পায়তনের উপাখ্যানের মূল উপজীব্য বিষয় বিদেশীয় রাজকুমার ও রাজকুমারীর প্রেম-কাহিনি। সরন্দ্বীপের রাজা শূরপালের রূপসি কন্যা চন্দ্রাবতী ভদ্রাবতী নগরের রাজা চন্দ্রসেনের পুত্র বীরভানের 'ভুবন মোহন রূপ' দেখে প্রণয়াসক্ত হন। চন্দ্রাবতীর সখী চিত্রাবতী রাজকন্যার পটচিত্র অঙ্কন করে নিদ্রিত বীরভানের বক্ষলগ্ন করে উড়ে গিয়ে রেখে আসেন। নিদ্রাভঙ্গের পর রাজকন্যার মনোহর চিত্র দর্শন করে বীরভান জ্ঞানশূন্য অবস্থায় কন্যার জন্য পর্বত কাননে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। চন্দ্রাবতীর বিরহে রাজকুমারের এই ব্যাকুলতা মন্ত্রিপুত্র 'সুত' রাজকুমারকে নিয়ে সসৈন্যে চন্দ্রাবতীর উদ্দেশ্যে অভিযাত্রা করেন। প্রেমাভিযাত্রায় তাঁরা সমুদ্রপথে নানা বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হন। 'লবন সমুদ্র' মধ্যে তুফানের কবলে পড়ে কোনোক্রমে

সহস্র নৌকার মধ্যে মাত্র পাঁচখানি নৌকা রক্ষা করতে সক্ষম হন ও প্রাণে বাঁচেন। ঝড়ঝঞ্ঝার পরদিন তাঁরা সিংহলে উপস্থিত হন। রাজকুমার বীরভানের রূপের প্রসংশা শুনে সিংহলাধিপতি তাঁকে রাজসভায় নিমন্ত্রণ করেন। এখানে এসে বীরভান জানতে পারেন সিংহল রাজকুমার ইন্দ্রমণির সঙ্গে চন্দ্রাবতীর বিয়ে। শেলসম হেন কথা শুনে বীরভান মনোদুঃখে সিংহল থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে এক বিজন পুরীতে এসে উপস্থিত হন, যেখানে মণিপুরি রাজ্যের পাত্রকন্যা যক্ষ কর্তৃক অপহৃতা হয়ে বন্দিনী। মণিপুরি পাত্রকন্যার সঙ্গে পরিচয়ের পর বীরভান জানতে পারেন তিনি চন্দ্রাবতীর সখী। তিনি চন্দ্রাবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেবার আশ্বাস দেন। পাত্রকন্যাকে নিজ রাজ্য মণিপুরে পৌঁছে দেবার জন্য বীরভান যাত্রা করলে পথে অজগর নাগ, রাক্ষস বাধা হয়ে দাঁড়ালে তিনি সকলকে পরাজিত করেন। এরপর পুথি খণ্ডিত।

চার বছর পর বীরভান মণিপুর রাজ্যে পৌঁছিয়ে এক মালিনীর সঙ্গে পরিচয় হয়। মালিনীর মারফত সে পাত্রকন্যাকে চন্দ্রাবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেবার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে বলেন। কিন্তু পাত্রকন্যা সে কথা বিস্মৃত হন কারণ বীরভান প্রদত্ত অভিজ্ঞান তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন। পরে অবশ্য অভিজ্ঞান ফিয়ে পেয়ে পূর্ব কথা স্মরণ হলে চন্দ্রাবতীর সঙ্গে মিলিত করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

অন্যদিকে, বীরভান বন্ধু সুতকে জঙ্গম রাজকন্যা তোতা পাখিতে পরিণত করে পালন করেন। তোতা পাখিরূপী সুত বন্ধু বীরভানকে খুঁজে পুনরায় ফিরে আসার প্রতিজ্ঞা করলে জঙ্গমকন্যা পঞ্চম তাকে মুক্তি দেন। মুক্ত তোতা পাখি মণিপুরে মালিনীর হাতে ধরা পড়ে। মধ্যে মধ্যে পুথি খণ্ডিত হবার কারণে কাহিনির ধারাবাহিক পারম্পর্য পাওয়া না গেলেও বোঝা যায় শেষ পর্যন্ত বীরভান ও চন্দ্রাবতীর মিলন হয়েছিল। সংক্ষেপে এই হল মাগন ঠাকুরের ৫০ পৃষ্ঠা কাব্যের কাহিনি সংক্ষেপ।

- **কাহিনিতে রূপকথার কল্পজগৎ :**

তুর্কি আক্রমণের (১২০১ খ্রি., মতান্তরে ১২০৩ খ্রি.) পরে ইরানীয় সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে বঙ্গদেশের পরিচয় হলেও বঙ্গজ দেশীয় সংস্কৃতি লোককাহিনি, উপকথা, রূপকথাকে অবহেলা করেননি দেশীয় কবিরা। তাঁদের রচনায় এইসব দেশীয় উপাদান নানাভাবে উঠে এসেছে। এপ্রসঙ্গে মুহম্মদ কবীরের ‘মধুমালতী’, সৈয়দ আলাওলের ‘পদ্মাবতী’ প্রভৃতি রোমান্টিক প্রণয়কাব্যের কথা বলা যায়। ‘চন্দ্রাবতী’ কাব্যটিও দেশীয় উপাদান তথা রূপকথা কাহিনি প্রধান। রাজকুমার বীরভানকে নিয়ে বন্ধু সুতের সরন্দীপের রাজকন্যা চন্দ্রাবতীর উদ্দেশ্যে যাত্রাপথে সমুদ্র নাগের কবলে পড়েন এবং অর্ধচন্দ্র বাণ, গরুড় বাণে নাগদের হত্যা করে মণির অধিকারী হওয়া রূপকথার মতোই চমকপ্রদ কাহিনি। রাক্ষসদের সঙ্গে বীরভানের যুদ্ধে শত শত রাক্ষস বধ, ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমিকে অজগর সাপের অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে অজাগরকে হত্যা করা ঘটনার চরিত্রগুলো রূপকথার চরিত্র। বীরভান বন্ধু সুতের রাক্ষসদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ কিংবা জঙ্গম

রাজকন্যা পঞ্চমের মন্ত্রবলে সুতকে তোতা পাখিতে রূপান্তর এবং রাত্রে মানব রূপ দিয়ে দৈহিক কেলি। মানব বাক্‌শক্তি সম্পন্ন তোতার অলৌকিক ঘটনা রূপকথাধর্মী।

- **সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাতাবরণ :**

মানুষের ভাব ভাবনা কল্পনা দেশ কাল ধর্ম নিরপেক্ষ নয়। তুর্কিরা বঙ্গদেশে আসার আগে পাল ও সেন আমলের বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যবাদ থেকে দেশীয় সংস্কৃতি উদ্ভুত হয়েছিল। তুর্কি আক্রমণের উত্তরকালে মুসলমান শাসনামলে বঙ্গীয় লেখকগণ বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা করলেও পূর্বজ দেশীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারেননি। তাছাড়া মুসলমান কবিগণ সাহিত্য চর্চায় নির্দিষ্ট ধর্মীয় বেড়াজালে বদ্ধ হয়ে থাকেননি, তাঁদের রচনায় হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির মেলবন্ধন দৃশ্যমান। 'চন্দ্রাবতী' কাব্যেও হিন্দু সমাজ সংস্কৃতি পরিস্ফুট। চন্দ্রাবতী বিবাহের মধ্যদিয়ে সামাজিক স্বীকৃতিতে কান্তকে পাবার জন্য—'আরাধএ দেব ত্রিলোচন'[২] কাব্যে শিবের প্রসঙ্গ কবি একাধিকবার এনেছেন। রাজকুমার বীরভান ও রাজকন্যা চন্দ্রাবতীর মধ্যে মিলন হবেই, কারণ তারা সেই জন্যই শিবের বরে মর্ত্যে এসেছেন এবং এই মিলনের অন্তরায় নানা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নায়ককে সহায়তা করবেন মহেশ্বর। কবির বক্তব্য—

"শিব-বরে দুইজন মর্ত্যেত আসিছে।
তোমার সুতের সহাএ আছে মহেশ্বর।"[৩]

এপ্রসঙ্গে মঙ্গলকাব্যের কথা মনে পড়ে যায়। সেখানে শাপভ্রষ্ট দেবতারা মর্ত্যে এসেছিলেন। এখানে বীরভান ও চন্দ্রাবতী শিবের বরে মর্ত্যে জন্মেছেন এবং বিপদ সময়ে মহেশ্বর তাঁদের ত্রাণ করেছেন। কাব্যের পরবর্তীতে শিব নায়কের বিপদ উদ্ধারে সহায়ক ভূমিকা পালন করছেন। যক্ষের কবল থেকে মণিপুরি পাত্রকন্যাকে উদ্ধার করে মণিপুরে নিয়ে যাবার সময় বীরভান রাক্ষসের কবলে পড়েন, যুদ্ধ বাধে রাক্ষসদের সঙ্গে। রাক্ষসদের কাছে পরাজিত হয়ে মৃত্যু আসন্ন চিন্তায় শঙ্কিত এমতবস্থায় স্বয়ং মহেশ্বর ত্রাণকর্তা রূপে অবতীর্ণ হন—

"শিব বোলে শুনহ কুমার বীরভান
ধনুত জুড়িয়া মার বিষ্ণুচক্রবাণ।
এ বুলিয়া চক্র সান্ধা মন্ত্র শিখাইল...
এহি মন্ত্র পড়িয়া লইল চক্রবাণ
রাক্ষস উপরে মারে করিয়া সন্ধান।
সেই শরঘাতে রাক্ষস সব কাটি পাড়ে
মহামন্ত্র নাদ ছাড়ি ভূমি তলে গড়ে।"[৪]

শিবের সহয়তায় বীরভান অবশেষে রাক্ষসদের পরাজিত করেন। ধার্মিকের আদর্শরূপে কবি উল্লেখ করেছেন ব্যাস ও যুধিষ্ঠিরকে। রাজা চন্দ্রসেনের ধার্মিক গুণের পরিচয় প্রসঙ্গে কবি ব্যতিরেক অলংকারের প্রয়োগে বলেছেন—

"ধর্মবাদী জিতি নিত্য ব্যাস যুধিষ্ঠীর।"[৫]

ধার্মিকগুণের পরিচয় জানাতে কবি যেমন ব্যাস, যুধিষ্ঠিরের উপমা ব্যবহার করেছেন। তেমনি স্বর্গের দেবতা ইন্দ্রের প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন কাহিনির বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে। কখনও শাস্ত্রগুণের পরিচয় প্রসঙ্গে, কখনও রূপের সুখ্যাতি করতে ইন্দ্রের প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন। যেমন—

(১) "সর্ব শাস্ত্রে বিশারদ ইন্দ্রের সমান।"[৬]

(২) "মহা দীপ্তিমান রূপ অধিক উলিল
স্বর্গ হোন্তে ইন্দ্র যেন ভূমিত নামিল।"[৭]

- **আঙ্গিক প্রকরণ :**

মাগন ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট আঙ্গিক রূপে প্রচলিত চৌতিশার ব্যবহার করেছেন। অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যের চৌতিশার ক্ষেত্রে দেখা যায় বিপন্ন মুহূর্তে দেবতার স্তব। প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে হিন্দু কবি রচিত চৌতিশা পাওয়া যায় এমন নয়, মুসলমান কবি কর্তৃক রচিত কাব্যেও চৌতিশার ব্যবহার রয়েছে। দৌলত উজির বাহরাম খানের 'লায়লী-মজনু' কাব্যে লায়লীর চৌতিশা, সৈয়দ সুলতানের 'জ্ঞানচৌতিশা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মুসলমান কবি রচিত চৌতিশার বিষয় স্বতন্ত্র। যেমন ফয়জুল্লাহের 'জয়নবের চৌতিশা'য় জয়নবের বিলাপ বর্ণিত, 'লায়লীর চৌতিশায়' লায়লীর বিলাপ বর্ণিত। এই কাব্যেও চন্দ্রাবতীর বিরহে নায়ক বীরভানের বিলাপ চৌতিশার প্রকরণে কবি বর্ণনা করেছেন।

'চৌতিশা' শব্দটি এসেছে চৌত্রিশ সংখ্যাবাচী শব্দ থেকে। 'ক' থেকে 'ক্ষ' পর্যন্ত চৌত্রিশটি বর্ণকে শব্দের বা চরণের আদ্যাক্ষর হিসাবে ধরে রচনা করা হয়। তবে ৩০ টি বা ৫০ টি অক্ষর নিয়েও 'চৌতিশা' রচিত হতে দেখা যায়। 'চন্দ্রাবতী' পুথির পাতা খণ্ডিত হবার কারণে মাগন ঠাকুর ক'টি বর্ণ ব্যবহার করে রচনা করেছেন তার নির্দিষ্ট সংখ্যা জানা যায় না। প্রাপ্ত চৌতিশা 'ছ' বর্ণ দিয়ে শুরু হয়ে 'ক্ষ' যুক্ত বর্ণে শেষ হয়েছে। যেমন—

ছ— "ছন্ন বুদ্ধি হই আক্ষি কথেক ফিরিমু
ছরন্দ্বীপ নগরেতে কেমতে যাইমু।"[৮]

ক্ষ— "ক্ষেমা কর বীরভান না কর কান্দন
ক্ষেমাত সদয় প্রভু কহিল মাগন।"[৯]

কবি সম্ভাবত 'ক' বর্ণ দিয়েই শুরু করেছিলেন। এখানে প্রতিটি বাক্যের আদিতে ব্যঞ্জনবর্ণ ক্রমান্বয়ে ব্যবহার করে পয়ার ছন্দে রচনা করেছেন। সমালোচক ওয়াকিল আহমেদ চৌতিশা প্রসঙ্গে বলেছেন—"কোরেশী মাগন ঠাকুরের চৌতিশা রচনাতেও দুর্বলতা ও স্থূলতা দেখা যায়।"[১০]

কাব্যের আঙ্গিক রচনায় দীর্ঘ ত্রিপদী, বিবৃতিধর্মী পয়ার, অর্ধছন্দ, খর্বছন্দ ব্যবহার করেছেন। ৮+৮+১০ মাত্রার দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দের যথাযথ ব্যবহারেও কবির নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—

"মালিনীর ঘরে আসি | রহিছিল পূর্ণশশী
শাপে ভ্রষ্ট না হৈল স্মরণ I ৮+৮+১০
অশক্য পাতকী হৈয়া | সাগরে ডুবিব গিয়া
বিষ খাই তেজিব জীবন।"[১১]I ৮+৮+১০

ছন্দের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকার অলংকারের (শব্দালংকার ও অর্থালংকার) প্রয়োগও কবি প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে। নিম্নে কয়েকটি অলংকারের প্রয়োগ দেখা হল—

উপমা— "সর্ব শাস্ত্রে বিশারদ ইন্দ্রের সমান।"[১২]
রূপক— "দেখি উথলিল ঢেউ বিরহ সাগর।"[১৩]
উৎপ্রেক্ষা— "সিঙ্গল দ্বীপেতে যে কুমার বীরভান
নিশি অন্ধকার যেন ভানু দীপ্তিমান।"[১৪]

ছন্দ অলংকার প্রয়োগে কবির নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া গেলেও সামগ্রিকভাবে "প্রতিভার সংস্পর্শে যে রচনা অনন্য ও আস্বাদ্য হয়ে ওঠে চন্দ্রাবতীর সেরূপ চমকপ্রদ, মোহময়, কালোত্তীর্ণ অংশ ক্বচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি কাব্যিক উপাদানের যে শিল্প প্রতিমা গড়েছেন তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি।"[১৫]

উত্তরটীকা

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ (সম্পা.), ফেব্রুয়ারি ২০০২, 'পদ্মাবতী' (দ্বিতীয় খণ্ড), আলাওল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃ-১৭
২. শরীফ, আহমদ (সম্পা.), ২০০৭, 'চন্দ্রাবতী' কোরেশী মাগন ঠাকুর, ঢাকা, সূচীপত্র, পৃ-৩
৩. তদেব, পৃ-৮
৪. তদেব, পৃ-২২-২৩
৫. তদেব, পৃ-৭
৬. তদেব, পৃ-৭
৭. তদেব, পৃ-১৫
৮. তদেব, পৃ-২৩
৯. তদেব, পৃ-২৬
১০. আহমদ, ওয়াকিল, ১৯৭০, 'বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান', ঢাকা, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, পৃ-২৮১
১১. শরীফ, আহমদ (সম্পা.), পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-৪৩
১২. তদেব, পৃ-৭

১৩. তদেব, পৃ-৩

১৪. তদেব, পৃ-১৪

১৫. আহমদ, ওয়াকিল, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-২৭৮

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

১. শরীফ, আহমদ (সম্পা.), ২০০৭, 'চন্দ্রাবতী', কোরেশী মাগন ঠাকুর, ঢাকা, সূচীপত্র।

সহায়ক গ্রন্থ

১. আহমদ, ওয়াকিল, ১৯৭০, 'বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান', ঢাকা, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি।

২. ইসলাম, আজহার, আষাঢ় ১৩৯৯, 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি', ঢাকা, বাংলা একাডেমী।

৩. নস্কর, সনৎকুমার, বইমেলা ২০২২, 'প্রাগাধুনিক কাব্য প্রকরণ : উৎপত্তি স্বরূপ বিবর্তন', কলকাতা, পাড়ি।

৪. হক, মুহম্মদ এনামুল ও করিম, আবদুল, ১৯৩৫, 'আরকান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য (খ্রীষ্টীয় ১৬০০-১৭০০ অব্দ)', কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

‘ময়মনসিংহ-গীতিকা’য় মৃত্যুর অনুষঙ্গ : সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং সহাবস্থানের দ্বন্দ্ব

সুব্রত পোদ্দার
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ জীব। গোষ্ঠীবদ্ধভাবেই সমাজে একসঙ্গে বসবাস করে। কিন্তু সেই সমাজের বুকেই সৃষ্ঠ এবং ক্রমপুষ্ট অন্ধবিশ্বাস ও গোঁড়ামির কারণে পরস্পরের মধ্যে ধীরে ধীরে ব্যাধির মতো গজিয়ে ওঠে ভেদাভেদ। এবং জীবনধারণের অসহনীয় উলটপুরাণ। বারবার বাধাপ্রাপ্ত হয় মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপন। প্রাচীন ‘ময়মনসিংহ-গীতিকা’র প্রায় প্রতিটি পালাগানে ফুটে উঠেছে তৎকালীন সময়ে সমাজে প্রচলিত জাতিভেদ, ধর্মবিদ্বেষের মতো নানান অভিশাপ। সাধারণ মানুষের অসহায় আত্মাহুতি। মহুয়া, মলুয়া, জয়ানন্দ প্রত্যেকেই কীভাবে তদানীন্তন সমাজ কর্তৃক অত্যাচারিত হয়ে, বিপর্যস্ত হয়ে, সর্বশ্রান্ত হয়ে, জীবনযুদ্ধের ময়দান ছেড়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিল—সেই দিকটি পরিস্ফুট করার চেষ্টা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।
সূচক শব্দ : মানবপ্রেম, গোঁড়ামি, জাতিভেদ, ধর্মবিদ্বেষ, সামাজিক চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র, আত্মহত্যা, প্রতিবাদ।

মূল আলোচনা :

যে শরীর ধারণ করে জন্মলাভ করে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। জন্মের মাধ্যমে যে জীবনের সূচনা হয়, মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই হয় তার পরিপূর্ণ মুক্তি। সঠিকভাবে জীবনকে অনুভব করতে হলে মৃত্যুর প্রেক্ষিতে তাকে অনুধাবন করা উচিত। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থেও আমরা লক্ষ করি নানান চরিত্রের মৃত্যু। এই মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সমাজ জীবনের পরিচয় যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনই ফুটে উঠেছে এক স্বতন্ত্র মানবিক ভাবনার পরিচয়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যধারার একটি বিশিষ্ট দিক হল ‘ময়মনসিংহ-গীতিকা’। যেখানে পালাগানগুলির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে মানুষের আচার-আচরণ, চিন্তা-চেতনা, সাংস্কৃতিক রীতি-নীতি, জাতিগত বিভেদ, ধর্মীয় বিদ্বেষ ইত্যাদি নানান দিক-সহ তৎকালীন সমাজ প্রেক্ষাপটটি। ‘ময়মনসিংহ-গীতিকা’-র পালাগানগুলিতে যে মৃত্যুপ্রসঙ্গ পাওয়া যায়, তাকে কেন্দ্র করে লক্ষ করা যায় অন্য এক ভাবনার জগৎ। জন্মের পর স্বাভাবিক নিয়মে প্রতিটি জীবেরই মৃত্যু অবস্বম্ভাবী—কারণ কোনও জীবই অমর নয়। তবে ‘ময়মনসিংহ-গীতিকা’-র কয়েকটি চরিত্রের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে এক স্বতন্ত্র ভাবনার পরিচয় ফুটে উঠেছে। যা আজও অমর হয়ে রয়েছে পাঠকের মনে।

প্রাচীনকালে গুহাবাসী মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধভাবে এক সঙ্গে বসবাস করত, সেখান থেকেই ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়েছে সভ্য সমাজ। প্রতিটি সমাজেরই একজন করে মোড়ল বা সমাজপতি থাকত। যে নির্ধারণ করত সেই সমাজের নানান রকম আচার-আচরণ। যা মেনে চলত সমাজবাসীরা। গড়ে উঠত বসবাসের উপযোগী সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশ। 'ময়মনসিংহ-গীতিকা'-র পালাগানগুলিতে সাধারণ নর-নারীর প্রেমের মধ্যে দিয়ে দেখা যায়—সমাজবহির্ভূত প্রেম, জাতপাত, ধর্মবিদ্বেষ ইত্যাদির মতো কয়েকটি বিষয়। যা মেনে নেয়নি তৎকালীন সমাজ। যার ফলে সমাজবাসীদের মধ্যে সৃষ্টি হয় বিভেদের প্রাচীর। এই সকল সামাজিক ভেদাভেদের কবলে পড়ে অনেক সময় সেই প্রেমিকযুগলের মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে। তবে নীরবে মেনে না নিয়ে, আত্মহত্যার মধ্যে দিয়ে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে তারা। 'না' কে 'না' বলেছে জীবনের বিনিময়ে। তাদের মধ্যে ফুটে উঠেছে এক প্রতিবাদী সত্তা।

'ময়মনসিংহ-গীতিকা'-র প্রথম পালাগান 'মহুয়া' পালা। এই পালাগানের মূল চরিত্র নদের চাঁদ ও মহুয়া। মহুয়া জন্মসূত্রে একজন ব্রাহ্মণ কন্যা। হুমড়া বেদে দলের সর্দার বা প্রধান ব্যক্তি। যে চুরি করে নিয়ে যায় ছয় মাস বয়সী মহুয়াকে। তারপর থেকেই মহুয়া বেড়ে ওঠে বেদে সমাজের মধ্যে। ধীরে ধীরে রপ্ত করে নিতে থাকে বেদে দলের নানান খেলা। একসময় সে খেলা দেখানোয় হয়ে ওঠে পারদর্শী। হয়ে ওঠে একজন বেদেনী। হুমড়ার নির্দেশে বেদের দল খেলা দেখানোর জন্য উপস্থিত হয় নদের চাঁদ-এর গ্রাম বামনকান্দায়। ঘটনাক্রমে নদের চাঁদ ও মহুয়ার মধ্যে স্থাপিত হয় প্রেমের সম্পর্ক। মহুয়া তার প্রেম ও প্রেমিক সম্পর্কে বাস্তববাদী। প্রেমের জন্য বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জনদের ছেড়ে দেশান্তরি হতেও সে রাজি। যদি তাতেও না হয় তবে আত্মহত্যা করে প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত—

"বন্ধুরে লইয়া অইবাম দেশান্তরি।
বিষ খাইয়া মরবাম কিম্বা গলায় দিয়াম দড়ি।।"[১]

মহুয়া ও নদের চাঁদ একে অপরের প্রতি প্রেমাসক্ত হয়েছে—এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক কথা। কিন্তু মহুয়ার মনে প্রথম থেকেই কেন জেগে উঠল তাদের প্রেম নিয়ে এই সংশয়? কেন তার মনে জেগে উঠল মৃত্যুভাবনা? শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাদের প্রেমের পরিসমাপ্তি ঘটে। হুমড়া বাইদ্যার নেতৃত্বাধীন বেদে সমাজ মেনে নিল না নদের চাঁদ-কে। কিন্তু কেন?

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় হিন্দু ধর্মাবলম্বী সমাজ ছোট ছোট জাতিগোষ্টিতে বিভক্ত ছিল। বর্তমানেও তাই। কোন জাতি ছোট কোন জাতি বড়ো—এই নিয়ে জাতিতে জাতিতে বিভেদ প্রাচীনকাল থেকেই ছিল। বর্তমান সময়েও যে নেই তাও বলা যায় না। প্রত্যেক জাতির সাংস্কৃতিক রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, বিবাহাদি শুধুমাত্র সেই জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। এমন সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বেদে সমাজ তাদের এক নারীর

সঙ্গে অন্য জাতির পুরুষের মিলনকে মেনে নিতে পারেনি। তাই দেখা যায়, পলাতক প্রেমিক যুগলকে খুঁজে বের করে বেদে সর্দার মহুয়াকে নির্দেশ দিয়েছে—

“আমার পালক পুত্রু সুজন খেলোয়ার।
বিয়া তারে কর কন্যা চল মোদের সাথ।।”[২]

অর্থাৎ নদের চাঁদ-কে ত্যাগ করে মহুয়া বেদে সমাজের সুজন খেলয়ার-কে বিয়ে করে তাদের সঙ্গেই থেকে যাক। বেদে সমাজ চায় না, তাদের সমাজ ত্যাগ করে মহুয়া অন্য কোনও সমাজের পুরুষের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হোক। অন্য জাতির সঙ্গে বিবাহকে বেদে সমাজ মানতে নারাজ। এ বিষয়ে তারা এতটাই দৃঢ়বদ্ধ যে, অন্য জাতির পুরুষকে হত্যা করে নিজ জাতির কন্যাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তাই মহুয়া শেষপর্যন্ত আত্মহত্যা করে নিজের জীবনের ইতি ঘোষণা করে।

প্রত্যেক পিতাই চায় তার কন্যা সুখী হোক। স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করুক। মহুয়াকে ছোটবেলায় চুরি করে এনে লালনপালন করে মানুষ করে হুমড়া বাইদ্যা। হুমড়া মহুয়ার পিতার মতোই। মহুয়ার প্রেমিক নদের চাঁদ জমিদার পরিবারের সন্তান। আর্থিকভাবেও বেশ স্বচ্ছল। সুতরাং তার সঙ্গে মহুয়ার বিবাহ হলে, মহুয়া যে সুখে থাকবে তা অনুমান করা যায়। তবুও কেন হুমড়া বাইদ্যা তথা বেদে সমাজ মহুয়ার স্বামী হিসাবে নদের চাঁদ-কে মেনে নিতে পারল না? এখানেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে হিন্দু সমাজ ও তার জাতিভেদ প্রথা।

শুধু জাতিগত বিভেদ নয়, ধর্মীয় বিদ্বেষও লক্ষ করা যায় এই গীতিকা সাহিত্যের কয়েকটি পালাগানের মধ্যে দিয়ে। ‘মলুয়া’ পালায় পাই, সমাজের বিচার ও শাসন ক্ষমতার অধিকারী এক কাজীর পরিচয়। সে অত্যন্ত দুরাচারী ও লম্পট স্বভাবসম্পন্ন। মলুয়ার রূপে সে মুগ্ধ। তাকে পাওয়ার জন্য শুরু করে নানান ছল ও চক্রান্ত। ঘটনাক্রমে মলুয়া পৌঁছয় মুসলমান দেওয়ান সাহেবের হাউলিতে। যদিও অক্ষত অবস্থায় শেষপর্যন্ত মলুয়া তার ভাইদের সহায়তায় দেওয়ান সাহেবের হাউলি থেকে উদ্ধার পায়।

মলুয়া তিন মাস বন্দি ছিল দেওয়ান সাহেবের হাউলিতে। তাই স্বাভাবিকভাবেই জ্ঞাতিবর্গের কাছ থেকে আখ্যা পায় অসতী বলে। তার স্বামী বিনোদের মামা জাতিতে ছিল কুলীন। সে মলুয়া-র রান্না করা ভাত খেতে অস্বীকার করে। কারন মুসলমানের ঘরে বন্দি থাকায় সমাজ কর্তৃক মলুয়ার জাতিনাশ হয়েছে। প্রায়শ্চিত্ত করে মলুয়াকে জাতিতে ওঠার নির্দেশ দেয় সে।

মুসলমানের ঘরে যাওয়ায় সমাজের কাছে সে অসতী। সমাজের বিচারে জাতিনাশ হয় তার। তাকে ফিরিয়ে নিতে চায়নি তার সমাজ। শুধু তাই নয়, যে তাকে ঘরে তুলবে তারও জাতিনাশ হবে—সমাজপতিদের এমনই বিধান। তাই স্বামীর প্রতি, সমাজের প্রতি প্রবল অভিমান নিয়ে ভাঙা নৌকায় চেপে নদীতে ভেসে যায় মলুয়া। হিন্দু সমাজের এই জাতপাতের বিরুদ্ধে, সমাজ প্রধানদের বিরুদ্ধে মলুয়ার প্রতিবাদী মানবসত্তাটি প্রবলভাবে ফুটে উঠেছে।

চন্দ্রাবতী ও জয়ানন্দের প্রেমকাহিনির মধ্যেও পাওয়া যায় বাঙালির ধর্মবিদ্বেষের কথা। চন্দ্রাবতী ও জয়ানন্দের পরিচয় বাল্যকাল থেকেই। পরিণত বয়সে দু'জনের মধ্যে গড়ে ওঠে প্রেমের সম্পর্ক। তাদের সম্পর্ক গড়িয়ে যায় বিবাহের দিকে। কিন্তু একদিন নদীর ঘাটে এক মুসলমান রমণীর রূপে মুগ্ধ হয়ে ওই রমণীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করে চলে যায় জয়ানন্দ। এই খবর শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে পরে চন্দ্রাবতীর পিতা—

পুরীতে জুড়িয়া উঠে কান্দনের রোল।
জাতিনাশ দেখ্যা ঠাকুর হইল উতরুল।।[৩]

মুসলমান রমণীর সঙ্গে জয়ানন্দের গৃহত্যাগের কথা শুনে চন্দ্রাবতীর পিতাকে প্রতিবেশীদের বলতে শোনা যায়—

অনাচার কৈল জামাই অতি দুরাচার।
যবতী করিয়া বিয়া জাতি কৈল মার।।[৪]

বিধর্মী নারীর সঙ্গে প্রণয় ও তার সঙ্গে গৃহত্যাগ করায় সমাজ কর্তৃক জয়ানন্দের জাতিনাশের প্রসঙ্গ এসেছে। জাতিতে সে ছিল ব্রাহ্মণ। কিন্তু এক মুসলমান তথা যবনী নারীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে সামাজিক রীতি-নীতির বিচারে জয়ানন্দের জাতিনাশ হয়েছে। হিন্দু ধর্মে বিশেষত উচ্চবর্ণীয় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মানুষেরা ছিল অন্ধ আচারনিষ্ঠ। বিধর্মী জাতি বা নিম্নবর্ণীয়দের ছোঁয়া জল পান করা তো দূর তাদের ছায়াও মাড়াত না। এই অস্পৃশ্যতা এতটাই প্রবলভাবে প্রচলিত ছিল যে, স্বাধীন ভারতে সংবিধান পাস করে তার বিলোপ ঘটানোর প্রচেষ্টা করা হয়। প্রাচীন ভারতবর্ষের বঙ্গদেশে তথা এই ময়মনসিংহ অঞ্চলে অস্পৃশ্যতা কতখানি প্রবল ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় এই পালাগানে। সমাজ কর্তৃক জয়ানন্দের জাতিনাশের পরিণতি গড়িয়ে গেছে মৃত্যু পর্যন্ত। জয়ানন্দ ফিরে এসে বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করলেও চন্দ্রাবতীর পিতা বা তাদের ব্রাহ্মণ সমাজ কেউই তাকে মেনে নেয়নি। তাদের ধারনা যবনী নারীর সংস্পর্শে জয়ানন্দ অপবিত্র হয়েছে। সমাজবাসী কর্তৃক জয়ানন্দকে এভাবে সমাজ থেকে বহিস্কারের কারণে সে আর ফিরতে পারেনি চন্দ্রাবতীর কাছে। শেষ পর্যন্ত নদীর জলে ডুবে আত্মহত্যা করে প্রাণ বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়।

'কঙ্ক ও লীলা' পালাগাণেও কঙ্কের জীবনকে কেন্দ্র করে লক্ষ করা যায় ব্রাহ্মণ সমাজের নানান ষড়যন্ত্র ও ছলচাতুরি। কঙ্কের জন্ম এক ব্রাহ্মণ পরিবারে। জন্মের পর কিছুদিনের মধ্যেই তার পিতামাতার মৃত্যু হয়। অনাথ শিশু কঙ্ককে তার সমাজের কেউই কাছে টেনে নেয়নি। উপরন্তু অপবাদ দেয় 'খাকুরা' বা মানুষ খেকো নামে। পরবর্তীকালে এক চণ্ডাল দম্পতির আশ্রয়লাভ করে সে। তাদের মৃত্যুর পর তার আশ্রয় হয় গর্গ মুনির গৃহে। সেখানে থেকে লেখাপড়া করত এবং গোরু চরাত। মুসলমান ফকিরের আগমনে কঙ্ক নিজের মুক্ত বুদ্ধিতে সেই ফকিরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। রচনা করে 'সত্য পীরের পাঁচালী'। কঙ্কের এই প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে গর্গ মুনি তাকে জাতিতে তুলতে চাইলেও ব্রাহ্মণ সমাজ তা মেনে নেয়নি। কারণ ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হয়েও

সে চণ্ডালের অন্ন গ্রহণ করেছে। তারপর আবার মুসলমান ফকিরের সংস্পর্শে এসেছে। ব্রাহ্মণবাদী সমাজের এই বিচার সত্যই হাস্যকর। পিতামাতার মৃত্যুর পর এই সমাজের কেউই শিশু কঙ্ককে আশ্রয় না দিয়ে দূরে ঠেলে দিয়েছে। এক চণ্ডাল দম্পতির মহানুভাবতায় কঙ্ক প্রাণে বাঁচলেও—ব্রাহ্মণ সমাজ আবার সেটা মানতে নারাজ। শুধু তাই নয়, কঙ্কের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণগণ শুরু করে ষড়যন্ত্র। রটায় মিথ্যা বদনাম। ব্রাহ্মণগণের এই ষড়যন্ত্রে ভ্রান্ত বিশ্বাসের সৃষ্টি হয় গর্গ মুনির মনে। যার ফলস্বরূপ গর্গ মুনি লীলা ও কঙ্কের প্রাণনাশের সঙ্কল্প করে।

হিন্দু হয়েও কঙ্ক মুসলমান ফকিরের কাছে দীক্ষা নিয়েছে। তাই পণ্ডিত সমাজ তাকে ঘরে ফিরিয়ে নিতে নারাজ। নানান ষড়যন্ত্রে কঙ্ককে বারবার বিধ্বস্ত করেছে সমাজ। এভাবেই সমাজ শক্তির এক প্রতিশোধমুখর রূপ এখানে ফুটে উঠেছে।

পালাগুলোতে দেখেছি নরনারীর প্রেম। ভালোবাসার জন্য তারা সহ্য করেছে অকথ্য দুঃখ ও যন্ত্রণা। মলুয়া ভালবেসেছে অন্য জাতির পুরুষকে। তাই বেদের দল মেনে নেয়নি। এখানে এসে যায় সমাজের সাংস্কৃতিক রীতি-নীতি ও জাতপাতের বৈষম্যের দিকটি। মলুয়াকে শেষ পর্যন্ত ভাঙা নৌকায় চেপে ভেসে যেতে হয়েছে নদীতে। জয়ানন্দ ফিরে আসার জন্য বারবার জানিয়েছে কাতর অনুরোধ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেও নদীতে ডুবে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। কঙ্কের জন্ম ব্রাহ্মণ পরিবারে। জন্মের পর পিতামাতার মৃত্যু হওয়ায় সমাজ তাকে দিয়েছে অপবাদ। ব্রাহ্মণ সমাজ যেখানে তাকে অপবাদ দিয়ে দূরে সরিয়ে দিতে চেয়েছে, সেখানে একজন চণ্ডাল কর্তৃক তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে সন্তান স্নেহে পালন করতে দেখা যায়। এখানে সমাজের নিয়ম রীতিতে আবদ্ধ ভদ্র জাতির তুলনায় ভদ্রেতর জাতির মানবিক দিকটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মুক্ত চেতনার অধিকারী কঙ্ক একজন মুসলমান ফকিরের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণে কুণ্ঠাবোধ করেনি। তবে ব্রাহ্মণ সমাজ তা মেনে নেয়নি প্রচলিত আচার বোধের কারণে। সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতটি তথা হিন্দু আদর্শের অনুসারী একটি স্বতন্ত্র সমাজরূপের পরিচয় বিশেষভাবে উপস্থাপিত হয়েছে পালাগুলোতে। যেখানে দেখা যায় সামাজিক অন্ধবিশ্বাস ও গোঁড়ামির কাছে মানবিকতার আশ্চর্য পরাজয়। প্রচলিত আদর্শ, রীতি-নীতি ইত্যাদি নানান সামাজিক আচার-বিচারের কারণে মানুষে মানুষে দেখা যায় নানান বিভেদ। যার ফলে বাধাপ্রাপ্ত হয় সাধারণ মানুষের সুস্থ এবং স্বাভাবিক জীবনযাপন। তবে শেষ পর্যন্ত সমস্ত সামাজিক আচার-বিচারের ঊর্ধ্বে গিয়ে জয়ী হয়ে ওঠে মানব প্রেম। জয়ী হয়ে ওঠে সাধারণ মানুষ। তাই ‘ময়মনসিংহ-গীতিকা’য় শেষপর্যন্ত সমকালীন সমাজ-দ্বন্দ্বকে ছাপিয়ে গিয়ে চিরন্তন মানব-প্রেম ও মুক্তির জয়গান বাজতে শুনি।

তথ্যসূত্র:

১. দীনেশচন্দ্র সেন(সঙ্কলিত): "মৈমনসিংহ-গীতিকা", কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৫৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১৩
২. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৩৯
৩. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১১২
৪. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১১৩

রাজপাট ধর্মপাট : বর্তমান সময়ের নিরিখে ষোড়শ শতকের বাংলার ধর্ম, রাজনীতি ও চৈতন্যদেবের অবস্থান

অরিজিৎ পাল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: বর্তমান সময়ে যে সাহিত্যিকেরা অনবরত বঙ্গদেশের ও ভারতবর্ষের প্রাগাধুনিক সময়কালের ইতিহাস নিয়ে নিরন্তর চর্চা করে চলেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম অভিজিৎ সেন (১৯৪৫-)। মধ্যযুগের বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস তথা ঐতিহাসিক ঘটনাবলী অভিজিৎ সেনের নিরলস সাধনার অন্যতম বিষয় এবং এই সময়কালটিকে অবলম্বন করেই তিনি রচনা করেছেন 'রাজপাট ধর্মপাট' (২০০৮) উপন্যাসটি, যে উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছেন বাংলা তথা ভারতবর্ষের সমাজসংস্কার আন্দোলনের অন্যতম নেতৃত্ব চৈতন্যদেব। সত্তর দশকের পরবর্তী সময়কাল থেকেই বাংলা ঐতিহাসিক তথা ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে একটি পটপরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই সময় মূলত উত্তর আধুনিকতাবাদী চেতনার চর্চার ফলে ইতিহাসবিদদের অতীতকাল তথা ইতিহাসকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিটিই অনেকটা পরিবর্তিত হয়েছিল। চৈতন্যদেব সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাও এই সময় থেকে পরিবর্তিত হয়েছিল। কথাসাহিত্যিক অভিজিৎ সেনও 'রাজপাট ধর্মপাট' উপন্যাসে ইতিহাস তথা ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর নবনির্মাণ করেছেন। পৃথিবীর যে কোনও স্থানেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম তার লুক্কায়িত দাঁতনখ বার করে মানুষের স্বাভাবিক যাপনকে ব্যাহত করেছে, ধর্ম হয়ে উঠেছে 'পাওয়ার-হাউস'। এই উপন্যাসটিও তার ব্যতিক্রম নয়। চৈতন্যদেব তাঁর ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে হিন্দুধর্মের প্রচলিত রীতিনীতির সংস্কার ঘটিয়ে শাসকের ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে শাসিতের ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী হিন্দুধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। রাজপাটের অভিপ্রায় তাঁর কোনওদিনও ছিল না। কিন্তু সময় ও পরিস্থিতি চৈতন্যদেবকে তাঁর অজান্তেই করে তুলেছিল 'পিপল'স লিডার'। কিন্তু চৈতন্যদেব তাঁর অসামান্য বুদ্ধিদীপ্ততার জেরে রাজনৈতিক ডামাডোল থেকে সচেতনভাবে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন, কারণ তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পারস্পরিক ধর্মীয় উগ্রতাকে দূরে সরিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পথ প্রশস্ত করা। আর এভাবেই চৈতন্যদেব হয়ে ওঠেন এক আধুনিক চিন্তাধারার মানুষ, যে ব্যক্তির মধ্যে ষোড়শ শতকেই যুদ্ধবিরোধী ও অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার মেলবন্ধন ঘটেছিল।

সূচক শব্দ: চৈতন্যদেব, অভিজিৎ সেন, রাজপাট, ধর্মপাট, ইতিহাস, ধর্ম, রাজনীতি।

মূল প্রবন্ধ:

বর্তমান সময়ে যে সাহিত্যিকেরা অনবরত বঙ্গদেশের ও ভারতবর্ষের প্রাগাধুনিক সময়কালের ইতিহাস নিয়ে নিরন্তর চর্চা করে চলেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম অভিজিৎ সেন (১৯৪৫-)। আশির দশক থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যচর্চায় অভিজিৎ সেনের নাম স্বমহিমায় বিরাজ করছে। 'বর্গক্ষেত্র' থেকে শুরু করে 'রহু চণ্ডালের হাড়'-তাঁর প্রতিটি উপন্যাসেই ফুটে উঠেছে নিজস্ব দৃষ্টিকোণ এবং একটি দর্শন। অসামান্য রচনানৈপুণ্য ও বর্ণনদক্ষতা তাঁর লেখনীগুলির মূল চালিকাশক্তি। মধ্যযুগের বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস তথা ঐতিহাসিক ঘটনাবলী অভিজিৎ সেনের নিরলস সাধনার অন্যতম বিষয় এবং এই সময়কালটিকে অবলম্বন করেই তিনি রচনা করেছেন 'রাজপাট ধর্মপাট' (২০০৮) উপন্যাসটি, যে উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছেন বাংলা তথা ভারতবর্ষের সমাজসংস্কার আন্দোলনের অন্যতম নেতৃত্ব চৈতন্যদেব।

সত্তর দশকের পরবর্তী সময়কাল থেকেই বাংলা ঐতিহাসিক তথা ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে একটি পটপরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই সময় মূলত উত্তর আধুনিকতাবাদী চেতনার চর্চার ফলে ইতিহাসবিদদের অতীতকাল তথা ইতিহাসকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিটিই অনেকটা পরিবর্তিত হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত যে ইতিহাস, সেটিকেই ভিন্নভাবে পৃথক পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা শুরু হয়েছিল এই সময় থেকে। ইতিহাসবিদদের পাশাপাশি ঔপন্যাসিকরাও এই প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন না। দেশের অতীতকে পক্ষপাতিত্বহীনভাবে বিচার করার প্রয়াসও এই সময় থেকে শুরু হয়েছিল। চৈতন্যদেব সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাও এই সময় থেকে পরিবর্তিত হয়েছিল। চৈতন্যদেবের দেবত্ব বা তাঁকে কেবলমাত্র 'আধ্যাত্মিক অবতার' বা 'ভক্তি আন্দোলনের পুরোধা' না করে রেখে তাঁকে ষোড়শ শতকের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব হিসাবে পর্যবেক্ষণ করার সূচনা হল, কালকূট রচিত 'জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য' (১৯৮৭) উপন্যাসটিকে চৈতন্যদেব সংক্রান্ত এই নতুন চিন্তাধারার পথিকৃৎ বলা যেতে পারে। চৈতন্যদেবকে নিয়ে রচিত বিশ শতক ও একুশ শতকের পরবর্তী উপন্যাসগুলিতেও চৈতন্যদেবকে ব্রাহ্মণ্যশাসিত হিন্দু সমাজের কাঠামো ভঙ্গকারী জাতপাতহীন এক নতুন হিন্দু সমাজের স্রষ্টা ও গণআন্দোলনের নেতৃত্ব হিসাবেই উপস্থাপিত করা হয়েছে, যেখানে চৈতন্যদেব কেবল ধর্মপ্রচারক নন, বড় হয়ে উঠেছে তাঁর মানবিক সত্তা ও গণ আন্দোলনের নেতৃত্বধারী মানসিকতা। কথাসাহিত্যিক অভিজিৎ সেনও 'রাজপাট ধর্মপাট' উপন্যাসে বঙ্গদেশে মধ্যযুগের বিশেষ এক সময়কালের রাজনৈতিক ও ঘটনাবলীকে সমাজে প্রচলিত ঐতিহাসিক ধারণার বিপরীতে দাঁড়িয়ে এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ দিয়ে অবলোকন করেছেন এবং উপন্যাসটিতে তৎকালীন সময়ের ইতিহাস নবনির্মিত হয়েছে।

'রাজপাট ধর্মপাট' উপন্যাসটির কেন্দ্রে রয়েছে ষোড়শ শতাব্দীর বাংলাদেশ। তখন গৌড়ে সুলতান হোসেন শাহের রাজত্বকাল। চৈতন্যদেব ততদিনে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ সেরে নীলাচলে ফিরে সন্ন্যাস গ্রহণের পর দ্বিতীয়বার গৌড়ভ্রমণে এসেছেন। রামকেলি

গ্রামে তিনি পার্ষদসহ বসবাস করতে শুরু করেন। একথা অবশ্যই মনে রাখা জরুরি, চৈতন্যদেব কিন্তু তখন নিতান্ত সামান্য সন্ন্যাসী নন, তিনি সে সময় সবথেকে বড় ধর্মীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, ওড়িশার রাজা প্রতাপরুদ্র সে সময় তাঁর অন্যতম প্রধান ভক্ত। প্রতাপরুদ্রর উদ্যোগেই জাঁকজমকপূর্ণভাবে চৈতন্যদেবের গৌড় যাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল, গ্রামে গ্রামে তাঁর থাকার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।[১] স্বাভাবিকভাবেই গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহ যে এই বিষয়গুলিকে সাদরে অভ্যর্থনা করবেন না, তা বলাই বাহুল্য। আর এই রাজনৈতিক টানাপোড়েনের প্রেক্ষাপটটিই এই উপন্যাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের 'প্রাককথনে' ঔপন্যাসিক অভিজিৎ সেন তাঁর উপন্যাসটি রচনার উদ্দেশ্যের পশ্চাতে একটি অনুমানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' ও অন্যান্য কয়েকটি বৈষ্ণব শাস্ত্রে উল্লিখিত রয়েছে- 'নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ অবশ্য হব রাজা/গন্ধর্বে লিখন আছে ধনুর্ম্ময় প্রজা' এরূপ প্রবাদবাক্য সে সময় মুখে মুখে গোটা বাংলাদেশ জুড়েই ছড়িয়ে পড়েছিল।[২] তুর্কি আক্রমণের পূর্বে যেমন সারা বাংলায় প্রচারিত হয়েছিল যে, শাস্ত্রে উল্লিখিত রয়েছে তুর্কিরা বঙ্গদেশ দখল করবে, এ ঘটনা তারই অনুরূপ।[৩] আর এই ধরনের শাস্ত্রোল্লিখিত প্রবচন খুব দ্রুত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং সেগুলি যুগে যুগে জনমানসে উন্মাদনা বিস্তার করে ও শাসকদের চিন্তার কারণ হয়। ঔপন্যাসিক মনে করেছেন, হয়তো গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হওয়ার এই প্রচারকে কেন্দ্র করে হোসেন শাহের হিন্দু ধর্মাবলম্বী অমাত্যরা আশার আলো দেখতে পেয়েছিল এবং ঠিক সেই সময়ে চৈতন্যদেবের রামকেলি আগমন তাদের আশাকে জোরালো করে তুলেছিল এবং তারা চৈতন্যদেবকেই 'গৌড়ের ব্রাহ্মণরাজা' হিসাবে ভেবে নিয়েছিল। সে সময় 'মাস লিডার' হিসাবেও চৈতন্যদেব এক ও অদ্বিতীয় ছিলেন, একথা বলাই বাহুল্য। আসলে এভাবেই প্রতিটি সময়ে ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির সূক্ষ্ম যোগাযোগ ঘটে যায়। যিনি সেই সময়ের ধর্ম আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা, তাঁকেই রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের নেতৃত্ব হিসাবে উপস্থাপিত করে হোসেন শাহের হিন্দু অমাত্যরা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখেছিলেন, বিধর্মী সুলতানদের অত্যাচার ও অবিচারের বিপরীতে 'নিজেদের শাসনব্যবস্থা' গড়ে তুলবেন ভেবেছিলেন। আর এভাবেই বঙ্গদেশের রাজনৈতিক চাপানউতোরের মধ্যস্থলে এসে পড়লেন চৈতন্যদেব, যাঁর রামকেলিতে আগমনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল হোসেন শাহের দুই মন্ত্রী দবীর খাস ও সাকর মল্লিককে (রূপ ও সনাতনকে) বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করে তোলা, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল নয়।

'রাজপাট ধর্মপাট' উপন্যাস অনুসারে, চৈতন্যদেবের রামকেলি আগমনের পশ্চাতে অমর ও সন্তোষ (দবীর খাস ও সাকর মল্লিক) সর্বপ্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। এখন প্রশ্ন জাগে, শ্রীচৈতন্যদেব কি রামকেলিতে এসেছিলেন শুধুমাত্র নিছক ধর্মপ্রচারের জন্য? নাকি তাঁর পৃথক কোনও উদ্দেশ্য ছিল? এ প্রসঙ্গে অনুমান করা যেতে পারে, ধর্মপ্রচারের পাশাপাশি চৈতন্যদেবের অমর ও সন্তোষকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করে রূপ-

সনাতনে রূপান্তরিত করার পশ্চাতে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা ক্রিয়াশীল ছিল এবং তা হল বৈষ্ণব শাস্ত্র রচনা। চৈতন্যদেব অনুভব করেছিলেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূল দর্শন ও তত্ত্বগুলি লিখিত রূপে থাকা যুগোপযোগী এবং সে কারণেই অমর ও সন্তোষকে দীক্ষিত করতে তাঁর রামকেলি আগমন। চৈতন্যদেব যে ধর্মীয় দিক থেকে নব্যপন্থার সন্ধান করছেন, তা পরিস্ফুট হয়, যখন দুই ভাইকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন-
'ধর্ম ও সমাজকে আচার সর্বস্বতার পথ পরিবর্তন করে ভক্তি ও প্রেমের, শুধু ভক্তি ও প্রেমের সম্পর্ককেই গুরুত্ব দিতে হবে।...ধর্মেরও বিবর্তন আছে। ধর্মকে সময়োপযোগী করে নিতে হবে।'[৪]

ধর্ম প্রকৃত অর্থে এক অতি পুরাতন ধারণা, যা ধীরে ধীরে মানবজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গিয়েছে। সময় যত এগিয়েছে, ততই ধর্মকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে অনাচার ও ভ্রষ্টাচার। ধর্মব্যবসায়ীদের হাত ধরে ধর্মের দ্বারা সমাজ ও রাজনীতিও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে ও হয়ে চলেছে অনবরত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম তার লুক্কায়িত দাঁতনখ বার করে মানুষের স্বাভাবিক যাপনকে ব্যাহত করেছে, ধর্ম হয়ে উঠেছে 'পাওয়ার-হাউস'। দেশ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী আকার ধারণ করেছে। পরবর্তীকালে ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির যূথবদ্ধতা থেকে ফায়দা তুলতে ও নিজস্ব আখের গোছাতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন রাজনীতিবিদেরা। যুগে যুগে একথা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। 'রাজপাট ধর্মপাট' উপন্যাসটিতেও ধর্ম ও রাজনীতির মেলবন্ধন করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। উৎপত্তির সময় থেকে বঙ্গদেশের ধর্মীয় বিবর্তনের ধারা নির্দিষ্ট ক্রম মেনেই অগ্রসর হয়েছে। শশাঙ্ক ও পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক, অন্যদিকে সেন রাজারা ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুগামী ছিলেন। তুর্কি আক্রমণের পর বাংলায় ইসলাম ধর্মের বিকাশ ঘটে। চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষলগ্নে, সে সময়ে বাংলায় বৌদ্ধ, সনাতন হিন্দু ও ইসলাম-তিন ধর্মের মানুষই বসবাস করতেন। বৌদ্ধধর্ম সেই সময় শাসকের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ধুঁকছে। হিন্দু ধর্মও সেই সময় ব্রাহ্মণ্যশাসিত, নিম্নবর্ণের হিন্দুরা নিপীড়িত।বল্লাল সেন প্রবর্তিত কৌলীন্য প্রথার প্রভাব সেই সময়ের হিন্দুসমাজে প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল। ইসলাম ধর্ম একদিকে শাসকের ধর্ম, অন্যদিকে এই ধর্মের ভেদাভেদহীনতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ সে সময় নিম্নবর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধদের কাছে প্রবলভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল। এরকম একটি পরিস্থিতিতে বঙ্গসমাজে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও তাঁর মুখ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে সেই অমোঘ বাণী 'চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তিপরায়ণা'। এরকম একজন উদারমনস্ক ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিকেই তো বাংলার সুলতানি রাজত্বের প্রতিস্পর্ধীস্বরূপ 'ব্রাহ্মণরাজা' হিসাবে নির্বাচন করা যায় এবং এটি ঘোরতর বাস্তবসম্মত।

কথিত রয়েছে, হোসেন শাহ যেহেতু নিজে অন্তর্ঘাতের মাধ্যমে প্রাসাদের রক্ষীবাহিনীকে ঘুষ দিয়ে পূর্ববর্তী সুলতান মুজাফফর শাহকে হত্যা করে গৌড়ের

সুলতান হয়েছিলেন, সেহেতু তিনি মনে করতেন, তাঁর বিরুদ্ধেও কোথাও না কোথাও ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হচ্ছে। এ নিয়ে সর্বদা আতঙ্কিত থাকতেন তিনি। গুপ্তহত্যার ভয় থেকে মুক্ত থাকার জন্যই তিনি তাঁর রাজদরবারে হিন্দু অমাত্যদের নিযুক্ত করেছিলেন, যাতে মসনদকে কেন্দ্র করে অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা না থাকে। তবে হিন্দু অমাত্যদের নিয়েও যে তিনি সর্বদা চিন্তামুক্ত থাকতেন, এমনটাও নয়। সেই কারণেই শত্রুরাজ্য ওড়িশার রাজা প্রতাপরুদ্র যাঁর পায়ের কাছে প্রতিনিয়ত বসে থাকেন, সেই সন্ন্যাসীর রামকেলি আসা তিনি সহজভাবে নেননি। তিনি আঁচ করেছিলেন, এই সন্ন্যাসীকে কেন্দ্র করে বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। উপন্যাসেও রয়েছে, হোসেন তাঁর গুপ্তচর প্রধাম মুকাবরের মাধ্যমে খোঁজ করছেন তাঁর দুই মন্ত্রী দবীর খাস ও সাকর মল্লিক সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন কী না। চৈতন্যদেবকে নিয়ে হোসেন ভীত হয়ে পড়েন, যখন তিনি মুকাবরের কাছ থেকে জানতে পারেন সন্ন্যাসীর পৃষ্ঠপোষক প্রতাপরুদ্র। মসনদ হারানোর ভয়ে আতঙ্কিত হোসেনের দুশ্চিন্তার চিত্রটি সুনিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন ঔপন্যাসিক অভিজিৎ সেন-

> 'সোজা হয়ে বসে হোসেন শাহ মুকাবর খানের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বলে কী লোকটা! প্রতাপরুদ্র যাঁর পৃষ্ঠপোষক সেই সন্ন্যাসী হাজার খানেক শিষ্যসামন্ত নিয়ে এখন তার নাকের ডগায় রামকেলিতে বসে আছেন! আর তাঁকে আপ্যায়ন করছে তারই দুই পরম প্রভাবশালী মন্ত্রি!'[৫]

চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে হোসেন শাহের হিন্দু অমাত্য তথা জনসাধারণের মধ্যে গৌড়ে বিপ্র রাজা হওয়ার প্রবাদটি প্রবলভাবে বিস্তারলাভ করার পশ্চাতে রয়েছে তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি। ধর্মীয় নেতা চৈতন্যদেব ব্যতীত সে সময় অন্য কারুর পক্ষেই মুসলিম শাসকের চোখে চোখ রেখে লড়াইয়ের মানসিকতা ছিল না। এ প্রসঙ্গে চৈতন্যদেবের চাঁদকাজি দলনের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। চাঁদকাজি ইসলাম শাসকের প্রতিনিধি, তার কীর্তন বন্ধ করার আদেশ হল 'শাসকের ফতোয়া'। প্রতি যুগেই শাসকের চোখরাঙানির বিরুদ্ধে প্রয়োজন হয় একজন গণনেতার অভ্যুত্থানের, যিনি কোনও কিছুকে তোয়াক্কা না করে শাসকের জোর করে চাপিয়ে দেওয়া আইনের বিরুদ্ধে জোরদার করে তুলবেন 'আইন অমান্য আন্দোলন'। চৈতন্যদেবকে শাসকবিরোধী গণনেতা করে তোলার প্রক্রিয়া অদ্বৈতরা অনেক আগেই শুরু করেছিলেন, সে কারণেই তাঁকে সর্বজনগ্রাহ্য ধর্মীয় নেতা হিসাবে গড়ে তোলার জন্য কখনও শ্রীবাসকে নৃসিংহাবতার, কখনও মুরারি গুপ্তকে বরাহ অবতার দেখানোর প্রয়োজন হয়। চৈতন্যদেব নিজেও হয়তো কোথাও মনে মনে বিশ্বাস করে ফেলেছিলেন তাঁর 'অবতারত্বের' বিষয়টি, তারই ফলস্বরূপ উন্মত্ত জনতাকে নিয়ে মিছিলের পুরোভাগে নেতৃত্ব দিয়ে বর্তমানের যে কোনও বিরোধী রাজনৈতিক দলের শাসকের 'দপ্তর ঘেরাও'-এর মত চাঁদকাজির বাড়ি 'অভিযান'। কিন্তু অদ্বৈতদের চৈতন্যদেবের মাধ্যমে

গণআন্দোলনের রাশটিকে রাজনৈতিক পালাবদলের অভিমুখে পরিবর্তিত করার পরিকল্পনা ব্যর্থ হল, যখন চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। এরপর চৈতন্যদেব যখন পুনরায় গৌড়ে আসলেন, তখনই সর্বত্র প্রচারিত হল গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হবে, ইসলাম শাসনের পতন ঘটবে। সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে সেই রাজার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারতেন একমাত্র চৈতন্যদেব, কারণ তাঁর কোনও বিকল্প ছিল না।

এবার বঙ্গদেশের ধর্মীয় পরিস্থিতির দিকে চোখ ফেরানো যাক। বাংলায় সে সময় ইসলাম ধর্ম শাসকের ধর্ম এবং তার ঠিক বিপরীতে রয়েছে হিন্দু ধর্ম। বৌদ্ধধর্ম তখন প্রায় ক্ষয়িষ্ণু। হিন্দু ধর্মের মধ্যে তখনও জাতিভেদ তীব্রভাবে রয়েছে, ব্রাহ্মণরাই তখন হিন্দু ধর্মের সর্বেসর্বা। উপন্যাসেও বলা হয়েছে-

'ব্রাহ্মণ্য সমাজের স্মৃতি ও জ্যোতিষ নির্ভরতা তিনশো বছরের ইসলামি শাসনেও কিছুমাত্র প্রশমিত হয়নি, বরং যেন একটা পাল্টা একগুঁয়ে সংহতি লাভ করেছিল।'[৬]

এ প্রসঙ্গে সুবুদ্ধি রায়ের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। নগর অধিকারী সুবুদ্ধি রায় সুলতান হোসেন শাহ কর্তৃক জাতিচ্যুত ও ধর্মচ্যুত হন। সে সময় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব এতটাই অধিক ছিল, সুবুদ্ধি রায় পুনরায় হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তনের প্রয়াস করলেও কঠোর ব্রাহ্মণ্য শাসিত হিন্দু সমাজ কখনই স্বধর্মচ্যুত সুবুদ্ধিকে গ্রহণ করেনি। অন্যদিকে তৎকালীন সময়ে ইসলাম শাসন চলার ফলে বহু মানুষকে বলপূর্বক ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল, আবার ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে নিপীড়িত নিম্নবর্ণের বহু হিন্দু স্বেচ্ছায় ভেদহীন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল।

সুতরাং, এখান থেকে সহজেই অনুমেয় চৈতন্যদেবকে প্রধানত দুই ধরনের শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে-

ক) হিন্দু ধর্মের কঠোর ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনের বিরুদ্ধে।

খ) তৎকালীন শাসকের ধর্ম ইসলামের প্রবল প্রতাপের বিরুদ্ধে।

চৈতন্যদেব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তাঁকে একটি সংস্কারহীন উদার নব্যপথের ধর্মাচরণের উদ্ভব ঘটাতে হবে, যা একদিকে ব্রাহ্মণদের একাধিপত্যের অবসান ঘটাবে এবং অন্যদিকে ইসলাম ধর্মের বিপরীতে একটি শক্তিশালী ধর্মমত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। এই কাজে চৈতন্যদেব সফলতাও অর্জন করেছিলেন। চৈতন্যদেবের এই সমাজসংস্কার তাঁকে প্রবল জনপ্রিয় করে তুলেছিল এবং সেই কারণেই তিনি রামকেলি আসায় গৌড়াধিপতি হোসেন শাহের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছিল। উপন্যাসে দেখা যায়, চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে বঙ্গের ইসলাম শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবের ক্ষেত্রটিও সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত ছিল, সুবুদ্ধি রায়ের পুত্র সুগত ও তাঁর সঙ্গী বিকর্ণ ধানুক ওড়িশা রাজ প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে একত্রিত হয়ে গৌড় অভিযানের পরিকল্পনা পর্যন্ত করে ফেলেছিলেন। আর এ বিষয়ে নেপথ্য থেকে যে ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছিলেন, তিনি বাসুদেব সার্বভৌমের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি।

বিদ্যাবাচস্পতি সহ বঙ্গবাসী হিন্দু ধর্মাবলম্বী অমাত্যরা অনুভব করেছিলেন, বাংলায় হোসেন শাহের শাসনকালের অবসান ঘটাতে হলে হিন্দু রাজ্য ওড়িশার সহায়তা তাদের প্রয়োজন এবং ওড়িশার সঙ্গে গৌড়ের তখন কার্যত স্নায়ুর চাপ বজায় রাখার লড়াই চলছে, যে কোনও মুহূর্তে যুদ্ধের সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। সকলেই অনুমান করে নিলেন, এই লড়াইয়ের নেতৃত্ব দেবেন চৈতন্যদেব এবং শাস্ত্রে উল্লিখিত বাণী অনুসারে 'গৌড়ে ব্রাহ্মণরাজা' হওয়া কেবলমাত্র সময়ের অপেক্ষা।

কিন্তু যাঁকে নিয়ে সেইসময় জনসাধারণের হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠেছিল, তিনি নিজে এ বিষয়ে কী ভেবেছিলেন? ঔপন্যাসিকের মতে, চৈতন্যদেব নিজেও এ বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। নীলাচল থেকে নবদ্বীপে ফিরে চৈতন্যদেব এ বিষয়ে বিদ্যাবাচস্পতির সঙ্গে আলোচনাও করেছিলেন। তবে দূরদর্শী, যুক্তিপ্রবণ ও প্রবল ধী-শক্তি সম্পন্ন চৈতন্যদেব বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁকে কেন্দ্র করে গৌড়ের অমাত্যদের এই আকাঙ্ক্ষা মূলত ভিত্তিহীন। মধ্যযুগের চৈতন্য চরিত কাব্যানুসারে, মূলত উত্তেজনার বশে প্রতাপরুদ্রের গৌড় আক্রমণ যে হঠকারিতা হবে, তাও তিনি অনুমান করেছিলেন এবং সেই কারণেই তিনি প্রতাপরুদ্রকে গৌড় আক্রমণ করতে নিষেধ করেছিলেন।[৭] 'রাজপাট ধর্মপাট' উপন্যাসেও দেখা যায়, গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হওয়ার প্রসঙ্গে সনাতনকে তিনি বলেছেন যাঁরা এই পরিকল্পনা করছে, তাঁরা উদ্দেশ্যহীনভাবে এই কাজ করছেন।

চৈতন্যদেব বুঝতে পেরেছিলেন, সবক্ষেত্রে 'কাঁটা দিতে কাঁটা তোলা যায় না।' তীব্র ধর্মীয় অনাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে ধর্মকেই পাল্টা প্রতিরোধের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যায় না, তাতে কেবলমাত্র ক্ষতির সম্ভাবনাই থাকে। ব্যক্তিগত ক্ষোভকে প্রশমিত করার জন্য ধর্মকে 'রাজনৈতিক আয়ুধ' করে তোলা একেবারেই সঙ্গত নয়। বরং সর্বস্তরে ভঙ্গুর ও ভেদাভেদপ্রবণ হিন্দু সমাজের আভ্যন্তরীণ শুদ্ধিকরণ প্রয়োজন। তাই ধর্মের পাল্টা ধর্মকে লড়িয়ে দেওয়ার থেকে তাঁর কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল অহিংস প্রেমভক্তি, যা ধনী-গরিব, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের মানুষ নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করবে। এভাবেই চৈতন্যদেব তাঁকে কেন্দ্র তৈরি সমস্ত রাজনৈতিক চাপানউতোরের অবসান ঘটিয়ে একটি পথ অবলম্বন করেই ঝাড়িখণ্ডের বনপথে বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলেন এবং তা হল এক ও অদ্বিতীয় কৃষ্ণনাম সংকীর্তনের পথ, যা ধর্মীয় উগ্রতা ও হানাহানির মানসিকতা থেকে মানুষকে সরিয়ে নিয়ে এসে উদারমনস্ক করে তোলে ও মুক্তির পথ দেখায়, এমনকি বিধর্মীদেরও বুকে জড়িয়ে ধরার আহ্বান জানায়। 'রাজপাট ধর্মপাট' উপন্যাসে এভাবেই ঔপন্যাসিক অভিজিৎ সেন চৈতন্যদেবের জীবনের এক অনালোচিত অধ্যায়কে পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। যে চৈতন্যদেবকে ইতিহাসের পাতায় বরাবরই একজন আধ্যাত্মিক অবতার ও ভক্তি আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে, ঘটনাচক্রে জনগণের কাছে 'ঈশ্বর' হয়ে ওঠা এ হেন চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে যে বঙ্গদেশে রাজনৈতিক পালাবদলের ক্ষেত্রও প্রস্তুত হতে পারে, সেই বিষয়টিকে এই উপন্যাসের মুখ্য বিষয়

করে ঔপন্যাসিক অভিজিৎ সেন প্রকৃত অর্থেই প্রচলিত ইতিহাসকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করে উপন্যাসটিতে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ করেছেন, যা এককথায় বিরল ও অভূতপূর্ব।

চৈতন্যদেব ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে হিন্দুধর্মের প্রচলিত রীতিনীতির সংস্কার ঘটিয়ে শাসকের ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে শাসিতের ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী হিন্দুধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, যে হিন্দু ধর্ম হয়ে উঠবে 'জনগণের ধর্ম'। রাজপাটের অভিপ্রায় তাঁর কোনওদিনও ছিল না। কিন্তু সময় ও পরিস্থিতি চৈতন্যদেবকে তাঁর অজান্তেই করে তুলেছিল নিপীড়ত মানুষের নেতা, আর্তের নেতা, করে তুলেছিল 'পিপল'স লিডার'। আর তাঁর এই ব্যক্তিত্বকে কাজে লাগিয়েই লক্ষ্যহীন ও উদ্দেশ্যহীন কয়েকজন ব্যক্তি শাসকের বিরুদ্ধে নিজেদের ব্যক্তিগত ক্ষোভ প্রশমিত করার জন্য চৈতন্যদেবকে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। চৈতন্যদেবকে সামনে রেখে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করাই ছিল এঁদের অন্যতম অভিপ্রায়। কিন্তু চৈতন্যদেব তাঁর অসামান্য বুদ্ধিদীপ্ততার জেরে তাঁকে কেন্দ্র করে তৈরি করা রাজনৈতিক ডামাডোল থেকে সচেতনভাবে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন, কারণ তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সার্বজনীন মুক্তির পথের সন্ধান করা এবং পারস্পরিক ধর্মীয় উগ্রতাকে দূরে সরিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পথ প্রশস্ত করা। উপন্যাসে বিকর্ণ ধানুককে তাই তিনি বলেছেন, ইসলাম শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে তিনি অপারগ-

> 'আমি যুদ্ধে বিশ্বাস করি না। যুদ্ধ তা যে কোনো যুদ্ধই হোক, তা শুধু ধ্বংসই করে এবং অগণিত মানুষের অশেষ দুঃখকষ্টের কারণ হয়। আমার কাজ পৃথক। আর আপনাদের সবার একথা মনে রাখা উচিত এদেশটা আর শুধু হিন্দুর দেশ নয় এবং এদেশের বেশিরভাগ মুসলমান জন্মসূত্রে এদেশের মানুষ।'[৮]

এভাবেই চৈতন্যদেব হয়ে ওঠেন এক আধুনিক চিন্তাধারার মানুষ, যাঁর মধ্যে ষোড়শ শতকেই যুদ্ধবিরোধী ও অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার মেলবন্ধন ঘটেছিল। ঔপন্যাসিক অভিজিৎ সেন আজকের যুগের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে এভাবেই দুই সময়কালকে মিলিয়ে দেন। বর্তমান সময়ের সংকীর্ণ ও উগ্র ধর্মকেন্দ্রিক বিদ্বেষপ্রবণ সমাজে, হিংসা ও হানাহানির যুগে চৈতন্যদেবের মত সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকা মানুষের উপস্থিতির প্রয়োজন কি আমরা প্রতিটি পদে অনুভব করি না?

তথ্যসূত্র:

১. রায়চৌধুরী, গিরিজাশঙ্কর, ১৯৪৬, 'বাঙলা চরিত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য', কলকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, , পৃ.২৭৬-২৭৭।

২. মজুমদার, বিমানবিহারী ও সুখময় মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), ১৯৭১, 'জয়ানন্দ বিরচিত চৈতন্যমঙ্গল', কলকাতা, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, পৃ. ১৪।

৩. জাকারিয়া, আবুল কালাম মোহাম্মদ (অনূদিত ও সম্পাদিত), ১৯৮৩, 'মীনহাজ-ই-সিরাজের তবকাত-ই-নাসিরী', ঢাকা, ঢাকা বাংলা একাডেমী, পৃ. ২৫।
৪. সেন, অভিজিৎ, ২০০৮, 'রাজপাট ধর্মপাট', কলকাতা, দেজ পাবলিশিং হাউস, পৃ. ২১।
৫. তদেব, পৃ. ১৫।
৬. তদেব, পৃ. ৮১।
৭. মজুমদার, বিমানবিহারী ও সুখময় মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), ১৯৭১,'জয়ানন্দ বিরচিত চৈতন্যমঙ্গল', কলকাতা, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, , পৃ. ২১৮।
৮. সেন, অভিজিৎ, ২০০৮, 'রাজপাট ধর্মপাট', কলকাতা, দেজ পাবলিশিং হাউস, , পৃ. ১০৭।

লিঙ্গ বৈষম্যের জৈবিক ও সামাজিক ভিত্তি

প্রণব ঘোষ
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ,
কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

বিষয় সংক্ষেপ: লিঙ্গ বৈষম্যের আলোচনা প্রসঙ্গে সেক্স ডিফারেন্স বা যৌন পার্থক্যের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। কাজেই আমাদের প্রথম আলোচ্য হল সেক্স বলতে কী বোঝায়। তারপর লিঙ্গই বা কি তা জানতে হবে। এরপর সেক্স ও জেন্ডার এর মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কিনা সেটাও আলোচনা করতে হবে।

'সেক্স' বলতে বোঝায় নারী পুরুষের মধ্যে জৈবিক প্রভেদ। যথা- নারী সন্তান ধারণ করে, পুরুষ এ কাজে অপারগ। অপরদিকে 'জেন্ডার' বলতে বোঝায় নারী ও পুরুষের মধ্যে সমাজসৃষ্ট প্রভেদ। যেমন রান্না করা, সন্তান পালন ইত্যাদি ব্যাপারে নারী-পুরুষের মধ্যে যে পার্থক্য তা লিঙ্গ পার্থক্য। এর কোন জৈবিক ভিত্তি নেই।

এখন প্রশ্ন হল এই লিঙ্গ বৈষম্যের সঙ্গে যৌন ঘটিত ব্যাপারের সম্পর্ক কি? এর উত্তরে বলা যায় সেক্স বা যৌন ঘটিত ব্যাপারের উপর ভিত্তি করেই সমাজ এই লিঙ্গ এর ধারণাটি গড়ে তুলেছে। তাহলে আবার প্রশ্ন ওঠে সেক্স যদি জৈবিক হয় এবং তার উপর নির্ভর করেই যদি লিঙ্গের ধারণাটি করে ওঠে তাহলে এর মধ্যে বৈষম্যের অনুপ্রবেশ ঘটলো কি করে? এর উত্তরে বলতে হয় নারী-পুরুষের যৌন পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে যে লিঙ্গ বিভাজন করা হয়েছে তা নারী-পুরুষ উভয়ের কথা ভেবেই করা হয়নি, তা করা হয়েছে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার স্বার্থে।

তাছাড়া, আরও কথা এই যে, নারী ও পুরুষের যে কর্ম বিভাজন তা প্রথম শুরু হয়েছিল উভয়েরই কিছু বাস্তব সুবিধার কথা ভেবে। কিন্তু পরবর্তীকালে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ এগুলি নারীর উপর চাপিয়ে দিয়েছিল নিজেদের স্বার্থে এবং নারীদের এই সমস্ত কর্মকে ছোট করেও হেয় করে দেখিয়েছিল। ফলত প্রথমে যা ছিল পার্থক্যের বিষয় পরে তা বৈষম্যের আকার ধারণ করল।

এখন এই লিঙ্গ বৈষম্যকে কিভাবে দূর করা যাবে তা আলোচনা করা দরকার। এর জন্য অনেকগুলি বিষয়ে আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে।

প্রথমত: নারী, পুরুষ এই উভয় লিঙ্গকে সমান মর্যাদা দিতে হবে। অর্থাৎ এদের মধ্যে লিঙ্গগত পার্থক্যকে স্বীকার করলেও তাকে বৈষম্যের রূপ দেওয়া চলবে না।

দ্বিতীয়ত: কোন কিছু জৈবিক হলেই যে সেটি অপরিবর্তনীয় এমন কথা এখন আর বলা যায় না। কেননা জীববিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এ কথা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং সেক্স অপরিবর্তনীয় ব্যাপার নয়, এরও পরিবর্তন ঘটানো যায়। কাজেই

এর উপর ভিত্তি করে যে লিঙ্গ বিভাজন তা নির্দিষ্ট কিছু নয়,তাও পরিবর্তিত হতে পারে।

সুতরাং পরিশেষে বলা যায় নারী-পুরুষের লিঙ্গ পার্থক্যটি অপরিবর্তনীয় কিছু নয়,তাই একে কঠোর ভাবে বেঁধে দেওয়া যায় না। এই লিঙ্গের ধারণাটিকে রাখতে হবে উন্মুক্ত। যেমন, একজন নারী চাইলেই পুরুষোচিত আচরণ করতে পারে, অনুরূপভাবে একজন পুরুষও চাইলে নারী সুলভ আচরণ করতে পারে। এক্ষেত্রে সামাজিক বাধা বা নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত নয়। আর এটা যদি সম্ভব হয় তাহলে লিঙ্গ বৈষম্য অনেকখানি দূর হবে। আর এটা সম্ভব হতে পারে একমাত্র পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে।

সূচক: পুরুষতন্ত্র, পিতৃতান্ত্রিকতা, যৌনতা, লিঙ্গ, লিঙ্গ বৈষম্য, পুরুষকেন্দ্রিকতা।

সূচনা:

লিঙ্গ বৈষম্য একটি সামাজিক ব্যাধি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারী ও পুরুষের মধ্যে ভেদরেখা নির্মাণ করে নিজেদের স্বার্থে। নারী ও পুরুষের জৈবিক পার্থক্যকে ভিত্তি করে সমাজ ব্যবস্থা তাদের মধ্যে কর্ম বিভাজন নির্ধারণ করে। পরবর্তীকালে এই কর্মবিভাজনই লিঙ্গ বিভাজনের রূপ ধারণ করে এবং কালক্রমে তা পরিণত হয় লিঙ্গ বৈষম্যে। এই লিঙ্গবৈষম্যের দ্বারা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ তার স্বার্থ সাধন করে চলেছে। এই লিঙ্গ বৈষম্যের অনিবার্য পরিণতি হল নারীকে হীন করে দেখা এবং ফলস্বরূপ নারীর উপর অত্যাচার। এই ব্যবস্থায় পুরুষোচিত গুন ও কর্মকে মহান, অপরপক্ষে নারীসুলভ গুণ ও কর্মকে হীন করে দেখা হয়েছে।

এই সমাজ ব্যবস্থা নারী-পুরুষের জৈবিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে নিজেদের স্বার্থে নির্মাণ করে চলেছে অপরিবর্তনীয় লিঙ্গ ব্যবস্থা। কিন্তু যেখানে মানুষের জৈবিক বৈশিষ্ট্যগুলি পুরোপুরি জৈবিকতা ও অপরিবর্তনশীলতা দাবি করতে পারছে না সেখানে তার উপর ভিত্তি করে নারী ও পুরুষের যে সমাজ সৃষ্ট বিভাজন তা কেন অপরিবর্তনশীল হবে? কাজেই লিঙ্গ বিভাজন পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীলতা নারী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যেই বিদ্যমান। সুতরাং এই ধারণাটি উন্মুক্ত রাখতে হবে এবং সর্বোপরি এই বিভাজন স্বীকৃত হলেও তা যেন কখনোই বৈষম্যের রূপ না নিতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

এই প্রসঙ্গে নারীবাদী দার্শনিক 'সিমন দ্যা বোভোয়া' র সুরে সুর মিলিয়ে বলতে হয় কেউ নারী হয়ে জন্মায় না, সে নারী হয়ে ওঠে অর্থাৎ সমাজেই মানুষকে নারী ও পুরুষ করে তোলে।

যৌনতা(Sex) ও লিঙ্গ (Gender) এর ধারণা:

সেক্স বলতে বোঝায় নারী ও পুরুষের মধ্যে জৈবিক প্রভেদ। জীববিজ্ঞান এই প্রভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছে। এতে মানুষের হাত নেই। যথা: নারী সন্তান ধারণ করে, পুরুষ এ

কাজে অপারগ। জেন্ডার বলতে বোঝায় নারী ও পুরুষের মধ্যে সমাজ সৃষ্ট প্রভেদ। মানুষ এই প্রভেদ সৃষ্টি করেছে। এতে জীববিজ্ঞানের কোনো ভূমিকা নেই। নারী ঘরে বসে রান্না করবে এবং পুরুষ অফিসে-আদালতে চাকরি করবে। নারী ও পুরুষের মধ্যে এই প্রভেদ সমাজের সৃষ্টি। একজন পুরুষ রান্না করতে পারে- এ ব্যাপারে কোন জৈবিক সীমাবদ্ধতা নেই। অনুরূপভাবে নারী অফিসে কাজ করতে পারবেনা- এমন কোন জৈবিক সীমাবদ্ধতাও নেই।

কাজেই গর্ভধারণে নারীর ভূমিকা সেক্স ভূমিকা। রান্না-বান্না নারীর জেন্ডার ভূমিকা। একইভাবে সন্তান ধারণে পুরুষের সীমাবদ্ধতা আছে। কিন্তু সন্তান লালন-পালনে পুরুষের কোন জৈবিক সীমাবদ্ধতা নেই। কাজেই সন্তান ধারণ নারীর সেক্স ভূমিকা আর সন্তান প্রতিপালন নারীর জেন্ডার ভূমিকা।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা গেল জৈবিক পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য সেক্স প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে নারী ও পুরুষের ভূমিকার সাংস্কৃতিক দিক বোঝানোর জন্য জেন্ডার প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়।

সেক্স মানুষের অপরিবর্তনীয় একটি জৈবিক বৈশিষ্ট্য। জন্মগতভাবে কোন মানুষ পুরুষাঙ্গের অধিকারী, আবার কোন মানুষ স্ত্রী অঙ্গের অধিকারী। ভিন্ন দেহাঙ্গের কারণে একজনকে পুরুষ, অপরজনকে নারী বলা হয়। কাজেই নারী ও পুরুষ মূলত মানুষে-মানুষে জৈবিক পার্থক্য এবং এ পার্থক্য সুস্পষ্ট।

লিঙ্গের ধারণার বিকাশ:

১৯৭০ এর দশক থেকে নারীবাদীদের দ্বারা জেন্ডার প্রত্যয়টি বিকশিত হতে থাকে। কথাটি সাধারণত এ অর্থে ব্যবহৃত হয় যে, প্রতিটি সংস্কৃতিতে নারী একই ভাবে পুরুষের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। এবং বিভিন্ন সমাজে ও বিভিন্ন সময়ে নারীর মর্যাদা বিভিন্ন হয়। কাজেই জেন্ডার মূলত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে মানুষের দ্বারা নির্ধারিত মর্যাদা বা অবস্থান। সুসান বাকিংহাম হার্টফিল্ড তার “Gender”গ্রন্থে জেন্ডার সম্পর্কে বলেছেন - “it is a social construction organised around biological sex- Individuals are born male or female but they acquire over time is in identity, that is what it means to be male or female”.

কাজেই জৈবিকভাবে মানুষ পুরুষ ও মহিলা এই দুটি ভাগে বিভক্ত। কিন্তু জেন্ডার হচ্ছে সামাজ- সাংস্কৃতিক বিনির্মাণ, যাতে নারীকে নারী এবং পুরুষকে পুরুষ করে তোলা হয় এবং উভয়ের বৈষম্যমূলক ও ভিন্নতার অবস্থান চিহ্নিত করা হয়।

যৌনপরিচয়:

সাধারণভাবে সেক্স আইডেন্টিটি বা যৌনপরিচয় বলতে ব্যক্তির জৈবিক বৃত্তিকেই বোঝায়l নারী ও পুরুষের জৈবিক বৈশিষ্ট্য তিনজাতীয় পরিচয় এ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এগুলি হলো- ক্রোমোজোমের গঠন, হরমোনের রসায়ন এবং এনাটমি বা দেহের গঠন।

নারীর জীব কোষে(female cell)কেবলমাত্র X ক্রোমোজোম থাকে এবং পুরুষের জীব কোষে Xএবং Y দুই প্রকার ক্রোমোজোম থাকে।

নারী ও পুরুষের হরমোন এক। ক্রোমোজোম ভেদে এই হরমোন ভিন্ন ভিন্ন রসায়ন সৃষ্টি করে। সব পুরুষের হরমোন রসায়ন এক নয়, আবার সব নারীরও হরমোনের রসায়ন এক নয়। ফলে পার্থক্যটি শুধুমাত্র নারী ও পুরুষের পার্থক্য নয়। প্রভেদটা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দেখা যায়।

নারী-পুরুষের প্রাথমিক যৌন ধর্মী পরিচয় ক্রোমোজোমের দ্বারা নিরূপিত হয় এবং দ্বিতীয় স্তরের যৌন ধর্মী পরিচয় নির্ধারিত হয় হরমোনের রসায়নের দ্বারা। তৃতীয় পর্যায়ে যৌন পার্থক্য ঘটে প্রথম দুটি পরিচয় এর উপর পরিবেশের প্রভাবের ফলে, অর্থাৎ ক্রোমোজোম, হরমোন ও পরিবেশের মিলিত প্রভাবে স্ত্রী-পুরুষের বৈশিষ্ট্যের কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন মনে করা হয় যে, পুরুষ বেশি যুক্তিবাদী, সে গণিত এবং যুক্তিবিদ্যায় পারদর্শী এবং নারী বেশি সংবেদনশীল, গান ছবি আঁকা এবং সাহিত্যে তার স্বচ্ছন্দ বিচরণ। বলা হয়েছে পুরুষ কর্তৃত্ব ফলাতে ভালবাসে, আর নারী কোন এক কর্তার অধীনে থাকলে আশ্বস্ত বোধ করে। আবার বলা হয় পুরুষ স্পষ্ট এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে, আর নারী সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে সদাই দ্বিধান্বিত।

পুরুষ আর নারীর গুণগত বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে একটি তালিকা প্রস্তুত করলে দেখা যাবে যে, পুরুষোচিত ও নারীসুলভ গুণগুলি সর্বদাই একে অন্যের বিপরীত। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন যে, নারী ও পুরুষের জৈবিক গঠনের পার্থক্যের ফলে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য গড়ে উঠেছে।

লিঙ্গ বিভাজনের জৈবিক ও সামাজিক উপাদান:

নারীবাদীরা নারী ও পুরুষের মধ্যে আর এক ধরনের পরিচয় এর কথাও বলেন, সেটা হল জেন্ডার আইডেন্টিটি। তৃতীয় পর্যায়ে যৌন পরিচয়ের সঙ্গে জেন্ডার বা লিঙ্গ পরিচয় এর সাদৃশ্য আছে। যেমন হঠকারিতা/ সহনশীলতা, অধিনায়কত্ব/ নমনীয়তা, চঞ্চলতা/ ধৈর্য- মনে করা হয় এই সবই লিঙ্গ বৈশিষ্ট্য। উপরে বিভাজনের প্রথমোক্ত পরিচয়টি সাধারণত পুরুষের ধর্ম এবং দ্বিতীয় ধর্মগুলি নারীর ধর্ম বলে মনে করা হয়।

জেন্ডার আইডেন্টিটি বলতে কতগুলি সৃজিত ধর্মকেই বোঝায়। সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার পরিবর্তন ঘটে। প্রতিটি সমাজ নারী ও পুরুষের কাছে বিশেষ কতগুলি আচরণ প্রত্যাশা করে। এই আচরণ যারা অনুসরণ করে তাদের আদর্শ নারী ও আদর্শ পুরুষ রূপে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে— আর এই গুণগুলি যথাক্রমে পুরুষালি গুণ ও মেয়েলি গুন রূপে গণ্য হয় । সমাজ প্রত্যাশা করলেই যে কোন নারী ও পুরুষ সেই মত আচরণ করবে তা নাও হতে পারে। একজন নারীর কাছ থেকে যেটা প্রত্যাশা করা হয় তা একজন পুরুষ অনুকরণ করতে পারে। আবার একজন নারী পুরুষ-সুলভ আচরণও করতে পারে। এর ফলে দেখতে পাওয়া যায় পুরুষালী নারী ও

মেয়েলি পুরুষ।সমাজ আরোপিত বলেই এরূপ সম্ভব। লিঙ্গ পরিচয় নারী ও পুরুষের সহজাত ধর্ম হলে এর থেকে এত সহজে নিষ্কৃতি পাওয়া যেত না।

যৌন স্বরূপকে যদি সহজাত বলা হয় এবং লিঙ্গ স্বরূপকে যদি সৃজিত বলা হয় তবে প্রশ্ন জাগে এই দুই স্বরূপের মধ্যে কোন কার্যকারণ সম্পর্ক আছে কিনা? অনেকে মনে করেন যে যৌন ধর্ম অনুযায়ী সমাজ লিঙ্গ ধর্ম নির্মাণ করে থাকে। তারা বলেন লিঙ্গ পরিচয় এর সূত্র যৌন পরিচয় এর মধ্যে প্রোথিত রয়েছে। শুধু তাই নয় কার্যকারণ সম্পর্কে এই অভিমুখের কোন বিকল্প কল্পনা করা যায় না। তার কারণ হিসাবে বলা হয়েছে anatomy is destiny। এর মানে জন্মসূত্রেই স্থির হয়ে যায় সারা জীবন কোন আচরণ নারীর পক্ষে আদর্শ আচরণ আর কোনটি পুরুষের পক্ষে শোভন। এই ব্যাখ্যা মানলে লিঙ্গ বৈষম্যকে অনেকখানি জৈবিক বলা যেতে পারে। এখানে যেন ক্রোমোজোম আর হরমোন দিয়েই নিয়তি নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে। কারণ এখানে বলা হচ্ছে তুমি যা হয়ে জন্মেছো তোমার জীবনের আদর্শ তাই দিয়েই স্থির হওয়া উচিত। এই মতবাদকে বায়োলজিজম বা জৈবকেন্দ্রিক মতবাদ বলা যায়।

উপরের আলোচনায় দেখা গেল যে যৌন পরিচয় এর উপর ভিত্তি করেই মানুষের লিঙ্গ পরিচয় গড়ে উঠেছে এবং এই পরিচয় জৈবিক হওয়ায় লিঙ্গ পরিচয় কেও জৈবিক বলতে হয়। কিন্তু অনেকে মনে করেন এমন মনে করা অসঙ্গত। কেননা, প্রথমত, কোন জৈবিক বিষয়ের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠলেই যে কোন বিষয় জৈবিক হবে এমন নয়। কারণ সেখানে বর্তমান থাকে সামাজিক হস্তক্ষেপ। দ্বিতীয়ত, যৌন বৈশিষ্ট্যকে জৈবিক বললেও জৈবিক বলতে আমরা যে অপরিবর্তনীয় কিছু বুঝবো এমন নয়। কেননা জীববিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মানুষে মানুষে জৈবিক প্রভেদকেও আর অপরিবর্তনশীল বলা যাচ্ছে না। মানুষের যৌন বৈশিষ্ট্য এক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল। কাজেই মানুষের যৌন বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটিয়ে তার লিঙ্গ পরিচযয়ে ও পরিবর্তন আনা সম্ভব।

লিঙ্গ বৈষম্যের বিভিন্ন দিক:

নারী পুরুষের হরমোন গত পার্থক্য:

আমাদের অনেক আচরণ আমাদের হরমোনের ক্ষরণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন পুরুষের হরমোন নারীর শরীরে প্রবেশ করিয়ে তাকে অনেক বেশি আগ্রাসী করে তোলা যায়। আবার অনুরূপভাবে নারীর হরমোন পুরুষের দেহে প্রবেশ করিয়ে তার আচরণে নারীসুলভ পরিবর্তন আনা যায়। কিন্তু এর থেকে এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না যে ,হরমোনের পরিবর্তনই মানুষের ও অন্যান্য প্রাণীর আচরণ পরিবর্তনের একমাত্র কারণ। কেননা এমন দৃষ্টান্ত ও বিরল নয় যে, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক পরিবেশের ভিন্নতার কারণে হরমোন ও গ্রন্থিগুলির ক্ষরণ ও বিভিন্ন রকম হয়। সুতরাং নিশ্চিত করে বলা যায় না যে, হরমোনের ক্ষরণ আগে হয় এবং পরিবেশের পরিবর্তন পরে হয়। কেননা যেহেতু দেখা যাচ্ছে পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হরমোনের ক্ষরণ ভিন্ন হয়। তাই

এমন বলা যেতেই পারে যে, আমাদের সামাজিক পরিবর্তনের দ্বারা আমাদের আবেগ,অনুরাগ ইত্যাদি পরিবর্তন ঘটানো যায়।

সুতরাং বলা যায় শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন যেমন ব্যক্তির আচরণগত বা পরিবেশের পরিবর্তন ঘটায়, আবার অনুরূপভাবে পরিবেশের পরিবর্তনও আমাদের শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনের সাহায্য করে।

উপরে আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে সমস্ত জৈবিক উপাদানের উপর ভিত্তি করে লিঙ্গে ধারণাটি গড়ে উঠেছে তা পুরোপুরি জৈবিক নয়। সুতরাং এর উপর নির্ভর করে যে লিঙ্গ বিভাজন তা অপরিবর্তনীয় কিছু নয়। তা যে সদাই পরিবর্তনশীল এ কথাই প্রমাণিত I

নারী পুরুষের যৌন পার্থক্য ও লিঙ্গ বৈষম্য পিতৃতন্ত্রের স্বার্থে একটি বিশেষ ব্যবস্থা:

নারী ও পুরুষের কিছু যৌন পার্থক্য আবশ্যিক। নারী ও পুরুষের এই যৌন পার্থক্য করা হয় তাদের উচ্চতা শারীরিক সক্ষমতা ইত্যাদির নিরিখে। কিন্তু সেক্ষেত্রে দেখা যায় নারী ও পুরুষ একে অন্যকে ছাপিয়ে যাচ্ছে। এটা হরমোনের স্তরে বেশি মাত্রয় লক্ষণীয়। তাছাড়া বহু মানুষ আছে যারা নারী- পুরুষের মধ্যবর্তী পর্যায়ে অবস্থান করে। নারী ও পুরুষের যে পার্থক্য তা বিভিন্ন সমাজে ও ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। কাজেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে নারী ও পুরুষের মধ্যে যে যৌন পার্থক্য করা হয় তা পুরোপুরি জৈবিক কিনা?

কাজেই এখন আলোচনা করতে হয় কোন কোন সামাজিক ভূমিকার দ্বারা আমরা নারী ও পুরুষের মধ্যে যৌন পার্থক্য করি এবং এগুলি পুরোপুরি জৈবিক কিনা?

উইলিয়াম জে গুডে ‘দ্যা ফ্যামিলি’ নামক গ্রন্থে এই ভূমিকা কে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করেছেন। সেগুলিকে লিঙ্গবৈষম্যের ক্ষেত্রে এভাবে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা যায়-

১. ঋতুচক্র, সন্তান ধারণ ক্ষমতা ও স্তন্যদুগ্ধ অবস্থান করে নারীদের মধ্যে। এইগুলি নারীর জৈবিক বৈশিষ্ট্য। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা হয়, ক. মেয়েরা সন্তান পালনের দায়িত্বে প্রাকৃতিকভাবেই নির্ধারিত। খ. তারাই ঘর-গেরস্থালি সামলাবে। গ. শিশুরা তাদের জৈবিক মায়ের দ্বারাই লালিত হবে।

কিন্তু বাস্তবে আশ্রয়বাক্য দ্বারা এই সিদ্ধান্তগুলি নিষ্কাশন করা যায় না। অর্থাৎ আশ্রয়বাক্য সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন জৈবিক সম্পর্ক নেই, যা আছে তা হলো কঠোর সামাজিক সম্পর্ক। যদি সিদ্ধান্ত গুলি আশ্রয় বাক্যের সঙ্গে জৈবিক সম্পর্কে আবদ্ধ থাকতো তাহলে এর সঙ্গে নৈতিক প্রসঙ্গটি জড়িয়ে থাকতো না। কিন্তু মায়েরা যদি এই দায়িত্বগুলি পালন না করে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় তাকে অনৈতিক বলা হয়। সুতরাং এই সিদ্ধান্তগুলি ছাড়াও নারীদের অন্যরকম করার সম্ভাবনা আছে। সমাজ কিছু বাস্তব সুবিধার জন্য নারীদের এই কার্যাবলী করার নির্দেশ দিয়েছিল।

হরমোনগত পরিবর্তনের কারণে সন্তান জন্মের পর মায়ের স্তন্যদুগ্ধের সৃষ্টি হয় এবং মেয়েরা এই সময় একটু দুর্বল থাকে। এই কারণে মনে করা হয় যে মেয়েরা সন্তান পালনের জন্য জৈবিকভাবে বাধ্য থাকে। এই সময় মা তার স্তন্যদুগ্ধ বাচ্চাকে পান করিয়ে অনেক সমস্যা থেকে মুক্ত হয়। অপরদিকে বাচ্চা এ খাবার খেয়ে পুষ্টি লাভ করে। ফলে একই সাথে দুজনেরই উপকার সাধিত হয়। ফলে এখানে বাচ্চার সঙ্গে মায়ের একটা মানসিক বন্ধন তৈরি হয় এবং সেটাকেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ জৈবিক বলে উপস্থাপন করে। তাছাড়া জন্মের পর বাচ্চারা অসহায় বোধ করার দরুন কাউকে আঁকড়ে ধরতে চায়। এবং যেহেতু বাচ্চা তখন মাকেই কাছাকাছি পায় তাই তাকেই আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করে। এর ফলে মা তার বাচ্চার সঙ্গে একটা নারীর টান অনুভব করে। আর পুরুষতান্ত্রিক সমাজ এটাকে কাজে লাগিয়ে নারীকে গৃহকোণে আবদ্ধ রাখতে সক্ষম হয়। ফলে নারী লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার হয়।

২. শারীরিক গঠন ও আয়তনের দিক থেকে নারী পুরুষের মধ্যে যে পার্থক্য তা সাংঘাতিক কিছু নয়। গোরিলাদের মধ্যে এই পার্থক্যটা বেশি হলেও গিবনস দের মধ্যে তা প্রবল নয়। পুরুষরা নারীদের তুলনায় বৃহৎ আয়তন ও বৃহৎ শক্তির অধিকারী হলেও নারীর প্রতি তার নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটি অন্য একটি কারণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, তা হল সামাজিক সহায়তা। শরীরের দিক থেকে বড় হওয়ার জন্য হয়তো পুরুষের কিছু সুবিধা আছে। কিন্তু এজন্য তাদের শ্রেষ্ঠ মনে করতে হবে এমন বলা যায় না। শিকার, যুদ্ধ এসবের ক্ষেত্রে ছেলেরাই একমাত্র যোগ্য এবং এগুলিই শ্রেষ্ঠ, এমন বলা যায় না। আসলে মেয়েদের এই কাজের সুযোগ গুলি দেওয়াই হয়নি।

৩. সন্তান জন্মানোর জন্য পুরুষের যৌন উদ্দীপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর উপর ভিত্তি করে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ এক্ষেত্রে পুরুষকে প্রাধান্য দেয় এবং নারীর যৌন ক্ষমতাকে হেয় করে দেখে। কিন্তু সন্তান জন্মানোর জন্য যে নারীর গর্ভধারণ অবশ্যম্ভাবী, সে কারণে নারীর গর্ভকে প্রাধান্য দেওয়া হলেও নারীকে হেয় করে দেখা হয়। নারীর যৌন উদ্দীপনার প্রতি এই অনীহা থেকে শেষ পর্যন্ত এমন বলা হচ্ছে নারীর যৌন উদ্দীপনা থাকা উচিত নয়। আরও বলা হয় পূর্বরাগের ক্ষেত্রে পুরুষরাই আগে এগিয়ে আসে অর্থাৎ নারী যৌনতার দিক থেকে নিষ্ক্রিয়। এই কারণে তাদের যৌন উদ্দীপনা থাকার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং সমাজ তাদের যৌনাঙ্গ সেলাই করার মত জঘন্য কাজ করতেও দ্বিধাবোধ করেনি। তাছাড়া পুরুষের শুক্রাণু দীর্ঘদিন এবং প্রতিনিয়ত নির্গত হয় অপরপক্ষে নারীর ডিম্বানু মাসে একটি ও অপেক্ষাকৃত অল্প দিন নির্গত হয়।

এর ফলে নারীকে হীন করে দেখা হতো। ফলে সে লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার হয় কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটা একটু অন্যরকম ছিল। কারণ পুরুষ জানতো নারীর যৌন ক্ষমতা অনেক বেশি। এবং তা সে নানাভাবে উপভোগ করতে পারে। কিন্তু যেহেতু অন্যান্য যৌন উপভোগগুলি সন্তান উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত নয়, তাই সেগুলিকে নিষেধ করে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তার যৌন উদ্দীপনার উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে সক্ষম হল।

৪. নারী ও পুরুষকে সমানভাবে মানুষ করেও দেখা যাচ্ছে নারীর বেঁচে থাকার ক্ষমতা পুরুষের তুলনায় অধিক। কিন্তু এই জৈবিক ব্যাপারটা সমাজ কর্তৃক গুরুত্বই পায়নি। এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় নারী ও পুরুষের যে বিভেদ তা সমাজ সৃষ্ট।

নারী ও পুরুষের জৈবিক বিকাশ একই সাথে হয়। কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে তা পরিপক্কতা বৌদ্ধিক দিক থেকে বিচার করা হলেও নারীর ক্ষেত্রে শারীরিক দিক থেকে বিচার করা হয়। এর কারণ মেয়েদের যৌনতার দিক থেকে সমাজের কাছে কাম্য করে তোলা হয়।

কাজেই উপরের এই আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, যৌন পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে নারী ও পুরুষের কর্ম বিভাজন বা লিঙ্গ বিভাজন তা পুরুষতন্ত্রের স্বার্থে পরিচালিত। ফলে এই লিঙ্গ বিভাজন অচিরেই লিঙ্গ বৈষম্যের রূপ ধারণ করে এবং এই লিঙ্গ বৈষম্যের ফলে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নারীরা। কেননা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীসুলভ গুণগুলিকে হেও প্রতিপন্ন করে দেখেছে।

লিঙ্গ বৈষম্যের ফলশ্রুতি: নারী বিদ্বেষের বিভিন্ন আকার

সমাজ ব্যবস্থা পুরুষ শাসিত হওয়ায় লিঙ্গ বৈষম্যের আবশ্যিক ফলশ্রুতি যে নারী বিদ্বেষ হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

নারীবাদীরা এই বিদ্বেষের তিনটি বিশেষ আকার কে তুলে ধরেছেন–

যৌনতা: এই স্তরে ঘৃণা বৈষম্য অত্যাচার খুব সহজেই চিহ্নিত করা যায় এটা আমাদের বাহ্যিক আচরণের বিষয়।

পিতৃতন্ত্র: পিতৃতান্ত্রিক সমাজে সমস্ত রকম নিয়ম গড়ে ওঠে পুরুষ প্রাধান্যের স্বার্থে। সমাজ বিকাশের এই পর্যায়ে নারীদের বস্তুকরণ বা পণ্যায়ন করা হয়। এই ব্যবস্থা ক্ষমতার উপর প্রতিষ্ঠিত। যারা ক্ষমতায় আছেন অর্থাৎ পুরুষ, যারা ক্ষমতায় নেই অর্থাৎ নারীকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখে।

পুরুষকেন্দ্রিকতা (phallocentrism): এই স্তরে সমাজ নারীর প্রতি যে বৈষম্যমূলক আচরণ করে তার স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে দেয়। নারী বৈষম্যের এই স্তরে তত্ত্বগতভাবে দেখানো হয় যে, কোন নারী-পুরুষের যে পার্থক্য তা হলো তাদের মানব উপাদান গুলির পার্থক্য। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে এখানে পুরুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে উর্বর এবং নারীসুলভ গুণগুলিকে অনুর্বর বলা হয়েছে। এখানে নারীরূপে নারীকে স্বতন্ত্র পরিচয় দেওয়া হয়নি। তাকে পুরুষের সাপেক্ষে বিচার করা হয়। Human শব্দটিকে নারীবাদীরা এইভাবে বিশ্লেষণ করেছেন Hu-man, এখানে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, সমগ্র মানবজাতিকে পুরুষের সাপেক্ষে বিচার করা হয়েছে। এখানে স্ত্রীলিঙ্গ কে পুংলিঙ্গের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

তাহলে দেখা গেল যে, যৌন পরিচয়ের উপর ভিত্তি করে লিঙ্গ পরিচয় গড়ে উঠেছে। কিন্তু এই যৌন পরিচয়ের জৈবিকতা নিয়েও অনেক সন্দেহ আছে। সুতরাং

লিঙ্গ পরিচয়ের জৈবিক ভিত্তি খুবই দুর্বল। কিন্তু এর থেকে এটা প্রমাণিত হয় না যে, এর মূলে কোন জৈবিক উপাদান নেই।

লিঙ্গ বিভাজন বৈষম্যের পথে:

প্রাক ঐতিহাসিক কালে মানুষের মধ্যে জৈবিক কিছু পার্থক্য কে ভিত্তি করে নারী ও পুরুষ উভয়ের স্বার্থে কর্ম বিভাজন করা হয়েছিল। অর্থাৎ সুষ্ঠুভাবে জীবন পরিচালনার জন্য ও নিজেদেরকে জীবন সংগ্রামে টিকিয়ে রাখার জন্য এই কর্ম বিভাজন করা হয়েছিল। আর এর মধ্যেই লিঙ্গ বিভাজনের বীজ নিহিত ছিল। প্রাচীনকালে মানুষের মধ্যে কোন বৈষম্য ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন আধুনিক যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ও ব্যক্তিগত মালিকানা সৃষ্টি হল তখন পুরুষ সমস্ত রকম অর্থনৈতিক ও উৎপাদনমূলক কর্মকে কুক্ষিগত করে নারীকে গৃহকর্মে নিযুক্ত করে। এখান থেকে নারীর কর্মকে হেও করে দেখা শুরু হয়। এই পর্যায়ে নারী পুরুষের লিঙ্গ বিভাজন বৈষম্যের আকার ধারণ করে। শুরু হয় পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা।

অনেকে বলেন যেহেতু নারী ও পুরুষের যৌন বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে লিঙ্গ বিভাজন করা হয় তাই সেখানে বৈষম্য থাকতে পারে না। এর উত্তরে অনেক নারীবাদী বলেন কর্ম বিভাজন পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার স্বার্থে পরিচালিত। তাই এখানে তাদের স্বার্থ বেশি করে পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং এই বৈষম্য অনিবার্য।

উপসংহার:

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে নারী ও পুরুষের যে লিঙ্গ বিভাজন তা জৈবিক কিছু উপাদানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠলেও তাদের মধ্যে যে বৈষম্য তা পুরোপুরি সমাজ নির্মিত। বিশেষত পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার স্বার্থেই এই লিঙ্গ বৈষম্য করা হয়।

সুতরাং নারী পুরুষের মধ্যে সমতা ফেরাতে গেলে এই লিঙ্গ বৈষম্য দূর করতে হবে। এই প্রসঙ্গে র‍্যাডিকাল নারীবাদীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তারা এমন একটি সমাজ ব্যবস্থার কথা বলেন যেখানে নারী ও পুরুষের মধ্যে লিঙ্গ পার্থক্য থাকলেও বৈষম্য থাকবে না। অর্থাৎ উভয় লিঙ্গই সমান গুরুত্ব পাবে।

পরিশেষে বলা যায় লিঙ্গ অপরিবর্তনীয় কিছু নয় তা পরিবর্তনশীল। সুতরাং একে নির্দিষ্ট করে নারী ও পুরুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। এই লিঙ্গ ভূমিকার ক্ষেত্রে সকল মানুষকে স্বাধীনতা দিতে হবে। অর্থাৎ একজন নারী চাইলেই পুরুষোচিত কর্ম করতে পারবে। আবার একজন পুরুষ চাইলেই নারী সুলভ কর্মসম্পাদন করতে পারে।

অনেকে মনে করেন এই লিঙ্গ বৈষম্য যেহেতু পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার স্বার্থে পরিচালিত তাই প্রকৃত লিঙ্গ সাম্য আনতে গেলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এবং একটি সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। যদি এমনটা সম্ভব হয় তাহলে লিঙ্গ বৈষম্য দূর হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. ইসলাম, মাহমুদা, নারী ইতিহাসে উপেক্ষিতা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

২. মান্নান, মোহাম্মদ আব্দুল, খানাম মেরি, শামসুন নাহার, নারী ও রাজনীতি, ঢাকা ২০০৬।

৩. মৈত্র, শেফালী, নৈতিকতা ও নারীবাদ, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৭।

৪. Bagchi, Nandita, Beyond patriarchy: A critic of Western mainstream epistemology, Progressive Publishers, Kolkata 2012.

৫. Beauvoir, Simone de, The Second Sex, translated and edited by H.M Parshley, Picador, London, 1998.

৬. Buckingham- Hatfield, Susan, Gender and Environment, Routledge, London, 2000.

৭. Goode, William J,The Family, Second edition, Prentice Hall of India Pvt.Ltd.,New Delhi,2007

৮. Moitra, Shefali, FeministThought- Androcentrism, Communication & Objectivity, Munshiram Monoharlal Publishers Pvt. Ltd., 2002.

শব্দ সমীক্ষা : বিষ্ণু দে-র কবিতা

খোকন বর্মন
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
নয়াগ্রাম পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মু সরকারি মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : রবীন্দ্রোত্তর তিরিশের কবিতা আন্তর্জাতিকতাকে গ্রহণ করেছিল দেহেমনে। ফলে ভাব বা বিষয় এবং সেই বিষয়কে প্রকাশ করার যে করণ-কৌশল— দুই দিক দিয়েই তিরিশের কবিতা নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল, নতুন সুরে বেজেছিল। কবিতা যেহেতু শব্দাশ্রিত, তাই শব্দের ব্যবহার কবিতার প্রকরণগত অন্যতম একটি দিক। কবিতায় শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাধারণত দু'টি বিষয় কাজ করে। এক. সময়ের অভিঘাত এবং দুই. কবির ব্যক্তিগত অভিরুচি, মনন চিন্তন বোধ প্রভৃতি। এই অভিরুচি থেকে রবীন্দ্রনাথ সবধরণের শব্দকে কবিতায় স্থান দিতে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিরা কবিতায় শব্দ ব্যবহারে কোনরকম বাছবিচারের তোয়াক্কা না করে কাঙ্ক্ষিত শব্দের সন্ধানে বিচরণ করেছেন আদিগন্ত পৃথিবীর বিশালতা থেকে খন্ড জীবনের তুচ্ছ মাধুর্যে। তাঁদের একান্ত অন্বিষ্ট ছিল কবিতায় আন্তর্জাতিকতার আবহ বা বোধ সঞ্চার। তাই নিত্যনতুন বিষয় ব্যঞ্জনার পাশাপাশি এমন সব শব্দ বাংলা কবিতায় ব্যবহৃত হল যা রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুবর্তীদের কবিতায় ব্যবহৃত হয়নি। বিশেষ বিশেষ শব্দের ব্যবহারে কবিরাও বিশিষ্ট হয়ে উঠলেন কবিতার ভাষায়। তিরিশের প্রধান প্রধান কবিরা তাঁদের কবি-প্রতিভা্র ধরণ অনুযায়ী শব্দ ব্যবহারে বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন। তবে এই শব্দ ব্যবহারের বৈচিত্র্য এবং ব্যাপ্তিতে যাঁর কথা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী করে তিনি বিষ্ণু দে। এই বৈচিত্র্যের ব্যাপ্তি এতোখানি যে তাঁর কবিতাসমগ্র প্রকাশকালে বিশিষ্টার্থক শব্দের একটি তালিকা সংযোজন অনিবার্য হয়ে পড়ে। এবং সেই ব্যাপ্ত বৈচিত্র্যের পরিচয় এরকম একটি সংক্ষিপ্ত পরিসরে কখনোই সম্ভব নয়। বিষ্ণু দে-র কবিতায় নামশব্দের বৈচিত্র্যময় ব্যবহারের পরিচয়ে এরকম একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচিত হতে পারে। এছাড়া আছে আরো কতরকমের শব্দের তাৎপর্যময় প্রয়োগ। সংস্কৃতজ তৎসম শব্দের পাশাপাশি কথ্য আটপৌরে শব্দ, অচলিত অপ্রচলিত স্বনির্মিত শব্দের পাশাপাশি জ্ঞান জগতের নানান ক্ষেত্র যথা শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি, রাজনীতি অর্থনীতি মনোবিজ্ঞান লোকায়ত লোকজ শব্দের এক আশ্চর্য সহাবস্থান সমন্বয় সংশ্লেষ হল বিষ্ণু দে-র কবিতা। এই প্রবন্ধে সেই শব্দ-সমূহের উপর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার প্রয়াস থাকবে।

সূচক-শব্দ: কবিতায় শব্দ ব্যবহারের বিশেষত্ব, বাংলা কবিতার প্রেক্ষিত, বিষ্ণু দে-র কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের বৈচিত্র্যময়তা প্রভৃতি সউদাহরণ আলোচনা।

মূল আলোচনা:

সাহিত্য এককথায় ভাষার শিল্প বা ভাষা শিল্প। কবিতাও তার ব্যতিক্রম নয়। তবু বিষয়টিকে একটু অন্যরকম করে বলতে ইচ্ছে হয়। ভাষাশিল্প হলেও কবিতা সাহিত্যের অন্যান্য সংরূপের তুলনায় এতোবেশি শব্দের বিশিষ্ট ও সংবেদী ব্যবহার কামনা করে যে, তা ভাষা শিল্প হয়েও অনেক বেশি শব্দ-শিল্প হয়ে ওঠে। এবং কবিতায় শব্দের এই গুরুত্ব বোঝাতে আমরা কোলরীজ আর মালার্মে-র দু'টি মন্তব্য উদ্ধৃত করতে চাইব। কবিতা বিষয়ে কোলরীজ জানিয়েছেন 'the best words in the best order' আর মালার্মে চিত্রশিল্পী দ্যগা-র একটি বিশেষ প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিলেন, ভাব দিয়ে কবিতা হয় না, হয় শব্দ দিয়ে। বস্তুতপক্ষে কবিতার ভাষায় কবি যে বিশিষ্ট বা স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত হয়ে ওঠেন, তা প্রধানত এই শব্দ ব্যবহারের বিশিষ্টতায়। কারণ এই শব্দই সমন্বিত হয়ে গড়ে তোলে পংক্তি বা চরণ, আর চরণের পর চরণ নিয়ে স্তবক কবিতা প্রভৃতি। কালের নিয়মে বা সময়ের গতিপথে ভাষার যে পরিবর্তন, রূপান্তর বা বিবর্তন তা অনেকাংশে শব্দের ধ্বনিগত ও অর্থগত রূপান্তর প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে। চর্যাপদের কথা আলোচনায় না এনেও বলা যায় মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব কবিতার কাব্যভাষা এক না। তেমনি ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার ভাষাও মাইকেলের কবিতার ভাষায় বিস্তর ফারাক। আবার রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাষা মধুসূদনের কবিতার ভাষা থেকে প্রতিসরিত হয়ে গেছে ভিতরে ভিতরে। তেমনি রবীন্দ্র-পরবর্তী তিরিশের কবিরা রবীন্দ্র-কবিতার ভাষা থেকে আলো নিয়ে নতুন এক কবিতার ভাষা গড়ে তুলতে প্রয়াসী হলেন। এই যে সময়ান্তরে কবিতার ভাষার বিবর্তন তার অনেকখানি অংশ জুড়ে রয়েছে শব্দের পরিবর্তন জনিত ভূমিকা। যেমন মাইকেল মহাকাব্য রচনার আত্যন্তিক প্রয়োজনে নির্মাণ করলেন যে ভাষা ভঙ্গি, সেখানে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল ধ্বনিগুনসম্পন্ন সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দের ব্যবহার। অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিশিষ্ট চলন মধুসূদনের কবিতার ভাষাকে সমকালীন কবিতার ভাষা থেকে অনন্যতা দিলেও শব্দগত স্বাতন্ত্র্যের দিকটিও এক্ষেত্রে সমান গুরুত্বে উল্লেখ্য। রবীন্দ্রনাথ গীতিকবিতার রচনার লক্ষ্যে মাইকেলী শব্দভাণ্ডারকে গ্রহণ না করে বরণ করে নিলেন বিহারীলালের অন্তঃসংবেদী লালিত্যময় সংগীতধর্মীতাযুক্ত কবিতার ভাষা। আর রবীন্দ্রোত্তর তিরিশের কবিরা শব্দ ব্যবহারে রবীন্দ্র-শুচিবায়ু ত্যাগ করে জীবনের সর্বভূমির শব্দকে কবিতায় নিয়ে আসার কারণে এবং শব্দ ব্যবহারের আধুনিক তরিকায় তাঁদের কবিতার ভাষাও রবীন্দ্রনাথের থেকে ভিন্ন সুরে উচ্চারিত হল।

কবিতায় শব্দ ব্যবহারে যেমন সময়ের একটি অবিসংবাদী ভূমিকা থাকে তেমনি সমান ক্রিয়াশীল থাকে কবি প্রতিভা জনিত বিশিষ্ট মনন চিন্তন বোধ উপলব্ধি প্রভৃতি। কখনোবা কবিতার বিষয় বা ভাব অনুযায়ী কবিকে বিশেষ বিশেষ শব্দের শরণ নিতে হয়। অনেক সময় পূর্ববর্তী কোন কবির প্রভাব চোখে পড়ে। তবে প্রত্যেক প্রকৃত কবিই অণ্বিষ্টই হল একটি নিজস্ব উচ্চারন তাঁর কবিতার ভাষার। এবং ভাষার সেই নিজস্বতা

কবি নির্মাণ করেন কবিমানস অনুযায়ী শব্দচয়ন এবং সেই শব্দের আশ্চর্য সহাবস্থানে ও সমন্বয়ে। এইভাবে কোন কবির সমগ্র জীবনের কবিতার মানচিত্রে শব্দ সংস্থাপনের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ভিন্ন ভিন্ন রেখায় প্রকট হয়ে ওঠে। তাই কোন কবি তাঁর কবিতার ভাষায় সংগীতধর্মীতা কিংবা লালিত্য ও লাবন্যময়তাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে সুন্দর ও মধুর ধ্বনিস্পন্দময় শব্দাবলী নির্বাচন করে নেন। তার জন্য কোন কবি বিশেষ কোন শব্দকে কবিতায় স্থান দিতে আপত্তি জানান। কেউ বা মহাকাব্যিক আবেদন জাগাতে প্রচলিত বাগভঙ্গীর বিপ্রতীপে নতুন এক বাণীভঙ্গী গড়ে নেন সংস্কৃতগন্ধী সমাসনিবদ্ধ তৎসম শব্দের ব্যবহারের আধিক্যে। কেউবা তৎসম শব্দের সঙ্গে সমানভাবে স্থান করে দেন তাঁর কবিতার ভাষায় প্রচল মুখের কথা। কেউবা প্রধানত সংস্কৃতগন্ধী তৎসম শব্দের প্রাধান্যে বিরাজ করেন কেউবা প্রচলিত মুখের কথায় বা ভাষায়। আবার কোন কবি তাঁর সমগ্র কাব্যসাধনায় সময় ও যুগের সঙ্গে সমান্তরাল অবস্থানে সম্পৃক্ত থেকে সময়ের সঙ্গে উদ্ভূত বা জাত শব্দকেও তাঁদের কবিতায় নতুন তাৎপর্যে ব্যবহার করেন। এইভাবে শব্দভাণ্ডার ও কবিতার ভাষা যুগপৎ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত একটি কথা এখানে দ্বিধাহীন বলা যায় যে, কবিতায় শব্দ ব্যবহারের শুচিবায়ুতা প্রভৃতি নিয়ে আমরা যে যাই বলি না কেন সময় এবং বিষয়ের সাপেক্ষে কবিতার ভাষায় শব্দের গ্রহণ-বৈচিত্র্যে রবীন্দ্রনাথের অনন্যতা অনস্বীকার্য। যদিও আমাদের আলোচনা রবীন্দ্র -পরবর্তী তিরিশের অন্যতম কবি বিষ্ণু দে-র কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ নিয়ে। আমরা মনে করি যে, সমগ্র বাংলা কবিতার প্রেক্ষিতে কবিতায় শব্দ ব্যবহারের বৈচিত্র্যে এবং সমৃদ্ধিতে রবীন্দ্রনাথের পরে যাঁর নাম তিনি বিষ্ণু দে। আমরা এই প্রবন্ধে বিষ্ণু দে-র কবিতায় শব্দ ব্যবহারের বৈচিত্র্যময় দিক নিয়ে কিছু আলোচনার চেষ্টা করব।

বিষ্ণু দে কাব্যসাধনা করেছেন প্রায় পঞ্চান্ন বছর। কবিতা লেখার সূত্রপাত ১৯২৫-২৬ সাল নাগাদ। সমানে লিখে গেছেন আমৃত্যু ১৯৭৮-৭৯পর্যন্ত। কাব্যগ্রন্থ লিখেছেন ১৭টি। যে কবি প্রায় পঞ্চান্ন বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন কাব্যসাধনা করেছেন— তিনি যদি প্রকৃতপক্ষে একজন প্রতিভাধর কবি হন— তাহলে তাঁর সৃষ্টিপ্রবাহে বৈচিত্র্যময় বিবর্তন ঘটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। বিষ্ণু দে-র কবিতা দুর্বোধ্য না দুরূহ এ নিয়ে তর্ক-প্রতর্ক যাইহোক না কেন, বিষ্ণু দে যে একজন প্রতিভাধর কবি ছিলেন সে বিষয়ে কোনো বিতর্কের অবকাশ নেই। স্বভাবতই তাঁর কবি-সত্তা বিবর্তিত হয়েছে সময়ের বাঁকে বাঁকে প্রকাশের নব নব প্রেরণায়। পবিত্র সরকার এ বিষয়ে জানিয়েছেন— "বিষ্ণু দে এমন একজন কবি, যাঁর মধ্যে তাঁর সমসাময়িকদের সঙ্গে তূলনায় সবচেয়ে বেশি বিবর্তন দেখা যায়, তাঁর যাত্রা নানা বাঁক নেয়।"[১] এই বাঁকবদল যদিও আমাদের আলোচনার বিষয় নয়, তবু এই সূত্রে বলে নেওয়া যায় যে, কোন কবির কবিতার বা কবি-মানসের বাঁকবদলে ভাবনা বা বিষয়ের অভিনবত্বের সঙ্গে সেই ভাবনা বা বিষয়-সম্পৃক্ত শব্দের প্রয়োগও অনিবার্য হয়ে ওঠে।

বিষ্ণু দে প্রধানত মননশীল কবি। বহুপাঠজনিত অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শিতা বিষ্ণু দে-র কবিতার মননশীলতার একটি দিক। আর একটি দিক অবশ্যই এটিয়ট কথিত আবেগানুভূতির নিরাসক্ত ও সচেতন স্বভূমিতে স্থিত থাকার প্রণোদনা। বিষ্ণু দে লিখেছেন— "এলিয়টের কাছে বাংলা লেখকদের ঋণগ্রহণ মুখ্যত এই আত্মসচেতনতার ক্ষেত্রে।"[২] অন্যদিকে বিষ্ণু দে-র বহুপাঠজনিত অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শিতা সম্পর্কে সুমিতা চক্রবর্তী জানিয়েছেন—"তাঁর চিত্ত কেবল বাংলা সাহিত্য পরিক্রমায় তৃপ্ত নয়, নিয়ত-উন্মুখ বিশ্ব সাহিত্যের দিকে। কেবল সাহিত্যেও তিনি নিবদ্ধ নন, ছবি ও ভাস্কর্যের নান্দনিকতায় তরুণ বয়স থেকেই তিনি আকৃষ্ট। ক্রমে দেখা যাবে সাহিত্য-চিত্র-ভাস্কর্য ছাড়াও পাশ্চাত্য সংগীত; লোককথা ও লোকশিল্প; আন্তর্জাতিক পৃথিবীতে সাড়াতোলা যে-কোনও সামাজিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভাবনা— এক কথায় মনন-চর্চার ক্ষেত্রকে বিস্তার দেবে— এমন যে-কোনও বিষয়ই তাঁকে আলোড়িত করে। সবকিছু থেকেই তিনি গড়ে নেন তাঁর শিল্পবোধের স্তরান্বিত, বর্ণময় বিন্যাস। সবকিছুই হয়ে ওঠে তাঁর সৃষ্টির উৎস।"[৩] সেইসঙ্গে আর একটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করতে হয়, তাঁর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মিথ ও পুরাণে তাঁর সুনিবিড় অনুসন্ধিৎসা। প্রথম জীবনের লেখায় প্রাচ্য পুরাণের তুলনায় প্রাশ্চাত্য পুরাণের উল্লেখ বেশি চোখে পড়ে, কিন্তু পরবর্তীকালে কবি প্রাচ্যপুরাণের প্রসঙ্গকে বেশি আশ্রয় করেছেন। তবে প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য হোক বিষ্ণু দে-র কবিতা সবসময় পুরাণকে আশ্রয় করে আত্মপ্রকাশের পথ বা উপায় অন্বেষণ করেছে। বিষ্ণু এমন কোন কবিতা খুঁজে বের করা মুশকিল যেখানে কোনভাবেই প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে প্রাচ্য অথবা পাশ্চাত্য পুরাণ-প্রসঙ্গ বা অণুষঙ্গের উল্লেখ বা ইশারা নেই। বিষ্ণু দে-র কবিতার দুরূহতা কিংবা দুর্বোধ্যতার কেন্দ্রভূমিতে রয়েছে এই প্রাচ্য প্াশ্চাত্য পুরাণের যৎপরোনাস্তি উল্লেখ; বিশেষত প্রথম জীবনে পাশ্চাত্য পুরাণের অজস্র উল্লেখ ও অনুষঙ্গ। বর্তমানে অবশ্য সেই দুরূহতা বা দুর্বোধ্যতার কিছু সুরাহা হয়েছে আনন্দ প্রকাশিত বিষ্ণু দে-র কবিতাসমগ্র ৩য় খন্ডের শেষাংশের নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও পবিত্র সরকার কৃত বিশিষ্টার্থক শব্দ ও তথ্যপঞ্জির সুবাদে। এবং বাংলা কাব্য কবিতার ইতিহাসে বিশেষত বাংলা আধুনিক কবিতার ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল। যাইহোক বিষ্ণু দে-র কবিতার পাঠক এই তথ্যপঞ্জির অনুসরণে বুঝতে পারবেন কবিতায় শব্দ ব্যবহারে বিষ্ণু দে-র সর্বভূমিতা বাসর্বগ্রাহীতার নিবিড় পরিচয়। আমরা বিষ্ণু দে-র কবিতা থেকে উদাহরণ-সহ তাঁর শব্দ ব্যবহারের দু-একটি দিক তুলে ধরতে চাইব।

তিরিশের পঞ্চকবির মধ্যে বিষ্ণু দে এবং সুধীন্দ্রনাথের গুরুগম্ভীর তৎসম শব্দের প্রতি বিশেষ প্রীতি ছিল তা তাঁদের কবিতা পাঠে বোঝা যায়। জীবনানন্দে আমরা তা দেখি না। বুদ্ধদেব বসু ও অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় তৎসম শব্দের সন্নিবেশ থাকলেও তা বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্রনাথের মতো এতো ব্যাপক নয়। যে সমস্ত তৎসম শব্দের উল্লেখ কেবল অভিধানেই মেলে, এমনকি এমন শব্দ যা অভিধানেও মেলে না তেমন শব্দ,

সেরকম স্বনির্মিত শব্দও এই দুই কবি নির্দ্বিধভাবে প্রয়োগ করেছেন। বিষ্ণু দে-র কবিতা থেকে দু-একটি নমুনা তুলে ধরা যেতে পারে—

১. ক্রেসিডা! তোমার থমকানো চোখে চমকায় বরাভয়।
তোমার বাহুতে অনন্ত-স্মৃতি ক্রতুকৃতমের শেষ।
মত্ত প্রলয় তোমাতেই করি জয়।

২. জানি জানি এই অলাতচক্রে চংক্রমন।
সোৎপ্রাসপাশে বলিনিকো তাই কথা।
ক্রেসিডা, আমার প্রচন্ড আকুলতা
জিজীবিষু প্রজাপতির বীভ্রমণ।

৩. বুদ্ধি আমার অপাপবিদ্ধমস্নাবির
জনকবন্ধ অন্ধ কর্মে ফুৎকার করি নর্মাচারে।
প্রাক্তন-পাশ্চাত্য মাগিনা। মন তুষার।

উদ্ধৃতি তিনটি বিষ্ণু দে-র দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'চোরাবালি' কাব্যের ক্রেসিডা কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে একটি বিশেষ উদ্যেশ্যে। এই কবিতায় প্রযুক্ত কিছু শব্দের কথা উল্লেখ করে বুদ্ধদেব বসু বিষ্ণু দে-র কাছে কিছু প্রশ্ন রেখেছিলেন; এবং সেই শব্দগুলি এই উদ্ধৃতি তিনটিতে প্রযুক্ত এই সেই উদ্দেশ্যে। যাইহোক প্রশ্নগুলি এই—"'ক্রতুকৃতম', 'অপাপবিদ্ধমস্নাবির', 'সোৎপ্রাসপাশ', (এমন আরো আছে), এই সব শব্দ ব্যবহার করে সত্যি লাভটা কোথায়? হয়তো কথাগুলোর জমকালো আওয়াজই প্রীতিকর, কিন্তু শারীরিক আলস্য অভিধান দেখার বিঘ্ন, এবং সাধারণ অভিধানে হয়তো সব পাওয়াও যাবে না। আপনার কি মনে হয় না যে সৎপাঠক এ-সব শব্দে প্রতিহত হবে?"[৪] কিন্তু বিষ্ণু যে লাভ লোকসানের প্রশ্ন এনেছেন তা অর্থহীন। কারণ কবিতায় শব্দ ব্যবহার কবি-ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। যেমন কবিতায় তদ্ভব দেশজ শব্দ নির্ভর সাররিয়াল উচ্চারণ জীবনানন্দের কবি ব্যক্তিত্বেরই সূচক। প্রত্যেক কবি তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রবণতা অনুযায়ী শব্দ ব্যবহার করেন। পাঠকের সুবিধা অসুবিধার কথা সৃষ্টির মুহূর্তে কবির বিবেচনায় থাকা সম্ভব না। কবি চাইলে পরে তা পরিবর্তন করে দিতেই পারেন। কিন্তু এই পরিবর্তনের নেপথ্যেও অনেক আততি ক্রিয়াশীল থাকে। কবিতার ছন্দ মাত্রার হিসেব, সমান অর্থদ্যোতনা ও ধ্বনিস্পন্দযুক্ত শব্দ মেলা দুরূহ। সেইসঙ্গে প্রযুক্ত শব্দের অব্যর্থতা শব্দটির পরিবর্তনের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় একটি শব্দের কারণে এটি কবিতা উঠে দাঁড়াতে যেমন পারে তেমনি হতে পারে ভরাডুবিও। তাই লাভ লোকসান নয়, প্রয়োগ-যাথার্থ বা অব্যর্থতা এক্ষেত্রে প্রধান বিবেচ্য। বুদ্ধদেব বসু যে শব্দগুলির প্রতি আঙুল তুলেছেন সেই শব্দগুলি কবিতায় এতোখানি অব্যর্থতা ও অনিবার্যতায় প্রযুক্ত যে শব্দগুলি পরিবর্তন করে অন্যকোন শব্দ বসিয়ে দেবার কথা ভাবাই যায় না। এইখানেই বিষ্ণু দে-র এই জাতীয় শব্দ ব্যবহারের মুন্সিয়ানা। এজাতীয় শব্দ বিষ্ণু দে-র কবিতাকে একাধারে মননশীলতা এবং দুরূহতা দুই দিয়েছে। পাঠকপ্রিয়তার প্রশ্নে বিষ্ণু

দে গ্রহচ্যুত হয়েছেন। তবু বিষ্ণু দে তাঁর কবিমানসকে বুঝবেন এমন অল্পসংখ্যক পাঠকের কথা ভেবে নিরবচ্ছিন্ন সাধনায় কাব্য রচনা করে গেছেন। কাব্যের ইতিহাসে যে কারণে বিষ্ণু দে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তবে এই জাতীয় শব্দ বিষ্ণু দে-র কবিতাকে ধ্বনি সম্পদে ঐশ্বর্যবান করেছে বুদ্ধদেব বসুর এই মন্তব্য যথার্থ। বিষ্ণু দে-র কবিতায় ব্যবহৃত আরো কিছু উল্লেখযোগ্য এজাতীয় শব্দের তালিকা তুলে ধরা যেতে পারে—

আসঙ্গলোলুপ সমুৎকর্ণ নিমীলনিলীম অশনায়ী রুদন্ত কুম্ভীরক কম্প্রস্নায়ু, নির্নন হতোহস্মি জায়ুজ মদিরেক্ষণ ক্রন্দসী কম্প্রবায়ু বিরিক্ত কৃচ্ছাকর্ষ অনীকশশবিষাণ স্ংস্থিতি দ্বিরাচারী বালালোল জিজীবিষু অধীতি রৌরব চৈতন্যশম্বুক অকল্কা কৈবল্য স্যন্দন নিবিদ্ অনিদ্রাজীবী উদ্বায়ু স্বয়ম্বশ দম্ভোলি ধর্মধ্বজ ধূম্রলোচন মুহুর্কম্প পৃথুল পক্ষবিধূনন উর্ধ্বগ্রীব বমনবিধুর বহুভুঞ্জিতা স্বনিত কিম্বস্রাবী করকাধারা কল্মষবিলাস আনন্দনিষ্যন্দন শ্রোণিভারনিলীনবসনা প্রমাজ্ঞান আসন্নমুমূর্ষাক্ষুব্ধ যুযুৎসুসমান কাংসনিনাদ মদহিংস্র শিরাস্ফোট দংষ্ট্রাকরাল শীকরবীজন সম্মোহকলিল অঘমর্ষী উদ্গীথমুখর ক্লৈব্যগামী পরস্বক্রিমি সংবিত উৎসৃজিত বীজকম্প্র ত্রস্তস্নায়ু ক্ষেড়ুনাট্য তুষারকরকা পরিক্রান্ত জরিষ্ণু সংক্রাম জীবিকামাৎস্য শশবিশাণ অবীচিকর্কশ সম্বাদী প্রজ্ঞাপারমিতা মাতরিশ্বা সন্নিপাতাতুর হবিষ্মতি শঙ্কাকলুষনিশীথে নির্চেরাগ চিরদ্বৈতাদ্বৈত অণোরণীয়ান অপ্সুদীক্ষা রক্তপ্লুত স্মিতনেত্র প্রভৃতি।

এখানে প্রসঙ্গত আর একটি বিষয় বলে নেওয়া যায় যে, সুধীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় তৎসম-শব্দ-প্রধান ভাষাকে কবিতার ভাষা করলেও কবিতার ভাষায় ধ্বনিগুণের পরিবর্তে একধরনের সুরসৌষম্য বজায় রাখতে চেয়েছেন প্রায় সমধর্মী শব্দ নির্বাচনের মাধ্যমে। যেমন—

তোমার যোগ্য গান বিরচিব বলে
বসেছি বিজনে, নব নীপবনে,
পুষ্পিত তৃনদলে।

অন্যদিকে বিষ্ণু দে ওজনদার তৎসম শব্দের পাশে অনায়াসে স্থান দিয়েছেন কথ্য দেশজ শব্দ— ফলে এই দুয়ের বৈপরীত্য-জনিত উচ্চাবচ উচ্চারণে ধ্বনিমাধুর্যের পরিবর্তে একধরনের ধ্বনিস্পন্দ সৃষ্টি করেছে।

১. স্বল্পপরিধি রক্তসূত্র সরস অধর
মুখে রেখেছি ও বক্ষে শুনেছি গ্রহদের বেগ।
দেখে মুহূর্ত-বিম্বে চিরন্তনেরই ছবি,
উর্বশী আর উমাকে পেয়েছি এ প্রেমপুটে।

২. পাণ্ডু মুখে তার
সূর্যাস্তের বর্ণছটা ঐশ্বর্যের প্রদীপ্তি ছড়ায়
স্পর্শধন্যতায়।

মুখখানি তার
দিশাহারা অস্তরাগ, থমকায় গোলাপের বনে
আর চেয়ে থাকে
মুক্তপক্ষ নভচারী উৎক্রোশের দিকে।

উদ্ধৃতি দুটিতে দেখা যাচ্ছে যে, 'স্বল্পপরিধি', 'রক্তসূত্র', 'সরস অধর', 'মুহূর্ত-বিম্ব', 'সূর্যাস্ত', 'বর্ণচ্ছটা','স্পর্শধন্যতায়', 'অস্তরাগ', 'মুক্তপক্ষ', 'উৎক্রোশ' প্রভৃতি শব্দ ও শব্দযৌগের পাশাপাশি কবি ব্যবহার করেছেন 'মুখে রেখেছি', 'বক্ষে শুনেছি', 'চেয়ে থাকে', 'ছড়ায়', 'থমকায়', 'পেয়েছি' প্রভৃতি চলিত যুক্ত-ক্রিয়া ও ক্রিয়ার পাশাপাশি 'বন', 'মুখ', 'দিশাহারা', 'গ্রহ', 'বেগ', 'ছবি' প্রভৃতি মুখে মুখে ব্যবহৃত হালকা চালের চলিত শব্দকেও ব্যবহার করছেন। ফলে কবিতার ভাষায় যেমন একটা বাকস্পন্দ সঞ্চারিত হয়েছে তেমনি লঘু গুরু শব্দ ও ধ্বনিসমাবেশে কবিতার উচ্চারণে এক ধরনের বিশেষ ধ্বনিস্পন্দ সঞ্চারিত হয়েছে— বাংলা কবিতার ভাষায় মধুসূদন যা আমদানি করেছিলেন মহাকাব্যিক গাম্ভীর্য সৃষ্টির প্রয়োজনে। বিষ্ণু দে কবিতার প্রকরণগত আলোচনায় আমাদের ঝোঁক থাকে তাঁর কবিতায় অপ্রচলিত সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দের ব্যবহারের প্রতি। কিন্তু বিষ্ণু দে-র কবিতায় দেশজ চলিত শব্দের ব্যবহারও উল্লেখ করার মতো।

১. কান করি ঝালাপালা/কুস্তির হাঁকে, হুমকির নেই শেষ।/ গরিমা তবু কালা
২. ট্রামে বাসে কলের চোঙায়
৩. পড়োশিরা হাসে, জানে ভিনগাঁয়ে লোকে,
৪. এক ফোঁটা বাষ্প-চোঁয়া জল
৫. কৃষাণের বউ পঁইছে বাজু বানায়।
৫. চাঁটি মেরে বলো চম্পট কোথা দেবে যত করো চোখ লাল,
কাকে শোধরাবে শাসিয়ে, শুধায় মার্-মার্-কাট্-কে।
৬. এখানে কঠিন মাটি, পাথর কাঁকর লালমাটি
উৎরাই খাড়াই, রুক্ষ মাঠে মাঠে তরঙ্গিত ঢেউ
জল নয় শুষ্কতার, তারি মাঝে এরা কেউ কেউ
আউশ কেটেছে, কেউ বুনেছে আমন কয় আঁটি
পাটও দেখি এক ঘরে, সর্ষে কেউ কেউ অড়হরে
এনেছে খেতের রঙ প্রাণের রঙের সোনালিতে,
কঠিন মাটির তারে এরা সুর জীবনের গীতে,
এরা কেউ হার মানে নাকো আজও বাঁচে ঘরে ঘরে
জন্ম প্রেম দ্বন্দ্ব আর মরণের অমোঘআকাশে,
এদের নক্ষত্র-গান ক্ষয়হীন আকালে অসুখে!

৭. পাতাঝরা নতুন পাতার আঁকশিতে অঙ্কুরে
৮. সন্ধ্যা ঘনায়, শহরের ঘুলঘুলি

এছাড়া মোড়, গলি, রোয়াক, গর্দান, গড়খাই, মুঠা, খুঁটা, নচ্ছার, ঘাড়, খাক, শ্যাওড়া, মশান, দেমাক, খড়, কুটা, পচা গুমোট, ভুয়া, কুঁড়ের চাল কোঠার চৌকাঠ, চোরাই প্রভৃতি এজাতীয় শব্দের অজস্র ব্যবহার চোখে পড়ে। চোখে পড়ে কুটুমের মতো কথ্য শব্দও বিষ্ণু দে ব্যবহার করেছেন অবলীলায়, ব্যবহার করেছেন তৎসম শব্দ বহুল বাক্যের ভিড়ে—

দোর্দন্ডপ্রতাপ রাজা, সসাগরা সাম্রাজ্য-ভান্ডার
প্রতিদিন হয় ভাজ্য পরিষদ, প্রিয়সখী,
কোটাল, কুটুম, চোর, রাজগুরুদের মাঝে।

এমনকি 'খোঁয়াড়' শব্দেরও দেখা মেলে বিষ্ণু দে-র কবিতায় —

কখনো ঝরনা সহস্রধারা, কখনো ফল্গু মীড়
অর্কেস্ট্রার মিলিত জোয়ারে মাসতুতো ভাই ডুবেছে খোঁয়াড়ে

বিষ্ণু দে যে লিখেছিলেন তাঁর 'ভাষা' কবিতায়—"রেখো না বিলাসী কোন আশা,/ নববাবু ভাষা ছাড়ো মন,/ অথবা মিলাও সে কূজন/ সাঁওতালি-ধনুকের টানে টানে ঝনন্-রণনে/ লাঙ্গলের ফলায় ফলায় সুতীব্র স্বননে, সাবেক নূতন ছন্দে মেলাও সে নাচ/ গ্রামেও শহরে, পাবে কবিতার ভাষা।।" তা আসলে কবির কবি-মানসের অন্তর্গত উপলব্ধির আঘ্রান—তা কোন কথার কথা নয়।

বিষ্ণু দে-র কবিতায় নাম-শব্দের ব্যবহার সুতীব্র মাত্রায় করা হয়েছে। নাম শব্দ ব্যবহারে কবির দিক থেকে সুবিধা হল খুব সহজে এবং নির্দিষ্টভাবে বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করা যায়; আর পাঠকের দিক থেকে অসুবিধা হল—সেই শব্দটি যে ব্যক্তি বা স্থান বা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির অনুষঙ্গ বহন করে তার সঙ্গে পরিচয়হীনতার কারনে অর্থ অনুধাবনে অপারঙ্গমতা। যদিও বিষ্ণু দে সুধীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিরা কবিতার ভাব-ব্যঞ্জনাকে সংহত-সুন্দর প্রকাশে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র-সম্বন্ধীয় অজস্র নাম শব্দ ব্যবহার করেছেন। তেমন বিষ্ণু দে-র কবিতায় দেখি—

১. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পুরাণ-কেন্দ্রিক নাম-শব্দ: বিষ্ণু দে-র কিছু কবিতার নাম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পুরাণের নাম-শব্দকে কেন্দ্র করে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের নামই 'উর্বশী ও আর্টেমিস'। এছাড়া আর যে সমস্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পুরাণ-কেন্দ্রিক নাম-শব্দ বিষ্ণু দে-র কবিতায় ব্যবহৃত—

পাশ্চাত্য পুরাণকেন্দ্রিক নাম: অয়রিডিকে অরফিউস আইসায়া আথেনে আন্দ্রমিদা আর্টেমিস ইনিয়াস ইফিজেনি ইসোলড এরস ওফেলিয়া ওরায়ন কাসান্ড্রা ক্রেসিডা ক্লিওপেট্রা টাইরেসিয়াস ট্রয়লাস ডায়ানা ড্যানায়ে নেয়াড পাইলেট পেনেলোপি প্যান্ডার প্রসার্পিনা প্রিয়াম ব্রুনহিল্ড ভিনাস মিরান্ডা মিরিয়াম ম্যামন য়ুলিসিস রিগান লাজারস লুসিফর সালোম হিপোলিটস হেলেন প্রভৃতি।

প্রাচ্য পুরাণকেন্দ্রিক নাম: ইভ আদম ঈশা উর্বশী উলুক উলুপী চন্দ্রাপীড় দক্ষিনরায় দিতি নহুষ নচিকেতা ভদ্রা মহাশ্বেতা মহীদাস যযাতি যুযুৎসু জটায়ু বরুণ বিশ্বামিত্র গায়ত্রী ইরা প্রজাপতি নীলকন্ঠ উমা সতী প্রভৃতি।

২. ঐতিহাসিক নাম-শব্দ: কাসানোভা কুবলাই খান কেনিয়াট্টা কেলসন ক্লাইভ খ্রুশ্চেফ চার্চিল চেলিউশকিন ট্রুমানি ডায়ার তানাকা সান তিতো দিউগাসভিলি নীরো বেভিন মাউন্টব্যাটেন সাক্কো-ভাঞ্জাত্তি সিদো-কাহ্নু লেনিন

৩. স্থানবাচক নাম-শব্দ: আউসবিটজ আমরুয়া আরিজেনো আর্কেডিয়া আলজীর ইথাকা এফেসাস এমডন ওয়ার্ধা কঙ্কন-গুর্জর কঙ্কালীতলা কপিলগুহা কিয়েফে খারকভ গেহেনা গোমেরা টাহিটি টিমবকটু টোলোডো ডালহুসি তুন্দ্রা নেয়ান্ডরতাল পিয়োঙ্গিয়াং প্রাগ ফেরগানা বহ্লীক বাটুম বারগানডা বারণাবত বাহেঙ্গা বেলগ্রেড ভায়ালোর ভেড়োয়াটাঁড় মামল্লপুরম মৌভোগ লস এঞ্জেলেস স্তালিনগ্রাদ স্যন্দন হাসনাবাদ হিমলাসা দিল্লি কলকাতা

৪. শিল্প-সাহিত্য-সংগীত-সংস্কৃতি সম্বন্ধিত নামশব্দ:

ক. কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক-দার্শনিক: অডেন আরাগঁ, আলি আকবর, এডগার এলেন পো, এলসি বব, ওঅর্ডসওয়র্থ কান্ট কুয়ে কোলরিজ গোর্কি গ্রোসফুগে গ্রেকো গ্লুক, ডন জুয়ান, তেম রুশে, দা ভিঞ্চি, নীটশে, নেরুদা, পাউন্ড, পিকাসো, পিসারো, পেটার, ফেদেরিকো গারথিয়া লোরকা, ফ্রানৎস শুবের্ট, বর্ট্রান্ড রাসেল, বতিচেল্লি, ব্রকলি, বাখ, বিল আর্চার, বেটোফেন, ভালেরি, ভিদাল, মাতিস, মালার্মে, শ্লেগেল, সক্রাটিস, সাফো, সেজান হাইনরিখ মান, হ্বাখনার

খ. সাহিত্য থেকে গৃহীত নাম: এডমন্ড, গনেরিল, টাইসন, বসন্তসেনা, ললিতা, লিয়র, শচীশ, সাইনারা, সীগফ্রিড সুমন সুরঙ্গমা

গ. সংগীত সম্পর্কিত নামশব্দ: আলি আকবর, গ্লুক, তেম রুশে (রুশ সুরস্রষ্টা), বাখ, বেটোফেন, মটসার্ট, মেলোডি-সিমফনি, মৈহারি, আশাবরী, আহীর ভৈরব চেলো ভয়রোঁ মিঞা কী দীপক পূরবী ভাটিয়ালী রাখালী সারেঙ্গী মল্লার গান্ধার সাহানা শেঁপাগীতি কাফী মন্দিরা জারী সারী কাওয়ালী যোগিয়া তবলচি ফ্রনন্যস শুক্টে, সোনাটা অর্কেস্ট্রা

৫. নদী নাম: ইয়াংচি, আমুদরিয়া আরাল কারাকোল টেমস দানিয়ুব দিনীপার নিয়াখিয়া মাটিয়ারা লেনা সাংপো সিরদরিয়া ইচ্ছামতি

৬. বৃক্ষ নাম: সিরিঙ্গা শ্যাওড়া মনসা ধুতুরা পিপুল শাল পলাশ

৭. ফুলের নাম: গার্ডেনিয়া গোলমোর ডেজি ভায়োলেন্ট বেগোনিয়া বোহিনিয়া লেবার্হাম ল্যাভেন্ডার হায়াসিপলা

৮. লোকসাহিত্য থেকে গৃহীত নাম শব্দ: লালকমল নীলকমল সাত ভাই চম্পা প্রভৃতি।

বিষ্ণু দে-র কবিতায় বাইনারি শব্দের প্রভূত ব্যবহার চোখে পড়ে। বাইনারি শব্দ হল দুই বিপরীত অর্থবোধক শব্দের পাশাপাশি ব্যবহার। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের অতি পরিচিত গানের পংক্তিসমূহ— 'হাসি কান্না হীরা পান্না দোলে ভালে' কিংবা 'নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু' প্রভৃতি। কবি সাহিত্যিক তাঁদের লেখায় এই বাইনারি শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে ভালো-মন্দ আলো অন্ধকার জীবন মৃত্যু সুখ দুঃখ প্রভৃতি নিয়েই যে জীবনের পরিপূর্ণতা এই বিশেষ দর্শনকে ভাষিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। জীবন বভুক্ষু কবি বিষ্ণু দে তাঁর কবিতায় এই বাইনারি শব্দের বহুল ব্যবহারে অন্তহীন জীবনের বিশালতা ও প্রসারতাকে ব্যঞ্জিত করতে চেয়েছেন। সেই সঙ্গে দুটি তো করতে চেয়েছেন জগত ও জীবনের গভীরে নিহিত চিরন্তন ও গভীর সত্যকে। উদাহরণ—

১. দুই তীরে বাহু বেঁধে জীবনের <u>গ্রীষ্মে ও শীতে</u>
ভিখারি হৃদয় চলে একই <u>ঘর বাহিরে</u> যাত্রায়

২. আপন আপন সত্তা আনে <u>কড়ি-কোমলের</u> গানে
আমাদের সেতু <u>এপারে ওপারে</u>

৩. <u>নরক</u> কি অবশেষে <u>স্বর্গ</u> থেকে হবে নির্বাসিত

৪. বাক্যস্রোত, শব্দ চলে <u>জোয়ার ভাঁটায়</u>
<u>খড়াই উৎরাই</u> পদক্ষেপে পদক্ষেপে <u>দক্ষিণে ও বামে</u>

৫. <u>লোকায়তে</u> অবসরে <u>লোকোত্তরে</u> সম্পূর্ণ মানুষ

৬. আজ খোঁজে কাল, <u>অতীত ও ভাবী</u> চিরন্তনের ছকে
<u>রাজা প্রজা</u> সাজে তাই।

৭. <u>ঘৃণা</u> আর <u>প্রেমে</u> ক্রান্তিতে চাই জীবিকার অবসর

৮. আমি চাই <u>সূর্যাস্তে ও সূর্যোদয়ে</u>
প্রত্যহের ইন্দ্রধনু ভেঙে যাক স্তরে স্তরে

৯. <u>আগুনে তুষারে</u> নরকের <u>শাদায় কালোয়</u>
<u>ভালো মন্দ</u> জীবন মৃত্যুর দ্বন্দ্বময় স্পষ্ট যন্ত্রনায়

১০. <u>জীবন</u> দিয়ে <u>মরণ</u> বুঝি।

১১. সেই রকম মুহূর্ত
<u>অনার্য আর্যের</u>, <u>কৃষক ও শাসকের</u>, <u>বৌদ্ধ আর ব্রাহ্মণ্যের</u>
<u>গৃহস্থ ও ধনিকের</u>, <u>স্মার্ত ও লৌকিকের</u>, <u>শ্রমিক ও ধনিকের</u>
স্থানে কালে প্রায় অন্তহীন দ্বন্দ্বের বিন্যাসে
<u>অনন্য ও অন্যোন্য</u> মুহূর্ত এক।

১২. কান্না ও হাসিতে নিভৃত আলাপ ও একতান

১৩. ঘর ও বাহির এক, তুমি তাই ঘরণী

১৪. আমাদের ইতিহাস মুহূর্তে মুহূর্তে গোনে
তরঙ্গিত আয়ু তার জীবনে মৃত্যুতে

১৫. সেদিন তুমি যে কথা বলেছিলে
সেই একতায় নিঃশেষ হোক এক ও বহুর নেতি।

আরো নানা কিসিমের বাইনারি শব্দের তাৎপর্যময় প্রয়োগ বিষ্ণু দে-র কবিতার নিবিড় পাঠকমাত্রই লক্ষ্য করবেন। বাইনারি শব্দের পাশাপাশি শব্দদ্বিত্বের ব্যবহারও বিষ্ণু দে-র কবিতায় চোখে পড়ে। বাইনারি শব্দ যেখানে দুই বিপরীত অর্থকে পাশাপাশি রেখে জগৎ ও জীবনের দ্বৈতময় ঐক্যের কথা বলে, শব্দদ্বিত্ব সেখানে একই শব্দের পাশাপাশি উচ্চারণে জগৎ ও জীবন কেন্দ্রিক কোন বিষয়ের ব্যাপ্তি গভীরতা বা বিশেষ কোন আবেগ আতিশয্যকে প্রকাশ করে। যেমন—

১. তার মাঝে আসে ওরা
দিনের মজুর দিন আনে হাতে হাতে রুজির সংঘাতে
মেঘে মেঘে কলিজার প্রচন্ড আবেগে কব্জিতে বাঁকাতে বেগে
সূর্যে সূর্যে মুঠি মুঠি দিন
বিস্তীর্ণ প্রান্তরে হাওয়া দুই দুই কিতারে কিতারে
সূর্যে সূর্যে উল্লসিত স্বাভাবিক
ঘরে ঘরে ভ'রে দেবে আকাশের বাতাসের পৃথিবীর সুর?
বিবর্ণ দুপুরে জ্বলে উদয় শিখরে ঐকতানে সূর্য সূর্য আভা চলে।
দিগন্তে দিগন্তে খোঁজো তৃষ্ণার্ত নিখিল।
আমি একা একা ভাবি ছোট ছোট সুখে।

২. সে তো শুধু ভাষা খুঁজে মরে
সে তো শুধু রূপ দিতে চায় জীবনে জীবনে হাটে বাটে ঘরে ঘরে
জীবনের নূতন বৎসরে।
তাইতো সে শানে
মাথা কোটে, যদি তার আর্তনাদে
যদি তার যন্ত্রণার ঘোঁটে ঘৃণার নির্ঝরে
পাষাণে পাষাণে প্রাণ জেগে ওঠে মহীয়ান
মৈত্রীর সংবাদে খেতের মাঠে মিলে মিলে মিছিলে মিছিলে।

৩. অস্তিত্বের মর্মে মর্মে
জীবনের রক্তে রক্তে, চৈতন্যের অস্থিতে অস্থিতে
জুলুম ও দাবি লরে অতলান্ত আততিতে,

কবিতায় শব্দ ব্যবহারে বিষ্ণুদে-র সব থেকে বেশি স্বাতন্ত্র্য অজানা অচেনা হঠাৎ শব্দের প্রয়োগে। এই ধরনের শব্দকে আলোচক পবিত্র সরকার তাঁর একটি লেখায় পাথরের টুকরোর সঙ্গে তুলনা করেছেন। যদিও পরক্ষণে তিনি জানিয়েছেন—"পাথরের টুকরো কথাটা যে অসতর্ক প্রয়োগ তা স্বীকার করছি। পাথরের টুকরো পথের অনিবার্য বা জরুরী অংশ নয়, কিন্তু ওই শব্দ ও অনুষঙ্গ গুলি কবিতার অনিবার্য অংশ, তাতে

অবিকল্পভাবে বয়নিত, ওগুলিকে সরিয়ে দেওয়ার কোন প্রশ্নই নেই।"[৫] পবিত্রবাবুর এই উক্তি প্রমাণ করে যে কেবল চমক সৃষ্টি এ জাতীয় শব্দ ব্যবহারের নেপথ্য প্রণোদনা নয়, এ বিষ্ণু দে-র কবি প্রতিভারই এক স্বাতন্ত্র্যময় প্রকাশ বিশেষ। যদিও তাতে সাধারণ পাঠক চমকিত নয় শুধু, বিভ্রান্তও হয়। তবে সবথেকে আশ্চর্য বিষয় হলো এ জাতীয় শব্দ ব্যবহারের প্রয়োগ মুন্সিয়ানা এবার জাতীয় শব্দ ব্যবহারের কিছু নমুনা পেশ করা যেতে পারে। তবে দীক্ষিত পাঠক এধরনের প্রয়োগ-মুন্সিয়ানায় পুরষ্কৃত হন তা বলা যায়। এবার এ জাতীয় শব্দ ব্যবহারের কিছু নমুনা পেশ করা যেতে পারে।

১. আমরাও আছি জেনো তোমাদেরই কমিশরিঅটে।
২. ছিঁড়ে যায় হারের আড়াল ভিন্নতার জামেয়ারে হাড়
৩. দৃষ্টি বুঝি পিকাসোর? আলহামব্রার জ্যোৎস্নাও গোর্নিকার গহনে ভাস্বর
৪. বহুরূপী তারা, তারা জানে শুধু রংরেজিনির খেলা।
৫. বাসা বাঁধো প্রিয়া বিশ্বব্যাপ্ত ব্যারাকে,
তোমার বাহুর পটভূমি গ্রিক ফাঁসি-কাঠ।
৬. তাইতো অতীত জ্বলে, ভবিষ্যৎ তাইতো ন্যগ্রোধ পল্লবিত
৭. ম্যাকাডাম রাজপথ নয়।
৮. আর্তেসীয় কাব্যের নির্ঝরে
৯. আকাশের নীলে মেঘের আঁজিতে লোটে
১০. প্রাণ হন্তারা হার মানে এই জঙে।
১১. মরে দলে দলে দেখো শূন্য সাম্পরায়ে ছাই মাটি ধূলা
১২. প্রাজ্ঞ, প্রৌঢ় ও গম্ভীর, দিউগাসভিলির মতো
১৩. শক্ত আলোয় পাণ্ডাশ দিনের চুরমার হাহাকার
১৪. তোমার নেব্যুলা চোখ নক্ষত্রের জীবনে আমার
বিপ্লবের মৃত্যু যে জায়গায়!
১৫. এপ্রিল তো চলে গেল হাস্যলঘু নেয়াড় আমার
১৬. পাহাড়ের ছায়াচ্ছন্ন কৃষ্ণ বক্রিমায়।...
আলোক-সোনাটা আমাকে করেছে বিচলিত, মূক,
১৭. প্রকৃতির বুদোয়ারে এসে পড়ি বিদেশি বর্বর,—

এছাড়াও প্রিরাফায়ে-লাইট, পেটারের মেয়ে, রোজা আলকেমিকা, প্লেটোর পেশি, ক্রিস্টিয়ানের মৈত্রী, মরিয়া লিবিডো, দেবুতাঁৎ, কামারাদেরি, এটাক্সিয়া, পিদসিকাতো প্রভৃতি কতরকমের অজানা অচেনা শব্দ বিষ্ণু দে তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেছেন তার নিবিড় গবেষণার বিষয়। পরিচিত আলো আর পাশ্চাত্য সংগীতের সোনাটার মিলনে যে এমন অভেদ রূপক রচনায় এমন চিত্ররূপ নির্মাণ সম্ভব তা একমাত্র বিষ্ণু দে-র পক্ষেই সম্ভব।

বাঙালি কবিদের কবিতায় ইংরেজি শব্দের আনাগোনা যেন এক অনিবার্য ঔপনিবেশিক দায়। বিষ্ণু দে তার ব্যাতিক্রম নন। নেবুলা পিস্টন পোস্টকার্ড রোমান্টিক স্টক এক্সচেঞ্জ লিবিডো ব্রিজ ফ্লাস প্যারানইয়া সাইরেন প্যাসিফিক প্রেকশাস ব্যাসিলাস মন্তাজ মেগালোম্যানিয়া কাসল প্রভৃতি নানাবিধ ইংরেজি শব্দ বিষ্ণু দে-র কবিতায় ভিড় করে। তবে ইংরেজি শব্দের ব্যবহারে বিষ্ণু দে-র স্বাতন্ত্র্যময় কৃতিত্ব হল ইংরেজি শব্দকে রূপকের কাজে ব্যবহার। তাই বিষ্ণু দে খুব সহজেই লিখতে পারেন 'কামনার টানে সঙ্গত গ্লেসিয়ার।'

ইংরেজি শব্দের পাশাপাশি অনেক আগন্তুক আরবি ফারসি শব্দের ব্যবহারও বিষ্ণু দে-র কবিতায় চোখে পড়ে। যেমন— আবাদ জিন্দাবাদ জনাব কসুর দরগা ঈদমুবারক ঈদ্‌গা খোদাই রোখ হিম্মৎ সেলাম নিশান কুমির পরিখা আলিসা মিনার দিলদার দেয়ালি চাঙড় নিমক হালাল জাহান্নাম তাঞ্জাম প্রভৃতি।

এছাড়া বিষ্ণু দে এমন কিছু শব্দ প্রয়োগ করেছেন তাঁর কবিতায় যেগুলো কবির বিশেষ ইতিবাচক বা নেতিবাচক ভাবপ্রকাশক। যেমন, 'চোরাবালি' শব্দটি যদি কবির অন্তহীন নঞর্থক মনোভাবনার প্রকাশক হয়, তবে 'উজ্জীবন' কিংবা 'বীজকম্প্র' প্রভৃতি শব্দ কবির অনন্ত ইতিবাচক মনোভাবের পরিচায়ক হয়ে ওঠে। সেরকম রামধনু, নক্ষত্র গান, সূর্যোদয়, দীপ্ত দান্ত প্রসন্ন প্রভৃতি শব্দ যেমন জীবনের ইতিবাচক অস্তিত্ব এবং উপস্থিতিকে ভাষিক রূপ দেয় তেমনি 'বালি চড়া', 'মরা নদী', 'নীরন্ধ্র আকাশ', 'পাহাড় কালো', 'মোহমুদ্গর' প্রভৃতি শব্দ বা শব্দ-যৌগ জীবনের অন্ধকার অমাবস্যার দিকটাকে আলোকিত করে।

এইভাবে বিষ্ণু দে-র কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ সংক্রান্ত আলোচনা অন্তহীন পথে এগিয়ে যেতে পারে। খুলে যেতে পারে আরো গহীন কোন অনালোকিত গুপ্তকক্ষের বন্ধ দরজা। বিষ্ণু দে-র কবিতায় ব্যবহৃত শব্দরাজি কবিতার নিবিড় পাঠক ও গবেষককে যেন এক মায়াবী ইশারায় প্রলুব্ধ করে।

তথ্যসূত্র:

১. সরকার, পবিত্র; বিষ্ণু দে: প্রথম পাঠের সংকট, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, বিষ্ণু দে সংখ্যা, বইমেলা ১৪১৬, পৃ- ৪২

২. দে, বিষ্ণু; টমাস্ স্টার্নস্ এলিয়ট, প্রবন্ধ সংগ্রহ-১, দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল ১৯৯৭, পৃ- ২৫৩

৩. চক্রবর্তী, সুমিতা; বিষ্ণু দে-র মনোভুবন: শিল্পমননে সাম্যবাদ, আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ফেব্রুয়ারি ১১, ২০০৮, পৃ- ১৬৫

৪. সরকার, পবিত্র; পর্বোক্ত, পৃ- ৪১

৫. বসু, বুদ্ধদেব; বিষ্ণু দে: চোরাবালি, কালের পুতুল, জানুয়ারি ১৯৫৯, নিউ এজ, পৃ- ৭৯

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রিকা:

১. কবিতা সমগ্র ১, বিষ্ণু দে, আনন্দ, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০০৪, কলকাতা।

২. কবিতা সমগ্র ২, বিষ্ণু দে, আনন্দ, তৃতীয় মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪১৪, কলকাতা।

৩. কবিতা সমগ্র ৩, বিষ্ণু দে, আনন্দ, দ্বিতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ২০০৭, কলকাতা।

৪. বসু, বুদ্ধদেব; বিষ্ণু দে: চোরাবালি, কালের পুতুল, জানুয়ারি ১৯৫৯, কলকাতা।

৫. প্রবন্ধ সংগ্রহ ১- বিষ্ণু দে, সম্পাদনা- ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল ১৯৯৭, কলকাতা।

৬. প্রবন্ধ সংগ্রহ ২- বিষ্ণু দে, সম্পাদনা- ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল ১৯৯৭, কলকাতা।

৭. আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়, দীপ্তি ত্রিপাঠী, দে'জ পাবলিশিং, নভেম্বর ১৯৯৭, কলকাতা।

৮. আমার কালের কয়েকজন কবি, জগদীশ ভট্টাচার্য, ভারবি, আগস্ট ২০০৪, কলকাতা।

৯. আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা, ড: বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রকাশ ভবন, মার্চ, ২০০৯, কলকাতা।

১০. আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়, সুমিতা চক্রবর্তী, ২৭ মাঘ, ১৪১৪, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

১১. আধুনিক বাংলা কবিতা/ স্বরূপে রূপে, ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, নভেম্বর ২০০৫, কলকাতা।

১২. কবি এবং কবিতার বিষয়-আশয়, ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, জুলাই ২০০৮, কলকাতা।

১৩. বিষ্ণু দে, এ ব্রতযাত্রায়, অরুণ সেন, অরুণা প্রকাশনী, ১৩৭০, কলকাতা

১৪. কোরক সাহিত্য পত্রিকা, বিষ্ণু দে সংখ্যা, সম্পাদক: তাপস ভৌমিক, বইমেলা ১৪১৬

সারদাদেবী : চিরকালীন আধুনিকতার এক প্রতিচ্ছবি

পারমিতা দত্ত
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
জে. কে. কলেজ, পুরুলিয়া

সারসংক্ষেপ:- উনিশ শতকের নব জাগরণ বাঙালির সমাজজীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রসার ঘটে। চিরাচরিত সামাজিক দষ্টি ভঙ্গীর পরিবর্তন হয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আদর্শের সম্মিলনে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে নতুন ভাবধারা ও আদর্শের সঞ্চার হয়। এই ভাবধারার আন্যতম নিঃশব্দ প্রচারক ও প্রেরণাদাত্রী ছিলেন সারদাদেবী। অন্তঃপুরে নিভৃতে বাস করে নিজের জীবনযাপন ও বাণীর মাধ্যমে আধুনিক ভারতের তথ্য বিশ্বের মলমূন্ত্র সাম্য ও সৌভাতৃত্বের বীজ বপন করেছেন তিনি। মানবজাতি সভ্যতার ও সংস্কৃতির বিকাশে নিজেকে আধুনিক বলে দাবী করে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বাহ্যিক সুখবিধানে সমর্থ হলেও মানষুের অন্তঃপ্রকৃতির জিজ্ঞাসা নিবারণে ব্যর্থ। আধুনিক সমাজ বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। বর্ণভের্ণ দ, সামাজিক আসাম্য, নারীনিগ্রহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক ব্যাধির নিরাময় এখনও হয় নাই। অথচ, আধুনিক সভ্যতার দাবী হলো মানবতাবোধ, নারীস্বাধীনতা, বিশ্বশান্তি ও আন্তজার্তিকতা। এই আদর্শগুলির রূপায়নে এবং সামাজিক সমস্যাগুলির প্রতিবিধানে সারদাদেবীর নির্দেশিত পথই একমাত্র পরাকাষ্ঠা। যে মানবসভ্যতা যুগ-যুগান্ত ধরে গড়ে উঠেছে তাকে নিজস্ব চিন্তাধারা ও উদার সমাজ সচেতনতার আলোয় সমদ্ধৃ করে এক নতুন মূল্যবোধের সঞ্চার করেছেন তিনি। সংযম, ত্যাগ, তিতিক্ষা ও পরমতসহিষ্ণুতা এই নতুন মলূ্যবোধের মলূ কথা।

মূলশব্দ:- আধ্যাতিকতা, আধুনিকতা, জীবনসাধনা, বাস্তবতা, নারীমক্তি, সমাজসচেতনতা, বিশ্বশান্তি, আদর্শ, সংস্কৃতি।

মলূ আলোচনা :-

আধুনিক যুগের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো উনিশ শতকের নবজাগরণ। বঙ্গ সমাজের চিন্তা ও ভাবধারায় গভীর পরিবর্তন সূচিত হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে যুক্তিবাদী চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা প্রসার লাভ করে। দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত সামাজিক বিশ্বাস ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে সংশয় সৃষ্টি হয়। এক নতুন দষ্টি ভঙ্গি ও মলূ্যবোধের সঞ্চার হতে থাকে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে ভাবধারার সমন্বয়ে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে এক নতুন পরিবর্তন সূচিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ হলেন এই আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। তবে, শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিনী ও প্রেরণাদাত্রী সারদাদেবীর জীবন ও কর্মেরর্মে মধ্যে এই নব ভাবধারা ও আদর্শ সার্থক পরিণতি লাভ

করে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার অভাবনীয় উন্নতীর ফলে মানষু বহিঃপ্রকৃতিকে পরাভূত করেছে। কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতির জিজ্ঞাসা নিবারণে সে ব্যর্থ। ব্যক্তি মানষের জীবন পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যায় জটিলতার আকার ধারণ করেছে। সামাজিক বর্ণভেদ, হিংসা, অশিক্ষা, কুসংস্কার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার সংকট সমাজকে সমস্যাসংকুল করে তুলেছে। এই জটীলতার সমাধানে সারদাদেবীর জীবন ও বাণীর সশ্রদ্ধ অনধুযানই একমাত্র পথ। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়ে এক নতুন মলূযবোধের সৃষ্টি করেছেন তিনি। ইউরোপীয় নবজাগরণের কতকগুলি মৌল আদর্শ সমগ্র পৃথিবীকে প্রভাবিত করে। এগুলি হলো মানবতাবোধ, বিশ্বভাতৃত্ব, ব্যভিস্বাধীনতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, নারীমক্তি, আন্তজার্তিকতা প্রভৃতি। আধুনিকতার এই বৈশিষ্ট্যগুলি সারদাদেবীর জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল। ইউরোপের শিল্পবিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সম্প্রসারণ করেছে। সেইসঙ্গে মানষু আজ বিশ্বনাগরিক হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। রাজনীতি, সমাজনীতি ও বিজ্ঞান যতই উন্নতর হোক না কেন তা সমাজকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করতে পারে না। কারণ এই বিষয়গুলিতে কোনো ধ্রুব সত্য নাই যা বিশ্ববাসীকে ঐক্য সূত্রে গ্রথিত করতে পারে। মানষের আন্তরের মিলনের জন্য প্রয়োজন এক অদ্বয় সত্যের। বেদান্ত দর্শনের পরমতত্ত্বের উপলব্ধি এক্ষেত্রে একমাত্র পথ। আপাত সাধারণ জীবনজাপনের মধ্য দিয়ে, ত্যাগ ও সংজমের মাধ্যমে শ্রীমা সারদাদেবী সমগ্র মানবসমাজকে একসূত্রে গাঁথার পথটি প্রদর্শন করে গেছেন। তাই একজন ইংরেজকেও তিনি পুত্র সম্বোধন করতে পারেন। গভীর বিশ্ব ঐক্যবোধে তিনি বলতে পারেন, "ব্রহ্মাণ্ড জড়ু সকলেই আমার সন্তান"।[১] সৎ ও অসৎ এর মা হয়ে উঠতে পারেন একইসঙ্গে। খ্রীস্টধমের মহান মানবতার আদর্শের সঙ্গে সারদামায়ের বিশ্বমানবতাবোধ একাকার হয়ে যায়। তবে, কেবল করুণাধারা নয় তার চরিত্রে কঠিন ব্যক্তিত্বের মাধুর্য্য ও লক্ষণীয়। সংসারে বিপরীত তরঙ্গের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও বিরুদ্ধ পরিবেশে মানিয়ে নেবার সহজাত ক্ষমতার জন্য তিনি আধুয়নিকা হয়ে উঠেছেন। তার পারিবারিক জীবনেও ছিল কঠোর সংগ্রাম। ভ্রাতাদের স্বার্থবদ্ধি ভ্রাতুস্পুত্রীদের পারস্পরিক হিংসা, সমস্ত কিছু অবর্ণনীয় ধৈর্যের দ্বারা শান্তভাবে তিনি মোকাবিলা করেছেন। জীবনের প্রতিকূলতাকে সহজভাবে গ্রহণ করে আদর্শনিষ্ঠ প্রত্যয়ে তিনি মাথা উঁচুকরে এগিয়ে গেছেন। এই প্রসঙ্গে তার অমোঘ বাণী যখন যেমন তখন তেমন যাকে যেমন তাকে তেমন। যেখানে যেমন সেখানে তেমন।"[২]

জীবন সম্বন্ধে অনসুন্ধিৎসা তার চরিত্রকে বিশিষ্টতা দান করেছিল। জগৎ ও জীবনকে পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষাদান করতেন তিনি। তাই তার শিক্ষা বাস্তবতা থেকে বিচ্যুত নয়। স্বচ্ছ জীবন সৃষ্টির অধিকারী ছিলেন তিনি। তাই তাঁর সন্ন্যাসী সন্তানদেরও তিনি নিরিমিষ খাবারের পক্ষপাতী ছিলেন না। দৈহিক স্বাস্থ্য রক্ষা না হলে মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা যে হবে না এ দরদূষ্টি তার ছিল। কিন্তু অতিরিক্ত আসক্তি সর্বদা পরিত্যাগ করতে বলতেন তিনি। আসক্তিবিহীন হয়ে জীবনের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি সংজমের সঙ্গে

গ্রহণ করাই তার শিক্ষা। তিনি সংসারীদের অনাসক্ত হতে উপদেশ করেন। কর্তব্য সম্বন্ধে তার স্পষ্ট নির্দেশ ছিল। কর্তব্য অবশ্যই করতে হবে কিন্তু ভালোবাসতে হবে একমাত্র ঈশ্বরকে। অর্থাৎ অত্যন্ত সহজভাবে তিনি নিষ্কাম কর্ম করতে বলেন। তাঁর নিজের জীবনেও নিষ্কাম কর্মেরর্মে স্ফুরণ দেখা যায়। সাংসারিক কাজকর্মেরর্মে মধ্যেও আধ্যাত্মিক চিন্তার ওপর তিনি জোর দেন। কারণ, অনাসক্তির অন্যতম পথ হলো ঈশ্বর চিন্তা। ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণের দেহত্যাগ এর পরে তাঁর নির্দেশে তিনি সরু লাল পাড় কাপড়, হাতে বালা পরিধান করতেন। তৎকালীন সময়ে এই ঘটনা ছিল বৈপ্লবিক। বস্তুত আধুনিকতা যে বাহ্যিক আচরণে প্রকাশিত হয় না তা নিতান্তই মননে, চিন্তায় এবিষয়ে শ্রীমার জীবনই বাস্তব প্রমাণ। অল্পবয়সী বিধবাকে তিনি অকারণ কৃচ্ছতা থেকে মুক্ত করেন। আত্মাকে কষ্ট দিয়ে ঈশ্বর লাভ হয় না। তাই ভক্তদের সামান্য খাদ্যগ্রহণ করে ঈশ্বরের আরাধনা করতে বলতেন। মানুষের আকাঙ্খা এক স্বাভাবিক প্রবত্তৃি । একে কোনো অুশাসনের দ্বারা বাঁধা যায় না। তাই আকাঙ্খার পূরণ দরকার। তবেই আকাঙখার প্রতি বিরাগ আসে, ত্যাগের সাধনায় ব্রতী হয় মানুষ। এই আধুনিক জীবন দৃষ্টির আলোকে তিনি সাধারণ জীবন ও মহাজীবনের মিলন ঘটিয়েছিলেন।

জগৎ ও জীবন সম্পর্কে স্বচ্ছ, উদারদষ্টিৃ ভঙ্গির অধিকারী ছিলেন বলেই যুক্তিহীন কুসংস্কার এবং প্রথানগুত্যের বিরোধী ছিলেন তিনি। সাধারন অর্থে আমরা যাদের সমাজসংস্কারক বলে থাকি সারদাদেবী সেই অর্থে সমাজ সংস্কারক ছিলেন না। দীর্ঘকাল প্রচলিত কোনো প্রথাকে সমলূে উৎখাত করে নতনূ ভাবের সঞ্চার তিনি করেন নি। এ বিষয়ে তিনি প্রচলিত সংস্কার পদ্ধতির বিরোধী ছিলেন। প্রাচীন ঐতিহ্যের মধ্যে নতুন ভাব সঞ্চার করে তাকে যুগোপযোগী করার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। সংগঠনের দ্বারা নতুন ভাবের সৃষ্টি ছিল তার আদর্শ। তাই সমাজে নিঃশব্দ বিপ্লব সৃষ্টিতে তিনি অগ্রণী ছিলেন। বিপ্লব সাধনের জন্য যুক্তিপূর্ণ মানসিকতার প্রয়োজন। আত্মজয়ী ব্যক্তির মনই বিপ্লবের উৎসস্থল। তিনি নিজে ব্রাহ্মণ ছিলেন। জন্মগত নয় চরিত্রগত অর্থে ব্রাহ্মণত্বের অধিকারী হতে বলতেন তিনি। প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মনত্ব হল একটি উচ্চতর মানব আদর্শ। মানষুকে নিজের কর্মপ্রর্ম চেষ্টার দ্বারা তা আয়ত্ত করতে হবে। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে বলা হয়েছে সত্ত্ব গুণের প্রাধান্য যার মধ্যে রয়েছে তিনি ব্রাহ্মণ। শ্রীমা অন্তরে এই বাণী ধারণ করে তাঁর ভাইঝি রাধুকে পরামর্শ দিয়েছিলেন বৈদ্য শ্যামাদাস কবিরাজকে প্রণাম করতে। কারণ তাঁর পাণ্ডিত্য আছে। মানষুকে তিনি দেবতার আসনে বসিয়েছিলেন। এই নিঃশব্দ বিপ্লব তিনি শতাধিক বৎসর পূর্বে বঙ্গসমাজে ঘটিয়ে গেছেন। জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত ভক্তকে এক আসনে বসিয়ে আহার করতেন তিনি।

সারদাদেবী ছিলেন বিজ্ঞানমনস্ক। অথচ প্রথাগত বিজ্ঞানশিক্ষা তার ছিল না। শুচিবাইকে তিনি মারাত্মক ব্যাধিজ্ঞান করতেন। উদার ও যুক্তিবাদী দষ্টিৃ ভঙ্গীর জন্য তিনি যা কিছুনতনূ তা গ্রহণ করতেন অঞ্জলী ভরে। কলকাতায় তিনি ইউরোপীয়ান ও

আমেরিকান মহিলাদের সঙ্গে একত্রে আহার করেছিলেন। নিবেদিতাকে হিন্দুরীতিনীতি শেখাবার জন্য নিজের কাছে রেখাছিলেন। বেদান্তের শুদ্ধ চৈতন্যকে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন নিজের কর্মে এবং জীবনসাধনায়। সৎ-অসৎ এর ভেদ জ্ঞান হলে তবে মন শুদ্ধ হয়। সমাজ বিষয়ে তার সচেতনতা ছিল প্রসংশনীয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেমে গেলে শান্তির জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন চোদ্দো দফা সন্ধির শর্ত ঘোষণা করেন। যতীন্দ্রনাথ ঘোষ এসম্বন্ধে শ্রীমা কে অবহিত করেন। তিনি মনে করতেন, বহৎ প্রয়াস কেবল মৌখিক বিষয়েই সীমিত থাকে না। আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা না করলে কখনোই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না। আজ বিশ্বের দিকে দষ্টি পাত করলে বোঝা যায় তিনি কতটা অভ্রান্ত ছিলেন।

আধুনিক যুগের অন্যতম একটি ধারণা হলো নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী স্বাধীনতা। বিদ্যাসাগর ও রামমোহন এর সমাজসংস্কার আন্দিলন নারীর স্বাধীন ব্যক্তিত্বের জয়গান করে। নারীশক্তির জাগরণে সারদাদেবী মূলতঃ ২ ধরনের ভূমিকা পালন করেন। প্রথমতঃ আদর্শ নারীর উদাহরণরূপে তিনি জগতে নিজেকে উপস্থাপিত করেন এবং দ্বিতীয়ত নারীকল্যান ও নারীশিক্ষার প্রসারে তিনি নিজে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নারীর পরিচয় স্ত্রী রূপে অথবা সহকারিণী রূপে। নারীর সর্বাপেক্ষা মহিমাময় রূপ হলো মাতৃরূপ। সারদাদেবীর মাতৃরূপের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের নারীর চিরাচরিত রূপটি ফুটে ওঠে। তাই বিবেকানন্দ তাকে ভারতের নারী জাগরণের পথিকৃৎ মনে করতেন। সারদাদেবী নারীদের মনন ও আত্মশক্তির বিকাশে গুরুত্ব দিতেন। নারীশিক্ষার প্রসারে তার বিশেষ সমর্থন ও উৎসাহ ছিল। নিবেদিতার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তিনি সক্রিয় সাহায্য করেন এবং সেখানে মেয়েদের পড়ানোর জন্য তিনি ভক্তদের উৎসাহ দেন। তাঁর উৎসাহে গৌরি মা ১৩০১ সালে ব্যারাকপুরে সারদেশ্বরী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এটি তৎকালীন নারীদের ত্যাগ ও সেবার কার্যে শিক্ষিত করে তোলে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়ন মূলতঃ নারীর পার্থিব সুখ-সুবিধা ভোগ ও পুরুষের সম অধিকার আদায়েই সীমাবদ্ধ। কিন্তু সারদাদেবী নিজস্ব পারিবারিক ও ধর্ম আচরণের মাধ্যমে নারীশিক্ষা ও নারী স্বাধীনতার ভিন্ন অর্থের সন্ধান দেন। শিক্ষার সঙ্গে সংযম, ত্যাগ ও আধ্যাত্মিকতার মেলবন্ধন প্রয়োজন। তবেই রাজনৈতিক, শিল্পকলা এবং সাংসারিক জীবন সর্বক্ষেত্রেই প্রকৃত স্বাধীনতার অধিকারী হতে পারে আধুনিক নারীসমাজ।

জাতীয়তাবোধ ও আন্তজার্তিকতা বোধের সমন্বয় ঘটেছিল সারদাদেবীর চিন্তন ও মননে। দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতি ছিল। বিপ্লবীদের প্রতি বিদেশী শাসকদের উৎপীড়নের প্রতিবাদে ইংরেজদের প্রতি তাঁর ক্ষোভ ছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে তাদের প্রতি তিনি বিদ্বেষমনোভাবাপন্ন ছিলেন না। তিনি মনে করতেন স্বদেশী আন্দোলন কখনোই বিদেশী বিদ্বেষ নয়। তিনি জগতের সকলকে আপন করে নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ কেউই অনাত্মীয় বা পর নয়। এই ভাবে তিনি

জাতীয়তাবোধ ও বিশ্বমানবের মধ্যে মহাসমন্বয়ের বীজ বপন করে গেছেন। তাঁর অনন্য চরিত্র ভাস্বর হয়েছিল ব্যক্তির অধিকারের স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে। ভক্তদের মধ্যে কেউ ব্রাহ্ম। হলে তিনি তাকে ঠাকুরের প্রসাদ দিতেন না। প্রকৃতপক্ষে তিনি সর্বাস্তিবাদী ছিলেন। নব-বেদান্তের সর্বাত্মক প্রয়োগ তাঁর জীবনব্যাপি কর্মেরর্মে মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল। সারদাদেবীর জীবনে ভূমা ও ভূমির মধ্যে সমন্বয় সাধন হয়েছিল। ধর্ম, কর্ম আধ্যাত্মিকতা ও সংসারজীবনের মধ্যে যে কোনো বিরোধ নেই তা নিজের জীবন ও কর্মেরর্মে মধ্য দিয়ে তিনি দেখিয়ে গেছেন। ব্যক্তিগত ও সমষ্টি জীবনের সার্থকতা হলো সমন্বয়ে। পারস্পরিক সহযোগিতা, শ্রদ্ধা এবং অন্য জাতির প্রতি সম্মান ছাড়া বিশ্বজনীনতা অসম্ভব একথা তিনি দঢ়ৃ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। সহনশীলতা ও সংযমের দ্বারা তিনি হিংসা ও ভেদকে পরাজিত করার শিক্ষা দিয়েছেন। এখানেই সারদাদেবী চিরন্তন আধুনিকতার প্রতিচ্ছবী হয়ে উঠেছেন।

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জী:-

১. শ্রী শ্রী মায়ের কথা (২য় ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ৮ম সংস্করণ, ১৩৮৫, পৃঃ-৪২২)
২. শ্রী শ্রী সারদাদেবী (ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, ক্যালকাটা বকু হাউস, কলিকাতা, অস্টম সংস্করণ, ১৩৮৮, পৃঃ-২০৩)
৩. শ্রীমা সারদাদেবী- স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, (ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৩৮৪) বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, তৃতীয় খন্ড শঙ্করী প্রসাদ বসু, মণ্ডল বকু হাউস, কলিকাতা (১৩৯০)
৫. শ্রী শ্রী মায়ের কথা, প্রথম ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, দ্বাদশ সংস্করণ, (১৩৮-৭)
৬. স্বামীজীর বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮-৪) শতরূপে সারদা স্বামী সুপর্ণানর্ণন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা, (২০১৬)

সত্তরের ছোটগল্প : প্রতিষ্ঠান বিরুদ্ধ স্রোত

নবীনচন্দ্র দে
গবেষক, বাংলা বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : বড় পত্রিকার অবস্থান বাংলা সাহিত্যে নিঃসন্দেহে গৌরবের অধ্যায়। যেখানে আশ্রয় পেয়েছে বাংলার বহু খ্যাত লেখক লেখিকারা। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে বড় পত্রিকা নিজের অবস্থান বদলেছে। টিকে থাকবার দৌঁড়ে নিজেকে বদলেছে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে। সঙ্গে বদলাতে হয়েছে তার সাথে জড়িয়ে থাকা লেখক লেখিকাদের সাহিত্যের মানসিক অবস্থান। সত্তরের লেখকেরা এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল সাপ্লাই করলেন না তাঁরা। তার বদলে নিজেদের স্বতন্ত্র অবস্থানকে খুঁজে নিলেন নিজেরাই। পুঁজিবাদী আগ্রাসনকে তাঁরা ভাঙলেন শিল্পীর স্বাধীনতা দিয়ে। তাঁদের হাতে সাহিত্য আর পণ্য হয়ে রইলো না। হয়ে উঠল শিল্পের স্বতন্ত্র পরিচায়ক। তাঁরা চিহ্নিত করলেন বড় প্রতিষ্ঠানের লেখকদের মিথ্যাচারকে। চিহ্নিত করলেন শাসন ও কুশাসনের মধ্যেকার পার্থক্য। নিজেদের এই বিদ্রোহী সত্তাকে তাঁরা বিকল্প সাহিত্যের ধারা হিসেবে রাখলেন না। সময়ের সাথে সাথে সাহিত্যের মূল ধারার সাথে তার যোগ প্রতিষ্ঠা করে দিলেন।
সূচক শব্দ : প্রতিষ্ঠান, শিল্পের কাঁচামাল, শিল্পীর স্বাধীনতা, কর্পোরেটায়ন, ছোটপত্রিকা, পুঁজিবাদ।

নিয়মিত চালের পিটুলিকে দুধ বলে খাবার অভ্যাস দুধের প্রকৃত স্বাদকে ভুলিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। সত্তরের সাহিত্য তথা সাহিত্যিকদের এমনই এক পরিমণ্ডলের মধ্য দিয়ে যাত্রা করতে হয়েছিল। যদিও এই পরিমণ্ডলের সলতে পাকানোর কাজ বিগত কয়েক দশক থেকে আরম্ভ হয়েছিল। যা ক্রমশ আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল সাহিত্যের মৌলিক অবস্থানকে। সঙ্গে স্বীকৃতি জানানো হতে থাকে প্রতিভার অন্ধত্বকে। যে অন্ধ প্রতিভা দুধের পুষ্টি গুণে মান্যতা পাচ্ছিল পাঠক সমাজে। তাইতো ১৯৭৮ সালের ৪ঠা নভেম্বর 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদকীয় অংশে সাগরময় ঘোষ লিখছেন, "...বাংলা সাপ্তাহিক এই 'দেশ' পত্রিকা বাংলা সাহিত্য জীবনের রূপ ও প্রকৃতির ঐতিহাসিক প্রগতির সকল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থেকে যেমন সেবকের তেমনি নায়কের কর্তব্য পালন করে এসেছে।"[১] মানতে দ্বিধা নেই এই 'দেশ' পত্রিকায় একসময় প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শেষ কথা', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মহানগর', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জন্ম ও মৃত্যু', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালাপাহাড়', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিবেক', আশাপূর্ণা দেবীর 'কপালে নেইকো ঘি', অচিন্ত্যকুমার

সেনগুপ্তের 'গার্ড সাহেব', শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রতিনিধি', সৈয়দ মুজতবা আলীর 'নোনা জলে'র মতো নানা গল্প। একে নিঃসন্দেহে সেবাকর্ম বলা যেতে পারে। সেই সঙ্গে যাঁদের অবস্থান একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নিঃসন্দেহে গর্বের। কিন্তু একই সাথে 'নায়কের কর্তব্য' পালনের মত ঔদ্ধত্যপূর্ণ মানসিকতা কখনোই গ্রহণীয় হতে পারে না। কেননা এই একটি বাক্যের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে আমিত্ববোধের সর্বগ্রাসী মনোভাব। যা নিজের প্রয়োজনে প্রিয়কে দেবতা, দেবতাকে প্রিয় করতে সংকোচবোধ করে না। বাণিজ্য শব্দটির মধ্যেই রয়েছে পুঁজিবাদের বীজ। বেঁচে থাকা বা বলা ভালো সামাজিক অভিব্যক্তির সাথে টিকে থাকার জন্য এই বীজকে বপন অন্যায় নয়। কিন্তু সাহিত্যের বিকাশে এই ধরনের মানসিকতা সাহিত্যকে প্রয়োজন ও প্রয়োজনের সরবরাহকারী পণ্যে পরিণত করে। যার পরিচয় মেলে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের কথায় (১৯৩৩-২০০৫)। "আমি শরতের কাছে শুনেছিলাম (শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়), সাগরময় ঘোষ ওকে বলেছিলেন যে 'তোমাকেও তো লিখতে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল শরৎ, বাট ইউ কুড্ নট ডেলিভার দ্য গুডস।"[২] লক্ষ্য করবার মতো এই 'গুডস' শব্দটি। আসলে গাধার নিঃসংকোচ মালবাহী ক্ষমতা গাধাকে চিরকাল গাধাই বানিয়ে রাখে। তার জীবনের কোনো উন্নতি ঘটায় না। শিল্পের ক্ষেত্রেও তা একই ভাবে সত্য। আর এর ফলেই তৈরি হয় প্রতিভার অন্ধত্ব। মনে রাখতে হবে বড় প্রতিষ্ঠানে না লিখতে পারার অসফলতা থেকে এই কথাগুলো উঠে আসেনি। আসছে একজন শিল্পীর ভাবনা, ভাষা ও সত্যকে দেখার ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পরিকাঠামো রূপে অবস্থানকে নিয়ে।

প্রতিষ্ঠান চাইছে গল্পে কৃত্রিম অথচ ঝকঝকে ভাষা ও ভাবনা। চাইছে একটি ছাঁচে গড়া ডিম্বাকার কাহিনি। একটি বড় প্রতিষ্ঠান সবসময় একটি যুগের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। করে থাকে সেই যুগের অন্যান্য সাহিত্যিকদের প্রভাবিত। যদিও দেবেশ রায়, মতি নন্দী, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো লেখকরা প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত থেকেও প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রভাবিত হননি। তবুও প্রাতিষ্ঠানিক মানসিকতা সেদিন গ্রাস করেছিল বহু লেখকের স্বাধীন লেখনি। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে বুদ্ধদেব গুহ'র (১৯৩৬-২০২১) 'কিছুদিন' গল্পের কথা। যেখানে তিনি ঋজুর লালগোলা প্যাসেঞ্জারে যাত্রার মধ্য দিয়ে প্যাসেঞ্জারদের অমানবিকতাকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। গল্পের মূল কাঠামোর সাথে ঋজুর স্ত্রীর কোনো যোগ নেই। তবুও ঋজুর ভাবনার মাধ্যমে স্ত্রীর যৌন অনুসঙ্গ লেখক প্রথমেই নিয়ে এসেছেন। "—ও শুধু নয়নার কথা ভাবে। তার শীতের রোদের মতো নরম পেলোবো ত্বকের কথা। তার ঠোঁটের দারুণ মিষ্টি বুনো বুনো গন্ধের কথা।"[৩] এই বর্ণনা যে কেবল পাঠক মনোরঞ্জনের জন্য তা বলবার অবকাশ রাখে না। গল্পের পরবর্তী পর্যায়ে দেখা গেল ট্রেন পায়রাডাঙা স্টেশনে পৌঁছায়। এবং সেখান থেকে ট্রেনের কামড়ায় ওঠার চেষ্টা করতে থাকে দশ-পনেরো বছরের একদল ছেলে। ট্রেনের অ্যাটেন্ড্যান্টের তৎপরতায় কামড়ায় ভেতরে আসতে

পারে না তারা। কিন্তু বন্ধ কামড়ার দরজায় চলতে থাকে নির্বিচারে কিল ও ঘুষি। সঙ্গে দু-একটা ইটও পড়তে থাকে। গাড়ির মধ্যে বসে থাকা ভদ্রলোকেরা দরজা বন্ধ করে নিজেদের যাত্রা নির্বিঘ্নে রক্ষা করতে খবরের কাগজে মনোনিবেশ করে। তখনই হঠাৎ চেতনা জেগে ওঠে ঋজুর। সে রুখে দাঁড়ায় ছেলের দলের সামনে। তার ফল ঘটে অপ্রত্যাশিত। একটি ছোট ছেলের ছোঁড়া ইটে থেঁতলে যায় ঋজুর ডান চোখ। এবং ঋজুকে সেই অবস্থায় ফেলে রেখে ট্রেন যাত্রা করে নিজের পূর্বনির্ধারিত গন্তব্যে। "ঋজু ওর ঘোরের মধ্যেই শুনতে পেল হুইসেল বাজিয়ে রুদ্ধ জানালার ইজ্জতের গাড়িটা ধীরে ধীরে, ওর সব সহযাত্রীর কালো কফের মতো সম্মান নিয়ে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে গেল।"[৪] এটি গল্প না হয়ে খবরের কাগজের প্রতিবেদন হলে কোনো অসুবিধা ছিল না। কেননা ছোটগল্পের প্রথম লাইনটি যেমন পাঠককে সরাসরি গল্পের মধ্যে নিয়ে যায় সেই রকম চমক এখানে নেই। এবং গল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে গল্পের একটি উদ্দেশ্য প্রাধান্য পেয়েছে ঠিকই। কিন্তু তা পরিপূরণের জন্য লেখকের ভাবনার বুননের অভাব স্পষ্ট। এবং শেষটিও কোনো রকম চমকপ্রদ হয়ে ওঠেনি। আসলে এখানে লেখক একটি সময়ের মানসিকতাকে ধরতে চাননি। তার বদলে ঘটনার বর্ণনাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। যা লেখকের তাড়াতাড়ি গল্প লেখার দায়ভার থেকে অব্যাহতি পাওয়ার মানসিকতাকেই স্পষ্ট করে। এই প্রসঙ্গেই আসে সত্তরের লেখকদের কথা। কেননা তাঁদের ক্ষেত্রে লেখা সরবরাহের দায়ভারের থেকে লেখার শিল্পমানকে প্রকাশ করবার তাগিদই ছিল মুখ্য। শৈবাল মিত্রের (১৯৪৩-২০১১) 'আবহমান স্বদেশ' গল্পটির কথাই ধরা যাক। যেখানে অমলেন্দু ট্রেনে করে চলেছে হাওড়া থেকে দিল্লি। লেখক অমলেন্দুর যাত্রার আবহাওয়ার সাথে একটি সময়কে বেঁধে দিয়েছেন। যে সময় তৈরি হয়েছে ইন্দিরা গান্ধীর দেহরক্ষীদের হাতে গুলি বিদ্ধ হয়ে মারা যাবার মধ্য দিয়ে। যদিও গল্পে একটি শিখ যুবককে রক্ষা ও দেশে অকস্মাৎ ঘটে যাওয়া দাঙ্গার প্রসঙ্গ এসেছে। সঙ্গে ছেলেটিকে রক্ষা করতে না চাওয়া ট্রেনের অন্য যাত্রী ও অমলেন্দুর তাদের বিপক্ষে রুখে দাঁড়াবার মানসিকতাই মুখ্য। কিন্তু শিল্পীর শিল্প গুনে বিষয়টি মানবিকতার চরম নিদর্শন হিসাবে পাঠকের সামনে উপস্থিত হয়েছে। "মিসেস গেলট বলল, ভাইয়া, আপনাকে একটা কথা বলতে এলাম। ভাইয়া ডাক শুনে সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে অমলেন্দু বলল, আপনার ছেলেকে আমি দেখবো।"[৫] অমলেন্দুর এই প্রতিশ্রুতি গল্পকে দিয়েছে শিল্পের প্রাণ। যাকে কোনো ভাবে 'গুডস' বলে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। আর এখানেই পার্থক্য তৈরি হয় শিল্পের তাগিদের সাথে, গুডসের তাগিদের।

একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই, প্রতিষ্ঠানই আশ্রয় দিয়েছিল বহু লেখকদের। একসময় প্রায় সমগ্র কৃত্তিবাসের লেখকমন্ডলী চলে আসে প্রতিষ্ঠানের আওতায়। কেননা শিল্পের আগে শিল্পীর বেঁচে থাকা জরুরি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯৩৪-২০১২) কথাতে, "...আমি আমেরিকা থেকে ফিরে আসি ১৯৬০ সালে। তখনকার আমেরিকা আর এখনকার আমেরিকা তো এক নয়। তখন অনেক সুযোগ

ছিল। চাকরি-বাকরি পেতেই পারতাম। পেয়েওছিলাম। সেখানে গিয়ে আমি বাংলা লিখব, ‘এই করব, সেই করব’। অনেক বায়ানাক্কা নিয়ে দেশে ফিরে এলাম। সেখানে আমার বান্ধবী ছিল, অ্যাপার্টমেন্ট ছিল, চাকরির সুযোগ ছিল, সব ছিল। কিন্তু আমি সব ছেড়ে চলে আসি। এসে কাঠ-বেকার অবস্থায় দু-বছর এখানে লড়াই করেছি। তারপর ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ আমাকে চাকরি দেয়। আমার বাবা মারা যাওয়ার পরে সংসারের দায়িত্ব আমাকে নিতে হয়। আমি বাড়ির বড়ো ছেলে। গদ্য লেখা শুরু করি কোনো অ্যামবিশনে নয়, জাস্ট টাকার জন্য। করতে করতে ১৯৮০ সালের পরে টাকার অভাবটা আমার মিটে যায়। এখন আমি কিন্তু টাকার জন্য লিখি না। যা আছে বা যা পাই, তাতে আমার চলে যায়। কিন্তু চক্র থেকে ছাড়া পাওয়া খুব মুশকিল।”[৬] আর এই মুশকিলটা যে কিরূপ ভয়ংকর তা প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত লেখকেরা পরবর্তীকালে ভালোই বুঝেছিলেন। কিন্তু বুঝেও ছিল নিরুপায়। কেননা প্রতিষ্ঠানের উপর কিছুই নেই। তাই তো, “‘দেশ’পত্রিকার একজন কর্মী হলেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, তিনি কিছু করেন না। কোম্পানি বলেই দিয়েছে, কিছু করতে হবে না। আমাকে বলেছে আপনি শুধু সম্পাদকীয় লিখবেন, আর কবিতা জয় গোস্বামী দেখবে, আপনি তার ওপর একটু দেখে দেবেন, ব্যস। আর-কিছু আপনাকে দেখতে হবে না। আজ ‘দেশ’ পত্রিকায় একটা বইয়ের রিভিউ ছাপাবার ক্ষমতা নেই আমার।”[৭] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই স্বীকারোক্তি প্রমাণ করে শিল্পীর দায়বদ্ধতা। সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের নৈতিকতা শূন্য মনোভাব। এইজন্য হয়তো তারা মিথ্যাচারকে প্রশ্রয় দিয়েছে নির্দ্বিধায়। ছাপা মেশিনের উদরে খাদ্য জোগান রাখাই তাঁদের উদ্দেশ্য। এ কারণেই হয়তো শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (১৯৩৫-) শ্রমিক নেতা সুবিনয়ের ভাবনায় (‘মুনিয়ার চারদিক’) মার্কসবাদের দু’রকম ব্যাখ্যার উপস্থাপন ঘটিয়েছেন। দীর্ঘদিন সুবিনয়ের কারখানা বন্ধ। কিন্তু মার্কসবাদী মানসিকতায় সে ধরে রেখেছে নিজের মনোবল। “পূর্ব এশিয়ার মুক্তি আনছেন কার্ল মার্কস। আরো কত লড়াই পড়ে আছে। এ তো সামান্য একটা কারখানার কয়েকজন শ্রমিক, আর লড়াইটাও ছোট—যার কথা খবরের কাগজে খুব ছোটো হরফে বেরোয়। এইসব ভেবে সুবিনয় মনের জোর ফিরিয়ে আনত।”[৮] একসময় দু’দলে ভাগ হয়ে যায় কারখানার শ্রমিক সংগঠন। সেই সুযোগ নিয়ে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের এলোমেলো শর্ত মেনে খুলে দেয় কারখানা। এবং নিজেদের এই জয়কে শ্রমিকদের জয় বলে ঘোষণা করে। কাহিনির এই পরিস্থিতিকে মার্কসবাদী বিশ্বাসের ভাঙন বলে প্রমাণ করতে চাইলেন লেখক। তাই তিনি লিখছেন, “তার শোয়ার ঘরে মাথার কাছে আছে কার্ল মার্কসের একখানা ছবি। স্মিত মুখ, তৃপ্ত, আত্মবিশ্বাসী। যতবার সেই মুখ মনে পড়ে ততবার সুবিনয় অন্যমনস্ক হয়ে যায়। মনে হয়, এ ঠিক জীবন নয়, অন্যতর এক জীবন অপেক্ষা করছে তার জন্য। পূর্ব এশিয়ার যোজন জুড়ে শকুনের ডানার ছায়া। মুক্তি আনবেন কার্ল মার্কস। কাচের স্বচ্ছ আবরণের ওপাশে কুয়াশার জড়ানো রোদ, সুন্দর সকাল, সুবিনয় অন্য মনে চেয়ে থাকে, চায়ে চুমুক দেয়।”[৯] আসলে লেখকের এই ভাবনায় সম্পূর্ণ মার্কসীয়

মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেনি। তার বদলে মার্কসীয় সংশয়ে ঘৃতাহূতির বন্দোবস্ত করেছেন যেন তিনি। সত্তরের লেখকদের মধ্যে এই মানসিকতা কখন মেলেনি। তাই তাঁদের লেখায় সত্য-মিথ্যের আসল রূপ অব্যক্ত ভাবে ধরা পড়েছে। যখন স্বপ্নময় চক্রবর্তী (১৯৫১-) 'লেলিন' গল্পে বলেন, বন্যা বিপর্যস্ত মানুষের দল চলেছে আশ্রয়ের খোঁজে। ওদের ঘরে আজ অনেক জল। তাই ঘর ছাড়বার আগে গুছিয়ে নিয়েছে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি। "পুঁটুলিতে প্রিয় জিনিস কোলে কাঁখে সন্তান। ঐ লোকটার পুঁটুলিতে একটা ছবি। বাঁধানো ছবি। ছবিটার অর্ধেক বেরিয়ে আছে। কার ছবি? লেনিনের? ঐতো টাক মাথা মুখে দাড়ি। পুঁটুলিতে চলেছেন লেনিন।"[১০] আসলে ওই মানুষগুলো জানে বাঁচতে হলে কখনো কখনো হার মেনে দু'পা পিছোতে হয়। তাই বলে নিজের বিশ্বাসের বেসাতি কখনোই সম্ভব নয়। এই মানসিক ভাবনা পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠান কখনোই গড়ে দিতে পারে না। তার জন্য প্রয়োজন চিন্তার স্বাধীনতা। দেখবার সারল্য। সত্তর তা পেরেছিল। আর পেরেছিল বলেই তাঁরা স্বতন্ত্র।

বাংলার শিল্প-সাহিত্য যে প্রতিষ্ঠান শাসিত সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু শাসন ও কুশাসন এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের (১৯৬১-) ভাষায়, "আসলে কর্পোরেটায়ন-প্রক্রিয়া চায় শিল্প কেবল মানসিক ভোগের সরবরাহী হবে। শব্দ, রং, সুরকে দেহের ইন্দ্রিয়ের দাস বানাতে হবে, কারণ মানুষের কোনো অতীত ও ভবিষ্যৎ নেই—কেবল 'বর্তমান'। যা যা আমাদের ইন্দ্রিয়কে সুখ দেবে, তাই-ই হবে শিল্পের উপজীব্য।"[১১] বুদ্ধদেব বসুর 'চোর! চোর!', শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'উত্তরের ব্যালকনি', 'স্বপ্নের ভিতরে মৃত্যু', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সাঁকো', 'মহাপৃথিবী', সমরেশ বসুর 'নিষিদ্ধ ছিদ্র', 'পেলে লেগে যা'— এর মতো গল্পে সমসাময়িক সময়, ঘটনা, যৌন সুড়সুড়ির মতো নানা অনুসঙ্গ এসেছে। কিন্তু এই সকল কাহিনির অবস্থান অনেক ক্ষেত্রেই সংবাদপত্রের শূন্যস্থান পূরণের মাধ্যম হয়েই থেকে গেছে। কেননা আদি-মধ্য-অন্ত বিশিষ্ট এই সকল গল্পগুলি মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে তুষ্ট করবার গল্প। মধ্যবিত্ত মানসিকতার পতন সংক্রান্ত গল্প। যার প্রধান লক্ষ্য কলকাতার নগরকেন্দ্রিক জীবন। হয়তো সেই কারণে ১৯৮৬ সালে "বর্তিকায় প্রকাশিত নিবেদন অংশে লেখা হচ্ছে, বর্তিকা বের করবার প্রধান উদ্দেশ্য হল গ্রাম ও শহরের নিম্নবিত্ত পাঠকের হাতে বই পৌঁছানো।"[১২] মনে রাখতে হবে লেখা প্রকাশের ক্ষেত্রে মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬) কোনো রকম প্রাতিষ্ঠানিক মিথ্যাচারকে প্রশ্রয় দেননি। সেই কারণেই সত্তরের তরুণেরা নিজেদের পথ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাঁর অভিভাবকত্ব মেনে নিয়েছিলেন নির্দ্বিধায়। যার দৃষ্টান্ত লুকিয়ে আছে ১৯৮১ সালে অভিজিৎ সেনকে (১৯৪৫) লেখা মহাশ্বেতা দেবীর এক চিঠিতে। "প্রমা পত্রিকায় আপনার ব্যবচ্ছেদ গল্পটি পড়লাম। মোটামুটি একই ব্যাপার। মন্দ নয়, তবে কিছু কিছু ব্যাপারে এবার সাবধান হবার সময় এসেছে। বিষয়বস্তুর মধ্যে কিছুটা একঘেয়েমি এসে যাচ্ছে। অবশ্য হয়তো ভেবেছেন সমস্যাগুলিকে এখন repeat করা দরকার। লেখকের নিজেকে তৈরি করার

ব্যাপারে কিন্তু সেটা খুব কাজের কথা নয়।”[১৩] আসলে দ্রৌপদী মেঝেন বা হাজার চুরাশির মা মহাশ্বেতা দেবীর অবস্থান ষাট-সত্তরে এক ব্যতিক্রমী সত্ত্বা রূপে এসেছে। যিনি নিজে প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের দেখেনদাড়িতে প্রভাবিত হননি। সঙ্গে জঙ্গল কেটে গন্তব্যের হদিস দিয়ে গেছেন আগমনীদের।

প্রতিষ্ঠানের একাধিপত্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য কেবল ‘বর্তিকা’ই সত্তররের লেখকদের আশ্রয় দেয়নি। অসংখ্য ছোটপত্রিকাও সেই সময় নিজেদের দার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল সত্তররের তরুণদের জন্য। ‘প্রমা’-র সম্পাদক সুরজিৎ ঘোষ জানাচ্ছেন, “তরুণদের লেখা প্রকাশ করি না এই অপবাদ থেকে বাঁচার জন্য এবং ভালো গল্পের কাগজ না থাকার কারণে এই প্রবন্ধ প্রধান কাগজটিতে আমরা গল্পের জন্য অনেকটা জায়গা দিয়ে থাকি।”[১৪] সম্পাদকমশাই এই কথা বললেন বটে। কিন্তু প্রতিষ্ঠান ও ছোটপত্রিকা এই দু’য়ের মধ্যে এক যুগ্ম সহবস্থান ধরে রেখেছিল ‘প্রমা’। কেননা এখানে একদিকে অবলীলায় প্রকাশ পেয়েছিল মেইন স্ট্রিমের লেখকদের বই। সেই তালিকায় যেমন ছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বসু তেমনি কবিদের মধ্যে ছিলেন অরুণ মিত্র, শঙ্খ ঘোষ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এর পাশাপাশি সত্তরের তরুণদের লেখাও খুব সহজেই জায়গা পেয়েছে ‘প্রমা’-তে। নবারুণ ভট্টাচার্যের ‘ফ্যাতাড়ু’, ‘মাথা নেই তো কি হয়েছে’, ‘ফোয়ারার জন্য দুশ্চিন্তা’, অভিজিৎ সেনের ‘ব্যবচ্ছেদ’, স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ‘সরষে ছোলা ময়দা আটা’, ‘ভালো করে পড়্গা ইস্কুলে’র মতো গল্প প্রকাশ পাচ্ছিল এখানে। আসলে সম্পাদকের মূল লক্ষ্য ছিল পত্রিকার উৎকর্ষ ও প্রতিষ্ঠা। হয়তো সেই কারণেই তাঁর এই দ্বৈত অবস্থান। এদিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মী অবস্থান পালন করেছে ‘অনুষ্টুপ’। পুরনো লেখার নব রূপায়ন, কিংবা গল্প কবিতার গতানুগতিক প্রাতিষ্ঠানিক মুদ্রণ তাঁরা করলেন না। তাঁদের বক্তব্যের তীক্ষ্ণতা ও প্রতিবাদের স্বতন্ত্র মানসিকতা চ্যালেঞ্জ জানালো প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে। তাইতো ‘অনুষ্টুপে’ প্রকাশিত হয়েছে একে একে অভিজিৎ সেনের ‘জেহাঙ্গি’, অমর মিত্রের ‘কেরানীর সমস্ত জীবন’, স্বপ্নময়ের ‘অষ্টচরণ ষোল হাঁটু’, ‘শনি’, ভগীরথ মিশ্রের ‘রাবণ’, ‘মিডফিল্ডার’, শচীন দাশের ‘ইতিহাসের খোঁজ খবর’, কিন্নর রায়ের ‘সরস্বতী’র মতো নানা গল্প।

এই প্রসঙ্গে বলতে হয় সত্তরের লেখকেরা যে কেবল ছোটপত্রিকায় লেখা প্রকাশ করেছেন এমন নয়। দেখা যায় ‘আনন্দবাজার পত্রিকায়’ প্রকাশিত হয়েছে অমর মিত্রের ‘কোকিল’, স্বপ্নময়ের ‘ঝড়ে কাক মরে’, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের, ‘হেলীপ্যাডে সূর্যস্নান’। এছাড়া ‘দেশ’ পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছে ভগীরথের ‘নৌকা বিলাস’, আফসার আহমেদের ‘অপ্রেম অমরণের’ মতন নানা গল্প। তবুও বলতে হয় সত্তরের লেখকদের গল্প লেখার সূত্রপাত এবং পরিণতি লাভ কিন্তু ছোটপত্রিকার হাত ধরেই। প্রতিষ্ঠানের বড় পরিসরে লেখা প্রকাশ হলেও এঁদের লেখা কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিকতা থেকে ছিল মুক্ত। এদিক থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী কিন্নর রায়। যাঁর সাহিত্যের বিচরণ কেবলমাত্র সীমাবদ্ধ

ছিল ছোটপত্রিকাতেই। কিন্তু দেখা যায় অনায়াসে কোনো লেখকের লেখাই স্থান পায়নি ছোটপত্রিকায়। 'অনুষ্টুপে'র সাথে ঘটা নিজের সেই অভিজ্ঞতার কথা ধরা পড়েছে অমর মিত্রের স্মৃতিতে। "আপনি আমার যে গল্পটি—অর্থাৎ মাঠ ভাঙে কালপুরুষ-এর এত প্রশংসা করেন, সেটি তো আপনারা ফেরত দিয়েছিলেন। তারপর হাসতে হাসতেই আবারও বলেন, 'অবশ্য মতামত সহ'।"[১৫] বিদ্রোহ ঘোষণা তারুণ্যের স্বভাবধর্ম। কিন্তু সেই বিদ্রোহকে তীক্ষ্ণ নজরের অনুশাসনে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল এই সকল ছোটপত্রিকা। যেখানে রয়েছে 'প্রতিক্ষণ', 'অনীক', 'অমৃতলোক', 'গল্পগুচ্ছ', 'নন্দনে'র মতো বহু পত্রিকা। আর এই কাজ যে কতটা সফলতার সাথে তাঁরা করে গেছেন তার স্বীকৃতিতো মেলে পাঠকের প্রতিক্রিয়াতেই— "একদিন বিখ্যাত অভিনেতা বিকাশ রায়-এর পুত্র সুমিত রায় এলেন। পাশাপাশি অনেক বাণিজ্যিক শারদীয় পত্রিকা শোভা পাচ্ছিল, তিনি সেগুলোর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে এক্ষণ-এর শেষ সংখ্যা ও অনুষ্টুপ তুলে নিয়ে আক্ষেপ করে বললেন, এই পত্রিকাগুলো বাঙালি পাঠকের গৌরব। কোথায় পেলেন? মাথা খুঁড়েও এখানে পাওয়া যায় না।"[১৬] এ গৌরব কেবল 'অনুষ্টুপ' বা 'এক্ষণে'র নয়। এ গৌরব বাংলার ছোটপত্রিকার। এবং ছোটপত্রিকার সাথে জড়িয়ে থাকা সত্তরের লেখকদের। যাঁদের পথ চলা অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছিল। কিন্তু যাদের আশ্রয় করে বেড়ে উঠেছে লেখক ও পাঠক গোষ্ঠী। তাঁরাই দিয়েছেন ছোটপত্রিকাকে প্রতিষ্ঠানের সমান্তরাল রূপ। কিন্তু সেখানে লক্ষ্য করা যায় না প্রাতিষ্ঠানিক ঔদ্ধত্য। বরঞ্চ পরিবর্তনকে মান্যতা দিয়ে শিল্পী ও শিল্পের মর্যাদাই প্রাধান্য পেয়েছে সেখানে।

তথ্যসূত্র :

১. ঘোষ, সাগরময়, ১৩৮৫, অর্ধ শতাব্দীর সাহিত্য সেবা, কলকাতা, দেশ, ৪৬ বর্ষ, সংখ্যা ১, পৃ. ৭।

২. চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন, ২০২১, গদ্য সমগ্র ১, কলকাতা, প্রতিভাস, পৃ. ২৩৯।

৩. গুহ, বুদ্ধদেব, ১৯৬৩, নির্বাচিত রবিবারের গল্প, কলকাতা, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটারস, পৃ. ২২।

৪. তদেব পৃ. ২২৫।

৫. মিত্র, শৈবাল, ২০১৭, শ্রেষ্ঠগল্প, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৪২।

৬. বিশ্বাস, অদ্রিস, ২০১৮, কথাবার্তা সংগ্রহ, কলকাতা, প্রতিভাস, পৃ. ১৩৩।

৭. তদেব পৃ. ১৩৮।

৮. মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু, ২০১৭, শ্রেষ্ঠগল্প, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ১১৩।

৯. তদেব পৃ. ১১৩।

১০. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, ২০১৪, স্বনির্বাচিত স্বপ্নময়, কলকাতা, অনুষ্টুপ, পৃ. ২২৮।

১১. তদেব পৃ. ১০৬।

১২. ভট্টাচার্য, বিজন, ১৯৮৫, প্রকাশকের নিবেদন, কলকাতা, বর্তিকা, যুগ্ম সংখ্যা, পৃ. ৩৩

১৩. সেন, অভিজিৎ, ২০২২, গদ্যসংগ্রহ, কলকাতা, চিন্তা, পৃ. ১৩০।

১৪. সেনগুপ্ত, সমরেন্দ্র, ১৩৮৯, প্রমাকাহিনী, কলকাতা, বিভাব, পৃ. ৩৬।

১৫. আচার্য, অনিল, ২০১৬, নিপাতনে সিদ্ধ : অর্ধশতকের অন্য ইতিহাস, কলকাতা, অনুষ্টুপ, পৃ. ১৫৯।

১৬. তদেব পৃ. ১৫০।

সপ্তগ্রাম বন্দরের হাত ধরে বেতড় বন্দরের উত্থান (ষোড়শ থেকে সপ্তদশ শতক)

মানসী জানা
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ

সারসংক্ষেপ: "যমুনা- সরস্বতী-ভাগীরথী" তিন মুক্ত বেণীর সঙ্গমে অবস্থিত ত্রিবেণী প্রাচীন বাংলার অন্যতম প্রধান তীর্থক্ষেত্র। এই ত্রিবেণীর দুই মাইল দূরে ভাগীরথী সঙ্গমের সন্নিকটে সরস্বতীর তীরে অবস্থিত সপ্তগ্রামে এক সু- বৃহৎ বন্দর গড়ে ওঠে, এবং এই বন্দরের সুবাদেই ধীরে ধীরে সপ্তগ্রাম বাণিজ্যের এক সুবিশাল কেন্দ্রে পরিনত হয়। সুদূর অতীতে সরস্বতী নদী রূপনারায়ণ নদের খাতে প্রবাহিত হত এবং এই রূপনারায়ণের তীরেই অবস্থিত ছিল প্রাচীন বাংলার বিখ্যাত বন্দর তাম্রলিপ্ত। সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগ থেকে সরস্বতী নদী, হুগলি নদীর দিকে তার বর্তমান খাতটিতে সরে আসতে শুরু করে, এবং দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সরস্বতী নদী এমন একটা অবস্থায় আসে, যে অবস্থায় ত্রিবেণীতে হুগলি নদী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে পশ্চিম হুগলির সমান্তরালে কিছু পথ অতিক্রম করে বর্তমান গার্ডেনরিচের অপর তীরে বেতড়ে পুনরায় হুগলিতে এসে পতিত হয়। এইভাবে সরস্বতী একটি চক্রাকার পথের সৃষ্টি করে। ১৫৩৭ নাগাদ সরস্বতী নদী মজে যেতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে নৌ- চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। ফলে বেশিরভাগ সময়েই পর্তুগিজ প্রভৃতি পাশ্চাত্য বণিকেরা ভাগীরথী দিয়ে হাওড়ায় প্রবেশ করে সরস্বতীর কূলে অবস্থিত বেতড় বন্দরে মাল খালাস করত ও ব্যবসা-বাণিজ্য করে বেতড়ের শ্রী বৃদ্ধির উত্থান ঘটাল। এইভাবে বেশ কিছু কাল বেতড় তার নিজ রূপে অবস্থান করার পর ধীরে ধীরে কালের নিয়মে তার শ্রী বৃদ্ধির পতন ঘটায়।
সূচক শব্দ: ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম, সরস্বতী নদী, বেতড় বন্দর।

মূল বিষয়:

বন্দর কথাটি ইংরেজি শব্দ 'Port', এবং এটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ ' Portus' থেকে যার অর্থ হল প্রবেশপথ। বন্দর হল উপকূল বা সৈকতের এমন একটি স্থান যেখানে এক বা একাধিক পোতাশ্রয়ে জাহাজ নোঙর করে স্থলভাগে মালপত্র বা যাত্রী আদান প্রদান করতে পারে। নৌ- বহন যোগ্য জলভাগ ও জমির আয়াসগম্যতা লক্ষ্য করেই বন্দরের স্থান নির্বাচন করা হয়। ঐতিহাসিক সময় থেকেই ভারতে বন্দরের বিকাশ ঘটেছিল এবং এই বন্দরই ইতিহাসের বিভিন্ন সময় স্থানীয় অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে। তৎকালীন সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালিত হত এইসব বন্দরের মারফৎ।

এইসব বন্দরের বিকাশ ঘটেছিল কতগুলি ভৌগলিক বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। এই সকল বিষয়গুলি সময়ের সাথে সাথে সেই সব ভৌগোলিক বিষয়গুলির অবলুপ্তি ঘটায়, ও বন্দর গুলির ধীরে ধীরে পতন ঘটে।

হুগলির সপ্তগ্রাম ছিল প্রধান নদী বন্দর। ত্রিবেণী হল গঙ্গা ও তার দুই প্রধান শাখা নদী যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থল। সরস্বতী নদী ভাগীরথী নদীর শাখা নদী ছিল যা ষোল শতক পর্যন্ত সক্রিয় ছিল, কিন্তু বর্তমানে এর প্রায় অস্তিত্ব নেই বললেই চলে, ষোড়শ শতকে ত্রিবেণী থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক ধরে বয়ে চলত সরস্বতী নদী। যমুনা নদী বইত দক্ষিণ-পূর্ব দিক ধরে, যমুনা বর্তমানে বইছে খালের আকারে, ইচ্ছামতি থেকে বেরিয়ে গোবরডাঙ্গা, গাইঘাটা,ও হরিণঘাটা হয়ে কোথাও হারিয়ে গেছে আবার কোথাও ক্ষুদ্র আকার ইতস্তত হয়ে গঙ্গায় পড়েছে। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ধীরে ধীরে সরস্বতীর উৎপত্তিস্থলে পলি জমতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে প্রায় শুকিয়ে যায়। সেই সরস্বতী অবশেষে এখন নিতান্তই খালের আকার ধারণ করেছে। ক্ষীণ জলের ধারা, দূষিত জলের আকারে ত্রিবেণী থেকে বেরিয়ে শঙ্খনগর, সপ্তগ্রাম পার করে হারিয়ে গেছে প্রবাহ পথ। একটি মজে যাওয়া শাখা আন্দুল কলেজের পাশ হয়ে বর্তমানেও বইছে। তারপর জনবসতির চাপে, কচুরিপানায় কিংবা মাছের ভেড়িতে, নদী গিলে ফেলা ইঁট ভাটায়, ও অপ্রয়োজনীয় আবর্জনায় কিছু বুজে গেছে অথবা আটকে গেছে। অতীতে সরস্বতী বাংলার নদী বলে নগরের উন্নয়ন ও পতনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। প্রাথমিকভাবে তখন প্রধান সমুদ্র নগর বন্দর তাম্রলিপ্ত ছিল, যার পতনের পরে সপ্তগ্রামের মতো বন্দরের উত্থান ঘটে।

বাংলায় সরস্বতী নামক নদীর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় 'মনসামঙ্গল কাব্যে'। মনসামঙ্গল অনুসারে চাঁদ সওদাগর ছিলেন এক প্রভাবশালী বণিক। এই চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্য পোতের সাগর যাত্রার বিবরণ ছিল সপ্তগ্রাম ধরে উজানে ত্রিবেনী হয়ে সাগর। বিশ্বাস করা হয় যে সরস্বতী নদী অধুনা রূপনারায়ণের খাত বরাবর মোহনায় পড়ত তাম্রলিপ্ত হয়ে। সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত সপ্তগ্রাম বন্দর এক সুদীর্ঘ কাল ধরে খ্যাতির শিখরে অবস্থান করে এসেছে। তাছাড়া ও প্রধান বন্দর সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁও ছিল মধ্যযুগীয় বাংলার একটি অন্যতম প্রধান বন্দর এবং দক্ষিণবঙ্গের প্রধান নগরী। অধুনা পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলায় অবস্থিত ব্যান্ডেল থেকে মাত্র চার কিলোমিটার দূরে এই নগরটি অবস্থিত ছিল। প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে ও সপ্তগ্রাম যে হিন্দু রাজা পরিচালিত গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল তা বিভিন্ন বৈদেশিক পর্যটকদের লেখা থেকে জানা যায়। বিভিন্ন বিদেশী বণিকগণ সপ্তগ্রামকে যে বিভন্ন নামে অভিহিত করেছিলেন তা বিভিন্ন লেখা থেকে জানা যায়। ইংরেজদের মুখে কখনো সপ্তগ্রামের নাম 'গ্যাঞ্জেস রিজিয়া', কখনো 'সাঁতগাঁ রিভার', পর্তুগিজদের আমলে সপ্তগ্রাম 'রয়্যাল পোর্ট'।[১]

একটা সময় ছিল যখন বিদেশিদের কাছে সপ্তগ্রাম, সোনার বন্দর।[২] র‍্যালফ্ ফিচের বর্ণনায়- 'Satgan is a faire citie for a citie of the Moors, and very

plentiful of all things'.[৩] সপ্তগ্রামে আসা বিভিন্ন বণিকগণ বিভিন্ন সময়ে দেশে ফিরে গিয়ে সপ্তগ্রামের ঐশ্বর্য বর্ণনায় অনান্য বণিকদের মধ্যে বাণিজ্যের নেশাকে পরিস্ফুটিত করে তুলেছিল। বাংলার তুঘলক শাসনকালে(১৩৩৬ -১৩৫৮) ইবন বতুতার সপ্তগ্রামে আসার কথা বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়। সপ্তগ্রামে বসবাসকারী মানুষ জন ও বণিকেরা কিন্তু বিদেশে বাণিজ্য করতে যেতেন না। কিন্তু বিভিন্ন বিদেশী বণিকগণ এখানে বাণিজ্য করতে আসতেন। ফলে বাণিজ্যের পথ সুগম হয়। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম থেকেই পর্তুগিজ বণিকগন সপ্তগ্রামে আসা যাওয়ার পাশাপাশি আমদানি রপ্তানিও শুরু করেন।১৫৩৩ সালে পাঁচটি জাহাজ ও একশো লোক নিয়ে এক পর্তুগিজ আলফেনসো ডে মেলো বাংলাদেশে উপস্থিত হন। তিনি সুলতানকে প্রচুর উপঢৌকন প্রদান করেন, কিন্তু সুলতান খুশি হওয়ার পরিবর্তে তাদের বন্দি করেন। ফলে একটা যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে সুলতান অবশ্য বিরোধ না বাড়িয়ে বন্ধুত্বপূর্ন আচরণ করেন। চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রাম দু জায়গাতেই কুঠি করার অনুমতি প্রদান করেন। পর্তুগিজরা সপ্তগ্রামে ১৫৩৫ নাগাদ তাদের বসতি স্থাপন করে ফেলেন। কিন্তু ওই বছরই সুলতান গিয়াসুদ্দিন মামুদ শাহ পরাজিত হন। ফলে পর্তুগিজরা কিছুদিন সপ্তগ্রাম থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখেন। পরবর্তীতে ১৫৫০ সাল নাগাদ পর্তুগিজরা সপ্তগ্রামে পুনরায় ফিরে আসেন।

সপ্তগ্রাম নগরী ছিল বাণিজ্যিক সমৃদ্ধে সমৃদ্ধ নগরী, এই সমৃদ্ধির কথা আমরা বিভিন্ন পর্যটকদের বিবরণ থেকে জানতে পারি। ১৫৬৭ সালে প্রাচ্য ভ্রমণকারী ভেনিসীয় সিজার ফ্রেডেরিক এর ভ্রমন বিবরণী এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সপ্তগ্রামর মতো সু উন্নত বন্দর থেকে বাণিজ্যের প্রধান দ্রব্যাদি কার্পাসের সূক্ষ বস্ত্র, রেশমের কাপড়, সোরা, নীল, লক্ষা, গালা প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানি হত। সপ্তগ্রাম কাগজ ও অন্যান্য হস্তশিল্প উৎপাদনের কেন্দ্র হিসাবে পতনের পরও ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত টিকে ছিল। Proto Pe Queno নামে পর্তুগিজরাই প্রথম সপ্তগ্রাম কে অভিহিত করেছিলেন। পর্তুগিজ বণিকগণ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকেই বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করার প্রকৃয়াদি আরম্ভ করে। ঐতিহাসিকগণ সপ্তগ্রামের বিলুপ্তির জন্য পলি জনিত কারণ কে দায়ী করলেও নগরটি বিলুপ্তির পেছনে ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে শেরশাহ ও হুমায়ুনের আক্রমণ এবং মুঘল আফগান প্রতিদ্বন্দ্বীতাও অনেকাংশে দায়ী ছিল। এই দ্বন্দ্বই বাণজ্যিক সংযোগের পথকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। পলি জমে সরস্বতী নদীর অনাব্য হয়ে পড়ার কারণ ছিল দীর্ঘদিনের প্রক্রিয়া।এই প্রক্রিয়া চলেছিল কয়েক শতক ধরে। ফলে বণিকেরা অন্যত্র তাদের বাণিজ্য স্থাপনে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। সপ্তগ্রামের পতনের পিছনে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অরাজকতার পাশাপাশি পলি জমার কারণটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়।

1580 খ্রিস্টাব্দে দে বারোস এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, সপ্তগ্রাম বড়ো বন্দর হলেও সরস্বতীর মুখ বেশি প্রসারিত ছিল না। তাই পর্তুগিজ বণিকেরা জাহাজ নিয়ে এর

অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারত না আসলে"Satgaw (satgaon)is great and Nobel city through less frequented Chittagong on account of the part not being so convenict for the entrance of ships".[৪] কিছু দিন পর, ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে Caesar Fredrich বলেছেন, বড় বড় জাহাজগুলো সরস্বতী বেয়ে বেতড়ের উত্তরে আর যেতে পারতো না, ছোট জাহাজগুলোও যে যেতো তাও কোনো মতে।[৫] ফলে বেশিরভাগ সময়েই পর্তুগিজ ও প্রভৃতি পাশ্চাত্য বণিকেরা ভাগীরথী দিয়ে হাওড়ায় প্রবেশ করে সরস্বতীর কূলে অবস্থিত বেতড় বন্দরে মাল খালাস করত,ব্যবসা-বাণিজ্য করত।

পর্তুগিজরা মূলত সপ্তগ্রামের ভগ্নদশা আরম্ভ হওয়ার কিছুকাল পূর্বেই বাংলায় প্রবেশ করে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পর্তুগিজরা কিছু কৌশলকে কাজে লাগিয়ে সপ্তগ্রামের অস্তিত্বকে প্রায় বিলুপ্ত করে তোলে। সরস্বতী নদী প্রবাহ ধারার মূলত আরও দক্ষিণে বেতড়ে বাণিজ্য ছাউনি করে হাট বাজারের প্রক্রিয়াদিকে ত্বরান্বিত করল। সপ্তগ্রামের বাণিজ্য লক্ষ্মীকে বেতড়ে প্রতিষ্ঠা করে বেতড়ের শ্রী বৃদ্ধির জন্য পর্তুগিজরা এক অনন্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। বাংলার আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল তার সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা অজস্র হাট ও বাজার সারা বাংলাদেশে গড়ে প্রতি ৪ মাইলে একটি হাট বা বাজার পাওয়া যেত এবং প্রতি হাজার পুরুষের জন্য ছিল একটি বাজার"।[৬] বাংলার জমিদাররা গ্রামগঞ্জে হাট বাজারের স্রষ্ঠা বলে মনে করা হয়। সিজার ফ্রেডেরিক নামে জনৈক ইউরোপীয় পর্যটক খ্রীষ্টীয় ষোল শতকের মাঝামাঝি সময় বেতড় পরিদর্শন করে লিখেছিলেন, শীতের সময় পর্তুগিজদের বানিজ্যের দৌলতে এখানে এক বিরাট বাজার বসত। শীতের শেষে অস্থায়ী চালা ঘর গুলিতে আগুন লাগিয়ে তারা চলে যেত এক বছরের মত।[৭] বেতড়ের সমকালীন গুরুত্বের প্রমান, ডি ব্যারেজ (খ্রিস্টীয় ১৫৫২-১৬১৩), ব্লায়েভ (খ্রিস্টীয় ১৬৪৫- ১৬৫০), রেনলের(১৭৭৯-১৭৮১) ম্যাপে এই স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৮]

রাজা লক্ষণ সেনের দ্বাদশ শতকে পাওয়া গোবিন্দপুর তাম্র শাসনে বেতড্ড চতুরক এর উল্লেখ পাওয়া যায়।১৩৪১ বঙ্গাব্দে সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় কালিদাস দও মহাশয় বেতুড্ড চতুরকের চতু:সীমা দিয়েছেন।[৯] এই বেতড্ড চতু:রকের অন্তর্গত বেতড় বর্তমানে হাওড়া জেলার বেতড় নামক স্থান। শালিমার গ্রান্ড ট্র্যাঙ্ক রোড ও আন্দুল পথের সংযোগস্থলে এর অবস্থান। এই স্থানেই বেত্রচন্ডিকার মন্দির। এই বেতড়ই পরবর্তীকালে বেতাই এবং আরো কিছুকাল পরে বেতাইতলা নামে আখ্যায়িত হয়।

বেতড়ের বেতাই চন্ডী মন্দির সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য জানা যায়। মধ্যযুগে গঙ্গার উভয়পাড় ছিল ঘন জঙ্গলে ভরা। কলকাতা শহর তখন মানুষের স্বপ্নের অতীত। নদীর পশ্চিম পাড়ে সমৃদ্ধ বেতড় বন্দর। শিবপুর সম্ভবত ছিল বেতড়েরই অন্তর্গত গ্রাম। একদিন শেওড়াফুলির রাজা নদীবক্ষে ভ্রমন করার সময় মা চন্ডীর স্বপ্নাদেশ পান। নৌকা সেখানেই থামিয়ে খুঁজে পান দেবী চণ্ডীর প্রস্তর মূর্তি। ঘন বেতবনে দেবীকে

পাওয়া যায় এবং বেতবনে প্রতিষ্ঠা করা হয় বলেই দেবীর নাম হল বেতাই চন্ডী। এই সবই স্থানীয় মানুষদের এবং মন্দিরের পুরোহিতদের কাছে পাওয়া তথ্য। দেবীর উৎপত্তির কোন প্রমাণ তথ্য সেরকম খুঁজে পাওয়া যায়নি। ইতিহাসের শূন্যস্থান গুলি মানুষের মতো অতি সহজে কিংবদন্তির দ্বারা পূরণ করে নিয়ে থাকে। কিংবদন্তি হলো লোক সাহিত্যের একটি অন্যতম উপাদান। কিংবদন্তিতে একটি কথা খুব বেশি প্রচলিত যে, ইতিহাস যেখানে মূক কিংবদন্তি সেখানে মুকখ। এমনও মনে করা হয় যে বেতড়ের দেবী চণ্ডী বলেই তিনি বেতাই চন্ডী এবং বর্তমানে লোকমুখে তিনি ব্যাতাই চন্ডী। দেবীর সংস্কৃতায়িত নাম বেত্রচন্ডিকা। খ্রীষ্টীয় পনেরো শতকের শেষ ভাগে রচিত বিপ্রদাস পিপলাই এর 'মনসা মঙ্গলে' ও বেতড় এবং স্থানীয় লৌকিক দেবী বেতাই চন্ডী সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়।[১০]

পর্তুগিজদের পাশাপাশি ওলন্দাজ, ফরাসি, ইংরেজরাও বেতড়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে যোগ দেয়, কারন বাংলার বস্ত্র শিল্প বিশেষত সুতি ও রেশমের জন্য। বাংলার মসলিনের তখন পৃথিবী জুড়ে নাম। খ্যাতি যত, খাতির তত।[১১] ইউরোপীয় বণিকেরা বাংলা থেকে রেশম, সোরা কেনার জন্য এখানে কুঠি তৈরি করে। একদিকে হাওড়া সংলগ্ন হুগলি জেলার তাঁত ও রেশম শিল্প, অন্যদিকে নীল, আঁখ প্রভৃত উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া হত। ফলে কুটির শিল্পের পাশাপাশি কৃষিকার্যের ও বেশ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। হাওড়া ,হুগলি তখন পুরোপুরি শহর না হওয়ায় প্রচুর পরিমাণে বন জঙ্গল ও গাছপালা থাকায় নৌকা নির্মাণের উৎকৃষ্ট কাঠ এখান থেকে সংগ্রহ করা হত। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের একটা উৎকৃষ্ট পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল এই বেতড়ে। ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে বেতড়ের বাণিজ্যের জাহাজ ও মাল বহনের বড়ো বড়ো নৌকা ভিড়াবার জন্য এক ধরনের ডক জাতীয় জাহাজঘাটা ছিল। বেতড়ের কাছে গঙ্গা বেশ গভীর থাকায় ডক গড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ ও গড়ে ওঠে। জাহাজ মেরামতি, রং করা, জাহাজের পিতল তামার আবরণ পরিবর্তন ইত্যাদি কাজের জন্য প্রয়োজন হয়েছিল এইরকম তৈরি পোতাশ্রয় যুক্ত বন্দরের।

আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে সম্রাট আকবরের সময়ে যে রাজস্বের হিসাব আছে তাতে বেতড়ের রাজস্ব ও নির্মিত হয়েছিল। এখানে দেখা যায় যে গঙ্গার পশ্চিম তীরে হাওড়ার এই ভু-ভাগে বেতড়ের রাজস্বই সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল। ইউরোপীয় বণিকরা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থে বেতড়ে বাণিজ্যের জন্য জাহাজ মেরামত ও দড়ির কারখানা গড়ে তুলেছিল। রামকৃষ্ণপুর, শিবপুর, শালিমার অঞ্চল, প্রভৃতি জায়গাতে অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে গড়ে ওঠে মদের দোকান ও অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্য। শন ও পাটের একাধিক কারখানার পাশাপাশি ছোট ছোট বেশ কিছু কারখানাও গড়ে ওঠে। ইউরোপীয় বণিকরা নিজেদের স্বার্থে শালিমার ও ঘুষুড়ি অঞ্চলে ছোটখাটো কারখানা স্থাপন করে এবং কলকাতার বিপরীত দিকে গঙ্গার ধারে আধুনিক শিল্প নগরীর প্রথম বুনিয়াদ রচনা করে।

নদী যেমন তার আপন নিয়মে ক্ষয় কাজ করে তেমনি সঞ্চয় কাজও করে। ফলে বাংলার জলপথ বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়ে ওঠে। বাংলার প্রধান ও বৃহত্তম নদী গঙ্গায় পলি সঞ্চয়নের ফলে অনেক নদীপথ তার গতি হারিয়ে ফেলে। সপ্তগ্রামের মত বন্দরের পতনের হাত ধরে বেতড় বন্দরের শ্রী বৃদ্ধি ঘটে, আবার কালের নিয়মেই এই বেতড় বন্দরের অন্তিমতার হাত ধরে হাওড়া শহরের পরিপুষ্টতা পূর্ণভাবে প্রাধান্য লাভ করে এবং নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। বর্তমানে বেতড়ের সেই তটভূমি আর নেই আছে কেবল বড়ো বড়ো বাজার ও অট্টালিকার সম্রাজ্ঞী।

উপসংহার: এই গবেষণা পত্রটি প্রাচীন ভারতের বন্দর গুলোর ভৌগোলিক বিষয় নির্ভর বন্দরের বিকাশ, শ্রীবৃদ্ধি, পরিপূর্ণতা ও অবনতির একটি দৃশ্যপট মাত্র। এই আলোচনা বর্তমানে ভারতবর্ষের গুরুত্বপূর্ণ বন্দর গুলোর টিকে থাকার ক্ষেত্রে একটি বার্তা মূলক দৃষ্টান্ত হতে পারে। বর্তমানে বন্দরের নাব্যতার রক্ষার্থে ড্রেজারের সাহায্যে মাটি কেটে তা রক্ষা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তৎকালীন সময়ে ড্রেজারের সাহায্যে মাটি কেটে বন্দরের নাব্যতা ধরে রাখার প্রযুক্তিবোধ থাকলে হয়তো বেতড় বন্দর আরও কিছুকাল স্থায়ী হত। তবে সপ্তগ্রাম বন্দরের পতন যেমন বেতড়ের সুখ্যাতি বাড়াতে সাহায্য করে তেমনি এই বন্দরই কলকাতার বিপরীতে গঙ্গার ধারে আধুনিক শিল্প নগরীর প্রথম বুনিয়াদ তৈরি করে কলকাতা মহানগরীর উত্থানে সাহায্য করে। অতীতকে জেনে বর্তমান কে সুগঠিত করার জন্য এই গবেষণা পত্রটি একটি সুস্পষ্ট সতর্ক বার্তা প্রদান করে।

তথ্যসূত্র:

১. পত্রী, পূর্ণেন্দু: পুরনো কলকাতার কথাচিত্র; দে'জ পাবলিশিং; কলকাতা- ৭৩; ১৯৭৯; পৃ:- ৭১।
২. পত্রী, পূর্ণেন্দু: ঐ; পৃ:- ৬৭।
৩. তদেব: পৃ:- ৬৭।
৪. রায়, নীহার রঞ্জন: বাঙালীর ইতিহাস; আদিপর্ব; দে'জ পাবলিশিং; কলকাতা-৭৩; আশ্বিন- ১৪০২; পৃ:- ১২৭।
৫. রায়, নীহার রঞ্জন: ঐ; পৃ:- ১২৭।
৬. বসু, সুগত: অ্যাগ্রারিয়ান বেঙ্গল; ইকনমি; সোশ্যাল স্টাকচার অ্যান্ড পলিটিক্স; ১৯১৯-১৯৪৭; কোম্বাই- ১৯৮৬; পৃ:- ৭০।
৭. সাঁতরা, তারাপদ: হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি; পূর্ত (পুরাতত্ত্ব) বিভাগ; পশ্চিমবঙ্গ সরকার; কলকাতা-০৯; আগস্ট- ১৯৭৬; পৃ:- ১০২।
৮. সাঁতরা, তারাপদ: ঐ; পৃ:- ১০২।
৯. তদেব: পৃ:- ১০২।
১০. তদেব: পৃ:- ১০২।

১১. পত্রী, পূর্ণেন্দু: ঐ; পৃ:- ৭৮।

গ্রন্থপঞ্জী:-

১. ভট্টাচার্য, কপিল: বাংলাদেশের নদ-নদী ও পরিকল্পনা; বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড; কলকাতা- ১৯৫৯।

২. বন্দোপাধ্যায়, দিলীপ কুমার: ভারতের নদ-নদী; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ; কলকাতা- ১৯৮৪।

৩. সেন, ড. সুরেন্দ্রনাথ: প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সংকলন; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; ১৯৪২।

৪. মুখোপাধ্যায়, সুবোধ কুমার: বাংলার আর্থিক ইতিহাস; অষ্টাদশ শতাব্দী কে.পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি; কলকাতা-২০১১।

ঋণস্বীকার:-

১. ড. জিতেশ চন্দ্র রায়: সহযোগী অধ্যাপক; ইতিহাস বিভাগ; পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ (স্বশাসিত) বয়স: ৫০; পেশা: অধ্যাপনা; নেশা: পড়াশুনা; গবেষণা।

স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথ

প্রদীপকুমার পাত্র
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ
পি. আর. এম. এস. মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের বাংলা কবিতার বিষয় হিসাবে রবীন্দ্র-অনুষঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। বিজয়া মুখোপাধ্যায়, দেবারতি মিত্র, অরূণ মিত্র, তারাপদ রায়, দেবদাস আচার্য, অনিতা অগ্নিহোত্রী, তপন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কবি সময়ের স্বরক্ষেপণে, প্রেম, প্রকৃতি, নিসর্গের ছবি অঙ্কনে, বাঙালির আত্মজাগরণে, বৈরী পরিবেশ থেকে উত্তরণের জন্য আলোকবর্তিকা হিসাবে, কখনও কলানুষঙ্গ গ্রহণে রবীন্দ্র শরণাপন্ন হয়েছেন। উক্ত কবিরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নানাভাবে বরণ ও গ্রহণ করেছেন। তিনি বাঙালি কবির কাছে জীবন্ত মিথ হয়ে উঠেছেন। তিনি জেগে আছেন বাঙালির অস্তিত্বে, কবিতার মূলে। যুগগত পরিপ্রেক্ষিতে কবিরা রবীন্দ্র চিন্তা-চেতনা থেকে কিছুটা সরে এলেও একেবারে পারেননি। ব্যাটারি যেমন চার্জারকে ভুলতে পারে না, তেমনই বাঙালি কবি রবীন্দ্রনাথকে মনে রেখেছেন। কবিতার বিষয়-আঙ্গিকগত নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে কবিতার প্যাটার্নে পরিবর্তন এলেও রবীন্দ্র ভাবনা বাঙালি বিস্মৃত হয়নি বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। একুশ শতকের বাঙালি কবিও রবীন্দ্রচর্চা করছেন।
সূচকশব্দ: রবীন্দ্র-অনুষঙ্গ, স্বরক্ষেপণ, আত্মজাগরণ, বৈরী পরিবেশ, উত্তরণ, আলোকবর্তিকা, কলানুষঙ্গ, শরণাপন্ন, রবীন্দ্রচর্চা।

মূল প্রবন্ধ :

আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' (জুলাই, ১৯৪০) আধুনিক কবিতা বিষয়ে আবু সয়ীদ আইয়ুব লিখেছেন— "কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ-পরবর্তী, এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত, অন্তত মুক্তিপ্রয়াসী, কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করেছি।"[১] —এই মন্তব্যে আধুনিক বাংলা কবিতার যে বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ পেয়েছে তা হল— সময়ের দিক থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী, চিন্তা-ভাবনার দিক থেকে রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত এবং মুক্তিপ্রয়াসী। তবে বিশ শতকের প্রথম কুড়ি বছর কবিরা গভীরভাবে রবীন্দ্র-অনুসারী ছিলেন। তাঁদের কাব্যিক চিন্তা-চেতনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বড়ো জায়গাজুড়ে রয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সাহিত্য-আলোচক অলোক রায়ের মন্তব্য গ্রহণযোগ্য— "বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে রাবীন্দ্রিক কবিভাষার অনুশীলন ও ব্যবহার কোনো বাঙালি কবি পরিহার করতে

পারেননি।"[২] প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪ খ্রি. – ১৯১৮ খ্রি.), জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড (১৯১৯ খ্রি.), অহিংস অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০ খ্রি. – ১৯২২ খ্রি.) প্রভৃতি উত্তাল পরিবেশ জীবন-যাপনে অস্থিরতা নিয়ে এসেছিল — যার প্রত্যক্ষ প্রভাব সাহিত্যে পড়ে। তরুণ সমাজের মনে হয় সাহিত্যে কেবল সত্যম-শিবম-সুন্দরম -এর আরাধনা করলে হবে না বাস্তবকে সরাসরিভাবে উপস্থাপন করতে হবে। তাঁরা মনে করেন রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের পুজারী। তাঁর সাহিত্যে বাস্তবতা তেমন নেই। একই সঙ্গে "তরুণ কবিরা আবির্ভাব-লগ্নেই এটা বুঝেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ থেকে হয় সরে আসতে হবে নয় তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হবে। ... নতুন কালের কবি হিসেবে স্বয়ংবৃত হতে গেলে তাঁদের পক্ষে রবীন্দ্র-পরিহার খুবই জরুরি।"[৩] ১৯২৩ সালে দীনেশরঞ্জন দাশ ও গোকুলচন্দ্র নাগের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'কল্লোল' পত্রিকায় রাবীন্দ্রিক চিন্তা-ভাবনার অন্য স্বর, ভিন্ন মাত্রা দেখা যায়। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এক ঝাঁক তরুণ কবির দুঃসাহসিক অভিযান শুরু হয়। তাঁরা কবিতায় রবীন্দ্রচেতনা থেকে সরে এসে সাহিত্যে নতুন মোড় আনার প্রয়াস করেন। রাবীন্দ্রিক চিন্তা-চেতনা পরিহার করার জন্য তরুণ কবিরা 'কল্লোল' পত্রিকাকে বেছে নেন। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক' প্রবন্ধে লিখেছেন— "যাকে 'কল্লোল'-যুগ বলা হয়, তার প্রধান লক্ষণই বিদ্রোহ, আর সে-বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ।"[৪] তরুণ কবিরা নিজেদের ভীত শক্ত করতে 'কল্লোল', 'প্রগতি', 'কালিকলম' পত্রিকার হাত ধরে বিদ্রোহ শুরু করেন — যা একাধারে সাহিত্যকেন্দ্রিক আন্দোলন বলা যায়। তবে এ আন্দোলনের গভীরতা খুব বেশি ছিল না। 'কল্লোল' পত্রিকায় যাঁরা রাবীন্দ্রিক চিন্তা-চেতনার পরিহারের কথা বলেছিলেন পরবর্তীকালে তাঁরা প্রবলভাবে নিজেদের গরজে রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ ও বরণ করেছেন।

'কল্লোল' পত্রিকার মধ্য দিয়ে আধুনিক বাংলা কবিতার যে জন্ম হয়েছিল তার প্রকৃত পথ চলা বিশ শতকের তিরিশের দশকের কবিদের হাত ধরে শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে যে আধুনিক কবিতার কথা চিন্তা করা হয়েছিল — সেই আধুনিকতার বিকাশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে জীবনানন্দ দাশ 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা'(১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) প্রবন্ধে জানিয়েছেন— "রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে সাহায্য ও ইঙ্গিত পেয়ে আজ যে আধুনিক কাব্যের ঈষৎ সূত্রপাত হয়েছে তার পরিণাম — বাংলা সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথের ভিত্তি ভেঙে ফেলে কোনো সম্পূর্ণ অভিনব জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে, সাহিত্যের ইতিহাস এরকম অজ্ঞাতকুলশীল জিনিস নয়। ইংরেজ কবিরা যেমন যুগে যুগে ফিরে শেক্সপীয়র-এর কেন্দ্রিকতার থেকে সঞ্চারিত হয়ে চলেছে আমাদের কবিরাও রবীন্দ্রনাথকে পরিক্রমা

করে তাই করবে — এই ধারণা প্রত্যেক যুগসন্ধির মুখে নিতান্তই বিচার সাপেক্ষ বলে বোধ হলেও অনেককাল পর্যন্ত অমূলক বা অসঙ্গত বলে প্রমাণিত হবে না — এই আমার মনে হয়।"[৫] এই কথার মধ্য দিয়ে জীবনানন্দ দাশ আধুনিক কবিদের রাবীন্দ্রিক ভাবধারায় দীক্ষিত হতে বলেছেন। আধুনিক কবি অমিয় চক্রবর্তী ছিলেন রবীন্দ্র অনুচর। রবীন্দ্র-বলয়ে থাকার কারণে তাঁর কাব্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব লক্ষ করা যায়। থাকাটাই স্বাভাবিক। বুদ্ধদেব বসু 'অমিয় চক্রবর্তীর পালা-বদল'(১৯৫৫ খ্রি.) প্রবন্ধে সেকথা জানিয়েছেন— "অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের জগতের উত্তরাধিকারী"[৬]। — এই উক্তিটি বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী প্রসঙ্গে করলেও এ কথা বলাই যায় তিনি একা নন, সকল আধুনিক কবিই কম-বেশি 'রবীন্দ্রনাথের জগতের উত্তরাধিকারী'।

জীবনানন্দ দাশ 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন—

"অনেক সময় পাড়ি দিয়ে আমি অবশেষে কোন এক বলয়িত পথে
মানুষের হৃদয়ের প্রীতির মতন এক বিভা
দেখেছি রাত্রির রঙে বিভাসিত হয়ে থেকে আপনার প্রাণের প্রতিভা
বিচ্ছুরিত ক'রে দেয় সঙ্গীতের মতো কণ্ঠস্বরে।
হৃদয়ে নিমীল হয়ে অনুধ্যান করে
ময়দানবের দ্বীপ ভেঙে ফেলে স্বভাবসূর্যের গরিমাকে।"

কবি সমকালের বৈরী পরিবেশ থেকে উত্তরণের পথ হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করেছেন। চল্লিশের দশকের কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের আবির্ভাব পর্বটি রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক সব দিক থেকেই ছিল প্রতিকূল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ(১৯৩৯ খ্রি. – ১৯৪৫ খ্রি.), ভারত-ছাড়ো আন্দোলন(১৯৪২ খ্রি.), মন্বন্তর(১৯৪৩ খ্রি.), প্রত্যক্ষ সংগ্রাম(১৯৪৬ খ্রি.) প্রভৃতি বীভৎস ঘটনা এসময় পর্বে ঘটে। এই প্রতিকূল পরিবেশ থেকে মানুষকে উত্তরণের পথ দেখাতে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য রবীন্দ্র শরণাপন্ন হয়েছেন। 'ছাড়পত্র'(১৯৪৮ খ্রি.) কাব্যের 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাটি এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়—

"তবুও ক্ষুধিত দিন ক্রমশ সাম্রাজ্য গ'ড়ে তোলে,
গোপনে লাঞ্ছিত হই হানাদারী মৃত্যুর কবলে;
যদিও রক্তাক্ত দিন, তবু দৃপ্ত তোমার সৃষ্টিকে
এখনো প্রতিষ্ঠা করি আমার মনের দিকে দিকে।"

চল্লিশের দামামাময় উত্তাল পরিবেশ-পরিস্থিতি পঞ্চাশের দশকের কবিদের কবিতায় স্তিমিত হয়ে গেল। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের স্বাধীনতা সাধারণ মানুষের

স্বপ্ন পূরণে ব্যর্থ হয়। তার ফলে সাধারণ মানুষের স্বাধিকারের আনন্দ তেমন উজ্জ্বল হয়নি। স্বাধীনতা লাভের পর কবিরা নতুন পথের অন্বেষণ করেন। চল্লিশের উত্তাল মুহূর্ত পেরিয়ে পঞ্চাশের দশকের কবিদের কবিতায় স্বাশ্রয়ী ও স্বীকারোক্তিমূলক প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এক কথায় বলা যায়, বিশ শতকের তিরিশের দশকে বাংলা কবিতায় যে আমূল পরিবর্তন এসেছিল — তা পঞ্চাশের দশকে নতুন মাত্রার সঞ্চার করে। এই পর্বে কবিরা 'শতভিষা', 'কৃত্তিবাস', 'দেশ' -এর মতো পত্রিকাকে কেন্দ্র করে গোষ্টিবদ্ধভাবে কবিতাচর্চা শুরু করেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী কবিতায় রবীন্দ্র-অনুষঙ্গ নানা ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কবিতার জগতে একজন প্রথিতযশা কবি হলেন বিজয়া মুখোপাধ্যায়(১৯৩৭ খ্রি. – ২০২০ খ্রি.)। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগুলির মধ্যে— 'আমার প্রভুর জন্য' (১৯৬৭ খ্রি.), 'যদি শর্তহীন'(১৯৭১ খ্রি.), 'ভেঙে যায় অনন্ত বাদাম' (১৯৭৭ খ্রি.), 'উড়ন্ত নামাবলী' (১৯৭৯ খ্রি.), 'দাঁড়াও তর্জনী' (১৯৮৮ খ্রি.), 'অশ্লেষ তিথির কন্যা' (১৯৯৩ খ্রি.), 'সামনে আপনারা'(২০০০ খ্রি.), 'ওই যে সৌধের চূড়া'(২০০১ খ্রি.), 'ভাষায় যেটুকু বলা যায়'(২০০5 খ্রি.), 'মাস্তুলের পাখি'(জানুয়ারি ২০০৮) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তিনি কবিতায় বহির্জগৎ নয় অন্তর্লোককে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। সহজ-সরল প্রাঞ্জল ভাষায় কবিতার বিষয় ব্যক্ত করেছেন। তাঁর কবিতায় নারীবাদের সুর প্রকাশ পেয়েছে।

বিজয়া মুখোপাধ্যায় 'আমার প্রভুর জন্য'(মে ১৯৬৭) কাব্যের 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের আরাধনা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন — সকল সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতার কথা স্বীকার করেন না, তবুও রবীন্দ্র গুরুত্ব কমে যায়নি। নবীন লেখকদের লেখায় রবীন্দ্র চিন্তা-চেতনার ছাপ লক্ষ করা যায়। কবির কথায়—

> "মাটি থেকে মাথা তোলে তথাপি অঙ্কুর
> বিশ্বাস, প্রাচীন বৃষ্টি ভূমিভাগ্যে তার
> নির্ধারিত আছে। ..."

কবির স্থির বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যতই বঞ্চনা করা হোক না কেন — তাঁর রশ্মি ঠিক বিচ্ছুরিত হবে এবং সারা বিশ্বকে আলোকিত করবে। 'মাস্তুলের পাখি'(জানুয়ারি ২০০৮) কাব্যের 'এখন রবীন্দ্রনাথ' কবিতায় কবি বর্তমান পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকে রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন। কবি রূপকের আড়ালে কবিতার মূলভাব পরিবেশন করেছেন। রবীন্দ্র প্রতিভা বর্তমান কবিসমাজের কাছে দুর্গম—

"কী দিয়ে বানিয়েছেন এ ম্যাজিক-জলরং তিনি,
এতে কি ছিল না কোনো সিঁদুরমিশেল কারসাজি
লুকনো কান্নার ধ্বনিছায়া ?
ঘোর লাগে চোখে।"

বিশ শতকের ষাটের দশকের একজন উল্লেখযোগ্য কবি হলেন দেবারতি মিত্র(১৯৪৬ খ্রি —)। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগুলির মধ্যে— 'অন্ধ স্কুলে ঘন্টা বাজে'(নববর্ষ ১৩৭৮), 'আমার পুতুল'(রথযাত্রা ১৩৮১), 'যুবকের স্নান'(ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮), 'ভূতেরা ও খুকি'(জানুয়ারি ১৯৮৮), 'জঙ্গলে কাটুল'(জানুয়ারি ১৯৯৫) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁর কবিতা অনেকটা আত্মজৈবনিক ধরনের। তাঁর প্রথম পর্বে রচিত কবিতার গঠন ছিল— "অনেকটাই জন্তুর মতো স্বাস্থ্যবান, নির্বোধ, শরীর-সুখী, প্রকৃতিলিপ্সু এবং সঙ্গীহীনতায় বিমর্ষ।"[৭] তাঁর কবিতায় নিসর্গ সৌন্দর্যের আনন্দানুভূতির কথা উঠে এসেছে এবং একই সঙ্গে প্রেমভাবনা সমান্তরাল গতিতে অগ্রসর হয়েছে।

কবি দেবারতি মিত্র 'অন্ধ স্কুলে ঘন্টা বাজে' কাব্যের 'রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তে পড়তে' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রসঙ্গ এনেছেন—

"রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তে পড়তে কখন
নিজের অজ্ঞাতসারে চলতে আরম্ভ করে দিই
জানলাবন্ধ ঘরের দেয়ালের বাইরে চলে যাই
বুঝতে পারি না।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় রয়েছে সীমার সঙ্গে অসীমের মেলবন্ধন। এই মিলনের তল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কবি দেবারতি মিত্র, রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠে তন্ময় হয়ে উঠেছেন। তিনি ভাব থেকে ভাবান্তরে উপস্থিত হয়েছেন। কবি সহৃদয় পাঠক হয়ে রবীন্দ্র কবিতার রস পান করেছেন। এই কবিতাটির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র কবিতার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে।

বাংলা কবিতার জগতে একজন যুগান্তকারী কবি ব্যক্তিত্ব হলেন অরুণ মিত্র(১৯০৯ খ্রি. – ২০০০ খ্রি.)। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগুলির মধ্যে— 'প্রান্তরেখা'(১৯৪৩ খ্রি.), 'উৎসের দিকে'(১৯৫৫ খ্রি.), 'ঘনিষ্ঠ তাপ'(১৯৬৩ খ্রি.), 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে'(১৯৭০ খ্রি.), 'শুধু রাতের শব্দ নয়'(১৯৭৮ খ্রি.), 'প্রথম পলি শেষ পাথর'(১৯৮১ খ্রি.), 'খুঁজতে খুঁজতে এত দূর'(১৯৮৬ খ্রি.), 'যদিও আগুন ঝড় ধসাভাঙা'(১৯৮৮ খ্রি.), 'এই অমৃত, এই গরল'(১৯৯১ খ্রি.), 'টুনি-কথার ঘেরাও থেকে বলছি'(১৯৯২ খ্রি.), 'খরা-উর্বরায় চিহ্ন দিয়ে চলি'(১৯৯৪ খ্রি.), 'অন্ধকার যতক্ষণ জেগে থাকে'(১৯৯৬ খ্রি.), 'ওড়াউড়িতে নয়'(১৯৯৭ খ্রি.), 'ভাঙনের মাটি'(১৯৯৮ খ্রি.) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনা তাঁর কবিতায় গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করেছে। কবি অরুণ মিত্র 'ওড়াউড়িতে নয়' কাব্যের 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। কবিতাটির মধ্যে কবির রবীন্দ্র-স্তুতি প্রকাশ পেয়েছে—

> "কী শোক সন্তাপে যে তোমার জীবন দগ্ধ হয়েছে তা আমাদের জানা, কিন্তু তার একটু আঁচও আমাদের গায়ে তুমি লাগতে দাওনি। সমস্ত বিষয় সমস্ত জ্বালা আত্মসাৎ করে নীলকণ্ঠ হয়ে রইলে এবং আমাদের শোনালে সমস্ত ব্যক্তিগত থেকে উত্তীর্ণ হয়ে অনন্ত সৌন্দর্যের ধ্বনি, অজ্ঞাত বিধাতার বন্দনাগীত। সেখানে কই তুমি ? তোমার হৃদয়ে যখন অবিরত রক্তক্ষরণ তখন তার ধারায় আমাদের রক্তাক্ত করলে না কেন ? মানুষ হিসেবে আমাদের পর করে রাখলে, আত্মীয় করলে না। এ জন্যে আমার মনোকষ্ট এক-এক সময় হিমালয় হয়ে ওঠে। তোমার অলোকসামান্য প্রতিভার কথা ভেবে তা সীমা ছাড়িয়ে যায়।"

টানা গদ্যের চরণে কবি কবিতাটির ভাব ব্যক্ত করেছেন। রবীন্দ্র সমসাময়িক, রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিরা যে কম-বেশি রবীন্দ্র-আলোয় আলোকিত ছিলেন উক্ত কবিতায় যেন সেকথাই স্পষ্ট করেছেন। দেশ-কাল-সমাজে, কবিতার ভাব প্রকাশে রবীন্দ্রনাথের অবদান স্মরণীয়। এই কথাটির মধ্য দিয়ে কবি অরুণ মিত্র সকল কবির প্রতিনিধি হিসেবে রবীন্দ্র স্মরণ করেছেন।

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা কবিতার জগতে একজন বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব হলেন কবি তারাপদ রায়(১৯৩৬ খ্রি. – ২০০৭ খ্রি.)। তিনি তাঁর কবিতার বিষয় ও আঙ্গিক সম্পর্কে জানিয়েছেন— "কবিতার বলার বিষয়ে বা ভঙ্গিতে আমি সবসময়ে একটু গতানুগতিকতার বাইরে একটু আলাদা থাকতে চেয়েছি। নিজের সম্বন্ধে আমার সবচেয়ে বড়ো কথা আমি কখনও এমন কিছু লিখি না যা স্পষ্ট নয়, যা বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়, যা আমি নিজে জানি না বা বুঝি না। ধোঁয়াটে বা অপরিচ্ছন্ন উক্তিতে আমি বিশ্বাস করি না এবং স্বীকার করতে দ্বিধা নেই আজ পর্যন্ত এমন কোনো পাঠক বা পাঠিকার আমি সন্ধান পাইনি যিনি বলেছেন, আমার কবিতা তিনি বুঝতে পারেননি।"[৮] তাঁর প্রকাশিত কাব্যগুলির মধ্যে— 'তোমার প্রতিমা'(১৯৬০ খ্রি.), 'ছিলাম ভালোবাসার নীল পতাকাতলে স্বাধীন'(১৯৬৭ খ্রি.), 'কোথায় যাচ্ছেন তারাপদ বাবু'(১৯৭০ খ্রি.), 'তোমার প্রতিমা'(১৯৭৩ খ্রি.), 'নীল দিগন্তে এখন ম্যাজিক'(১৯৭৪ খ্রি.), 'পাতা ও পাখিদের আলোচনা'(১৯৭৫ খ্রি.), 'ভালোবাসার কবিতা'(১৯৭৭ খ্রি.), 'দারিদ্র্যরেখা'(১৯৮৬ খ্রি.), 'দুর্ভিক্ষের কবিতা'(১৯৮৯ খ্রি.), 'জলের মতো কবিতা'(১৯৯২ খ্রি.), 'দিন আনি দিন

খাই'(১৯৯৪ খ্রি.), 'টিউবশিশুর বাবা'(১৯৯৫ খ্রি.), 'ভালো আছ, গরিব মানুষ'(২০০১ খ্রি.), 'কবি ও পড়শিনি'(২০০২ খ্রি.) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'ছিলাম ভালোবাসার নীল পতাকাতলে স্বাধীন' কাব্যের 'মৃন্ময়ী', 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি', 'প্রভুর জন্য' প্রভৃতি কবিতায় রবীন্দ্র-অনুষঙ্গ নানাভাবে উঠে এসেছে। 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় কবি তারাপদ রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সরাসরি অভিযোগের সুরে প্রশ্ন করেছেন—

"কে আপনাকে বলেছিল, 'বসন্ত রোদন ভরা'
আপনি দেখেছিলেন ?
হায়! হায়!
আপনি সব জেনে শুনে আমাদের সর্বনাশ করে গেছেন,
যেদিকে তাকাই শুধু লিরিকের লতা,
হাওয়ায় গড়িয়ে পড়ে,
ন্যাকা মেয়েছেলে যেন কিছুই জানে না।"

বাংলা গীতিকবিতার যথার্থ শিল্পী হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর রচনায় (কবিতা, গান, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক) লিরিকের প্রাধান্য বেশি। তাঁর রচনা কোনো কোনো সময় বাস্তববাদকে ছাড়িয়ে ভাববাদ উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। কবি তারাপদ রায় জানিয়েছেন বর্তমান প্রেক্ষিতে ভাববাদ থেকে যুক্তিবাদ বেশি গ্রহণযোগ্য। তাই লিরিকের লতা মনে তেমন জায়গা পায় না 'হাওয়ায় গড়িয়ে পড়ে'। কবি, রবীন্দ্রনাথকে অভিযোগ করলেও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। তিনি জানেন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে রয়েছে চরৈবেতির মন্ত্র।

বিশ শতকের ষাটের দশকের একজন কবি ব্যক্তিত্ব হলেন দেবদাস আচার্য। তাঁর 'অগণিত কবিতা – ২' -এর 'সন্ধ্যাসংগীত' কবিতাটির নামকরণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সন্ধ্যাসংগীত'(১৮৮২ খ্রি.) কাব্যটির কথা স্মরণ করায়। 'সন্ধ্যাসংগীত' কবিতায় কবি লিখেছেন—

"যা ভেবেছি তা যে প্রভাবিত ভাব, যা বুঝেছি তাও অমৌলিক,
ঘোলাটে আকাশে তারা তো কখনো হয় না তেমন উজ্জ্বল,
অনুভূতি ছিল অনিয়ন্ত্রিত, স্বপ্ন ছিল না স্পষ্ট,"

কবিতাটিতে কবি উপমা-রূপক-প্রতীকের আড়ালে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করেছেন।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কবিতার জগতে অনিতা অগ্নিহোত্রী স্মরণীয় নাম। 'চন্দন গাছ', 'বৃষ্টি আসবে', 'সাঁজোয়া বাহিনী যায়', 'ব্রেল', 'কৃতাঞ্জলি মেঘ', 'মালিম হাবার' তাঁর প্রভৃতি কাব্য উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী'(১৮৯৩ খ্রি.) কাব্যের শেষ কবিতা হল 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'। অন্যদিকে কবি অনিতা অগ্নিহোত্রী 'বৃষ্টি আসবে'

কাব্যে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' শিরোনামে একটি কবিতা রচনা করেন। উভয় কবিতার মধ্যে কেবলমাত্র নামসাদৃশ্য আছে এমন নয়, ভাবসাদৃশ্যও বর্তমান। মানবজীবন এক নিরুদ্দেশ পথে যাত্রা করে — যার আরম্ভ জানা থাকলেও অন্তিম বিন্দু অজানাই থেকে যায়। কবিতাটির শেষাংশে কবি যেন সেই কথাই প্রকাশ করেছেন—

"তুমিও কেন হারিয়ে গেলে, পাগল নদী, সাগর জলে
পৌছলে না। বালুর চরে জ্যোৎস্নামাখা রাত্রি ধু-ধু!"

তপন বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাধীনতা-পরবর্তী পর্বে কবিতা লেখা শুরু করেন। তিনি কথাশিল্পী ও কবি। তিনি এই দু'টি ধারাকে সমানতালে চালনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র ভূমিকায় জানিয়েছেন— "একজন কবিই হব এই ছিল আশৈশব লক্ষ্য, কখন যে গদ্যের টানে হয়ে গেছি ঔপন্যাসিক ও গল্পকার সেই সন্ধিক্ষণ আমার নিজেরও স্মরণে নেই। অথচ প্রাথমিকে পড়ার সময় থেকেই গদ্য লেখার শুরু, তারপর কবিতা লেখার মুসাবিদা। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াপড়ির দিনগুলিতে এমন দিন কমই গেছে যেদিন কোনও কবিতা লিখিনি। তবে ছাপাছাপির কথা ভেবেছি অনেক পরে যতক্ষণ না পায়ের তলায় খুঁজে পেয়েছি মাটি।"[৯] তাঁর রচিত কাব্যগুলির মধ্যে— 'ভাবনায় সাম্প্রতিক শব্দগুলি'(১৯৭১ খ্রি.), 'বাবা দক্ষিণরায়ের গুলগুলি চোখ'(১৯৭৩ খ্রি.), 'সাদা পায়রার মমি'(১৯৮৭ খ্রি.), 'রুনা সিরিজ'(১৯৮৮ খ্রি.), 'সাতটি কাব্যগল্প'(১৯৯৬ খ্রি.), 'মোমবাতির আলোয় প্রেম'(২০০১ খ্রি.), 'একগুচ্ছ রক্তকরবী : নন্দিনীকে'(২০১৪ খ্রি.), 'দাঁড়িয়ে, রইলে কেন, চলো'(২০১৪ খ্রি.), 'কবিতা'(২০১৭ খ্রি.) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁর কবিতায় রবীন্দ্র-অনুষঙ্গ নানা ভাবে এসেছে। 'বাবা দক্ষিণরায়ের গুলগুলি চোখ' কাব্যের 'সহজ পাঠ', 'কবিতা' কাব্যের 'চরৈবেতি', 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রভৃতি কবিতা পাঠ করলে তা অনুভব করা যায়।

'সহজ পাঠ' হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটি শিশু পাঠ্য। এই বইটি শিশুদের বাংলা বর্ণমালার পাঠ নিতে, বাংলা ভাষা শিখতে, পড়া ও লেখার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কবি তপন বন্দ্যোপাধ্যায় 'সহজ পাঠ' কবিতায় সমকালের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করতে স্মৃতি রোমন্থন করেছেন শৈশবের দেশে। আর তা করতে গিয়ে রবীন্দ্র-অনুষঙ্গ উঠে এসেছে—

"খঞ্জনি বাজায় যে বাউল সে রেখে যায় উদাসীন হাওয়া
বুকের রন্ধ্রে, বুক ভরে যায় ঠাসাঠাসি তুলোট কাগজে, আঁকিবুকি, খাগের কলম
ধুঁধুল পাতার স্বপ্নে বাল্যকালের পাতা উল্টে যাই, বাল্যকালের ধাঁচে
স্বরবর্ণ চিবোনোর ফুরসতে পৌঁছে যায় পাঠশালা – পইঠার কাছে"।

কবি লোকাভরণ শৈলীর প্রয়োগ করে কবিতাটির ভাব ব্যক্ত করেছেন। 'বাল্যকালের পাতা উল্টে' পরবর্তী জীবনের অধ্যয়ন পর্ব সুগম হয়। কবি শৈশবের স্মৃতিসুধার ডালি থেকে সহজ পাঠ নিয়ে বর্তমানকে সুন্দরভাবে চালনার কথা বলেছেন।

'চরৈবেতি' হল উপনিষদের মন্ত্র — যার অর্থ এগিয়ে চলা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চরৈবেতি'র ভাবনা 'বলাকা'(১৯১৬ খ্রি.) কাব্যে প্রয়োগ করেছেন। কবি তপন বন্দ্যোপাধ্যায় 'চরৈবেতি' কবিতায় থেমে থাকা নয় এগিয়ে চলার বার্তা দিয়েছেন—

"পথের উপর থাকবে সাঁকো, পাহাড় থাকাও বিচিত্র নয়
থাকতে পারে খন্দখানা, বন্ধুর পথ কাঁকরময়
হঠাৎ যদি থমকে যাই, যায় না চলা একটি পা-ও
ভিতর থেকে বলছে কেউ, চরৈবেতি, এগিয়ে যাও।"

'এগিয়ে যাও' এই কথাটি রাবীন্দ্রিক ভাবনার পরিচয়বাহী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বলাকা'(১৯১৬ খ্রি.) কাব্যে যে এগিয়ে চলার বার্তা দিয়েছেন এই কবিতায় তার কিছুটা আভাস রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সাহিত্য'(১৯০৭ খ্রি.) প্রবন্ধগ্রন্থের একটি অন্যতম প্রবন্ধ হল— 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' তথ্যকে গ্রহণ করে তার সঙ্গে সাহিত্যের রস মিশিয়ে যে উপন্যাস গঠিত হয় তাই ঐতিহাসিক উপন্যাস'। ইতিহাসের তথ্যকে গ্রহণ করে তার সঙ্গে সাহিত্যের রস মিশিয়ে যে উপন্যাস গঠিত হয় তাই ঐতিহাসিক উপন্যাস। কবি তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' কবিতাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্ত প্রবন্ধটির নাম সাদৃশ্য ও ভাবসাদৃশ্য রয়েছে। কবি লিখেছেন—

"চারশো বছর আগে আমি কি ছিলাম এই পুরোনো শহরে
কী ছিল আমার নাম, বসবাস কোন বাড়িটিতে
সিংহদরজাগুলি সার সার খুঁজে চলি নিবিষ্ট দু-চোখ মেলে
কোন সে দরজা ঠেলে খুঁজে পাব প্রাচীন আমি-কে।"

ইতিহাস কেবলমাত্র অতীতের কথা নয়— বর্তমান ও ভবিষ্যতের পথকে সুন্দরভাবে চালনা করার অন্যতম সোপান। এই কবিতায় কবি ইতিহাসের মধ্য দিয়ে প্রাচীন আমির সন্ধান করেছেন। এখানে অতীত ও বর্তমান, পুরনো ও নতুনের মেলবন্ধন ঘটেছে।

এভাবে স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গের বাংলা কবিতার পাঠ নিলে দেখা যায়, কবিরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নানাভাবে বরণ ও গ্রহণ করেছেন। তিনি বাঙালি কবির কাছে জীবন্ত মিথ হয়ে উঠেছেন। তিনি জেগে আছেন বাঙালির অস্তিত্বে, কবিতার মূলে। যুগগত পরিপ্রেক্ষিতে কবিরা রবীন্দ্র চিন্তা-চেতনা থেকে কিছুটা সরে এলেও একেবারে পারেননি। ব্যাটারি যেমন চার্জারকে ভুলতে পারে না, তেমনই বাঙালি কবি

রবীন্দ্রনাথকে মনে রেখেছেন। কবিতার বিষয়-আঙ্গিকগত নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে কবিতার প্যাটার্নে পরিবর্তন এলেও রবীন্দ্র ভাবনা বাঙালি বিস্মৃত হয়নি বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। একুশ শতকের বাঙালি কবিও রবীন্দ্রচর্চা করছেন।

তথ্যসূত্র :

১. আইয়ুব, আবু সয়ীদ ও মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত), আধুনিক বাংলা কবিতা, কবিতা ভবন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ জুলাই ১৯৪০, ভূমিকা

২. রায়, অলোক (সম্পাদিত), সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃ. ৮

৩. সিংহরায়, জীবেন্দ্র, আধুনিক কবিতার মানচিত্র, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃ. ২৫

৪. বসু, বুদ্ধদেব, প্রবন্ধ-সংকলন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : এপ্রিল ২০১৮, পৃ. ৭৩

৫. দাশ, জীবনানন্দ, কবিতার কথা, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, নবপর্যায় সিগনেট প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ২৬

৬. বসু, বুদ্ধদেব, কালের পুতুল, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ মে ২০১০, পৃ. ১০১

৭. দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন ও বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ(সম্পাদিত), আধুনিক কবিতার ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ২০৪

৮. রায়, তারপদ, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : অক্টোবর ২০২১, পৃ. ৮

৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০১৯, পৃ. ৭

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ :

অগ্নিহোত্রী, অনিতা, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১৯

মিত্র, অরুণ, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৬

দাশ, জীবনানন্দ, শ্রেষ্ঠ কবিতা, কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ : জানুয়ারি, ২০২০

মিত্র, দেবারতি, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০০

মুখোপাধ্যায়, বিজয়া, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ : জুন ২০১০

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সঞ্চয়িতা, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ : আশ্বিন ১৩৫৬

ভট্টাচার্য, সুকান্ত, ছাড়পত্র, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৫৪

রায়, তারাপদ, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : অক্টোবর ২০২১

বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০১৯

সহায়ক গ্রন্থ :

ভট্টাচার্য, তপোধীর, কবিতার রূপান্তর, সাহিত্যলোক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৩

ত্রিপাঠী, দীপ্তি, আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট ২০১৭

চক্রবর্তী, সুমিতা, আধুনিক কবিতার চালচিত্র, সাহিত্যলোক, কলকাতা, পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ : ১৪ এপ্রিল ২০১৬

সমরেশ বসুর 'সুচাঁদের স্বদেশযাত্রা' : উদ্ভ্রান্ত উদ্বাস্তু মানুষের দল

দেবাশিস মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
প্রভাত কুমার কলেজ, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর

আমার এই আলোচনার মূল প্রাণ কেন্দ্র হয়ে উঠেছে উদ্বাস্তু মানুষের দল। এই উপন্যাসে আমি দেখিয়েছি উদ্বাস্তু মানুষ কীভাবে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার। কীভাবে নিজের দেশ আর নিজের থাকেনা, কীভাবে নিজের দেশেই একজন 'পরবাসী' হয়ে ওঠে, তার ইতিবৃত্ত। কখনও সেই বিবরণ হয়ে উঠছে ভয়াবহ অভিজ্ঞতার, আবার কখনও তা হয়ে উঠছে ইতিহাস ও রাজনীতির পক্ষপাতদুষ্টতায় পূর্ণ, আবার কখনও সেই বিবরণ হয়ে উঠছে নারীত্বের অবমাননার ইতিকথা। কখনও তা হয়ে উঠছে স্মৃতিচারণা ও বিষাদময়তায় ঘেরা। এখানে দেখানো হয়েছে মানুষের মূল্যবোধের অবক্ষয় ও অসহায়তার নির্মম চিত্র। এসবের পাশাপাশি লেগেই আছে উদ্বাস্তু মানুষের হাহাকার, পুরোনো বসতি ছেড়ে নতুন বসতির জন্য বিশাল এক সংগ্রামের কাহিনি।

দেশবিভাগের লেখালেখি নিয়ে বা উদ্বাস্তু মানুষের সংকটের কথা সাহিত্যে তুলে ধরা নিয়ে একদল মানুষের ধারণা ছিল যে ছিন্নমূল বা উদ্বাস্তু মানুষজনের ভয়াবহ সংকটের কথা বা দেশভাগ নিয়ে সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে অপ্রাচুর্যতা আছে। এই মতামত পুরোপুরি সেই অর্থে সত্য নয়। কারণ, অনুসন্ধানের অলসতায় প্রকৃত সত্যটা চাপা পড়ে গেছে। উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে সাহিত্য রচনায় খামতি নেই বরং সাহিত্যে উদ্বাস্তু মানুষের প্রাধান্য এতটাই বেশি তা রীতিমতো বিস্ময়ের উদ্রেক করে। বিশেষ করে বিগত এক দশকে উদ্বাস্তু মানুষের অসহায়তার কথা সাহিত্যে যেভাবে ধরা পড়েছে, যেভাবে আলোচনা করেছেন সাহিত্যিকেরা (ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, কবিরা) তা বিশেষ করে অবাক করার মতোই।

আমি উদ্বাস্তু সংক্রান্ত যে সমস্ত উপন্যাস পড়েছি সমরেশ বসুর 'সুচাঁদের স্বদেশযাত্রা' (১৯৬৯) সেইসব উপন্যাসের থেকে বেশ কিছুটা অন্য গোত্রের। আমরা একাধিক উপন্যাসের একাধিক চরিত্রকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে দেশভাগের ফলে উদ্বাস্তু হতে দেখেছি। তাদের নিজস্ব ভূমি হারাতে দেখেছি। সুচাঁদও দেশ হারানো এক চরিত্র কিন্তু তার ধরনটা বেশ আলাদা। নিজস্ব ভূমি হারিয়ে দেশ ভাগাভাগির কারণে উদ্বাস্তু হয়েছে সে, এমন উদ্বাস্তু হওয়াটা দেশভাগের পরবর্তী সময়ে খুব স্বাভাবিক ঘটনা, যা অন্যান্য উপন্যাসেও আমরা অসংখ্য চরিত্রের মধ্যে পেয়েছি। কিন্তু, কী অদ্ভুত! 'সুচাঁদের স্বদেশযাত্রা' উপন্যাসে আমরা সুচাঁদকে একবার নয়, দুবার উদ্বাস্তু হতে

দেখেছি। প্রথমবার, উত্তাল পরিস্থিতির কারণে উদ্বাস্তু হয়ে সে বাধ্য হয়ে পূর্ববঙ্গ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে আসছে। দ্বিতীয়বার, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিকূল পরিবেশে থাকতে না পেরে সে সিদ্ধান্ত নেয় আবারও পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে পূর্ববঙ্গে ফিরে যাওয়ার। কিন্তু সুচাঁদ পূর্ববঙ্গের বাসিন্দা হওয়ার পরও তাকে নিজের দেশে ফিরে আবারও উদ্বাস্তু হতে হল। সে নিজভূমিতে 'পরবাসী' হয়ে উঠল। তাই পূর্ববঙ্গে ফেরার পরে বন্দুকধারী পুলিশসহ দারোগা এসে সুচাঁদকে হিন্দুস্থানের গুপ্তচর সন্দেহে থানায় নিয়ে চলে যায়। নিজের দেশ ছেড়ে আবারও নিজের দেশে ফিরে যাওয়া, মানুষের এধরনের বিপর্যয়ের দিকটিকে ঔপন্যাসিক সুচাঁদের আকুল কাতরতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন উপন্যাসটিতে- "যখন জেলের ভিতরে তাকে ঢোকানো হয়, তখন মনে মনে বলে, আগো মা, একদিন তো ওরা বুঝব, আমি শুধু দ্যাশে আইছিলাম..."[১] আমার মনে হয় এখানেই উপন্যাসের বিশেষ অভিনবত্ব।

উপন্যাসটি মূলত স্মৃতিচারণমূলক। উপন্যাসের অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র সুচাঁদ বহুরূপী সং দেখিয়ে তার জীবিকা নির্বাহ করে। সুচাঁদের সাথে নমঃশূদ্রদের মেয়ে বুঁচির (ভালো নাম ষোড়শী) ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে, যার চোখ দুটো বিলের জলের মতোই কালো। বুঁচির সাথে বেশ অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে সুচাঁদ, কিন্তু বিনোদ-এর সাথে বুঁচির বিয়ে হয়ে যাওয়ায় এবং বুঁচি সন্তানসম্ভবা হলে এই গ্রামে সুচাঁদের আর মন টেকে না। সে পা বাড়ায় হিন্দুস্থানের দিকে। বছর দুয়েক আগে দেশভাগ হলে, অনেক সংখ্যালঘু হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে- "পশ্চিমের ভাটিতে তখন হিন্দুর গাঙ ঢল খেয়েছে।... বিলডিহির অনেক ভদ্রলোক চলে গিয়েছিল। যতেক দত্ত মিত্তির গুহ বোস, সব বাড়িই প্রায় ফাঁকা।"[২] সুচাঁদ কিন্তু তখনও পূর্ববঙ্গেই থেকে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে সুচাঁদ যে হিন্দুস্থানে পা বাড়িয়েছে তার মূল কারণ কিন্তু দেশভাগ নয়, কোথাও বুঁচিকে না পেয়েই বুঁচির জন্যই সে আজ পশ্চিমবঙ্গের দিকে পা বাড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে আসার পরে সুচাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখকের কলমে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তু মানুষের অসহায়-অবমাননার চিত্র উপন্যাসে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সুচাঁদের কথনে দেশ হারা মানুষের জীবনের বিভিন্ন প্রতিকূলতার চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন বেশ কিছু মানুষ আছে যাদের অবস্থা পূর্ববঙ্গের থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসে আরও ভালো হয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিলডিহির বোস-ঠাকুরতা, দত্তজা, মিত্তির মশাই প্রমুখ। এমনকি গদাধর পণ্ডিত, ব্রজেশ্বরী পুরোহিতের মতো লোক যাদের পূর্ববঙ্গে ভাত জুটত না, তাদের এখন দরজার সামনে মোটর গাড়ি অপেক্ষা করে। এই শ্রেণির মানুষের মধ্য দিয়ে লেখক এমন একটা সম্প্রদায়কে দেখালেন, দেশভাগ যাদের জীবনকে নষ্ট করে দেয়নি বরং সচ্ছল করেছে। আবার লেখক উপন্যাসটিতে দেখিয়েছেন খেলানির মা বাসন্তী, পরানের মেয়ের মতো নারীরা চাল চোরাকারবারের সাথে যুক্ত হয়ে অন্ন সংস্থানের জন্য অন্য জীবন কাটাচ্ছে। দেশভাগ উদ্বাস্তু মানুষের এমন জীবন যাপনে বাধ্য করেছে। নাসীরামের মতো অনেকেই সীমান্ত পারাপার করার কাজে নিযুক্ত হয়েছে। তারা অসৎ

পথে অর্থ উপার্জন করছে। আবার দেশভাগের ফলে কিছু নতুন দালালের জন্ম হয়েছে। পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে তারা অসহায় মানুষের কাছ থেকে টাকা শোষণ করেছে। এই শ্রেণির দালালরা বিভাজনকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগিয়েছে। সুচাঁদের মুখ দিয়ে লেখক উপন্যাসে বারবার উচ্চারণ করিয়েছেন রাজনৈতিক নেতাদের চরম ভণ্ডামি ও নিচু মানসিকতার কথা। এইসব ভণ্ড নেতাদের প্রতি সুচাঁদের অন্তরের জ্বালা করুণভাবে প্রকাশিত হয়েছে উপন্যাসটিতে।

উদ্বাস্তু মানুষগুলোর সুস্থ জীবন-যাপন দেশভাগের পর কীভাবে রূপান্তরিত হয়ে একটা অভিশপ্ত অধ্যায়ে পতিত হল, সেই বিষয়টিকেই এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে আমি এখানে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। আসলে সাহিত্যে এইসব ধারার লেখকেরা কেউ সরাসরি দেশভাগের ভয়াবহতাকে প্রত্যক্ষ করেছেন, কেউবা এই ভয়াবহতার কথা শুনেছেন। তাঁদের সেই শোনা কথা বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরীর স্মৃতিতে ভেসে উঠেছে তাঁদের সাহিত্যে। শৈশব-কৈশোরের ফেলে আসা স্মৃতি, জন্মস্থান তাঁদের লেখায় ধরা পড়েছে। আজও সেইসব উদ্বাস্তু মানুষের চোখের জল সাহিত্যের পাতা ভিজিয়ে দেয়। ঠিক একইরকমভাবে এবঙ্গ থেকে যারা ওবঙ্গে চলে গিয়েছিল তাদেরকে নিয়েও ওবঙ্গে সাহিত্য রচনা করা হয়েছে। একটা মানুষ যে দীর্ঘদিন ধরে তার পরিচিত বেষ্টনীতে বসবাস করেছে। অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে তার পরিবেশ, তার পরিচিতি বিষয়ে। হঠাৎ একটা সময়ে নিজ জন্মভূমি ত্যাগ করে দাগাদাগির আঁচড়ে তাদেরকে আছড়ে পড়তে হয়েছে বিভিন্ন প্রান্তে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অর্জুন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিদিশা, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ভূষণ পাল, সলিল সেনের মনমোহন ভট্টাচার্য্য, বিজন ভট্টাচার্যের হরেন্দ্র মাস্টারের মতোই সমরেশ বসুর 'সুচাঁদের স্বদেশযাত্রা'- উপন্যাসে সুচাঁদের জীবন কীভাবে বদলে গেল সেটাই দেখানো হয়েছে এখানে। নৃশংস হত্যালীলা তাদের জীবনকে মুহূর্তে বদলে দিয়েছে। কখনও কলোনি, কখনওবা স্টেশন চত্বর তাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই হয়ে উঠেছে। কখনওবা মেয়েরা তাদের আব্রু বাঁচাতে না পেরে নিজেদেরকে বিকিয়ে দিয়েছে বাজারে। হয়ে উঠেছে বাজারের পণ্য; কখনও অর্থের তাগিদে, কখনও আবার অপারগ হয়ে। এরকমই নানান অপ্রীতিকর দৃশ্যের উন্মোচন করে, বেশ কিছু ঘটনার মধ্য দিয়ে উপন্যাসটিতে সুচাঁদের পাশাপাশি অন্যসব চরিত্রের মধ্য দিয়ে এই উপন্যাসে উদভ্রান্ত উদ্বাস্তু মানুষের অসহায় জীবন-যাপনকে তুলে ধরেছেন লেখক।

তথ্যসূত্র:

১। সমরেশ বসু, সুচাঁদের স্বদেশযাত্রা, অঞ্জলি প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৩, পৃ: ১১১

২। তদেব, পৃ: ৬০

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১। ঘোষ সেমন্তী (সম্পাদনা), দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা'', গাঙচিল, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ ২০১৪

২। চক্রবর্তী প্রফুল্লকুমার, 'প্রান্তিক মানব, পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুজীবনের কথা', দীপ প্রকাশন, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০১৫

৩। চট্টোপাধ্যায় ভবানীপ্রসাদ, 'দেশবিভাগ পশ্চাৎ ও নেপথ্য কাহিনি', আনন্দ, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৩

৪। চ্যাটার্জী জয়া, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ ,বাংলা ভাগ হল'-বিভাগ ১৯৩২-১৯৪৭' (অনুবাদ: আবু জাফর), এল্ অ্যালমা পাবলিকেশনস, কলকাতা, প্রথম বাংলা সংস্করণ ২০০৩

৫। দাশ উদয়চাঁদ (সংকলন ও সম্পাদনা), 'দেশবিভাগ ও বাংলা আখ্যান', দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, মে ২০১৬

৬। বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দীপ, 'দেশভাগ স্মৃতি আর সত্তা', প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা পুনর্মুদ্রণ সেপ্টেম্বর, ২০০১

৭। বসু সমরেশ, সুচাঁদের স্বদেশযাত্রা, অঞ্জলি প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৩

৮। ভট্টাচার্য তাপস, 'বাংলা উপন্যাসে উদ্বাস্তু জীবন', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২৫শে বৈশাখ ১৪১১

৯। সিনহা ড. হেনা, 'বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ'ভগ্ননীড়ের বেদনা ,, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, স্বাধীনতা দিবস ২০১০

‘মনসা’র বিবর্তন....লেখকের কলম থেকে পাঠকের চোখে...

শম্পা লাহা
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
পাঁচথুপী হরিপদ গৌরীবালা কলেজ

সারসংক্ষেপ : প্রতিটি সৃষ্টির নেপথ্যে বিরাজিত থাকে এক-একটি পটভূমি। ‘মঙ্গলকাব্য’ উদ্ভবেরও এমন নেপথ্য ইতিহাস রয়েছে, রয়েছে বৃহত্তর সমাজ। আর লক্ষ্য করবার বিষয়, যে অর্থে শিল্প চায় গন্ডীবহির্ভূত অবাধ স্বাধীনতা; সেই অর্থে ‘মঙ্গলকাব্য’গুলি স্বাধীন নয়। তাদেরকে শৃঙ্খলিত করেছে মধ্যযুগীয় হাজারতর নিষেধ, সংস্কার, যুক্তিহীন বিশ্বাস। মঙ্গলকবিদের নব নব উন্মেষশালী প্রতিভাকে সৃষ্টির প্রেরণায় নিয়জিত করবার পথে ছিল দ্বিধা, সংশয়, সর্বোপরি ছিল অলিখিত ধর্মীয় অনুশাসন। তাই সাহিত্য-সৃষ্টির সহজ মীমাংসিত গাণিতিক সূত্রের বন্ধনে এই ‘মঙ্গলকাব্য’গুলির উৎপত্তি বিচার্য নয়। আখ্যানধর্মী একাধিক দেব-দেবীকে নিয়ে লিখিত হয়েছিল সে যুগের ‘মঙ্গলকাব্য’।

আর এই কাব্যধারার অন্যতম আকর্ষণ ‘মনসামঙ্গল’ এর আখ্যান কেমন ছিল লেখকের কলমে? আর কেমনভাবেই বা পাঠকের মনের আঙিনায় পদসঞ্চার ঘটেছিল মনসার? শিবের অযোনিসম্ভূতা কন্যারূপে? যাকে দেবলোকের কেউ দেবতা বলেই মানতে চায় নি, নাকি ভাগ্যাহত, নিপীড়িত সেই নারী রূপে যার বিমাতা চন্ডী থেকে শুরু করে স্বামী জরুৎকারু পর্যন্ত কেউই পাশে দাঁড়ায়নি। সেই কাহিনী সেই করুণ পটভূমিই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।
সূচক শব্দ : মনসা, দেবী, লেখক, পাঠক, মধ্যযুগ, শিল্প।

মূল প্রবন্ধ:

অন্য অনেক ধারণার মতো কালগত ধারণাটিও একটি আপেক্ষিক ধারণামাত্র। কোনো কিছুর সাপেক্ষে একটি নির্দিষ্ট সময়পর্বকে আমরা প্রাচীন, মধ্য কিংবা আধুনিকের তকমা লাগাই। যে কাল আমাদের নিকটবর্তী তাকেই আধুনিক বলি আমরা, সেটা কালগত নৈকট্যের কারণেও আবার চিন্তাগত প্রগতিশীলতার সাপেক্ষেও। কারণ রবীন্দ্রনাথের ভাষ্য অনুযায়ী আধুনিকতার মানদন্ড সময় নয়, মর্জি। মানুষের মন চলতে চলতে যে যায়গায় বাঁক নেয়, সেই বাঁকটাকেই বলা হয়, ‘আধুনিক’।

সন্ধ্যেয় প্রদীপ দিতে গেলে সকাল থেকেই সলতে পাকাতে হয়। আধুনিকতার বাঁকও তেমনি। হঠাৎ করে এই বাঁক আসে না, আসে ধীরে ধীরে, অনেক ধাপে অনেক সিঁড়ি পেরিয়ে।

প্রতিটি সৃষ্টির নেপথ্যে বিরাজিত থাকে এক-একটি পটভূমি। 'মঙ্গলকাব্য' উদ্ভবেরও এমন নেপথ্য ইতিহাস রয়েছে, রয়েছে বৃহত্তর সমাজ। আর লক্ষ্য করবার বিষয়, যে অর্থে শিল্প চায় গন্ডীবহির্ভূত অবাধ স্বাধীনতা; সেই অর্থে 'মঙ্গলকাব্য'গুলি স্বাধীন নয়। তাদেরকে শৃঙ্খলিত করেছে মধ্যযুগীয় হাজারতর নিষেধ, সংস্কার, যুক্তিহীন বিশ্বাস। মঙ্গলকবিদের নব নব উন্মেষশালী প্রতিভাকে সৃষ্টির প্রেরণায় নিয়োজিত করবার পথে ছিল দ্বিধা, সংশয়, সর্বোপরি ছিল অলিখিত ধর্মীয় অনুশাসন। তাই সাহিত্য-সৃষ্টির সহজ মীমাংসিত গাণিতিক সূত্রের বন্ধনে এই 'মঙ্গলকাব্য'গুলির উৎপত্তি বিচার্য নয়। আখ্যানধর্মী একাধিক দেব-দেবীকে নিয়ে লিখিত হয়েছিল সে যুগের 'মঙ্গলকাব্য'।

আর এই কাব্যধারার অন্যতম আকর্ষণ 'মনসামঙ্গল'। 'মঙ্গলকাব্য'গুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন 'মনসামঙ্গল'। ব্যক্তিগত বিবেচনায় এবং সমালোচকের দৃষ্টি উভয়তেই সন্ত্রাসবাদিনী মনসার চরিত্রটি হল সমকালীন সমাজ-পরিবেশের প্রত্যক্ষ ফসল। তৎকালীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজের রাজা, ভূস্বামী, ধনী অভিজাত বা জমিদার সমাজের প্রতিভূ মনসা, যিনি রুষ্ট হলে চাঁদের ধনসম্পত্তি নষ্ট করেন। কখনও চাপের মধ্যে ফেলে নির্দিষ্ট ধর্মাচার পালনের কথাও বলেন। তাঁর উদ্দেশ্য যেনতেন প্রকারে উচ্চসমাজে পূজিত হওয়া, তাঁর জন্য নির্বিবেক হতেও আপত্তি নেই। এই বিবেকহীনতাই মধ্যযুগের সমাজের চালিকাশক্তি হিসাবে উপস্থিত মানুষগুলোরও শ্রেণিচরিত্র। প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিজয়গুপ্তের কাব্য। পাঠান রাজত্বের ঐতিহাসিক ও সামাজিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে লেখা এই কাব্যের লেখক-পাঠক উভয়েই তখন জর্জরিত। তাই দেবী হলেও দেবমহিমার স্থলে ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, হিংসা, ক্রুরতা, প্রতিশোধস্পৃহা, ছলনা, ষড়যন্ত্র এসে মিলেমিশে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছে অধ্যাত্মমহিমা। এরপর সামন্তদের প্রতাপ, কাজীর অত্যাচার, ধনীর বিলাসিতা, জমিদারী সংঘর্ষ, গুপ্তহত্যা সবই ধরা পড়েছে বিজয়গুপ্তের কাব্যে।। এককথায় এই মনসা সম্পর্কে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্যটি প্রনিধানযোগ্যঃ—"মনসাকে দেবতা বলিয়া কল্পনা না করিয়া তাঁহাকে মধ্যযুগের অত্যাচারী রাষ্টশক্তির প্রতীকরূপেই কল্পনা করা হইয়াছে। সেইজন্য আত্মরক্ষায় নিরুপায় সমাজের সমগ্র ঘৃণা তাঁহার উপরও পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। অত্যাচারিতের নিকট বারবার সেই দেবতার অপপমান ও পরাজয় বর্ণনার ভিতর দিয়া লাঞ্ছিত সমাজ সেদিন নিজের দুর্গতির মধ্যে এমনিভাবে মানসিক সান্ত্বনা লাভ করিয়াছে।" [১]

কিন্তু এই পরিচয়ই মনসার প্রথম এবং শেষ পরিচয় নয়। পাঠকের মনে সন্দেহের সাথে তাই জিজ্ঞাসাও জেগে ওঠে---সংসার ক্ষেত্রে সূচারুরূপে প্রতিষ্ঠা পেলে অন্যভাবে দেবীরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা তাঁর মধ্যে জাগত কী? আর জাগলেও তার পরিপূর্ণতার জন্য তিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এত বেশী মাত্রায় তৎপর থাকতেন কী?

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার,/ কেন নাহি দিবে অধিকার,/ হে বিধাতা।" আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি জনপ্রিয় বিষয় নিঃসন্দেহে। আধুনিক বাংলা

সাহিত্যের বহু রচনাতেই রচনাকার এঁকেছেন ভাগ্যের বিরুদ্ধে নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ছবি। যদিও নারী সমাজের এই জেহাদ ঘোষণার সূচনা প্রায় পাঁচশ বছর আগেকার বাংলা সাহিত্য।

'মনসামঙ্গল' কাব্যের মনসাই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কী প্রাণপণ সংগ্রাম করতে হয়েছে তাঁকে। ঈর্ষা, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি মানুষী দুর্বলতাগুলি থেকে বিবর্তিত হতে হতে পাঠকের চোখে ধরা দায় এক অন্য মনসা। এই মনসা খল, ক্রুর, প্রতিহিংসাময়ী নন, বরং বিজয়গুপ্তের কাব্য থেকে কেতকাদাসের কাব্যের দিকে যাত্রা করলে দেখা যায়, মনসা তাঁর ঐতিহ্যবাহিত ক্রোধ সংবরণ করে হয়ে উঠেছেন মাতৃস্বরূপা। ভক্তিই বড় সম্পদ হয়ে উঠেছে তাঁর কাছে। প্রমাণ কাজলা মালিনীর দুই পুত্রকে বিঘত্যা নাগ দিয়ে, ক্ষণিকের অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য দংশন করাবার পরেও পুনরায় প্রাণদান করতে তৎপর হয়েছেন। প্রতিহিংসাপরায়ণতা থেকে এই কোমলস্বভাবে পরিবর্তন শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পরোক্ষ ফসল।

যদিও সর্পদেবী মনসার এই আখ্যান ঐতিহ্যবাহিত। মনসা চরিত্রও পূর্বলালিত। তবুও চরিত্রচিত্রণ থেকে বিকৃতি পর্যন্ত যদি খুঁটিয়ে দেখা যায়, তাহলে প্রতিহিংসাপরায়ণতার রং ছাড়া পাওয়া যাবে আরও অনেক রঙের ছোপ। এই মনসা বিমাতা চন্ডীর সঙ্গে বিরোধে সদা তৎপর, আবার চাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তিতেও ভয়ার্ত।

সংস্কৃত পুরাণগুলোতে সব দেবীদেরই ভয়ঙ্কর ও ধ্বংসাত্মক রূপের উজ্জ্বল বর্ণনা থাকলেও মনসার মতো প্রতিহিংসাপরায়ণ দেবীর সাক্ষাৎ বিরল। তবে এটা তাঁর চরিত্রের একটা খোলসমাত্র। নিবিড় পাঠে পাঠকের চোখে ধরা পড়ে সমকালীন সমাজের কুৎসিত চিত্র----

"পরম সুন্দরী কন্যা পদ্মের উপর'
দেখিয়া লাবণ্যরূপ মোহ গেল হর।।
মহেশ-মোহিনী হাসে বসি পদ্মপাতে।
কামে অচেতন হর ধরিলেন হাথে।।" (২)

এখানে কামাতুর পুরুষ অন্য কেউ নন, স্বয়ং পিতা। আর কামনার বলি মনসা। নারীর দিক থেকে কোনো প্ররোচনা না থাকা সত্ত্বেও পুরুষের চোখে নিষেধ ও সত্য উন্মোচন না হওয়া অবধি নারী হয়েছে কামনার সামগ্রী, ভোগের বস্তু, যৌনতার উপাচার। তাই শিবের চোখেও মনসা একটি যৌন অর্থময়, সুন্দর, জৈব শরীর ছাড়া আর কিছু নয়, ধর্মীয় পর্দার তলে দেবীদের নির্মোকে মেয়েদের এই বিপন্নতা, নিরাপত্তাহীনতা সপ্তদশ শতকের অবক্ষয়ী সমাজের জ্বলন্ত চিত্র।

এখানেই শেষ নয়, মনসার এই নিরাপত্তাহীনতা, আশ্রয়ের জন্য বিপন্নতা চিরকালীন, অচ্ছেদ্য এক অঙ্গের মতো। যার সূত্রপাত বিমাতা চন্ডীর দাহন অঙ্গারে

বামচক্ষু অন্ধ করা থেকে শুরু করে দেব-কারিগর নির্মিত সিজুয়া পুরীতে নির্বাসন দান পর্যন্ত।.........

"সিজবনে বনবাস দিয়া যাও বাপা।
নিষ্ঠুর হইলে বাপ মোরে নাঞি কৃপা।।" [৩]

এরপর শুরু আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। কারণ তিনি শিবের কন্যা। যেখানে অসহায়তা, নিঃসঙ্গতার সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে গেছে আত্মপ্রতিষ্ঠার সুতীব্র অভীপ্সা, যার জন্য পিতাকে যুক্তিতর্কের জালে জড়াতেও মনসা দ্বিধাহীন।.........

"কহ পৃথিবীতে মোর কে করিব পূজা।
আমি অপূজনী হলে তুমি পাবে লজ্জা।।" [৪]

মনসার জীবনের পরবর্তী বেদনাকর অভিজ্ঞতা তাঁর বিবাহ। এখানেও বাধ সাধলেন বিমাতা চন্ডী। তাঁর সৃষ্ট মায়াভেক দেখে ছুটে এল 'নাগরাশি কন্যা' র যত সাপের দল। মুনি জরুৎকারু তখন পলায়নপর। স্বামীহীন জীবনে পুত্র আস্তিকই তখন তাঁর একমাত্র সম্বল।

এরপর অন্যান্য দেব-দেবীর পূজা প্রাপ্তির পাশেই প্রবল হয়ে উঠেছে দেবীর আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা, সহজ ছিল না এই দেবকন্যার পূজা পাওয়া, কারণ পুরুষশাসিত দেবতাসমাজে মনসার মতো একজন সুনির্দিষ্ট পিতৃপরিচয়হীন, বিমাতা বিতাড়িত দেবীর পূজা প্রচলিত করতে গেলে দরকার আতঙ্ক জাগরণের; যেহেতু এখানে সোজা আঙুলে ঘি ওঠার নয়, তাই।

পরবর্তী সমস্ত কাহিনি জুড়ে, বেহুলা দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে চাঁদের পূজো লাভ পর্যন্ত, বিষধর সর্পই হয়ে উঠেছে তাঁর উদ্দেশ্যসিদ্ধির মোক্ষম অস্ত্র। কোথাও নীতিহীন নিষ্ঠুরতায়, কোথাও ছলে-বলে-কৌশলে, অনুগতজনকে দাক্ষিণ্য দিয়ে বাঁধা রেখে কখনও ক্রূর হয়ে, অসংখ্যবার অসংখ্যরকম ছদ্মবেশ ধরে। সহ্য করতে হয়েছে বিমাতার লাঞ্ছনা, পিতার ঔদাসীন্য, স্বামীর অবজ্ঞা, দেবসমাজের প্রতিকূলতা---তাঁকে বাধ্য করেছে কচুয়ার তটে রাখাল বালকদের প্রতি প্রতিকূল হতে, হাসনের পুরী ধ্বংস করতে, চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করতে। আবার এই দেবীই মমতাময়ী জালু-মালুর প্রতি, কাজলা মালিনীর দুই পুত্রের প্রতি।

আর এখানেই মনসা নিজের দৈবী সত্তা ছাড়িয়ে হয়ে ওঠেন অসামান্য এক মানবী। পাঠক অনুভব করে তিনি শুধুই প্রতিহিংসাপরায়ণা কোন দেবী নন, তিনি অযোনিসম্ভবা তাই মাতৃস্নেহবঞ্চিতা, যৌবনে অনতিপরিচিত পিতার কামার্ত দৃষ্টির বলি, বিমাতার সন্দিগ্ধতায় অন্ধ, দেবকন্যা হয়েও পুরুষশাসিত দেবসমাজ থেকে বিতাড়িতা, ভোগসুখবিরহিত প্রৌঢ় মুনির সঙ্গে বিবাহ, এবং বিবাহ রাত্রেই পরিত্যাগ। যাকে পূজা প্রতিষ্ঠা করতেও সাহায্য গ্রহণ করতে হয় আতঙ্কের, শিবকন্যা হয়েও। এই সুতীব্র জীবন-সংগ্রাম দেবী কেন, কোন সাধারণ নারীরও সহ্যসীমার বাইরে, তাই মনসা যেন

নিজের অজান্তেই হয়ে উঠেছেন মধ্যযুগের সমস্ত অত্যাচারিত, নিপীড়িত নারীমানসের প্রতিনিধি, যাঁদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় একটাই প্রশ্নঃ----

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার,/ কেন নাহি দিবে অধিকার,/ হে বিধাতা।" কারণ সমাজ তো পুরুষশাসিত। অতএব পুরুষ দেবতারই পূজা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। সেখানে মনসা একে নারীদেবতা, তার উপর অন্ত্যজ শ্রেনির পাতালকন্যা, সুনির্দিষ্ট পিতৃপরিচয়হীনা। অর্থাৎ 'মনসা'র কোন 'স্ট্যাটাস' নেই। বামচক্ষুহীনা এই দেবীর দেবীত্ব নিতান্ত দায়ে না পড়ে থাকলে স্বীকার না করলেও চলে যায়। হয়তো সে কারণেই শিবকন্যা হওয়া সত্ত্বেও মনসাকে লড়াই করতে হয়েছে পুরুষশাসিত দেবসমাজের সঙ্গে। ছিনিয়ে নিতে হয়েছে নিজের স্থান, সেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ, যে সমাজে শিব প্রতিষ্ঠিত এবং স্বীকৃত। অথচ দেবকন্যা হওয়া সত্ত্বেও, শুধু নারী হবার কারণেই, মনসা দেবীর পুজা তাঁদের মতে অনুচিত, কারণ যে হাতে 'দেব-শূলপাণি' পূজিত হন, সেই একই হাতে শোভা পায় না 'চেংমুড়ি কানী' র পূজা, তা সে যতই শিবকন্যা হন না কেন।

এই গর্বোদ্ধত পুরুষের কণ্ঠ সেদিনও অশ্রুত ছিল না, আজও নেই। সেদিন যা ছিল অঙ্কুরমাত্র, তাই আজ বিষবৃক্ষে রূপান্তরিত। সেদিনের মনসাই আজকের শবলা আর পিঙ্গলায় রূপায়িত। আজও যেমন কন্যাসন্তান অপেক্ষা পুত্রসন্তানই অধিকতর অভিপ্রেত। মধ্যযুগেও চিত্র কিছু আলাদা ছিল না। যেখানে নারী পুরুষের গৃহদাসী, সেবাদাসী, যৌনদাসী--- কিন্তু সঙ্গিনী বা অর্ধাঙ্গিনী নয়। যার পরবর্তী উত্তরণ উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের 'মনসামঙ্গল পালা'(২০১৬), দেবেশ ঠাকুরের 'মনসামঙ্গল' এ।

বলতে দ্বিধা নেই, আজ থেকে পাঁচশো বছরেরও আগে যে-কাহিনী জন্ম নিয়েছিল লোকসমাজের গভীরে, তার আবেদন এত তীক্ষ্ণ ও ব্যাপক ছিল যে, পরবর্তী কালের সাহিত্যস্রষ্টারাও বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছেন তাকে। দেবী মনসার ভাগ্যে হয়তো কবিবর মুকুন্দ চক্রবর্তী কিংবা রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের মতো প্রতিভাবান শিল্পীর কর-স্পর্শ জোটেনি, কিন্তু আধুনিক কালের লেখক এবং পাঠক বোধ হয় তার সেই আক্ষেপ পূরণ করে দিয়েছে নবতর ব্যঞ্জনা ও ভাব-সৌন্দর্যের সম্ভারে।

তথ্যসূত্র:

১। ভট্টাচার্য আশুতোষ, 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', প্রকাশস্থান ও প্রকাশনী অনুল্লিখিত, পঞ্চম সংস্করণ ১৯৭০, পৃষ্ঠা-৪১৪
২। নস্কর সনৎকুমার, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বিরচিত 'মনসামঙ্গল', প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশঃ ১ লা জানুয়ারী ২০১১, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, বইমেলা ২০১৫, পৃষ্ঠা-১৮ (মূল কাব্য অংশ)
৩। ঐ, পৃষ্ঠা-২৩
৪। ঐ, পৃষ্ঠা-২৩

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

১। ‘কোরক’ সাহিত্য পত্রিকা, শারদ ২০১৬, মঙ্গলকাব্য ও মঙ্গলকাব্যচর্চা, কলকাতা, সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৬, দেশবন্ধুনগর, বাগুইহাটি।

২। তবু একলব্য, সময়ের সংলাপ, মঙ্গলকাব্য বিশেষ সংখ্যা, দশম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, আশ্বিন-১৪২২, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা।

৩। মল্লিক দীপঙ্কর, মধ্যযুগঃ ফিরে দেখা, পুস্তক-বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারী ২০০৪, দ্বিতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০১২।

৪। গঙ্গোপাধ্যায় মুনমুন, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের ‘মনসামঙ্গল’—জীবন বীক্ষার আলোকে, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ দীপাবলি, ২০১০।

৫। নস্কর সনৎকুমার, প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যঃ পরিপ্রশ্ন ও পুনর্বিবেচনা, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশঃ ১৫-০৮-২০১২

“ভেসে থাকি অস্তিত্বের দৈন্য নিয়ে” : অমল, বিমল, কমলের অস্তিত্ব-জিজ্ঞাসা ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’

শ্রেয়সী রায়
গবেষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : পড়াশুনা এবং চাকরি সূত্রে লণ্ডনে থাকার সময়ে টুকরো কিছু ভাবনা, ডায়েরি, কবিতাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গেঁথে লেখা হয় ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটক। **১৯৬৩** সাল। বাংলায় বিমূর্ত বা অ্যাবসার্ড নাটকের স্বাদ এনে দিয়েছিলেন বাদল সরকার। ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ তার গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। তার পাশাপাশি এই নাটকে মিলবে অস্তিত্ববাদী জীবন-জিজ্ঞাসার কিছু মূল প্রশ্ন আর সেই সঙ্গে সমাধানের কাছে পৌঁছনোর প্রয়াস। ঊনবিংশ শতক থেকে সূচিত এই বিশেষ দর্শনটির অভিঘাতকে তত্ত্ব হিসাবে নয়, বরং যাপনসত্য হিসাবে কেমন করে গ্রহণ করতে পারে সমসময়ের ব্যক্তিমনন, আর কেমন করে ক্রমিক আত্মখনন করে খুঁজে নিতে পারে আলোর দিশা — ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’-এর নাট্যচরিত্রদের হাত ধরে তাকেই চিনে নেওয়ার সামান্য চেষ্টা এই লেখায়।
মূলশব্দগুচ্ছ : বাদল সরকার, নাটক, বিমূর্ততা, অস্তিত্ববাদী দর্শন।

।।১।।

‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকটির নায়ক কে? নাটকের নামচরিত্র ইন্দ্রজিৎ? প্রশ্নদীর্ণ জীবনের উপকূলে দাঁড়িয়ে অর্থ আর অনর্থ, কিংবা বেঁচে থাকা আর টিঁকে থাকার দ্বন্দ্বে দ্বিধান্বিত ইন্দ্রজিৎ? নাকি লেখক? নাট্যঘটনার, কিংবা বলা ভালো ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকের ঘটনাহীন ঘটনার সমষ্টির ভিতর থেকে মাঝেমধ্যে ভেসে উঠছে যার মুখ, যার স্পর্ধিত কলম, আর আবার হারিয়ে যাচ্ছে জলের ক্ষণজীবী আলিম্পনে? অমল, বিমল, কমলদের ভিড়ে আর একজন নির্বিকল্প ‘নির্মল’ হয়ে মিশে যাওয়ার অপচয় থেকে বারবার ইন্দ্রজিৎদের রক্ষা করে যে। যে বলে —

> “তবু তুমি নির্মল নও। আমিও সাধারণ। তবু আমি নির্মল নই। তোমার আমার নির্মল হবার আর উপায় নেই।”[১]

অন্যদিকে অমল, বিমল, কমল? ‘এবং’ সংযোজক অব্যয়টির ব্যবহার যাদের অনুল্লিখিত উল্লেখ আসলে রেখে গেছে নাটকের নামে? অমল, বিমলদেরই তো ‘অপর’ এই ইন্দ্রজিৎ, তাদেরই alter-ego। খণ্ড, ক্ষুদ্র যাপনের নিয়ত আবর্তনের জাঁতায় পিষে সব সম্ভাবনার খোসা ছিঁড়ে যে অভিন্ন, যে মাপ-দস্তুর অমলেরা তৈরি হয়েছে, হচ্ছে প্রতিদিন, তাদের ভিতরকার জমে থাকা প্রতিরোধ ইন্দ্রজিৎ, আবার হয়ে উঠতে না পারার গাঢ় বেদনায় নিজেকে ক্রমশ ‘নির্মল’ হয়ে যেতে দেখার অভিমানও ইন্দ্রজিৎ।

এই নাটক তাই শিরোনামেই ধারণ করে রেখেছে প্রত্যেক ব্যর্থ এবং অ-ব্যর্থ ইন্দ্রজিতের অভিযাত্রার সন্ধান।

"অমল বিমল কমল। এবং ইন্দ্রজিৎ।
বিমল কমল। এবং ইন্দ্রজিৎ।
কমল। এবং ইন্দ্রজিৎ।
এবং ইন্দ্রজিৎ।"[২]

কিন্ত বন্ধুদের আড্ডায় লেখক গল্পচ্ছলে এ-ও বলেছিল যে এই নাটকের নাম রাখা যেতে পারত 'ইন্দ্রজিৎ এবং মানসী' (যেহেতু মলাটে কুলোবে না 'অমল, বিমল, কমল, ইন্দ্রজিৎ ও মানসী' — এই নাম)। এই 'মানসী'টি এসে পড়ায় লেখকের নাটকটা নারীচরিত্র বর্জিত হতে হতেও হল না অল্পের জন্য। যদিও নারী চরিত্রটির ব্যক্তিরূপ প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে তার 'মানসী' নাম আর 'মানসী কল্পনালতা'র আবরণে। মানসী সেই অব্যক্তনামা নারী, সকল প্রেমিকার সত্তার ভিতরে অন্তঃশীল সেই রহস্যময়ী, যাকে পেয়েও পাওয়া, বুঝেও বোঝা বাকি থেকে যায় ইন্দ্রজিৎদের। তাদের আজীবনের জিজ্ঞাসায় মাঝেমধ্যে সান্ত্বনার প্রলেপ হয়ে আসে মানসী, যদিও কখনও ঘটায় না জিজ্ঞাসার উপশম —

"... নিশার আঁধারস্রোতে
মুছে ফেলে দিয়ে যায় সৃষ্টিপট হতে
এই ক্ষীণ অর্থহীন অস্তিত্বের রেখা,
তখন করুণাময়ী দাও তুমি দেখা"[৩]

তবে নাটকের নাম 'ইন্দ্রজিৎ এবং মানসী' হল না কেন? লেখক তো জানত যুগে যুগে কত মিলনান্ত, বিয়োগান্ত, সামাজিক, ঐতিহাসিক নাটকের যুগ্ম কুশীলব হয়ে থেকেছে 'ইন্দ্রজিৎ এবং মানসী'র দল। তবে কি নতুন পৃথিবীর গল্পে গুরুত্ব কমেছে মানসীর? মানসী রয়ে গেছে ইন্দ্রজিতের জীবনসমুদ্রের একটি স্রোত হয়ে, যত গুরুত্বপূর্ণই হোক, ইন্দ্রজিতের দৃষ্টিসীমার বাইরে যার অর্থ নেই কোনো! অথবা হয়তো এর উত্তর সত্যিই শিরোনামের স্থানসংকুলান, 'এবং' শব্দেই সমাহিত হয়ে আছে অমল-বিমল-কমলদের মতো ইন্দ্রজিতের মানসীরাও।

।।২।।

"এক-দুই-তিন
এক-দুই-তিন-দুই-এক-দুই-তিন
চার-পাঁচ-ছয়
চার-পাঁচ-ছয়-পাঁচ-চার-পাঁচ-ছয়
সাত-আট-নয়
সাত-আট-নয়-আট-সাত-আট-নয়
নয়-আট-সাত-ছয়-পাঁচ-চার-তিন-দুই-এক।"[৪]

লেখক কবিতা লিখেছে একটা, বন্ধুরা হেসে বলেছে, যে কবিতা বোঝার অতীত 'আধুনিক কবিতা' হওয়ার মাপকাঠিতে তা উৎরে গেছে নিঃসন্দেহে। অতএব, কবি-বন্ধুর এই লেখা একটি অবিসংবাদী 'আধুনিক কবিতা'। —এবং এই নাটক আধুনিক নাটক, এই জীবন আধুনিক জীবন। সুতরাং এরা সকলেই আপাত-দুর্বোধ্যতায় সাংকেতিক। আমাদের মনে পড়ে বাদল সরকার তাঁর আত্মজৈবনিক জার্নালটিতে 'এবং ইন্দ্রজিৎ'-এর রচনাকালীন স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছিলেন —

> "দুবছর ধরে লণ্ডনের বিভিন্ন কবিতা, চিন্তা, ডায়েরি প্রায়ই খোঁচা মারে — সেসব নাটকের ছকে পেতে লেখার।... কোনোরকম নির্দিষ্ট পরিকল্পনা না করেই লিখে চললাম। যেন একটা কবিতা থেকে পরের কবিতায় পৌঁছানো, মাঝখানটা সংলাপ দিয়ে ভরা।"[৫]

এই নাটক, অতএব, রচয়িতার সাক্ষ্যেই হয়ে দাঁড়িয়েছে কবিতার নিকট-আত্মীয়। এখন প্রথমতম কবিতাটির হাত ধরে চিনে নেওয়া যাক এই নাটকের মূল প্রশ্নের অভিমুখটিকে।

অমলের নাম বিমল হতে পারত, বিমলের নাম হতে পারত কমল। ইন্দ্রজিৎদের হতাশা, ভয়, ক্লান্তি, জীবনবিমুখতা প্রায়শই লুকিয়ে পড়ে 'নির্মল' নামের আড়ালে। 'মানসী' যেকোনো একটি মেয়ের নাম হতে পারত, কিংবা হতে পারত পৃথিবীর সমস্ত মেয়েরই নাম। 'মাসিমা' হতে পারতেন মা, কিংবা পিসিমা, বা কাকিমা, বা মামিমা, অথবা বড়বৌদি। এই অজস্র সম্ভাব্যতার আবর্তনে ঘুরছে সমস্ত চরিত্রের পরিচয়, যারা সত্যি করে কোনো 'চরিত্র'ই হয়ে উঠতে না পারার ব্যর্থতায় ক্ষিপ্ত। অবশ্য হয়ে ওঠার প্রয়োজন, আর হতে না পারার সংশয় বিষয়ে সচেতনও হতে পারেন না সকলে। ক্রিকেট-সিনেমা-রাজনীতি-সাহিত্য নিয়ে নিয়মমাফিক আড্ডা সেরে অমল-কমলদের দলবল চলে যায়। তার কিছুক্ষণ পর ইন্দ্রজিৎ চকিতে লেখককে বলে ফেলে —

> "আচ্ছা তোর কখনো মনে হয় না?... এই যে চলছে — তার কোনো মানে নেই? একটা বিরাট চাকা কেবল ঘুরছে আর ঘুরছে। আর আমরা তার সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে ঘুরছি আর ঘুরছি—।"[৬]
>
> আর ঠিক তখনই 'অর্থহীন' আধুনিক কবিতার অভিঘাত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় 'অর্থহীন' আধুনিক জীবনের মাঝখানে। — "এক-দুই-তিন। এক- দুই -তিন- দুই-এক-দুই-তিন।"

।।৩।।

অভিনয় নির্দেশনায় নাট্যকার বলে দেন পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী অমল-বিমল-কমলদের দল কোনো রকম রূপসজ্জা ছাড়া কেবল ভাবভঙ্গিতে চাপল্য এনেই হয়ে যেতে পারবে কখনো স্কুলের ছাত্র, কখনো বা কলেজপড়ুয়া, কিংবা একটু গাম্ভীর্যের ভঙ্গি ব্যবহার করলেই হয়ে যাবে শিক্ষক। কলেজের আড্ডা থেকে বড়বাবুর দপ্তর, বর-কনে থেকে কর্তা-গিন্নি — জীবনের সমস্ত পর্যায়ে তারা সকলেই পা ফেলে মেপে, সাবধানে, নিয়ম-

মতে। কৈশোর থেকে তারুণ্য হয়ে প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত এই যে অতি-নিশ্চিত যথাবিধানের আবর্তন, তা যে উত্তরণহীন পৌনঃপুনিকতাকে বহন করে অন্তর্মনে, তারই ফলশ্রুতিতে অমল-বিমলেরা আসলে থেকে যায় বয়সচিহ্নহীন, অ-বিশিষ্ট কিছু মধ্যবয়সী পুরুষ।

"ঘর থেকে স্কুল। স্কুল থেকে কলেজ। কলেজ থেকে দুনিয়া। ...
ঘুরছে আর ঘুরছে আর ঘুরছে। এক-দুই-তিন-দুই-এক।"[৭]

কিন্তু এই নিয়মের জালকে ছিঁড়ে ফেলতে পারে কে? 'এবং ইন্দ্রজিৎ'-এর সহযাত্রী হয়ে প্রশ্নাতুর আমরাও এবারে খুঁজতে চেষ্টা করি এর উত্তর ।

প্রথম সম্ভাব্য উত্তর প্রেম, — বিবাহ এবং সংসার নামক চিরকেলে প্রতিষ্ঠানটির অন্তর্ভুক্তি। এক কবিতা থেকে আরেক কবিতার মধ্যে গড়িয়ে যেতে যেতে আমাদের 'লেখক'টির কলম একসময়ে পৌঁছেছিল সেই জনপ্রিয় স্যাটেয়ারটিতে —

"কেন তুমি ঘড়ি ধরে অফিসেতে ছুটবে?
কেন তুমি বঁটি দিয়ে তরকারি কুটবে?
তেল দিতে কেন বাছো অন্যের চরকাই?
সব্বাই করে বলে, সব্বাই করে তাই!"[৮]

এই শুনে, মাসিমা, দুনিয়ার যাবতীয় মা-মাসি-খুড়ি-পিসির হয়ে স্নেহাস্পদকে খেতে ডাকার একমাত্র গুরুদায়িত্বটি যাঁকে পালন করতে হয় দিবারাত্র, তিনি, ঠিক আদর্শ 'মাসিমা'র মতোই সমাধান বাৎলান —

"বিয়ে থা' করলে এসব খ্যাপামি ঘুচে যেত দুদিনে।"[৯]

তাহলে কি সত্যিই এই ঘূর্ণিপাকের আজব দুনিয়ার সমাধান সূত্রটি লুকিয়ে আছে প্রেমে? মানুষ-মানুষীর ভালোবাসাই কি তাহলে সেই আলিবাবার বন্ধ দুয়ারের চাবিকাঠি, যা খুঁজে পেলে কেটে যাবে সব কলুষ, ধুয়ে যাবে নিত্যদিনের সমস্ত মালিন্য? একটি নারীর আবির্ভাব পারস্য-গালিচায় করে পরিচিত ম্লান জগৎকে দিতে পারবে অচিন সাগরপারের রূপকথা-দেশে উড়ান? যেখানে কবিরা সহজেই বলবেন—

"অনেক কমলা রঙের রোদ ছিলো,
অনেক কাকাতুয়া পায়রা ছিলো,
মেহগনির ছায়াঘন পল্লব ছিলো অনেক;
... আর তুমি ছিলে;"[১০]

এমনই আনন্দছন্দে জীবনের সমস্ত তালভঙ্গের কর্কশতাকে একদা ডুবিয়ে দিতে চেয়েছিল ইন্দ্রজিৎ, আর আমাদের 'লেখক' —

"কী হবে মিথ্যা সূক্ষ্ম হিসাবে পুরোনো সংখ্যা গুণে?
কী হবে স্বপ্নে ভবিষ্যতের তন্তু-আঁচল বুনে?
রাত্রিদিনের ছন্দে কখনো যাবে না তো কেটে তাল
বৃথা কেন তবে মনের দেউলে ভরে তোলো জঞ্জাল?
হৃৎস্পন্দন সময়ের তালে বেঁধে নিতে যদি পারো

পরোয়া থাকে না কারো।”[১১]

কিন্তু জীবনের হিসেবের কড়ি তবু খেয়ে যায় বাঘে। বিবাহ আর সংসার নামক ‘নিশ্চিন্ত নিরাপদ’ সামাজিক ঘেরাটোপে ঢুকে পড়ে ‘মাসিমা’দের স্বস্তি দিতে পারে না ইন্দ্রজিৎ, মানসীরা। বিয়ে হয়তো তারা করবে, করবে না হয়তো, হয়তো করে সুখী হবে, হবে না হয়তো! —

“আমার সন্ধান ক্লান্ত। এখনো গোপন
ধরণীর শেষ বিশ্লেষণ।
আমার প্রচেষ্টা ক্লান্ত। এখনো নিঃসাড়
জগতের জড়তার ভার।”[১২]

তাহলে এই জড়তার ক্লান্তি ভাঙবে কিসে? নিঃসংবেদী ঘুমে, নাকি প্রচণ্ড অট্টহাসিতে? হিজবিজবিজেরা জানে ‘কিংকর্তব্যবিমূঢ়’ নামে ডাকা হলেই জীবনের বিরাট অট্টালিকা হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ে যেতে পারে যেকোনো মুহূর্তে। কিন্তু না, সুধী দর্শক হাসবেন না। ‘লেখক’ মিনতি করে বলতে থাকে — সে যে কি প্রচণ্ড চেষ্টা করছে একটা সত্যিকারের নাটক লেখার! সেই অমল-বিমল-কমল এবং ইন্দ্রজিৎ এবং মানসী এবং আরও আরও অনেকের নাটকের শেষ অঙ্ক পর্যন্ত ধৈর্য ধরে দেখতে হবে আমাদের, আর খুঁজতে হবে সমাধানের অন্য একটা দিশা।

“লেখক : আমরা — কেন?
মাসীমা : তোরা কেন? তার মানে?
লেখক : আমরা আছি কেন?”[১৩]

আছি কেন? এই প্রশ্নের মুখোমুখি বারবার পাঠককে, দর্শককে দাঁড় করিয়েছে বাদল সরকারের নাটক। আশার অঙ্কুর শোচনীয় শুষ্কতায় মরে গেলে পড়ে থাকে ভবিষ্যৎহীন বর্তমান,— একটা আয়াসশূন্য, আশঙ্কামুক্ত বর্তমান — গতকালের ছাঁচে-ঢালা অসংখ্য সুপরিনির্দিষ্ট, সীমাবদ্ধ আগামীর প্রতিমূর্তি বর্তমান। অন্য ভাষায় তারই নাম ‘মরে যাওয়া’। “মানুষের বাঁচাতে গেলে বিশ্বাস দরকার” — বলেছিল ইন্দ্রজিৎ। বিশ্বাসের আশ্রয়ভূমি থেকে চ্যুত হয়ে হয়ে ইন্দ্রজিৎদের জগৎ এসে পৌঁছয় এমন উৎকেন্দ্রিকতায়, যেখানে ঈশ্বর, অদৃষ্ট, ভালোবাসা, পৃথিবী, এমনকি বিপ্লবের স্বপ্নও হয়ে গেছে ঘষা কাঁচের মত অস্বচ্ছ। এভাবেই নিশ্চিন্তে ‘মরে’ গিয়ে বেঁচেছে অমল, বিমল, কমলের দল। বাদল সরকারের আরেকটি অস্তিবাদী বিমূর্ত নাটকের সংলাপেও পাই মুমুক্ষার অপরপিঠে থাকা এই মুমূর্ষার সন্ধান —

“শরদিন্দু : ... বাঁচতে কে না চায় ?
সীতানাথ : অনেকেই চায় না ।
শরদিন্দু : কে বললো চায় না ?
সীতানাথ : কে বললো চায় ?

শরদিন্দু : যদি না চায় তো বেঁচে আছে কেন? আত্মহত্যা করছে না কেন — তোমার মতো ?

সীতানাথ : বেঁচে নেই। আত্মহত্যা করছে। হয়তো আমার মতো নয় ।

শরদিন্দু : তার মানে ?

সীতানাথ : তার মানে তারা গলায় ফাঁসি দিয়ে ঝুলছে না। কাপড়ে কেরোসিন ঢেলে জ্বলছে না। কোমরে পাথর বেঁধে ডুবছে না। তারা নিঃশব্দে নীরবে বাঁচা বন্ধ করে বসে আছে।”[১৪]

ইন্দ্রজিৎ আমাদের মনে করিয়ে দেয় সিসিফাসের গল্প। কোরিন্থের রাজা সিসিফাস দেবরাজ জুপিটারের অভিশাপে গড়ানে পাহাড়ের গা বেয়ে তুলছে আর তুলছে প্রকাণ্ড ভারি পাথরের চাঁই। পুরাণের নিরবধি কাল ব্যেপে চলছে, চলবে সিদ্ধিহীন শ্রমের এই আবর্তন। অস্তিত্বের আকাশ এমন বিপুল আঁধিতে ঢেকে গেলে চকিতে মনে হতে পারে সমাধান বুঝি কেবল মৃত্যু, জীবনের পূর্ণচ্ছেদ। মানুষ হয় বাঁচবে, নয় মরবে — এই ‘খাঁটি’ যুক্তিতে যেমন করে মরেছিল সীতানাথ। কিংবা প্রতিবেশ আর পরিজনের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধসূত্র খুঁজতে গিয়ে যেভাবে অর্থহীনতায় বিভ্রান্ত হয়েছিল কাম্যুর নায়কেরা। “The Myth of Sisyphus” -প্রবন্ধমালায় পাই মঁসিয়ে ম্যোরসদের সেই চিন্তাজগৎটির পরিচয় —

> “A world that can be explained even with bad reasons is a familiar world. But, on the other hand, in a universe suddenly divested of illusions and lights, man feels an alien, a stranger. His exile is without remedy since he is deprived of the memory of a lost home or the hope of a promised land. This divorce between man and his life, the actor and his setting, is properly the feeling of absurdity. All healthy men having thought of their own suicide, it can be seen, without further explanation, that there is a direct connection between this feeling and the longing for death.
>
> The subject of this essay is precisely this relationship between the absurd and suicide, the exact degree to which suicide is a solution to the absurd. The principle can be established that for a man who does not cheat, what he believes to be true must determine his action. Belief in the absurdity of

> existence must then dictate his conduct. It is legitimate to wonder, clearly and without false pathos, whether a conclusion of this importance requires forsaking as rapidly as possible an incomprehensible condition. I am speaking, of course, of men inclined to be in harmony with themselves."[১৫]

কিন্তু শরদিন্দু কিংবা ইন্দ্রজিৎকে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে খুঁজতে হয় নি জীবনের যৌক্তিকতার শেষ উত্তর। বরং 'সুমহান' মানবসভ্যতার ইতিহাস খুঁড়ে পাওয়া সমস্ত ক্ষয় আর ক্ষত, শোষণ আর নিশংসতার 'বাকি ইতিহাস'-কে বুকের ভিতর জমা রেখে সেই দাহনের আগুনে জীবনের অর্থকে খুঁজবার প্রতিশ্রুতি নিয়েছিল শরদিন্দু।

এই পর্যায়ে এসে এক-দুই-তিনের সমস্ত সাংখ্য ঘূর্ণির সমাধান যেন অবশেষে মিলল স-চেতনার আর সু-চেতনার মোড়ে।

"তবু বাঁচতে হবে। তবু চলতে হবে। আমাদের তীর্থ নেই, শুধু যাত্রা আছে। তীর্থযাত্রা।"[১৬] — এই প্রতীতি-গভীর উচ্চারণের মধ্যেই রয়ে গেল যাত্রিকের মানুষী-সত্তার শেষ অভিজ্ঞান। এতক্ষণে, সমাধানের কূলে এসে নোঙর ফেলে ইন্দ্রজিৎ-লেখকদের দ্বিধার আর দ্বন্দ্বের দোলাচলে অশ্রান্ত ব্যাকুল জীবনতরণী। ইন্দ্রজিতেরা শিরোধার্য করে নেয় কেবল পাড়ি দেওয়ার দায়, পথ-চলার মহাদীক্ষা —

> "তবে তাই হোক।
> বৃথা প্রশ্ন চাপা থাক, ভুলে যাই শোক।
> জীবনের প্রথম প্রভাতে
> বিনা দ্বন্দ্বে বিনা প্রশ্নে উন্মুক্ত দুহাতে
> তীর্থপথ মহাদীক্ষা করেছি গ্রহণ।
> দিবসান্তে আজ যেন মন
> নাহি ভোলে সেই দীক্ষা । তীর্থ নয়,
> তীর্থপথ আমাদের—মনে যেন রয়।"[১৭]

উল্লেখপঞ্জি :

১) সরকার, বাদল, দ্বাদশ মুদ্রণ : বৈশাখ ১৪২২, এপ্রিল ২০১৫, 'এবং ইন্দ্রজিৎ', কলকাতা - ৭০০০৭৩, কথাশিল্প, পৃষ্ঠা - ৭৯

২) সরকার, বাদল, দ্বাদশ মুদ্রণ : বৈশাখ ১৪২২, এপ্রিল ২০১৫, 'এবং ইন্দ্রজিৎ', কলকাতা - ৭০০০৭৩, কথাশিল্প, পৃষ্ঠা - ৬

৩) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সংস্করণ : পৌষ ১৩৭৬ পুনর্মুদ্রণ : মাঘ ১৪২৩, 'মানসসুন্দরী', 'সোনার তরী', কলকাতা - ৭০০০১৭, বিশ্বভারতী , পৃষ্ঠা - ৮৩

৪) সরকার, বাদল, দ্বাদশ মুদ্রণ : বৈশাখ ১৪২২, এপ্রিল ২০১৫, ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’, কলকাতা - ৭০০০৭৩, কথাশিল্প, পৃষ্ঠা - ১৪

৫) সরকার, বাদল, প্রথম মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০২৩, ‘পুরোনো কাসুন্দি’, তৃতীয় পর্যায়, কলকাতা - ৭০০০০৯, অনুষ্টুপ, পৃষ্ঠা - ২০৪

৬) সরকার, বাদল, দ্বাদশ মুদ্রণ : বৈশাখ ১৪২২, এপ্রিল ২০১৫, ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’, কলকাতা - ৭০০০৭৩, কথাশিল্প, পৃষ্ঠা - ২১

৭) সরকার, বাদল, দ্বাদশ মুদ্রণ : বৈশাখ ১৪২২, এপ্রিল ২০১৫, ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’, কলকাতা - ৭০০০৭৩, কথাশিল্প, পৃষ্ঠা - ২৪

৮) সরকার, বাদল, দ্বাদশ মুদ্রণ : বৈশাখ ১৪২২, এপ্রিল ২০১৫, ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’, কলকাতা - ৭০০০৭৩, কথাশিল্প, পৃষ্ঠা - ৪৭

৯) সরকার, বাদল, দ্বাদশ মুদ্রণ : বৈশাখ ১৪২২, এপ্রিল ২০১৫, ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’, কলকাতা - ৭০০০৭৩, কথাশিল্প, পৃষ্ঠা - ৪৭

১০) দাশ, জীবনানন্দ, দশম মুদ্রণ : শ্রাবণ ১৪১০, অগাস্ট ২০০৩, ‘নগ্ন নির্জন হাত’, ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’, কলকাতা - ৭০০০৭৩, ভারবি, পৃষ্ঠা - ৬৮

১১) সরকার, বাদল, দ্বাদশ মুদ্রণ : বৈশাখ ১৪২২, এপ্রিল ২০১৫, ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’, কলকাতা - ৭০০০৭৩, কথাশিল্প, পৃষ্ঠা - ৩৩

১২) সরকার, বাদল, দ্বাদশ মুদ্রণ : বৈশাখ ১৪২২, এপ্রিল ২০১৫, ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’, কলকাতা - ৭০০০৭৩, কথাশিল্প, পৃষ্ঠা - ৬১-৬২

১৩) সরকার, বাদল, দ্বাদশ মুদ্রণ : বৈশাখ ১৪২২, এপ্রিল ২০১৫, ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’, কলকাতা - ৭০০০৭৩, কথাশিল্প, পৃষ্ঠা - ৪৬

১৪) সরকার, বাদল, দ্বিতীয় মুদ্রণ : আশ্বিন ১৪০৯, ‘বাকি ইতিহাস’, ‘নাটক সমগ্র’, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা - ৭০০০৭৩, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা - ৮৮-৮৯

১৫) Camus, Albert, Translation from French : Justin O'Brien, First Vintage International Edition : March 1991, ‘Absurdity and Suicide’, ‘The Myth of Sisyphus and Other Essays’, New York, Vintage International, page - 2-3

১৬) সরকার, বাদল, দ্বাদশ মুদ্রণ : বৈশাখ ১৪২২, এপ্রিল ২০১৫, ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’, কলকাতা - ৭০০০৭৩, কথাশিল্প, পৃষ্ঠা - ৮০

১৭) সরকার, বাদল, দ্বাদশ মুদ্রণ : বৈশাখ ১৪২২, এপ্রিল ২০১৫, ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’, কলকাতা - ৭০০০৭৩, কথাশিল্প, পৃষ্ঠা – ৮১

"মহাশ্বেতা দেবীর হারুণ সালেমের মাসি : বিশ্বমাতৃত্বের মহীয়সী রূপ"

আশিস কুমার সাহু
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সাঁকরাইল অনিল বিশ্বাস স্মৃতি মহাবিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসার: বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে স্বতন্ত্রভাবে বিরাজিত ব্রাত্য মানুষের জননী মহাশ্বেতা দেবী। তাঁর গল্প উপন্যাসে ব্রাত্য মানুষের পাশাপাশি সমানভাবে জায়গা করে নিয়েছে সমাজের অবহেলিত নারী। তিনি তাঁর গল্প উপন্যাসে নারীকে চিত্রিত করেছেন বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে। বিশেষ করে যেখানে নারী তার প্রাপ্য অধিকার থেকে, সম্মান থেকে, মর্যাদা থেকে বঞ্চিত সেখানে তাঁর কলম সমস্ত শক্তি নিয়ে সেই নারীর হয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে। তার হয়ে লড়াই করেছে বিপক্ষ শক্রর বিরুদ্ধে। তাঁর বিভিন্ন গল্পে এক ভিন্ন মাত্রায় চিত্রিত হয়েছে মাতৃত্বের চিরন্তনী রূপ। মাতৃত্বের মহীয়সী রূপের ছবি আমরা দেখতে পাই তাঁর 'স্তনদায়িনী', 'সাঁঝ সকালের মা, 'হারুণ সালেমের মাসি' প্রভৃতি গল্পে। আমার আলোচ্য 'হারুণ সালেমের মাসি' গল্পে আমি আলোচনা করে দেখানোর চেষ্টা করেছি গর্ভে ধারণ না করেও গৌরবী যেভাবে জাত-পাতের ঊর্ধ্বে উঠে ভিন্ন ধর্মের এক অসহায় সন্তানকে আঁকড়ে ধরে বিশ্বজনীন মাতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে।

সূচক শব্দ: মহাশ্বেতা দেবী, হারুণ সালেমের মাসি, গৌরবী, হারা, যশি, মাতৃত্ব, বিশ্বমাতৃত্ব, বাৎসল্যসুখ।

প্রতিপাদ্য বিষয়: বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে স্বতন্ত্রভাবে বিরাজিত ব্রাত্য মানুষের জননী মহাশ্বেতা দেবী। তাঁর গল্প উপন্যাসে ব্রাত্য মানুষের পাশাপাশি সমানভাবে জায়গা করে নিয়েছে সমাজের অবহেলিত নারী। তিনি তাঁর গল্প উপন্যাসে নারীকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে চিত্রিত করেছেন। বিশেষ করে যেখানে নারী তার প্রাপ্য অধিকার থেকে, সম্মান থেকে মর্যাদা থেকে বঞ্চিত সেখানে তাঁর কলম সমস্ত শক্তি নিয়ে সেই নারীর পাশে দাঁড়িয়েছে। তার হয়ে লড়াই করেছে বিপক্ষ শক্রর বিরুদ্ধে। তাঁর বিভিন্ন গল্পে এক ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় চিত্রিত হয়েছে মাতৃত্বের চিরন্তনী রূপ। মাতৃত্বের মহীয়সী রূপের ছবি আমরা দেখতে পাই তাঁর 'স্তনদায়িনী', 'সাঁঝ সকালের মা', 'হারুণ সালেমের মাসি' প্রভৃতি গল্পে। আলোচ্য 'হারুণ সালেমের মাসি' গল্পের গৌরবী হয়ে উঠেছে বিশ্বজননী স্বরূপা। নিজস্ব সমস্ত জাগতিক সুখকে বিসর্জন দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে শুধুমাত্র বাৎসল্যসুখের টানে মাতৃ-পিতৃহারা মুসলমান শিশু হারাকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে ভিটে ছেড়ে পাড়ি দিয়েছে শহর কলকাতায়। গৌরবী জানে শহরের ফুটপাতে

মানুষের ভিড়ে হারিয়ে গেলে তাদের পরিচিতিটাই পালটে যাবে। কেউ জানতে চাইবে না ওদের ফুটপাতের জীবনের বাইরে অন্য কোন পরিচয়ের ইতিহাস।

'হারুণ সালেমের মাসি' গল্পটি বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই, গল্পের প্রধান চরিত্র স্বামীহারা গৌরবী এক অজ গ্রামের একটি ভাঙাচোরা কুঁড়েঘরে একাই থাকে। মেয়ে বিবাহিতা। ছেলে নিবারণ প্রাইভেট বাসের টিকিটবাবু। ছেলে তাকে দেখে না। সে তার বউকে নিয়ে অন্যত্র থাকে। জন্ম থেকেই গৌরবীর একটা পা খোঁড়া। সে সেই খোঁড়া পায়ে শাক পাতা গুগলি প্রভৃতি তুলে যশির কাছে বিক্রি করে কোনোরকম পেট চালায়। অবশ্য এই শাক পাতা গুগলি সংগ্রহের কাজে তার নিত্য সঙ্গিনী হল প্রতিবেশী হারার মা। এমনকি শাক পাতা গুগলি সংগ্রহের ক্ষেত্রে গৌরবীকে নির্ভর করতে হয় হারার মায়ের উপর। যশির ভালো নাম যশোদা সে গৌরবীদের কাছ থেকে এই শাক পাতা গুগলি কিনে নেয়।

গল্পের প্রথমে দেখা যায় রুগ্ন সাতবছরের ছোট্ট হারা এসে তোতলানো সুরে গৌরবীকে বলে- "মা ললে না মাসি! ডেকে ডেকে দেখলাম মা রা দেয় না।"[১] হারার কথা শুনে গৌরবী ছুটে যায় হারার বাড়ি। গিয়ে দেখে হারার মা আর বেঁচে নাই। ছোট্ট হারা বুঝে ওঠার আগেই তার জীবনে নেমে আসে গভীর কালো অন্ধকার। হারার বাবা মারা গেছে আগেই। হারা জাতে মুসলমান। তাই দিনের শেষে হারা তার মায়ের কবরে মাটি দেয়। পিতৃ-মাতৃহারা হারার দায়িত্ব তার কাকা নিতে অস্বীকার করে। হারা সম্পূর্ণ অনাথ হয়ে পড়ে। এই জগতে হারার আর কেউ নেই। হারা শুধু জানে গৌরবীকে। তাই হারা গৌরবীর কাছে আসে। গৌরবী হারাকে তাড়িয়ে দিতে পারল না। মায়ের স্নেহকোলে জায়গা দিল হারাকে। রাত হলে হারাকে কিছুটা খুদ দিয়ে সে একগাল খুদ খেয়ে চাটাই পেতে দুজনে শুয়ে পড়ল। চাটাইতে শুয়ে গৌরবীর চোখে ঘুম আসে না। হারাকে আশ্রয় দিয়ে গৌরবী সাত-পাঁচ কত কিছু ভাবতে থাকে। সে নিজেই পরের জায়গায় পরের দয়ায় বাস করে। নিজের পেটের ভাত ঠিকমতো জোটে না। তার উপর হারাকে সে আশ্রয় দিয়ে নেহাত ফ্যাসাদেই পড়ে গেল। এই সকল নানান ভাবনা ভাবতে ভাবতে চোখে ঘুম আসে। ঘুমের মধ্যে সে স্বপ্নে দেখতে পায়, হারার মা তাকে হাত ধরে তার স্বপ্নরাজ্যে নিয়ে যাচ্ছে। যেখানে অনেক অনেক থানকুনি আর দূর্বা, মাদার গাছের তলায় অজস্র ঢেঁকি শাক। সকালে ঘুম ভাঙতেই নানান দুশ্চিন্তা ভিড় করে গৌরবীর মনে। সে হারাকে পাঠায় যশির কাছে। যশির কাছে হারা যেন গিয়ে বলে যে, যশী যেন একবার গৌরবীর সঙ্গে দেখা করে। আর আসার সময় হারা যেন থানকুনি পাতা তুলে আনে খালপাড় থেকে। গৌরবী হারাকে এও শিখিয়ে দেয় যে, রাস্তায় কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে রাতে কোথায় ঘুমিয়েছিলি? উত্তরে যেন হারা বলে উঠোনে। গৌরবী খুব যত্ন করে হাঁড়ির কোনায় পড়ে থাকা মিয়ানো চালভাজা একটা পোটলায় দেয় রাস্তায় খেয়ে জল খাওয়ার জন্য।

হারা চলে যাওয়ার পর সাত-পাঁচ ভেবে হারার মায়ের উপর গৌরবীর খুব রাগ হল। নিজে নিজেই বলতে লাগল– “মাগীর সাতকুলে কেউ নেই, আমার ভরসায় ছেলে রেখে চোখ বুজল। এখন জাত বা কেমন করে থাকে ধর্মের বা কি হয়!”[২] কিন্তু ফিরে এসে হারা যখন গৌরবীর হাতে মেটে আলুটা দিয়ে রান্না করার কথা বলল তখন গৌরবীর মুখে আনন্দের হাসি। কোথায় পেলি জিজ্ঞেস করতেই হারা বলে–“ঘরে ছিল। মা বলেছিল...’ হারা কর গুণে গুণে বলল, ‘মাসিকে দিস হারা? আর বলছিল....”[৩] গৌরবী গভীর কৌতুহলের সঙ্গে বলল- “কী?”[৪] হারা উত্তরে বলল- “মাসির পা ধরে পড়ে থাকিস।”[৫]

হারার কথা শুনে ‘গৌরবীর শুকনো বুকে যেন কিসের ঢেউ লাগল।’ হারার কথা তার খুব ভালো লাগল। এ জগতে যে তারও প্রয়োজন আছে এ কথা ভেবে হারাকে বুকে টেনে নিয়ে চোখ মুছে বলল-“ দুঃখী আরেক দুঃখীর মন বুঝে। তাই বলেছিল। নে হারা, মেলা কর! পুকুরে যা।”[৬]

গৌরবী হারাকে মেনে নিলেও গৌরবীর সমাজ তা মানবে কেন। এ বিষয়ে সে যশির সঙ্গে কথা বলে। তার এই বিপদের দিনে সে যশিকে কাছে পেতে চায়। তাই সে যশিকে বলে, হারার মা মারা যাওয়ার পর থেকে সে এখানেই ঘোরাফেরা করে আর দুটো ভাত দিলে খায় আর উঠোনে ঘুমায়। গৌরবীর কথা শুনে যশি গৌরবীকে একটি সহজ উপায় বাতলে দেয়, “শহরে ছেড়ে দিতে পারি। ভিক্কে করে খাবে।”[৭] যশির প্রস্তাবকে গৌরবী ঠিক মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। সে যশিকে বলে- “ওই ছেলে!”[৮] গৌরবীর কথা শুনে যশির খুব রাগ হয় গৌরবীর উপর। পরিষ্কারভাবে জানায়- “দয়া দেকালে, দু-গাল মুড়ি দিলে তা বুঝি। তোমার নিজের পেট চলে না তুমি যাও অন্যরে ভালো করতে। আমি বলি শোন! ওরে শহরে ছেড়ে দে আসি। বাঁচে মরে ও বুঝুক গা। শহরে কী ছেলে বাঁচে না গো? বাজারে আমের আঁটি চুষে, পচা কলাটা বেলটা খেয়ে, ফুটপাতরে ঘুমিয়ে অমন লাখোটা ছেলে বড়ো হচ্ছে না।”[৯] গৌরবী যশির এই প্রাস্তাবকে সমর্থন না করে বরং সে যশির কাছে বিকল্প পথ হিসাবে ছেলের কাছে যাওয়ার কথা জানালে যশি সোজাসাপ্টা উত্তরে বলে- “মা বলে যদি ভাবত তা'লে কি তোমার এই অবস্থা হয়? তা'লে! তা'লে কী, তা নিজের কপালকে বল গা।”[১০] এই কথা বলে উঠে যাওয়ার সময় গৌরবীকে আবার মনে করিয়ে বলে- “খাওয়া- দাওয়া ছোঁয়া নেপা ছিষ্টি কর না মাসি। তোমার বাগ্যতা করি। মুকুন্দবাবুকে তুমি চেন না, আমরা চিনি। দেশের মানুষ, ঘরের মানুষ বলে ছেড়ে দেবে ও? মুকুন্দবাবু এই বাড়িতে মনসাঘট পুজো করল ভাদ্দরে, পাঁঠা কাটল, আমরা সবাই খেয়ে গেলাম। তিনি শুনলে খুব বেজার হবে গো।”[১১] যশির মুখে এই কথা শুনে গৌরবী মনে মনে খুবই ভয় পেল। এই কথা কাউকে না বলার জন্য যশিকে সে কাতর মিনতি করে। শুধু অনুরোধ নয়, যশির মন পেতে হারার আনা সাধের মেটে আলুটাও তাকে নিয়ে যেতে বলল গৌরবী। গৌরবীর মধ্যে একটা দুশ্চিন্তা কাজ করতে থাকে। সে কী

করবে? হারাকে তাড়িয়ে দেবে? তাড়িয়ে দিলে হারা কোথায় যাবে? এই সকল নানান ভাবনা মাথায় ঘুরতে থাকে গৌরবীর। এদিকে হারা গৌরবীর জন্য মেটে আলু জোগাড় করা কেরাসিন এনে দেওয়া এ সকল টুকিটাকি কাজের ফাঁকে গৌরবীর হৃদয়ে একটু একটু করে জায়গা করে নিয়েছে।

এই সব কিছুর মাঝে গৌরবী ভাবে যে নিবারণের কাছে গেলে নিশ্চয়ই হারার একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বর্তমানে ছেলে নিবারণ বাসে টিকিট কেটে ভালোই রোজগার করে। গৌরবী ভাবে ছেলের কাছে গিয়ে সব বললে নিশ্চয় মায়ের বিপদের সময় ছেলে ফিরিয়ে দেবে না। তার কাছে যদি আশ্রয় পাওয়া যায় সমস্ত দুশ্চিন্তার অবসান ঘটতে পারে। এই চিন্তা করে গৌরবী যায় তার ছেলের কাছে। গৌরবীকে চা খেতে দেবে বলে ছেলেকে চা পাতা কিনতে পাঠিয়ে বউমা পেটকাপড় থেকে দুটো টাকা আর একখানা কাপড় বের করে শাশুড়ীর হাতে দেয়। ছেলের ঘরে রেডিও বাজছে শুনে গৌরবী বউমার কাছে রেডিওর দাম শুনে বউমার কাছে একশ টাকা চেয়ে আবদার করে বসে। সে বৌমাকে বলে যে, একশ টাকা পেলে একটা গোরু কিনবে। গোরুর গোবর দিয়ে ঘুঁটে আর দুধ বেচে তাদের দুই প্রাণীর বেশ চলে যাবে। বউমা দুই প্রাণীর বিষয়ে জানতে চাইলে গৌরবী বলে- "ঐ একটা গরিব ছেলে বউ! মাসি মাসি বলে।"[১২]

মায়ের মুখে এই সব কথা শুনে প্রচুর ক্ষুব্ধ হয় নিবারণ। সে মা'কে বলে-"ওঃ মাসি-বোনপো দুধ খাবে, আমি গোরু কিনে দেব। যাও যাও, মেলা বোকো না"[১৩] গৌরবী নিবারণের কাছে কাঁদতে কাঁদতে হারার বিষয়ে সবকিছু বলে। মায়ের কাছে হারার বিষয়ে সব শুনে নিবারণের মুখ যেন অন্ধকার হয়ে গেল। সে মা'কে বলল- "তুমি নইলে এমন শত্রু আর কে হবে?"[১৪] ছেলের মুখে এই কথা শুনে গৌরবী প্রথমে ছেলের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়লেও পরে সে তার কাছে আশ্রয় চেয়ে প্রার্থনা করে। ছেলে প্রথমে অস্বীকার করলেও পরে মায়ের উপর শর্ত চাপিয়ে দিয়ে বলে- "ও পাপ বিদেয় কর। তারপর ভেবে দেখব। খবর দিও, খবর দিও জানলে?"[১৫] নিবারণ হারার বিষয়ে গৌরবীকে এও বলে– "বিদেয় কর। এখন আমাদের দেশে গাঁয়ে যুদ্ধ হচ্ছে। অজো গাঁয়ে থাক, জানতে পার না কিছু। রোজ কত লোক এসে এপারে উঠছে। তাদের মধ্যে ছোঁড়াকে ছেড়ে দাও না কেন? বল তো রেখে আসি। কাল পরশু।"[১৬] নিবারণের কথা শুনে গৌরবী যখন হারার বেঁচে থাকা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করে নিবারণ তখন পরিষ্কার জানিয়ে দেয়- "মরবে মরবে। রোজ দিন হেথা- হোথা মানুষ মরছে না! ওর কপালে থাকে মরবে।"[১৭] এই সকল কথাবার্তার মাঝে ছেলের বাড়িতে গৌরবীর থাকাকে কেন্দ্র করে নিবারণ ও তার বউ এর মধ্যে ঝগড়া বেধে যায়। এই ঝগড়ার মাঝে ভয়ে গৌরবী বেরিয়ে এসে বাস রাস্তায় বসে থাকা হারাকে সঙ্গে করে ঘরে ফিরে। আসার পথে হারা দোকান থেকে লম্ফ জ্বালার কেরোসিন নিয়ে আসে। হারার উপর গৌরবীর মনে মনে খুব রাগ হলেও কেরোসিন দিয়ে গৌরবীকে হারার যে সাহায্য

তার জন্য গৌরবী হারাকে রাগতে পারে না, বরং সে ভাবে তার এই দুঃসময়ে এইটুকু কেরোসিন দিয়েও কে ওকে সাহায্য করে?

রাতে ঘুমানোর সময় গৌরবী ভাবতে থাকে সে যদি হারাকে তাড়াতে পারে তাহলে হয়তো ছেলের বাড়িতে একটু আশ্রয় পাবে। কিন্তু গৌরবীর অন্তরাত্মা যেন একথায় সায় দেয়নি। ভেতর থেকে যেন কেউ তাকে একাজে বাধা দিচ্ছে। কিছু দিন বাদে হারার কথা শুনে মুকুন্দ এসে পরিষ্কার গৌরবীকে জানিয়ে দেয়-"...ও ছোঁড়াকে যদি বিদায় না কর আমার ভিটে ছেড়ে দাও।"[১৮] মুকুন্দের কথা শুনে গৌরবী কাতর কণ্ঠে বলে–"ছেড়ে দেব? অ বাপ মুকুন্দ ! ছেড়ে আমি কোথা যাব?"[১৯] গৌরবীর কাতর অনুরোধকে উপেক্ষা করে জুতো মসমসিয়ে মুকুন্দ চলে যায়। গৌরবী নিজেকে খুব অসহায় বোধ করে। সামনে হারাকে দেখতে পেয়ে মুহুর্তেই পাগলের মতো তেড়ে গিয়ে বলে- "মর মর! তোর জন্য আমার এত দুর্ভোগ। তোর জন্য আমাকে সবাই কুকুরতাড়া করে। মর তুই। যেখানে ইচ্ছে বিদায় হ।"[২০] কিছু বুঝে উঠার আগেই গৌরবীর এই আচরণে ভয় পেয়ে হারা পালিয়ে যায়। পালিয়ে গিয়ে নিজের ঘরে বসে বসে মা-এর জন্য কাঁদতে লাগে। কেঁদে কেঁদে সে ঘুমিয়ে পড়ে। সন্ধ্যের সময় যখন তার ঘুম ভাঙে তখন সে অনুভব করে যেন কেউ ওর গায়ে হাত দিয়ে ঠেলছে। ছোট্ট হারার মনে হয় তার মা, পরক্ষণেই সে ভাবে, তার মা তো নেই। তার মা তো মরে গেছে। তবে কে তার গায়ে হাত দিয়ে ক্রমাগত ঠেলে যাচ্ছে। চোখ মেলে দেখে যে মা নয় তার মাসি গৌরবী। 'মাসি গো' বলে 'হারা ভয়ে কেঁদে উঠল।' গৌরবী হারাকে নিয়ে শহরে যাওয়ার কথা বললে হারা যখন বলে–"শওরে যে তুমি যাও না, তুমি হাঁটতে পার না যে?"[২১] উত্তরে গৌরবী জানায়–"পারব হারা। শোন, আমরা শওরে যাব। সেখানে কেউ কারো কোন কথা জানতে চায় না। কেউ কারে চিনে না।"[২২] হারা যখন শহরে গিয়ে থাকা খাওয়া নিয়ে প্রশ্ন করে গৌরবী উত্তরে জানায়– "হ্যাঁ রে। পথে পথে ভিক্ষা করব, পথে বসে রাঁধব, ফুটে শোব, কাপড়নেতা গেরিমাটিতে রঙ করলে ময়লা হয় না। যশির কাছে আমি সব জেনে নিয়েছি।"[২৩] গল্পের শেষে দেখা যায় গৌরবী আর হারা গ্রাম ছেড়ে চলে যায় শহরে। লেখিকার ভাষায়– "শহরে গৌরবী আর হারার সমাজ অনেক বড়। সমুদ্রের মতো। সেখানে একবার মিশে যেতে পারলে আর কোন ভয় থাকে না।"[২৪]

গল্পের প্রথম থেকে শেষ অবধি পুরো কাহিনি আবর্তিত হয়েছে হারা ও গৌরবীকে কেন্দ্র করে। গল্পের প্রথম চরণ যেমন শুরু হয়েছে গৌরবী ও হারাকে নিয়ে তেমনি গল্পের শেষেও হারা ও গৌরবীর সমান উপস্থিতি পাঠকের চোখে সমানভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাই কাহিনির গতিপ্রকৃতির দিক থেকে বলা যেতে পারে মায়ের সঙ্গে সন্তানের যেমন নাড়ির সম্পর্ক তেমনি গৌরবীর সঙ্গে হারার। তাইতো গৌরবী যখন মনে মনে ভাবছে, হারাকে তাড়াতে পারলে নিবারণ হয়তো ওকে একটু আশ্রয় দিতে পারে কিন্তু সেই সময় গৌরবীর বুকের ভেতর থেকে কে যেন 'না' 'না' বলতে লাগল।

লেখিকার ভাষায়- “সে কি হারার মা না নিবারণের মা,কে গৌরবীকে মানা করতে লাগল?”[২৫]

কথিত আছে মায়ের কোন জাত নেই। মাতৃত্বের আসন যে জাত-পাতের ঊর্ধ্বে সদা বিরাজমান, তার উজ্জ্বল উদাহরণ হারুণ সালেমের মাসি তথা গৌরবী। জাতে মুসলমান শিশু হারাকে আশ্রয় দেওয়ার ফলে গৌরবীকে নানান সামাজিক পারিবারিক বাধা নিষেধের সন্মুখীন হতে হয়েছে। হয়তো কখনো তার মতো এক দরিদ্র নারীর মন অভাবের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের চিন্তায় বিচলিত হয়ে ছোট্ট হারাকে গালমন্দ করেছে বা পাগলের মতো তেড়ে গিয়েছে মারার জন্য ঠিকই কিন্তু পরক্ষণেই তার স্নেহভরা কোলে তুলে নিয়েছে তাকে। গৌরবী চাইলে পারত হারাকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজের অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের একটা স্থায়ী সমাধান করতে। কিন্তু সে তার সমস্ত ব্যাক্তিক সুখকে বিসর্জন দিয়ে মাতৃত্বের চিরন্তন সুখের জন্য মাতৃত্বের টানে হারাকে ত্যাগ করতে পারেনি। তাই গল্পের শেষে আমরা দেখতে পাই গৌরবী হারাকে নিয়ে সংকীর্ণ জাত-পাতের গণ্ডির অনেক বাইরে পাড়ি দিয়েছে। সেই গণ্ডির বাইরে যেখানে কেউ কাউকে চিনে না। কেউ কারো কথা জানতে চায় না। সেই বৃহত্তর জগতে হারিয়ে গিয়েছে গৌরবী শুধুমাত্র মাতৃত্বের স্বাদ পাওয়ার অসীম আনন্দে। এখানেই গৌরবী হয়ে উঠেছে বিশ্বমাতৃত্বের মহীয়সী রূপের আলোয় ভাস্বর।

তথ্যসূত্র:

১। স্তনদায়িনী এবং অন্যান্য গল্প; মহাশ্বেতা দেবী; করুণা প্রকাশনী; ২০১৬; পৃ.-৮৮

২। তদেব; পৃ.- ৯২

৩। তদেব; পৃ. - ৯২

৪। তদেব; পৃ. - ৯২

৫। তদেব; পৃ. - ৯২

৬। তদেব; পৃ. – ৯৩

৭। তদেব; পৃ. – ৯৪

৮। তদেব; পৃ. – ৯৪

৯। তদেব; পৃ. – ৯৪

১০। তদেব; পৃ. – ৯৪

১১। তদেব; পৃ. – ৯৪

১২। তদেব; পৃ. – ৯৬

১৩। তদেব; পৃ. – ৯৬

১৪। তদেব; পৃ. – ৯৬

১৫। তদেব; পৃ. – ৯৬

১৬। তদেব; পৃ. – ৯৬

১৭। তদেব; পৃ. – ৯৭
১৮। তদেব; পৃ. – ৯৮
১৯। তদেব; পৃ. – ৯৮
২০। তদেব; পৃ. – ৯৮
২১। তদেব; পৃ. – ৯৮
২২। তদেব; পৃ. – ৯৮
২৩। তদেব; পৃ. – ৯৮
২৪। তদেব; পৃ. – ৯৮
২৫। তদেব; পৃ. – ৯৭

অসহযোগ আন্দোলন ও *প্রবাসী* পত্রিকায় শিক্ষা বিষয়ক ভাবনা : একটি পর্যালোচনা

অরিজিৎ প্রামাণিক
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রী কলেজ, নারায়ণগড়, পশ্চিম মেদিনীপুর

সারসংক্ষেপ: বিংশ শতকের দুই-এর দশকে ভারতের রাজনীতি অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ঝঙ্কারে মুখরিত হয়ে উঠেছিল। রাজনীতির গন্ডি ছাড়িয়ে এই আন্দোলন যেমন তৎকালীন সমাজজীবন ও অর্থনৈতিক জীবনকে আলোড়িত করেছিল তেমনই জাতির শিক্ষাজগতেও এর প্রভাব ছিল লক্ষণীয়। অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে ছেলেমেয়েদের মধ্যে সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল-কলেজ বর্জনের মনোবৃত্তি তৈরি হয়েছিল। একই সাথে স্থানে স্থানে তার পরিবর্তে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার অঙ্গীকার করা হয়। এই প্রেক্ষিতে বাংলা থেকে প্রকাশিত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের *প্রবাসী* পত্রিকা এই স্কুল-কলেজ ত্যাগের আচরণের তীব্র সমালোচনা করেছিল। আলোচ্য প্রবন্ধে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে *প্রবাসী* পত্রিকা কিভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিত্যাগের নীতিকে যুক্তিসহকারে খন্ডন করেছিল এবং জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে তার নিজস্ব মতামত প্রদান করেছিল।
সূচক শব্দ: অসহযোগ আন্দোলন, সরকারি স্কুল-কলেজ, ছাত্র-ছাত্রী, জাতীয় শিক্ষা, প্রবাসী, গান্ধী, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস।

ভূমিকা

ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর আবির্ভাব এবং একের পর এক প্রথমে চম্পারন সত্যাগ্রহ ও পরে খেড়া, আমেদাবাদ ও রাউলাট সত্যাগ্রহের মত অহিংস আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একজন সশ্রদ্ধ নেতা হিসেবে নিজের পরিচিতি স্থাপন করা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে যুগপৎ তাৎপর্যপূর্ণ ও চমকপ্রদ ঘটনা। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে সমগ্র ভারতীয়দের দাবি দাওয়াকে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল। কংগ্রেস প্রথমদিকে আপামর ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরেছিল কিনা অথবা ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোন সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলার মানসিকতা কংগ্রেসের নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে ছিল কিনা এইসব তর্ক-বিতর্কের মধ্যে না গিয়েও একথা সম্ভবত নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে যে গান্ধীর আবির্ভাবের পূর্বে জাতীয় কংগ্রেস ছিল ভারতীয়দের রাজনৈতিক লড়াইয়ের একমাত্র সক্রিয় মঞ্চ। গান্ধীও এই মঞ্চকে ব্যবহার করেই সর্বভারতীয় স্তরে তাঁর আন্দোলনকে

সংগঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাই দেখা যাচ্ছে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার আগে সাংগঠনিক স্তরে কংগ্রেসের মধ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রদবদল করা হচ্ছে যেমন একুশ বছর বয়স্ক সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য কংগ্রেসের সদস্যপদ উন্মুক্ত করা, কংগ্রেসের বার্ষিক সদস্যপদের চাঁদা চার আনা করা অথবা ভারতকে ভাষা ভিত্তিক একুশটি প্রদেশে বিভক্ত করে প্রতিটি প্রদেশে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি স্থাপন করা ইত্যাদি।আর এই সবই করা হচ্ছে জাতীয় কংগ্রেসকে ভারতীয়দের আরও কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ঐতিহাসিক এস. আর. মেহেরোত্রা যথার্থই বলেছেন, "With the coming of Gandhi and the launching of the non-violent non-cooperation movement, the Congress entered the era of mass politics."[১]

গান্ধীর নেতৃত্বে যে অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল এবং যে আন্দোলন সারা দেশের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে একে একটি সর্বভারতীয় চরিত্র প্রদান করেছিল তার সমস্ত দিকের মূল্যায়ন আলোচ্য প্রবন্ধের মধ্যে করা সম্ভব নয়। এই আন্দোলন দেশের বিশেষ করে বাংলার শিক্ষাব্যবস্থার উপর কিরকম প্রভাব ফেলেছিল কেবলমাত্র এই একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রবন্ধের আলোচনা শুরু হবে। পরে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের *প্রবাসী* পত্রিকা এই অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন দেশের শিক্ষাব্যবস্থার উপর এই আন্দোলনের প্রভাবকে কিভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিল তা দেখানোর চেষ্টা করা হবে।

গান্ধী, অসহযোগ আন্দোলন ও সরকারি স্কুল-কলেজ বর্জনের নীতি

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ার বেশ কয়েকমাস আগে থেকে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে গান্ধীর অসহযোগ নীতির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে যথেষ্ট বাগবিতন্ডার সূচনা হয়েছিল। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে বিপিন চন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশের মত নেতৃবৃন্দের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও অসহযোগের নীতিকে অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীকালে সেই বছরই ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে এই নীতির প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করা হয়। এইভাবে কার্যত গান্ধী নির্দেশিত পথে এবং কংগ্রেসের পরিচালনায় অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা ঘটে।[২] ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের কলকাতার অধিবেশনে কংগ্রেস যে সাতটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল তার মধ্যে একটি প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, "গবর্ণমেন্টের নিজস্ব, গবর্ণমেন্টের সাহায্যকৃত ও গবর্ণমেন্টের শাসনাধীন স্কুল ও কলেজ হইতে সন্তানদিগকে ক্রমে ক্রমে লইয়া যান এবং প্রত্যেক প্রদেশে জাতীয় স্কুল ও কলেজ স্থাপন করুন।"[৩] ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে যে সকল প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়েছিল তার মধ্যে দুটি প্রস্তাবে সমকালীন সরকারি শিক্ষার বিষয়ে অসহযোগিতার নীতি গ্রহণ করা হয়। এই প্রস্তাব দুটিতে বলা হয়েছিল, "(ক) ১৬ বৎসরের কম বয়স্ক ছেলেমেয়েদের অভিভাবকদের জানাইয়া দিতে হইবে যে তাদের ছেলেমেয়েদের

গভর্ণমেন্ট সাহায্যপ্রাপ্ত অথবা গভর্ণমেন্ট পরিচালিত স্কুল হইতে নাম কাটাইয়া জাতীয় বিদ্যালয়ে পড়াশুনার ব্যবস্থা করা হউক। (খ) ১৬ বৎসর বয়স্ক ছাত্রদের অবিলম্বে গভর্ণমেন্টের অধীনে অথবা গভর্ণমেন্ট সাহায্য-প্রাপ্ত স্কুল ত্যাগ করিতে হইবে এবং তাহারা কোন জাতীয় বিদ্যালয়ে পড়িবে অথবা স্বেচ্ছায় অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিবে।”[৪] ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী উল্লেখ করেছেন যে নাগপুর অধিবেশনে কংগ্রেস যেসব প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল তার অধিকাংশেরই খসড়া চিত্তরঞ্জন দাশ তৈরী করেছিলেন। গান্ধী নাগপুর অধিবেশনের জন্য যে প্রাথমিক খসড়া তৈরী করেছিলেন এবং যে চূড়ান্ত খসড়াটি অবশেষে গৃহীত হয়েছিল তার বয়ানের মধ্যে পার্থক্য থেকেই তা বোঝা যায়। শিক্ষা সংক্রান্ত প্রস্তাবের ক্ষেত্রে ছাত্রদের স্কুল-কলেজ ত্যাগের প্রসঙ্গে আগের gradual বিশেষণটি বাদ দেওয়া হয়। যদিও জাতীয় স্কুল স্থাপনের কথা বলা হয়েছিল। আবার ষোল বছর বা তার থেকে বেশি বয়সের ছেলেদের বিদ্যালয় বর্জনের নীতির অধীনে নিয়ে আসা হয়।[৫]

কংগ্রেসের কলকাতা ও নাগপুরের অধিবেশনে ছাত্রদের সরকারি স্কুল-কলেজ পরিত্যাগ করার নীতি ঘোষিত হওয়ার পাশাপাশি গান্ধী নিজেও ছাত্রদের সরকারি স্কুল-কলেজ থেকে নাম কাটিয়ে জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে বোম্বাই-এর মুজফ্ফরাবাদে অনুষ্ঠিত একটি জনসভায় তিনি অসহযোগ নীতির অঙ্গ হিসেবে অভিভাবকদের কাছে তাঁদের সন্তানদের সরকারি স্কুল থেকে সরিয়ে আনার প্রস্তাব রাখেন। এমনকি তাঁদেরকে ইংরেজ সরকারের প্রভাব থেকে মুক্ত জাতীয় অথবা ব্যক্তিগত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজে এগিয়ে আসতে বলেন।[৬] সেই বছরই আগষ্ট মাসে *নবজীবন* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধে তিনি বলেন, “The Government uses our schools and colleges to produce servants. If we stop this important help to the Government, it will have no negligible effect. So long as we believe that Government is a beneficent one, we need have no shame in helping the schools and preparing qualified men for Government service.” তিনি আরও উল্লেখ করেন যে ছেলেমেয়েদের সরকারি স্কুল পরিত্যাগের ফলে তাদের পড়াশোনার কোন ক্ষতি হবে না কারণ ছেলেমেয়েদের স্কুলত্যাগ করার পর স্কুলশিক্ষকরাও তাঁদের চাকরি থেকে পদত্যাগ করে দেশের জনগণের দ্বারা পরিচালিত স্কুলে যোগদান করবেন ও ছেলেমেয়েদের পঠনপাঠন অব্যাহত রাখবেন।[৭] আসলে গান্ধীর দৃষ্টিতে অসহযোগ আন্দোলন ছিল একটি স্বয়ংক্রিয় সমন্বয়সাধনের আন্দোলন কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যদি সরকারি স্কুলগুলি ছাত্রশূণ্য হয়ে যায় তাহলে তার স্থানে নিজে থেকেই জাতীয় স্কুল স্থাপিত হবে।[৮] ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে *অমৃত বাজার পত্রিকা*-র সম্পাদক মতিলাল ঘোষকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারেও গান্ধী ছেলেদের স্কুল পরিত্যাগের পর নতুন স্কুল গড়ে তোলার কথা বলেন। তাঁর মতে যতক্ষণ পর্যন্ত ছেলেরা বর্তমান স্কুলগুলিতে

বৌদ্ধিকভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত দেশের উন্নতির কোন আশা নেই।[৯] মেহমেদাবাদে প্রদত্ত এক ভাষণেও গান্ধীকে ইংরেজ সরকারের স্কুল বয়কটের জন্য অভিভাবকদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে এবং দেশবাসীদের নিজেদের ব্যয়ে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর উপদেশ দিতে শোনা যায়। তিনি শিক্ষকদের সরকারি স্কুলের চাকরি ছেড়ে এইসব স্কুলে যোগদান করার ডাক দেন। পাশাপাশি সরকারি স্কুলের গৃহ পরিত্যাগ করে নিজেদের গৃহে স্কুল স্থাপন করার কথাও তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে।[১০]

ঐতিহাসিক সুমিত সরকারের মতে অসহযোগ আন্দোলনের চারটি পর্যায়ের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসের মধ্যে ছাত্রদের সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল ও কলেজ থেকে দলে দলে বেরিয়ে আসা এবং উকিলদের ওকালতির পেশা ত্যাগ করার উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল।[১১] বাংলায় এই শিক্ষাব্যবস্থা বয়কটের প্রভাব সবথেকে বেশি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্যন্ত প্রতিমাসেই প্রায় ২০ জন করে প্রধান শিক্ষক অথবা শিক্ষক সরকারি স্কুল ত্যাগ করেছিলেন। ছাত্রদের মধ্যে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্জনের হিরিক ছিল অনেক বেশি। এই একই সময়পর্বের মধ্যে অর্থাৎ ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের মধ্যে গভর্ণমেন্ট ও গভর্ণমেন্ট সাহায্য প্রাপ্ত স্কুলের ১০৩,১০৭ জন ছাত্রের মধ্যে ১১,১৫৭ জন ছাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ত্যাগ করেছিল। ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিক ব্যামফোর্ডের ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত *History of the Non Cooperation and Khilafat Movement* গ্রন্থটি থেকে প্রাপ্ত গোপন রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিক সুমিত সরকার দেখিয়েছেন অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব কলেজ স্তরের শিক্ষার উপর যতটা পড়েছিল প্রাথমিক শিক্ষার উপর ততটা পড়ে নি।[১২] এত বিপুল সংখ্যক ছাত্র যারা নির্দ্বিধায় গান্ধীর ডাকে সাড়া দিয়ে স্কুল-কলেজ পরিত্যাগ করেছিল তাদের শিক্ষাদানের জন্য অনেক জাতীয় স্কুল ও কলেজ নির্মিত হয়েছিল। যদিও সুরেশ চন্দ্র ঘোষের মতে এই নবনির্মিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে একাধিক অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হত যেমনপর্যাপ্ত কাঠামো, প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত শিক্ষক, সরঞ্জাম ও আর্থিক সহায়তার অভাব। তা সত্ত্বেও এই আন্দোলনের প্রভাবে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল ও কলেজে ছাত্রসংখ্যা অনেকটা কমে গিয়েছিল। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে সারা দেশে কলেজ, হাই স্কুল ও মিডিল স্কুলে ছাত্র উপস্থিতির হার যথাক্রমে ৮.৬, ৫.১ ও ৮.১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল।[১৩] অসহযোগ আন্দোলনের এই পর্বে বিহার ও উড়িষ্যাতে ৪৪২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বাংলাতে ১৯০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বোম্বাই ও ইউনাইটেড প্রভিন্সে (ইউ.পি.) যথাক্রমে ১৮৯ ও ১৩৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল।[১৪]

স্কুল ও কলেজ বর্জনের নীতি অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন সময়েই যথেষ্ট সমালোচিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্কুল-কলেজ বর্জনকে "নিছক শূণ্যতার নৈরাজ্য" বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।[১৫] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অসহযোগ আন্দোলনের সময়

ছাত্রদের বিদ্যালয় ত্যাগ করা ও 'ন্যাশনল স্কুল' স্থাপন করার মত ঘটনার সাথে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় বালক ও যুবকদের বিদ্যালয় ত্যাগ এবং 'ন্যাশনল কাউন্সিল অব এডুকেশন' ও অন্যান্য 'জাতীয় বিদ্যালয়' গড়ে ওঠার তুলনা টেনেছেন। এরপর তিনি মন্তব্য করেন, "কিন্তু এবারকার শিক্ষান্দোলনে স্বদেশীযুগের আবেগও নাই, আন্তরিকতাও নাই -অল্পকালের মধ্যেই সেগুলি নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।"[১৬] ইংরেজ সরকার শিক্ষাব্যবস্থার উপর অসহযোগ আন্দোলনের ক্ষতিকারক প্রভাব স্বীকার করে নিলেও ছাত্রদের স্কুল-কলেজ বর্জনের প্রবণতা কতটা স্থায়ী হবে সে সম্পর্কে সন্দিহান ছিল। সরকারি রিপোর্টে তাই দেখতে পাই বলা হচ্ছে, "...guardians gave little support to the movement, and the excitement died out gradually. Most of the students returned, and colleges and schools resumed normal work, though an appreciable number of students appear to have abandoned school and college permanently;"[১৭] অন্য আরেকটি সরকারি রিপোর্টে অনুরূপভাবে শিক্ষাব্যবস্থার উপর অসহযোগ আন্দোলনের বিরূপ প্রভাবের কথা মেনে নিয়ে বলা হচ্ছে, "Eventually, the excitement died down for the lack of stimulus, when it had run its course, and the national colleges promised by the non-co-operators did not materialise."[১৮]ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী মনে করেন জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা ব্যার্থ হয়েছিল। কারণবাংলায় স্থাপিত হওয়া ১৯০টি জাতীয় বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মাত্র ৭০টির অস্তিত্ব টিকে ছিল।[১৯]

সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ ও জাতীয় শিক্ষা প্রসঙ্গে *প্রবাসী*

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে যখন অসহযোগ আন্দোলনে জাতির জীবন উত্তাল ততদিনে *প্রবাসী* পত্রিকা বাঙালি পাঠকসমাজে একটি রুচিশীল মাসিক হিসেবে নিজের স্থান পাকা করে নিয়েছে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এলাহাবাদে থাকাকালীন *প্রবাসী* পত্রিকার প্রকাশ শুরু করেন। প্রথমে এলাহাবাদ ও বাংলার বাইরে দেশের বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী প্রবাসী বাঙালিদের জন্য এই পত্রিকা প্রকাশ করা হলেও ধীরে ধীরে বাংলার সমাজজীবন, রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্পর্কে এই পত্রিকাটি তার নিজস্ব মতামত প্রদান করতে থাকে। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম থেকেই *প্রবাসী* কংগ্রেসের মধ্যে ইংরেজ সরকারের স্কুল-কলেজ বর্জনের নীতি নিয়ে যে আলোচনা চলছিল তার সমালোচক হয়ে ওঠে। হঠাৎ করে সরকারি স্কুল ত্যাগ করার পর ছাত্রদের ভবিষ্যত কি হবে সেই বিষয়ে *প্রবাসী* বলেছিল, "সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে সম্পূর্ণরূপে বেসরকারী স্বাধীন বিদ্যালয় কয়েকটিমাত্র আছে। বালক বালিকাদিগকে বাড়ীতে শিক্ষা দিবার মত বিদ্যা, অবসর বা সামর্থ্য ও ধন অল্প লোকেরই আছে।"[২০] *প্রবাসী* পত্রিকা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কাজে উৎসাহ দেখালেও শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়কে রাজনীতির সাথে যুক্ত করার পক্ষপাতী ছিল না। এমনকি ভারতীয়দের নিজেদের উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার

প্রতিষ্ঠার কাজকে সুসম্পন্ন করতে গেলে "ধীরতা ও সাত্ত্বিকতা আবশ্যক" বলে মনে করত। *প্রবাসী* তাই লিখেছিল, "উত্তেজনাপূর্ণ রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় কোন প্রচেষ্টার সহিত তাহাকে জড়িত করিলে এই ধীরতাও সাত্ত্বিকতা হ্রাস পাইবে।" *প্রবাসী* আরও বলেছিল, "...স্বরাজ্য লাভ করিবার পূর্ব্বেও আমরা আমাদের আদর্শ অনুযায়ী স্কুলকলেজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতে থাকি, কিন্তু তাহাকে কোন রাজনৈতিক প্রচেষ্টার সহিত যুক্ত না করিয়া;-আমরা তাহা করিব একটি নিত্য কর্ত্তব্যরূপে, নৈমিত্তিক কর্ত্তব্য বলিয়া নহে।"[২১]

প্রবাসী পত্রিকা কেবলমাত্র সরকারি স্কুল-কলেজ বর্জনের বিরোধীতা করে ক্ষান্ত হয় নি, এর পাশাপাশি এই নীতি প্রয়োগের ফলে কি সমস্যা জন্ম নিতে পারে সেই সম্পর্কে কিছু মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল। *প্রবাসী* দেখিয়েছিল ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারি অনুযায়ী ভারতে সমস্ত ধরণের শিক্ষক, অধ্যাপক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কেরানী ও তাদের উপর নির্ভরশীল লোকেদের মোট সংখ্যা ছিল ৫,৩০,৫৭৯ জন। এখন অসহযোগ আন্দোলনের ফলে সরকারি ও সরকারি অনুমোদিত স্কুলগুলি যদি উঠে যায় তাহলে এই বিপুল সংখ্যক মানুষের ভরন পোষণের দায়িত্ব কে নেবে? *প্রবাসী* খানিকটা শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে দেশের তৎকালীন নেতাদের এই বিষয়টি নিয়ে ভাববার উপদেশ দেয়।[২২] জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের প্রশ্নেও *প্রবাসী* পরিসংখ্যান ব্যবহার করে এর বিশালতা ও আসন্ন সমস্যা সম্পর্কে একটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করে। *প্রবাসী* দেখায় ১৮১৮-১৯ খ্রীষ্টাব্দের সরকারি শিক্ষা রিপোর্টে ভারতে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৭৯,৩৬,৫৭৭ জন ও মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১,৯৭,৩৪৭টি। এগুলি চালাবার জন্য রাজকোষ ও সাধারণ লোকেদের থেকে মোট খরচ হয়েছিল ১২,৯৮,৬৩,০৭৩ টাকা। এদের মধ্যে রাজকোষ থেকে ব্যয় হয়েছিল ৭ কোটি ১৭ লক্ষ ২৬ হাজার ২৯২ টাকা এবং জনগণ ব্যয় করেছিল ৫ কোটি ৮১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৭৮১ টাকা। জাতীয় বিদ্যালয়গুলিকে চালনা করতে গেলে এই সমপরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে। দেশে বিপুল পরিমাণ নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার উপস্থিতির কথা মেনে নিয়ে *প্রবাসী* বক্তব্য রাখে যে যেহেতু দেশবাসীর ট্যাক্সের টাকার খুব সামান্য অংশ অর্থাৎ প্রায় সাত কোটি টাকা সরকার শিক্ষার জন্য ব্যয় করে, অতএব এই মুহূর্তে যদি ছাত্র-ছাত্রীরা সরকারি স্কুল পরিত্যাগ করে তাহলে সরকারকে ট্যাক্স তো দিতেই হবে কারণ সরকার ট্যাক্সের টাকা মুকুব করবে না, উপর্যুপরি আরও সাত কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করতে হবে জাতীয় বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য। সেই সব স্কুলে আবার অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেমেয়েরাই ভর্তি হবে যারা এতদিন সরকারি স্কুলে পড়াশোনা করছিল। অতঃপর *প্রবাসী* প্রশ্ন করেছিল, "...এই যে-সব ছাত্রছাত্রী কোন একপ্রকার শিক্ষা পাইতেছে, তাহাদের শিক্ষার জন্য এই দরিদ্রদেশে দ্বিতীয়বার সাতকোটি টাকা খরচ করা ভাল, না, ঐ সাতকোটি টাকা খরচ করিয়া সেই-সব দরিদ্রলোকদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা ভাল যাহারা এখন কোন শিক্ষাই পাইতেছে না?"[২৩]

একথা ভাবা হয়ত ভুল হবে যে *প্রবাসী* সম্পূর্ণভাবে অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধী ছিল। *প্রবাসী* একস্থানে বলেছিল, “যাহা হউক, গান্ধী মহাশয়ের মত আমরাও মনে করি যে, কেবল “সহযোগিতা” দ্বারা স্বরাজ প্রাপ্তি ঘটিতে পারে না; সম্পূর্ণ হউক, বা কোন কোন বিষয়ে হউক অসহযোগের প্রয়োজন।”[২৪] *প্রবাসী* মূলত এই আন্দোলনের বেশ কিছু নীতির বিরোধী ছিল যার মধ্যে অন্যতম ছিল স্কুল-কলেজ বর্জনের নীতি। ইংরেজ সরকারের কাজকর্মকে অচল করে দেওয়ার জন্য *প্রবাসী* প্রস্তাব রেখেছিল “দেশের লোকের পক্ষে সৈনিক ও অসৈনিক কোন প্রকার সরকারী চাকরী না করা” এবং সরকারকে ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করা। কিন্তু ছাত্রদের স্কুল ত্যাগের কারণে সরকার অচল হয়ে পড়বে এইরকম বিশ্বাস *প্রবাসী*-র ছিল না। জাতীয় স্কুল-কলেজ সম্পূর্ণভাবে তৈরি হওয়ার পরই ছাত্রদের সরকারি স্কুল-কলেজ ত্যাগ করাকে *প্রবাসী* শ্রেয় মনে করেছিল।[২৫] *প্রবাসী* অন্যত্র এই প্রসঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেছিল, “ ইংরেজ গবর্ণমেন্টকে যিনি যত খারাপ বলিতেছেন এবং উহাকে আমাদের যত লাঞ্ছনা, অপমান ও অধোগতির কারণ বলিতেছেন, তাহা স্বীকার করিয়া লইলেও আমরা ইস্কুল কলেজ ছাড়ার সার্থকতা বুঝিতে পারিতেছি না।”[২৬] অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন সরকারি দমননীতির বিরুদ্ধে ছাত্ররা স্কুল-কলেজ ত্যাগ করে প্রতিবাদে সামিল হচ্ছিল। *প্রবাসী* পত্রিকা এই সকল ছাত্রদের সদিচ্ছার সমাদর করলেও মন্তব্য করেছিল, “তাঁহারা পড়াশুনা বন্ধ করিলে বা রাখিলে গবর্ণমেন্টের সদ্য সদ্য বা ভবিষ্যতে ক্ষতিগ্রস্থ ও জব্দ হইবার সম্ভাবনা আছে কি না, ও থাকিলে কতটুকু আছে, তাহা ভাবিয়া দেখা।” আবার যে সকল ছাত্র সরকারি বর্বরতার প্রতিবাদ স্বরূপ স্কুল-কলেজ যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে অথচ নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদে মত্ত তাদের প্রতি তীব্র বিষোদগার প্রকাশ করতেও *প্রবাসী* পিছপা হয় নি।[২৭]

ইংরেজদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্জনের নীতির সমালোচনা করার সাথে সাথে দেশের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিৎ তা নিয়েও *প্রবাসী* বিস্তারিত আলোচনা করেছিল। *প্রবাসী*-র পৃষ্ঠায় জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চিকিৎসাবিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং, ভূতত্ত্ববিদ্যা, খনিজবিদ্যা, কৃষি, বাণিজ্য, ভূগোল, ইতিহাস, সাহিত্য, ড্রয়িং বা রেখাঙ্কন, সঙ্গীত, মানবদেহতত্ত্ব, শরীরপালন ইত্যাদি বিষয় শেখানোর প্রস্তাব রাখা হয়েছিল।[২৮] জাতীয় শিক্ষার প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে *প্রবাসী* এমন এক শিক্ষার কথা বলেছিল যাতে ভারতীয়দের “একজাতিত্ব রক্ষিত ও বর্ধিত হয়।” আর এই একজাতিত্বেরপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হবে যখন ভারতীয়রা“ক্রিয়াশীলতার স্বাধীনতা ও সুযোগ” লাভ করবে। *প্রবাসী* লিখেছিল, “ক্রিয়াশীলতার স্বাধীনতা ও সুযোগ পাইয়া মানুষ যেমন দেহ ও আত্মায় পরিণতি-প্রাপ্ত (mature) হয়, তেমনি আমাদের একজাতিত্ব ক্রিয়াশীলতার স্বাধীনতা ও সুযোগ পাইলে পরিণতি-প্রাপ্ত (mature) হইতে পারে।”[২৯]

উপসংহার

গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের সময় এক বছরের মধ্যে স্বরাজ অর্জনের আশ্বাস দিলেও ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে চৌরিচৌরার ঘটনায় মর্মাহত হয়ে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। ফলে আন্দোলন অনেকটা মাঝপথেই বন্ধ হয়ে যায়। আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়ার সাথে সাথে স্বভাবতই এর মূল প্রস্তাবগুলি যেমন ব্রিটিশ সরকারের স্কুল-কলেজ প্রত্যাখ্যান করে জাতীয় শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশ করা, আইনজীবিদের ওকালতির পেশা ত্যাগ করা ইত্যাদি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের *প্রবাসী* পত্রিকা শুরু থেকেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্জনের বিষয়টির মধ্যে কোন সারবত্তা খুঁজে পায় নি। ফলে এর সম্ভাব্য ক্ষতিকারক পরিণাম সম্পর্কে নিয়মিতভাবে পাঠকদের অবগত করতে থাকে। অবশ্য এই সমালোচনা কোনভাবেই অন্তঃসারশূণ্য ও অর্থহীন ছিল না, বরং এর মধ্যে গঠনমূলক উপাদানের সমাহার লক্ষ্য করা গিয়েছিল। আসলে *প্রবাসী* সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা বর্জনের মধ্যে একটি ধ্বংসাত্মক প্রবণতা লক্ষ্য করেছিল এবং এই নেতিবাচক প্রবণতার বিরোধীতা করেছিল। অসহযোগ আন্দোলনের উচ্ছাস, গান্ধীর চারিত্রিক আকর্ষণ *প্রবাসী* পত্রিকাকে যে একেবারেই প্রভাবিত করে নি তা নয়, কিন্তু সেই উচ্ছ্বাসের গড্ডলিকা প্রবাহে গা না ভাসিয়ে এই পত্রিকাতৎকালীন শিক্ষাঙ্গন বর্জনের রাজনীতির বিরুদ্ধাচারণ করে একটি বাস্তবোচিত ও সময়োপযোগী পথের দিশারী হয়ে উঠতে পেরেছিল।

তথ্যসূত্র:

১) Mehrotra, S. R., *Towards India's Freedom and Partition*, Rupa& Co., New Delhi, 2007, p. 116.

২) Bandyopadhyay, Sekhar, *From Plassey to Partition: A History of Modern India*, Orient Black Swan, Hyderabad, 2012, p. 300.

৩) দাশগুপ্ত, শ্রী হেমেন্দ্রনাথ, *ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (তৃতীয় খন্ড)*, অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির, কলিকাতা, ১৩৩৪, পৃ. ১৪।

৪) তদেব, পৃ. ৩২।

৫) ত্রিপাঠী, অমলেশ, *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭)*, সাহিত্য অকাদেমী, নিউ দিল্লী, ১৪১৫, পৃ. ১০২।

৬) *The Collected Works of Mahatma Gandhi, XVIII, (July-November 1920)*, The Publication Division, Ahmedabad, 1965, pp. 98-97.

৭) ibid, pp. 160-161.

৮) ibid, p. 175.

৯) ibid, p. 259.

১০) ibid, p. 408.

১১) Sarkar, Sumit, *Modern India*, 1885-1947, Macmillan, Chennai, 2011, p. 204.
১২) ibid, p. 206.
১৩) Ghosh, Suresh Chandra, *The History of Education in Modern India. 1757-2012*, Orient BlackSwan, Hyderabad, 2019, p. 153.
১৪) Sarkar, Sumit, op.cit, p. 207.
১৫) ত্রিপাঠী, অমলেশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩।
১৬) মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, *ভারতে জাতীয় আন্দোলন*, গ্রন্থম, কলিকাতা, ১৩৬৭, পৃ. ১৬০।
১৭) *Report on Public Instruction of Bengal for 1920-21*, The Bengal Secretariate Book Deport, Calcutta, 1922, p.2.
১৮) *Report on The Administration of Bengal, 1920-21*, The Bengal Secretariate Book Deport, Calcutta, 1922, p. xix.
১৯) ত্রিপাঠী, অমলেশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪।
২০) *প্রবাসী*, শ্রাবণ, ১৩২৭, ২০শ ভাগ, ১ম খন্ড, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ৪০৮।
২১) *প্রবাসী*, আশ্বিন, ১৩২৭, ২০শ ভাগ, ১ম খন্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃ. ৬০৮।
২২) *প্রবাসী*, কার্ত্তিক, ১৩২৭, ২০শ ভাগ, ২য় খন্ড, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৯৪।
২৩) তদেব, পৃ.৯৪-৯৫।
২৪) *প্রবাসী*, ফাল্গুন, ১৩২৮, ২১শ ভাগ, ২য় খন্ড, ৫ম সংখ্যা, পৃ. ৭১৩।
২৫) *প্রবাসী*, মাঘ, ১৩২৭, ২০শ ভাগ, ২য় খন্ড, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ৩৮৮-৩৯০।
২৬) *প্রবাসী*, পৌষ, ১৩২৭, ২০শ ভাগ, ২য় খন্ড, ৩য় সংখ্যা, পৃ. ২৮৮।
২৭) *প্রবাসী*, পৌষ, ১৩২৮, ২১শ ভাগ, ২য় খন্ড, ৩য় সংখ্যা, পৃ. ৪৩৫।
২৮) *প্রবাসী*, অগ্রহায়ণ, ১৩২৭, ২০শ ভাগ, ২য় খন্ড, ২য় সংখ্যা, পৃ, ১৮১-১৮৫।
২৯) *প্রবাসী*, ফাল্গুন, ১৩২৭, ২০শ ভাগ, ২য় খন্ড, ৫ম সংখ্যা, পৃ. ৪৬৯-৪৭৮।

বাংলা ছড়ায় প্রচ্ছন্ন ইতিহাস

লিসা পাল
মহিলা আরক্ষী, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ
পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ

সারসংক্ষেপ (Abstract) : ইতিহাস ও সাহিত্য একে অপরের পরিপূরক। সাহিত্যের মধ্যে যেমন ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায়, তেমনি ইতিহাসেও থাকে সাহিত্যের খবর। ইতিহাসে থাকে মানুষের জীবনধারার অতীত চিত্র আর সাহিত্য বলে সম্ভাবনার কথা। যুগ যুগ ধরে ইতিহাস ও সাহিত্যের সম্পর্ক গভীর। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে লোকসাহিত্য একটি বিশেষ শাখা যা অতীতকাল থেকে প্রবহমান মানুষের জীবনধারা ও ঐতিহ্যের কথা বলে। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে 'ছড়া' হল একটি শাখা যা মানুষের মুখে মুখে শিশু মনোরঞ্জনের জন্য সৃষ্টি হয়েছিল। এইসব ছড়ার সৃষ্টিকর্তার নাম যেমন অজ্ঞাত তেমনি যুগে যুগান্তরে হয়েছে এর পাঠান্তর। যার ফলে ছিল না কোনো সাহিত্যমূল্য। মৌখিক রচনার এই হীরে মানিক সাহিত্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। ছড়াগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক গুরুত্ব বোঝা যায় সংগৃহীত ছড়াগুলি বিশ্লেষণের পর। এই ছড়ার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ইতিহাসের গুরত্বই হল মূল প্রবন্ধের আলোচনার বিষয়বস্তু।
সূচক শব্দ (Key Word) : ইতিহাস ও সাহিত্য, ছড়ার ইতিহাস, ছড়ায় প্রচ্ছন্ন ইতিহাস, প্রাসঙ্গিকতা।

মূল আলোচনা (Discussion):
প্রাচীনকাল থেকেই সাহিত্য ও ইতিহাসের সম্পর্ক গভীর। ইতিহাস যেমন মানুষের অতীতের কথা বলে আর আমরা অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমানে প্রয়োগ করি। তেমনি সাহিত্যও মানুষের কথা বলে, বলে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা। এককথায় বলা চলে ইতিহাস অথব সাহিত্য জ্ঞান গ্রহণের এই দুটি পন্থাই আসলে মানুষের কথা বলে। অতীতের নির্যাস ইতিহাসে থাকে আর সাহিত্য তার থেকে উৎস উপাদান গ্রহণ করে। আর সাহিত্যও হয় ইতিহাসের উপাদান। —যেমন আমরা অতীতের বিভিন্ন সাহিত্যের পরিচয় পেয়ে থাকি ইতিহাস বই থেকেই। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় 'রামায়ণ'-এর কথা। যে মহাকাব্যের মধ্যে প্রাচীন ভারতবর্ষের চিত্র পাওয়া যায় যা ইতিহাসের অন্তর্গত আবার এই 'রামায়ণ' কে মূল উৎস উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে রচিত হয়েছে বিভিন্ন কবিতা, গল্প, নাটক ইত্যাদি। ইতিহাস যেমন অতীতকালের দলিল, সাহিত্য তেমনি ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়। ইতিহাস বর্ণনা করে কিন্তু সাহিত্য দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী সমৃদ্ধ। এ বিষয়ে অ্যারিস্টটল-এর 'কাব্যতত্ত্ব' (Poetics)-এ আলোচনা আছে।

যেখানে ঐতিহাসিক সত্য ও কাব্যিক সত্য-এর তুলনামূলক আলোচনা আছে। যেখানে বলা হয়েছে ইতিহাসে বাস্তব চিত্রের বর্ণনা দেয় কিন্তু কাব্য-এ বাস্তব চিত্রের বর্ণনা না থাকলেও সম্ভাব্যতার ইঙ্গিত থাকে। এই স্থানে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও ইতিহাস ও সাহিত্যের মূল মেলবন্ধনের জায়গা হল মানুষের কথা, মানব মনের কথা, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতির কথা। ইতিহাস মানবসমাজের যুগবিবর্তনের কথা লিপিবদ্ধ করে রেখেছে বলেই সাহিত্যের দ্বারা উপকরণ সংগ্রহের আকর হতে পেরেছে। আবার ভবিষ্যতের ইঙ্গিত সাহিত্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় যা হয়তো বাস্তব বস্তুনিষ্ঠ নয়। এ প্রসঙ্গেই বিস্তৃত আলোচনার একটি স্থান হয়ে উঠেছে লোকসাহিত্যের বিশিষ্ট শাখা ছড়া। যে ছড়া অতীতকাল থেকে প্রবহমান মুখ হতে মুখে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। লোকসাহিত্যের লিখিত রূপ না থাকায় সেইভাবে গুরুত্ব ছিল না। জার্মানীর গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয় ১৮১২ সালে লোককথা সংগ্রহ করে এবং লোকসাহিত্য চর্চার দ্বার খুলে দেয়। এই 'গ্রিম ভাইদের রূপকথা' সারাবিশ্বে লোকসাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে আলোচন ফেলে দেয়। তার ঢেউ সারাবিশ্বের মতো ভারতেও আছড়ে পড়েছিল। শিলাইদহে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছড়া সংগ্রহ করেন এবং 'সাধনা', 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় 'ছেলেভুলানো ছড়া' ও 'মেয়েলি ছড়া' নামে ১৩০১-১৩০২ বঙ্গাব্দের মধ্যে প্রকাশ করতে থাকেন। ছড়ার মধ্যে সাহিত্যগুণ লক্ষ করে তিনি বাংলা সাহিত্যে ছড়ার বিশেষ ভূমিকা ও গুরুত্ব সম্পর্কে বিদ্বদ্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই ভাবেই বাংলা সাহিত্যে ছড়া চর্চার সূত্রপাত হয়।

লোকসাহিত্যের যে ছয়টি শাখা রয়েছে (ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা, নাট্য, গীতি, গাথা, কথা) তার মধ্যে ছড়া প্রধান শাখা। লোকসমাজে প্রচলিত স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত মৌখিক পদ্য হল ছড়া (Rhyme)। 'ছড়া' শব্দটি ছটা বা ছড়িয়ে যাওয়া থেকে এসেছে। যে ছন্দোবদ্ধ পদ্য মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে যায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, কাল থেকে কালান্তরে, প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে তাই ছড়া। এর কোনো লিখিত রূপ নেই। ছড়াকার-এর নির্দিষ্ট নাম নেই। ছড়াগুলি স্বরবৃত্ত ছন্দে শিশুর মনোরঞ্জনের জন্য রচিত। ছড়াগুলির সার্বিক অর্থ সেইভাবে পাওয়া যায় না। কল্পনার জগতে ছড়ার উৎপত্তি। ছড়াগুলি ছন্দ প্রধান কিন্তু এর বিষয়ের মধ্যে চূড়ান্ত অসংলগ্নতা লক্ষ করা যায়। ছড়া মৌখিক হওয়ায় মূল ছড়া অবিকৃত রূপে পাওয়া যায় না। পাঠান্তর ঘটেছে অনেক স্থানে। সবচেয়ে বিশেষ আলোচনার বিষয় হল— ছড়াগুলির বিষয়গত অসংলগ্নতা থাকলেও এমন কিছু চিত্র পাওয়া যায় যা শিশুমনের উপযোগী। শিশুর মনের মতো সাহিত্য ও কল্পনার চিত্র প্রকাশে ছড়ার বিকল্প কিছু হতে পারে না। নতুন পৃথিবীতে শিশুর আগমনে শিশুর কল্পনায় পৃথিবী, মানুষ সম্পর্কে অদ্ভুত ধারণা তৈরি হয়, তাদের মনে নানারকম জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হয়। কল্পনার বুননে তারা সেই অপার্থিব জগতে যেতে চায়। বাস্তবে যে জগতের কোনো প্রকার অস্তিত্ব নেই। এককথায় বাস্তবতাহীন জগত হল ছড়ার জগৎ। কিন্তু সেই জগৎ তো মানুষই রচনা করেছে। সেই কারণে যে সমাজে

বসে ছড়া রচিত হয়েছে সেই সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী, ঐতিহাসিক কালবিবর্তন কিন্তু ছড়ার ওপর প্রভাব ফেলেছে। ছড়াগুলি পর্যালোচনা করলে পাওয়া যাবে ইতিহাসের চালচিত্র। ছড়ায় রয়েছে প্রচ্ছন্ন ইতিহাস। এ প্রসঙ্গে ড. সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন—

> "অনেকগুলি ছড়ার মধ্যে ইতিহাসের টুকরো থাকা খুবই সম্ভবপর বলে মনে হয়। আর অনেকগুলির মধ্যে স্থানীয় ইতিহাস একেবারে প্রচ্ছন্ন হয়ে যায়নি।"[১]

সুতরাং ছড়াগুলিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যাবে প্রচ্ছন্ন ইতিহাসের খণ্ড চিত্র। আর সেই চিত্র থেকে ছড়া রচনার কাল এবং তৎকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক চিত্রের সন্ধান পাওয়া যাবে। ছড়ার ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম ছড়ার গুরুত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হন। যদিও ১৮১২ সালে উইলিয়াম কেরীর 'ইতহাসমালা'য় ছড়া চর্চার সূত্রপাত হয়েছিল। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রথম ছড়ার সংকলন গ্রন্থ রচনা করেন ১৮৯৫ খ্রী: 'ছেলেভুলান ছড়া'। পরে যোগীন্দ্রনাথ সরকার ১৮৯৯ খ্রী: ৪১০টি ছড়া নিয়ে প্রকাশ করেন 'খুকুমনির ছড়া'। এছাড়া আছে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর 'বাংলার ব্রত' (১৯০৯ খ্রী:), রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী'র 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' ( ), নিরুপমা দেবী'র 'পল্লীবালিকাদিগের উৎসব' (১৯১২ খ্রী:), সুহাসিনী দেবী'র 'মেয়েলি ব্রতকথা', অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়-এর 'মেয়েলি ব্রত', আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ-এর 'চট্টগ্রামী ছেলেভুলানো ছড়া', দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার-এর 'মেয়েলী সাহিত্য', বিজনবিহারী ভট্টাচার্য-এর 'উত্তর পশ্চিম ভারতের গ্রাম্য ছড়া', 'ছড়াছড়ি', ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য-এর 'বাংলার লোক-সাহিত্য', ড. ভবতারণ দত্ত-এর 'বাংলাদেশের ছড়া', বিমল কুমার মুখোপাধ্যায়-এর 'বাঙলার গ্রাম্য ছড়া' ইত্যাদি।

বিভিন্ন ছড়ার সংকলন গ্রন্থে বিভিন্ন ছড়ায় ইতিহাসের যে চিত্র পাওয়া যায় তা কয়েকটি উদাহরণে আলোচনা সাপেক্ষ।

"খোকা ঘুমোলো পাড়া জুড়োলো বর্গী এল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবো কিসে।"[২]

১৭৪২-১৭৫১ সাল পর্যন্ত বর্গী হাঙ্গামায় বাংলাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কতটা খারাপ হয়েছিল তা এই ছড়া থেকে অনুমেয় এবং এই যে ইতিহাসের চিত্র ছড়ার মাধ্যমে সেযুগ থেকে এযুগে এসেছে তাই ছড়াটির ইতিহাস চেতনাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে।

"চক্ষু বুজে ছবি দেখি বাংলা ভেসেছে
বড়ো সাহেবের বিবিগুলি নাইতে এসেছে।"[৩]

—সাহেব, বিবি এই শব্দগুলোর মাধ্যমে ফিরিঙ্গি-দের শাসনকালের চিত্র তুলে ধরে—

"চন্দ্র সূর্য হার মেনেছে, জোনাক জ্বালে বাতি।
মেগেল পাঠান হদ্দ হল,
ফার্সি পড়ে তাঁতি।"[৪]

—এই ছড়ায় মোগল, পাঠান যুগের কথা বর্ণিত হয়েছে।

'ছেলেভুলানো ছড়া'-তে ছড়ার ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন—

> "বাংলা ভাষায় ছেলে ভুলাইবার জন্য যে-সকল মেয়েলি ছড়া প্রচলিত আছে, কিছুকাল হইতে আমি তাহা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম। আমাদের ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস-নির্ণয়ের পক্ষে সেই ছড়াগুলির বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে।"[৫]

"মাছের কাঁটা পায়ে ফুটল দোলায় চেপে যাই।
দোলায় আছে ছ পণ কড়ি গুণতে গুণতে যাই।।"[৬]

পাল শাসনের শেষে নবম শতকে কড়ির ব্যবহার শুরু হয় বাংলায় এবং ব্যবহার চলতে থাকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আগমনের সময় পর্যন্ত। উপরোক্ত ছড়া থেকে বোঝা যায় ছড়াটি নবম থেকে সপ্তদশ শতকের মধ্যেই কোনো একসময় রচিত হয়েছে। অথবা

"আপনি যাব গৌড়।
আনব সোনার মউর।।"[৭]

গৌর যখন বাংলার রাজধানী ছিল তৎকালীন সময়ে এই ছড়া রচিত। 'মউর' বলতে বিয়ের জন্য মাথার 'টোপর' জাতীয় সজ্জার বস্তুকে বোঝানে হয়েছে। তৎকালীন সময়ে বাংলার রাজধানী গৌর এতটাই ধনসম্পদে পরিপূর্ণ ছিল তারই প্রমাণ দেয় এই ছড়াটি। অর্থাৎ ধনসম্পদশালী বাংলার রাজধানীর সময়ের কথা আছে এই ছড়ায়। "টাঁকশালেতে চাকরি করে, ঘুঘু ডাঙায় ঘর"[৮] এই ছড়াটি অর্বাচীন কারণ ততদিনে টাঁকশাল তৈরি হয়েছে অর্থাৎ টাকার প্রচলন হয়ে গেছে। "সয়দাবাদের ময়দা, কাশিমবাজারের ঘি"[৯] ছড়াটিতে প্রসিদ্ধ স্থান নামের উল্লেখ আছে যেখানে ময়দা এবং ঘি উন্নতমানের ছিল। "খোকা যাবে নায়ে লাল জুতুয়া পায়ে"[১০] ছড়ায় পাটনা থেকে হলুদ এনে গা ফর্সা করার কথা বলা হয়েছে। পাটনার বিখ্যাত হলুদের প্রসঙ্গ এই ছড়ায় উঠে এসেছে অর্থাৎ অনেককাল আগে থেকেই পাটনার হলুদ বিখ্যাত ছিল। "আর্শি আর্শি আর্শি / আমার স্বামী পড়ুক ফার্সী"[১১] এই ছড়াতে সেই সময়ের কথা রয়েছে যখন ফার্সী শিখলে সরকারে চাকরি এবং মান পওয়া যেত। এখানে সেই স্ত্রীর মনের কথা রয়েছে যে চায় তার স্বামী ফার্সী শিখে নাম, যশ ও অর্থের অধিকারী হোক। এ প্রসঙ্গে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য স্মরণীয়—

> "লোকসাহিত্যের সবটুকু মৌখিক ব্যাপার হলেও এর পিছনে লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির এমন সমস্ত পরিচয় প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে যা হয়তো তথাকথিত সমাজ ইতিহাস-সংক্রান্ত মোটা মোটা কেতাবে লেখা নেই।"[১২]

পল্লব সেনগুপ্ত বলেছেন এ প্রসঙ্গে—

> "লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন প্রকাশের মধ্যে যে শুধুমাত্র প্রাগিতিহাসের কিংবা ইতিহাসের ঊষাকালের আলো-আঁধারই লুকিয়ে থাকে, এমন নয়। ইতিহাসের স্পষ্ট রূপটি যখন মূর্তিমন্ত হয়ে উঠতে থাকল, তখন থেকে উত্তরকাল অবধি বহুবিচিত্র বিবর্তনের চিহ্নও স্তরে স্তরে সন্নিবিষ্ট আছে লোকায়ত সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রকরণ গুলির মধ্যে।"[১৩]

'আহিকম বাইকম তাড়াতাড়ি' ছড়াটিতে 'রেল কম ঝমাঝম', বাক্যটির দ্বারা বোঝা যায় আমাদের দেশে ততদিনে রেলগাড়ি প্রতিস্থাপিত হয়েছে অর্থাৎ ইংরেজ শাসনাধীন সময়ে এ ছড়া রচিত। ব্রজসুন্দর সান্যালের 'শরৎকালী' ছড়ায় আছে—

"ভাবি মনে গজাননে করেন দণ্ডবৎ,
গঙ্গা আনতে যেমন চললেন ভগীরথ।"[১৪]

এতে ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের পৌরাণিক ইতিহাস প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। ড. মোক্ষদাচরণ ভট্টচার্য রচিত 'নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা' প্রবন্ধে প্রকাশিত 'ননীচুরি' ছড়ায় 'কৃষ্ণ ও বলরাম' এর পৌরাণিক চরিত্র চিত্রিত হয়েছে—

"নন্দরাণী নন্দরাণী বড়ই ভাগ্যবাণ
সেই ঘরতে জন্ম নিলেন কৃষ্ণ বলরাম।"[১৫]

অথবা লাউলের পুত্রসন্তান হলে সে কী কী গহনা পরবে তা একটি ছড়ার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। গহনার বর্ণনা থেকে তৎকালীন বিভিন্ন ধরনের গহনার নাম সম্পর্কে জানা যায় "লাউলের ঘরের ছেইলারে লো কি কি গয়না দিমু"[১৬] এই ছড়াতে। বয়লা, ডেনাজোখা তাবিজ, জসম, চন্দ্রহার, সূর্যহার, বুকজোখা পাটা, বাঘের নখ বাঁধানো, কোমর জোখা টোড়া, পাওজোখা খাড়ু, গুজরী, দশ আঙুলে পুঁটি ইত্যাদি গহনার নাম পাওয়। যায়। যেসব গয়নার বেশিরভাগই এখন অপরিচিত আমাদের কাছে। 'আইলাম রে বরণে'[১৭] ছড়াটিতে রয়েছে—

"বাইনা বাড়ী ঘুঘুর বাসা
টাকা ভাঙায় দু' দু' পয়সা
ন' ন' মাসে ন' ন' টাকা
আমরা পাইলাম ছয় টাকা।"

এর থেকে বোঝা যায় ছড়াটি অর্বাচীন কারণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এদেশে আগমণের পর টাকার প্রচলন শুরু হয়। বারোমাসী ছড়ায় বাঙালীর বারো মাসের সংস্কৃতির ইতিহাস উঠে এসেছে। যেখানে সুন্দর করে বরোমাসের আচার-অনুষ্ঠানের বর্ণানা রয়েছে। যেমন— আশ্বিনে অম্বিকা পূজা, পাঁঠা বলি, কার্তিকে কালিকা পূজা, ভাইফোঁটা, অগ্রহায়ণে নবান্ন উৎসব, পৌষ সংক্রান্তি, মাঘ মাসে সরস্বতী পূজায় হাতে খড়ি, ফাল্গুনে দোলযাত্রা, চৈত্র মাসে চড়ক, গাজন, আর বৈশাখে তুলসীতলায় জল

দেওয়া, জ্যৈষ্ঠে জামাই ষষ্ঠী, আষাঢ়ে রথযাত্রা, শ্রাবণে ঝুলন যাত্রা, ভাদ্র মাসে মনসা পূজা। এই রীতিনীতির ইতিহাস বাংলার মানুষের জীবনযাত্রার সাথে ওতপ্রোত জড়িত।

বাঙালি সমাজে পূর্বে কন্যাকে অর্থের বিনিময়ে পিতা বিক্রি করে দিতেন। সেই কারণে এক কন্যা তার বাবার প্রতি অভিযোগ করেছেন এই ছড়াটিতে অভিমানী হৃদয়ে—

"এতটাকা নিলে বাবা দূরে দিলে বিয়ে,
এখন কেন কাঁদছ বাবা গামছা মুড়ি দিয়ে।"[১৮]

"আল্লা আল্লা বল ভাই আল্লা নাইক ঘরে"[১৯] ছড়াটিতে রয়েছে জাতিবিদ্বেষের গন্ধ। "আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে" ছড়াতে তৎকালীন সময়ে অগ্রে পশ্চাতে ডোম সৈন্য ও ঘোড়া সজ্জিত সৈন্য দ্বারা বিবাহ যাত্রার প্রসঙ্গ উল্লিখিত আছে—

"দুধে ধোয়া কোম্পানির উড়িল নিশাল।
মীরজাফরের দাগাবাজিতে গেল নবাবের প্রাণ।"[২০]

এখানে পালাশীর যুদ্ধে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার চিত্র ফুটে উঠেছে। "ভাত মারলে নীল বাঁদরে"[২০] ছড়াতেও রয়েছে নীল বিদ্রোহের ছবি। এইভাবেই ছড়ায় উঠে এসেছে ইতিহাস যা প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটি মন্তব্য বেশ প্রাসঙ্গিক—

> "সব ভাষাতেই বহু প্রাচীনকাল থেকে লোকজীবন ও সংস্কৃতির নানা ঘাত ঘরে শিশু-কিশোরদের প্রতি স্নেহ- ভালোবাসার এ জাতীয় সমিল কাব্যময় উক্তি মানুষের মুখে মুখে এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে বাহিত হয়ে এসেছে।"[২২]

সুতরাং ছড়া শিশুমনের কল্পনা বলে অথবা মেয়েলি চিন্তায় স্বভাবত উৎপন্ন বলেই যে সাহিত্য গুণসম্পন্ন নয় তা কিন্তু নয়। এ ছড়াতে যেমন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী খুঁজে পাওয়া যায় তেমনি অর্থনৈতিক চালচিত্রেরও হদিশ পাওয়া যায়। আর একটু বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখলে ছড়ার মধ্যে ইতিহাসের চালচিত্রও খুঁজে পাওয়া যায়। ছড়ায় প্রচ্ছন্ন ইতিহাস-কে খুঁজে বের করার যথেষ্ট গুরুত্ব ও বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। কারণ ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে বর্তমানে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা হয়ে থাকে তাই ইতিহাসের গুরত্ব। ছড়ার মধ্য থেকে যদি কোনো ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ধার করা যায় তাহলে অনেক কিছুর সমাধানের সূত্র মিলতে পারে। এই কারণে গবেষণাধর্মী এই প্রবন্ধের অবতারণা। এ প্রসঙ্গে—

> "রবীন্দ্রনাথ ছড়া থেকে অতীত দিনের বহু উল্লেখযোগ্য ইতিহাসের সন্ধান পাওয়ার কথা বলেছেন। অবনীন্দ্রনাথও তা সমর্থন করেছেন।"[২৩]

অর্থাৎ এইসব সামাজিক ইতিহাস, বিভিন্ন সংস্কৃতির ইতিহাস, সামাজিক প্রথার ইতিহাস প্রভৃতি বিভিন্ন ছড়া আলোচনা করে উদ্ধার করা হয়েছে। যেখানে প্রাচীন বাংলার সমাজে পণপ্রথা, নারীবিক্রয়, বারোমাসের বাঙালি রীতিনীতির ইতিহাস, পৌরাণিক চরিত্রের অবস্থান ইতাদি ছড়ার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। যেগুলোর মাধ্যমে তৎকালীন সমাজের

জীবনযাত্রার চিত্র ফুটে উঠেছে। তখনকার সাথে এখনকার সামাজিক, সাংস্কৃতিক রীতিনীতির বিবর্তনের চিত্রটি বর্তমান জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণ করলে সহজেই বোঝা যাবে। প্রাচীন বাংলাদেশের জীবনযাত্রা ও পাশ্চাত্য প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া জীবনযাত্রার পার্থক্য ছড়াগুলির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। প্রাচীন বঙ্গদেশে নারীদের অবস্থান, সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে অবগত হয়েছি এই ছড়াগুলির প্রচ্ছন্ন ইতিহাস পার্যালোচনা করে।

তথ্যসূত্র:

১. চক্রবর্তী, বরুণকুমার, ২০০৯, বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯, পৃ. ২১৮
২. গিরি, ড. সত্যবতী, মজুমদার, ড. সমরেশ (সম্পাদনা), ২০০৯, *প্রবন্ধ সঞ্চয়ন*, 'বাংলা লোকসাহিত্যে ইতিহাসচেতনা' (অন্তরা মিত্র), রত্নাবলী, কলকাতা-০৯, পৃ. ১০২
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. সলিলকুমার, ২০১৬, রবীন্দ্রসাহিত্য অন্বেষায় লোকসাহিত্য : তথ্য ও মূল্যায়ন, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা- ০৯, পৃ. ৩৫
৪. তদেব, পৃ. ৩৯
৫. তদেব, পৃ. ১০৩
৬. তদেব (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছেলেভুলানো ছড়া), পৃ. ১৬
৭. তদেব, পৃ. ৩৬
৮. তদেব, পৃ. ৩৮
৯. তদেব, পৃ. ৪০
১০. তদেব, পৃ. ৪৪
১১. নায়ক, শ্রী জীবেশ, ২০০০, লোকসংস্কৃতি পরিচয়, মল্লিক পুস্তকালয়, মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পৃ. ১০৯
১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. অসিতকুমার, ২০১৮-১৯, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ৭৩, পৃ. ২২৭
১৩. সেনগুপ্ত, পল্লব, ২০১০, লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা- ০৯, পৃ. ১২৩
১৪. চক্রবর্তী, বরুণকুমার, ২০০৯, বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯, পৃ. ১২৯
১৫. তদেব, পৃ. ১৩১
১৬. তদেব, পৃ. ১৩৬
১৭. তদেব, পৃ. ১৪৫
১৮. তদেব, পৃ. ১৮৫

১৯. গিরি, ড. সত্যবতী, মজুমদার, ড. সমরেশ (সম্পাদনা), ২০০৯, *প্রবন্ধ সঞ্চয়ন*, 'বাংলা লোকসাহিত্যে ইতিহাসচেতনা' (অন্তরা মিত্র), রত্নাবলী, কলকাতা-০৯, পৃ. ১০৩
২০. তদেব, পৃ. ১০৫
২১. তদেব, পৃ. ১০৫
২২. চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল, ২০১২, সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, রত্নাবলী, কলকাতা ০৯, পৃ. ১০৬
২৩. চক্রবর্তী, বরুণকুমার, ২০০৯, বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯, পৃ. ১৫৬

যোগের সিদ্ধি ও ঈশ্বর : একটি দার্শনিক সমীক্ষা

চৈতালী সাহা
গবেষক, দর্শন বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

সারাংশ : ভারতীয় দর্শন চর্চাই যোগশাস্ত্র সুপ্রাচীন ও খুব পরিচিত একটি শাস্ত্র। এই শাস্ত্রের মূল আলোচ্য বিষয় হল যোগ বা সমাধি। যোগ দর্শনে যোগের স্বরূপ, যোগের প্রকার, যোগ সাধনের অঙ্গ, যোগসিদ্ধির প্রয়োজনীয়তা, যোগসিদ্ধির ফল ইত্যাদি বিষয়গুলিকে বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যোগ ও সাংখ্য দর্শন হল সমানতন্ত্র দর্শন। সাংখ্য দর্শনকে তত্ত্ববিধি এবং যোগ দর্শনকে প্রয়োগবিধি বলা হয়েছে। যোগ দর্শনকে প্রয়োগবিধি বলা সত্ত্বেও কিন্তু যোগ দর্শনে সাংখ্য তত্ত্বগুলির অতিরিক্ত তত্ত্ব হিসাবে ঈশ্বর স্বীকার করা হয়েছে। তাই স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে কেন যোগ দর্শনে ঈশ্বরের ধারণা স্বীকার করা হল? আদেও কী যোগ দর্শনে ঈশ্বরের ধারণার স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা আছে? অথবা যোগদর্শনে ঈশ্বর স্বীকারের গুরুত্ব কতটা? ঈশ্বর কিভাবে সমাধি যোগের পথকে প্রশস্ত করে? এবং সর্বোপরি যোগসূত্রকার পতঞ্জলি ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে কী বলেছেন? প্রবন্ধে এই সকল প্রশ্নগুলির যথার্থ উত্তর প্রদানের প্রচেষ্টা করা হয়েছে মাত্র।

বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে যেমন পরিমাণের তারতম্য থাকে এবং সকল পদার্থের মধ্যে মহৎ পদার্থ রূপে আত্মাকে স্বীকার করা হয়, তেমনি জ্ঞানেরও তারতম্য রয়েছে, আর যিনি মহৎ জ্ঞানের অধিকারী তিনিই হলেন সর্বজ্ঞ ঈশ্বর। তাই মহৎ জ্ঞানের অধিকারী রূপে ঈশ্বরের ধারণাকে স্বীকার করতেই হয়। যেহেতু তিনি সর্বজ্ঞ তাই তিনি হলেন বিশেষ পুরুষ এবং সকল পুরুষের গুরু বা উপদেষ্টা। তাই তার আরাধনা করলে চিত্ত শান্ত হয়, তিনি প্রসন্ন হয়ে যোগসিদ্ধির উপযুক্ত অধিকার যোগীকে প্রদান করেন। ভক্তিপূর্ণ ঈশ্বরের আরাধনাই যোগীর রাগ, দ্বেষ, বাসনাকে দূর করে। তখন যোগী অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশ থেকে মুক্ত হয়; কর্ম, কর্মফল বিষয় তাঁর জ্ঞান জন্মায়। এই বিবেকজ্ঞানই যোগীকে সমাধিস্তরে পৌঁছে দেয়।

সূচক শব্দ : যোগ, ক্রিয়াযোগ, নিয়ম, ঈশ্বর, স্বধ্যায়

মূল আলোচনা (Discussion) :

সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়কে মুখ্য ও গৌণ ভেদে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যোগ দর্শনের প্রথম সূত্র – **"অথ যোগানুশাসনম্"**[1] -এর প্রতি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে,

1. যোগসূত্র ১/১
তর্কালংকার, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত, শ্রী গোপাল বসু মল্লিক-ফেলোশিপ প্রবন্ধ,খণ্ড-১, কলকাতা, শকাব্দঃ ১৮২২ মাঘ, পৃষ্ঠা-২১৪

যোগই হল যোগ দর্শনের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। আর প্রধানমহদহংকারাদি হল তার গৌণ প্রতিপাদ্য বিষয় বা অনুসঙ্গ বিষয়। যেহেতু আলম্বন বা বিষয় ছাড়া যোগ দর্শনের আলোচনা করা যায় না, তাই প্রধানমহদহংকারাদি-কে আলম্বন করে যোগকে আলোচনা করা হয়েছে। সাংখ্য ও যোগ সমানতন্ত্র দর্শন হলেও এই দুই দর্শনের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। তার মধ্যে মূল একটি পার্থক্য হল ঈশ্বরের ধারণা, সাংখ্য দর্শনে ঈশ্বরের ধারণা স্বীকার করা না হলেও, যোগ দর্শনে ঈশ্বরের ধারণাকে স্বীকার করা হয়েছে।

কিন্তু যোগ দর্শনের কেন ঈশ্বরের ধারণা স্বীকার করা হল? পতঞ্জলি বলেন, যেসকল পদার্থের মধ্যে যেমন পরিমাণের তারতম্য দেখতে পাওয়া যায়। এই তারতম্য কোন একটি স্থানে গিয়ে বিশ্রান্ত হয়। যেমন - একটি পদার্থের অপেক্ষা অপর একটি পদার্থ মহৎ হয়, আবার সেই পদার্থটির অপেক্ষা অন্য আরেকটি পদার্থ মহৎ হয়। কিন্তু আত্মাতে মহৎ পরিমাণের তারতম্য বিশ্রান্ত হয়। কেননা, আত্মা অপেক্ষা মহৎ কোন পদার্থ নাই। সেইরূপ জ্ঞানেরও তারতম্য দেখতে পাওয়া যায় এবং সেই তারতম্য কোন একটি স্থানে গিয়ে বিশ্রান্ত হয়। যেমন- রামের অপেক্ষা শ্যাম বেশি জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে, আবার শ্যাম অপেক্ষা যদু বেশি জ্ঞানের অধিকারী। এইরূপ যিনি সর্বজ্ঞ তিনি হলেন ঈশ্বর। তাই ঈশ্বরে গিয়ে জ্ঞানের তারতম্য বিশ্রান্ত হয়। এখন আমাদের জানতে হবে কিভাবে যোগ দর্শনে ঈশ্বরের ধারণাকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

যোগ দর্শনের সমগ্র অংশটাই যোগ-কথাই পরিপূর্ণ। এই শাস্ত্রে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে যোগ এবং যোগ সাধনার সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে আলোচনা করা হয়েছে। যোগ কি? এই প্রসঙ্গে বিশদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পতঞ্জলি তার দ্বিতীয় সূত্রে বলেছেন –

"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।।"১/ ২।।[2]

অর্থাৎ চিত্তের বৃত্তি-নিরোধের নাম যোগ। এই সূত্রে চারটি শব্দ রয়েছে — যোগ, চিত্ত, বৃত্তি এবং নিরোধ। যোগ শব্দটি 'যুজ্' ধাতু থেকে এসেছে; এর দুটি অর্থ আছে, একটি অর্থ হল সংযোগ হওয়া বা মিলিত হওয়া, অপর অর্থটি হল সমাধি। যোগদর্শনে যোগ শব্দের অর্থ সমাধিকে গ্রহণ করা হয়েছে। চিত্ত শব্দের অর্থ হল প্রকৃতির সাত্তিক পরিণাম, যার অপর নাম হল বুদ্ধি। আর এই বুদ্ধিতে অসংখ্য চিন্তাধারা নিরন্তন উত্থান-পতন বিস্তার হয়ে চলেছে তাকেই বৃত্তি বলে। আর নিরোধ শব্দের অর্থ হল অবস্থা বিশেষ। অর্থাৎ যেরূপ অবস্থা বিশেষে চিত্ত-বৃত্তি সমূহ আংশিক বা সম্পূর্ণ রূপে নিরুদ্ধ

---

2. যোগসূত্র ১/২
আরণ্য (শ্রীমৎ স্বামী) হরিহরানন্দ এবং শ্রীমদ্ ধর্মমেঘ আরণ্যও রায় যজ্ঞেশ্বর ঘোষ বাহাদুর কর্তৃক সম্পাদিত, কপিলাশ্রমীয়পাতঞ্জল যোগদর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, এপ্রিল, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-২৩

হয়ে যায়, সেই অবস্থা বিশেষের নাম যোগ। চিত্ত সত্ত্ব, রজঃ, তমো এই তিন গুণের স্বভাব হেতু প্রকাশশীল, প্রবৃত্তিশীল ও স্থিতিশীল হয়। আবার এই তিন গুণের তারতম্যের ফলেই চিত্ত বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। চিত্ত যখন তম গুণের দ্বারা অনুবিধ হয় তখন অজ্ঞান, বৈরাগ্য, অধর্ম, অনৈশ্বর্য ইত্যাদির বিষয়ের সাথে যুক্ত হয়। চিত্ত রজ গুণের দ্বারা অনুবিধ হলে মোহ, আবরণ প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়। আর যখন চিত্ত সত্ত্ব গুণের দ্বারা অনুবিধ হয় তখন জ্ঞান, বৈরাগ্য, ধর্ম, ঐশ্বর্য ইত্যাদি বিষয়ের সাথে যুক্ত হয়। আবার এই তিন গুণের তারতম্য অনুসারে চিত্ত নানারূপ অবস্থা গ্রহণ করে। চিত্তের বিভিন্ন অবস্থা বা স্তরকে চিত্তভূমি বলা হয়েছে। এই চিত্রভূমি পাঁচ প্রকার, যথা- ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। চিত্তের অসংখ্য বৃত্তি রয়েছে। কিন্তু চিত্তের যত প্রকার বৃত্তি থাকুক না কেন, তা এই পাঁচটি ভূমির কোনো একটি ভূমি বা স্তরে অবস্থান করবে। এই পাঁচ প্রকার চিত্তভূমির প্রত্যেক অবস্থাতেই স্বল্প পরিমাণে বৃত্তি নিরোধ ঘটিয়ে থাকে। যেমন- অনুরাগ দশাই ক্রোধ বৃত্তির নিরোধ ঘটায়, আবার ক্রোধ দশায় অনুরাগ বৃত্তির নিরোধ ঘটায়। অতএব বৃত্তি নিরোধ চিত্তের সর্বকালীন অবস্থাতেই তা সত্য। কিন্তু এই পাঁচ প্রকার চিত্রভূমিকেই যোগ বা সমাধির অবস্থা বলা যায় না। আত্মা বা পুরুষ যখন একান্ত ভাবে স্বরূপে অবস্থিত হয়, বা যে অবস্থায় ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয়ের সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটে সেই অবস্থায় যোগের অবস্থা। ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত ভূমিতে একান্তরূপে আত্মার স্বরূপের অবস্থান হয় না বলে এগুলিকে যোগের অবস্থা বলা যায় না। কেবলমাত্র একাগ্র ও নিরুদ্ধ ভূমিতেই আত্মা নিজস্বরূপে অবস্থান সম্ভব হয়, তাই এই দুটি ভূমিকেই যোগের অবস্থা বলা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হল যে, চিত্তবৃত্তি নিরোধের উপায় কি? বা কি উপায় অবলম্বন করলে চিত্তবৃত্তি নিরোধ সম্ভব হবে? এর উত্তর দিতে গিয়ে মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন -

"অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ।।"১/ ১২।।[3]

অর্থাৎ, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা এই সমুদ্বয় চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়ে থাকে। নদীর জলরাশি নির্দিষ্ট একই দিকে প্রবাহিত হতে পারে। কিন্তু চিত্তবৃত্তি নদীর স্রোতের মতো নির্দিষ্ট একটি দিকে প্রবাহিত হয় না। চিত্তাবৃত্তি সমান ভাবে উভয় দিকেই প্রবাহিত হতে পারে। এই চিত্তাবৃত্তির দুটি দিক হল- একটি প্রবৃত্তিমার্গ[4] অর্থাৎ যা পরম অকল্যাণকর,

---

3. যোগসূত্র ১/ ১২
আরণ্য (শ্রীমৎ স্বামী) হরিহরানন্দ এবং শ্রীমদ্ ধর্মমেঘ আরণ্যও রায় যজ্ঞেশ্বর ঘোষ বাহাদুর কর্তৃক সম্পাদিত, কপিলাশ্রমীয় পাতঞ্জল যোগদর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ, এপ্রিল, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-৪৪
4. যে ধর্ম অনুশীলনেরদ্বারা ইহলোক ও পরলোকে অধিকতর সুখ লাভ করা যায় তাই হল প্রবৃত্তিধর্ম।

আর অপরটি হল নিবৃত্তিমার্গ[5] অর্থাৎ যা পরম কল্যাণকর। যোগী ব্যক্তিরা প্রথমে বৈরাগ্যের[6] দ্বারা প্রবৃত্তি মার্গের প্রবাহকে বন্ধ করে এবং অভ্যাস অর্থাৎ বারংবার অনুশীলনের মাধ্যমে নিবৃত্তির পথটিকে প্রশস্ত করে। বৈরাগ্যের প্রচেষ্টার ফলে প্রবৃত্তির স্রোত যতই রুদ্ধ হয়, তেমনি অভ্যাসের ফলে নিবৃত্তির স্রোত প্রবল হয়। ফলে যোগী ব্যক্তি কৈবল্যের দিকে অগ্রসর হন। এখানে বৈরাগ্য ও অভ্যাস উভয়কে একত্রে চিত্তবৃত্তি নিরোধের উপায় বলা হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন –

"যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা।।" ৬/১৮।।[7]

অর্থাৎ যোগী যখন অনুশীলনের দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ করেন এবং সমস্ত জড় বিষয়ের কামনা- বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে আত্মাতে অবস্থান করেন, তখন তিনি যোগযুক্ত হয়েছেন বলা হয়।

এখন প্রশ্ন ওঠে, অভ্যাস বলতে কি বোঝানো হয়েছে? এর উত্তরে মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন –

"তত্র স্থিতৌ যত্নোঅভ্যাসঃ।।" ১/১৩।।[8]

---

5. যে ধর্ম অনুশীলনের দ্বারা নির্বাণ বা কৈবল্য বা চিরমুক্তি বা চিরশান্তি লাভ করা যায় তাই হল নিবৃত্তিধর্ম।
6. প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বিষয় ও অপ্রত্যক্ষগ্রাহ্য বিষয়ের প্রতি ব্যক্তির যে তৃষ্ণা বা ভোগবিলাসের অভাবই হল বৈরাগ্য। চিত্ত সর্বদা চঞ্চল থাকার কারণে একটি বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য জন্মালেও চিত্তে অপর একটি বিষয়ের প্রতি তৃষ্ণা জন্মায়, তাই সকল বিষয়ের প্রতি তৃষ্ণা নিবারণের জন্য যম-নিয়মাদির অভ্যাস প্রয়োজনীয়।
   শীল রূপ গোস্বামীপাদ কৃষ্ণভাবনামৃতের ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

   "অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথাহমুপযুঞ্জতঃ।
   নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।।
   প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
   মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।।"

   অর্থাৎ, বিষয়ের প্রতি আসক্তিশূন্য হয়ে এবং ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে নির্বন্ধ করে ভগবানের সেবার অনুকূল বিষয়টুকু গ্রহণ করাকেই বলা হয় যুক্তবৈরাগ্য। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে জীবের সম্পর্কের কথা না জেনে যে সব কিছু পরিত্যাগ করে, তার বৈরাগ্য কখনই পূর্ণ নয়। — ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব ২/২৫৫-২৫৬

   স্বামী, শ্রীমৎ ভক্তিচারু অনুবাদিত, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ভক্তি বেদান্ত বুক ট্রাস্ট, শ্রী মায়াপুর ধাম, নদীয়া, ১৬ তম সংস্কার মার্চ, ২০১৮, পৃষ্ঠা-২৮৮
7. স্বামী, শ্রীমৎ ভক্তিচারু অনুবাদিত, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ভক্তি বেদান্ত বুক ট্রাস্ট, শ্রী মায়াপুর ধাম, নদীয়া, ১৬ তম সংস্কার মার্চ, ২০১৮, পৃষ্ঠা-২৯৫

অর্থাৎ, চিত্তের স্থিরতা সম্পাদনার্থে যে, যমনিয়মাদি সাধন সম্পাদন বিষয়ের যত্ন অর্থাৎ পুনঃপুন চেষ্টা তাকেই অভ্যাস বলা হয়েছে। চিত্তে রাজসিক ও তামসিক বৃত্তিপ্রবাহ বেশি পরিমাণে থাকলে সাত্ত্বিক বৃত্তিগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে, এবং চিত্তে মোহ ও বিক্ষেপের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। ফলে চিত্তনিরোধ সম্ভব হয় না। তাই যোগসিদ্ধিও সম্ভব হয় না। এইজন্য যোগাভিলাষী পুরুষকে চিত্তের স্থিরতা সম্পাদনের জন্য দীর্ঘকাল অবিচ্ছেদ্য ভাবে যমনিয়মাদি অনুশীলন করতে হবে। এইরূপ নিরন্তন যত্নের ফলে চিত্তে রাজসিক ও তামসিক বৃত্তি প্রবাহক্ষিণ হয়ে যাবে ও সাত্ত্বিক বৃত্তি ধারা প্রবাহিত হবে এবং যোগসিদ্ধি সম্ভব হবে। যোগদর্শনে এইরূপ প্রযত্নকেই অভ্যাস বলা হয়েছে। অর্থাৎ তিন গুণের তারতম্যের কারণে চিত্ত চঞ্চল অবস্থায় থাকে। চিত্তের একাগ্রতা প্রতিস্থাপনের জন্য যে সকল যত্ন নেওয়া দরকার তাকেই অভ্যাস বলা হয়েছে। আর চিত্তের একাগ্রতা প্রতিস্থাপনের জন্য যমনিয়মাদি যোগাঙ্গের অভ্যাসের কথা বলা হয়েছে।

সুতরাং পূর্বের আলোচনা অনুসারে চিত্তবৃত্তি নিরোধ বা যোগসিদ্ধির জন্য যমনিয়মাদি সাধনের অভ্যাস অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ যোগের অনুশীলন আবশ্যক। আর এই অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বিতীয় যোগটি হল নিয়ম। 'নিয়ম বলতে বোঝায় নিয়মিত ব্রতপালন অভ্যাস। এই নিয়ম পাঁচ প্রকার, যথা- শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান।'[9] শৌচ দুই প্রকার। এক বাহ্য শৌচ, যেমন প্রাত্যহিক স্নান, আহার ইত্যাদি এবং অপরটি হল আন্তর শৌচ, যেমন- কাম, ক্রোধ, লোভ, প্রভৃতি থেকে মুক্ত হয়ে চিত্তের শুদ্ধি। সন্তোষ হল প্রাপ্ত বিষয়ের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। তপস্যা হল ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, উষ্ণাদি প্রভৃতি সহ্য করা অথবা ইন্দ্রিয়কে সংযত করা। স্বাধ্যায় বলতে প্রণব বা ওঁকারের জপ অথবা আধ্যাত্ম শাস্ত্র অধ্যায়নকে বোঝানো হয়েছে। ঈশ্বর প্রণিধান বলতে ঈশ্বরের চিন্তা, সকল কর্ম ও কর্মফল ঈশ্বরের সমর্পণ করা এবং ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বিশেষকে বোঝানো হয়ে থাকে।

এই পাঁচ প্রকার নিয়মের মধ্যে আবার তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান–এই তিনটিকে একত্রে ক্রিয়াযোগ বলা হয়েছে। যে সকল ব্যক্তির চিত্ত সর্বদা চঞ্চল, তাদের পক্ষে সর্ব প্রথমে জ্ঞানযোগের মাধ্যমে যোগসাধন বা যোগসিদ্ধি সম্ভব হয় না। তাই তারা এই ক্রিয়া যোগের মাধ্যমে চিত্তকে স্থির করবে এবং উন্নততর সাধনপথ অবলম্বন করে যোগসিদ্ধির দিকে অগ্রসর হবেন। চিত্তের জ্ঞান প্রতিবন্ধক দোষ তিন প্রকার, যথা— মল, বিক্ষেপ ও আবরণ। তার মধ্যে মলদোষ হল — রাগ, দ্বেষ ও তন্মলক বাসনা; বিক্ষেপ দোষ হল— রজোগুণের প্রবণতা জনিত চিত্রের চাঞ্চল্য; আর আবরণ দোষ হল– অবিজ্ঞা বা ভ্রান্তিজ্ঞান। ক্রিয়াযোগ দ্বারা মলদোষ, ধ্যানযোগ দ্বারা

---

8. সাংখ্য-বেদান্ততীর্থেণ, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ, শ্রী গোপাল বসু মল্লিক-ফেলোশিপ প্রবন্ধ,খণ্ড-৩, শ্রী সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা ১৩৩৩, পৃষ্ঠা-১৩৪
9. "শৌচ- সন্তোষ-তপঃ-স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মঃ।।" ২/৩২।। যোগসূত্র

বিক্ষেপদোষ, আর বিবেক জ্ঞান দ্বারা আবরণ দোষ নিবারণ হয়। মলদোষ নিবারণের জন্য ক্রিয়াযোগ অবলম্বন করা প্রাথমিক যোগীর পক্ষে বিশেষ ভাবে উপযোগী। আর এই ক্রিয়া যোগের মাধ্যমে ব্যক্তির অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশ দূরীভূত হলে তার চিত্তে বিবেক জ্ঞানের উদয় হয় এবং তখন ব্যক্তি সমাধির প্রতি অভিলাষী হয়। ফলেযোগী ব্যক্তি ক্রমশ কৈবল্যের দিকে অগ্রসর হন বা কৈবল্যলাভ করেন। তাই মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন–

"যোগাঙ্গনুষ্ঠানাদবিশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিবা বিবেকখ্যাতে।।" ২/২৮।।[10]

অর্থাৎ বারংবার যোগাঙ্গ অনুষ্ঠান করার ফলে ব্যক্তির চিত্ত থেকে তিন প্রকারের জ্ঞান প্রতিবন্ধক দোষ দূর হয়। মন বিশুদ্ধ ফটিক ন্যায় স্বচ্ছ ও প্রকাশময় হয়। বিশুদ্ধ চিত্তে জ্ঞানদীপ্তির প্রকাশমানের শেষসীমা হল বিবেকখ্যাত, ব্যক্তি ক্রিয়াযোগ ও বিবেকজ্ঞানের মাধ্যমে যোগাঙ্গের মূল অঙ্গ যোগ বা সমাধিতে লিপ্ত হন।

এখন প্রশ্ন হল, যোগাঙ্গে ঈশ্বর স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, যোগসিদ্ধিতে যেমন অভ্যাস ও বৈরাগ্য অনুকূল উপায়, তেমনই শীঘ্র যোগসিদ্ধির জন্য সহজ ও সুলভ্য অপর আরেকটি বিষয় রয়েছে, যেটি অনুসরণ করলে যোগীকে আর অন্য কারোর সাহায্য নিতে হয় না এবং সহজেই যোগসিদ্ধি হয়, সেই উপায়টি হল ঈশ্বরের প্রতি মনোনিবেশ বা ঈশ্বর প্রণিধান। ঈশ্বর প্রণিধান অর্থ– ভক্তি সহকারে ঈশ্বরের আরাধনা বা উপাসনা। ভক্তি সহযোগে আরাধনা করিলে ঈশ্বর তার প্রতি প্রসন্ন হন, এবং অনুগ্রহ করেন, ফলে উপাসকের হৃদয়গত সমস্ত পাপ ধুয়ে যায়, এবং ঈশ্বর যোগীকে যোগসিদ্ধির উপযুক্ত অধিকার প্রদান করেন। ভগবান্ বলিয়াছেন –

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।।" ১০/১০ শ্রীমদ্ভগবদগীতা

অর্থাৎ, ঈশ্বর পরায়ণতার ফলে ঈশ্বরানুগ্রহলাভ ও জ্ঞানযোগে অধিকার প্রাপ্তি হয়। অতএব মনে হয়, ঈশ্বরারাধনাই যে চিত্তবৃত্তি-নিরোধাত্মক সমাধিসিদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায়, এ বিষয়ে মতভেদ খুব অল্প লোকেরই আছে। তাই যারা একান্ত চিত্তে ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তারা অতি অল্প কালের মধ্যেই অভীষ্ট যোগফল প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। তাই যোগ দর্শনে সূত্রকার ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন এবং ঈশ্বরের স্বরূপ ও স্বভাবাদির জ্ঞান না থাকলে ঈশ্বরের প্রতি মনোনিবেশ করা যায় না বলে, ঈশ্বরের স্বরূপ ও স্বভাবাদির ব্যাখ্যা করে বলেছেন–

"ক্লেশ-কর্ম্ম–বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।।

---

10. যোগসূত্র ২/২৮
আরণ্য (শ্রীমৎ স্বামী) হরিহরানন্দ এবং শ্রীমদ্ ধর্মমেঘ আরণ্যও রায় যজ্ঞেশ্বর ঘোষ বাহাদুর কর্তৃক সম্পাদিত, কপিলাশ্রমীয় পাতঞ্জল যোগদর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ, এপ্রিল, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-১৮০

তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞ-বীজ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।।" ১/২৪-২৫।।[11]

ক্লেশ, কর্ম, বিপাক, আশয়বিমুক্ত, যা তাকে স্পর্শ করতে পারে না, সেই বিশেষ পুরুষই হলেন ঈশ্বর। ঈশ্বরের নিরাতিশয় জ্ঞান থাকায় তিনি সর্বজ্ঞ। পাঁচ প্রকার ক্লেশ, যথা- অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। কর্ম্ম দুই প্রকার — ধর্ম ও অধর্ম্ম। বিপাকবা কর্ম্মফল তিন প্রকার — জন্ম, আয়ুঃ ও সুখ-দুঃখাদি ভোগ। আশয় বা বাসনা হল পূর্ধ্ববতন কর্মফলের সংস্কার। ঈশ্বর হলেন পুরুষ, কিন্তু তিনি সাধারণ জীবগণের ন্যায় আলোচ্য পুরুষের থেকে ভিন্ন। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, সাধারণ জীব পুরুষগণ পূর্বেবাক্ত অবিদ্যাদি পঞ্চবিধ ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয়ের সঙ্গে একেবারে সম্বন্ধ শূন্য নই; কোন না কোন সময়ে ক্লেশাদির সহিত সম্বন্ধযুক্ত থাকেই, কিন্তু ঈশ্বর পুরুষ তার সম্পূর্ণ বিপরীত, ঈশ্বরে ক্লেশ ও কর্ম্মাদি-সম্বন্ধ কখনই ছিল না, ভবিষ্যতেও হবে না, এবং বর্তমানেও নেই। মুক্ত জীবগণের বর্তমান কালে ক্লেশাদি-সম্পর্ক না থাকলেও পূর্বের ছিল; আর প্রকৃতিলীন জীবগণের ক্লেশাদি-সম্বন্ধ পূর্ব্ব ও পর উভয় কালেই অক্ষুণ্ন থাকে; ঈশ্বরে কিন্তু তিন কালেই তার সম্পূর্ণ অভাব থাকে। এটিই হল সাধারণ জীবপুরুষ অপেক্ষা ঈশ্বরের বিশেষত্ব। তাই ঈশ্বরকে শুধু পুরুষ না বলে 'পুরুষবিশেষ' বলা হয়েছে। ঈশ্বর হলেন নিত্য, অনাদি, অনন্ত, ঐশ্বর্য নিরতিশয় ও সাম্যাতিশয়শূন্য। তাছাড়া অপরিসীম জ্ঞানশক্তিও সাধারণ জীবের থেকে ঈশ্বরের বিশিষ্টতা জ্ঞাপন করে। কেননা, ব্যবহার-জগতে জ্ঞান মাত্রেরই ন্যূনাধিকভাব পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ আত্মা বা ব্যক্তি অল্পজ্ঞ, অধিকজ্ঞ হতে পারে, কিন্তু কখনোই সর্বজ্ঞ হতে পারে না, কেবলমাত্র ঈশ্বরই হলেন সর্বজ্ঞ আত্মা। জ্ঞানের সেই ন্যূনাধিকভাব বা জ্ঞানের তারতম্য ঈশ্বরে পরিসমাপ্ত হয়। তাই সেই অপরিসীম জ্ঞানের প্রভাবেই ঈশ্বর সর্ববজ্ঞতা লাভ করেছেন।

সাধারণ পুরুষ অবিদ্যাদি ক্লেশের অধীন, শুভাশুভ কর্ম্মজনিত পুণ্য পাপের অধিকারী, এবং কর্ম্মানুযায়ী জন্ম, জীবন ও ভোগের ক্রীত দাস, অধিকন্তু পূর্ববসঞ্চিত আশয় বা বাসনা দ্বারা নিয়ত পরিচালিত হয়, কিন্তু ঈশ্বরের স্বভাব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি অনন্ত জ্ঞানের আকর, তাই তিনি সর্ব্বজ্ঞ। সুতরাং ঈশ্বরের মধ্যে ভ্রান্তি জ্ঞানময় অবিদ্যাদি প্রভৃতি ক্লেশের অবস্থিতি কখনোই সম্ভবপর হয় না। অতএব ঈশ্বর ও সাধারণ জীব স্বরূপতঃ একজাতীয় পুরুষ হলেও, ঈশ্বর নিত্যশুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত, এবং চিরকালই জীবসুলভ দোষরাশি দ্বারা অসংস্পৃষ্ট। এই কারণে সূত্রকর্ত্রা ঈশ্বরকে আদিগুরুর পদে অভিষিক্ত করিয়া বলিয়াছেন—

"স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছোৎ।।" ১/ ২৬।।[12]

---

11. যোগসূত্র—**১/ ২৪-২৫**
বেদান্তবাগীশ, শ্রীকালীবর কর্তৃক সংকলিত ও অনুবাদিত, পাতঞ্জল দর্শন ও যোগ-পরিশিষ্ট, ভিক্টোরিয়া প্রেস, কলকাতা, ১২৯১, পৃষ্ঠা-৫৭-৫৮

অর্থাৎ জগতে ব্রহ্মাদি যাঁরা আদিগুরু বলে প্রসিদ্ধ, ঈশ্বর তাদেরও গুরু বা উপদেষ্টা। কেননা, ব্রহ্মাদি সকলেই আদিপুরুষ হলেও, তাঁরা অপরাপর জীবের ন্যায় উৎপত্তিশীল বলে তাঁরাও নিত্য নয়, তাই তাঁদের জন্ম ও বিনাশ আছে। আর তাঁরা নিত্য না হলে, তাঁদের জ্ঞানও নিত্য হতে পারে না, তাই তাদের জ্ঞান আগন্তুক। অপর দিকে ঈশ্বর যেহেতু সর্বজ্ঞ, নিত্যজ্ঞান সম্পন্ন; তাই ঈশ্বরই হলেন ব্রহ্মাদি সকল আদিপুরুষের উপদেষ্টা। নিত্য সিদ্ধ ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রভাবেই ব্রহ্মাদি সকল আদিগুরু দিব্য জ্ঞানের অধিকারী হন। তাই যোগসিদ্ধির জন্য মুমুক্ষ ব্যক্তিরাও ঈশ্বরের আরাধনায় তৎপর হন।

ঈশ্বরের আরাধনা করতে হলে তাঁর নাম-মন্ত্রাদির জ্ঞান থাকা আবশ্যক, তা না হলে ঈশ্বরের উপাসনা করা যায় না। তাই সূত্রাকার প্রথম পাদের ২৭নং সুত্রে বলেছেন—**"তস্য বাচকঃ প্রণব।।"**[13] অর্থাৎ, তাঁকে প্রণব বা ওম বলা যায়। উদাহরণের মাধ্যমে বলা যায়, কোন এক ব্যক্তির একাধিক নাম থাকলেও, সেই ব্যক্তির সকল নামই প্রিয় হয় না, নির্দিষ্ট কোন একটি নামই তার প্রিয় হয়। আর সেই নামে তাকে সম্বোধন করলে সে খুশি হয়। ঠিক একই ভাবে ঈশ্বরেরও অসংখ্য নাম রয়েছে। আর ঈশ্বরের যে কোনো একটি নামেই তাঁর উপাসনা করা যেতে পারে। কিন্তু তাঁর আশুপ্রীতি সম্পাদনের জন্য নির্দিষ্ট একটি বিশেষ নাম রয়েছে। কারণ, ঈশ্বরের সঙ্গে প্রণবের যে, বাচ্য-বাচক ভাব সম্বন্ধ, তা অনাদিসিদ্ধ; ওঙ্কার শব্দটি এমন একটি শব্দ যা সাধক উচ্চারণ করলে তার চিত্তে ঈশ্বরভাব জাগ্রত হয়, ব্যক্তি বিশেষের সংকেতকৃত নহে; এই বিশিষ্টতাটী অপর কোন নামেই নেই; তাই প্রণব নাম তাঁর এত প্রিয়। সেই প্রিয় নামে সম্বোধন করলে বা আরাধনা করলে তিনি সহজেই সন্তুষ্ট হন, এবং সন্তুষ্ট হয়ে আরাধকের যোগসিদ্ধির সহায়তা করেন। তাঁর সহায়তা লাভ করলে জগতে কোনো ব্যক্তিকেই ফল লাভ থেকে বঞ্চিত হতে হয় না। এই জন্যই সূত্রকার যোগসিদ্ধির বা চিত্তবৃত্তি নিরোধের সহজ উপায়রূপে প্রণবের উল্লেখ করিয়াছেন।

যোগসিদ্ধিকামী ব্যক্তিকে 'প্রণব' মন্ত্রের জপ করিতে হবে ও সঙ্গে সঙ্গে প্রণবার্থ পরমেশ্বর বিষয়ে চিন্তা করতে হবে। এইরূপ ভাবনা করতে করতে যোগীর চিত্ত একাগ্রতা সম্পন্ন হবে। ঈশ্বরের ধারণাকে আমরা দুই ভাবে করতে পারি। এক বাহ্যভাব অর্থাৎ রূপাদিযুক্ত সত্তারূপে এবং আন্তর্ভাব অর্থাৎ অন্তর্যামী ঈশ্বরের ধারণা রূপে।

---

12. যোগসূত্র ১/ ২৬
আরণ্য (শ্রীমৎ স্বামী) হরিহরানন্দ এবং শ্রীমদ্ ধর্মমেঘ আরণ্যও রায় যজ্ঞেশ্বর ঘোষ বাহাদুর কর্তৃক সম্পাদিত, কপিলাশ্রমীয় পাতঞ্জল যোগদর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ, এপ্রিল, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-৭২
13. যোগসূত্র ১/ ২৭
সাংখ্য-বেদান্ততীর্থেণ, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ, শ্রী গোপাল বসু মল্লিক-ফেলোশিপ প্রবন্ধ,খণ্ড-৩, শ্রী সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা ১৩৩৩, পৃষ্ঠা-১৪৩

ঈশ্বরের বাহ্য ভাবনা যেহেতু গ্রহণ, গ্রহীতা ও গ্রাহ্য—এই তিন জাতীয় তত্ত্বের অন্তর্গত হয়ে পরে, তাই অন্তর্যামী রূপে ঈশ্বরের ভাবনাকে গ্রহণ করা হয়েছে। তাই ভক্তিপূর্ণ ভাবে সেই প্রণব বা ঈশ্বরের - জপ ও প্রণবার্থ ভাবনাকেই ঈশ্বর প্রণিধান বলা হয়েছে। ঈশ্বর প্রণিধানের ফলে যোগীর আত্ম-চৈতন্য প্রত্যক্ষগোচর হয়, এবং যোগ সাধনার প্রবল প্রতিপক্ষ চিত্ত বিক্ষেপকর বিঘ্নসমূহ বিধ্বস্ত করে সমাধি স্তরে পৌঁছায়।

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, যোগ বা সমাধির স্তরকে আরো সহজ ও সরল করার জন্য, যোগী ব্যক্তিকে কৈবল্যলাভের জন্য যাতে দীর্ঘপথ অবলম্বন না করতে হয়, শীঘ্রই সমাধি স্তরে উপনীত হতে পারে এবং সহজেই চিত্ত স্থির বা একাগ্র করতে পারে তাই যোগ দর্শনে সাংখ্যতত্ত্ব অতিরিক্ত ভাবে ঈশ্বরকে স্বীকার করা হয়েছে। আর স্বাধ্যায় বা প্রণব অর্থের ভাবনাপূর্বক জপেব দ্বারা চিত্তকে একাগ্র করার কথা বা উপদেশ দেওয়া হয়েছে। চিত্ত একাগ্র হলে জপ বা মন্ত্রের সূক্ষ্মতর অর্থের অধিগম হবে। সেই সূক্ষ্মতর ভাবনাপূর্বক পুনঃপুন জপ করতে থাকলে, এইরূপে স্বাধ্যায় হতে যোগ, আবার যোগ হতে স্বাধ্যায় বিবর্ধিত হয়ে প্রকৃষ্ট যোগকে নিষ্পাদিত করবে। আর এই যোগ বা সমাধিই যোগীকে কৈবল্য প্রতিপাদন করবে।

গ্রন্থপঞ্জী:

১. আরণ্য (শ্রীমৎ স্বামী) হরিহরানন্দ এবং শ্রীমদ্ ধর্মমেঘ আরণ্যও রায় যজ্ঞেশ্বর ঘোষ বাহাদুর কর্তৃক সম্পাদিত, কপিলাশ্রমীয় পাতঞ্জল যোগদর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ, এপ্রিল, ১৯৮৮।

২. বেদান্তবাগীশ, শ্রীকালীবর কর্তৃক সংকলিত ও অনুবাদিত, পাতঞ্জল দর্শন ও যোগ-পরিশিষ্ট, ভিক্টোরিয়া প্রেস, কলকাতা, ১২৯১।

৩. সাংখ্য-বেদান্ততীর্থেণ, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ, শ্রী গোপাল বসু মল্লিক-ফেলোশিপ প্রবন্ধ,খণ্ড-৩, শ্রী সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা ১৩৩৩।

৪. তর্কালংকার, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত, শ্রী গোপাল বসু মল্লিক-ফেলোশিপ প্রবন্ধ, খণ্ড-১, কলকাতা, শকাব্দঃ ১৮২২ মাঘ।

৫. স্বামী, ভর্গানন্দ কর্তৃক অনূদিত, পাতঞ্জল যোগদর্শন, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০২০।

৬. স্বামী, অভেদানন্দ, যোগদর্শন ও যোগসাধনা, বেদান্তমঠ, কলকাতা, ২০১৬।

৭. শাস্ত্রী, ভট্টাচার্য, শ্রী দীনেশচন্দ্র, ষড়দর্শন : যোগ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, সেপ্টেম্বর, ২০০৬।

৮. বন্দোপাধ্যায়, কনকপ্রভা, সাংখ্য-পাতঞ্জল দর্শন, সাহিত্য সংস্থা, কলকাতা, ১৯৬১।

৯. মাধবাচার্য, সর্বদর্শন সংগ্রহ,খণ্ড-১, সত্যজ্যোতিঃ চক্রবর্তী অনুবাদিত, সাহিত্যশ্রী কলকাতা ১৩৫১।

১০. রাধাকৃষ্ণাণ, সর্বপল্লী, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, খণ্ড-এক, ভাগ-দুই, এম. সি. সরকার এন্ড সান্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১২ই আশ্বিন, ১৩৬৬।

১১. বসু, রনদীপম, ইয়োগা সুস্থতায় যোগচর্চা, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।

১২. বসু, রনদীপম, ভারতীয় দর্শন, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১০।

১৩. ইন্দ্রানী স্যান্যাল ও রত্না দত্ত শর্মা সম্পাদিত, ধর্মনীতি ও শ্রুতি, 'পাতঞ্জলীয় যোগদর্শনে নৈতিকতার পরিচয়', সুস্মিতা সাহা অনুবাদিত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগে মহাবধি বুক এজেন্সি, ১৪১৫।

১৪. স্বামী, শ্রীমৎ ভক্তিচারু অনুবাদিত, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ভক্তি বেদান্ত বুক ট্রাস্ট, শ্রী মায়াপুর ধাম, নদীয়া, ১৬ তম সংস্কার মার্চ, ২০১৮।

১৫. Dasgupta, S. N., Yoga Philosophy, University of Calcutta, 1930.

১৬. Chatterjee S. C. & Dutta, Dhirendra Mohan, An Introduction To Indian Philosophy, Motilal Banarsi Dass, Delhi, 2004.

১৭. Sharma, C. D., A Critical Survey Of Indian Philosophy, Motilal Banarsi Dass, Delhi, 2006.

১৮. Dasgupta, S. N., A History of Indian Philosophy, Vol. I, Motilal Banarsi Dass, Delhi, 2006.

উনিশ – বিশ শতকের বাংলা নাটকে প্রতিফলিত মহাভারতের কর্ণ চরিত্র

সৌরভ সামন্ত
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস রচিত প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের বৃহত্তম গ্রন্থ মহাভারত-এ বহু চরিত্রের বৈচিত্র দেখা যায়। সেই বৈচিত্র্যময় চরিত্রগুলির যে যে গুণাবলী একবাক্যে আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তা হল বীরত্ব, মহত্ব, সাহসিকতা। এমনই এক বীর, সাহসী ও ট্র্যাজিক চরিত্র হলেন কুন্তীপুত্র কর্ণ। কুন্তীভোজের রাজকুমারী পৃথা যৌবনকালে দুর্বাসা মুনির প্রদত্ত আশিসে পুত্রেষ্টি মন্ত্র প্রাপ্ত হন। এই মন্ত্র বলে সূর্যদেবতাকে আহবান করে কুমারী পৃথা সূর্য সম্ভবা দীপ্তিময় কানীন পুত্র সন্তান কর্ণের জন্ম দেন। কিন্তু দেবোপম এই পুত্রের জন্মে কোন আনন্দ-উৎসব হয়নি, কোন মঙ্গল শঙ্খ বাজে নি। বিশেষত নিজের ও নিজের পিতার সামাজিক সম্মান রক্ষার্থে কুন্তী সদ্যজাত শিশুপুত্রকে ধাত্রীর সহায়তায় বেতের পেটিকায় ভাসিয়ে দিলেন অশ্বনদীর জলে। সুদূর হস্তিনাপুরের নিকটস্থ চম্পা পুরীতে ভীষ্মের রথের সারথী অধিরথ ও তাঁর পত্নী রাধা এই দিব্য শিশুটিকে পেয়ে পুত্র-স্নেহে পালন করেন। তাই তিনি কৌন্তেয় নন রাধেয়। অধিরথ পুত্রের নাম রাখেন বৃষসেন। বাল্যকাল থেকেই কর্ণ ধনুর্বিদ্যায় আগ্রহী ছিলেন। মহাভারতে কর্ণকে অর্জুনের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ধনুর্ধর হিসাবে চিত্রিত করা হলেও তাঁর চারিত্রিক মহত্বের কথা যেন তেমনভাবে উল্লিখিত হয়নি বরং বেশ ম্লান, নিষ্প্রভই থেকে গেছে।

তথাপি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় চরিত্র কর্ণ। 'দানবীর' হিসাবে পরিচিত কর্ণ দানে অকুণ্ঠহস্ত। আমাদের বাঙালির সমাজ জীবনে 'দাতাকর্ণ' একটি বহুল পরিচিত প্রবাদবাক্য। কর্ণ চরিত্রের বীরত্ব নয়, তাঁর পরম দানশীল চরিত্রই উপজীব্য **হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'দাতাকর্ণ'** নাটকটিতে। মূল মহাভারতের অনুবাদে কথিত আছে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে স্বর্গরাজ ইন্দ্র কর্ণের সূর্য উপাসনার সময় ব্রাহ্মণ বেশে উপস্থিত হয়ে ভিক্ষা স্বরূপ তাঁর কবচকুণ্ডল প্রার্থনা করলে সত্য রক্ষার্থে কর্ণ তা ইন্দ্রদেবকে দান করেন। তবে কর্ণ সূর্যের পরামর্শে অর্জুনকে হত্যা করার জন্য ইন্দ্রের কাছ থেকে একাগ্নি বাণ প্রার্থনা করেন। আবার অনেক গ্রন্থে এমন তথ্যও পাওয়া যায় যে শ্রীকৃষ্ণ কর্ণের প্রতিজ্ঞা ও দানশীলতার পরীক্ষা নেবার জন্য ব্রাহ্মণ ছদ্মবেশ ধারণ করে কর্ণের নিকট গিয়ে পুত্র বৃষকেতুর মাংস ভক্ষণ করতে চান। কর্ণ প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে বৃষকেতুকে হত্যা করে ব্রাহ্মণ ছদ্মবেশি কৃষ্ণকে আহার করতে দেন। কৃষ্ণ কর্ণের এই ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তাঁর সন্তানের জীবন দান করেন। এই দুই কাহিনিরই মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন নাট্যকার হরিপদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'দাতাকর্ণ' নাটকটিতে। নাটকের শুরুতেই ইন্দ্র

কর্তৃক কবচকুণ্ডল গ্রহণের ঘটনাকে স্থান দিয়েছেন নাট্যকার। আর দানবীর কর্ণের মহত্ব প্রকাশের নিমিত্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ ছদ্মবেশে অঙ্গরাজ্যে গমন করে কর্ণপুত্র বৃষকেতুর মাংস ভক্ষণের প্রার্থনা করেন। আর কৃষ্ণ নানা বাক্যালাপে কর্ণকে তাঁর প্রতিজ্ঞাচ্যুত করতে প্রয়াসী হন এমনকি সুস্পষ্ট বাক্যে কর্ণকে তাঁর 'প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ' করতেও বলেন। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা রক্ষাই কর্ণের জীবনের একমাত্র অভিপ্রায়। 'হয় প্রতিজ্ঞারক্ষা, নয় মৃত্যু'--- এটাই তাঁর আজীবন সংকল্প। পার্থিব ধন- মান, আত্মীয়-পরিজন কোন কিছুতেই তাঁর মোহ নেই। সে যা কিছু নিজের বলে জানে তা দান করাকে পরম সৌভাগ্য বলে মনে করে। ব্যথিত পিতৃহৃদয়েও কর্ণ বিনয়ী, শান্ত, অচঞ্চল এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সাত রাজার ধন সম সন্তান শুধু নয়, রাজ্যসহ নিজ জীবন দানেও সে অকুতোভয়। ভিক্ষুককে দান করা যে তাঁর জীবন-মরণ পণ ---

অঙ্গীকৃত বাক্য করিব পালন।
পুত্র মাংস করায়ে ভোজন,
মুক্ত হব ঘোর সত্য পাশ হতে।[১]

জীবনের সত্য রক্ষার্থে কর্ণ নিজের পুত্রের প্রতিও নিষ্ঠুর। তাঁর ধর্মপথের বিরুদ্ধাচারণ করে জ্যেষ্ঠ পুত্র বৃষসেন তাঁর কাছে শত্রুসম। বৃষসেন তাঁর ধর্মাচারে বাধা দিলে তাঁকে কারারুদ্ধ করেন ; এমনকি অস্ত্র ধারণ করে তাঁর রক্তক্ষয়েও পিছুপা হয় না। কিন্তু রাজ্যবাসী সহ স্ত্রী-পুত্রের বিরোধিতায় কর্ণ তাঁর প্রতিজ্ঞা পূরণের ব্যর্থতায় আত্মগ্লানিতে জর্জরিত। তাঁর এই প্রতিজ্ঞা রক্ষায় সে একা ; তাঁর এই নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্যই একে একে সবাই কর্ণকে ত্যাগ করে কিন্তু কর্ণের অবিচল সিদ্ধান্ত---

কিন্তু আমাকে সত্য পালন কর্ত্তেই হবে।[২]

শেষপর্যন্ত সমস্ত দোলাচলতা কাটিয়ে নিঃসঙ্গ কর্ণ তাঁর সত্যরক্ষার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। তারপর তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে ব্যথাতুর পিতৃহৃদয়ের হাহাকার---

আমি পিশাচ, আমি পিতা হয়ে স্বহস্তে বাছার শিরশ্ছেদন করেছি।
আমি পিশাচ। হাঃ হাঃ ! (হাস্য)[৩]

সেই হাহাকারকে গোপন করে, ব্যাথার আগুনে হৃদয়কে দহন করে কর্ণ ব্রাহ্মণের শেষ আদেশ -পুত্রমাংস ভক্ষণেও সম্মত হয়। আর তখনই ব্রাহ্মণবেশি কৃষ্ণ তাঁর আসল পরিচয় জ্ঞাপন করে ঘোষণা করেন---

আপনার এই 'দাতাকর্ণ' নাম জ্বলন্ত অক্ষরে ভারতের গৃহে গৃহে
খোদিত থাকবে।[৪]

শুধু শ্রীকৃষ্ণ নয়, দেবরাজ ইন্দ্রও স্বীকার করেন কর্ণের এই দানশীল মহিমা। সমগ্র নাটকে কর্ণ তাঁর এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে গিয়ে বারবার মানসিক দোলাচলতা ও দ্বন্দ্বের শিকার হয়েছে। এই ব্যাথাতুর হৃদয়ের দ্বন্দ্বেই কর্ণ রক্ত মাংসের জীবন্ত এক চরিত্রে পরিণত হয়েছেন।

বাংলা সাহিত্যে কর্ণ চরিত্র শুধু তাঁর বীরত্বের জন্য নয়, তাঁর ভাগ্যহত জীবনের জন্যও যে সমান জনপ্রিয় তাঁর পূর্ণাঙ্গ রূপটি আমরা প্রথম পেলাম **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের**

'কাহিনী' গ্রন্থের অন্তর্গত **"কর্ণ-কুন্তী সংবাদ"** (১৩০৬ বঙ্গাব্দ) কাব্যনাট্যে। গ্রিক ট্রাজেডির নিয়তিতাড়িত নায়কদের মতোই তিনি ঐশ্বর্য মন্ডিত। তাই উনিশ শতকের রেনেসাঁসের শেষ পর্বে কৃষ্ণ বা অর্জুন বা যুধিষ্ঠির নয়, কর্ণ হয়ে উঠলেন নায়ক। মহাভারতের উদ্যোগপর্বে কুন্তী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগের দিন সন্ধ্যায় কর্ণ ও কুন্তীর সাক্ষাৎপর্বটি আলোচ্য কাব্যনাট্যের বিষয়বস্তু। নাটকটিতে দুটি মাত্র চরিত্র - কর্ণ ও কুন্তী। কুন্তীমুখে নিজের জন্মরহস্য শুনে অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে কর্ণ। সেইমুহূর্তে জয়-পরাজয়, রণহিংসা সবকিছু কর্ণের কাছে মিথ্যে হয়ে গেছে। চেতনার এক অন্যস্তরে তিনি চলে গেছেন যেখানে রয়েছে সন্তান আর জননীর স্বপ্নময়জগৎ। মাতৃস্নেহ ও কর্তব্যবোধের দ্বন্দ্বে জয়ী হয়েছে মাতৃস্নেহ। কর্ণের মন ছুটে চলেছে কুন্তীর আশ্রয়ে। আকুল কর্ণ বারবার শুনতে চেয়েছে কুন্তীমুখে 'পুত্র' সম্বোধন।

দেবী, কহো আরবার,
আমি পুত্র তব। [৫]

এই চিত্ত দৌর্বল্য মূল মহাভারতীয় কর্ণে নেই। সেইসঙ্গে স্নেহের টান, স্নেহের আকাঙ্ক্ষাকেও ছাপিয়ে গেছে কর্ণের হৃদয়ের অভিমান। আজ মায়ের কাছে তার একটাই প্রশ্ন---

আজি কেন ফিরাইতে আসিয়াছ ক্রোড়ে। [৬]

কর্ণ চরিত্রের দ্বন্দ্ব যেন ক্লাইম্যাক্স স্পর্শ করেছে। আগামীকালের যুদ্ধে যে কর্ণ বীরের কীর্তি রচনা করতে পারতেন এই নতুন পরিচয়, নতুন উপলব্ধি তাঁকে যেন দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এক নতুন পরীক্ষার সামনে। কিন্তু শেষপর্যন্ত কর্ণ ফিরে দাঁড়িয়েছে আত্মমর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের নিজভূমিতে। তার শান্ত উচ্চারণ---

মাতঃ , সূতপুত্র আমি , রাধা মোর মাতা -
তার চেয়ে নাহি মোর অধিক গৌরব।
পাণ্ডব পাণ্ডব থাক ; কৌরব কৌরব -
ঈর্ষা নাহি করি কারে। [৭]

এখানেই কর্ণ চরিত্রের গৌরব। তিনি লোভ, ঈর্ষা, পার্থিব চাওয়া পাওয়ার ঊর্ধ্বে। যশোলাভের কামনা তাঁর নেই। সে প্রকৃত বীর। তাঁর সুদৃঢ় কর্তব্যবোধ, একনিষ্ঠ ধর্মবোধ তাঁকে মহত্ব দিয়েছে।

মহাভারতের দুই শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর তথা পরস্পর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী কর্ণ ও অর্জুন। নাট্যকার **অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়** তাঁর **"কর্ণার্জ্জুন"** (১৯২৩) নাটকে অর্জুন অপেক্ষা কর্ণের মাহাত্ম্য ও বীরত্বকেই বেশি করে দেখাতে চেয়েছেন। নাটকের শুরুতে কর্ণের মধ্যে সূর্যদেবের প্রতি এক অজানা আকর্ষণের পাশাপাশি নাট্যকার কল্পিত এক শূদ্র কাহিনির মধ্যে দিয়ে কর্ণকে এক শূদ্রের তথা শোষিত নিপীড়িত মানবের বলিষ্ঠ রক্ষাকর্তা হিসেবে দেখিয়েছেন। এই নাটকে নিয়তি সর্বত্র সব চরিত্রের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছে। নিয়তির ফেরেই সূতপুত্ররূপে পরিচিত কর্ণের প্রতি বারবার ঘটেছে অবিচার। গুরু ও ঋষির অভিশাপ প্রাপ্তির মাধ্যমে কর্ণের জীবনে যে শোকাবহ পরিণাম ঘটতে

চলেছে তাঁর আভাস দিয়েছেন নাট্যকার নাটকের প্রথম অঙ্কেই। দ্বিতীয় অঙ্কে কর্ণের প্রতি অবিচারের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভাতে। যেইমাত্র কর্ণ ধনুক হাতে নিয়ে অংশগ্রহণে উদ্যত হলেন দ্রৌপদী স্বয়ম্বর সভার সকল নিয়ম ও প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করে সূতপুত্র বলে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে।অপমানিত কর্ণ স্বয়ম্বর সভার শর্তের কথা না তুলে, নিজের জেদ ও তেজ না দেখিয়ে ব্যথিত হৃদয়ে দ্রৌপদীকে আশীর্বাদ করে সেখান থেকে বিদায় নেন। অপমানের দুঃসহ যন্ত্রণায়, হতাশায় কর্ণ সূর্যদেবের সম্মুখে দাঁড়িয়ে মৃত্যুকে কামনা করছেন যা মূল মহাভারতে নেই। -

হে অস্তগামী অন্তর্যামী জগৎ- নয়ন ,
এ জীবন ডালি দিই সম্মুখে তোমার ; -
সূত-পুত্র কর্ণ নাম
যাক্ মুছে -
যাক্ মিশে অনন্ত আঁধারে -
মৃত্যু হ'ক একমাত্র আশ্রয় আমার।[৮]

এখানে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ঘটনা নিয়তি নির্ধারণ করেছে। কর্ণ এই নিয়তির বিধান ছেদ করতে চেয়েছিল -

নাহি ভয়
রণক্ষেত্রে অসিমুখে
নিয়তির ছেদিব বন্ধন।[৯]

কিন্তু এই নিয়তির বন্ধন ছেদ করতে পারেনি কর্ণ। নিয়তির কাছে পরাক্রমশালী দানবীরের পরাজয় এটাই কর্ণের ট্রাজেডি।

মহাভারতের প্রতি **ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের** অপরিসীম আগ্রহের প্রতিফলন তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলি। ১৯২৫ সালে ‘কর্ণ’ নামে যে নাটক রচনা সম্পূর্ন হয়, ১৯২৬ সালে **‘নর-নারায়ণ’** নামকরণ করে নাটকটি সর্বপ্রথম অভিনীত হয়। নাটকটি গড়ে উঠেছে কর্ণ চরিত্রকে অবলম্বন করে, দৈব ও পুরুষাকারের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে। নাটকের সূচনা কর্ণের ব্রহ্মশাপ প্রাপ্তিতে, আর সমাপ্তি কর্ণের প্রাণোৎসর্গে। কর্ণের অন্তর্দ্বন্দ্ব আলোচ্য নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু। মহাভারতে কর্ণের রাধেয় ও কৌন্তেয় সত্তার কোন দ্বন্দ্ব প্রকাশের সুযোগ ঘটেনি। কিন্তু আলোচ্য নাটকে নাট্যকার উভয় সত্তার দ্বন্দ্ব প্রকাশে বিশেষ সাফল্য লাভ করেছেন। তাঁর চরিত্রের মানসিক শক্তি তাঁর ‘রাধেয় - সত্তায়’ নিহিত। কর্ণের জীবনের প্রকৃত দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে আত্মপরিচয় জ্ঞাত হবার পর। তাঁর আজন্ম পোষিত সংকল্প ও অভিমান ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। কর্ণ যখনই তাঁর পুরুষাকারের ওপর নির্ভরশীল হয়েছেন তখনই নিষ্ঠুর নিয়তি তাঁর সংকল্প ও সাধনাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। কর্ণ জীবনের প্রথম পর্যায়ে কৃষ্ণের ঐশী মহিমার প্রতি সন্দিহান হলেও মৃত্যুর অন্তিম লগ্নে শ্রীকৃষ্ণের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

বাসুদেব - বাসুদেব
একবার সম্মুখে দাঁড়াও

সম্মুখে দাঁড়াও নর-নারায়ণ।[১০]

মহাভারতের যে দুটি চরিত্রকে বিনা দোষে সর্বাধিক অবমাননা সহ্য করতে হয়েছে তাঁরা হলেন কর্ণ এবং দ্রৌপদী। দ্রৌপদীর প্রতি দানবীর কর্ণের দানশীল মহত্ত্বের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা তাঁর কোমলহৃদয়, তাঁর প্রেমিক সত্তাকে আবিষ্কার করেছেন নাট্যকার **শ্রী কেদারলাল রায়** তাঁর **"কুন্তী-কর্ণ-কৃষ্ণা"**(১৯৫৭) নাটকে। এই নাটকে নাট্যকার পৌরাণিক চরিত্রের আড়ালে সূক্ষ্ম মানব অনুভূতিগুলিকে ব্যক্ত করেছেন। নাট্যকার মাত্র তিনটি অঙ্কে মহাভারতের প্রধান কাহিনিটিকে উপস্থাপিত করেছেন। যদিও পৌরাণিক কাহিনির গতানুগতিক অনুসরণ তিনি করেন নি। শিশুকাল থেকেই অকারণ বঞ্চনা, অবজ্ঞা ও অপমান কর্ণকে করে তুলেছে অসম্ভব অভিমানী, দুর্বিনীত ও অসহিষ্ণু। সমস্ত দিক থেকে যোগ্যতর হওয়া সত্ত্বেও অর্জুনকে অতিক্রম করতে না পারার প্রবল অন্তর্দহন তাঁকে করে তুলেছে প্রতিহিংসাপরায়ণ। অন্যায় অধর্ম জেনেও দুর্যোধনের সঙ্গে তিনি মিলিত হয়েছেন। জন্মলগ্নেই আপন জননী দ্বারা পরিত্যক্ত আর স্বয়ম্বর সভায় দ্রৌপদীও তাঁকে অপমান করেছেন। তাঁর জীবনের এই স্মরণীয় দুই নারীর প্রতি তাঁর কণ্ঠে বর্ষিত হয়েছে হাহাকারপূর্ণ বিদ্বেষ---

> নারী ! কেন জানি না, কোন অশুভক্ষণে আমি তোমাকে দেখেছিলাম ! তুমিও এক নারী - যে আমাকে চিরদিন মুগ্ধ করে চিরদিন শুধু বিষ ছড়িয়ে আমাকে দগ্ধ করেছো। আর সেও আর এক নারী, - যে আমাকে গর্ভে ধারণ করে অবহেলায় নদীর জলে ভাসিয়ে চিরদিনের জন্যে হেয় করে রেখেছে ! হায় নারী, -কর্ণের জীবনে শুধু তোমরাই কি থাকবে চির-অভিশাপ হয়ে।[১১]

দ্বিতীয় অঙ্কে গভীর রাতে ক্লান্ত কর্ণের কক্ষে পিছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছে দ্রৌপদী। সেখানে দৃঢ়চেতা কর্ণের দুর্বলতা ধরা পড়েছে দ্রৌপদীর সম্মুখে। কৃষ্ণের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা এখানে উন্মোচিত হয়েছে---

> আমার দুটী প্রিয় নাম। একটী কৃষ্ণ, আর একটী কৃষ্ণা ! পৃথিবীতে আর কোনও নামতো আমি জানিনে কৃষ্ণা ! আর সেই তারা দুটীই, আমার প্রিয় শত্রু। একজন সারথী হয়ে, অপরের হাত দিয়ে তীর ছুড়বে ; আর একজন অশ্রু হয়ে আমার দৃষ্টি আচ্ছন্ন করবে, - আমি প্রতিপক্ষের অস্ত্র ব্যর্থ করতে নিজের অস্ত্র খুঁজে পাব না।[১২]

ব্যর্থ প্রেমের যন্ত্রণাদগ্ধ কর্ণের হৃদয়কে সান্ত্বনা দিয়েছে কৃষ্ণা। অপমানিত লাঞ্ছিত কর্ণ প্রেমের টানে সমস্ত অপমান, লাঞ্ছনা সহ্য করেছে। সে প্রকৃতই প্রেমিক।

> ভালোবেসেছিলাম, তাই সেই আর্ত্তনাদে নীরবে আত্মসমর্পণ করে - সভা কক্ষ ত্যাগ করে এসেছিলাম।[১৩]

এরপর পাণ্ডব জননী কর্ণের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন। পাণ্ডবগণের প্রতি কুন্তীর অগাধ স্নেহ , ভালোবাসা কর্ণকে ঈর্ষান্বিত যন্ত্রণাকাতর করে তুলেছে। তবে মাতৃ পরিত্যক্ত কর্ণ মাতৃ অবহেলার পরেও মাকে শ্রদ্ধা করে----

সে মা হয়তো পাণ্ডবজননীর মত নয় ! তবু সে আমার মা, আমার স্বর্গ, আমার তপস্যা, আমার সব। [১৪]

তাই কুন্তীকে মাতৃজ্ঞানে কর্ণ তাঁর রক্ষাকবচ 'কবচকুন্ডল' অবলীলায় অঞ্জলি দিয়েছে। অবশেষে অভিমানী কর্ণ মনস্থির করেছে যুদ্ধে সে আত্মবলিদান দেবে। তাই কুন্তীর কাছে বিদায় নেওয়ার সময় বলেছে----

শেষ হয়ে গেল কর্ণ, শেষ হয়ে গেল তার - এই একসঙ্গে জন্ম আর মৃত্যু। [১৫]

নাট্যকার বীরবিক্রমী কর্ণের প্রেমাসক্ত হৃদয় ও মাতৃভক্তিকে অসাধারণ দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। নাটকের শেষে নাট্যকার কর্ণের জন্য সমস্ত পাণ্ডবসহ দ্রৌপদী ও কুন্তীর শোকবিহ্বল অবস্থাকে তুলে ধরেছেন। এভাবেই যেন আজন্ম বঞ্চিত কর্ণ মৃত্যুর পর পেয়ে গেল তাঁর স্বীকৃতি ও পরিচয়।

১৮৬৯ সালে লেখা **বুদ্ধদেব বসুর** একটি বিখ্যাত কাব্যনাট্য **"প্রথম পার্থ"**। নাটকটির আখ্যান এর উৎস মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুরুর পূর্ব দিন। কৌরব পক্ষের সেনাপতি মহাবীর কর্ণকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করতে কুন্তী, দ্রৌপদী এবং স্বয়ং কৃষ্ণের অবস্থানের আলোকে এই কাব্যনাটক। এছাড়া এই নাটকে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি স্বরূপ রয়েছেন দুই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে মুখোমুখি পঞ্চ ভ্রাতার বিপরীতে একই মাতৃগর্ভজাত সন্তান কিন্তু নিয়তির খেলায় পরিত্যক্ত কর্ণ। মাতৃত্বের দাবি নিয়ে কুন্তী কর্ণের কাছে এসেছেন এবং তাঁকে যুদ্ধ থেকে বিরত বা নিরপেক্ষ থাকার অনুরোধ করেছেন। অভিমানী কর্ণ জানে কুন্তীর প্রকৃত অভিপ্রায়---

এই আপনার অভীষ্ট ? পাণ্ডবের শ্রীবৃদ্ধি ?
অর্জুনের আয়ু ? [১৬]

কুন্তীর মুখে নিজের জন্ম রহস্য জেনেও তাই কর্ণ বিগলিত হয়নি। এখানে তার আত্মসংযম ধরা পড়েছে। এমনকি কুন্তীর শেষ প্রলোভন দ্রৌপদীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার প্রস্তাবকেও কর্ণ অবহেলায় উড়িয়ে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত পরাভব মেনে কুন্তীকে ফিরে যেতে হয়েছে। এরপর এসেছে দ্রৌপদী বন্ধুত্বের প্রস্তাব নিয়ে। অবশেষে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও যুদ্ধ থেকে সরে যেতে অনুরোধ করেছে কর্ণকে। কিন্তু কর্ণের পক্ষে তা গ্রাহ্য করা অসম্ভব। কোন প্রলোভনেই তিনি অতীতের অপমান ভুলে যেতে পারে না। কর্ণকে বুদ্ধদেব অনেক মহৎ করে আঁকতে পেরেছেন। তাঁর প্রেম, কামনা, সৌন্দর্যবোধ সব থাকা সত্ত্বেও তিনি :

শুধু অপেক্ষমাণ
সেই মহান নিষ্করুণ পরীক্ষার জন্য,
যার মধ্যে দিয়ে অবশেষে
আমি পাব আমার আত্মপরিচয়, হতে পারবো নিজের কাছে প্রকাশিত ও প্রমাণিত। [১৭]

পরিণতমনা কর্ণের সঙ্গে কৃষ্ণের সংলাপ তাই কাব্যনাট্যের অন্যতম আকর্ষণ। এখানে কৃষ্ণ সম্পূর্ণ মহাভারতীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে বিদ্যমান। আর আসন্ন মৃত্যুর প্রেক্ষাপটে কর্ণ যেন চিরকালীন ভক্তের মতো ভগবান কৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করেছেন।

মহাজ্ঞানী, আমার শেষ নমস্কার তোমারই জন্য।
এসো, আলিঙ্গন দাও।
আবার রণস্থলে দেখা হবে। তারপর হয়তো পরজন্মে
তবে আশীর্বাদ করো, আর যেন ফিরে না আসি।[১৮]

তাই বুদ্ধদেব বসুর কর্ণ যেমন সত্যনিষ্ঠ তেমনি নির্জনতা প্রিয় মহাপ্রাণ। তিনি যেন নির্লিপ্ত কালদ্রষ্টা। প্রকৃত অর্থেই তিনি আধুনিক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিত্বের পরিচয় প্রতিষ্ঠিত।

উৎসের সন্ধানে :

১। হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, ‘দাতাকর্ণ’ , তৃতীয় সংস্করণ ১৩২০ সাল, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী , কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪৬
২। তদেব, পৃষ্ঠা ১৭৫
৩। তদেব, পৃষ্ঠা ২৩২
৪। তদেব, পৃষ্ঠা ২৩৭
৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘কাহিনী’ , বিশ্বভারতী, ১৯৬৩ , কলিকাতা , পৃষ্ঠা ৮৬
৬। তদেব, পৃষ্ঠা ৮৭
৭। তদেব, পৃষ্ঠা ৮৮
৮। অজিত কুমার ঘোষ, বিষ্ণু বসু, নিপেন্দ্র সাহা (সম্পাদিত) : ‘বাংলা নাট্য সংকলন’, প্রথম খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাডেমি, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০১ , পৃষ্ঠা ৪৯৪
৯। তদেব, পৃষ্ঠা ৫২১
১০। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ : ‘ক্ষীরোদপ্রসাদ নাটক সমগ্র’ , প্রথম খন্ড, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ২০০১ , পৃষ্ঠা ১৭৩
১১। কেদারলাল রায় : ‘কুন্তী-কর্ণ-কৃষ্ণা’, ডি এম লাইব্রেরী, প্রথম প্রকাশ , ১৩৬৪, পৃষ্ঠা ১৯
১২। তদেব, পৃষ্ঠা ৪৯
১৩। তদেব, পৃষ্ঠা ৫১
১৪। তদেব, পৃষ্ঠা ৫৫
১৫। তদেব, পৃষ্ঠা ৮৪
১৬। বুদ্ধদেব বসু : ‘নাটক সমগ্র’, প্রথম খন্ড, দে’জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৩, পৃষ্ঠা ১৫৩
১৭। তদেব, পৃষ্ঠা ১৭২
১৮। তদেব, পৃষ্ঠা ১৯৪

সমাজ সংস্কারে নদীয়া জেলা; প্রসঙ্গ বিধবা বিবাহ

ইন্দ্রাণী দত্ত
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, ইতিহাস বিভাগ
পলাশী কলেজ, নদীয়া

সারাংশ : ঊনবিংশ শতকে যে সব সামাজিক কুপ্রথা ভারতীয় সমাজকে প্রভাবিত করেছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল বাল্যবিধবা। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় সমাজ বুঝেছিল সমাজ থেকে এ সব কুপ্রথাগুলো নিবারণ করতে না পারলে সমাজ এগোতে পারবে না। তার পরিবর্তে সমাজ বদ্ধ পুকুরের মত আবদ্ধ হয়ে যাবে। পাশ্চাত্য শিক্ষিত মানুষ এটাও বুঝেছিল মিটিং বা মিছিলে নয়, আইনি পদক্ষেপের দ্বারাই বৈধব্যের নরক যন্ত্রণা থেকে বালিকাদের মুক্তি দেওয়া যাবে। এই জন্যেই সমাজ সংস্কারকরা আইনি ব্যবস্থার জন্য বারবার ছুটে গিয়েছে বড়লাটের সাহায্যের জন্য। কারণ তাঁরা জানতো আইনের মাধ্যমেই এই কুপ্রথা রদ করা সম্ভব। অন্যদিকে শাস্ত্র নির্ভর হিন্দু সমাজের প্রধান অস্ত্রই ছিল শাস্ত্রের বিধান। হিন্দু পণ্ডিতরা বোঝাতে সচেষ্ট হয় বিধবা বিবাহ শাস্ত্র বিরোধী। আর এই শাস্ত্রের ওপর ভর করেই বালিকাদের বৈধব্যের মুক্তির জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সর্বস্তরে চেষ্টা করেছিলেন। বিদ্যাসাগর "পরাশর সংহিতা" থেকে উদ্ধৃতি সংগ্রহ করে বলেন –

> "গতে মৃত প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরেন্যো বিধীয়তে"

অর্থাৎ বিধবা বিবাহ শাস্ত্র বিরোধী নয়। নানা ঝড়ঝাঁপটার মধ্যে দিয়ে ১৮৫৬ সালে ১৩ই জুলাই বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়। বিধবা বিবাহ আইন পাশ হওয়ার পর বিদ্যাসাগরের খ্যাতি সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ল। বিদ্যাসাগরের নামে রচিত হলো গান-

> "বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে
> করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে"।.....

বিধবা বিবাহ আইন ভারতবর্ষের মেয়েদের জন্য এক অচলায়তন ভেঙে দিয়েছিল। বিধবা বিবাহের জন্য ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের পূর্বে কলকাতা মহানগরী থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে নদীয়া জেলাতে শুরু হয়েছিল এক সামাজিক প্রথা অবলুপ্তির আন্দোলন। কারণ নদীয়াবাসী বুঝেছিল নারী জাতিকে কোন ঠাসা করলে সমাজ কখনো এগোতে পারবে না বরং বদ্ধ পুকুরের মতো আটকে যাবে।

সূচক বাক্য : প্রাচীন ভারতে বিধবাবিবাহ, বিদ্যাসাগরের পূর্বে বিধবাবিবাহ, নদীয়াবাসীর চিন্তায় বিধবাবিবাহ, বিধবা বিবাহে নদীয়ার ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা।

মূল আলোচনা :

বিধবা বিবাহ বিরোধী সংস্কার ভারতীয় হিন্দু সমাজে বহুদিন বদ্ধমূল হলেও প্রাচীন ভারতে চিত্রটা কিছুটা অন্যরকম ছিল। প্রাচীন ভারতে নারীদের অবস্থান পুরুষদের থেকে এগিয়েই ছিল। সমাজের কালানুক্রম এবং যুগের পরিবর্তনে নারীদের অবস্থান নিম্নগামী হয়। প্রাচীনকালে মেয়েদের বিধবা বিবাহ প্রচলন ছিল। প্রাচীন ভারতের যে বিধবা মহিলার বিবাহ হত তিনি পুর্নভবা হিসেবে সমাজে পরিচিত ছিলেন এবং তিনি পূর্ব স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতেন। শুধুমাত্র প্রাচীন যুগে নয় মহাকাব্যের যুগেও বিধবা বিবাহের প্রচলন ছিল। যেমন- রামায়ণে সুগ্রীব ও মহাভারতের যুগে অর্জুনের সঙ্গে নাগরাজের কন্যা উলুপীর বিবাহ। এই চিত্রটা বদলাতে থাকে মুসলিম রাজত্বের সময় থেকে। এই সময় থেকেই বিধবা বিবাহ সমাজে নিন্দনীয় হয়ে পড়ে। তবে মুঘল যুগে জয়পুরের রাজা জয় সিংহ ও কোটার রাজা জালিম সিংহ এবং পেশোয়ার পরশুরাম ভাও বিধবা বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করলে সমাজ ও পারিবারিক চাপে তা ব্যর্থ হয়।

উনবিংশ শতকের পূর্বে পূর্বভারতের বিক্ষিপ্ত কিছু জায়গায় বিধবা বিবাহ আন্দোলন শুরু হয়। যুগের থেকে অগ্রবর্তী আন্দোলন শুরু হলেও সামাজিক চাপে তা ব্যর্থ হয়। রত্নগিরির এক তেলেগু ব্রাহ্মণ বিধবা বিবাহের সমর্থনে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। কিন্তু তা সমাজের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেনি। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ভারতে ব্রিটিশ শাসন শুরুর পূর্বে বাংলাদেশে বিধবা বিবাহ দেবার উদ্যোগ নিয়েছিলেন বাংলাদেশের ঢাকার দেওয়ান রাজ বল্লভ। তিনি তার নিজ বিধবা কন্যাকে বিবাহ দেবার জন্য তৎপর হয়ে পন্ডিত মহলে শাস্ত্রীয় বিধান চাইলে পন্ডিত মহল শাস্ত্রীয় বিধান দিলেও নদীয়া রাজের বিরোধিতায় তা ব্যর্থ হয়ে যায়। শুধুমাত্র নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে তৎকালীন নদীয়ার রাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেন "ব্যবহার বিরুদ্ধ" এর কাজ বলে। অন্যদিকে পরবর্তীতে নদীয়ার রাজ শ্রীশচন্দ্র বলেছিলেন, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজবল্লভ কে বিধবা বিবাহ প্রচলনের কৃতিত্ব দিতে চাননি তাই হয়তো কৃষ্ণচন্দ্র এই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করেন।

অষ্টাদশ শতকে বিদ্যাসাগরের পূর্বে বাংলায় ঢাকার দেওয়ান রাজবল্লভ তার বিধবা কন্যা কে বিবাহ দেওয়ার চেষ্টা করলে নদীয়ার রাজপরিবার যেমন বাধা হয়ে দাঁড়ায় ঠিক তেমনি নদীয়ার রাজপরিবার থেকেই শুরু হয় উনবিংশ শতকে বিধবা বিবাহ আন্দোলনের প্রচেষ্টা এবং তা শুরু করেন নদীয়ার মহারাজা শ্রীশচন্দ্র। তিনি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করে বিধবা বিবাহ প্রবর্তনে প্রয়াসী হন। তিনি শাস্ত্রীয় সমর্থন লাভের চেষ্টা করলে প্রথমে পণ্ডিতরা মানতে না চাইলেও পরে তাঁর অনুরোধে বিধবা বিবাহ কে সমর্থন করেন। কিন্তু সামাজিক চাপে তিনি এই আন্দোলনে সামিল হতে পারেননি। অন্যদিকে কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজ এর দুই সদস্য ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় ও

বারাসাত নিবাসী কালীকৃষ্ণ মিত্র বিধবা বিবাহ আন্দোলনের আন্দোলন শুরু করলে বীরনগরবাসী বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের বিরোধিতায় এই আন্দোলন ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে রাধাকান্ত দেবের গৃহে বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত এক সভায় নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ পন্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন উপস্থিত ছিলেন এতে বিধবা বিবাহের পক্ষ জয়ী হলেও এই সিদ্ধান্ত ফলপ্রসূ হয়নি।

নদীয়াবাসীর বিধবাবিবাহ আন্দোলন ব্যর্থ হলেও তারা থেমে থাকেনি। মহানগর থেকে বহু দূরে থেকেও তারা এই সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে গিয়েছে। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বিদ্যাসাগর প্রথম বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে প্রবন্ধ লিখে বিধবা বিবাহ আন্দোলন শুরু করলে শিক্ষিত সমাজে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সেই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম সদস্য কালীকৃষ্ণ মিত্র কৃষ্ণনগরে এক সভায় বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ সম্পর্কিত প্রবন্ধ পাঠের মাধ্যমে বিধবা বিবাহের আবশ্যকতা এবং বিদ্যাসাগরের শাস্ত্র প্রমাণ গুলির বৈধতা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন। তাঁর এই বক্তৃতার ফলে কৃষ্ণনগরে বিধবা বিবাহ আন্দোলনের নতুন জোয়ার আসে।

আবার অন্যদিকে বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ খসড়া তৈরি করলে তাতে নদীয়ার ব্রাহ্মসমাজের সদস্য কালীকৃষ্ণ মিত্র স্বাক্ষর করেন। শুধুমাত্র বিধবা বিবাহ আন্দোলন এর জনমত গঠন নয়, নদীয়াবাসী বিধবা বিবাহ মতো একটি মহৎ সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিল। কলকাতার যে প্রথম বিধবা বিবাহ হয় সেখানে যে পাত্রী ছিলেন তিনি ছিলেন নদীয়া রাজের কূলগুরু পরিবারের ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা কালীমতি দেবী। এবং এই বিবাহের আরেকজন উদ্যোক্তা ছিলেন নদীয়ার অপর এক পন্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

শুধুমাত্র নদীয়া জেলা যেমন বিধবা বিবাহ আন্দোলনে শামিল হয়েছিল তেমনি এর বিরোধীতাও করেছিল। ১৭৫৬ সালে রাজবল্লভের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করেছিল মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র শুধুমাত্র বিধবা বিবাহের কৃতিত্ব রাজবল্লভের হবার জন্য। আবার সেখানেই ব্রাহ্মসমাজ সর্বোপরি বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবা বিবাহ আন্দোলন শুরু করেছিল তখন আবার নদীয়া বাসীরা বিরোধিতা শুরু করেছিল। ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইনের বিরোধিতায় যখন সারা বাংলা তথা ভারতবর্ষে ঝড় উঠেছিল এবং ভারত সরকারের কাছে যে আইনের বিরোধিতার জন্য যে আবেদন পত্র প্রেরণ করা হয় তাতে ছিল নদীয়াবাসীর নাম। অর্থাৎ পক্ষে এবং বিপক্ষে এই দুয়েরই মধ্যে স্থান ছিল নদীয়ার। পার্থক্য ছিল শুধুমাত্র সময় এবং কালের।

একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে আজও বিধবা বিবাহ মানুষের বাঁকা চোখের অংশ। সেই বিধবাবিবাহ নিয়ে নদীয়াবাসী চিন্তাভাবনা শুরু করেছিল। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড যেমন নদীয়াতে অবস্থিত ছিল ঠিক তেমনি এই নদীয়াতে প্রথম সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল। এতে যেমন এগিয়ে এসেছিল নদীয়ার রাজ পরিবার তেমনি এগিয়ে এসেছিল নতুন চিন্তার অগ্রদূত ব্রাহ্মসমাজের সদস্যরা। সমাজের স্রোতের বিপরীতে

হেঁটে তারা সমাজকে এক কুসংস্কার মুক্ত সমাজ উপহার দিতে চেয়েছিল। প্রযুক্তি নির্ভর আজকের সমাজ বিধবা বিবাহ কে সাদরে আমন্ত্রণ জানায়নি। কিন্তু আজ থেকে বহু বছর আগে এর সূত্রপাত ঘটলেও আজ ও তা সমাজের উচ্চবিত্তদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, নিম্নবিত্তের কাছে পরিহাস এবং কোণঠাসা হওয়ার একটা দিক।

তথ্যসূচি :

- বাঙলার নারী আন্দোলন সংগ্রামী ভূমিকায় দেড়শ বছর - ছবি বসু (রায়)।
- উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি - অমিতাভ মুখোপাধ্যায়।
- নদীয়া কাহিনী - কুমুদনাথ মল্লিক।
- নদিয়ার ইতিহাস -কমল চৌধুরী।

ব্যক্তি-ইচ্ছা : প্রকৃতির প্রতিফলন

জয়িতা দত্ত
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
নিউ আলিপুর কলেজ

সারসংক্ষেপ : নৈতিক দায়িত্বের উপস্থিতির অন্যতম প্রধান শর্ত হল 'ইচ্ছার স্বাধীনতা'। গ্রীক যুগে ও আধুনিক যুগে ইচ্ছার স্বাধীনতাকে নৈতিক কর্মের আবশ্যক উপাদান বলে ব্যাখ্যা করা হলেও বর্তমানে ইচ্ছার স্বাধীনতার উপস্থিতি সম্ভব কিনা সে বিষয়েই দার্শনিকেরা সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাই ইচ্ছার স্বাধীনতার স্বরূপ বিশ্লেষণের মাধ্যমে নৈতিক দায়িত্বের উপস্থিতির ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান শর্তরূপে ইচ্ছার স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি আলোচনা করা জরুরী। সাধারণত মনে করা হয় যে, ইচ্ছার স্বাধীনতা ব্যক্তির জন্মগত বা স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। কোনও ব্যক্তি যে কর্ম সম্পাদন করতে চায় সেই কর্ম যদি ব্যক্তি নিজ ইচ্ছা অনুসারে সম্পাদন করে তাহলেই তার ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে বলা যায়। কিন্তু ফ্রাঙ্কফুর্ট ইচ্ছার স্বাধীনতার এই অর্থ স্বীকার করেন না।তাঁর মতে কোনও ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে তখনই বলা যায় যদি ব্যক্তি নিজে সেই ইচ্ছার স্রষ্টা হয় এবং কেন সে ঐ বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করল তার স্বপক্ষে যুক্তি প্রদান করতে পারে।ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকার First Order Desire বা প্রাথমিক ইচ্ছা থাকতে পারে, কিন্তু এই বহুবিধ ইচ্ছাগুলির মধ্যে যেটি তার Second Order Desire বা চুড়ান্ত ইচ্ছা দ্বারা স্বীকৃত সেই ইচ্ছা অনুযায়ী কর্ম সম্পাদিত হলে ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে বলা যায়। ফ্রাঙ্কফুর্ট ইচ্ছাগুলিকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন – একপ্রকার ইচ্ছা আমাদের কর্মগুলি সম্পাদন করে। এই কর্মসংক্রান্ত ইচ্ছাগুলি কোন কর্মটি ব্যক্তি করবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। দ্বিতীয় প্রকার বা চুড়ান্ত ইচ্ছাগুলি এই প্রথম প্রকার অর্থাৎ প্রাথমিক ইচ্ছাকে গঠন করে।আমাদের বিভিন্ন ইচ্ছার মধ্যে কোন ইচ্ছাটি অনুসারে আমাদের কর্ম করা উচিত অর্থাৎ এই ইচ্ছাগুলির মধ্যে কোন ইচ্ছাটি সর্বাধিক কাঙ্খিত তা নির্ণয় করে চুড়ান্ত ইচ্ছা। প্রাথমিক ইচ্ছাকে গঠন করার মাধ্যমে চুড়ান্ত ইচ্ছা ব্যক্তিকে পুনর্গঠিত করে। চুড়ান্ত ইচ্ছা, প্রাথমিক ইচ্ছাগুলির মূল্যায়ন করে এবং তার মধ্যে যেটি উপযুক্ত সেটি অনুসারে কর্ম সম্পাদনে ব্যক্তিকে অনুপ্রাণিত করে। তাই ফ্রাঙ্কফুর্ট মনে করেন ব্যক্তি যদি তার চুড়ান্ত ইচ্ছা অনুমোদিত প্রাথমিক ইচ্ছা অনুসারে কর্ম পালন করে তবে তার ইচ্ছার স্বাধীনতা বর্তমান বলা যায়। কারণ সেক্ষেত্রে ব্যক্তি তার নির্বাচিত আকাঙ্ক্ষাটি পরিপূরণে সমর্থ হয়।কোনও ব্যক্তির চুড়ান্ত ইচ্ছাযদি তার চুড়ান্ত সংকল্প দ্বারা পরিচালিত না হয় তাহলে তাকে ব্যক্তি বললেও নৈতিক কর্তা বলা যাবে না। কারণ আকাঙ্ক্ষাগুলি অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তির সাময়িক উত্তেজনা বা প্রণোদনা থেকে হতে পারে। চুড়ান্ত ইচ্ছা হল কেবল ব্যক্তির

মানসিক ইচ্ছা।এটি যে সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তির চিন্তাশীল বা বিচারশীল ইচ্ছাকে বোঝায় এমন নয়। কিন্তু Volition বা সংকল্প হল দৃঢ় কর্ম প্রয়াস। কোনও ব্যক্তি যখন চিন্তাপ্রসূত ইচ্ছা অনুসারে এমন কোনও আকাঙ্ক্ষাকে কর্মে পরিণত করার চেষ্টা করে যার দ্বারা তার সামগ্রিক জীবনের উদ্দেশ্য পূরণ করা সম্ভব হবে, ব্যক্তি যদি আকাঙ্ক্ষাটি যৌক্তিক কিনা এই বিচার বিবেচনা করে কর্ম সম্পাদনের সিদ্ধান্ত নেয় তখনই ব্যক্তির চুড়ান্ত সংকল্প আছে বলা যায়। সেক্ষেত্রে ইচ্ছার স্বাধীনতার যথাযথ প্রয়োগের জন্য সেই কর্মটি সম্পাদনের নিমিত্তে সে দায়বদ্ধ হয়ে পড়ে। তাই যুক্তি বা বুদ্ধি অনুসারে কর্ম সম্পাদন করতে পারলেই কেবল ব্যক্তির দায়িত্ব সম্পূর্ণ হয় না। ব্যক্তির দায়িত্ব হলো সেই চাহিদা বা আকাঙ্ক্ষা মনে প্রোথিত করা যা তাকে অগ্রসরতার পথে নিয়ে যায়। ব্যক্তিমাত্রই তার কোনও না কোনও আকাঙ্ক্ষা থাকে, কিন্তু নৈতিক কর্তা মাত্রই কেবল আকাঙ্ক্ষা থাকে না,Volition বা সংকল্পও থাকে। কোনও ব্যক্তির চুড়ান্ত ইচ্ছা আছে এ কথার অর্থ হল তার যুক্তি প্রদানের ক্ষমতা আছে। সে বিচার বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কোন ব্যক্তির Second order desire বা Volition of second order desire আছে এ কথার অর্থ হল তার ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে। ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকার অর্থ ব্যক্তি যা করতে চায় সেই কর্মটি করার স্বাধীনতা তার আছে। ফ্রাঙ্কফুর্ট-এর মতে ব্যক্তির ইচ্ছা মনোগত বাসনা অনুসারে বা চাহিদা অনুযায়ী কর্ম সম্পাদনে যদি সমর্থ হয় তাহলেই ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে বলা যায়।

সূচক শব্দ: ইচ্ছার স্বাধীনতা, প্রাথমিক ইচ্ছা, চুড়ান্ত ইচ্ছা, সংকল্প।

মূখ্য প্রবন্ধ:

সমমনোভাবাপন্ন ব্যক্তিবর্গ জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজন পূরণের জন্য এবং উৎকৃষ্ট জীবন যাপনের লক্ষ্যে একে অপরের সঙ্গে সঙ্গবদ্ধ হয়ে সমাজ গঠন করে।সমাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সমাজ নির্ধারিত এবং সর্বজনস্বীকৃত কিছু নীতি বা আইন প্রণয়ন আবশ্যক – যা ব্যক্তির নিকট অবশ্যপালনীয় বলে গৃহীত হয়।এই নীতিগুলি ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতি নির্ণয়ে সাহায্য করে।মানুষের যুক্তিবোধ তাকে কতকগুলি নৈতিক নিয়ম নির্ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করে এবং তার নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ববোধ তাকে ঐ সমাজস্বীকৃত নিয়মগুলি অনুসরণ করে কর্ম পালনে অনুপ্রাণিত করে। সুতরাং বলা যায় নৈতিকতাকে যথাযথ ভাবে অনুসরণ করা সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপনের জন্য তাদের আচরণের অভিমুখ নির্ধারণে অত্যন্ত আবশ্যক।নৈতিকতা ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।নৈতিক অনুশাসনগুলি ব্যক্তি স্ব-ইচ্ছায় অনুসরণ করে যেহেতু ভালো, শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য প্রশাসক, পরিচালকের বলপ্রয়োগ অপেক্ষা নৈতিক পথ অনুসরণ সুবিধাজনক, যেহেতু সেক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীনতা বজায় থাকে। সে কারণেই নৈতিকতা বাধ্যতামূলকভাবে নয়, ব্যক্তি তার নিজ ইচ্ছায় নৈতিক আচরণে উদ্বুদ্ধ হয়। আবার নৈতিকতার ধারণা সমাজ জীবনে উপস্থিত

থাকার জন্যই ব্যক্তির আচরণের বিচার হয়, তার আচরণের সংশোধন হয়, তাকে নিন্দা করা হয় অথবা সঠিক আচরণ পালনের জন্য নৈতিক কর্মের কর্তাকে প্রশংসা করা হয়। সংশোধন করার সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দানের অর্থই হল ব্যক্তি অন্যরূপ কর্ম পালনে সমর্থ। অর্থাৎ ব্যক্তি যে কর্মটি সম্পাদন করেছে সেটি তার স্বাধীন ইচ্ছা জনিত সিদ্ধান্ত – যার দায়িত্ব ব্যক্তির উপরেই ন্যস্ত।পরিস্থিতি ব্যক্তির সম্মুখে একাধিক বিকল্প কর্ম উপস্থিত করতে পারে। কিন্তু ব্যক্তি সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপনের জন্য যুক্তি দ্বারা নিজের উদ্দেশ্যগুলির বিন্যাস করে এবং গুরুত্ব অনুসারে সেগুলি পূরণে সচেষ্ট হয়। ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থিত একাধিক উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন উদ্দেশ্যটিকে সে বাস্তবায়িত করতে কর্ম পালন করবে তা নির্বাচনের স্বাধীনতা যখন ব্যক্তির থাকে তখন ব্যক্তি স্বইচ্ছায় কর্ম সম্পাদন করছে বলা যায়। পাশ্চাত্য নীতিতাত্ত্বিক ইমানুয়েল কান্টের দর্শনেও ইচ্ছার স্বাধীনতাকে কর্মপালনের পূর্বস্বীকৃতি বলে গণ্য করা হয়। কান্ট বুদ্ধিপ্রসূত সমাজ স্বীকৃত সার্বজনীন নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাবণত থেকেই কর্মপালনের স্বাধীন সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছেন। তাঁর মতে, যদিও সমাজ স্বীকৃত সার্বজনীন নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়েই ব্যক্তি কর্ম সম্পাদন করেন এবং সে কর্ম তাঁর কর্তব্য বলেই বিবেচিত হয় তা সত্ত্বেও ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা যায় না। সার্বজনীন নিয়মটি সমাজ কর্তৃক অনুমোদিত হলেও ব্যক্তি যখন নিয়মটিকে নিজের কর্মের নীতি বলে গণ্য করে এবং তার প্রতি শ্রদ্ধার কারণেই তাকে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন তার নিজ ইচ্ছার উপর নিয়ন্ত্রণকে স্বীকার করতেই হয়। ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছা প্রণোদিত না হয়ে সমাজ, পরিবেশ, পরিস্থিতি দ্বারা বলপূর্বক নীতি অনুসারে কর্মসম্পাদনে প্রবৃত্ত হয় তবে অবশ্যই কান্ট সেটিকে নৈতিক কর্ম বলবেন না। সুতরাং কান্টের কর্তব্যবাদেও ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকৃত। টিমারম্যানের মতে, কান্টইচ্ছা বা কর্মপ্রয়াসকে একটি বৃত্তি বা সামর্থ্য বলে মনে করেছেন[1]। এই সামর্থ্য কিন্তু সব ক্ষেত্রে কার্যকর অবস্থায় থাকে না। ব্যক্তি যখন কোনও বাহ্যিক শর্তের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে অথবা আবেগের অত্যাধিক উপস্থিতির কারণে বুদ্ধির সঠিক ব্যবহারে অসমর্থ হয় তখন তার কর্মপ্রয়াসের বৃত্তিটি উপস্থিত থাকলেও সেটি স্বাধীন নয়। তাই ব্যক্তিকে তার ইচ্ছাটিকে ব্যক্তিগত স্বার্থ, আবেগ ও বাহ্যিক শর্তের প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে। এখানেই ব্যক্তির উদ্যমকে স্বীকার করতে হবে, তার ইচ্ছার স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ ব্যক্তি নিজে সচেষ্ট না হলে সামর্থ্য প্রয়োগ অসম্ভব। নৈতিক কর্ম সম্পাদনকালে ব্যক্তির ইচ্ছা উপস্থিত থাকে কিনা, তা কি সত্যই স্বাধীন, না অন্য শর্ত নির্ভর সে বিষয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ বর্তমান। এই প্রবন্ধে আমার উদ্দেশ্য হল ইচ্ছার স্বাধীনতার কারণ অনুসন্ধান করা।

গ্রীক যুগে ও আধুনিক যুগে ইচ্ছার স্বাধীনতাকে নৈতিক কর্মের আবশ্যক উপাদান বলে ব্যাখ্যা করা হলেও বর্তমানে ইচ্ছার স্বাধীনতার উপস্থিতি সম্ভব কিনা সে বিষয়েই দার্শনিকেরা সন্দেহ প্রকাশ করেন। নিয়ন্ত্রণবাদী দার্শনিক Robert Blatchford, W.T.Stace, Maurice Mandelbaum, Mortiz, Schlick, Charles

Stevensonপ্রমুখরা মনে করেন, ব্যক্তির অধিকাংশ কর্মই একটি নির্দিষ্ট কার্যকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ– যা ব্যাক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। ব্যক্তি যখন কোনও কর্ম সম্পাদন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন ঐ বিশেষ কর্ম সম্পাদনের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করে তার সমাজ, পরিবেশ,পরিস্থিতি।কিন্তু যদি ইচ্ছার স্বাধীনতাই না থাকে তাহলে ব্যক্তিকে তার কর্মের জন্য দায়ী বলা যায় না। অর্থাৎ নৈতিক দায়িত্বের প্রশ্নই অর্থহীন হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে নৈতিক অবধারণই সম্ভব হবে না – এ মত প্রকাশও অবান্তর নয়। কিন্তু এমন ঘটলে সামাজিক জীবনেও বিপর্যয় নেমে আসবে। এ কারণেই অনিয়ন্ত্রনবাদী দার্শনিক যেমন অ্যারিস্টটল,এপিকিউরাস,হাজী,রবার্ট কেন্ ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতার উপস্থিতিকে অস্বীকার করার পক্ষপাতী নন।এই দার্শনিকেরা মনে করেন, ব্যক্তির যদি ইচ্ছার স্বাধীনতা না থাকে তাহলে তার পক্ষে কর্ম সম্পর্কে নৈতিক অবধারণ গঠনই অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাঁরা যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠা করেন, ব্যক্তির কর্ম যে কেবল স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তাই নয়, ঐ ইচ্ছাটিও ব্যক্তি নিজে গঠন করে। অর্থাৎ ব্যক্তি যে কেবল কর্মের সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করে তাই নয় কীরূপ ইচ্ছার অধিকারী সে হয়ে উঠবে তাও বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির নিজ নিয়ন্ত্রণাধীন। ফ্রাঙ্কফুর্টের মতে, কোনও ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে তখনই বলা যায় যদি ব্যক্তি নিজে সেই ইচ্ছার স্রষ্টা হয় এবং কেন সে ঐ বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করল তার সমর্থনে যুক্তি প্রদান করতে পারে। অর্থাৎ ইচ্ছার স্বাধীনতা গঠনে ব্যক্তির বিশেষ ভূমিকা বর্তমান। তাঁর মতে, ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকার প্রাথমিক ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে,এইগুলি অনেক ক্ষেত্রেই সমাজ বা পরিবেশ-পরিস্থিতিপ্রদত্ত। কিন্তু এই বহুবিধ আকাঙ্ক্ষাগুলির মধ্যে যেটি তার second order desire বা চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষা দ্বারা স্বীকৃত সেই আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী কর্ম সম্পাদিত হলে ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে বলা যায়। ফ্রাঙ্কফুর্ট এই ইচ্ছাগুলিকে দুই প্রকার বলেছেন –এক প্রকার ইচ্ছা আমাদের কর্মগুলি সম্পাদন করে। এই কর্মসংক্রান্ত ইচ্ছাগুলি কর্মটি নির্বাচণ ও সম্পাদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই ইচ্ছা বিভিন্ন প্রকারের হয়।কোনও ব্যক্তির বেড়াতে যেতে ইচ্ছা হতে পারে। আবার কোনও ব্যক্তির বাড়ি থেকে ঘুমানোর ইচ্ছা হতে পারে।ব্যক্তির এই জাতীয় ইচ্ছাগুলি কোনও না কোনও কর্ম করতে প্রণোদিত করে। দ্বিতীয় প্রকার বা Second Order Desire গুলি এই প্রথমটিকে অর্থাৎ First Order Desire বা প্রাথমিক ইচ্ছাকে গঠন করে।এই দ্বিতীয় প্রকার ইচ্ছাটি কোনও কর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত না। প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের মনে বহুবিধ ইচ্ছার উদ্ভব হয়। ঐ একাধিক ইচ্ছার মধ্যে কোন ইচ্ছাটি অনুসারে আমাদের কর্ম করা উচিত অর্থাৎ ইচ্ছাগুলির মধ্যে কোনটি সর্বাধিক কাঙ্খিত তা নির্ণয় করে second order desire বা চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষা । প্রাথমিক ইচ্ছাকে নির্বাচন করার মাধ্যমে চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষাটি ব্যক্তিকেও পুনর্গঠিত করে। Second Order Desire বা ইচ্ছার এই উচ্চতর পর্যায়টি ব্যক্তির প্রাথমিক ইচ্ছাগুলির মূল্যায়ন করে এবং তার মধ্যে যেটি উপযুক্ত সেটি অনুসারে কর্ম সম্পাদনে ব্যক্তিকে অনুপ্রাণিত করে।তাই ফ্রাঙ্কফুর্ট

মনে করেন, ব্যক্তি যদি তার ইচ্ছার এই উচ্চতর পর্যায়টি অনুমোদিত ব্যক্তির প্রাথমিক ইচ্ছা অনুসারে কর্ম পালন করে তবে তার ইচ্ছার স্বাধীনতা বর্তমান বলা যায়।কারন সেক্ষেত্রে ব্যক্তি তার সামগ্রিক জীবনের লক্ষ্যের সমরূপতার দ্বারা নির্বাচিত আকাঙ্ক্ষাটি পরিপূরণে সমর্থ হয়।কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তি যেরূপ ব্যক্তি হতে চায়, যে ইচ্ছা অনুসারে জীবন চালিত হওয়া উচিত বলে মনে করে বাস্তবে সেই অনুসারে কর্ম না করে আবেগের বশবর্তী হয়ে ক্রিয়া করে। সেক্ষেত্রে ইচ্ছার এই উচ্চতর পর্যায়টি আমাদের প্রাথমিক ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়। এই দুটি ইচ্ছার মধ্যে কোনও মিল থাকে না। এই ক্ষেত্রে ব্যক্তির ইচ্ছাকে স্বাধীন বলা যায় না, কারণ ব্যক্তি যে কর্মগুলি সম্পাদন করা উচিত বলে মনে করে প্রাথমিক ইচ্ছা সেগুলিকে না করে অন্যবিধ কর্ম সম্পাদনের প্রতি ধাবিত হয়। ব্যক্তির সম্মুখে সমাজ বা বাহ্যিক পরিস্থিতি দ্বারা প্রোথিত একাধিক First Order Desire বা কর্ম নির্ধারক প্রাথমিক ইচ্ছা যেমনক, খ, গ ইত্যাদি উপস্থিত থাকতে পারে। কিন্তু ব্যক্তি তার নিজের বিশ্লেষণীদক্ষতার দ্বারা যে প্রাথমিক ইচ্ছাটি নির্বাচন করে, সেই প্রাথমিক ইচ্ছা অনুযায়ী কর্ম সম্পাদিত হলেই Second Order Desireবা ব্যক্তি-প্রকৃতি নির্ধারক ইচ্ছা বা উচ্চতর পর্যায়ের ইচ্ছা অনুযায়ী কর্ম সম্পাদিত হয়েছে বলা যায়। কারণ ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থিত একাধিক প্রাথমিক ইচ্ছার মধ্যে যদি কোনও ইচ্ছা ব্যক্তিকে জীবনের সামগ্রিক উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য পূরণের উপযোগী কর্মে প্রণোদিত করে তাহলে যে আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরিচালিত হয়ে ব্যক্তি কর্মটি সম্পাদন করে সেই আকাঙ্ক্ষাটি হল ব্যক্তির Second Order Desire।ব্যক্তির Second Order Desire বা ব্যক্তি-প্রকৃতি নির্ধারক ইচ্ছা বা উচ্চতর পর্যায়ের ইচ্ছাটি হল তার বিচারমূলক বিশ্লেষণী সামর্থ্য, যার মূল্যায়নের ক্ষমতা আছে। এই Second Order Desireটি ফ্রাঙ্কফুর্ট-এর মতে Desire of the first order। সুতরাং ব্যক্তি কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষার দ্বারা পরিচালিত হয়ে কর্মটি সম্পাদন করবে তা কর্মটির প্রসঙ্গ বা ঘটনা পরম্পরা আলোচনা করে অনুধাবন করা যায় না। ঘটনা প্রসঙ্গ থেকে কেবল এটুকু বোঝা যায় যে এটি অথবা প্রাথমিক ইচ্ছা অথবা কোনও একটি নির্দিষ্ট কর্মসম্পাদনের আকাঙ্ক্ষা অথবা কোনও আকাঙ্ক্ষা বর্তমান থাকার আকাঙ্ক্ষা।

ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থিত একাধিক প্রাথমিক ইচ্ছার মধ্যে কোনও একটি প্রাথমিক ইচ্ছা ব্যক্তির আবেগ বা অনুভূতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে যা বাহ্যিক পরিস্থিতি বা সমাজের প্রভাবে ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হয়। এই আবেগ বা অনুভূতিগুলি ব্যক্তির চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষা বা Second order desire কে অবদমিত করে ব্যক্তিকে আবেগ বা অনুভূতি অনুসারে কর্ম সম্পাদনে অনুপ্রাণিত করে। এই সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার প্রাথমিক ইচ্ছা অনুসারে কর্ম সম্পাদন করা সত্ত্বেও ব্যক্তির সম্পাদিত কর্ম তার Second order desire বা চরম ইচ্ছা অনুযায়ী সম্পাদিত হয়েছে বলা যায় না। কারণ Second order desire দ্বারা অনুপ্রাণিত কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মটি সম্পাদনে উদ্যোগী হয়; সেখানে আবেগ, সাময়িক

উত্তেজনা বা প্রণোদনার বশে ব্যক্তি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।অর্থাৎ, ব্যক্তি যখন 'ক'কর্মটি সম্পাদনে উদ্যত হয় তখন 'ক'কর্মটি সম্পাদনের জন্য সে তার চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কর্মটি সম্পাদন করে না। ব্যক্তি কর্মটি সম্পাদন করে কোনও আবেগ, অনুভূতি বা সাময়িক উত্তেজনাবশত। অপরদিকে ব্যক্তি যদি 'ক'কর্মটি তার চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষা বা Second order desire এর দ্বারা পরিচালিত হয়ে সম্পাদন করে তাহলে এই কর্মটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হয়ে কাজটি সম্পাদন করবে। কারণ এক্ষেত্রে 'ক'কর্মটি সম্পাদন করাই ব্যাক্তির একমাত্র চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষা এবং ব্যক্তি তার ইচ্ছা অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করে বলা যায়। এই ইচ্ছাই হল ব্যক্তির Second order desire যা ব্যক্তির বুদ্ধি নির্দেশিত ইচ্ছা বলে গণ্য হয়।

বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করার জন্য আমরা একটি বাস্তব উদাহরণের সাহায্য নিতে পারি। ধরা যাক কোনও ব্যক্তি ঘূর্ণিঝড় ইয়াস-এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্যার্থে দুর্গত এলাকায় যায় ও প্রচারের উদ্দেশ্যে সেই ছবি সমাজ মাধ্যমে দেয়। কিন্তু এই সহানুভূতিমূলক কাজটি কোনও দূরবর্তী সৎ ফলাফল বা পরিণামের কথা চিন্তা করে বা সহানুভূতির সাপেক্ষে সে করে না; সে এই কাজটি করে সম্পূর্ণ নিজের খ্যাতিলাভের উদ্দেশ্যে। ব্যক্তির সম্মুখে সমাজ কর্তৃক প্রোথিত একাধিক প্রাথমিক ইচ্ছা উপস্থিত – নিজের নাম বা খ্যাতি লাভ করা, অপর ব্যক্তির উপকারার্থে সাহায্য করা ইত্যাদি। এক্ষেত্রে ব্যক্তির কর্মটি তার খ্যাতি লাভ করা নামক প্রাথমিক ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হয়। যদিও ব্যক্তির প্রাথমিক ইচ্ছা তাকে কর্মে প্রণোদিত করে, কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যক্তির ব্যক্তির খ্যাতি লাভ করার আকাঙ্ক্ষা-অনুভূতি তার সাহায্য করা রূপ প্রাথমিক ইচ্ছাকে অবদমিত করে ব্যক্তিকে খ্যাতি লাভ করার ইচ্ছা নামকপ্রাথমিক ইচ্ছা অনুসারে কর্ম সম্পাদনে উদ্যত করে।তাই এক্ষেত্রে ব্যক্তি প্রাথমিক ইচ্ছাঅনুযায়ী কর্মসম্পাদন করলেও তার সম্পাদিত কর্ম will বা চরম ইচ্ছার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় না। কারণ ব্যক্তি যখন খ্যাতিলাভের স্বার্থে কোনও কাজ সম্পাদন করে তখন সে তার ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হয়ে কাজটি করে এমন বলা যায় না। Second order desire বা ব্যক্তির will সর্বদাই ব্যক্তিকে ভালোত্তর পথে অগ্রসর করে। আত্ম-বিশ্লেষণের মাধ্যমে চরম ভালত্বে বা নৈতিক ব্যক্তিতে উন্নীত হতে অনুপ্রানিত করে। তাই Second order desire বা ব্যক্তির will কখনোই কেবল খ্যাতিলাভের স্বার্থে ব্যক্তিকে কোনও কর্মপালনে উদ্যত করে না।কোনও ব্যক্তির Will বা ইচ্ছা হয়তো এক বা একাধিক প্রাথমিক ইচ্ছার অনুরূপ হতে পারে, কিন্তু তারা একে অপরের সঙ্গে সমবিস্তৃত নয়।Will একমাত্র সমবিস্তৃত হয় সেই কার্যকরী আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যা ব্যক্তিকে Second order desire অনুযায়ী কর্ম সম্পাদনে অনুপ্রাণিত করে। এক্ষেত্রে কার্যকরী আকাঙ্ক্ষাটি হল ব্যক্তির জীবনে উত্তোরণের পথে অগ্রসর হওয়ার চুড়ান্ত আকাঙ্ক্ষা, যা একমাত্র Second order desire-ই হতে পারে। শর্ত সাপেক্ষ প্রাথমিক ইচ্ছাগুলি ব্যক্তিকে কোনও একটি নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনে প্রণোদিত করতে পারে। কিন্তু এই

আকাঙ্ক্ষাটি তার চূড়ান্ত লক্ষ্যের একটি অংশ হলেও কখনোই চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষা বলে গণ্য হয় না। Will বা ইচ্ছা কখনোই ব্যক্তিকে কেবল কোনও একটি নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনে উদ্যত করে না, বরং Will বা ইচ্ছা বলতে বোঝায় সেই কার্যকরী আকাঙ্ক্ষা যা ব্যক্তিকে তার জীবনের চুড়ান্ত লক্ষ্য পূরণের নিমিত্ত কর্ম সম্পাদনের প্রেষণার জন্ম দেবে –যা কেবল সেই ব্যক্তির হিতসাধনই করে না, অপর ব্যক্তিরও স্বার্থ বিঘ্নিত না করার লক্ষ্যে উদ্যত হয়।Second order desire মূলত ব্যক্তির Will বা ইচ্ছা কে প্রকাশ করে।

কোনও ব্যক্তির 'ক'নামক প্রাথমিক ইচ্ছাটি যদি তার Second order desire দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় এবং ব্যক্তি'ক'কর্ম সম্পাদনে প্রণোদিত হয় তখন তার এই কর্মটি তার ইচ্ছা অনুসারে হয়েছে একথা অনুমোদন যোগ্য হবে। অর্থাৎ কোনও ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থিত একাধিক কর্মসম্পাদনের আকাঙ্ক্ষা যেমন ক, 'খ', 'গ'এর মধ্যে 'ক'নামক প্রাথমিক ইচ্ছাটি তখনই তার Second order desire অনুসারী হবে যখন ব্যক্তির 'ক'নামক প্রাথমিক ইচ্ছাটি ব্যাক্তির চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষাকে পরিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে 'ক'নামক কর্মসম্পাদনে উদ্যত হবে। ব্যক্তির সকল প্রাথমিক ইচ্ছা অবশ্যম্ভাবীরূপে ব্যক্তির যা চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষা, ব্যক্তির যা will তার অনুরূপ হয় না। বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য ফ্রাঙ্কফুর্ট একটি উদাহরণের সাহায্য নিয়েছেন। ধরা যাক, একজন চিকিৎসক মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার স্বার্থে তাদের মাদকের অভাবে যে মানসিক পরিস্থিতির উদ্রেক হয় তা অভিজ্ঞতা করার প্রয়োজন বোধ করেন।এরজন্য তিনি ড্রাগ গ্রহণের যে আকাঙ্ক্ষা সেই আকাঙ্ক্ষাটি অনুভব করার আকাঙ্ক্ষা করেন। এক্ষেত্রে চিকিৎসকের প্রাথমিক ইচ্ছাটি হল তার মাদক গ্রহণের আকাঙ্ক্ষাটি অনুভব করা। তার মূল লক্ষ্য বা Second order desire হল মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা মাদকের অভাবে কি ধরনের মানসিক পরিস্থিতি অনুভব করেন তা অনুভব করা, মাদক গ্রহণ করা নয়। এই অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য চিকিৎসক মাদক গ্রহণের যে আকাঙ্ক্ষা কেবল সেটিকেই আকাঙ্ক্ষা করতে চান। অর্থাৎ মাদক গ্রহন কালে ব্যক্তির যে আকাঙ্ক্ষা হয় তা অনুভব করা, কিন্তু মাদক গ্রহণের আকাঙ্ক্ষাকে সম্পন্ন করা নয়। চিকিৎসক মাদক না গ্রহণের আকাঙ্ক্ষাটিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। চিকিৎসকের চুড়ান্ত আকাঙ্ক্ষা হল একটি নির্দিষ্ট মানসিক অবস্থার (মাদক না পেলে মাদকে আসক্ত ব্যক্তিরা কি অনুভব করেন) অভিজ্ঞতা লাভ করা।চুড়ান্ত ইচ্ছা কখনোই এই আকাঙ্ক্ষাটিকে কর্মে পরিণত করতে আগ্রহী নয়। অর্থাৎ এই আকাঙ্ক্ষার অনুভবের জন্য প্রাথমিক ইচ্ছামাদক গ্রহণ করা নামক কর্মে উদ্যোগী হলেও চুড়ান্ত ইচ্ছা ঐ কর্মকে সমর্থন করেনা। চিকিৎসক যদি মাদকের অভাবে মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের মানসিক পরিস্থিতির উপলব্ধি করতে পারেন তাহলেই তার চুড়ান্ত ইচ্ছাটি পূর্ণ হবে, মাদক গ্রহণের কোনো আকাঙ্ক্ষা চিকিৎসকের নেই। চিকিৎসকের এই প্রাথমিক ইচ্ছাটি কখনোই তার will বা ইচ্ছা রূপে পরিগণিত হতে পারে না, কারণ এই প্রাথমিক ইচ্ছাটি চিকিৎসকের জীবনের চূড়ান্ত কার্যকরী আকাঙ্ক্ষা

বা চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ নয়। প্রাথমিক ইচ্ছাঅনুযায়ী কর্ম সম্পাদিত হলেও, তা যদি চূড়ান্ত ইচ্ছা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় ও কর্ম সম্পাদনের সময় ঐ চূড়ান্ত ইচ্ছাটিকেই কর্মের মাধ্যমে পরিপূরণ করতে সমর্থ হয় তাহলে ঐ প্রাথমিক ইচ্ছাটি will বা ইচ্ছা রূপে পরিগণিত হয়। সুতরাং সমাজ পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি দ্বারা প্রোথিত যেকোনো আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্তির কার্যকরী আকাঙ্ক্ষা বা চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এখানে স্পষ্ট করা প্রয়োজন যে চূড়ান্ত ইচ্ছা সর্বদাই যে যুক্তি-নির্ভর হবে এমন নয়। কোনও ব্যক্তির চূড়ান্ত ইচ্ছাযদি তার চুডান্ত সংকল্প দ্বারা পরিচালিত না হয় তাহলে তাকে কর্তা বলে গণ্য করলেও নৈতিক কর্তা বলা যাবে না। কারণ ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষাগুলি অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তির সাময়িক উত্তেজনা বা প্রণোদনা থেকে উদ্ভব হয়। চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষাহল কেবল ব্যক্তির মানসিক ইচ্ছা। কিন্তু Volition হল দৃঢ় কর্ম প্রয়াস। কোনও ব্যক্তি যখন চিন্তাপ্রসূত ইচ্ছা অনুসারে কোনও আকাঙ্ক্ষাকে কর্মে পরিণত করতে আগ্রহী হয় যার দ্বারা সে তার সমগ্র জীবনের উদ্দেশ্য পূরণ করা সম্ভব হবে বলে মনে করে এবং ব্যক্তি যদি আকাঙ্ক্ষাটি যৌক্তিক কিনা এই বিচার বিবেচনা করে কর্ম সম্পাদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখনই ব্যক্তির second order volition আছে বলা যায়। সেক্ষেত্রে ইচ্ছার স্বাধীনতার যথাযথ প্রয়োগের দ্বারা সেই কর্মটি সম্পাদনের জন্য সে দায়বদ্ধ হয়ে পড়ে। তাই যুক্তি বা বুদ্ধি অনুসারে কর্ম সম্পাদিত হলেই কেবল ব্যক্তির দায়িত্ব সম্পূর্ণ হয় না। ব্যক্তির দায়িত্ব হলসেই চাহিদা বা আকাঙ্ক্ষা মনে প্রোথিত করা যা তাকে যুক্তিগ্রাহ্য পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করে। ব্যক্তিমাত্রই তার কোনও না কোনও আকাঙ্ক্ষা থাকে, কিন্তু নৈতিক কর্তার কেবল আকাঙ্ক্ষা থাকে না,Volition বা সংকল্পও থাকে। এই সংকল্পই ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্টভাবে কারণ থেকে কার্যেউপনীত হওয়ার পথ নির্দেশ করে। ফ্রাঙ্কফুর্ট মনে করেন, কোনও ব্যক্তির যদি চূড়ান্ত ইচ্ছা থাকে, কিন্তু চূড়ান্ত ইচ্ছাকে পূরণ করার চূড়ান্ত সংকল্প না থাকে তাহলে তাকে ব্যক্তি বা নৈতিক কর্তা না বলে ‘Wanton’ বলতে হবে[2]।Wanton বলতে বোঝায় এমন একজন কর্মের কর্তাকে যার প্রাথমিক ইচ্ছা থাকলেও কোনও চূড়ান্ত সংকল্পনেই। তাই Wanton কর্মের কর্তা হলেও তাকে নৈতিক কর্তা বলা যাবে না। Wanton কখনোই তার Will বা ইচ্ছা সম্বন্ধে যথাযথ বোধের অধিকারী নয়। তার আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য সে কর্ম করলেও ঐ আকাঙ্ক্ষাগুলি তার নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী কিনা, সে অন্য কোনও আকাঙ্ক্ষা দ্বারা চালিত হতে আগ্রহী কিনা সে বিষয়ে সে বিচারশীল নয়। এমন হতেই পারে যেতার কৃত কর্মটি অন্য ব্যক্তিদের সম্পাদিত কর্মের অনুকরণ। প্রকৃতপক্ষে ঐটি তার পরিকল্পিত আকাঙ্ক্ষা নয়।Wanton বলতে সাধারণত নিম্ন মানসবৃত্তিসম্পন্ন পশু ও অন্যান্য প্রাণীদের বোঝায় যারা কেবল প্রবৃত্তির তাড়নায় কর্ম সম্পাদন করে থাকে এবং শিশুদেরও বোঝায় যারা তাদের অভিভাবকদের নির্দেশ অনুসারে কর্ম সম্পাদন করে। প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিরাও Wantonবলে পরিগণিত হতে পারে যদি তাদেরপ্রাথমিক ইচ্ছাঅনুসারে কর্ম সম্পাদনের সামর্থ্য থাকলেও চূড়ান্ত

সংকল্প না থাকে। কোনও ব্যক্তির চুড়ান্ত ইচ্ছাআছে এ কথার অর্থ হল তার যুক্তি প্রদানের ক্ষমতা আছে। সে বিচার বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কোনও ব্যক্তির চুড়ান্ত আকাঙ্ক্ষা বা Volition of Second order desire আছে এ কথার অর্থ হল সে ইচ্ছার স্বাধীনতা বিশিষ্ট। ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকার অর্থ ব্যক্তি যা করতে আগ্রহী সেই কর্মটি করার স্বাধীনতা তার বর্তমান। ফ্রাঙ্কফুর্ট-এর মতে,ব্যক্তির ইচ্ছা যদি মনোগত বাসনা অনুসারে বা চাহিদা অনুযায়ী কর্ম সম্পাদনে সমর্থ হয় তাহলেই তার ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে। অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষাটিকে যদি ব্যক্তি যৌক্তিকভাবে বিচার করতে পারে, সেটি ব্যক্তির অগ্রসরতার সহায়ক হয়,তবেই ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে ।

সুতরাং ফ্রাঙ্কফুর্টের তত্ত্ব থেকে আমরা বলতে পারি ইচ্ছার স্বাধীনতা জন্মসূত্রে প্রাপ্ত নয়, সমাজ কর্তৃক প্রদত্ত কোনও অধিকার নয়। বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন হওয়ার কারণেই কেবলমাত্র ব্যক্তি ইচ্ছার স্বাধীনতার অধিকারী হতে পারে এমন নয় বরং এই স্বাধীনতা ব্যক্তি অর্জন করে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে।সুষ্ঠুভাবে সমাজ জীবনযাপনকালে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার বিস্তার, আত্মবিশ্লেষণী ক্ষমতা অর্জন ও বিচক্ষণতার ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি এই ইচ্ছার অধিকারী হতে পারে এবং এই ইচ্ছা প্রয়োগে সক্ষম হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে,ইচ্ছার স্বাধীনতা উপলব্ধি করে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করে।ইচ্ছাকে গঠন করার, সঠিক আকারে আকারিত করার সামর্থ্য বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন হওয়ার কারণে কেবলমাত্র ব্যক্তিরই থাকে। ফ্রাঙ্কফুর্টের এই ব্যাখ্যার মধ্যে আমরা অস্তিবাদী ধারণার একটি স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করি। কারণ অস্তিবাদে যেমন ব্যক্তির অস্তিত্ব তার স্বাধীনতা উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, ঠিক তেমনই এখানেও, আত্ম-বিশ্লেষণী ক্ষমতা, উত্তরণের পথে অগ্রসরতার মাধ্যমে আমরা ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতাকে প্রকাশ করতে পারি। তবে এখানে উত্তরণ বলতে কোনও বাহ্যিক বা ঐহিক বিষয় প্রাপ্তি নয়। উত্তরণ হল এখানে নৈতিক ব্যক্তিরূপে পরিপূর্ণতা অর্জন।সুতরাং বলা যায় ব্যক্তির সুষ্ঠুভাবে সমাজ জীবন যাপনের জন্য নৈতিক ব্যক্তিরূপে পরিপূর্ণতা অর্জনের জন্য সমাজের মধ্যেই এই ইচ্ছার স্বাধীনতাকে অর্জন করতে হয়। ইচ্ছার স্বাধীনতার অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবেই ব্যক্তিনির্ভর হলেও সামাজিক পরিকাঠামো, নিয়ম নীতি, অভিজ্ঞতা ও পরিস্থিতি ব্যক্তিকে এই ইচ্ছার স্বাধীনতা অর্জনে সাহায্য করে।

তথ্যসুত্র:

1. Timmermann, J. (2007). *Kant's Groundwork of the Metaphysics of Morals: A Commentary*. Cambridge University Press. P.XII
2. Frankfurt, H. G. (1971). Freedom of the will and the concept of a person. *The Journal of Philosophy*, 68(1), P. 13

সহায়কপত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থপঞ্জী

1. Clarke, R. (1992). Free will and the condition of moral responsibility. *Philosophical Studies*, 66, 53–72.
2. Fischer, J. M., &Ravizza, M. (1993). *Perspectives of Moral Responsibility*. Cornell University Press.
3. Fischer, J. M. (2004). Free will and moral responsibility. In D. Copp (Ed.), *The Oxford Handbook of Ethical Theory*. Oxford University Press.
4. Fischer, J. M. (1999). Recent work on moral responsibility. *Ethics*, 110(1), 93–139.
5. Frankena, W. K. (2015). *Ethics*. Person.
6. Frankfurt, H. G. (1971). Freedom of the will and the concept of a person. *The Journal of Philosophy*, 68(1), 5–20.
7. Frankfurt, H. G. (2003). Alternative possibilities and moral responsibility. In D. Widerker& M. McKenna (Eds.), *Moral Responsibility and Alternative Possibilities*. Ashgate Publishing Limited.
8. Hansen, C. (1972). Freedom and moral responsibility in Confucian ethics. *Philosophy East and West*, 22(2), 169–186.
9. Locke, D., & Frankfurt, H. G. (1975). Three concepts of free action. *Proceedings of the Aristotelian Society*, Supplementary Volumes, 49, 95–125.
10. Ritchie, D. G. (1895). Free-will and responsibility. *International Journal of Ethics*, 5(4), 409–431.
11. Shoemaker, D. (2007). Moral address, moral responsibility, and the boundaries of the moral community. *Ethics*, 118(1), 70–108.
12. Timmermann, J. (2007). *Kant's Groundwork of the Metaphysics of Morals: A Commentary*. Cambridge University Press.

বীরাঙ্গনা দুর্গাবতী : রাজকন্যা, রাজমহিষী ও রাজমাতা

জীবনকৃষ্ণ পাত্র
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বীরবিক্রম মেমোরিয়াল কলেজ, আগরতলা

সারসংক্ষেপ : 'মহামানবের সাগরতীরে' গড়ে ওঠা ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ত উজ্জ্বল এবং গৌরবময়। এই গৌরবময়তার পেছনে রয়েছে বহু বীর- যোদ্ধাদের আত্মোৎসর্গের কাহিনি। কাহিনিগুলোর সব কয়টি যে প্রকটিত হয়ে আছে, তা নয়। অনেক অনালোকিত কাহিনির পরিচয় পাই--যেগুলো ইতিহাসের রথচক্রতলে লুকিয়ে আছে; অথচ যেগুলোর গরিমা কোনো অংশে প্রচারের আলোকে আলোকিত কাহিনিগুলো থেকে কম নয়। রাজপুতনা অঞ্চলের বীরাঙ্গনা রানি দুর্গাবতী– রাজকন্যা, রাজমহিষী ও রাজমাতা হিসেবে আমাদের হৃদয়ে চিরকাল আসন পেতে উপবিষ্ট রয়েছেন। রাজমাতা দুর্গাবতীর বিচিত্র ব্যক্তিত্বের পরিচয় তুলে ধরা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। বহু রাজা-মহারাজ, রানি-মহারানির পরিচয় আমরা সহজে পেয়ে যাই, কিন্ত দুর্গাবতীর পরিচয় আমরা কয়জন জানি! সংক্ষিপ্ত পরিসরে তাঁর পরিচয় স্পষ্ট করা হল এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সূচক শব্দ: গৌরবময়, আত্মোৎসর্গ, রথচক্রতল, রাজকন্যা, রাজমহিষী, রাজমাতা, বীরাঙ্গনা।

মূল আলোচনা:

দেশ-কাল ভেদে কোনো জাতির ইতিহাস লেখা সাধারণ বিষয় নয়। জাতির ধারাবাহিক সংগ্রাম ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস রক্ত-আখরে লেখা হয়ে থাকে যদি ঐ জাতির পরম্পরায় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বীরযোদ্ধা স্বদেশ প্রেমিকরা জন্মগ্রহণ করেন এবং আত্মোৎসর্গ করে স্বদেশভূমিকে রক্ষা করেন। আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাস সুপ্রাচীনকাল থেকে সুমহান হয়ে আছে কারণ, ভারতমাতার গর্ভে বহু বীর ও বীরাঙ্গনা জন্মগ্রহণ করেছেন। যুবরানি, রানি ও রাজমাতা দুর্গাবতী তাঁদের মধ্যে একজন, যিনি শৌর্য, বীর্যে, তেজস্বিতায়, স্বদেশ প্রেমের কারণে ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি একদিকে যেমন ছিলেন গর্ভধারিণী মা, তেমনি অন্যদিকে ছিলেন বিধর্মী-বিদেশী শত্রুর হাত থেকে স্বদেশভূমিকে রক্ষার জন্য দৃঢ় সংকল্পকারিণী, বরাভয়দায়িনী, যুদ্ধাস্ত্র-সজ্জিতা বীরাঙ্গনা এবং প্রজাকুল রক্ষাকারিণী অতুলনীয় মাতৃকাশক্তির প্রতিভূ। ঝান্সির রানি লক্ষ্মীবাঈ, মাহিষমতীপুরীর রানি জনা, রানি জিজাবাঈ, রানি পদ্মিনী, রানি রাসমণি, রানি অহল্যাবাঈ--- এমনকি একালের কল্পনা দত্ত ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের মতো তিনি যেমন ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁর তেজস্বিতার কারণে, তেমনি

মৈত্রেয়ী, গার্গী, অপালার মতো তিনি যুক্তিবাদী ও বাস্তববোধের কারণে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিহাসেও স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর জীবন, প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম ও আত্মবলিদানের বিষয় প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করা যেতে পারে।

রানি দুর্গাবতী জন্মসূত্রে ছিলেন বংশগত আভিজাত্যে রাজপুতনার রাজপুত রাজা বিদ্যাধর সিং ও কিরাৎপাল সিং এর বংশধর। তিনি ৫-ই অক্টোবর, ১৫২৪ খ্রিস্টাব্দে চান্দেল রাজা কিরীট সিং শালিবাহনের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি মাতৃহারা হওয়ার কারণে পিতার নিকটেই লালিতা-পালিতা হন। স্বাভাবিকভাবে দুর্গাবতী শিক্ষা-দীক্ষায় তাঁর পিতার কাছে বড় হয়েছেন স্বভাব-সাহসী বালকের মতো। তাই তিনি কৈশোরে পিতার নিকট থেকে নীতিশিক্ষা, সমরশাস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা, অশ্বচালনবিদ্যা শিক্ষা প্রভৃতি বিষয় পারদর্শিতার সাথে রপ্ত করেছিলেন। এমনকি শিকার অভিযানে পিতার সামনে অব্যর্থলক্ষে তির সঞ্চালন করে বাঘ হত্যা করেছিলেন। পরবর্তীকালে বন্দুক চালিয়ে মানুষ খোকো বাঘের শিকার করে অসহায় প্রজাদের তিনি রক্ষা করেছিলেন। হাতি ও অশ্বের পিঠে বসে অস্ত্রচালনার মতো কঠিন বিদ্যাও তিনি অক্লেশে লাভ করেছিলেন। তাঁকে নিয়ে তাঁর পিতা যেমন খুবই গর্বিত ছিলেন, তেমনি তিনি প্রতিটি মুহূর্তে তাঁকে উৎসাহিত করে যেতেন।

দুর্গাবতী কৈশোরে অসামান্যা সুন্দরী হয়ে উঠলেন। তরুণী বয়সে তিনি সৌন্দর্যে ও সাহসে হয়ে উঠলেন এক মূর্তিমতী মহীয়সী। তিনি একসময় জানলেন, গণ্ডোয়ানার তরুণ রাজপুত্র দলপৎ শৌর্য ও পরাক্রমে একজন আদর্শ স্বদেশ প্রেমিকের পরিচয় দিয়ে চলেছেন। তাঁর গুণে মুগ্দ দুর্গাবতী তাঁকে বিবাহ করার বাসনা প্রকাশ করতেই চান্দেল পরিবারে বিরোধ সৃষ্টি হয়। কারণ, গণ্ডোয়ানার রাজ পরিবার চান্দেল রাজপরিবারের তুলনায় বংশগরিমায় ও আভিজাত্যে কুলীন নয়, সুতরাং দুই রাজপরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন অসম্ভব। কিন্তু দুর্গাবতী তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় থেকে তাঁর বন্ধবী রামচেরীকে দূত হিসেবে একখানি পত্র দিয়ে আমন্ত্রণের জন্য প্রেরণ করলেন রাজকুমার দলপতের কাছে। পিতা সংগ্রাম সিংহের অনুমতিক্রমে দলপৎ শাহ একদিন কিছুসংখ্যক হাতি ও ঘোড়াসহ বারো হাজার সৈন্য নিয়ে গণ্ডোয়ানা রাজ্যে প্রবেশ করলে রাজা কিরীট সিংহ তাঁকে সাদরে স্বাগত জানান এবং দলপৎকে নিয়ে তিনি তাঁর রাজ্যের সুদৃশ্য স্থানে পরিভ্রমণে বেরোন। স্থানীয় দুর্গামন্দিরে দলপৎ দেখেন অসামান্যা সুন্দরী রাজকন্যা দুর্গাবতী স্বয়ং দুর্গামূর্তিতে পূজার্চনা নিবেদন করছেন। দলপৎ এই রাজকন্যাকে এখানেই প্রথম দেখেন। পরের দিন দুর্গাবতী তাঁর পিতা, বান্ধবী রামচেরী, দলপৎ ও দলপতের বন্ধু মোহনদাস গভীর অরণ্যে শিকার অভিযানে বেরিয়ে পড়েন। এক নিরালায় দুর্গাবতী ও দলপত মতবিনিময় করে বিবাহের সিদ্ধান্ত নেন। দুর্গাবতী মনে করেন, মানুষের পরিচয় জাতে, ধর্মে বা বংশকৌলিণ্যে নয়, মানুষের পরিচয় তার কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা প্রতিষ্ঠায়, তার মহান আদর্শে এবং কতর্ব্যপরায়ণতায়। এছাড়া দুর্গাবতী মনে করেন, দাক্ষিণাত্যের গণ্ডোয়ানা রাজ্যের এই তরুণ বীর দলপৎই

সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ , যিনি উত্তর ভারতে ক্রমপ্রসারিত বিধর্মী মোঘল শক্তিকে সহজে দাক্ষিণাত্যে প্রবেশের মূল প্রতিরোধী শক্তির ভূমিকা পালনের যোগ্য নায়ক। দলপৎই দাক্ষিণাত্য রক্ষাকারী। এই সমস্ত ভাবনা রানি দুর্গাবতীর স্বদেশ প্রেমকে প্রকটিত যেমন করেছিল তেমনি তাঁর সুদূরপ্রসারী তীক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়ও দিয়েছিল। সুতরাং রাজা কিরীট সিংহ বিবাহের আয়োজন করলেন (১৫৪২ খি:), মহাসমারোহে বিবাহ সম্পন্ন হল। চান্ডেলের রাজকুমারী দুর্গাবতী হলেন গণ্ডোয়ানার যুবরানি এবং অব্যবহিত পরে দলপতের পিতা সংগ্রাম শাহের ইচ্ছাক্রমে দলপৎ হলেন রাজা আর দুর্গাবতী হলেন রাজরানি। বিবাহের কিছুদিনের মধ্যে রানি দুর্গাবতী গণ্ডোয়ানার রাজধানী সিংগরগড় এবং রাজ্যের সর্বত্র আবালবৃদ্ধবনিতার একান্ত প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠলেন আর স্বামীর সাথে শিকার অভিযানে গিয়ে অব্যর্থ নিশানায় তির নিক্ষেপ করে একজোড়া বাঘ শিকার করে তাঁর সাহসিকতা ও শক্তিমত্তায় যোগ্য সহধর্মিণীর পরিচয় দিলেন। তিনি প্রশাসনিক বিষয়ে স্বামীর কাছে যোগ্য পরামর্শদাত্রীর ভূমিকা পালন করে চললেন। তিনি তাঁর স্বামীকে পরামর্শ দিলেন যে, রাজ্যের সৈন্যদের আধুনিক প্রশিক্ষণ দেওয়া খুবই জরুরি। তাছাড়া বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সৈন্যদের প্রস্তুত থাকতে হবে, যে কোনো মুহূর্তে শত্রুপক্ষের সৈন্য আক্রমণ করলে প্রতি আক্রমণ করতে হবে, রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদকে যথাযথ ব্যবহার করতে হবে, নির্মম শুল্কব্যবস্থায় প্রজাগণ যাতে দুর্দশাগ্রস্ত না হয়ে পড়ে সেদিকে প্রশাসনকে সজাগ থাকতে হবে ---এই সমস্ত ভাবনা দুর্গাবতীকে পূর্ণ নারীত্বে উত্তীর্ণ করেছে। দুর্গাবতী স্বামীর সাহায্যে অনেক মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, অনেক পুষ্করিণী খনন করেছিলেন (মহিষ্মতীর ‘রাণীতাল’ বিখ্যাত পুষ্করিণী) এমনকি তাঁর বন্ধবীর দেওয়া মুক্তা হারের বিনিময়ে তিনি বৃহৎ পুষ্করিণী ‘চেরিতাল’ খনন করে বান্ধবীকে উৎসর্গ করেছিলেন। দুর্গাবতীর বান্ধবীর অনুপ্রেরণায় রাজমন্ত্রী অধরসিংহ ও একটি পুষ্করিণী খনন করে নাম দেন ‘অধরতাল’। দুর্গাবতীর এই সমস্ত শুভ প্রচেষ্টার কারণে গণ্ডোয়ানার প্রজারা তাঁকে দেবী দুর্গার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

বিবাহের তিন বছর পর রানি দুর্গাবতীর গর্ভে জন্ম নিল (১৫৪৫ খি:) এক সুন্দর দেবশিশুর মতো সন্তান, নাম তার বীরনারায়ণ। বীরনারায়ণ তাঁর পিতা-মাতার মতো বহুগুণের সম্ভার নিয়ে আসার পাঁচ বছরের মাথায় পিতৃহারা হন (১৫৫০ খি:)। অকালে কঠিন অসুখে দলপৎ মৃত্যুবরণ করেন। স্বামীর শোকে মুহ্যমানা দুর্গাবতী ভেঙ্গে পড়লেন এবং স্বামীর চিতায় সহমৃতা হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, কিন্তু রাজ্যবাসীর জীবন, নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে এবং নাবালক পুত্রের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে দূরে সরলেন। তিনি বালকপুত্র বীরনারায়ণকে নিজের আদর্শে বিচিত্র বিদ্যায় পারদর্শী করার চেষ্টা করলেন এবং বীরনারায়ণকে রাজসিংহাসনে বসিয়ে রাজমাতা হিসেবে প্রজাকল্যাণ ও দেশ-রক্ষার কাজে ব্রতী হলেন। এ বিষয়ে তাঁর বান্ধবী রামচেরীর ভূমিকা অতুলনীয়।

রাজসিংহাসনে বীরনারায়ণকে আসীন করার পর রাজমাতা দুর্গাবতী লক্ষ করেন প্রতিবেশী শত্রুরাজারা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে গণ্ডোয়ানা আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। রাজমাতা বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে নিজে তাঁর সৈন্যদেরকে দেশ-রক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানালেন। এর মধ্যেই তাঁর প্রিয় পুত্র বীরনারায়ণ পনেরো বছর বয়সে উপনীত হলেন সম্পূর্ণ মাতৃকাশক্তির ছত্রছায়ায় বলীয়ান হয়ে। রাজমাতা পুত্রের সাথে মহাপরাক্রমে প্রতিবেশী শত্রুদের পরাভূত করে তাদের ছোট ছোট রাজ্য নিজের দখলে আনলেন এবং নিজের রাজ্য ও রাজধানীকে আরও সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করলেন। একদা রাজমাতা দুর্গাবতী হঠাৎ অবগত হলেন যে--- শেরশাহের কর্মচারী সুজাত খানের পুত্র বাজবাহাদুর মালব শাসন করছিলেন, তিনি সুলতান হিসেবে প্রচুর সংখ্যক সৈন্যের সাহায্যে গণ্ডোয়ানার অভিমুখে অভিযান করে গণ্ডোয়ানা দখলের জন্য এগোচ্ছেন। দুর্গাবতী সেই সময় বাজবাহাদুরের সৈন্যদের বিরুদ্ধে নিজের সৈন্য নিয়ে সম্মুখ-সমরে অবতীর্ণা হলেন এবং বাজবাহাদুরকে অক্লেশে পর্যুদস্ত করে বিতাড়িত করলেন। রাজমাতা দুর্গাবতীর অল্প সংখ্যক সৈন্য থাকা সত্ত্বেও তাঁর উপস্থিতবুদ্ধি ও রণকৌশলের কারণে এই জয়লাভ সম্ভব হয়েছিল। রাজমাতা তাঁর সৈন্যদের দৃঢ়তা ও দুর্জয় সাহসের জন্য প্রশংসা করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন এমনকি তাদের পুরস্কৃতও করেছেন। কয়েকদিন পর বাজবাহাদুরের সৈন্য (হস্তী আরোহী, অশ্বারোহী, পদাতিক) বিপুল পরাক্রমে পুনরায় আক্রমণ করতে চাইলে পাহাড়ের গুহায়, জঙ্গলের ঝোপের ভেতরে নদীর তীরে লুকিয়ে থাকা অল্পসংখ্যক গণ্ডোয়ানার সৈন্য অতর্কিতে আক্রমণ করে বাজবাহাদুরের বহু সংখ্যক সৈন্যকে জখম করে দেয়, বহুসংখ্যক সৈন্য ঘটনাস্থলে মারা যায়, আর বাকি সৈন্য আত্মরক্ষার জন্য পিছু হটে। বাজবাহাদুরের সেনাপতি ফতেহ্ খান মৃত্যুবরণ করে। বাজবাহাদুরের মনোবল ভেঙ্গে যায় এবং তিনি অবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে দ্রুত পলায়ন করেন। এইভাবে ১৫৫৫ খ্রি:--- ১৫৬০ খি: পর্যন্ত বাজবাহাদুর বার বার গণ্ডোয়ানা আক্রমণ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থ হন। এই ব্যর্থতার পেছনে রয়েছে রাজমাতা দুর্গাবতীর যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শিতা, তাঁর সৈন্যবাহিনীর দৃঢ় মনোবল, জাত্যভিমান ও স্বদেশ প্রীতি।

এদিকে ১৫৬০ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট আকবর ওয়াকিল পদ থেকে বৈরাম খাঁকে অপসারিত করে সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজে মনোযোগী হন। তিনি ১৫৬১ খ্রিস্টাব্দে মালব জয়ের মধ্য দিয়ে দাক্ষিণাত্য বিজয় নীতির কার্যকরতা শুরু করেন। মালবের শাসন কর্তা বাজবাহাদুরকে তিনি উৎখাত করেন। তারপর তিনি গণ্ডোয়ানা জয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। আকবর কারা প্রদেশের শাসনকর্তা আসফ খানকে গণ্ডোয়ানা আক্রমণের নির্দেশ দেন। কথিত আছে যে, আক্রমণের পূর্বে সম্রাট আকবর একটি সোনার খাঁচা এবং একটি চিঠি রাজমাতা দুর্গাবতীর নিকট প্রেরণ করেন। চিঠিতে লেখা আছে--- একজন সামান্যা নারী হয়ে একটি রাজ্যের প্রধান শাসক হিসেবে দুর্গাবতী একেবারে বেমানান। এও উল্লেখ আছে--- বশ্যতা স্বীকার করতে হবে (অর্থাৎ সোনার খাঁচায় বন্দী হয়ে ভোগ

বিলাসিতার মধ্যে আকবরের অনুগত দাসী হিসেবে থাকতে হবে) অথবা যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে। আকবর খবর পেয়েছিলেন গণ্ডোয়ানা একটি সমৃদ্ধ ও সম্পদশালী রাজ্য। এই রাজ্য ৪৮ হাজার বর্গমাইল বিস্তৃত, যার মধ্যে রয়েছে ৭০ হাজারের মতো গ্রাম, একাধিক সমৃদ্ধ নগর এবং প্রচুর কেল্লা। এছাড়া রয়েছে ২০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য, ১০০০ হাতি এবং যথেষ্ট সংখ্যক পদাতিক সৈন্য। রানি দুর্গাবতী আকবর প্রেরিত চিঠি পেয়ে প্রথমে বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। কারণ, সম্রাট আকবর বৃহৎ মোঘল সাম্রাজ্যের অধিপতি, তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হলে তাঁরই সমকক্ষ হতে হবে, অন্যথায় বিপর্যয়কে বরণ করতে হবে। রানি দুর্গাবতী কূটনৈতিকভাবে বশ্যতা স্বীকারের পরিবর্তে রাজমন্ত্রী অধরের মাধ্যমে সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব সম্রাটের নিকট পাঠালেন, কিন্তু আকবর গণ্ডোয়ানা রাজ্যের ধনসম্পদ করায়ত্ত করার জন্য সন্ধি প্রস্তাব খারিজ করেন। আকবর ১০ হাজার সৈন্য প্রেরণ করে আসফ খানকে গণ্ডোয়ানা আক্রমণের নির্দেশ দেন। দুর্ভাগ্য যে, রাজমাতা দুর্গাবতী চক্রান্তের স্বীকার হন। তাঁর বিপুল সংখ্যক সৈন্যবাহিনীর বেশিরভাগ অংশ তাঁকে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকে। এমন অবস্থায় রাজমন্ত্রী অধর এবং পরিষদবর্গ দুর্গাবতীকে যুদ্ধযাত্রা থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু দুর্গাবতী তাঁদের অনুরোধ উপেক্ষা করে মোটামুটি ২০০০ সৈন্য (অন্যমতে ৫০০০ সৈন্য) নিয়ে আসফ খানকে সম্মুখ যুদ্ধে হটিয়ে দেন এবং তাঁর সেনাবাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দেন। পর্যুদস্ত আসফ খান ঐ রাত্রে দুর্গাবতীর সৈন্যবাহিনীর পিছু নিয়ে অতর্কিত আক্রমণ করার চেষ্টা করলে দুর্গাবতীর সৈন্যবাহিনী পরের দিন সকালবেলা পর্যন্ত যুদ্ধ করে মনোবল হারিয়ে ফেলে। তীব্র বৃষ্টি, পাহাড়ী সংকীর্ণপথ, পাবর্ত্য ঝরনা প্রভৃতি প্রতিকূল পরিবেশে অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে পুত্র বীরনারায়ণকে সঙ্গে করে তিনি যুদ্ধে অবশ্যম্ভাবী পরাজয় জেনেও ম্যাসিডনের অধিপতি আলেকজান্ডারের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা পুরুর মতো প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে প্রথমে আহত হন বীরনারায়ণ। দুর্গাবতী জীবনমৃত্যুর সন্ধিলগ্নে দাঁড়িয়ে হাতির পিঠে বসে তাঁর অব্যর্থ নিশানায় একের পর এক মোঘল সৈন্যকে ভূপাতিত করতে লাগলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য! হঠাৎ একটি তির এসে দুর্গাবতীর চোখের কাছে এসে বিদ্ধ হল। আর একটি তির এসে তাঁর গলার কাছে বিদ্ধ হল। বীরাঙ্গনা দুর্গাবতী দুটি তির নিজের হাতে উৎপাটন করলেন। প্রবল রক্তস্রোত তাঁর বরাঙ্গকে সিক্ত করল। তিনি আশাহত হলেন। অবশেষে তিনি তাঁর হাতির চালক (মাহুত)-কে বললেন,“Pierce your spike in my chest so that the enemy not defile me till I am alive.” মাহুত রানির আহ্বানে বিস্মিত হলেন কিন্তু রানিকে হত্যা করতে পারলেন না। রানি আবার মাহুতকে চিৎকার করে নিজের তরবারি বের করে নির্দেশ দিলেন, “Swing this dagger, damn it ! Your queen Commands !” মাহুত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রানির নির্দেশ পালন করতে না পারায় বীরাঙ্গনা দুর্গাবতী তাঁর হাতের অস্ত্র নিজের বুকে বিদ্ধ করে আত্মহত্যা করলেন (২৪-শে

জুন, ১৫৬৪ খি:)। তাঁর এই আত্মহত্যাকে ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ অসাধারণ ব্যাখ্যায় মূল্যায়িত করেছেন---

"Choosing death rather than dishonor, she stabbed herself to the heart so that her end was as noble and devoted as her life had been useful." (Akber the Great Mughal, Page-51)

গণ্ডোয়ানা রাজ্য পরিণামে মোঘল আধিপত্যে চলে যায়। পরবর্তীকালে আকবর গণ্ডোয়ানার শাসনভার দলপৎ শাহের বংশধর চন্দ্র শাহকে দেন। চন্দ্র শাহ মোঘলদের প্রতি বশ্যতা জ্ঞাপন করেন। এক তেজস্বিনী মহীয়সী নারীর এহেন পরাজয় ইতিহাস পাঠক এবং স্বদেশ প্রেমিকদের অশ্রুসজল করে তোলে। এই পরাজয় যেন ইতিহাসের ট্র্যাজিক বেদনাকে এখনো বহন করে চলছে। তবে আশার কথা, উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন যখন ক্রমশ উন্মেষ থেকে সমৃদ্ধি এবং অন্তিমলগ্নে উপনীত হতে চলেছিল তখন স্বাধীনতাকামী শিক্ষিত স্বল্প-শিক্ষিত ও যুবসম্প্রদায়ের কাছে দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা স্বরূপ আদর্শ হিসেবে আরাধ্য হয়েছিলেন রাজমাতা দুর্গাবতীর মতো এই ভারতভূমির বীরাঙ্গনা এবং বীররা। এঁদের সংগ্রামময় জীবনগাথা স্বাধীনতাকামী আপামর ভারতবাসী এবং স্বাধীনতা উত্তর ভারতবাসীর কাছে অগ্নিমন্ত্রের দীক্ষা দিয়েছিল এবং দিতে থাকবে।

মহীয়সী রাজমাতা দুর্গাবতীকে স্বাধীনোত্তর মধ্যপ্রদেশ সরকার ১৯৮৩ খিস্টাব্দে সম্মান জ্ঞাপন করে জববলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে 'রাণী দুর্গাবতী বিশ্ববিদ্যালয়' নামটি প্রদান করেছে। ভারত সরকার তাঁর স্মরণে ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে ২৪-শে জুন ডাক টিকিট প্রকাশ করেছে। এর সাথে সাথে ভারত সরকার জববলপুর জংশন থেকে জম্মু তাইওয়াই এক্সপ্রেস ট্রেনের(11449/11450) নাম দিয়েছে 'দুর্গাবতী এক্সপ্রেস'। এমনকি ২৪শে জুন তাঁর আত্মবলিদানের দিনটিকে আমরা 'বলিদান দিবস' হিসেবে শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করেছি।

ঋণ স্বীকার:

১) ভারতের ইতিহাস কথা --- কিরণ চৌধুরী, পঞ্চম সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ, ১৯৮৯ খ্রি., পৃষ্ঠা-২৪০, মর্ডান বুক এজেন্সি, কলকাতা।

২) মোঘল সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)--- অনিরুদ্ধ রায়, ২০০৫, পৃষ্ঠা-৭৪-৭৫, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা।

৩) মুঘল যুগ থেকে কোম্পানি আমল --- সৌমিত্র শ্রীমানী, ২০০৮, পৃষ্ঠা ২৮-২৯, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, কলকাতা ।

৪) RANI DURGAVATI (A PICTURE BOOK) by Prabhat Prakashan (New Delhi).

৫) Yahoo.com & Google. com.

তোমায় কিছু দেব বলে : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'খেয়া' কাব্যের অন্তর্জগত

সুমনা সান্যাল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সোনামুখী কলেজ, সোনামুখী, বাঁকুড়া

সারসংক্ষেপ (Abstract): এই প্রবন্ধে আমার মূল প্রতিপাদ্য 'খেয়া' কাব্যে নিহিত রবীন্দ্রনাথের মন-এর বহুমাত্রিক চলাচলের যাত্রাপথ। মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির সামান্য দুই একটি সূত্র আমি এই লেখায় ব্যবহার করেছি।

'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে নিজের কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "বোঝানো কাজটা সম্পূর্ণ আমার নিজের হাতে নাই-যিনি বুঝিবেন তাঁহার উপরেও অনেকটা নির্ভর করিবে। আশঙ্কা আছে, অনেক পাঠক বলিবেন, কাব্যও হেঁয়ালি রহিয়া গেল, জীবনটাও তথৈবচ"।

অন্তঃকরণের পূর্বাপর বিবেচনাই মনঃসমীক্ষণ। এক গহন সত্ত্বার মেঘ ও রৌদ্রের খেলা, বিচিত্র প্রতীক, সঙ্কেত, এমনকি অ-দেখা রঙ নিয়েই গড়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভুবন। জীবনের শেষপ্রান্তে **১৯৩১** সালে 'শান্তিনিকেতন প্রবন্ধমালা' গ্রন্থে তিনি লিখেছিলেন "সাহিত্য রচনায় লেখকের প্রকৃতি নিজের অগোচরে নিজের পরিচয় দেয়"

আমার এই লেখা রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া' কাব্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন সেই 'অগোচর মন' কে খুঁজে দেখার চেষ্টা করবে।

মূল শব্দাবলী (Key Words): খেয়া, মনঃসমীক্ষণ, বঙ্গভঙ্গ, সমকালীন বাংলাদেশ, চিত্তবৃত্তি, secret self, defence mechanism।

মনঃসমীক্ষণ (Psychoanalysis): এবং সাহিত্যের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক সম্বন্ধে 'Literature and ' Psychoanalysis' প্রবন্ধের 'To open the Question' অধ্যায়ে মনঃসমীক্ষক ও প্রাবন্ধিক স্যোশানা ফেলম্যান(Shoshana Felman)লিখেছেন সাহিত্যতাত্ত্বিকেরা চান, মনঃসমীক্ষণ ও সাহিত্যের মধ্যে একটা সত্যিকারের কথোপকথনের জায়গা খুলে যাক। কীভাবে? তারও উত্তর দিয়েছেন ফেলম্যান-" as between two different bodies of language and between two different modes of knowledge"

এভাবেই, ভাষা এবং জ্ঞানতত্ত্বের প্রকল্পের ভিন্ন ভিন্ন শরীর, মেজাজকে সঙ্গে নিয়েই সাহিত্যের অন্তরমহল কে পাঠ করে সাইকোঅ্যানালাইসিস বা মনঃসমীক্ষণ। সাহিত্যের ভাষার 'অপর' (other) হয়ে উঠে মনঃসমীক্ষণ কান পেতে শোনে সেইসব

'না বলা বাণী ঘন যামিনীর মাঝে। এভাবে এই লেখাও সাইকোঅ্যানালাইসিস কে সঙ্গে নিয়ে খেয়া পারাপার করবে।

খেয়া প্রকাশিত হয় ১০ই অগস্ট, ১৯০৬ সালে। আখ্যাপত্রে লেখা ছিল খেয়া/শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, বোলপুর/ মূল্য ১ টাকা। আখ্যাপত্রের পিছনের পাতায় ছিল মজুমদার প্রেশ/৫০নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট,/কলিকাতা। কবি এই কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করেছেন বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু কে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা সম্পর্কে তৎকালীন বাংলা সমালোচক এবং পাঠক মহলে বারবার উঠেছে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ। খেয়াও এর ব্যতিক্রম হলোনা। মনে রাখতে হবে, খেয়া প্রকাশের আগেই দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে কাব্যের অভিব্যক্তি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মতবিরোধ হয়েছে। খেয়ার একটি সমালোচনা বেরোয় প্রবাসী পত্রিকায় ১৩১৩ কার্তিক সংখ্যায়। কোনো এক অজ্ঞাতনামা সমালোচক লিখেছেন "সত্য সত্যই ফুটিতে পারে নাই, কাজেই অস্পষ্টতাদোষে দূষিত হইয়াছে, এরকম কেবল তিনটি কবিতা এ গ্রন্থে আছে,যথা-দান, বাঁশি এবং হার।

সমালোচকদের পাশে সরিয়ে আমরা এখন দেখে নেবো 'খেয়া' কাব্যের কবিতাগুলি রচনার অব্যবহিত আগে এবং রচনাকালীন সময়ে কেমন ছিল বাংলাদেশের পরিবেশ এবং সেই প্রসঙ্গেই দেখবো সেই সময় রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কাজ এবং অন্যান্য লেখা যা তাঁর মনের সঙ্গে সংলগ্ন ছিল।

১৯০৫ সাল থেকে শুরু হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়। তাই খেয়া'র কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল বয়কট আন্দোলনে উত্তাল বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে।আবার, এসবের ঠিক এক বছর আগে বিশ্ব-রাজনীতির অঙ্গনে আরম্ভ হয়েছে রুশ-জাপান যুদ্ধ (১৯০৪খ্রীষ্টাব্দ)

১৯০৫ সালে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রয়াত হলেন।এই বছরেই মার্চ মাসে 'সফলতার সদুপায়' প্রবন্ধে ভাষাবিচ্ছেদের প্রতিবাদ করলেন রবীন্দ্রনাথ।'ভাণ্ডার' পত্রিকার সম্পাদকের পদেও এলেন কবি। ৭ই অগাস্ট বয়কট আন্দোলনের সুত্রপাতে টাউনহলে 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' প্রবন্ধ পাঠ, স্বদেশী গান রচনা, অক্টোবর ১৬ তারিখে বঙ্গবিচ্ছেদ ঘোষণার প্রতিবাদে রাখীবন্ধন ও বিবিধ গান রচনা, কুষ্ঠিয়াতে বয়ন বিদ্যালয়, পতিসরে কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন, ১৯০৬ সালে বঙ্গদর্শনের সম্পাদক পদ থেকে অবসর এবং ১৯০৬ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ 'ভারতবর্ষ', 'খেয়া' ও 'নৌকাডুবি'। খেয়া'র কবিতাগুলি রচনা এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশের সমকালে এই ছিল তাঁর সামাজিক কর্মব্যস্ততার দিনলিপি।

প্রশান্তকুমার পাল তাঁর 'রবিজীবনী'র পঞ্চম খণ্ডে লিখেছেন "রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনকে অনুসরণ করা কঠিন। বহুবর্ণ রঞ্জিত ও অসংখ্য মহলে বিভক্ত সেই কাব্যালোকের গোলকধাঁধায় ক্রমবিকাশ ও পরিণতির পথটি চিহ্নিত করা দুরূহ। এই সমস্যা আরও তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে খেয়া-র কবিতাগুচ্ছ থেকে"। বাইরের এইসব

কোলাহল, অভিঘাত খেয়ার কবিতাগুলিকে স্পর্শমাত্র করেনি। কী এমন কারণ যার জন্যে সমকালীন সামাজিক প্রেক্ষিত একবারও এই কবিতাগুলিতে উঠে এলোনা?

মনঃসমীক্ষক সিগমুন্ড ফ্রয়েড মনকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। চেতন(Conscious), অবচেতন(Unconscious) এবং আসংজ্ঞান বা অতি-চেতন(Pre-conscious)।চেতন মন হলো ব্যক্তির সচেতন চিন্তা ও অনুভূতি। এমন কিছু স্মৃতি যা সহজেই চেতন্মনে জাগ্রত হয়। আত্মসচেতনতা, আত্মকেন্দ্রিকতা সবই চেতন মনের অংশ। অবচেতন মন আমাদের স্বপ্ন ও স্বয়ংক্রিয় চেতনার ভাণ্ডার, ভুলে যাওয়া অবদমিত স্মৃতি, কামনা বাসনার আধার। অতিচেতন মনের এমন একটি দিক যা চেতন আর অবচেতন এই দুই স্তরের সঙ্গেই যুক্ত থাকে। এই স্তর মানসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করতে পারে, অবদমিত স্মৃতি জাগিয়ে তুলে সেই স্মৃতি আর জ্ঞানকে মনের চেতন স্তরে পৌঁছে দিতে পারে। এই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই, শুধুমাত্র লেখার প্রয়োজনে সামান্য পরিচিতি মাত্র।

অবচেতন মন দুই ধরণের প্রবৃত্তি নিয়ে গঠিত। একটি হলো জৈবিক প্রবৃত্তি, অন্যটি অবদমিত কামনা। প্রবৃত্তি আর অবদমিত কামনা নিয়ে অবচেতনের যে অংশ গঠিত তার নাম অদস বা ইদ(Id), যার একমাত্র লক্ষ্য সুখপ্রাপ্তি, বাসনা মেটানো।

এরপর মানবমন যখন বাস্তবের সংস্পর্শে এসে বুঝতে পারে যে তার সব চাহিদা কখনো পূর্ণ হবেনা তখন মন তার চাহিদাকে সীমিত করার চেষ্টা করে। কোনো কোনো চাহিদা পুরোপুরি অবচেতনে নির্বাসিত হয়। এই গোটা প্রক্রিয়াটা মিলিত হয়ে তৈরি হয় একটি agency বা ক্রিয়াকর্তা, বাস্তবের সঙ্গে যার সংযোগ আছে এবং যে ইদ বা অদস এর প্রবৃত্তিকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ফ্রয়েড এই ক্রিয়াকর্তা বা agency এর নাম দিয়েছেন অহম বা Ego। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানবমনে যে মূল্যবোধ গড়ে ওঠে তাকে ফ্রয়েড বলেন অধিশাস্তা বা Super-ego।ইদ এর চাহিদাগুলি থাকে অবচেতনে আর অহম বা Egoথাকে মনের চেতন স্তরে।অনেক সময় অহম(Ego) অদস(Id)এর চাহিদার বিরুদ্ধে একধরণের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলে যাতে অদস এর অন্ধ চাহিদা, প্রবৃত্তিকে অন্তত কিছু পরিমাণে অবদমন করা যায়। এই অবদমন বজায় রাখতে গিয়ে প্রচুর পরিমাণে মানসিক শক্তির ক্ষরণ হয়। এইভাবে Ego তে সঞ্চিত মানসিক শক্তির অনেকটাই ক্ষয় হয় নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে। মনঃসমীক্ষণ এই প্রক্রিয়ার নাম দিয়েছে Defence mechanism বা প্রতিরক্ষা।এবার এই কয়েকটি সূত্রকে মনে রেখে আমরা প্রবেশ করবো 'খেয়া'কাব্যের অন্তরমহলে।

নৌকা বা খেয়ার চিত্রকল্প রবীন্দ্রকাব্যের একটি বহু ব্যবহৃত অনুষঙ্গ। 'সোনার তরী'র মাঝি বা খেয়ার 'নেয়ে'র মুখ ছিল আবৃত। নির্বাক সেই মাঝি কবির কোনো আর্তিরই উত্তর দেয়নি।সোনার তরীর 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতার সেই নাবিকা, সেই নারীর প্রতিটি দেহভঙ্গির সংগে জড়িয়ে ছিল মৃত্যুর চিত্রকল্প।'সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা', 'অসীম রোদন', 'সংসশয়ময় ঘননীলনীর' এই মৃত্যুর অনুষঙ্গের মধ্যে পাঠককে যা

ভাবায় তাএই নাবিকার সঙ্গে কবির পূর্বপরিচিতি। "যখন প্রথম ডেকেছিলে তুমি/কে যাবে সাথে/ চাহিনু বারেক তোমার নয়নে নবীন প্রাতে"। অর্থাৎ খেয়াতে যিনি কবিকে নিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রায় চলেছেন তিনি কবির পরিচিতা এবং এক অপার প্রগাঢ আকর্ষণে তিনি ওই রমণীর সঙ্গে খেয়ায় যাত্রা করেছেন।'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের নৌকা সংক্রান্ত প্রথম কবিতার নাম 'শেষ খেয়া', যেন এই বুঝিবা শেষ ভেসে চলা।সমস্ত কবিতা জুড়ে কী যেন এক অনির্দেশ্য বেদনা- "ঘরেও নহে পারেও নহে/যে জন আছে মাঝখানে/সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে"

অবচেতনে জমে ওঠা সেই অন্ধ প্রবৃত্তি এখানে দেখা দিল, সে প্রবৃত্তি Thanatos, মারণ প্রবৃত্তি। খেয়ার অনেক কবিতাই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন নারীর জবানীতে। 'ঘাটের পথ', 'শুভক্ষণ', 'ত্যাগ', 'দান', 'গোধূলিলগ্ন' এইসব কবিতায় কথা বলেছে নারী। দুটি কারণে এভাবে লেখা হতে পারে। হয়তো কবি এইসব কবিতার মধ্যে নিহিত বিষণ্ণতাকে বলিয়ে নিচ্ছেন তাঁর কোনো প্রিয় পরিচিতার ভাষ্যে, হয়তো যা সে কখনো বলতে পারেনি অথচ রবীন্দ্রনাথ তার মুখে শুনতে চেয়েছেন সেসব কল্পনাকে এখানে তিনি রূপ দিয়েছেন।দ্বিতীয়ত, এসব কবিতার মধ্যে হয়তো কবির এক বিশেষ চিত্তবৃত্তির প্রকাশ ঘটেছে। যে কোনো বড়োমাপের কবি/শিল্পীর মধ্যে একইসঙ্গে বাসা বেঁধে থাকে পুরুষ এবং নারী।এসব কবিতায় কবির অন্তরের পুঞ্জীভূত নারীসত্তার চলাচলের স্পর্শ পাওয়া গেল।প্রসঙ্গত, 'খেয়া'র আগে প্রকাশিত 'উৎসর্গ' কাব্যের ১০ নং কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন-

> "আমার মাঝারে যে আছে কে গো সে,
> কোন বিরহিনী নারী?"

খেয়া'র 'ঘাটের পথ' কবিতায় জল আনতে যাওয়া বধূ যেন পদাবলীর রাধা। চণ্ডীদাসের বিরহকাতর রাধা। আবার পদাবলীর রাধার বর্ষাভিসারের প্রতীকেসেছে এই কবিতায়।
"আমি ডরি নাই ঝড়জল/উড়েছে আকাশে উওতলা বাতাসে/উদ্দাম অঞ্চল"

এর পরের কবিতার নাম 'ঘাটে'। যেন নিজেকেই বলছেন কবি, তোমাদের বাইরের কর্মকাণ্ডে, তোমাদের উগ্র দেশপ্রেমে, সীমিত জাতীয়তাবাদে আমি আর নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছিনা। এ প্রসঙ্গে প্রশান্তকুমার পাল লিখছেন সেই সময় রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে যেভাবে ব্যস্ত, উদ্বিগ্ন ছিলেন বাংলাদেশের সংকট নিয়ে ঠিক ততোটাই ছিলেন নীরব। ১৯০৪ সালের ১৯শে জুলাই ভারত সরকার 'Extraordinary' গেজেটে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব প্রকাশ করার পরদিন 'বেঙ্গলী' পত্রিকা কালো বর্ডার দিয়ে সেই খবর ছাপে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এরপরেও বিস্ময়করভাবে নীরব ছিলেন। সমকালের থেকে চিন্তায় প্রজ্ঞায় অনেক এগিয়ে ছিলেন তিনি।কোনদিনই হুজুগে মাতেননি।বয়কট আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা,দরিদ্র দেশীয় ব্যবসায়ী এবং ক্রেতাদের জন্যে বয়কটের ক্ষতিকর দিক পরবর্তীকালে তাঁর 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে এসেছে। যদিও বঙ্গভঙ্গের কালে চারণকবির ভূমিকা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য স্বদেশ

পর্যায়ের গান লিখেছেন।যার মধ্যে একটি বিখ্যাত গান 'আমার সোনার বাংলা' এবং 'বাংলার মাটি বাংলার জল'।কিন্তু হুজুগে যোগ না দেওয়া এই নীরবতাকে ঠিক ক্লান্তি বলা যায়না।

এরপর আসবে 'শুভক্ষণ' কবিতার প্রসঙ্গ। এই কবিতায় নারীর ভাষ্যে উঠে এসেছে এক পরম অপেক্ষার ছবি-

"ওগো মা, রাজার দুলাল যাবে আজি মোর/ঘরের সমুখপথে/আজি এ প্রভাতে গৃহকাজ লয়ে/রহিব বলো কী মতে/ বলে দে আমায় কী করিব সাজ/কী ছাঁদে কবরী বেঁধে লব আজ/পরিব অঙ্গে কেমন ভঙ্গে কোন বরনের বাস"- রাজার দুলালকে একবারমাত্র চোখে দেখা, এই আর্তিরই মিত এবং সংহত রূপ এই 'শুভক্ষণ' কবিতাটি।

'গোধূলিলগ্ন' কবিতায় যেন বাসকসজ্জিকা রাধা তাঁর বিবাহের বাসরশয়ন সাজিয়ে তুলছেন। বিবাহের রঙে রাঙা হয়ে আসা বাসরঘর যূথীদলে সাজাতে হবে- "সারা যামিনীর দীপ সযতনে/জ্বালায়ে তুলিতে হবে বাতায়নে/যূথীদল আনি গুণ্ঠনখানি করিব বয়ন যে"। 'চিত্রা' কাব্যের 'জীবনদেবতা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ নিজেকে বাসরঘরের বধূরূপে কল্পনা করেছিলেন এডওয়ার্ড থম্পসন যাকে বলেছিলেন 'অস্বস্তিকর'। ফ্রয়েড লিখেছেন-" One has to have two sexual phantasies,of which one has a masculine and the other a feminine phantasies, of which has a masculine character" অত্যন্ত সংবেদনশীল কবি শিল্পীদের মধ্যে অনেক সময় এই দ্বৈত সত্ত্বার উপস্থিতি থাকে।খেয়া'র 'আগমন' কবিতায় ২০১১ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। 'রক্তকরবী' 'রাজা' এইসব নাটকে রাজার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে আসে তাঁর ধ্বজা। প্রতিটি ক্ষেত্রেই রাজাকে চোখে দেখা যায়না এবং তিনি আসেন আঁধার রাতে। অপ্রস্তুতির মধ্যেই রাজাকে বরণ করার আয়োজন চললো। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক বোধের সংগে আমরা পরিচিত। আমরা জানি তিনি কোনো বানিয়ে তোলা ঈশ্বরে বিশ্বাসী নন। তাঁর জীবনদেবতা তাঁরই অন্তর্নিহিত creativity।আবার একইসঙ্গে তাঁর একান্ত প্রিয় মানবীই তাঁর জীবনদেবতা, যিনি ছিলেন শৈশব থেকে প্রথম যৌবনাবধি তাঁর 'সাহিত্যের সঙ্গী', তাঁর রচনার প্রথম পাঠক। কিন্তু 'আগমন' কবিতায় যে রাজার কথা পাই, তিনি আধ্যাত্মিক, তিনি মিস্টিক ঈশ্বর। যার জন্যে মানুষের প্রস্তুতি থাকেনা। তিনি দুঃখের মধ্যে দিয়েই আসেন-"হায় রে ভাগ্য হায় রে লজ্জা/কোথায় সভা কোথায় সজ্জা/ দু-এক জনে কহে কানে/ 'বৃথা এ ক্রন্দন-/রিক্ত করে শূন্য ঘরে/করো অভ্যর্থন"

'দান' কবিতায় ফিরে এলো নারীর ভাষা।এখানেও যেন রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করলেন প্রিয় পরিচিত অবরোধবাসিনীর এক সাহসী স্বপ্নকে, যা তিনি বসালেন এই কবিতার নারীর মুখে। পুরুষটির যে মালা তিনি লজ্জায় সামাজিক বাধায় চাইতে পারেননি সেই মালা যেন আজ তরবারির রূপ নিলো-"এ তো মালা নয় গো, এ যে তোমার তরবারি/জ্বলে ওঠে আগুন যেন বজ্র-হেন ভারী-/এ যে তোমার তরবারি" এবার

এই নারী তার সামাজিক বাধা উপেক্ষা করে বলতে পারছে "তোমার লাগি ঘরে-পরে/মানব না আর লাজ/ তোমার তরবারি আমায় সাজিয়ে দিল আজ"

অবচেতনে সঞ্চিত অবদমিত বাসনা এই নারীর বয়ানে এখানে আশ্চর্য শিল্পিত রূপ পেয়েছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন "সাংকেতিক কবিকর্মে কবির সচেতন মনের প্রচেষ্টা নাই, তাঁহার অর্ধচেতন বা অবচেতন মনের সূক্ষ্ম গোপন অনুভূতি, আশা আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি কাব্যে রূপায়িত হয়।

বয়কট আন্দোলনের উত্তেজনায় নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পেরে তিনি এসবের সঙ্গে একটা নির্মোহ দূরত্ব রচনা করলেন।এভাবেই খেয়ার 'বিদায়' কবিতায় জানিয়ে দিলেন-"বিদায় দেহ ক্ষম আমায় ভাই/ কাজের পথে আমি তো আর নাই" এইসব সামাজিক আন্দোলন থেকে বহুদূরে থেকে যায় 'খেয়া', যার কাব্যশরীরে লেগে থাকে বিষাদের আবরণ। অহম বা Ego এখানে অবচেতন বা unconscious এ সঞ্চিত সেইসব বিস্মৃত স্মৃতিদের ফিরিয়ে এনে বাইরের অভিঘাত থেকে মনকে রক্ষা করতে গড়ে তুলেছে প্রতিরক্ষা,ফ্রয়েডের সেই defense mechanism।আবার এই প্রতিরক্ষার সাবধানতা সত্ত্বেও খেয়া'তে ফিরে এসেছে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' পর্বের সেই বিষাদ।ফিরে এসেছে সেই সামাজিক বাধাজনিত অবদমনের যন্ত্রণা-'Return of the repressed'

"আপনি যে দুখ ডেকে আনি সে যে
জ্বালায় বজ্রানলে-
অঙ্গার করে রেখে যায়, সেথা
কোনো ফল নাহি ফলে" (ভার/'খেয়া)

এই বিষাদময় হাহাকারে জেগে থাকে 'খেয়া' কাব্য-

"তুমি এ পার- ও প্র কর কে গো
ওগো খেয়ার নেয়ে
....
আমার মুখে ক্ষণতরে
যদি তোমার আঁখি পড়ে
আমি তখন মনে করি
আমিও যাই ধেয়ে
ওগো খেয়ার নেয়ে" (খেয়া)

তথ্যসূত্র:

১) রবীন্দ্ররচনাবলী- শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/পঞ্চম খণ্ড/বিশ্বভারতী/পৌষ ১৪০২
২) রবিজীবনী/প্রশান্তকুমার পাল/পঞ্চম খণ্ড/আনন্দ পাবলিশার্স/শ্রাবণ,১৪০৯-পৃ-২৫৩-৩০৭

৩) রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক/প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়/বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ,২য় খণ্ড/পৌষ ১৩৯৫, পৃ-২৯

৩) কবি রবীন্দ্রনাথ/বুদ্ধদেব বসু/দে'জ পাবলিশিং/সেপ্টেম্বর,১৯৯৩/৩য় সং/পৃ-৫৬-৫৯

8) Femininity/Anxiety and Instinctual life/New Introductory Lectures on Psychoanalysis/Sigmund Freud/translated by J.Strachey/ Shrijee Books International/2003/page- 147

5) The Introductory Lectures on Psychoanalysis/Sigmund Freud/trans-Strachey/Page-200-210

6) Literature and psychoanalysis: The question of reading: otherwise/Shoshana Felman/The Johns Hopkins University press/page- 117/2005, 1st edition ।

হামিরউদ্দিন মিদ্যার 'মাঠরাখা' পল্লিবাংলার নকশি কাঁথা

সুখেন্দু ঘোষ
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : হামিরউদ্দিন মিদ্যা বর্তমান সময়ের একজন শক্তিশালী গল্পকার। জন্ম ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া জেলায় সোনামুখী থানার রূপপাল গ্রামের এক কৃষক পরিবারে। ছোটোবেলা থেকেই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করায় বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতা তাঁর গল্পের স্বচ্ছ ভাবে চিত্রিত হয়েছে। তাঁর গল্পের নায়করা সকলেই পল্লিবাংলার নিম্নবর্গ পরিবারের প্রতিনিধি। রূপকথার গল্পের মতো বর্ণনারীতির মধ্যে দিয়ে এই মানুষগুলির রূঢ় জীবন যন্ত্রণার কথা তাঁর গল্পের প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠেছে। 'উড়োকাক' গল্প তারই প্রতিফলন। 'কস্তুরী' গল্পতে উঠে এসেছে এক চাকরিহীন শিক্ষিত যুবকের জীবন সংগ্রামের কথা। 'ডাকপুরুষ' গল্পে দেখি কুসুম গ্রামের মানুষদের আজন্ম লালিত লৌকিক সংস্কারের কাছে হার মেনে নিয়েছে ধর্মীয় প্রতিহিংসা। 'কবর' গল্পটিতেও এই ধর্মীয় সংস্কারের চিত্র দেখা যায়। করোনাকালীন পরিস্থিতিতে মেষমারা চরের কবরকে কেন্দ্র করে বর্তমান সমাজের অন্ধকারময় ক্রুর রূপটি ফুটে উঠেছে। তেমনই তাঁর গল্পে রয়েছে মাটি, মানুষ ও যন্ত্র সভ্যতার দ্বন্দ্ব। 'নিশিকাব্য', 'নাবাল ভূমি', 'ফসলের ঘ্রাণ', 'মাঠরাখা' প্রভৃতি গল্পের প্রেক্ষাপট চাষ জমি। মাঠ-ই হয়ে উঠেছে গল্পের নায়ক। গল্পগুলির মূল সুর একটায়, শ্রম লাঘবের জন্য মানুষ যন্ত্র সভ্যতাকে আপন করতে গিয়ে ছিন্ন করেছেন মানবিক সম্পর্ক বন্ধন।
সূচক শব্দ : ডাকপুরুষ, মাঠরাখা, নিম্নবর্গ, যন্ত্রসভ্যতা, পল্লিবাংলা।

মূল আলোচনা :

শিল্প সৃষ্টি হয় স্রষ্টার কল্পনার পরিতৃপ্তিতে এবং একই শিল্পকে বারবার ভাঙ্গা গড়ার মধ্যে দিয়ে, নতুন ভাবে নতুন রূপদানে। সাহিত্যরূপ শিল্পতেও-এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না। হামিরউদ্দিন মিদ্যার 'মাঠরাখা' গল্পগ্রন্থের গল্পগুলিও ভাঙ্গা-গড়ার আগুনে পুড়ে পল্লিপ্রকৃতির রূপকে পরিপক্ক পোড়ামাটির দেউলের ওপর স্থায়ীভাবে চিত্রিত করেছে। গল্পকারের কথায়— "বড় হয়ে যখন গল্প লিখতে এলাম, আমাকেও 'ভাঙ্গা-গড়ার' নেশায় পেয়ে বসল। একটা গল্প একবার লিখে দেওয়ার পরেও মনে শান্তি পাই না। যতবার পড়ি, মনে হয় যেন আরও কিছু বলার ছিল। আরও কিছু করার ছিল।" (লেখকের কথা)। তাঁর 'মাঠরাখা' গল্পগ্রন্থটি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০২১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে লেখা মোট আঠারোটি গল্পের একটি সংকলন। গল্পগ্রন্থটিতে পল্লিবাংলা যে রূপ ফুটে উঠেছে

তা নকশী কাঁথা মাঠের মতোই সুন্দর। গল্পগুলি যেন জীবনানন্দ দাশের রূপসী বাংলার প্রকৃতিকে মনে পড়িয়ে দেয়—

> "পৃথিবী রয়েছে ব্যস্ত কোনখানে সফলতার শক্তির ভিতর, কোনখানে আকাশের গায়ে রূঢ় মনুমেন্ট উঠেছে জেগে, কোথায় মাস্তুল তুলে জাহাজের ভিড় সব লেগে আছে মেঘে, জানি নাকো;-- আমি এই বাংলায় পাড়াগাঁয়ে বাঁধিয়াছি ঘর"[১]

জীবনানন্দের মতো তিনিও পল্লিবাংলার কোলে ঘর বাঁধতে চেয়েছেন। তাই তাঁর গল্পের বর্ণিত চিত্রকল্প একদিকে যেমন আমাদের স্মৃতিপটে হারিয়ে যাওয়া গ্রাম জীবনের স্নিগ্ধতা নিয়ে এসে মনকে পরিতৃপ্ত করে। তেমনই পল্লিবাংলার মানুষের বর্তমান পরিস্থিতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির দ্বন্দ্বও আমাদের চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠে।

ক

'মাঠরাখা' গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প 'ডাকপুরুষ' এই দ্বন্দই ফুটে উঠেছে। ডাকপুরুষ হলো বিধাতার কাছে যে স্বর্গ ও মর্ত্যের খবর চালনা করেন। একসময় ডাকপুরুষ বিধাতার কাছে চাষীদের দুঃখ দুর্দশা দূর করার উপায় জেনে এসে চাষিদের উপদেশ দেন। মাটিকে প্রণাম করতে বলেন, চাষবাসে অবহেলা করতে বারণ করেন এবং শস্যের দেবী লক্ষ্মীকে সন্তুষ্ট করে রাখতে বলেন। কারণ শস্যের দেবী রুষ্ট হলে চাষ বন্ধ হবে। সবাই ধুলিসাৎ হবে। এই ডাকপুরুষের কথা মেনে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে কুসুমদাঙ্গার মানুষরা নলপোঁতা করে আসছে, আশ্বিন মাসের শেষে সংক্রান্তি দিন। নলপোঁতা হলো ভালো ফলনের আশায় শস্যদেবীর উদ্দেশ্যে পোয়াতি ধান গাছকে সাধ দেওয়া। প্রাচীন সংস্কার অনুযায়ী নলপোঁতা করলে ধান গাছের পোকা দূর হয়। প্রাচীন এই সংস্কারকে পরিবর্তন করতে চেয়েছেন কুসুমডাঙ্গার নতুন ইমাম সাহেব। তিনি শুক্রবার মসজিদে সাধারণ মানুষদের বুঝিয়েছেন নলপোঁতা হিন্দুদের পুজো তা পালন করা শেরেকি অর্থাৎ গুনা বা পাপ কাজ। কিন্তু বাপ-ঠাকুর্দার তিন পুরুষের প্রাচীন সংস্কার নলপোঁতা ইমাম সাহেব বন্ধ করলে মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়েন হায়দার আলী। কারণ হায়দার আলী একমাত্র অবলম্বন বাবার রেখে যাওয়া জমি। সে ভাবে নলপোঁতা না করলে হয়তো ভালো ফসল পাওয়া যাবে না। হায়দার আলী পিতা গিয়াসউদ্দিনের ছোটো থেকে তাকে নলপোঁতার মন্ত্র শিখিয়েছেন। নলপোঁতার বিষয়ে স্বার্থপরের মতো নিজের জমি ফসল ভালো হোক আশা করতে নেই। সকল চাষিদের কথা চিন্তা করতে হয়—

> "অন সরষে কাঁকুড় নাড়ি
> যা রে পোকা ধানকে ছাড়ি
> সবার ফসল উঠুক গাড়ি গাড়ি..."[২]

শেষ পর্যন্ত হায়দার আলীর কাছে ইমাম সাহেবের যুক্তির থেকে প্রাচীন সংস্কারের বড়ো হয়ে উঠে। রাতের অন্ধকারে তাই সে সবার অলক্ষ্যে নিজের জমিতে নলপোঁতা করতে যায়। কিন্তু নলপোঁতা প্রথার করার সময়ে আকস্মিকভাবে ছয়দুলকে আবিষ্কার করে

সেও এসেছে তার জমিতে নলপোঁতা করতে। দুইজন দরিদ্র কৃষকের মানসিকতা ধর্মের দ্বন্দ্ব, ভীরুতা ও আক্রোশে ফলে পাল্টে যায়নি। তাই হায়দার আলী বলেছেন—

> "নল পোতা কুনু হিন্দু পরব লয়, কুনু মুসলমানের পরম লয়। নলপোঁতা হলো চাষিদের পরব। চাষিদের কুনু জাত হয় না রে ছয়দুল। চাষিরা হল অন্নদাদা। সবার কথা ভাবে।"[৩]

অলৌকিকতার স্পর্শে রচিত মাঠরাখা গল্পগ্রন্থের দ্বিতীয় গল্প 'নিশিকাব্য'। কিন্তু অলৌকিকতার সেই সোপান গড়ে ওঠার আগেই মানুষের অতীত ও কল্পনার স্মৃতিমেদুরতার কাছে তা হার মেনেছে। গল্পটির প্রধান দুই চরিত্র চল্লিশের কোঠা পেরোনো মরিয়ম ও তার স্বামী রায়হান। রাত্রে মরিয়ম কলতলায় জল আনতে গেলে সেখানে একটি ল্যাটা মাছ দেখে তার লোভ হয়। কয়েকবারের চেষ্টায় সেটিকে ধরতে না পারায় ল্যাটা মাছকে কেন্দ্র করে মনের মধ্যে তাঁর অশুভ চিন্তার আতঙ্ক জাগে। কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেল মরিয়াম না আসায় তার স্বামী রায়হান তার খোঁজে বের হয়। এবং মরিয়মের মতোই তারও চোখ আটকে যায় ল্যাটা মাছের প্রতি। মাছটিকে অনুসরণ করলে দেখে তাঁর একমাত্র ক্ষেত জমির আলপথে মাছ ভরে আছে। এই দৃশ্যপট তাঁর মনে ছেলেবেলার স্মৃতিকে সজাগ করে তোলে। মনে পড়ে যায় বাবার সঙ্গে খুনি পেতে মাছ ধরার কথা। তৎকালীন সময়ে সমস্ত অঞ্চলটা ছিল চাষ জমিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু বর্তমানে তারই জমিটি কেবল বেঁচে আছে। ফসল যে খুব ভালো হয় তাও না। তাই একমাত্র ছেলে বাপির ইচ্ছা জমিটিকে বাগানে পরিণতি করবে। রায়হান তাতে সায় দেয় না। প্রৌঢ়ের এই ক্ষীণ প্রতিবাদই বাঁচিয়ে রেখেছে পল্লিবাংলার প্রকৃতিকে। যে পল্লি বর্তমান সময়ে অপ্রাসঙ্গিক। যেমন যৌবনের কাছে অপ্রাসঙ্গিক চল্লিশ ঊর্ধ্ব মরিয়ম। কিন্তু স্মৃতি মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। তাই রায়হানের পুরনো দিনের স্মৃতির মধ্যে দিয়ে মরিয়ম হয়ে উঠেছে নববধূ।

খ

'কবর' গল্পটি ২০২০ খ্রিস্টাব্দে করোনাকালীন সময় লেখা। মেষমারা চড়ে সদ্য গড়ে ওঠা একটি কবরকে কেন্দ্র করে গল্পের কাহিনি বিস্তার লাভ করেছে। আশপাশের অঞ্চলের কোনো মানুষ না মরায় করবটি কার এই বিষয়ে গ্রামের সকলে ধন্দে পড়ে। কৌতুহল সামলাতে না পেরে গ্রামের পীর সাহেব কয়েকজন সাহসী যুবককে নিয়ে রাতের অন্ধকারেই নির্জন মেষমারা চড়ে কবর সন্ধানে বের হন। কেও কেও মনে করেন নদীর চর থেকে ভেসে আসা এক করোনায় মৃত মানুষের কবর এটি। কিন্তু আকৃতি দেখে সকলের অনুমান করে করবটি নিজে হয়তো কোনো শিশু শুয়ে আছে। সে হয়তো কুমারী মায়ের সন্তান। যদিও ধর্মীয় কারণের জন্য কেউ কবর খুঁড়তে চায় না। শেষে সাংবাদিক ও পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং কবরের নিচে থেকে বের হয় একটি মরা পাখি। গ্রামের সকলেই বুঝতে বাকি থাকে নাই কাজটি কার? কিছুদিন আগে গ্রামের এক পাগল এসেছে তার সহানুভূতি প্রতিটি প্রাণীর জন্য।

সে খাবার কিনে পশুপাখিদের খাওয়ায়। একদিন ইলেকট্রিক তারে শক লেগে একটি কাক মারা যায় তার জন্য সে কেঁদেছিল। যে পরিস্থিতিতে মানুষ মানুষের সঙ্গে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখছে। মৃত দেহ স্পর্শ করছে না। সেই সময় পাগলটির পশুপাখিদের প্রতি সহানুভূতি আমাদের সত্যিই অবাক করে। গল্পটি তাৎপর্য এখানেই। বর্তমান সমাজে আজ কারো প্রতি সহানুভূতি নেই তাই সাধারণের বিপরীতে কাজ করা প্রকৃত মানুষটি সকলের চোখে পাগল হয়ে উঠেছে।

শিবদাসের সংগ্রামী জীবনের সঙ্গে এক স্বচ্ছ ভালোলাগার অনুভূতি দিয়ে রচিত 'কস্তুরী' গল্পটি। শিবদাস বর্তমান বেকারত্ব পরিস্থিতির শিকার। পড়াশোনা করলেও গত দুবছর ধরে চাকরির চেষ্টা করে সে চাকরি পায় না। শেষ পর্যন্ত বাবার ভৎসনায় পড়াশোনার পাঠ চুকিয়ে নদীর পাড়ে হাটে রোজকারের আশায় বই বিক্রির দোকান দেয়। কিন্তু সে সফল হতে পারে না। তাই বই বিক্রি ছেড়ে হাটে নিত্য প্রয়োজনীয় স্টিলের আসবাবপত্র বিক্রি করতে থাকে। একদিন হাটে শিবদাসের পাশে এসে বিভিন্ন রকম পাথর, মাদুলি ও কস্তুরীর দোকান নিয়ে বসেন রাজস্থানের এক মহিলা ও তার যুবতী মেয়ে। যুবতী মেয়েটিকে শিবদাসের ভালোলাগে। কিন্তু মেয়েটির অনুরাগ শিবদাসের কাছে যেমন অপরিচিত তেমনি তাদের বিক্রয় দ্রব্য মৃগনাভিও তাঁর কাছে নতুন। ইতিমধ্যেই কস্তুরীর বিক্রির কথা সমস্ত হাটে ছড়িয়ে পড়ে। কস্তুরী নিয়ে নানান কাহিনি কানে আসে শিবদাসের। বর্তমানে কস্তুরী বিক্রি বে-আইনি। কারণ আসল কস্তুরী পাওয়া যায় এক ধরনের পুরুষ হরিণের দেহ থেকে। হরিণটি যখন দশ মাস বয়স হয় তখন মিলনের ঋতু উপস্থিত হলে তার নাভি থেকে এই সুগন্ধ বেরিয়ে আসে হরিণীকে আকৃষ্ট করবার জন্য। কিন্তু এই সুগন্ধি উৎস পুরুষ হরিণ খুঁজে পায় না। তাই সে সারা বনময় ছুটতে থাকে। আর সেই হরিণটিকে মেরে কস্তুরী সংগ্রহ করতে হয়। গল্পের শেষে দেখি শিবদাসের সেই হরিণটির মতোই অবস্থা হয়েছে। সে কস্তুরীর সুগন্ধির সন্ধানে সারা ঘরময় হন্যে হয়ে খুঁজে শেষে উপলব্ধি করেছেন তার দেহই সেই সুগন্ধের উৎসস্থল। এই কস্তুরী যেন শিবদসের মনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করেছে। অর্থাৎ প্রকৃত কস্তুরীর সন্ধান পেয়েছেন শিবদাস। শিবদাসের মনে ভালোবাসার প্রতি তীব্র আকর্ষণ সঞ্চারিত হয়েছে তা যেন আসল কস্তুরীর মতনই সুগন্ধি ও দুর্লভ।

গ

হামিরউদ্দিনের মিদ্যার গল্পে মূলত নিম্নবিত্ত মানুষের পেশার সঙ্গে যন্ত্রসভ্যতার দ্বন্দ্বের কথা ফুটে উঠেছে। এমন একটি গল্প 'নাবাল ভূমি'। নাবাল ভূমি হল সমতল জায়গার উর্বল জমি। এরসঙ্গে বাঘমুন্ডি পাহাড়ের জমির বিস্তর পার্থক্য আছে। পাহাড়ের রুক্ষ জমিতে ধান হয় না। অভুক্ত মানুষরা তাই জীবিকার জন্য বছরের নির্দিষ্ট সময় চলে যায় নাবাল ভূমিতে ধান কাটার কাজে। লেখক বাঘমুন্ডি পাহাড়ের জীবনযাত্রা বর্ণনা করেছেন—

> "বাঘমুন্ডি পাহাড়ের কোলে এই গ্রামটা যেন পৃথিবীর মানচিত্রের বাইরে। খরা এখানে লেগেই আছে বারোমাস। হাহাতে মানুষগুলোর সারাদিনের চিন্তা শুধু ভাত-কাপড়ের।... এখানে জমি রুক্ষ, অনর্বর। ডাঙা, টিলা, কাঁকুরে লালমাটি। জলের বড়ই অভাব।"[৪]

এই অঞ্চলে বেড়ে ওঠা কিশোরী ঝিনুক তার পরিবারের সঙ্গে জীবিকার জন্য প্রতিবছর বোরো ধান কাটতে নাবাল ভূমি ঝুঁঝকিডাঙার ফজলু শেখের বাড়ি যায়। ফজলু শেখের ছোটো ছেলে নিয়ামতের পুত্র সেলিম হলো ঝিনুকের একমাত্র বন্ধু। ঝিনুকের সারা বছর সেলিমের জন্য মন খারাপ করে। কিন্তু বৈশাখ মাস পড়তেই সেলিমের সঙ্গে সাক্ষাতের আশায় ঝিনুকের মন আবার আনন্দে ভরে ওঠে। যদিও এখন তারা দুজনেই ব্যস্ত। সেলিম এখন স্কুলে পড়ে, অন্যদিকে ঝিনুককে তার মা বাবার সঙ্গে ধান কাটার কাজে নামতে হয়। কিন্তু ঝিনুক এবার এসে সেলিমের কাছে সময় ও শ্রম সাশ্রয় ধান কাটার মেশিনের গল্প শুনে হতাশ হয়। সেলিম তাকে ধান কাটার মেশিন দেখালে দানব তুল্য মেশিন দেখে ঝিনুকের মনে চিন্তার ভাঁজ পড়ে। ঝিনুক বুঝতে পারে তাঁদের মতো শ্রমিকদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তার সঙ্গে আর সেলিমের কখনো দেখা হবে না। ঝিনুকের কথায় সেলিমেও মন দুঃখে ভরে উঠে। সমাপ্ত হয় একজন কিশোর-কিশোরীর নিষ্পাপ বন্ধুত্বের। যন্ত্র সভ্যতা সঙ্গে মানব সভ্যতার সম্পর্কে যে ছিন্নমূল অবস্থা সে কথায় এই গল্পে নিপুণভাবে ফুটে উঠেছে।

'ফসলের ঘ্রাণ' গল্পটি মাটি নিয়ে লেখা। আসলে লেখক গল্পের আদলে পল্লিবাংলার এক সরল কৃষকের মনস্তত্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন। আবহাওয়া প্রতিকূলতার কথা চিন্তা করে গ্রামে সকলেই মেশিনে ধান কেটে নিলেও বিষ্ণুপদ তাঁর সামান্য জমির ধানটুকু নিজের হাতেই কাটতে চায়। কারণ সে জানে মেশিনে ধান কাটলে বাড়ির গরুটি সারা বছর খড় পাবে না। কিন্তু পাকা ফসলের ওপর কালবৈশাখীর কালো মেঘ ঘনিয়া এলে বিষ্ণুপদের মন অস্তির হয়ে উঠে। তাকে সাহায্য করার কেউ নেই। তাঁর ছেলে সুমনের চাষবাস পছন্দ নয়। সে রাজমিস্ত্রি কাজে বাইরে যায়। সেই সুমনই যখন আসে ধান তোলার কাজে সাহায্য করতে তখন বিষ্ণুপদর সমস্ত দুশ্চিন্তা এক নিমেষে দূর হয়ে যায়। মনের মধ্যে এক অদ্ভুত আনন্দ জেগে ওঠে। সে বুঝতে পারে ছেলে জমি চিনেছে মাটি চিনেছে। বিষ্ণুপদর মনের মধ্যে আগামীর স্বপ্ন ভরে ওঠে। তাই সে বোরো ধানের পর আমন ধানের বীজতলা করবার জন্য বর্ষার জলকে বাঁধ দিয়ে ধরে রাখে।

ঘ

'মাঠরাখা' গল্পটিতে লেখক পল্লিবাংলার এক হারিয়ে যাওয়া পেশার কথা তুলে ধরেছেন। গল্পটি শারদীয়া বর্তমান পত্রিকায় ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। মাঠরাখা শব্দটির অর্থ হলো যে মাঠ আগল দিয়ে রাখে। মাঠরাখা নির্বাচন করা হয় গ্রামের

ষোলোয়ানা কৃষকদের সহমতিতে। মাঠরাখার কাজ ধান কাটা থেকে খামারে ধান ওঠা পর্যন্ত সময়ে মাঠের ধান পাহারা দেওয়া। তার পরিবর্তে মাঠরাখাকে প্রত্যেক কৃষক বিঘে প্রতি ছয় আটি করে ধান পারিশ্রমিক হিসাবে দিতেন। কিন্তু বর্তমানে যান্ত্রিক সভ্যতার কারণে তা বিলুপ্তির পথে। নাসের পিতা জমির আলী ছিলেন ভূমিহীন কৃষক। মাঠরাখার কাজ করে তার সংসার চলত। জমির আলী মৃত্যুর পর গ্রামের সকলের কথায় মাঠ রাখা করতে রাজি হয় নাসের। নাসেরের স্মৃতিপটে ভেসে ছোটবেলার কথা। বাবা তাকে নিয়ে যেতেন মাঠ পাহাড়ে দিতে। বলতেন—

> "জমির মালিক হয়ে কি হবেক রে! গোটা মাঠটার মালিক হয়ে যাবি। আলের ওপর লাঠি হাতে যখন দাঁড়াবি সেই মাঠটাই তুর। কেউ এক আঁটি ধান তুর সামনে চুরি করতে সাহস পাবেনি।"[৫]

বাবার কথা নাসবের কাছে ছিল রূপকথার মতো। তাছাড়া বাবা তাকে খোলা আকাশের নিচে অফুরন্ত মাঠের মাঝে মাঠপরীদের গল্প শোনাতেন। জোৎস্না রাতে তারা আকাশ থেকে নেমে আসে। মাঠের মধ্যে কেউ অন্যায় কাজ করলে তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ভাড়ালগোড়ের বিলের জলে ডুবিয়ে মেরে দেয়। মাঠরাখাদের কাজে ফাঁকি দেওয়া যায় না। সদ্য বিবাহিতা নাসেব তাই বউকে ছেড়ে মাঠের কুড়ে ঘর থেকে মাঠ পাহারা দেয়। কিন্তু বর্তমানে ধান কাটার মেশিন আবিষ্কারের পর অনেকের কাছেই নাসেবের গুরুত্ব হারিয়েছে। মাঠরাখার ন্যায্য পাওনায়ও সে পায়না। সঠিক মূল্য না পাওয়ায় নাসের মনও চায় মাঠরাখার কাজে ফাঁকি দিতে। তাই সে রাতের অন্ধকারে মাঠের কুঁড়ে ঘরে হ্যারিকেন জেলে রেখে চলে যায় নিজের বাড়িতে কিন্তু তাঁর বউ নাজমা তাকে দেখে রাগ করে। তিরস্কার জানায় মাঠরাখার কাজে ফাঁকি দেওয়ার জন্য। নাজমা যেনো হয়ে ওঠে সেই মাঠপরীদের প্রতিমূর্তি। তাকে দেখে ভয় পায় নাসেব–

> "নাজমা এখনো দাঁড়িয়ে আছে! হলুদ শাড়ির ওপর চাঁদের আলো পড়ে সারা গা থেকে জ্যোৎস্না ঝরছে। অমন আলো দেখে নাসেবের গা-হাত শির শির করে উঠল। মনে পড়ল ছেলেবেলায় বাপের মুখে শোনা গল্পটা। তাহের শেখের খামারবাড়িতে দাঁড়িয়ে মেয়ে মানুষটি যেন নাসেবের বউ নয়। আকাশ থেকে ডানা মেলে নেমে এসেছে কোনও পরি! কাছেই তো ডুমুরজলার দিঘি। নাসের আর পেছন ফিরে তাকাবার সাহস পেল না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে মাঠে ফিরে যেতে হবে"[৬]

আসলে রাতে মাঠের মালিক মাঠরাখারা। দিনের আলো ফুটতে না ফুটতে এই মালিকানার বদলে যায়। চাষিরা গাড়ি বোঝাই করে ধান তুলে নিয়ে যায় নিজের বাড়িতে। তাই মাঠরাখাদের মনে রাখে না ধনী কৃষকরা। কিন্তু মাঠরাখার কাজের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে পুরাতন সংস্কার ও সম্মান। পল্লিবাংলার মানুষগুলো সেই সংস্কার আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়।

৬

মাঠরাখা গল্পগ্রন্থের শেষ গল্প 'উড়োকাক'। উড়োকাকের ব্যঞ্জনায় লেখক খেটে খাওয়া নিম্নবর্গীয় মানুষদের বুঝিয়েছেন। শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে প্রতি বছর কসবায় বড় করে মেলা বসে। কথিত আছে কসবা হলো চাঁদ সওদাগরের চম্পক নগরী। গল্পের নায়ক শিবদাস সেই কসবায় গিয়েছেন তার পাতুরি মেলা নিয়ে কিন্তু মেলায় ঢুকে দেখে সমস্ত মাঠটার মধ্যে এক ফোটাও জায়গা নাই বসার মতো। শিবদাস ভাবে চাঁদ সওদাগরের দম্ভের কথা। শিবের প্রসাদ প্রাপ্ত চাঁদ সওদাগার ব্রাহ্মণ্য সমাজ বহির্ভূত অন্য কোনও লোক দেবতাকে পুজো করেন না। অন্য দেবতাদের সে নিচ ভেবে। কিন্তু অনেক চেষ্টার পর মা মনসা বাম হাতে সদাগরের পুজো পেয়েছিল। মনসার মতো সেও যেন লাঞ্চিত হয়েছে সমাজের সভ্য মানুষদের কাছে। তাই সে মূল মেলা থেকে দূরে সার্কাসে তাবুর পাশে বসতে জায়গা পেয়েছে। কিন্তু তার বিক্রি বাটা তেমন হয় না। শেষে আংটি বিক্রেতা দাড়িওয়ালা নুরুমুদ্দিন তার প্রতি স্নেহ দেখায় এবং মেলার অবস্থা দেখে শিবদাসকে ফিরে তাদের সঙ্গে ফিরে যেতে বলেন। তাঁদের সকলেই এক অবস্থা। আসলে তাঁরা অসহায় মানুষের একটি সমষ্টি। প্রত্যেকের জীবন যুদ্ধে হার না মানতে বদ্ধপরিকর। অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাদের ন্যায্য উপার্জন লাভ করতে না পারায় তারা একদিকে যেমন হতাশ হয় তেমনি সকলের কাছে নিজেদের দুঃখ ভাগ করে নিয়ে আনন্দ পায়—

> "ওরা যাচ্ছে নিজেদের সুখ-দুঃখ আর জীবনে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের গল্প করতে করতে। কারো ছেলে-বউ বাপকে দেখে না, বুড়ো বাপকে ব্যবসায় নামতে হয়েছে। কেউ মেয়ের বিয়ের পণের টাকা জোগাড় করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। কারও জমি বন্ধক পড়েছে তা ফেরানোর জন্য মরিয়া।"[৭]

হামিরউদ্দিন মিদ্দ্যার গল্পের মূল বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কৌশল। তার কলমের জাদু স্পর্শে বর্ণনারীতির মধ্যে দিয়ে 'উড়োকাক' গল্পটির মধ্যে সমগ্র দেশের উত্তপ্ত পরিস্থিতি ফুটে উঠেছে। চীন দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ক্রমশ খারাপ হওয়ায় চীনা পণ্য ভারতে আসা বন্ধ হয়েছে। দেশটার সঙ্গে কখন যুদ্ধ লেগে যায় তারও ঠিক নেই। কিন্তু যুদ্ধে প্রাণ যায় সাধারণ মানুষদেরই ধনীরা আরও ধনী হয়ে উঠে। নুরুমুউদ্দিন তাই ছোবল মারা সাপের মতো ফোঁস করে বলেছেন— "যুদ্ধ করবেক শালারা, আর না খেয়ে মরবো আমরা"[৮]

হামিরউদ্দিন মিদ্যার গল্প পড়লে মনের মধ্যে এক অদ্ভুত আমেজ জেগে ওঠে। যা অনুভবের, সঠিক শব্দ দিয়ে যাকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করা যায় না। তাঁর গল্পগুলি যেন নকশি কাঁথার মতো সুচ ও সুতো দিয়ে বোনা পল্লিজীবনের সরল চিত্র। যার গ্রাম্য প্রকৃতি মনকে একদিকে যেমন রোমাঞ্চিত করে তেমনি সেই পরিবেশের বেড়ে ওঠা প্রান্তিক মানুষগুলি জীবন যন্ত্রণা আমাদের আবেগবিহ্বল করে তোলে। যারা আধুনিক

যন্ত্র সভ্যতার কাছে হার মেনে নিয়েছে। যাঁদের ক্ষুদ্র পেশাগুলি আজ সংকটের মুখে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারে শরীরের শেষ শ্রম দিয়েও দুবেলা যাঁদের পেট ভরে না। লেখিকা সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাই হামিরউদ্দিন মিদ্যা সম্পর্কে বলেছেন— একদম fresh একটি কণ্ঠস্বর। একটি voice যেটি প্রায় missing আমাদের territory-তে সেটাই খুঁজে পেলাম ওঁর লেখায়। হামির উদ্দিনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কোনরকম গৌরচন্দ্রিকা ছাড়াই সরাসরি গল্পে প্রবেশ। অতি কথন একেবারে নেই। গ্রাম ও মাটির গল্প বলে যে কোন লুকানো রাগ বা অভিমান আছে তাও নয়।

তথ্যসূত্র :

১। জীবনানন্দ দাশ, রূপসী বাংলা, অবসর, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ১৯৯৬, ঢাকা ১১০০, পৃষ্ঠা ৩৫
২। হামিরউদ্দিন মিদ্যা, মাঠরাখা, সোপান, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০২২, কলকাতা ০৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০
৩। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২
৪। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯০
৫। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৮
৬। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫১
৭। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫৮
৮। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫৯

এশিয়ার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার : বিশ শতকের প্রগতিশীল এবং জাতীয়তাবাদী ভারতীয় বাঙালির দৃষ্টিতে জাপানের উৎসব ও পারফরমেন্স

অদ্রিজা ভট্টাচার্য
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: উনিশ শতকের আগে পর্যন্ত ভারতীয় ঐতিহ্যে ভ্রমণের ধারণা প্রধানত বাণিজ্য এবং তীর্থযাত্রার সঙ্গেই যুক্ত ছিল। কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালির চেতনা, অভ্যাস এবং দৈনন্দিন চাহিদার পরিবর্তনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যুক্ত হয় একটি নতুন চাহিদা; দেশ দেখার নেশা। বাণিজ্যিক বা প্রশাসনিক প্রয়োজন ছাড়া কেবল শখ পূরণও হয়ে ওঠে ভ্রমণের নতুন উদ্দেশ্য। ইউরোপের দেশগুলি ঘুরে দেখার পাশাপাশি জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত বিশ শতকের বাঙালি এশিয়ার দেশগুলি ঘুরে দেখাকেও জাতীয় কর্তব্যের পর্যায়ে নিয়ে যায়। প্রশাসনিক ও প্রযুক্তিগত উন্নতি, জাতীয় ঐক্য রক্ষা, ঐতিহ্যের অনুসরণ প্রভৃতি কারণে জাপান ও চিনকে নিয়ে বাঙালির আগ্রহ সর্বাধিক বৃদ্ধি পায়। প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদী বাঙালি উপলব্ধি করে এশিয়ার মধ্যে জাপানই একমাত্র বুঝতে পেরেছে যে, ইউরোপ যে শক্তির বলে পৃথিবীতে সর্বজয়ী হয়ে উঠেছে একমাত্র সেই শক্তিকে আত্মগত করতে পারলেই পাশ্চাত্যের আধিপত্যকে রোধ করা যায়। পাশ্চাত্য নির্ধারিত পদ্ধতি বা প্রকল্পগুলিকে অনুসরণ না করেও সভ্যতার পরিপূর্ণ বিকাশের দ্বারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেভাবে জাপান এশিয়ার প্রতিভূ হয়ে উঠেছিল তা পরাধীন দেশবাসীর মনে সাহস ও স্বাজাত্যবোধের নবজোয়ার নিয়ে আসে, যা থেকে জন্ম নেয় এশীয়বাদী ঐক্যের ধারণা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয় কুমার সরকার-সহ একাধিক বাঙালি পর্যটক জাপান ভ্রমণ করে *প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বিচিত্রা*-র মতো সমসাময়িক বাংলা পত্রিকাগুলিতে তাঁদের ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরেছিলেন। এই প্রবন্ধগুলিতে ইতিহাস, সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্মাদর্শ, জীবনশৈলীর পাশাপাশি ধারাবাহিকভাবে উঠে আসতে থাকে জাপানের উৎসব-অনুষ্ঠান, তার সঙ্গে যুক্ত আচার-নীতি এবং পারফরমেন্সের বিবরণ। প্রাবন্ধিকেরা জাপান ও ভারতের পারফরমেন্সগুলির সাদৃশ্যের ওপর নির্ভর করে দুটি দেশের অতীত সাংস্কৃতিক যোগসূত্র অনুসন্ধান করেন। ইউরোপের স্বনির্মিত উৎকর্ষের দাবির বিপরীতে এশিয়ার সমৃদ্ধিশালী ও সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ছবি পরাধীন দেশবাসীর সামনে উপস্থাপিত করে তাদের মনোবল বৃদ্ধিও লেখকদের অন্যতম লক্ষ্য হয়ে ওঠে। এই প্রবন্ধে মূলত বিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন বাঙালি পর্যটকদের জাপান ভ্রমণকালে সেখানকার

উৎসব, উৎসবের সঙ্গে জড়িত সাংস্কৃতিক পারফরমেন্সগুলিকে প্রতিগ্রহণের স্বরূপ, সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রভাব অনুসন্ধান করা হয়েছে।
সূচক শব্দ- পারফরমেন্স, জাতীয়তাবাদ, এশীয়বাদ, সংস্কৃতি, রিচুয়াল, ভ্রমণসাহিত্য।

ভ্রমণ বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে সংযুক্ত। তবে উনিশ শতকের আগে পর্যন্ত বাঙালি ঐতিহ্যে ভ্রমণের ধারণা মূলত আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যসাধন এবং বাণিজ্যিক আদানপ্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি পাশ্চাত্য ভ্রমণকে একটি বিশেষ শিক্ষামাধ্যম হিসেবে দেখেছিল। যে শিক্ষা পরাধীনতা ও সংস্কারাচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি তথা আধুনিক জীবনে উত্তরণের হাতিয়ার ছিল। একইসঙ্গে ভ্রমণের নেশা প্রাচীনপন্থী, অনাধুনিক জীবনচর্যায় ক্লান্ত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত বাঙালিকে নতুন দেশ ও সংস্কৃতির স্বাদ গ্রহণ করার স্বাধীনতা এনে দিয়েছিল। পাশ্চাত্য ভ্রমণের সঙ্গেই জাতীয়তাবাদী ধারণায় উজ্জীবিত বাঙালি স্বাজাত্যপ্রীতি এবং আত্মশক্তির বিকাশের জন্যও এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলি ভ্রমণ করে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এশীয়বাদী ধারণা নির্মাণে সচেষ্ট হয়। উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে বিভিন্ন ভারতীয় পত্রপত্রিকায় 'The Greater India' বা বৃহত্তর ভারতের ধারণা প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ গৃহীত হয়। এক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে অন্যান্য এশীয় দেশ, বিশেষত দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাংস্কৃতিক অতীত যোগসূত্র স্থাপন একটি স্থায়ী প্রবণতা হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া ১৯০৫ সালে রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের অবিশ্বাস্য জয়লাভের পরে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের কাছে জাপান হয়ে ওঠে সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে বিজিত এশীয় প্রতিনিধি। প্রযুক্তিগত উন্নতি, তীব্র স্বদেশপ্রীতির কারণে জাপানের পাশাপাশি চিনও বাঙালি পর্যটকদের আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু ছিল। ১৮৮৬ সালে বার্মা তথা অধুনা মায়ানমারে ব্রিটিশ আধিপত্য কায়েমের পরে প্রশাসনিক ও ব্যবসায়িক স্বার্থে বহু বাঙালি পরিবারই বার্মায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করে। চিন, জাপান, জাভা, বলিদ্বীপ, বার্মা প্রভৃতি এশীয় দেশগুলি ভ্রমণ করে বৃহত্তর 'এশীয় ঐক্য' গড়ে তুলতে রবীন্দ্রনাথও বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিভিন্ন বাঙালি পর্যটকদের ভ্রমণের অভিজ্ঞতাগুলি ধারাবাহিকভাবে *সাহিত্য* (১৮৯০), *ভারতবর্ষ* (১৯০০), *প্রবাসী* (১৯০১), *বিচিত্রা* (১৯২৭) প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হতে শুরু করে। এই ভ্রমণবিবরণমূলক, অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক প্রবন্ধগুলিতে অন্যতম বিষয় হিসেবে উঠে এসেছিল বিভিন্ন দেশের, জাতির, সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক পারফরমেন্স। এই পারফরমেন্সগুলিকে যে দৃষ্টিভঙ্গিতে বাঙালি পর্যটকেরা প্রবন্ধগুলিতে তুলে ধরেছিলেন তার মধ্যে দিয়ে নিজের দেশের এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সাপেক্ষে একটি বিশেষ রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে 'অপর'-কে দেখার মানসিকতা প্রতিফলিত হয়েছিলো। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে মূলত বিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন বাঙালি পর্যটকদের জাপান ভ্রমণকালে সেখানকার উৎসব, উৎসবের সঙ্গে জড়িত সাংস্কৃতিক

পারফরমেন্সগুলিকে প্রতিগ্রহণের স্বরূপ, সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভাব অনুসন্ধান করা হয়েছে।

উনিশ শতক থেকেই *মাদ্রাজ মেইল, দিল্লি গেজেট, ভয়েস অব ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান স্পেকটেটর*-এর মতো ইংরেজি পত্রিকাগুলিতে জাপান নিয়ে ব্যাপক প্রচার চলতে থাকে। উল্লেখ্য যে, এই ভারতীয় ইংরেজি পত্রিকার গ্রাহক ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত উচ্চ ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত ভারতীয়রা। পাশাপাশি *ভারতবর্ষ, প্রবাসী*-র মতো বাংলা পত্রিকাগুলিতেও ধারাবাহিকভাবে উঠে আসতে থাকে বাঙালিদের জাপান ভ্রমণের ইতিবৃত্ত। বিশ শতকের প্রথম দশক থেকেই জাপান ইউরোপীয় দেশগুলিকে পরাজিত করে সভ্যতার উন্নতির মাপকাঠিতে মডেল রাষ্ট্র হয়ে ওঠে। পাশ্চাত্য নির্ধারিত পদ্ধতি বা প্রকল্পগুলিকে অনুসরণ না করেও সভ্যতার পরিপূর্ণ বিকাশের দ্বারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেভাবে জাপান এশিয়ার প্রতিভূ হয়ে উঠেছিল তা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ভারতীয়দের কাছে অনুকরণযোগ্য আদর্শ হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ যখন এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলিকে ভ্রমণ করে একটি সামগ্রিক এশীয়বাদী বোধ গড়ে তুলতে চাইছেন তখন তিনিও জাপানকে এই যোগসূত্র স্থাপনের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। জাপানের এই দ্রুত উত্থান ঔপনিবেশিক শোষণে ক্লান্ত ভারতবাসীর মনে এশীয়বাদী চেতনার বিকাশ ঘটায়। রাষ্ট্র হিসেবে জাপানের স্বাজাত্যপ্রীতি, ঐতিহ্যবোধ, প্রবল আত্মবিশ্বাস প্রভৃতি গুণগুলি ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের কাছে আকাঙ্ক্ষিত মডেল হয়ে ওঠে। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে যখন কোরিয়ার ওপরে জাপানের আধিপত্য কায়েমের খবর বিশ্বের দরবারে উঠে আসে তখন জাপানের প্রতি এই প্রশংসাসূচক দৃষ্টিভঙ্গি অনেকাংশেই সন্দেহে পর্যবসিত হয়। এই আধিপত্য কায়েম প্রকল্পে ব্রিটেনের মদত আছে জানার পরে এই সন্দেহ আরও বেশি ঘনীভূত হতে শুরু করে। যদিও তখনও অবধি জাপানকে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র হিসেবে না দেখে ক্ষমতার লোভে ভুল পথে চালিত হওয়া রাষ্ট্র হিসেবে দেখার পক্ষপাতী ছিল ভারতীয়রা। ভারতীয়দের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল শান্তিপূর্ণ বৌদ্ধ নীতি ও আদর্শের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেই জাপান ভুল সংশোধন করতে সক্ষম হবে।

প্রবাসী পত্রিকার ত্রয়োদশ খণ্ডের (১৩২০) চৈত্র সংখ্যায় সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'মিয়াকো ওদোরী' শীর্ষক প্রবন্ধে জাপানের বসন্ত উৎসব এবং তার সঙ্গে জড়িত আচার-রীতির বর্ণনা দিয়েছেন। মিয়াকো ওদোরী এক বিশেষ ধরনের নৃত্য অনুষ্ঠান, যা শহরের মধ্যে থিয়েটারে বসন্তকালে অনুষ্ঠিত হয়। আমদের দেশের মতো জাপানেও নৃত্য-গীতের মাধ্যমে বসন্ত বন্দনার রীতি অতি প্রাচীন। অনুষ্ঠানের শুরুতে এক নৃত্যশিল্পী এসে চানোয়ু নামক একটি বিশেষ জাপানি প্রথায় চা তৈরি করে দর্শকদের দেন। শুধু প্রথম শ্রেণির দর্শকদেরই এই চা দেওয়া হত। এরপরে দর্শকেরা নৃত্যের আসরে গিয়ে বসেন। রঙ্গমঞ্চ তিনদিক সাদা সাটিনের কাপড়ে ঢাকা থাকে। মাঝে একটা দেবদারু গাছ, ডানদিকে বাঁশগাছ এবং বাঁদিকে পাম গাছ থাকে। খিলানটি সোনালি, লাল এবং ঈষৎ

বাদামি ও সাদা রঙের ফুল ও পতাকা দিয়ে সাজানো থাকে। সাধারণত দিনে পাঁচবার এই নাচ হয়। একটি দল একবারের বেশি নাচ করে না। প্রতিটি দলে তিনটি ভাগ থাকে-

১) সামিসেন বাজিয়ে দশজন নর্তকী একত্রে গান করে। এদের জিকাতা বা গায়িকার দল বলে।

২) তারপর দশজন ঐকতান বাদিকার দল থাকে যারা বাঁশি, ক্ষুদ্র ঢাক ও ডমরু বাজায়।

৩) বাকি বত্রিশজন নাচ করে।

রঙ্গমঞ্চের ওপর সবসুদ্ধ বাহান্নজন স্ত্রীলোক থাকে। রঙ্গমঞ্চের দক্ষিণে গায়িকার দল বসে গান আরম্ভ করে। বাঁদিকে বাদিকাদের দল ঐকতান বাজায়। মাঝখানে নৃত্যশিল্পীরা নাচ করে। এমনভাবে মঞ্চে নৃত্যশিল্পীরা প্রবেশ করে যে দেখে মনে হয় কোন সরীসৃপ বা উজ্জ্বল আলোর রেখা রঙ্গমঞ্চের দিকে ধেয়ে আসছে। সুখ- দুঃখ, প্রেম, দেশভক্তি, দেশের জন্য আত্মবলিদান প্রভৃতি মানবমনের বিচিত্র ভাবলীলাকে তারা সুশৃঙ্খলভাবে নৃত্যের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলে। বিষয় অনুসারে রঙ্গমঞ্চে দৃশ্য পরিবর্তন করা হয়। প্রতিটি নৃত্য কবিতা বা চিত্রের মতো সুসংযত ও ছন্দোবদ্ধ। সুন্দরের প্রতি আন্তরিক সম্ভ্রম ও সংযমবোধ বৌদ্ধধর্মের সাধনা থেকেই তারা লাভ করেছে।

প্রবাসী-র আষাঢ় ১৩২৮ সংখ্যায় নির্ম্মলপদ চট্টোপাধ্যায় 'জাপানে নববর্ষ অভ্যর্থনা' শীর্ষক প্রবন্ধে জাপানে নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর রীতিকে তুলে ধরেছেন, যার সঙ্গে আমাদের দেশের ছৌ নাচ বা রামলীলার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। জাপানে প্রতি নববর্ষেই ছেলে-মেয়েরা নানারকম বিচিত্র ও রঙচঙে মুখোশ পরে পথে পথে ক্রীড়া-কৌতুক করে নববর্ষকে বরণ করে। মুখোশগুলি পৌরাণিক চরিত্র ও ভাবের পরিকল্পনা প্রকাশ করে। আমাদের দেশের ছৌ নাচের মুখোশের সঙ্গে এই দেশের মুখোশগুলির পার্থক্য হল এগুলি মানুষের আকারের তুলনায় খুব বড়ো করে গড়া হয় এবং কাগজের তৈরি বলে তা বেশি ভারী হয় না। সেই মুখোশ পরলে মানুষকে অত্যন্ত বেঁটে এবং হাত-পা সরু বলে মনে হয়।

প্রবাসী-র কার্তিক ১৩৩৩ সংখ্যায় 'জাপানের নাট্যমঞ্চ' শীর্ষক প্রবন্ধে অশোক চট্টোপাধ্যায় ভারতীয় অভিনেতা ও নাট্যব্যক্তিত্বদের পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ প্রবণতার সমালোচনা করেছেন এবং পাশ্চাত্য নাট্যরীতির সমকক্ষ হিসেবে প্রাচ্য নাট্যরীতিকে প্রতিস্থাপন করতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি প্রাচীন জাপানি নাট্যরীতিগুলি নিয়ে সুবিস্তৃত আলোচনা করেছেন এবং প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে ভারতীয় নাট্যরীতির সঙ্গে জাপানি নাট্যরীতির তুলনা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাট্যরীতির মধ্যে কোনটি অধিক সমৃদ্ধ তা বিচার করা সহজ নয় কারণ উভয়েই স্বতন্ত্রতা বজায় রেখে স্বক্ষেত্রে গৌরব অর্জন করেছে। প্রাচ্যের নাট্যকলার কৌশল, আখ্যানবস্তু, আদর্শ

পশ্চিমের থেকে স্বতন্ত্র। আবার প্রাচ্যের মধ্যেও দেশভেদে এগুলির বিভিন্নতা আছে। ভারতে অনেকসময়েই ধ্রুপদী নাট্যরীতির ধারাবাহিকতা ভেঙে নতুন নাট্যরীতি তৈরি হয়। তবে চিনে বা জাপানে প্রাচীন নাট্যকলার ক্ষেত্রে এই ধারাবাহিকতার অভাব দেখতে পাওয়া যায় না। জ্ঞানচর্চা ও ভালো জিনিসের সমাদরের দিক থেকে জাপানি নাট্যকলার ইতিহাস খুবই সমৃদ্ধ। জাপানের কাবুকি থিয়েটার প্রায় তিনশো বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 'নো' এবং 'লিঙ্গোশিব্যাই', যাদের থেকে কাবুকি থিয়েটার প্রেরণা লাভ করেছিল তা আরও প্রাচীন। 'নো' চতুর্দশ শতাব্দীর জাপানি ক্লাসিক থিয়েটার। এখানে অভিনেতারা মুখোশ পরে অভিনয় করে। আর লিঙ্গোশিব্যাইতে অদৃশ্য তার দিয়ে বাঁধা ছোট ছোট পুতুল অভিনয়ের জন্য ব্যবহার করা হত, যার সঙ্গে আমাদের দেশের মুখোশ নাচ ও পুতুল নাচের সাদৃশ্য আছে। বর্তমান ভারতীয় নাট্যরীতির অনুকরণপ্রিয়তা নিয়ে প্রাবন্ধিক অশোক চট্টোপাধ্যায় অসন্তুষ্ট। তিনি মন্তব্য করেছেন, আধুনিক থিয়েটারে প্রাচীন ভারতীয় নাট্যকলার কৌশল গৌণ হয়ে গেছে এবং ভারতীয় রঙ্গালয় বর্তমানে পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণ মাত্র। তবে সেই হারানো নাট্যরীতির যেটুকু এখনো অবশিষ্ট আছে তার সঙ্গে জাপানি নাট্যরীতির আকার ও প্রকারগত সাদৃশ্য চোখে পড়ে। অধ্যাপক তাকাসুকুও *ইয়ং ইস্ট* গ্রন্থে লিখেছেন যে, গতযুগের শেষভাগে জাপান ভারত থেকে কয়েকপ্রকারের মেলোড্রামা ও নৃত্যভঙ্গি আমদানি করেছিল। মুখোশ তৈরি আজও জাপানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প।

জাপানি রঙ্গমঞ্চকে 'ধর্ম্ম রঙ্গমঞ্চ' এবং সাধারণ 'জনপ্রিয় রঙ্গমঞ্চ' এই দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। নো এবং লিঙ্গোশিব্যাই ধর্ম রঙ্গমঞ্চে এবং কাবুকি সাধারণ রঙ্গালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। কাবুকির অভিনেতারা বংশানুক্রমিকভাবে অভিনয় করে যান। কৌশলের নৈপুণ্য, পরিশ্রম ও অসাধারণ প্রতিভার ভিত্তিতে তাদের পদমর্যাদা নির্ধারিত হয়। নারীবর্জিত কাবুকি রঙ্গালয় এক নারীর দ্বারাই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আইনমোর শিস্তো মন্দিরের সেবিকা এক নর্তকী ও-কুনি ১৫৯৬ সালে কাবুকি প্রতিষ্ঠা করেন। ও-কুনির পরে কিছুকালের জন্য জাপানি রঙ্গমঞ্চে নারীর প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু তাদের অসাধু জীবনযাপনের প্রভাব জাপানি সমাজে এতদূর বিস্তৃত হয়েছিল যে বাধ্য হয়ে ১৬১৯ সালে নারীর অভিনয় বন্ধ করে দিতে হয়। এরপরেও কিছুদিন নরনারী একত্রে অভিনয় করার প্রয়াস চলেছিল, কিন্তু রাজশক্তির প্রবল প্রতাপে তা বন্ধ হয়ে যায়। এরপরে পূর্ণবয়স্ক লোকদের দ্বারা পরিচালিত রঙ্গমঞ্চের উদ্ভব হয়। অভিনেতাদের মধ্যে যারা নারীর ভূমিকায় অভিনয় করে তারা 'ওন্নাগেতো' ও হাস্যরসের অভিনেতারা 'দোকোগাতা' নামে পরিচিত হয়। বিখ্যাত কাবুকি অভিনেতাদের মধ্যে কিয়েতোর সাকাতাতোজুরো এবং ইয়েদোর ইচিকাওয়া দানজুরো ছিলেন অন্যতম। এরা দুজনেই গেনরোকু যুগের (১৫৬০-১৬৪০) মানুষ। জাপানি সাহিত্য ও চারুশিল্পের প্রভূত উন্নতি হওয়ার কারণে এই যুগকে পুনর্জাগরণের যুগ বলে। তোজুরোর চারুশিল্পে অবিশ্বাস্য দক্ষতা ছিল। সাধারণ লোকের জীবনচিত্র রঙ্গমঞ্চে ফুটিয়ে তুলতে তোজুরোর

শ্রেষ্ঠ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর অভিনয় ধারাকে বাস্তব বা সাধারণ ধারা বলা হয়। সেটি অনেকটা বর্তমান পাশ্চাত্য নাটকের বাস্তব ধারানুসারী হলেও সম্পূর্ণ বাস্তব ছিল না। কিন্তু ইচিকাওয়া দানজুরো ডল থিয়েটারের অতিরঞ্জিত অভিনয় ধারা থেকে প্রেরণা লাভ করেছিলেন। তিনি আরাগাতো বা অতিরঞ্জিত কলার বিকাশসাধন করেছিলেন। তাঁর বীরত্বমূলক অভিনয় স্বল্পসময়ের মধ্যেই দর্শকদের মন জয় করেছিল। ভারতীয় অভিনয়কলার বীররসের সঙ্গে আরাগাতোর কিছু সাদৃশ্য আছে।

কিঙ্কেডের বইতে কাবুকি নাটককে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। ‘সেওয়া মোনো’ বা দৈনন্দিন জীবননাট্য, ‘ষিদাই মোনো’ বা ঐতিহাসিক নাট্য, ‘সোসাগোতো মোনো’ বা নৃত্যনাট্য এবং ‘আরাগোতো’ বা কল্পনাট্য। প্রথম শ্রেণির নাটকে মানুষের স্বভাবের চিত্র দেওয়া হয়। নাট্যকার তার চারপাশের মানুষের সুখ-দুঃখের ছবি আঁকেন। ঐতিহাসিক নাটকে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের ছবি আঁকা হয়। কিন্তু ইতিহাসের অবিকল পুনরাবৃত্তি করা রাজ আদেশে নিষিদ্ধ হওয়ায় নাট্যকারেরা ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের নিয়ে কাল্পনিক আখ্যান গড়ে তোলেন। ‘সোসাগোতো’ বা নৃত্যনাট্য উপাখ্যান, সঙ্গীত, দৃশ্যপট, অভিনয়, সাজসজ্জা, অঙ্গসঞ্চালন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যযুক্ত থাকে। আরাগোতোয় দেহভঙ্গি থেকে অভিনয়, সাজসজ্জা সবই অতিরঞ্জিত করে দেখানো হয়। বিশ্বস্ততা ও আত্মবিসর্জন কাবুকি নাটকের প্রধান আলোচ্য বিষয়। নাটকে প্রেমের ও ভূতের দৃশ্যও বেশি দেখা যায়। সামাজিক উদ্দেশ্যমূলক নাটকের সংখ্যাও প্রচুর। জাপানি নাটকে অতিপ্রাকৃত ঘটনার বাহুল্য দেখে অনুমান করা যায় এখানকার দর্শকেরা সাধারণ নাটকের চেয়ে অতিপ্রাকৃত ঘটনা দেখতে বেশি পছন্দ করে। অশোক চট্টোপাধ্যায় সশরীরে জাপান ভ্রমণ করে কাবুকি থিয়েটার দেখেছিলেন এমন কোনও স্পষ্ট প্রমাণ প্রবন্ধ থেকে পাওয়া যায় না। সম্ভবত জো কিঙ্কেডের গ্রন্থ থেকে তিনি জাপানি নাট্যরীতি সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন। সেই পাঠেরই একধরনের প্রতিগ্রহণ এই প্রবন্ধ, যেখানে লেখকের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সূত্রে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই পাশ্চাত্য নাট্যরীতির বিপরীতে জাপান ও ভারতের নাট্যরীতির তুলনামূলক আলোচনা উঠে এসেছে। কিঙ্কেডের গ্রন্থে জাপানের সাধারণ রঙ্গালয়ের যে ছবি ফুটে ওঠে, সেখানে দেখা যায় পশ্চিমের দেশগুলির মতো আদ্যোপান্ত সম্ভ্রম ও নীরবতা রক্ষা করে এশিয়ার দর্শকেরা থিয়েটার দেখে না। বরং ভারতের মতো জাপানেও প্রতিটি অঙ্কের সূচনা ও সমাপ্তিকালে চায়ের পেয়ালার শব্দ, দর্শকদের লঘু আলাপচারিতা, গ্যালারির পেছন দিকের খরিদ্দারদের কাছে ঘুরে ঘুরে বিক্রেতাদের হাঁকডাক এইসব মিলেমিশে এক বিচিত্র আমেজ তৈরি হয়। কাবুকিতে দর্শকেরা উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই শূন্য রঙ্গালয়ের চারদিকে তুরী-ভেরীর গুরুগম্ভীর শব্দ পাওয়া যায়। অভিনেতারা মঞ্চে প্রবেশের পূর্বে ভেরীবাদকদের প্রবল শব্দ বন্ধ হয়ে কেবল একটি মৃদু বাঁশির শব্দ শোনা যায়। দুপুর থেকে মাঝরাত পর্যন্ত কাবুকির অভিনয় চলত। কাবুকির ভৃত্যেরা নাটক চলাকালীন দর্শকদের গরম ভাত, মদ, চা ইত্যাদির যোগান দিত। অধিকাংশ নাটকেই আখ্যানবস্তু

দর্শকদের পরিচিত। আখ্যান তাদের যত জানা হয়, নাটকের ঘটনাগুলি তারা তত বেশি উপভোগ করে। কারণ এতে অজানা ঘটনা দেখার বিস্ময়বোধ থাকে না। কাবুকির প্রধান উদ্দেশ্যই হল দর্শকদের মনোরঞ্জন করা এবং অভিনেতাদের সর্বোচ্চ দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ করে দেওয়া। থিয়েটার চলাকালীন অভিনেতারা দর্শকদের মধ্যে দিয়ে হেঁটে সমগ্র রঙ্গালয়টি পরিভ্রমণ করে দর্শকদেরও নাটকের অংশ করে তোলেন। এই রীতিকে 'নুনুমিচি' বলে। প্রায় প্রতিটি নাটকেই মূল ভাবের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কিছু গান থাকে। শ্রোতাদের মনে ঘটনার আবেদনকে দীর্ঘস্থায়ী করে তোলার জন্য ভেরীবাদকেরা কতগুলি নির্দিষ্ট সুর বাজায়। অভিনেতারা অনেকসময় সাবেকি মুখোশ পরেও অভিনয় করে। তাদের কথা বলার ভঙ্গিও সাবেকি ধরনের। কাবুকি নিয়মতান্ত্রিক শিল্প। এখানে ভূতপ্রেতসহ প্রতিটি চরিত্রই নির্দিষ্ট পোশাক ছাড়া অন্য কোনো পোশাকে সাজতে পারে না। নাটকে দুজন লোক একত্রিত হয়ে ঘোড়ার মুখোশ পরে ঘোড়া সাজে। এই মানব-পশুদের সাজ দেখে বাংলার প্রাচীন চিত্র নবনারী কুঞ্জরের কথা মনে পড়ে যায়। ভারতীয় কলায় নবনারী কুঞ্জর একটি জনপ্রিয় পৌরাণিক চিত্রশৈলী। রাধিকা ও তার আটজন সখী একত্রে হাতি বা কুঞ্জরের রূপ ধারণ করেন, তাই তাঁরা নবনারী। আর সেই হাতির আরোহী হলেন কৃষ্ণ, যাঁর নাম রসরাজ। পৌরাণিক মতে, এই নয়জন নারী ভারতীয় শিল্পের নবরসের প্রতীক।

জাপানি জীবনে আধুনিকতার সূচনা হলেও কিংবদন্তীগুলি যে এখনো জাপানি মন ও সংস্কারকে অধিকার করে আছে তা নাটকের শিল্পবস্তুর দিকে তাকালে সহজেই অনুমান করা যায়। সবশেষে লেখক আধুনিক জাপানি নাট্যরীতি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, প্রাচীন নাট্যরীতির উত্তরাধিকার রক্ষা সম্পর্কে জাপানিরা সচেতন হলেও জাপানি নাটক সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্য প্রভাবকে এড়িয়ে যেতে পারেনি। আমেরিকার ছায়াচিত্রের মতো চটকদার ঘটনাবলিকে কেন্দ্র করে জাপানে এখন বিদেশি নাটকের অনুবাদ অভিনীত হচ্ছে। ভারতীয় রঙ্গমঞ্চে যেমন নৃত্য-গীত এবং নিম্নরুচির হাস্যরসের সঙ্গে অতিরঞ্জিত সংলাপ যুক্ত করে নাট্যখিচুড়ি তৈরি করা হয় কাবুকি থিয়েটারেও আজকাল সেই প্রবণতা প্রবেশ করেছে।

প্রবাসী-র বৈশাখ ১৩৩৭ সংখ্যার পঞ্চশস্য বিভাগে একটি লেখক-পরিচিতিহীন প্রবন্ধ পাওয়া যায়। 'জাপানের প্রাচীন ও আধুনিক নৃত্য' শীর্ষক এই প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক জাপানের প্রাচীন কাগুরা নৃত্যের পরিচয় দিয়েছেন। জাপান দেশের সাধারণ গ্রামবাসী যাদের পক্ষে শহরে গিয়ে অভিনয় দেখা সম্ভব ছিল না তারা নানা পূজা-পার্বণে নিজেদের মনোরঞ্জনের জন্য নৃত্য-গীত ও আমোদপ্রমোদের আয়োজন করত। সেই নাচগুলির মধ্যে কাগুরা ছিল সবচেয়ে প্রাচীন। উৎসবের দিনে গ্রামের মন্দিরের সামনে গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে এই নাচ করত। এই নাচের জন্য কোন পেশাদার লোক ছিল না। কিন্তু জাপানের পাড়াগাঁয়ে সিন্তো ধর্মের প্রভাব ক্ষীণ হয়ে আসার সাথে সাথেই নাচের জনপ্রিয়তাও কমে আসে। জাপানের নগরবাসীরা দীর্ঘদিন নৃত্যবিমুখ ছিল, তবে

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে আমেরিকা থেকে আনা পাভ্লোভা, রুথ সেন্ট, টেনিস লা আর্জেন্টিনা প্রমুখ বিখ্যাত নৃত্যশিল্পীরা জাপানে আসেন। তাদের হাত ধরে পুনরায় জাপানে নৃত্যকলার জনপ্রিয়তা তৈরি হয়। ইউরোপীয় নৃত্যের মতো ইউরোপীয় সঙ্গীতও জাপানে প্রচলিত হয়। তবে বিশুদ্ধ ইউরোপীয় সংগীতের রূপ গ্রহণ করতে না পারার জন্য জাপানি সংগীত জাপানি নৃত্যের মতো সফলতা পায়নি। রবীন্দ্রনাথও *জাপান যাত্রী* গ্রন্থে জানিয়েছেন –

> একদিন জাপানি নাচ দেখে এলুম। মনে হল, এ যেন দেহভঙ্গির সংগীত। এই সংগীত আমাদের দেশের বীণার আলাপ। ...সমস্ত দেহ পুষ্পিত লতার মতো একসঙ্গে দুলতে দুলতে সৌন্দর্যের পুষ্পবৃষ্টি করছে। খাঁটি ইউরোপীয় নাচ অর্ধনারীশ্বরের মতো, আধখানা ব্যায়াম, আধখানা নাচ; তার মধ্যে লম্ফঝম্প, ঘুরপাক, আকাশকে লক্ষ্য করে লাথি-ছোঁড়াছুঁড়ি আছে। জাপানি নাচ একেবারে পরিপূর্ণ নাচ। তার সজ্জার মধ্যেও লেশমাত্র উলঙ্গতা নেই। অন্য দেশের নাচে দেহের সৌন্দর্যলীলার সঙ্গে দেহের লালসা মিশ্রিত। এখানে নাচের কোনো ভঙ্গির মধ্যে লালসার ইশারামাত্র দেখা গেল না। আমার কাছে তার প্রধান কারণ এই বোধ হয় যে, সৌন্দর্যপ্রিয়তা জাপানির মনে এমন সত্য যে তার মধ্যে কোনোরকমের মিশেল তাদের দরকার হয় না এবং সহ্য হয় না।
>
> কিন্তু, এদের সংগীতটা আমার মনে হল বড়ো বেশি দূর এগোয় নি। বোধ হয় চোখ আর কান, এই দুইয়ের উৎকর্ষ একসঙ্গে ঘটে না।

ভারতবর্ষ-র অগ্রহায়ণ ১৩২২ সংখ্যার 'জাপানের দিল্লি' শীর্ষক প্রবন্ধে বিনয় সরকার জানান তিনি কিয়েটোতে এসে লক্ষ করেছেন মন্দিরের একটি অংশকে কাঁধে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যা দেখতে রাস্তার দুপাশে মানুষ ভিড় করেছে। এই উৎসবকে তিনি হিন্দুদের 'উল্টোরথ' উৎসবের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি দেখেছেন আমাদের দেশে যেমন দশহরা বা ভাসানের সময় মূর্তি কাঁধে করে নিয়ে যাওয়া হয়, এখানেও সেই একই রীতি পালিত হয়। পাঞ্জাব ও দিল্লির রামলীলা, ভারতবিলাপ বা মুসলিমদের মহরম উৎসবের সঙ্গে এই উৎসবের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন প্রাবন্ধিক। এই শোভাযাত্রাগুলি যেন রাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করে এশিয়ার শোভাযাত্রা তথা এশিয়ার সাংস্কৃতিক 'রিচুয়ালের' প্রতীক হয়ে উঠেছে। জাপানে চারিদিকে ছড়িয়ে থাকা বৌদ্ধ মন্দিরগুলি দেখে তাঁর বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে থাকা শিবের থান বা কালীমন্দিরগুলির কথা মনে পড়েছে।

উনিশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে যখন বাঙালি পর্যটকেরা কালাপানির সংস্কার অতিক্রম করে বিদেশের মাটিতে পা রাখছেন তখন তাঁদের দৃষ্টি 'আধুনিক শিক্ষা ও দর্শনে দীক্ষিত', 'বাঙালি', 'ভারতীয়', 'বিশ্বনাগরিক' ইত্যাদি নানা পরিচয় দ্বারা চালিত

হচ্ছে। ফলে তাঁদের প্রতিগ্রহণের মানসিকতাও হয়ে উঠছে ভিন্ন ভিন্ন। এঁরা শুধুই পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় সীমাবদ্ধ থাকেননি। তাঁদের জাতীয়তাবোধ বহুস্তরযুক্ত, জটিল এবং দ্বন্দ্বসমন্বিত। বিশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশক জুড়ে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উজ্জীবিত উচ্চ ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত বাঙালি এবং মূলত হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের কাছে এশিয়ার মধ্যে একমাত্র জাপানই ছিল প্রবল পরাক্রমশালী ইউরোপের যোগ্য সমকক্ষ। জাপান পাশ্চাত্যের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করলেও পাশ্চাত্যের দাসত্ব স্বীকার করেনি। বরং সেই শিক্ষাকে নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে গড়ে নিয়েছে। তাদের দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা, স্বজাতি-সাধনা এবং শান্তিই তাদের শক্তির উৎস। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত অধিকাংশ প্রবন্ধেই একরকম আশঙ্কা প্রকাশ পেয়েছে যে জাপানের প্রকৃত ক্ষমতার উৎস যেহেতু ভারতবাসী এখনও বুঝতে পারেনি, তাই তাদের ভালো গুণগুলি অনুকরণ করতেও তারা সক্ষম হবে না। যদিও ভারতবর্ষ জাপানের সমতুল্য হয়ে উঠতে পারেনি তবুও জাতীয়তাবাদের স্বার্থে জাপান ও ভারতের অতীত যুগের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সাদৃশ্যগুলিকে পুনরুদ্ধার করা প্রয়োজন বলে অধিকাংশ প্রাবন্ধিক মনে করেছেন। ভারত নিজের সমৃদ্ধিশালী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারকে জানলে তারাও জাপানের মতো আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠবে। সেই অতীত সম্বন্ধস্থাপনের মধ্যে দিয়ে পাশ্চাত্যের সামনে এশিয়ার ইতিহাস, সংস্কৃতি, দর্শন ও ধর্মীয় ঐক্যের একটি সমৃদ্ধিশালী ছবি উপস্থাপন করা এবং পরাধীন দেশবাসীকে ঐতিহ্যের এই উত্তরাধিকার সম্পর্কে সচেতন করাই প্রাবন্ধিকদের অভীষ্ট লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল।

সহায়ক গ্রন্থ :

১) চট্টোপাধ্যায়, অশোক, কার্ত্তিক ১৩৩৩, 'জাপানের নাট্যমঞ্চ', *প্রবাসী,* খণ্ড ২৬.২, পৃ. ১০৬

২) চট্টোপাধ্যায়, নির্ম্মল পদ, আষাঢ় ১৩২৮, 'জাপানে নববর্ষ অভ্যর্থনা', *প্রবাসী,* খণ্ড ২১.১, পৃ. ৩৭১

৩) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পৌষ ১৩৯৬, 'জাপান-যাত্রী', *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (দশম খণ্ড), কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

৪) বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র, চৈত্র ১৩২০, 'মিয়াকো ওদোরী', *প্রবাসী,* খণ্ড ১৩, পৃ. ৬০৪

৫) সরকার, বিনয় কুমার, অগ্রহায়ণ ১৩২২, 'জাপানের দিল্লি', *ভারতবর্ষ,* খণ্ড ৩, পৃ. ১০৬৮

৬) 'জাপানের প্রাচীন ও আধুনিক নৃত্য', বৈশাখ ১৩৩৭, *প্রবাসী,* খণ্ড ৩০.১, পৃ. ১৪৯

৭) Gooptu, Sarvani, 2023, 'The Politics of Cultural Intimacies in Asia: Writings on Drama and Musical Performances in East and South East Asia in Bengali literature and Journals', *Identity at*

Crosswords: Performance and the Culture of Nationalism in Asia (eds. Sarvani Gooptu and Mimasha Pandit), Delhi, Routledge.

৮) Gooptu, Sarvani, 2022, *Knowing Asia, Being Asian: Cosmopolitanism and Nationalism in Bengali Periodicals 1860-1940,* NY, Routledge.

৯) Gooptu, Sarvani, 2018, 'Japan and Asian Destiny: India's Intellectual Journey through Contemporary Periodicals 1880-1930s', *On Modern Indian Sensibilities: Culture, Politics, History* (eds. Ishita Banerjee-Dube and Sarvani Gooptu, NY, Routledge

১০) Saaler, Sven, W.A. Christopher, 2011, *Pan Asianism: A Documentary History, Volume 1, 1850-1920,* UK, Szpilman Rowman and Little Field Publishers.

১১) Sen, Satadru, 2015, *Benoy Kumar Sarkar: Restoring the Nation to the World,* NY, Routledge.

তথ্যসূত্র:

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পৌষ ১৩৯৬, 'জাপান যাত্রী', রবীন্দ্র-রচনাবলী (দশম খন্ড), কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৃ.৪২৮

অরুণোদয় সাহার 'পদ্ম পাতায় জল' : সমকালীন সমাজের প্রতিচ্ছবি

রাকেশ দেবনাথ
অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
অদ্বৈত মল্ল বর্মন স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, ত্রিপুরা

সারসংক্ষেপ (Abstract): আলোচ্য গবেষণামূলক নিবন্ধে সমকালীন সময়ের বাস্তব দলিল রুপে ত্রিপুরার ঔপন্যাসিক অরুণোদয় সাহার 'পদ্মপাতায়জল' উপন্যাসটিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বক্ষমান আলোচ্য উপন্যাসে ঔপন্যাসিক তথানুকাল্লের দেশভাগকালীন সময়ে সাধারণ মানুষের বাস্তব ছবি এঁকেছেন। স্বাধীনতা অর্জিত হলেও গ্রামবাংলার মধ্যবিত্ত মানুষগুলির জীবনে অস্তিত্বের সংকট ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ত্রিপুরা রাজ্যের পরিসরে এই বিশেষ সময়কালের উত্তাল পরিস্থিতি সম্পর্কে লেখক তার সমাজমনস্কতার পরিচয় জ্ঞাপন করেছেন। এই সময়ের হাত ধরেই উপন্যাসে উঠে। এসেছে ত্রিপুরার উগ্রবাদসমস্যা, নকশাল আন্দোলন, উদ্বাস্তু সমস্যার মতো অনেক বাস্তব ঘটনার ছবি, যা উপন্যাসটির জনপ্রিয়তার অন্যতম প্রধান কারণ।
মূলশব্দ (Keyword): ত্রিপুরা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, রাজনীতি, উগ্রবাদ সমস্যা, নকশাল আন্দোলন।

মূল আলোচনা (Discussion)

সাহিত্য সময়ের দলিল। সাহিত্য মানব জীবন নির্ভর ইতিহাস। বাংলার সাহিত্যের প্রতিটি শাখার পাতায় পাতায়লুকিয়ে আছে মানুষের কথা, মানুষের ইতিহাস। সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যওনতুন আঙ্গিকে গড়ে ওঠে।সেজন্য সাহিত্যে সমাজের প্রতিচ্ছবি বা প্রতিবিম্ব ধরা পড়ে। সাহিত্য সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে এই রূপায়ণগত বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করি। সাহিত্যের পারিভাষিক শব্দ 'Literature'। এই 'Literature' এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Martin Gray বলেছেন-

> "A vague, all- inclusive term for poetry, novels, drama, ahort stories, prose: anything written, in fact, with an artistic purpose, rather than merely to communicate information; or anything written and examined as if it had an artistic purpose ।" [১]

উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি সীমান্তরাজ্য ত্রিপুরা। পার্বত্য এই রাজ্যের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, শিল্প ও সংস্কৃতি বিশ্বের পর্যটকদের বরাবরই আকর্ষণ করে আসছে। শুধু তাই নয়,

সাহিত্য সৃষ্টিতেও এই রাজ্য পিছিয়ে নেই। ত্রিপুরার সাহিত্য মানেই ত্রিপুরার ইতিহাস। ত্রিপুরার রাজন্য আমলের ইতিহাস, স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাপ, বঙ্গভঙ্গের আঘাত, দেশভাগের ঘা, আশি সনের দাঙ্গা, উগ্রপন্থীর কালো দিন এই সমস্ত ঘটনাই ফিরে ফিরে এসেছে এখানকার সাহিত্যের পাতায় পাতায়।

সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো উপন্যাস। ত্রিপুরার উপন্যাস লেখার প্রথম প্রয়াসলক্ষ্য করা যায় 'রবি' পত্রিকার (১৯২৪ খ্রিঃ) প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত পরিমল কুমার ঘোষ এর 'খাঁচার পাখি' নামক একটি উপন্যাস প্রকাশের মধ্য দিয়ে। এরপর বীরেন দত্তের 'গ্রামের মেয়ে' উপন্যাসটি ১৯৩৮-৩৯ সালে লেখা হয় কিন্তু দীর্ঘকাল পরে ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতার অনেক পরে বিশ শতকের সত্তরের দশকে প্রকাশিত হয় প্রদীপ আচার্যের 'পথের প্রদীপ','দুই অধ্যায়' এই উপন্যাস দুটি। বিশ শতকের আশির দশক থেকেই এ রাজ্যে প্রকৃত উপন্যাস রচনা শুরু হয় কার্তিক লাহিড়ী, বিমল সিংহ, বিকাশ সাহা, প্রদীপ দেব প্রমুখের লেখনীর মাধ্যমে।

ত্রিপুরার বাংলা কথাসাহিত্য যাঁদের লেখনীতে ঋদ্ধ হয়েছে অরুণোদয় সাহা (১৯৪৮) তাদের মধ্যে এক অন্যতম নাম। তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কুমিল্লা শহরের কান্দিরপাড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তারপর নানা অস্থিরতার মধ্যেই মায়ের কোলে করে চলে আসেন রাজন্য শাসিত এই পার্বত্য ত্রিপুরায়। তারপর উঁনাদের স্থায়ী ঠিকানা হয় ত্রিপুরার বিশালগড়ে। তিনি বর্তমানে ত্রিপুরার বাংলা কথা সাহিত্য চর্চার সাথে যুক্ত। তার প্রথম উপন্যাস 'পদ্মপাতায় জল'। উপন্যাসটি 'স্যন্দন' পত্রিকায় শারদ সংখ্যা ১৪১২ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ২০০৫ এ প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সময়ে ২০২১ এর ফেব্রুয়ারিতে আগরতলা নীহারিকা পাবলিশার্স থেকে গ্রন্থাকারে দু'মলাটে রূপ পায়। ১২টি পরিচ্ছেদের এই উপন্যাসের পটভূমি হল ত্রিপুরা। ফলত দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, শরণার্থী শিবির, মানুষের অস্তিত্বের সংকট, চরিত্রের অবনমন সমস্তই এই উপন্যাসের সমাজ চিত্রকে বাস্তবায়িত করে তুলেছে। সচেতন পাঠককে বলে দিতে হয় না এই উপন্যাসের ঘটনা আসলে ত্রিপুরার ইতিহাসে ঘটে যাওয়া স্থানীয় ঘটনার জলছবি।

পদ্মপাতায় জল যেমন স্থির থাকতে পারেনা, টলমল করে। ঠিক তেমনি এই উপন্যাসের কাহিনিতে চরিত্র গুলোর জীবন সংকট আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে। জীবনের সেই হতাশা অবক্ষয় নারীর যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি হচ্ছে 'পদ্মপাতায় জল' উপন্যাস। চরিত্র নির্মাণেও লেখক এর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। দিবাকর, স্ত্রী দীপা, মেয়ে কাজু, ছেলে রুনু, রুনুর বন্ধু অনির্বাণ, ওপার বাংলা থেকে উঠে আসা সমরেন্দ্র ভৌমিক ও তার এক প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে জোছনা, স্মৃতি, ও একই নামে দুটি চরিত্র নিখিল, নিখিল প্রত্যেকের জীবনই পদ্মপাতার জলের মতো টলমলে এই বুঝি ফুরিয়ে গেল জীবন।

'পদ্মপাতায় জল' উপন্যাসে সময় ও পরিসর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উত্তাপহীনতা দিয়ে উপন্যাসের শুরু। উপন্যাসে দেশভাগের কথা আছে। দেশভাগ শব্দটি শুনলেই একটা দগদগে ঘা খাওয়া ইতিহাসের জলছবি আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে, যার জলছাপ এখনো মুছে যায়নি ত্রিপুরাবাসীর মন থেকে। দেশভাগ কথাটি আমাদের অস্তিত্বের সংকটকে তথা 'Identity crisis' কে নাড়া দেয়। এই দেশভাগ পরবর্তী কালে আমাদের বাংলা সাহিত্যকে বিশেষভাবে প্রবাহিত করেছে। উপন্যাসে দেশভাগের প্রসঙ্গ ক্রমে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ঔপন্যাসিক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সূত্রে সমরেন্দ্র ভৌমিক ও তার মেয়ে জোছনা চরিত্রটি অঙ্কন করে বিষয়টিকে পাঠকের সামনে জীবন্ত রূপে তুলে ধরেছেন।

ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্তবর্তী দেশ বাংলাদেশ তখন এক বিশেষ কারণে উত্তাল হয়ে উঠেছিল, ইতিহাস তার সাক্ষী। মানুষ যখন নিজের বুকের রক্ত ঢেলে দিচ্ছিল স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য তখন লক্ষ লক্ষ মানুষ অতিক্রম করেছিল আন্তর্জাতিক সীমানার খুটি। সেই সময়টি হল **১৯৭১** সাল। সে সময় দেশটিতে রাষ্ট্রনৈতিক সংগ্রাম তীব্র আকার ধারণ করে। বাঁধভাঙ্গা জলস্রোতের মতো ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছিল মানুষ। উপন্যাসিক লিখেছেন-

> "পূর্ব পাকিস্তানের সীমানা পেরোলেই ত্রিপুরা। প্রাণের ভয়ে, প্রাণের দায়ে যারা ভারতে প্রবেশ করল তাদের পরিচয় হল বাংলাদেশী শরণার্থী। ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের ন্যায় আগত শরণার্থীরা প্লাবনের মতো ত্রিপুরায় ঢুকে পড়লো।" [২]

প্রথম অবস্থায় শরণার্থীদের নিয়ন্ত্রণ করতে ত্রিপুরার প্রশাসন প্রস্তুত ছিল না। যারা নিজেদের প্রাণকে হাতে করে নিয়ে এখানে চলে এসেছে তাদেরকে প্রথমে স্থানীয় স্কুলঘরে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে। লঙ্গরখানা তৈরি করে সেখানে তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। পরবর্তী সময়ে এদেশের সরকার অত্যন্ত মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে শরনার্থী মানুষদের জন্য অন্ন, বস্ত্র ও অস্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিচ্ছিল। এমনকি কূটনৈতিক ভাবেও পরিস্থিতির মোকাবিলা করার নানা প্রয়াস চালিয়েছেন এদেশের সরকার।

উপন্যাসে দেখা যায় দেশভাগের শিকার হয়ে সমরেন্দ্র ভৌমিক ও তার মেয়ে জোছনা স্বভূমি ত্যাগ করে চলে এসেছে ত্রিপুরায়। কুমিল্লার বেগমাবাদে তাদের বাড়ি। এখানে এসে সমরেন্দ্র এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় আবিষ্কার করেন। এভাবেই তো কাছে দূরের স্বজনদের নিয়ে বঙ্গভূমির মানুষ যুগ যুগ ধরে বসবাস করে আসছেন। সে ত্রিপুরায় এসে দিবাকরকে খুঁজে পেয়েছে, দিবাকরের বাবাকে তিনি দুর্সম্পর্কে বেয়াই পরিচয় দিয়ে সে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। দীপাকে তিনি ঝিয়ারী সম্বোধন করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে সমরেন্দ্র ও জোছনাদের মত অগণিত মানুষ সীমান্ত রেখা পেরিয়ে ত্রিপুরায় এসে ভিড় করেছে। তখন এই বাংলাদেশি শরণার্থীদের জন্য অস্থায়ী শিবির গড়ে উঠতে লাগলো ত্রিপুরার আগরতলা, বিশালগড়, শিলাছড়ির মতো অনেক জায়গায়। এইরকমই এক শরণার্থী শিবিরে সমরেন্দ্র ভৌমিক তার মেয়ে জোছোনাকে সহ ৩৪ ভরি সোনা নিয়ে বিশালগর মোড়াবাড়ি শরনার্থী ক্যাম্পে এসে ওঠেন। পরবর্তী সময়ে জোছনা দিবাকর ও দীপার সংসারে আশ্রিত হতে পেরেছে।

সমরেন্দ্র ভৌমিককে লেখক দেশভাগের প্রতিনিধি নির্ভর স্থানীয় চরিত্র হিসেবে অঙ্কন করেছেন। তিনি দেখেছেন হিন্দু-মুসলমানের বিভাজন, আর এখন দেখে চলেছেন শরণার্থী শিবিরের অকথ্য জীবন যাপন। স্ত্রীবিয়োগ এরপর তিনি একমাত্র মেয়ে জোছনাকে নিয়ে প্রাণ ও মান বাঁচাতে আশ্রয় নেন ত্রিপুরায়। বাংলাদেশে জোছোনাকে মুসলমান এক যুবক অপহরণ করে বিয়ে করেছিল, কিন্তু বিবাহ জীবন সুখের হয়নি, রাজনীতির বলি হয়েছিল ছেলেটি। তাকে হত্যা করা হয়েছিল। জোছনাকে চলে আসতে হয় বাপের বাড়িতে। এই ঘটনাটিই তৎকালীন রাজনৈতিক উত্তাল পরিস্থিতি সম্পর্কে জানান দেয়। সমরেন্দ্র বলেন-

> "জ্বালারতো আমার শ্যাষনাই। দ্যাশে মুসলমান পোলা ভাগাইয়া লইয়া গেছিল। এখন হিন্দুর পুলারা ফুসলায়। আর বাগানোর ধান্দা করে।... সারারাত চোখের পাতা এক করতে পারিনা। বাসের বেড়ার ফাঁক দিয়া মাইয়ার ব্লাউজ ধইরা টানে অসভ্যেরা।"[৩]

রবার্ট কেনেডি তখন ইংল্যান্ড থেকে ভারতের ত্রিপুরায় বিশালগড়ের কাছে মুড়াবাড়ি শরনার্থী শিবিরে গেছেন, সেখানে সমরেন্দ্র ভৌমিকের সঙ্গে তার কথা হয়েছে। কেনেডির বড় ভাই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তাকে খুনকরা হয়েছিল। সমরেন্দ্র কাঁদো কাঁদো গলায় বলেছেন-

> "বাংলাদেশ ভালো না, ইন্ডিয়া ও ভালো না, আমেরিকাও ভালো না। অসৎ মানুষ এ পৃথিবীটা ভইরা গেছে। আমি কোথাও আর যামু না। পরলোকে চইলা যামু। আমার ইস্তিরি সেখানে আছে। আমি তার কাছে যাইতে চাই।"[৪]

উপন্যাসে রাজনীতি একটি বড় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকা, চীন, জাপান, নিউজিল্যান্ড, রাশিয়া, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ কেন্দ্রিক রাষ্ট্রীয় স্তরের রাজনৈতিক অবক্ষয়ের কথা আছে। ঔপন্যাসিক নিখিল চরিত্রের মুখে সংলাপ তুলে দিয়েছেন-

> "দাদা, আজকের পত্রিকা পড়েছেন? অর্থমন্ত্রী শচীন চৌধুরী টাকার মূল্য হ্রাস করে দিয়েছে। কি কাণ্ড বলুন, ভারতবর্ষে এই প্রথম একজন বাঙালি অর্থমন্ত্রী হয়েছে। প্রাইম মিনিস্টার ইন্দিরা গান্ধি তাঁকে বলির পাঠা বানালেন।" [৫]

আর্জেন্টিনার চে গুয়েভারার মহান বিপ্লবী সংগ্রামের কথা উপন্যাসে আনির্বাণের মাধ্যমে এসেছে। অর্থাৎ অনির্বাণের কণ্ঠে বিপন্ন জীবন এবং তা থেকে উত্তরণের কথা আছে। অনির্বাণ বলেছে-

> "কিউবায়ফিডেল কস্ট্রোয়া করেছেন- চিনদেশের মাওসে তুংয়ের নেতৃত্বে কৃষক শ্রমিকের সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের নকশালবাড়িতে আগুন জ্বলে উঠেছে- সে আগুনকে ছড়িয়ে দিতে হবে দিক থেকে দিগন্তে।"[৬]

পরবর্তী সময়ে আমরা দেখতে পাই অনির্বাণ কাজুর হাতে 'রেড বুক' তুলে দেয়। এতে আছে চীনের চেয়ারম্যানের দীর্ঘ বিপ্লবী জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্জাত বাণী ও নির্দেশাবলি। কাজু অনির্বাণকে দেখে যখন বলে তুমি চেগুয়োভার হতে চাও কি। তখনই তাদের কথা প্রসঙ্গে উঠে আসে নকশাল আন্দোলনের কথা। ঔপন্যাসিক লিখেছেন –

> "আমাদের দেশে এখন চেগুয়েভারার মতবিপ্লবী ব্যক্তিত্ব দরকার- আমাদের এখন দরকার সশস্ত্র বিপ্লব।... কে দেবে এই নেতৃত্ব? নকশাল আন্দোলনের তাত্ত্বিক নেতা চারু মজুমদার অবশ্য বলেছেন, সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমেই আমাদের দেশে পরিবর্তন আসবে।" [৭]

অনির্বাণ বলেছিল এই রেড বুকটা লুকিয়ে রাখার জন্য। পুলিশ খুঁজে পেলে সমস্যা হতে পারে। অনির্বাণ কাজুর সম্বন্ধে বলে যদি সে বিপ্লব দেখে যেতে পারে তাহলে সে সবাইকে বলবে কাজুও তাকে বিপ্লব আনতে সাধ্যমত সাহায্য করেছে। অনির্বাণ বলে-

> "বিপ্লব, তুমি দীর্ঘজীবী হও। বিপ্লব জিন্দাবাদ।" ৮

উপন্যাসের প্রত্যেকটি চরিত্র পদ্ম পাতার জলের মতন টলমল করছে। দিবাকর প্রথম জীবনের সরকারি চাকরি করতো। পরবর্তী সময় দেখতে পাই রাজনৈতিক শোষণের শিকার হয়ে জেলে থাকতে হয়েছে। তার স্ত্রী দীপা আজীবন সংসার প্রতিপালন করতে করতে সায়াটিকে ব্যথায় তলিয়ে যাচ্ছে। স্মৃতির জীবনে আরও বিপন্ন। তার বিয়ে থা হয়নি। বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাওয়ার পরে ভাড়াটিয়া নিখিলের সঙ্গে সম্পর্কে যুক্ত হয়ে গর্ভে সন্তান ধারণ করেন। এবং পরবর্তী সময়ে গর্ভের সন্তানসহ আত্মহত্যা করে। উপন্যাসে কাজু ছাড়া প্রত্যেকটি চরিত্রের কাছে জোছনা বিশবাষ্পের মত ছিল। দিবাকর তাকে ব্যবহার করেছে না তার শরীর নিয়ে খেলা করেছে। দিবাকর জোছনাকে নিয়ে আগরতলা জয়নগরে ভাড়া বাড়িতে পালিয়ে গেছে। জোছনার জন্য দীপা, দিবাকর এর দাম্পত্য জীবনে ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে। ছেলে রুনুকেও জেলে থাকতে হয়েছে।

তৎকালীন সময়ে এক উত্তাল পরিস্থিতিতে ত্রিপুরায় গড়ে উঠেছে উগ্রবাদ সমস্যা। দিবাকরকে অপহরণ করা হয়েছে। দক্ষিণ ত্রিপুরার শিলাছড়ির কাছে শরণার্থী

শিবির গড়ে উঠছে। দিবাকর ঘর তৈরি করার কাজ নিয়েছে। সেখান থেকেই তাকে উগ্রপন্থী ধরে নিয়ে যায়। ঔপন্যাসিক লিখেছেন-

> “হঠাৎ তিনজন যুবক এসে দিবাকরকে ঘিরে দাঁড়াল। তাদের প্রত্যেকের মুখ রুমাল দিয়ে ঢাকা। যদিও তাদের মুখ ঢাকা, তবু বুঝতে অসুবিধেনেই ওরা উপজাতি যুবক।” [৭]

কাজু দিবাকরকে উগ্রপন্থীদের হাত থেকে ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করছে এবং সমরেন্দ্র ভোমিকও তাকে সাহায্য করবে বলে জানায়। এই সমস্ত ঘটনার মধ্যে দিয়েই আমরা দেখতে পাই ত্রিপুরার উগ্রবাদ সমস্যার একটি জলন্ত রূপ।

সাহিত্য সমাজের কথা বলে। আজকের ঘটে যাওয়া ঘটনা ভাবিকালের সাহিত্যের আঁধার। ‘পদ্মপাতায় জল’ ও ত্রিপুরার ইতিহাসে ঘটেযাওয়া এক করুন সময়ের কথা বলেছে। ত্রিপুরার ঘটনাকে সাহিত্যের প্লট বানিয়ে অনেক সাহিত্যিকের-কর্ম থাকলেও অরুণোদয় সাহার ‘পদ্মপাতায় জল’ পাঠকের কাছে এক অন্য মাত্রায় ধরা দেয়। এখানে লেখক ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গার নাম ব্যবহার করে ঘটনাগুলিকে বাস্তব করে তুলেছেন। যা ত্রিপুরার অন্য আরো সাহিত্যিকের রচনায় তেমন ভাবে লক্ষ্য করা যায় না।

উপন্যাসে এমন অনেক বিষয় ছিল যেগুলোর প্রতি লেখক তেমনভাবে দৃষ্টি দেননি। যেমন কাজু ও অনির্বাণের প্রেম, কন্যাদানগ্রস্থ পিতা সমরেন্দ্র ভৌমিক মেয়ে জোছনাকে নিয়ে চিন্তিত ছিলেন কিন্তু পরবর্তী সময়ে জোছনার কি হলো তা লেখক দেখাননি। স্মৃতি চরিত্রটিকে গর্ভবতী অবস্থায় ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়েছেন। এর জন্য দায়ী কে? কথাকার অরুণোদয় সাহা এভাবেই ত্রিপুরার ইতিহাসে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনাকে প্রেক্ষাপট করে উপন্যাসের কাহিনিকে বাস্তবসম্মত করে তুলেছেন। যা সমকালীন সময়ের দলিল হিসেবে থেকে যাবে পাঠকের হাতে।

তথ্যসূত্র:

১. মিশ্র, অশোককুমার, ড., ১৫আগষ্ট ১৯৯৭-৯৮, ‘সাহিত্যের রূপরীতি কোশ’, কলকাতা ৭০০০০৯, সেন্ট্রাল বুক পাবলিশার্স, পৃ- ১

২. সাহা, অরুণোদয়, ফেব্রুয়ারি ২০২১, ‘পদ্ম পাতায় জল’, আগরতলা, ত্রিপুরা ৭৯৯০০৬ নীহারিকা পাবলিশার্স, পৃ-২৪

৩. তদের, পৃ-৩২

৪. তদের, পৃ-৩৯

৫. তদের, পৃ-২১

৬. তদের, পৃ-৪৬

৭. তদের, পৃ-৩৪

৮. তদের, পৃ-৩৭

৯. তদের, পৃ-৮২

গ্রন্থপঞ্জি

আকরগ্রন্থ:

মিশ্র, অশোককুমার, ড., ১৫ আগষ্ট ১৯৯৭-৯৮, ‘সাহিত্যের রূপরীতি কোশ’, কলকাতা ৭০০০০৯, সেন্ট্রাল বুক পাবলিশার্স।

সহায়গ্রন্থ:

১. চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল, আগস্ট১৯৯৫, ‘সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ’, কলকাতা, দে’জ পাবলিশার্স।

২. মিশ্র, অশোককুমার, ড., ১৫ আগষ্ট ১৯৯৭-৯৮, ‘সাহিত্যের রূপরীতি কোশ’, কলকাতা ৭০০০০৯, সেন্ট্রাল বুক পাবলিশার্স।

রবীন্দ্রনাথের ‘শাস্তি’: নামকরণের অন্দরমহল

রামকৃষ্ণ মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
জীবনতলা রোকেয়া মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: বাংলা ছোটগল্প চর্চার ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গল্পকারদের মধ্যেও তিনি একজন। প্রায় শতাধিক ছোটগল্পে তিনি যে বিচিত্র ভুবন ও রসের সন্ধান দিয়েছেন তা অনন্য। গল্পগুচ্ছের অন্তর্গত 'শাস্তি' গল্পটি সম্পর্কে এতদকাল পর্যন্ত বহু আলোচনা হয়েছে ও হচ্ছে। আলোচ্য গল্পের প্রধান নারী চরিত্র চন্দরা। তাকে মিথ্যা মৃত্যুর দায় গ্রহণে বাধ্য করেছিল তারই 'স্বামী রাক্ষস' ছিদাম। শাস্তিযোগ্য না হয়েও মৃত্যুদণ্ডের '' তাকেই ভোগ করতে হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, শাস্তি কি শুধু চন্দরাই পেয়েছিল? না। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কুরি পরিবারের সকলেই শাস্তি ভোগ করেছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পটভূমিকায় দরিদ্রপীড়িত সেই কুরি পরিবারের চিরস্থায়ী জীবনযন্ত্রণা তথা 'শাস্তি'র যে নিদারুণ রূপ রবীন্দ্রনাথ এই গল্পের পরতে পরতে উপস্থাপন করেছেন, তা বাস্তব এবং গভীর তাৎপর্যবহ। আমাদের এই আলোচনাতে নামকরণের সেই বহুমাত্রিক তাৎপর্য উঠে এসেছে।
সূচক শব্দ: রবীন্দ্রনাথ, গল্পকার, গল্পগুচ্ছ, 'শাস্তি' গল্প, পটভূমি, শাস্তির অন্দরমহল, চন্দরা, ছিদাম, দুখিরাম, রাধা, শিশু পুত্র,তাৎপর্য।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি। কবির কল্পনা, শিল্পীর শৈল্পিক নিপুনতা ও লেখকের গভীর বাস্তবতায় সমুজ্জ্বল তার ছোটগল্পগুলি। 'রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ' গ্রন্থে, তপব্রত ঘোষ জানিয়েছেন- "রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প যেন নখ দর্পণে বিশ্ব -দেখা। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে কোন পুনরুক্তি নেই, ছোটগল্পের রবীন্দ্রনাথ যেন ঈশ্বরেরই প্রতিদ্বন্দ্বী। মানবজীবন ও মানব মনের 'অনন্তপার' বৈচিত্র্যে এইসব গল্প যেমন অমিতবিত্ত তেমনি শিল্পের প্রসাধনেও 'নিতুই নব'।

রবীন্দ্রনাথের ‘গল্পগুচ্ছে’র একটি সুবিখ্যাত ছোটগল্প 'শাস্তি'। সাধনা পত্রিকাতে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের শ্রাবণ মাসে এটি প্রকাশিত হয়। গল্পের পটভূমি সামন্ততান্ত্রিক গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থা। রবীন্দ্রনাথ তখন বাংলাদেশের শিলাইদহে। গ্রাম বাংলার দরিদ্র পীড়িত অসহায় কৃষিজীবি নর- নারীদের জীবন যাপন সম্পর্কেও তাঁর ছিল গভীর জানাশোনা । নিজেও ছিলেন জমিদারের ভূমিকায়। তবে সেকালের সব

জমিদাররা মাত্রই যে প্রজাপীড়ক কিংবা অত্যাচারী ছিলেন, তা নয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার ‘বঙ্গদেশের কৃষক’ প্রবন্ধে সম্পর্কে স্পষ্টই জানিয়েছেন -".......সকল ভূস্বামী এ চরিত্রের নহে । অনেকের যথার্থ দয়া ধর্ম আছে।" পাশাপাশি দয়া , ধর্মহীন অমানবিক জমিদার মহাজনদের নিদারুন শোষণের চিত্রও তিনি এঁকেছেন। সামন্ততান্ত্রিক পীড়নে পরান মন্ডলের মতো অগণিত কৃষকদের জীবনে শ্রীবৃদ্ধি বলে কিছুই ছিল না। প্রাবন্ধিকের ভাষায়- "চাষা চিরকাল ধার করিয়া খায়, চিরকাল দেড়ি সুদ দেয়।"

'শাস্তি' গল্পে জমিদারতন্ত্রের শোষণে নিপীড়িত কৃষকগণের লাঞ্ছনা চিত্র আছে। রয়েছে নিসর্গ প্রকৃতির প্রভাব। বাংলাদেশের প্রধান নদী পদ্মার কথাও এসেছে। রবীন্দ্রনাথ যখন শিলাইদহের কুঠির বাড়িতে তখন “শিলাইদহের উত্তর দিয়ে পদ্মা প্রবাহিত, ঠিক সরাসরি উত্তরে পাবনা শহর, বাজিতপুর স্টিমারঘাট ও ইছামতি নদীর মুখ।......... কুঠিবাড়ির উত্তরে পদ্মার উপরে খেয়াঘাট।.........বাংলাদেশের অন্যান্য গ্রামে যেমন জেলেপাড়া, কামারপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া প্রভৃতি থাকে এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।......... পদ্মা নদীতে কুঠিবাড়ির কাছে একটি বটগাছ ও বেল গাছের নিকট বাঁধা থাকতো কবির বাহন ' বোটখানি"(শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ - প্রমথনাথ বিশী)। উল্লেখ্য আলোচ্য গল্পে, গল্পকার পদ্মা নদীর যে ভাঙ্গনের পরিচয় দিয়েছেন তা মূলত গল্প কাহিনীর মূলভাবনার সঙ্গে প্রতীকায়িত। পদ্মা নদীর ভাঙ্গন যথার্থই 'কুরি' পরিবারের সমূহ সর্বনাশের আগাম পূর্বাভাস। সর্বোপরি, সমকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে আলোচ্য গল্পে উঠে এসেছে, গ্রামীন কৃষিজীবী মানুষের লাঞ্ছিত জীবনের বাস্তব চিত্র।

এবার আসা যাক গল্পের নামকরণ প্রসঙ্গে। সাহিত্যের নামকরণ ব্যক্তি নামের মত নয় । কানা মেয়ের নাম ‘পদ্মলোচন’ কিংবা ময়লা ছেলের নাম ‘উজ্জ্বল’ রাখলেও কিছু আপত্তি থাকে না । তবে সাহিত্যের নামকরণকে হতে হয় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাই সাহিত্যিকেরা তাঁদের সাহিত্য সমূহের নামকরণের প্রতি বিশেষ যত্নশীল হন। সজাগ দৃষ্টিভঙ্গি ও দূরদর্শী চিন্তা ভাবনার আলোকে তারা তাঁদের গল্প, উপন্যাস, কাব্য, কবিতা,নাটক - প্রহসন ও প্রবন্ধাবলীর নামকরণ করেন । রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের সব্যসাচী। বাংলা সাহিত্যের সব শাখাতেই তার অবাধ বিচরণ । সাহিত্যের নামকরণ সম্পর্কেও তাঁর প্রখর সচেতনতা সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । নামকরণ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও কাটা ছেঁড়া রবীন্দ্রনাথের হাতে বহু ক্ষেত্রে লক্ষিত হয়েছে। আমাদের আলোচ্য ‘শাস্তি’ গল্পটির নামকরণ যে গভীর ব্যঞ্জনাবাহী, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ‘শাস্তি’ শব্দের আভিধানিক অর্থ সাজা, দণ্ড বা নিগ্রহ। এবার আমরা, আলোচ্য গল্পের

বিষয়বস্তু পর্যালোচনায় অগ্রসর হয়ে দেখব 'শাস্তি' নামকরণ- আলোচ্য গল্পটির ক্ষেত্রে কতখানি সদর্থক ও তাৎপর্যপূর্ণ।

গল্পটি তিনটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। তীব্র একমুখীন গতিতে গল্পের কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র চন্দরা স্বামীর দেওয়া মিথ্যা দোষারোপের বোঝা কাঁধে নিয়ে প্রগাঢ় অভিমানে মরণের শাস্তি গ্রহণে অবিচল থেকেছে । **প্রথম পরিচ্ছেদে** গল্পকার সামন্ততান্ত্রিক গ্রামীণ পটভূমিতে যে দরিদ্র জর্জরিত কুরি পরিবারের নারী - কলহের সংকট উপস্থাপন করেছেন, তা বাস্তব। প্রতিবেশীদের কাছেও রাধা ও চন্দরার ঝগড়া- বিদ্বেষ আর বিশেষ কোন কৌতুহল জাগ্রত না। গল্পের সূত্রপাত যেদিন সেদিনের বর্ষণমুখর প্রকৃতি অত্যন্ত গুমোট ছিল এবং সেই পরিবারের অনতিদূরে প্রবাহিত পদ্মার ভয়ংকর চোখ রাঙানোও স্পষ্ট ভাবে অনুভূত হচ্ছিল। নিসর্গ প্রকৃতির সেই গুমোট ভাব ও পদ্মার ভয়ংকর হাতছানির বহিঃপ্রকাশ কুরি পরিবারে লক্ষিত হয়। সেদিন সকালে দুখিরাম ও তার ভাই ছিদাম রুই যখন জমিদারের পেয়াদার জবরদস্তিতে, দা হাতে নিয়ে কাজে বের হচ্ছিল তখন তাদের দুই বউ ছিল কলহমুখর। অনিচ্ছার সত্ত্বেও জমিদারের কাছারি গৃহের চাল সারাইয়ের কাজে দুই ভাইকে যেতে হয়েছে। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে সারাদিন পরিশ্রমের বিনিময়ে তারা যে ক্ষুধা নিবৃত্তির ‘জলপানি’ ও ‘মজুরি’ পেয়েছিল তা সামান্যই। সারাদিনের সেই বীতশ্রদ্ধ মন নিয়ে দুই ভাই বাড়ি ফিরেছে। ক্ষুধার্ত দুখিরাম ভাত চেয়েছিল তার স্ত্রী রাধার কাছে। চন্দরার সঙ্গে কলহে ক্লান্ত রাধাও সেদিন চালে’র অভাবে হাঁড়ি চড়াতে পারেনি। বিক্ষুব্ধ চিত্তে স্বামীর মুখের ওপর “তীব্র কণ্ঠস্বর আকাশ-পরিমান” ক্রোধে জানায়- “ভাত কোথায় যে ভাত দিব। তুই কি চাল দিয়া গিয়াছিলি? আমি কি রোজগার করিয়া আনিব।”- রাধার এই প্রত্যুত্তরে দুখিরাম আপন স্ত্রী’র গণিকা বৃত্তিজনিত রোজগারের কুৎসিত শ্লেষ অনুভব করে তীব্র বাঘের ন্যায় গর্জন করে বলেছে –“কি বললি!” - হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে হাতে দা তুলে নিয়ে আঘাত করেছে রাধা’র মাথায়। সারাদিনের পরিশ্রমের ন্যায্য পাওনার বঞ্চনা, জলে ভেজা ক্ষুধার্ত দেহমনের সংগোপনীয় ক্রোধ-এক ধরনের আদিম হিংস্রতায় উগরে দিল সে এক অসহায় নারী’র উপর। আহত রাধা লুটিয়ে পড়ে “ছোট জয়ের কোলের কাছে”। এবং মৃত্যু হয় রাধার।

নিসর্গ প্রকৃতিতে তখন গভীর প্রশান্তি। সমস্ত দিনের শেষে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। পৃথিবীর যাবতীয় কোলহল তখন আর নেই। কুরি পরিবারও নিস্তব্ধ। জেগে থাকা মানুষগুলো কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ঠিক সেই মুহূর্তে কুরি বাড়িতে রামলোচন চক্রবর্তীর পদার্পণ। জমিদারের খাজনা আদায়কারী,মামলা-মোকদ্দমার ক্ষেত্রে, আইনি পরামর্শদানে এই রামলোচন ছিলেন “সমস্ত গ্রামের প্রধানমন্ত্রী”। সন্ধ্যার সেই থমথমে পরিবেশে

রামলোচন ভীত কণ্ঠে দুখিরামের নাম ধরে ডাক দিতেই সে অবোধ বালকের মতো উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কেঁদে ওঠে। সংশয় নিবারণ কল্পে এগিয়ে আসে ছিদাম। তার মুখেই রামলোচন জানতে পারেন, "ঝগড়া করিয়া ছোটবউ বড় বউয়ের মাথায় এক দায়ের কোপ বসাইয়া দিয়াছে।" এবং তাতে বড় বউ রাধার মৃত্যু হয়েছে। সমূহ বিপদ ও আগামী দিনের আইনি শাস্তি থেকে ছোট বউকে বাঁচানোর জন্য প্রবাল আকুতিতে ছিদাম তখন মরিয়া। রামলোচনের পা জড়িয়ে ধরে একরাশ আশা নিয়ে জানায় "দাদাঠাকুর এখন আমার বউকে বাঁচাবার কি উপায় করি।" ছিদামের এই আর্তিতে তিনি প্রত্যুত্তর দেন "তুই এখনই থানায় ছুটিয়া যা বলগে তোর বড় ভাই দুঃখী সন্ধ্যাবেলায় ঘরে আসিয়া ভাত চাইয়াছিল, ভাত প্রস্তুত ছিল না বলিয়া স্ত্রীর মাথায় দা বসাইয়া দিয়াছে।" উল্লেখ্য, কাকতালীয়ভাবে রামলোচন চক্রবর্তী ছিদামের বউ চন্দরাকে বাঁচানোর জন্য যে আইনি পরামর্শ দিয়েছেন তার সঙ্গে প্রকৃত ঘটনাটির যথাযথ মিল ছিল। কিন্তু ছিদাম খুব তাৎপর্যপূর্ণভাবে তা অস্বীকার করে উত্তর দিয়েছে –"ঠাকুর বউ গেলে বউ পাইব, কিন্তু আমার ভাই ফাঁসি গেলে আর তো ভাই পাইব না।" ছিদামের মনের আসল কথা টের পান রামলোচন চক্রবর্তী এবং অবশ্যই আমরা। অর্থাৎ অপরাধ না করেও চন্দরা শাস্তি পাক - এটা একজন স্বামী পুরুষের পক্ষে মেনে নেওয়া যতখানি সহজ তার চেয়ে অধিক কঠিন অপরাধী ভাইয়ের শাস্তিকে গ্রহণ করা।

অতঃপর রামলোচন সহজে বুঝেছেন, দু'কুল বাঁচানো সম্ভব নয়। ছিদামকে তিনি পরামর্শ দেন- "তবে যেমনটি ঘটিয়াছে তাই বলিস।" রামলোচন ফিরে গেছেন স্বগৃহে। বাঁধভাঙা বন্যার মত কুরি পরিবারের দুই বউয়ের বিবাদ এবং মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়েছে দিগ্বিদিকে। পুলিশ আসল, "অপরাধী এবং নিরাপরাধী" কুরি পরিবারের পরিণত জীবন্ত মানুষ গুলো আগামী বিপদের ভয়ঙ্কর সম্ভাবনায় উদ্বিগ্ন হলো। শাস্তির লেলিহান শিখার সামনে দাঁড়িয়ে তখন শুধু প্রহর গোনার পালা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শুরুতে ছিদাম তার স্ত্রী চন্দরাকে মিথ্যা অপরাধের ভার সমর্পণ করেছে। ছিদামের এ অনুরোধ চন্দরার কাছে ছিল "স্বামী রাক্ষসের" বুভুক্ষু আহ্বান। তাই হত্যাকারীর অপরাধ জনিত শাস্তি থেকে চন্দরাকে বাঁচিয়ে দেওয়ার যে সম্ভব্য নিদান ছিদাম দিয়েছিল, তাতে 'বজ্রাহত' চন্দরার পক্ষে বাকস্তব্ধ হওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না। এরপর গল্পকার খুব অল্প কথায় কুরি পরিবারের পরিণত সদস্যদের স্পষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। ১৭-১৮ বছরের চন্দরার 'মুখখানি হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল; শরীরটি অন অনতিদীর্ঘ আটসাঁট....। একখানি নতুন তৈরি নৌকার মতো.....।" পরিপূর্ণ কিশোরীর পরিপাটি ছিল তার চলনে, বলনে এবং কর্মে। পৃথিবীর যাবতীয় ভালো-মন্দ বিষয়ের প্রতি ছিল তার সীমাহীন কৌতূহল। স্বামী ছিদাম ছিল তারই পরিপূরক। কালো

পাথরে গড়া শিল্পীর সচেতন মানব মূর্তি । নিটলদেহী ছিদাম বুদ্ধিতে তীক্ষ্ণ, কর্মে ক্ষিপ্র, প্রসাধনে যত্নশীল এবং স্ত্রীর প্রতি ঈষৎ সন্দিগ্ধ। চন্দরার বাড়াবাড়িতে তার মাঝে মাঝে মনে হতো "এ যদি মরিয়া যায় তবে আমি নিশ্চিত হইয়া একটু খানি শান্তি লাভ করিতে পারি।"

দুখিরাম চেহারায়, প্রকৃতিতে ছিল ঠিক ছিদামের বিপরীত । রাধার পরিপূরক । দুঃখীর বউ রাধা কলহপ্রবন- "অত্যন্ত এলোমেলো ঢিলেঢালা আগোছালা ।" দুখি"নিরীহ অথচ ভীষণ, এমন সরল অথচ নিরুপায় মানুষ অতি দুর্লভ।" দুখির স্বভাবজ এই বৈশিষ্ট্য তাকে জীবন পথে চলার ক্ষেত্রে, সব বিষয়ে ছিদামের উপরই নির্ভরশীল করে তুলেছিল । দোষী সাব্যস্ত চন্দরাকে কৌশলে ছিদাম তার নির্মম শাস্তি ভোগ থেকে বাঁচিয়ে দেবে - এই আশ্বাসে 'বৃহৎকায় দুখিরাম নিশ্চিন্ত' থেকেছে। ক্রমান্বয়ে গল্পকার খুব সংক্ষেপে ছিদাম ও চন্দরার দাম্পত্য জীবনের দ্বান্দ্বিক চিত্র উপস্থাপন করেছেন, যা দেখে আমরা খুব সহজেই অনুভব করি- সন্দেহপ্রবণ স্বামীকে মুঠোর মধ্যে রাখতে চন্দরারও গভীর দুশ্চিন্তা ছিল । অন্যদিকে, ছিদামও তার 'বিশেষ ভালোবাসা'র পাত্রী চন্দরাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকতো প্রতিমুহূর্তে।' স্ত্রীর চলাচলের পথও নির্দিষ্ট করে দিতে দ্বিধা করেনি ছিদাম –"এবার যদি কখনো শুনি তুই একলা ঘাটে গিয়াছিস, তোর হাড় গুড়াইয়া দিব ।"স্ত্রীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিদামের "এক- একবার মনে হইত, এ যদি মরিয়া যায় তবে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া একটু খানি শান্তি লাভ করিতে পারি ।" তার মধ্যে স্ত্রী সম্পর্কে যে এক ধরনের প্রতিহিংসা সংগোপনীয় ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায় । লেখক ছিদামের সেই গভীর মনস্তত্ত্বের পরিচয় উদ্ঘাটনে বলেছেন- "মানুষের উপরে মানুষের যতটা ঈর্ষ হয় যমেরর উপরে এতটা নহে ।" বলাবাহুল্য, স্ত্রীর উপর এই সক্রিয় "ঈর্ষা' ছিদামকে অনেকাংশেই চন্দরার উপর হত্যাকারীর দায় অর্পনে প্ররোচিত করেছে।

গল্পের তৃতীয় পরিচ্ছেদ - আদালতে চন্দরার বিচার প্রক্রিয়া ও শাস্তি প্রদানের আখ্যান । রামলোচন চক্রবর্তীর পরামর্শ মতো ছিদাম খুব নিষ্ঠার সঙ্গে অপরাধী সব্যস্ত চন্দরাকে মুক্ত হওয়ার বিদ্যাশিক্ষা দিয়েছে। কিন্তু কোন কিছুই তা কাজে আসেনি। পুলিশ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, বিচারক সবারই কাছে চন্দরা স্বীকার করেছে বড়'জা রাধাকে সেই খুন করেছে । উল্লেখ্য, তার স্বামী খুনের দায় নিতে বললে সে 'স্তম্বিত' হয়ে 'কালো অগ্নি'র মতো দৃষ্টি বাণে দগ্ধ করেছিল ছিদামকে । চন্দরা যখন বুঝেছে সে নিরুপায়, খুনের দোষ স্বীকার করা ছাড়া কোনো পথ তার সামনে খোলা নেই তখন তার নিদারুণ অভিমানক্ষুব্ধ মন একান্তভাবে কামনা করেছে ইহ জীবনের কঠিনতম শাস্তি গ্রহণকেই। জজ সাহেব তাকে অপরাধ শিকারের শাস্তি হিসেবে ফাঁসির কথা

উল্লেখ করলে, চন্দরা অপার আকৃতিতে তাঁকে জানিয়েছে- "ওগো তোমার পায়ে পড়ি, তাই দাও না সাহেব। তোমাদের যাহা খুশি করো, আমার তো আর সহ্য হয় না।" হত্যাকারী হিসাবে অকপাট স্বীকারোক্তি, 'প্রধান বিশ্বস্ত ভদ্র সাক্ষী রামলোচন'-এর নির্ভেজাল সাক্ষ্যদানে চন্দরার ফাঁসি বা মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি ঘোষিত হয়।

চন্দরাকে ফাঁসির দড়ি গলায় পরানোর আগে 'দয়ালু সিভিল সার্জন' চন্দরার শেষ ইচ্ছা পূরণের সুযোগ দিতে চাইলে সে জানিয়েছে –"একবার আমার মাকে দেখিতে চাই।" জন্মদাতা পিতা চন্দরাকে সৎপাত্রের কন্যা দান করে নিশ্চিন্তে মরেছেন বহুকাল আগে। মৃত্যুকালে তার সান্ত্বনা ছিল -"যা হোক আমার মেয়েটির একটি সদগতি করিয়া গেলাম।" চন্দরার জন্মদাতা পুরুষপিতা মৃত । যে মায়ের 'এক ফোটা দুধের ঋণ' অপ্রতিশোধ্য, যার গর্ভে দশ মাস দশ দিন লালিত হয়ে এই মর্ত পৃথিবীর আলো দেখেছি সেই মা'ই ছিল চন্দরার ইহ জীবনের দর্শনীয় শেষ তীর্থস্থান । বিশ্বাসঘাতক স্বামী ছিঃ- দাম চন্দরার সঙ্গে দেখা করতে চায়- ডাক্তারের এই প্রস্তাবে প্রবল বিদ্বেষে জীবনবিমুখ চন্দরার মুখনিঃসৃত অভিব্যক্তি ছিল – "মরণ!-" বলা যায় এই দ্বি- অক্ষর সমন্বিত পদবন্ধের উচ্চারণে চন্দরার সেই মুহূর্তকার স্বামী বিদ্বিষ্ট জীবনবিমুখ বাসনার পাশাপাশি তার গোটা দাম্পত্য জীবনের অমোঘ বিরক্তি ঘোষিত হয়েছে। স্থান কাল পাত্রের নিরিখে চন্দরারর মুখনিঃসৃত সেই অভিব্যক্তি ছিল 'হাজার কথার এককথা'। জীবন বিতৃষ্ণ এক গাঁয়ের বধূ'র এই অমোঘ উচ্চারণ জ্যা-মুক্ত শব্দভেদি বাণের মতো ছিদামের বিক্ষুব্ধ হৃদয়কে বিদ্ধ করেছে। এ ছিল তাঁর কাছে আমৃত্যু কালের চিরস্থায়ী 'শাস্তি'।

'পোস্টমাস্টার' গল্পে খুব স্পষ্টভাবেই রবীন্দ্রনাথ পোস্টমাস্টারের উলাপুর ত্যাগের পথে কিশোরী রতনের বিক্ষুব্ধ মনের অভিব্যক্তিকে বর্ষা বিস্ফারিত নদীর সঙ্গে একাত্ম ভাবে মিশিয়ে দিয়েছিলেন । অতঃপর নদী কুলের শ্মশান, বর্ষার খরস্রোতা নদীর টানে বেগে প্রবাহিত হওয়া নৌকার কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে পোস্টমাস্টারের মানস অভিব্যক্তি ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন- "....জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল,কী। পৃথিবীতে কে কাহার ।" 'শাস্তি' গল্পেও এই উদাসীন পৃথিবীর তত্ত্ব এসেছে স্বাভাবিক ভাবেই। দুখিরাম যেদিন সন্ধ্যায় তার স্ত্রীর মাথায় দায়ের কোপ বসিয়ে দিয়েছিল সেদিন ছিল 'বাহিরে পরিপূর্ণ শান্তি'। আবার শাস্তিযোগ্য চন্দরাকে 'ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সেশনে চালান' করার পর 'শ্রাবণের অবিরল বৃষ্টি' ধারা 'নবীন ধানক্ষেত্র' কে সিক্ত করে 'পৃথিবীর সমস্ত কাজকে' সৃষ্টিকর্তা সচল রেখেছেন স্বাভাবিক গতিতে । উদাসীন পৃথিবীর ছোটো-বড়ো সব ঘটনা সম্পর্কেই নির্বিকার

সৃষ্টিকর্তা। তাই নিরাপরাধ চন্দরার মৃত্যুদণ্ডও তাঁর কাছে কোন অনুকম্পার উদ্রেক করে না।

এবার চন্দরারর দৈহিক শাস্তি প্রদানের নেপথ্যে যারা ছিল তাদের প্রসঙ্গে আসা যাক। কুরি পরিবারের দুই ভাই দুখিরাম ও ছিদাম রুই-যথার্থই সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় লালিত দরিদ্র কৃষিজীবী শ্রেণীর প্রতিনিধি । যাদেরকে গল্পকার রামলোচন চক্রবর্তীর 'কোরফা প্রজা' হিসেবে তুলে ধরেছেন । কোরফা প্রজারা অন্য প্রজাদের কাছ থেকে জমি ভাড়া নিয়ে চাষ করে । তাতে তাদের কোন অধিকার থাকে না । এই দুই কোরফা প্রজাকে আজীবন ধরে দারিদ্রতার শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে । জমিদারের পেয়াদা কাছারি ঘরের চাল সারাইয়ের জন্য সারাদিন কাজ করিয়ে যে কিঞ্চিত জলপানি ও কতিপয় মজুরি দিয়েছে তাতে তাদের পেট, মন কোনটাই ভরেনি। অতএব, জমিদারের পক্ষ থেকে এহেন কৃষিজীবী মানুষদের গোটা জীবন ধরেই পরিবার পরিজন নিয়ে দৈহিক, মানসিক ও আর্থিক শাস্তি ভোগ করতে হয়।

কুরি পরিবার, পরিবারের সবাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শাস্তি ভোগ করেছে। প্রথমে আসা যাক দুখিরাম ও তার স্ত্রী রাধার দেড় বছরের শিশুটির প্রসঙ্গে । যে পরিবার দিন আনা দিন খাওয়ার উপর নির্ভরশীল, যেখানে চালের অভাবে ভাতের উনুনে হাঁড়ি চড়ে না -সেখানকার গৃহবধূদের দু-বেলা দু -মুঠো ভাত জুটতো কিনা সন্দেহ! আর যদি কোনো মায়ের অন্ততপক্ষে দুবেলা পেট ভরানোর জন্য দুমুঠো ভাত না জোটে, তাহলে সেই মা পর্যাপ্ত পরিমাণ বুকের দুধ বাচ্চাকে খাওয়াবেই বা কি করে? পাশাপাশি চিরদিনের জন্য মা হারানোর 'শাস্তি'ও ভোগ করতে হবে তাকে ।

রাধা দরিদ্র কৃষিজীবী পরিবারের বড় বউ । প্রতিনিয়ত দারিদ্রতা ও কলহ প্রবণতার মধ্য দিয়ে তার সর্বকালের দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হয়েছে। মানসিক অশান্তির পাশাপাশি জীবনসঙ্গীর হাত থেকে যে 'শাস্তি' সে গ্রহণ করেছে তা নৃশংসতা সমগ্র মানব সমাজকে বিস্ময়ে হতবাক করে দেয় । ইহ জীবনের যাবতীয় পাপ-তাপ থেকে মুক্ত হয়েছে রাধা স্বামীর হাতের দা'এর কোপ খেয়ে । স্বামী-স্ত্রীর সংসারে দ্বন্দ্ব-মধুর সম্পর্কটাই তো আসল সত্য। বলাবাহুল্য, তার সেই অনভিপ্রেত মৃত্যুই পরিবারের সকলকেই আরো বেশি কঠিন থেকে কঠিনতম 'শাস্তি' ভোগে বাধ্য করেছে।

দুখিরাম যথার্থই খুনি । স্ত্রীকে হত্যা করে সে যে পাপে নিমজ্জিত হয়েছে তার অনুতাপ ও অনুশোচনার আগুন বাকি জীবন তাকে বয়ে বেড়াতে হবে। অন্যদিকে, চন্দরার মৃত্যুদণ্ডের পিছনেও তার প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব ছিল । দুখিরাম মোটা বুদ্ধিসম্পন্ন, অবিবেচক, হঠকারী ও অদূরদর্শী । তাই তার 'শাস্তি'র ব্যপ্তিও সীমাহীন। প্রাপ্ত

পারিশ্রমিকের বঞ্চনা জনিত কষ্ট, স্ত্রী হত্যার অনুশোচনা, চন্দরের ফাঁসি হওয়ার নিষ্ঠুর বেদনা যথার্থই 'দুখি' নামের পরিপূরক।

স্ত্রী হত্যার জন্য দুখি'র প্রাপ্য শাস্তি অন্যায় ভাবে ছিদাম চাপিয়ে দিয়েছে চন্দরার ওপর। চন্দরা সেই অন্যায়ের গুরুভার বহনের মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করেছে, মৃত্যুদন্ডের দড়ি পরার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত । তার স্বামী ছিদামও তাকে দাম্পত্য জীবনে কম দুঃখ দেয়নি। একজন অষ্টাদশী কিশোরী বধূ'র কাছে স্বামীর ভালোবাসা না পাওয়া, সন্দীগ্ধ স্বামীর হাতে নিপীড়িত হওয়ার ঘটনাও চন্দরাকে সহ্য করতে হয়েছে। ছিদামের প্রস্তাব অনুযায়ী চন্দরা হত্যার দায় গ্রহনে 'স্তম্ভিত' হয়েছে এবং মনেপ্রাণে অনতিকালের মধ্যে 'স্বামী রাক্ষসের' হাত এবং সংস্পর্শ থেকে মুক্তি প্রার্থনা করেছে। সবার কাছে হত্যার দায় স্বীকার, তাই অনভিপ্রেত কিছু নয়। সেই আত্মহনন ছিল চন্দরা'র মৃত্যুদণ্ডের চেয়েও কঠিনতম 'শাস্তি'।

চন্দরার ইহ জীবনের মর্মদাহ ফাঁসি কাঠে দৈহিক শাস্তির মাধ্যমে নির্বাপিত হয়েছে। তার স্বামী ছিদামের 'শাস্তি' রাবনের চিতার ন্যায় প্রজ্জ্বলিত থাকল চিরকাল। 'বউ গেলে বউ পাইবো। কিন্তু আমার ভাই ফাঁসি গেলে আর তো ভাই পাইব না।'- এই প্রতীতি জ্ঞানে ছিদাম যে পরিকল্পনা করে তার স্ত্রীর উপর হত্যার দায়ী চাপিয়েছিল, তা শেষপর্যন্ত হিতে বিপরীত হয়ে পড়ে। দাম্পত্য জীবনে ছিদাম চন্দরাকে একটু বিশেষ ভালবাসলেও সম্পূর্ণরূপে স্ত্রীর মানসপযোগী হতে পারেনি। যে মানসিক যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ছিদাম চন্দ্রার মৃত্যু কামনাও পর্যন্ত করেছে। চন্দরার মৃত্যুতে ছিদামের সেই মর্মযন্ত্রণার পরিধি আরো ব্যপ্ত হয়েছে। স্ত্রী'র হত্যাকারী রূপে নিজের একক ভূমিকা পালনের মর্ম পীড়া তাকে প্রতিনিয়ত তাড়িত করেছে। সুস্থ সবল দেহ নিয়ে বেঁচে থেকে আত্ম-অনুশোচনার আগুনে তিলে তিলে দগ্ধ হওয়ার 'শাস্তি' গ্রহনই হয়ে রইলো তার জীবনের অলংকার। প্রিয়জনের ঘৃণার পাত্র হয়ে বেঁচে থাকার যন্ত্রণাও ছিদামকে আহত করেছে পলে পলে।

আলোচ্য গল্পের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে একটি দরিদ্র পীড়িত গ্রাম্য কৃষিজীবী পরিবার। যে পরিবারের প্রত্যেকেই সামন্ততান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোর নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে বিদ্ধ। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ দুখিরাম হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে তার মুখরা স্ত্রীকে যে শাস্তি প্রদান করেছিল তাহাই ছিল গল্পটির প্রাণ ভোমরা । বড় বউ রাধার সেই অনাকাঙ্ক্ষিত 'শাস্তি'র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব পরিবারের সকল সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ছন্দপতন ঘটিয়েছে। তারা প্রত্যেকেই কোন না কোন ভাবে দৈহিক কিংবা মানসিক 'শাস্তি'র শিকার । তপব্রত ঘোষ তার 'রবীন্দ্র ছোটো গল্পের শিল্পরূপ' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন –"জমিদার শাস্তি দিয়েছিল দুখি আর ছিদামকে, দুখি

শাস্তি দিল রাধাকে, দুখির প্রাপ্য শাস্তি অন্যায় ভাবে চন্দরার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে শাস্তি দিল ছিদাম, আর ছিদামের এই অন্যায়ের প্রতিবাদে ছিদামের শেষ দেখার ইচ্ছাকে তীব্র ধিক্কারে বলিষ্ঠভাবে প্রত্যাখ্যান করেই চন্দরা চূড়ান্ত শাস্তি দিয়ে গেল।" ফলে এ গল্পপাঠে পাঠকগণ 'শাস্তি'র বহুমাত্রিক তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগ পান। তাই গল্পটির 'শাস্তি' নামকরণ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ব্যঞ্জনধর্মী এবং সর্বাঙ্গ সুন্দর।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-গল্পগুচ্ছ; বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, মাঘ ১৪১৮

২। তপোব্রত ঘোষ- রবীন্দ্র- ছোটগল্পের শিল্পরূপ; দেজ পাবলিশিং, কলকাতা -৭৩, আগস্ট-২০১০

৩। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়- কালের পুত্তলিকা, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা -৭৩, সেপ্টেম্বর -২০১১

৪। মীনাক্ষী সিংহ – গল্পগুচ্ছ জীবনের মেঘ ও রৌদ্র; বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, ১৪১৫

৫। মথনাথ বিশী- শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ; মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা-০৯, ১০ম মুদ্রণ-১৪১৮

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুঙ্গভদ্রার তীরে : একটি ভিন্ন পাঠ

বনমালী খাটুয়া
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : রবীন্দ্রোত্তর বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর মানিক পাধ্যায়ের সমসাময়িক কথাসাহিত্যিক হলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। 'ব্যোমকেশ' এর স্রষ্টা হিসাবে সাহিত্য জগতে তাঁর বিশেষ পরিচিতি ঘটলেও গল্প, উপন্যাস চিত্রনাট্য ও কিশোরপাঠ্য কাহিনি রচনাতেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। মাত্র কুড়িবছর বয়সে মহাবিদ্যালয়ে পড়াকালীন তাঁর প্রথম সাহিত্য 'যৌবনস্মৃতি' প্রকাশ পায়। এরপর নিজস্ব প্রতিভা ও মৌলিক ভাবনা চিন্তাকে কাজে লাগিয়ে একে একে নানা সাহিত্য রচনা করেন। ব্যোমকেশের কাহিনি কে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা ধরা হলে তারপরে যার নাম করতে হয় তা হল, তাঁর ঐতিহাসিক গল্প ও উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরে যদি সার্থক ঐতিহাসিক গল্প কিংবা উপন্যাসের রচয়িতা হিসেবে কারো নাম নিতে হয় তিনি হলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে এক সাক্ষাৎকারে তিনি মন্তব্য করেছেন- "ঐতিহাসিক গল্প লেখার প্রেরণা পাই বঙ্কিমচন্দ্র পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে শিখেছি ভাষার মধ্যেই বাতাবরণ সৃষ্টি করা যায়-বিশেষ করে ঐতিহাসিক বাতাবরণ। ইতিহাস থেকে চরিত্রগুলো কেবল নিয়েছি; কিন্তু গল্প আমার নিজের।" ** ঐতিহাসিক কাহিনী সমগ্র শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থ পরিচয় অংশ আনন্দ পাবলিশার্স পৃষ্ঠা ৮২১। দাক্ষিণাত্যের এক বিশিষ্ট অঞ্চল বিজয়নগরকে কেন্দ্র করে শরদিন্দু রচনা করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস 'তুঙ্গভদ্রার তীরে'। উপন্যাসটির একদিকে ঔপন্যাসিক যেমন তুঙ্গভদ্রার প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনা দিয়েছেন, অপরদিকে বিজয়নগর কে ঘিরে প্রাচীনকালে প্রতিষ্ঠিত হিন্দুরাজ্যের অতীত ইতিহাস কে তুলে ধরেছেন।

উপন্যাসটিতে মূলত হিন্দু রাজ্য বিজয়নগরের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা দ্বিতীয় দেবরায়ের রাজত্বকালের নানা ঘটনা স্থান পেয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে এসেছে কলিঙ্গরাজ ভানুদেবের প্রসঙ্গ। এমনকি একসময় মুসলমান শাসক মুহম্মদ তুল্লক জোরপূর্বক হিন্দুদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। হিন্দু ধর্মকে বাঁচাতে তাই দ্বিতীয় দেবরায় পাশাপাশি অঞ্চলের সকল হিন্দুরাজার কন্যাকে বিবাহের মধ্যে দিয়ে একে অপরের মৈত্রী স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। এই কারণে উপন্যাসে আমরা দেখি কলিঙ্গরাজ ভানুদেবের কন্যা বিদ্যুম্মালাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন রাজা দ্বিতীয় দেবরায়। আসলে এই বিবাহ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যতীত অপর কিছু নয়।

'তুঙ্গভদ্রার তীরে' বাংলা সাহিত্যে একটি সার্থক ঐতিহাসিক ও রোমান্সধর্মী উপন্যাস। ঐতিহাসিক কাহিনির চরিত্র হিসাবে রয়েছে, দ্বিতীয় দেবরায়, প্রথম দেবরায়,

হরিহর, রামচন্দ্র প্রভৃতি। অন্যদিকে কাল্পনিক চরিত্র হিসেবে রয়েছে বিদ্যুন্মালা মণিকঙ্কণা, অর্জুন বর্মা, বলরাম দাস, কুমার কম্পন প্রভৃতি। ঔপন্যাসিক খুবই দক্ষতার সঙ্গে ইতিহাসের মূল কাহিনির সঙ্গে উপকাহিনির সঙ্গতি রেখে 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসটি রচনা করেছেন। এক্ষেত্রে উপকাহিনি কোথাও প্রধান কাহিনিকে ছাপিয়ে যায়নি। শরদিন্দু তাঁর এই উপন্যাসটিতে একদিকে যেমন ইতিহাসের নানা ঘটনা ও কাহিনির মধ্যে দিয়ে সাহিত্যসত্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন, অন্যদিকে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির পাশাপাশি কাল্পনিক চরিত্রগুলিকেও উজ্জ্বলতা দান করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি গুরু গম্ভীর ভাষা প্রয়োগ না করে তা সহজ সরল নাট্যধর্মী সংলাপের মধ্যে দিয়ে মর্মস্পর্শী আকারে তুলে ধরেছেন। মানবিক রসে ভরপুর ঐতিহাসিক এই উপন্যাসটিতে শরদিন্দু যে বিভিন্ন আঙ্গিক তুলে ধরেছেন তারই এক চিত্র আমরা এই আলোচনা সন্দর্ভটিতে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি মাত্র।

সূচকশব্দ : ভূমিকা, ঐতিহাসিকতা, চরিত্র, ভাষা, উপসংহার।

(১)

বাংলা সাহিত্য বরাবরই সমৃদ্ধ হয়ে এসেছে বিশিষ্ট লেখকদের উৎকৃষ্ট সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। এই উৎকর্ষতা কখনো কখনো এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে জন্ম নিয়েছে শিল্পী কিংবা লেখকের নিজস্বতা। এর ফল স্বরূপ বাংলা সাহিত্য ভান্ডারে নানা সৃষ্টি, রত্ন রূপে বিরাজিত ও কালজয়ী। প্রায় প্রত্যেক শিল্পী-সাহিত্যিক তার নিজস্বতার গুণে সময়ের সাথে বয়ে চলা নানা ঘটনা, কাহিনি কিংবা যাপনকে তুলে ধরেন তাঁদের সৃষ্টি কর্মে। এমনই এক কথাসাহিত্যিক হলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যকে যে সকল স্বনামধন্য লেখকেরা প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ করে চলেছেন তাদেরই একজন হলেন ব্যোমকের স্রষ্টা। ১৮৯৯ সালের ৩০ মার্চ উত্তর প্রদেশের জৌনপুরে জন্ম শরদিন্দু , মূলত গোয়েন্দা কাহিনির জন্য বাঙালি পাঠক হৃদয়ে স্থান লাভ করলেও তার অলৌকিক গল্প, চিত্রনাট্য ও ঐতিহাসিক গল্প- উপন্যাস গুলি যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমকালে তাঁর আবির্ভাব ঘটলেও সক্রিয়তার গুণে তিনি আজও বাংলা কথাসাহিত্যে বিশেষভাবে আলোচিত ও প্রশংসিত। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে কলেজে পড়াকালীন তার প্রথম সাহিত্য 'যৌবন স্মৃতি' প্রকাশ পায়। এরপর একে একে লিখেন বহু গল্প, উপন্যাস, চিত্রনাট্য, কিশোরপাঠ্য কাহিনি। যদিও পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ব্যোমকেশের স্রষ্টা হিসাবেই বাংলা সাহিত্যে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত তবুও তার ঐতিহাসিক উপন্যাস ও গল্পগুলি পাঠক হৃদয়ে এনে দেয় এক ভিন্ন মাত্রা। বিশেষত তাঁর বহু আলোচিত ও প্রশংসিত উপন্যাস ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ বাংলা সাহিত্যে এক বিশেষ আলোচনার দাবী রাখে। শরদিন্দুর পূর্বে বহু ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা হলেও তিনি এই উপন্যাসে প্রাচীন ইতিহাসের আলোকে মানবজীবনের যে গভীর সত্যকে তুলে ধরেছেন তা সাধারন পাঠক

হিসাবে হৃদয়কে নাড়া দেয় বিশেষ ভাবে। উপন্যাসটি পড়ে একজন সাধারন পাঠক হিসাবে এর যে বিভিন্ন অভিমুখগুলি রয়েছে তার কয়েকটি আমার এই আলোচনা সন্দর্ভটিতে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি মাত্র।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা একটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস হলো 'তুঙ্গভদ্রার তীরে'। প্রতিটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের পেছনে যেমন বিশেষ ঐতিহাসিক কাহিনি নিহিত থাকে 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসটিও তার ব্যতিক্রম নয় । লেখক উপন্যাসটির ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ প্রসঙ্গে বলেছেন –

"এই কাহিনীর ঐতিহাসিক পটভূমিকা Robert Sewell এর A Forgotten Empire এবং কয়েকটি সমসাময়িক পান্থুলিপি হইতে সংগৃহীত। Sewell এর গ্রন্থখানি ৬৫ বছরের পুরাতন। তাই ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সম্পাদিত সাম্প্রতিক গ্রন্থ The Delhi Sultanate পাঠ করিয়া Sewell এর তথ্যগুলি শোধন করিয়া লইয়াছি । আমার কাহিনীতে ঐতিহাসিক চরিত্র থাকলেও কাহিনী মৌলিক ; ঘটনাকাল খ্রিঃ ১৪৩০ এর আশেপাশে। তখনো বিজয়নগর রাজ্যের অবসান হইতে শতবর্ষ বাকি ছিল।"[১]

লেখকের ডায়েরি থেকে জানা যায় গ্রন্থটির রচনা শুরু হয় ২১ জুলাই ১৯৬৩ , শেষ হয় ১৭ এপ্রিল ১৯৬৫। 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৭২ সালে শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায়। এরপর কুড়িতম মুদ্রণ প্রকাশিত হয় ১৪২৩ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে। বহু আলোচিত তথা প্রশংসিত এই উপন্যাসটি উৎসর্গ করা হয় প্রমথনাথ বিশী মহোদয়কে। উপন্যাসটির প্রচ্ছদ যিনি অঙ্কন করেছিলেন তিনি হলেন অজিত গুপ্ত। বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারায় 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' এতটাই জনপ্রিয় ছিল যে, ১৯৬৭ সালে তা রবীন্দ্র পুরস্কারে ভূষিত করা হয় ।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় মোট পাঁচটি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছিলেন। তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস 'কালের মন্দিরা' (১৩৫৮), এরপর তিনি লিখেছেন 'গৌড়মল্লার', 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ', 'কুমার সম্ভবের কবি'। তবে বিষয়বস্তু, ঘটনা কিংবা কাহিনির দিক দিয়ে যে উপন্যাসটি পাঠক মনকে এক ভিন্ন জগতে নিয়ে যায় তা হলো 'তুঙ্গভদ্রার তীরে'। উপন্যাসটি প্রসঙ্গে বহু সমালোচক নানা মন্তব্য করেছেন। যেমন, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলেছেন-

> "তোমার লেখায় একটা জাদু আছে , তুমি অনায়াসে এমন একটা বাতাবরণ সৃষ্টি করো যে পলকে মনকে শুধু অতীতে টানিয়া লও । তুঙ্গভদ্রার তীরে তোমার সে সুনাম রক্ষা করিয়াছে । ইতিহাসের অভিজ্ঞতা এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি দুই-ই তোমার তুল্য মূল্য ।"[২]

আবার রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন –

> "আপনি বিজয়নগরের অতীত ঐশ্বর্যের স্মৃতি একটি মনোরম কাহিনীর মধ্যে দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন - এজন্য আমরা অর্থাৎ

ঐতিহাসিকেরা খুবই কৃতজ্ঞ - কারণ লোকে ইতিহাস পড়ে না - কিন্তু আপনার বই পড়বে । Alexander Dumas যে উদ্দেশ্য নিয়া Three Musketeers প্রভৃতি লিখিয়া ছিলেন আপনার দুইখানি উপন্যাসের মধ্য দিয়া তেমনি শশাঙ্কের পরবর্তী সময়কার বাংলা ও দেবরায়ের বিজয়নগর সম্বন্ধে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে ।”[৩]

বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তী সময়ে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে শরদিন্দু যে সিদ্ধ হস্ত ছিলেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এখন প্রশ্ন হতে পারে প্রাক্-শরদিন্দু কথাসাহিত্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বহু ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন । এক্ষেত্রে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি, বিশেষত ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ কেন এত উচ্চ প্রশংসিত সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ ঐতিহাসিক উপন্যাসটি আলোচনার পূর্বে ইতিহাস সম্পর্কে শরদিন্দুর মোহ কতখানি ছিল তা জানা প্রয়োজন। ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে এক সাক্ষাৎকারে তিনি মন্তব্য করেছেন – “ঐতিহাসিক গল্প লেখার প্রেরণা পাই বঙ্কিমচন্দ্র পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে শিখেছি ভাষার মধ্যেই বাতাবরণ সৃষ্টি করা যায় -বিশেষ করে ঐতিহাসিক বাতাবরণ। ইতিহাস থেকে চরিত্রগুলো কেবল নিয়েছি ; কিন্তু গল্প আমার নিজের। সর্বদা লক্ষ্য রেখেছি কি করে সেই দুটিকে ফুটিয়ে তোলা যায় । যে সময়ের গল্প তখনকার রীতি-নীতি, আচার – ব্যবহার, অস্ত্র, আহার, বাড়িঘর ইত্যাদি খুঁটিনাটি সব না জানলে যুগকে ফুটিয়ে তোলা যায় না। এরপর আছে ভাষা , ঐতিহাসিক গল্পের ভাষাও হবে যুগোপযোগী।”[৪]

উপরিউক্ত মন্তব্য থেকে বোঝা যায় শরদিন্দু ইতিহাস থেকে কাহিনি ও চরিত্র গ্রহণ করলেও বলার ঢং তাঁর নিজস্ব। এমনকি যে যুগের উপর দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস গুলি লিখেছেন সেই যুগের রীতি-আচার সহ নানা দিকগুলিকে দক্ষতার সঙ্গে চেষ্টা করেছেন তুলে ধরতে। পাশাপাশি ভাষা শিল্পের উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ উপন্যাসটি বিশ্লেষণ করতে গেলে আমাদের প্রথমেই দৃষ্টি আরোপ করতে হয় তার ঘটনার প্রতি। এরপর তার ঐতিহাসিকতা, চরিত্র, ভাষা-শিল্প ও অন্যান্য বিষয়ের প্রতি ।

(২)

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ উপন্যাসটিকে ধরা হয় বাংলা সাহিত্যের একটি সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস । যদিও উপন্যাসটির ঐতিহাসিকতার দিক নিয়ে দেখলে পূর্বের অধ্যায়ে নানা বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে ; তবুও উপন্যাসটিকে সার্থক ঐতিহাসিক রচনা বলা যায় কিনা সে বিষয়ে একটু গভীরে দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে ।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস গুলির মধ্যে উচ্চ প্রশংসিত হল ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ । উপন্যাসটি প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন –‘Fictionised history নয়

,Historical fiction' । লেখক সুদূর দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরকে কেন্দ্র করে রচনা করেছেন এই উপন্যাসের পটভূমি। সমালোচক লিখেছেন – " বিরুপাক্ষের পাষাণমূর্তি ঘিরিয়া এক প্রাকারবদ্ধ দুর্গনগর গড়িয়া উঠিয়াছিল। নগরের নাম ছিল বিজয়নগর ।"[৫]

উপন্যাসটির ঘটনাকাল ১৪৩৬ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময় । বিজয়নগর রাজ্যের তখনো অবসান হতে শতবর্ষ বাকী। মূলত বিজয় নগরের রাজা দ্বিতীয় দেবরায়ের রাজত্বকালকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটির মূল অবয়ব গড়ে তুলেছেন লেখক । প্রসঙ্গক্রমে এসেছে এই রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব ইতিহাস। জানা যায় বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সঙ্গমবংশীয় হরিহর ও বুক্কের জীবন ইতিহাস। এরা ছিলেন দুই ভাই । শোনা যায় একসময় দিল্লির সুলতান মুহম্মদ তুঘ্লক এই দুই ভ্রাতাকে জোর করে মুসলমান করেছিলেন। কিন্তু তাদের বেশিদিন মুসলমান করে রাখা যায়নি। একদিন তারা পালিয়ে এসে শৃঙ্গেরি শংকর মঠের সন্ন্যাসী বিদ্যারণ্যের শরণাপন্ন হয়েছিলেন । তিনি তাদের পুনর্দীক্ষিত করেছিলেন হিন্দু ধর্মে । ঔপন্যাসিক লিখেছেন –

> "তারপর দুই ভাই মিলিয়া গুরুর সাহায্যে হিন্দু রাজ্য বিজয়নগরে প্রতিষ্ঠা করিলেন। বিজয়নগরের আদি নাম বিদ্যানগর, পরে উহা মুখে মুখে বিজয়নগরে পরিণত হয় ।"[৬]

বুক্কের পৌত্র ছিলেন প্রথম দেবরায়। দেবরায়ের আবার দুই পুত্র হলেন – রামচন্দ্র ও বিজয়রায় । বিজয়রায়েরই সুযোগ্য সন্তান দ্বিতীয় দেবরায় । এই দেবরায়ই প্রকৃত অর্থে বিজয়নগরকে মুসলমান প্রভাব মুক্ত হিন্দু রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । দেবরায়ের শাসনকাল ইতিহাস অনুমোদিত । তাঁরই রাজত্বকালকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসটির মূল কাহিনি গড়ে উঠেছে ।

যে কোনো উপন্যাসে চরিত্র হল প্রাণবায়ু । চরিত্রকে এড়িয়ে কোন উপন্যাসের মূল কাহিনি গড়ে উঠতে পারে না। শরদিন্দুর 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' ঐতিহাসিক উপন্যাসটিও এর ব্যতিক্রম নয়। উপন্যাসের প্রধান ঐতিহাসিক চরিত্র হিসাবে দ্বিতীয় দেবরায় , যাকে উপন্যাসের নায়ক বলা যায়, যদিও এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে । কারণ অনেকেই অর্জুন বর্মাকে নায়ক বলে সমর্থন করেন । এছাড়া ঐতিহাসিক চরিত্র হিসাবে আমরা প্রথম দেবরাজ , বিজয়রায় , হরিহর , রামচন্দ্র প্রমুখের কথা বলতে পারি । ঐতিহাসিক চরিত্রের পাশাপাশি যে সকল কাল্পনিক চরিত্রগুলি উপন্যাসের কাহিনি ও ঘটনাকে পরিপূর্ণতা দান করেছেন , তারা হলেন – বিদ্যুন্মালা ,অর্জুন বর্মা , মণিকঙ্কণা , বলরাম দাস , কুমার কম্পন প্রভৃতি ।

ঐতিহাসিক উপন্যাসে যে যুগ বা সময়ের কথা বর্ণিত হবে, সেই সময়ের ঘটনার মধ্যে একপ্রকার বিশ্বস্ততা থাকার যে কথা বলা হয়েছে তা রয়েছে 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসটিতে । রচনাটিতে যে সময়কালের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তা অনেকটাই ইতিহাস প্রসিদ্ধ । দ্বিতীয় দেবরায়ের রাজত্বকাল , বিজয়নগরের হিন্দুরাজ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ ,

মুসলিম শাসন দ্বারা হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরকে প্রভাবিত করার চেষ্টা , কলিঙ্গ রাজবংশের পরিচয় প্রভৃতি নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে ১৪৩০ সালের সময়কালকে ঔপন্যাসিক ইতিহাসের বিশ্বস্ত দলিল হিসাবে তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি বিজয়নগর রাজ্যের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক তথা নৈসর্গিক চিত্র তুলে ধরার ক্ষেত্রে ইতিহাস ও কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন লেখক । পারস্যের রাষ্ট্রদূত আব্দুর রাজাকের ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় – দ্বিতীয় দেবরায়ের রাজত্বকালের নানা ঘটনা, এমনকি এই উপন্যাসে যে আগ্নেয় অস্ত্র ব্যবহারের প্রসঙ্গ রয়েছে তাও ইতিহাস প্রসিদ্ধ। শুধু বিজয়নগর নয় , ইতিহাস প্রসিদ্ধ কলিঙ্গ রাজপরিবারেরও পরিচয় তুলে ধরেছেন লেখক ।

প্রধান কাহিনির পাশাপাশি লেখক উপকাহিনিকেও গুরুত্ব দিয়েছেন 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসটিতে । এক্ষেত্রে লেখক বঙ্কিমচন্দ্রকে অনেকটাই অনুকরণ করেছেন বলা চলে । বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ইতিহাসধর্মী উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা', 'দুর্গেশনন্দিনী', 'চন্দ্রশেখর' প্রভৃতিতে উপকাহিনিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন । অনুরূপে 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসটিতেও শরদিন্দু দ্বিতীয় দেবরায় , অর্জুনবর্মা , মনিকঙ্কনা , বিদ্যুন্মোলা , বলরাম দাসের প্রধান কাহিনির পাশাপাশি , পিঙ্গলা এবং মন্দোদরী ও চিপিটকের উপকাহিনিকে তুলে ধরেছেন দক্ষতার সঙ্গে । লেখক প্রধান কাহিনির সঙ্গে সংগতি রেখেই উপকাহিনিকে স্থান দিয়েছেন উপন্যাসে । এক্ষেত্রে উপকাহিনি কোনক্ষেত্রেই প্রধান কাহিনিকে ছাপিয়ে যায়নি ।

সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বকে অনেকক্ষেত্রে স্থান দেওয়া হয় ঐতিহাসিক উপন্যাসে। 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসটিতেও ধরা পড়েছে সেই চিত্র । তৎকালে একজন রাজার একাধিক রানী থাকতেন । তাদের পরিচর্যার জন্য থাকতেন একাধিক পরিচারিকা বা দাসী । আলোচ্য উপন্যাসে রাজা দেবরায়েরও তিনজন রানী ছিলেন এবং প্রধান দাসী হিসাবে ছিলেন পিঙ্গলা । এছাড়া ছিলেন মঞ্জিরা , সুভদ্রা প্রভৃতি । তাছাড়া তৎকালে সমাজে যে সতীদাহ প্রথা প্রচলন ছিল তার প্রমান পাওয়া যায় – রাজভ্রাতা কুমার কম্পন নিহত হলে তাঁর দুই পত্নী কৃষ্ণাদেবী ও গিরিজাদেবী সহমৃতা হন । পাশাপাশি রাজনৈতিক চিত্র হিসাবে পাই মুসলমান শাসন ব্যবস্থা ও তার শাসন , শোষণ-পীড়নের ভয়ংকর চিত্র । ইসলামরা এক সময় জোরপূর্বক হিন্দুদের তাদের ধর্মে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন । উদাহরণস্বরূপ বলা যায় – অর্জুনবর্মার পিতা রামবর্মা যাদব বংশীয় ক্ষত্রিয় হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে মুসলমানরা জোরপূর্বক ইসলামধর্মে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন । পাশাপাশি হিন্দু নারীদের উপর চলতো অমানবিক আচরণ । উপন্যাসটিতে বর্ণিত বলরাম দাসের সুন্দরী স্ত্রীকে মুসলমানদের অপহরণ তার জ্বলন্ত উদাহরণ ।

এছাড়া ঐতিহাসিক উপন্যাসে যুগের যে tone and temper of the age – কে তুলে ধরতে হয় , তা শরদিন্দু ভাষার বয়নে , শব্দের গাম্ভীর্যে ও ভঙ্গিমায় সার্থক

আকারে তুলে ধরেছেন । তাই শরদিন্দুর ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ যে একটি সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস তা সহজে বলা চলে ।

(৩)

যেকোনো গল্প কিংবা উপন্যাসের ক্ষেত্রে লেখকের অভিজ্ঞতা হল তাঁর শিল্পভাবনার একমাত্র মূলধন । আর এই মূলধনকে খাটানোর প্রধান আধার হল চরিত্র । উপন্যাসে সাধারণত দেখা যায় মানবজীবনের জটিল গ্রন্থি মোচনের ইতিহাস । ঔপন্যাসিক এই গ্রন্থি মোচন ঘটান প্রধানত চরিত্রের মাধ্যমে । চরিত্রকে সামনে রেখে লেখক মূলভাবকে নানা আঙ্গিকে মেলে ধরেন সাহিত্যের পাতায় । বলা যায় যেকোনো গল্প বা উপন্যাসের মূল কাহিনি চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করে এগিয়ে চলে এবং কাহিনিটিকে গতিদান করে । শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ উপন্যাসটির মূল কাহিনিও যে নানা চরিত্রের উপর নির্ভর করে এগিয়ে চলেছে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। উপন্যাসটির কেন্দ্রবিন্দু বিজয়নগর হলেও লেখক নানা চরিত্রের মাধ্যমে উপন্যাসের মূলকাহিনিকে গতিদান করেছেন । ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ উপন্যাসটিতে প্রধান চরিত্র হিসাবে রয়েছে দ্বিতীয় দেবরায় , অর্জুনবর্মা , বিদ্যুন্মালা ও মণিকঙ্কণা ও বলরাম দাস। আর অপ্রধান চরিত্র হিসাবে আমরা বলতে পারি – চিপিটক , মন্দোদরী, কঙ্কনদেব, পিঙ্গলা, রসরাজ, মঞ্জিরা প্রভৃতির কথা।

‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র হল দ্বিতীয় দেবরায় । সঙ্গমবংশীয় দুই ভাই বুক্ক ও হরিহর বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করলেও বিজয়রায়ের পুত্র দ্বিতীয় দেবরায়ই ছিলেন এই রাজ্যের শ্রেষ্ঠ নরপতি। তাঁরই সুদক্ষ রাজ্যশাসনের গুনে বিজয়নগর পরিণত হয়েছিল শক্তিশালী হিন্দুরাজ্যে। একসময় বহমনি রাজ্যের মুসলমান শাসনকে প্রতিহত করে দ্বিতীয় দেবরায় বিজয়নগরের হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পঁয়ত্রিশ বছরের যুবক দেবরায়ের দেহ যেমন সুঠাম, সুদৃঢ় তেমনি চরিত্র ছিল বজ্রকঠিন। পাশাপাশি তিনি ছিলেন মিতভাষী ও সংযমী পুরুষ। তিনি তাঁর রণনিপুণ দক্ষতার গুনে একদিকে যেমন মুসলমান শত্রুদের দমন করেছিলেন, অন্যদিকে হিন্দু রাজাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধকে দূর করতে একাধিক হিন্দু রাজকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। কলিঙ্গের রাজা ভানুদেবের আর্যাস্ত্রীর কন্যা বিদ্যুন্মালাকে এভাবেই তিনি বিয়ে করতে চেয়েছিলেন । যদিও উপন্যাসের শেষ অংশে আমরা দেখি দেবরায়ের সঙ্গে ভানুদেবের অনার্যাস্ত্রীর কন্যা মণিকঙ্কণার সঙ্গে বিয়ে হতে। দেবরায়ের রাজত্বকালেই বিজয়নগর রাজ্যে স্বর্ণযুগ সুরু হয় বলা যায়। সমালোচক লিখেছেন –

> “তাঁর রাজ্যশাসন বিধি, রণনৈপুণ্য, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও মুসলমান প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সৈন্য সংগঠন-এ সবকিছুর মধ্যেই একটা বীর্যবান ব্যক্তিত্বের প্রকাশ।”

উপন্যাসের নায়কোচিত প্রায় সমস্ত গুনের অধিকারী ছিলেন তিনি। যদিও এই উপন্যাসের প্রকৃত নায়ক দ্বিতীয় দেবরায় না অর্জুন বর্মা সে নিয়ে রয়েছে যথেষ্ট বিতর্ক। তবুও দেবরায় যে এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র সেকথা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসটির অপর এক প্রধান চরিত্র হল অর্জুন বর্মা । অনেকে একে বলেন নায়ক চরিত্র । উপন্যাসটির অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি । যদিও চরিত্রটি লেখকের স্বকল্পিত তবুও ইতিহাসের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করে সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। উপন্যাসটির কাহিনি থেকে জানা যায় - বিজয়নগরের দক্ষিণে যবনদের রাজধানী গুলবর্গায় তার বাস । যবনদের অন্যায় অত্যাচারে অতীষ্ঠ হয়ে তিনি বিজয়নগরে উপস্থিত হওয়ার লক্ষ্যে একদিন ঝাঁপ দেন নদীতে। বিদ্যুন্মালাদের নৌকা যখন কলিঙ্গ থেকে বিজয়নগরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল, একদিন বলরাম কর্মকার নামে এক যাত্রী তাকে দেখতে পায় নদীতে ভাসমান অবস্থায়। পরে তাকে জল থেকে উদ্ধার করা হয়। এরপর সুস্থ-স্বাভাবিক হলে তার জীবন বৃত্তান্ত জানা যায় । বিদ্যুন্মালাদের সঙ্গী হিসাবে অর্জুন বর্মাও বিজয়নগরের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন । বিজয়নগর সংলগ্ন কিল্লাঘাটে তরী পৌঁছানোর কিছু পূর্বে শুরু হয় হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি । প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়ে নৌকার যাত্রীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে নদীর জলে । বিদ্যুন্মালা নদীর জলে তলিয়ে গেলে তাকে উদ্ধার করেন অর্জুন বর্মা । নির্জন দ্বীপে অচৈতন্য বিদ্যুন্মালার সঙ্গে অর্জুন বর্মার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে । জ্যোৎস্না রাত্রির মৃদু আলোয় রাজকুমারীর দেহসৌন্দর্য অর্জুন বর্মাকে করেছিল মুগ্ধ । এরপর বিদ্যুন্মালার চেতনা ফিরলে উভয়ের সঙ্গে চলে স্বল্পালাপ । এখানেই যে উভয়ের মনে প্রেমের প্রথম বীজ রোপিত হয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখেনা । উপন্যাসের পরবর্তী ঘটনাও তার সাক্ষী বহন করে ।

অর্জুন বর্মা ছিলেন যদুকুলের সন্তান । তাই তাঁর মধ্যে ছিল অসীম সাহস । হিন্দুত্বের রক্ত সারা শরীরে প্রবাহের ফলে মেনে নিতে পারতেন না মুসলিম শাসন । তাই বাধ্য হয়ে হিন্দু রাজ্য বিজয়নগরে এসেছিলেন । অর্জুন বর্মা চরিত্রের একটি বড় দিক হল – হৃদয়ের অন্তরদ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের একদিকে রয়েছে প্রেম, অপরদিকে কর্তব্য। রাজা দেবরায়ের রাজ্যে কর্তব্য পালনে তিনি যেমন মুখর তেমনি বিদ্যুন্মালার প্রেমও তাঁর হৃদয়কে নাড়া দিত। আসলে বিজয়নগর রাজ্যের সদ্য নিয়োজিত একজন সামান্য রাজকর্মচারী হয়ে বিদ্যুন্মালার প্রেমে সায় দিতে চাননি অর্জুন । কিন্তু প্রতিটিমুহূর্তে বিদ্যুন্মালার উপস্থিতি ও অর্জুনের সান্নিধ্যলাভের চেষ্টা তাকে করেছিল দুর্বল । একদিন এই বিদ্যুন্মালার জন্যই জন্যই অর্জুন বর্মা রাজার চোখে হয়েছিলেন বিশ্বাসঘাতক ও অপরাধী। একসময় অর্জুন বর্মা আক্ষেপ করে বিদুম্মালার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "তিন দিন আগে আমি সজ্জন ছিলাম, আজ আমি কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতক। রাজা আমাকে

ভালোবাসেন , আমাকে পরম বিশ্বাসের কাজ দিয়েছেন ; আর আমি প্রতিমুহূর্তে তাঁর সাথেবিশ্বাসঘাতকতা করছি। তুমি আমার এ কী সর্বনাশ করলে ?”[৮]

লেখক তাঁর কাল্পনার গুনে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এক কাল্পনিক চরিত্র অর্জুন বর্মাকে গড়ছেন রক্তমাংসে গড়া এক মানব চরিত্ররন্ধপে ।

উপন্যাসের আর এক উল্লেখযোগ্য চরিত্র হল বলরাম দাস । কলিঙ্গ থেকে বিজয়নগরের উদ্দেশ্যে আসা তিনটি নৌকার একটির যাত্রী ছিলেন তিনি। কলিঙ্গ রাজকন্যাদ্বয় বিদ্যুন্মালা ও মণিকঙ্কণার সহযাত্রী হিসাবে এসেছিলেন বিজয়নগরে । এই বলরাম দাসই একসময় নদীর জলে ভাসমান অর্জুন বর্মাকে বাঁচিয়ে ছিলেন। ফলে উভয়ের মধ্যে গড়ে ওঠে এক গভীর বন্ধুত্ব। বয়সের দিক থেকে অর্জুন বর্মার চেয়ে প্রায় দশ বছরের বড় ছিলেন বলরাম দাস। সারাজীবন নানা দুঃখ কষ্ট পেলেও তাকে গুরুত্ব দেননি বালরাম, বরং তাকে বলতে শুনি-

“ সে জীবনে অনেক দুঃখ পাইয়াছে , কিন্তু দুঃখ বস্তুটাকে সে বেশি আমল দেয় না । দুঃখ তো আছেই , দুঃখ তো জীবনের সঙ্গী ; তাহার ফাঁকে ফাঁকে যতটুকু সুখ আহরণ করা যার ততটুকই লাভ ।”[৯]

-বলরাম দাস কলিঙ্গ থেকে এলেও তিনি ছিলেন বাংলাদেশের মানুষ , জাতিতে ছিলেন কর্মকার। বন্ধুবর অর্জুন বর্মার কাছে সে তাঁর জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরেছেন-

> “বর্ধমানের নাম তুমি বোধহয় শোননি ; দামোদর নদের তীরে মস্ত নগর । সেখানে আমার কামারশালা ছিল ; বেশ বড় কামারশালা । কাস্তে , কুড়ল , কাটারি তৈরি করতাম। ঘোড়ার ক্ষুরে নাল ঠুকতাম , গরুর গাড়ির চাকায় হাল বসাতাম , তলোয়ার, সড়কি, এমনকি কামান পর্যন্ত তৈরি করতে জানি , কিন্তু মুসলমান রাজারা তৈরি করতে দিত না ; মাঝে মাঝে রাজার লোকেরা এসে তদারক করে যেত । আমরা অবশ্য লুকিয়ে লুকিয়ে অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতাম।”[১০]

বলরাম দাস যে কেবল কর্মকার কিংবা সাঁতারে পটু ছিলেন তা নয় , পাশাপাশি তিনি ছিলেন সুকণ্ঠের অধিকারী । মৃদঙ্গ সহযোগে কবি জয়দেবের পদাবলী গাইতেও শোনা গেছে তাঁকে –

“তালফলাদপি গুরুমতিসরসম্
কিমু বিফলীকুরুষে কুচকলমম্ ,
মাধবে মা করু মানিনি মানময়ে । ”[১১]

পদাবলীর এই রসে একসময় মজে ছিলেন বন্ধু অর্জুনবর্মা, বিদ্যুন্মালা ও মণিকঙ্কণা । এছাড়া মঞ্জিরার প্রতি তাঁর প্রেমকাহিনি উপন্যাসটিতে একটি আলাদা মাত্রা এনে দেয় ।

'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসটিতে বিদ্যুন্মালাকে নায়িকা চরিত্র বলা যেতে পারে । চরিত্রটি ঔপন্যাসিকের কল্পনা প্রষুত । বিদ্যুন্মালা ছিলেন কলিঙ্গ দেশের রাজা ভানুদেবের আর্যস্ত্রীর কন্যা ।ভানুদেব যুদ্ধে দেবরায়ের কাছে পরাজিত হলে শর্তানুসারে নিজ কন্যা বিদ্যুন্মালার ও বৈমাত্রেয় ভগিনী মণিকঙ্কণাকে দেবরায়ের বধূরূপে পাঠিয়েছিলেন । বিদ্যুন্মালার বয়স আঠারো বছর । তন্বী, তপ্তকাঞ্চন বর্ণা , যৌবনে উচ্ছল মেয়েটির মন প্রকৃতিতে ছিল এক শান্ত স্বভাব । বাইরে থেকে সহজে চেনা যায় না তাঁর মন । দীর্ঘ তিন মাসের নৌকা মাত্রা তার মনে এনেছিল ক্লান্তি । তাছাড়া দেবরায়ের সঙ্গে বিয়েতে তার মত ছিল না । তাঁর মতে এই বিয়ে-একটি রাজনৈতিক দাবার চাল ব্যতীত অন্যকিছু নয় । বিজয়নগর সংলগ্ন তুঙ্গভদ্রার জলে এক প্রাকৃতিক দুর্যোগের রাতে অর্জুন বর্মার সাথে তার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে ।

লেখকের এই বর্ণনা একদিকে যেমন মহাভারতের দ্রৌপদী কে লাভের কথা মনে করিয়ে দেয় , অন্যদিকে মনে করায় বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রীরাধারপূর্বরাগের রোমান্টিক মনোহর চিত্রের কথা।

এরপর বিদ্যুন্মালা ও অর্জুন বর্মা বিজয়নগরে এসে পৌঁছায় । রাজা দেবরায় ভাই কম্পনের দ্বারা জানতে পারে পরপুরুষের স্পর্শ দ্বারা ঝড়বৃষ্টির রাতে প্রাণ ফিরে পেয়েছেন বিদ্যুন্মালা । কম্পনের কথা পুরোপুরি রাজা বিশ্বাস না করলেও মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকে রাজগুরু কুর্মদেবের কাছে পরামর্শ নেন এই বিষয়ে । গুরুর বচন অনুযায়ী আগামী তিনমাস আটকে যায় এই বিয়ে । ফলে বিদ্যুন্মালাকে রাজঅন্তঃপুরে স্থান দেওয়া হয় । এক্ষেত্রে বিদ্যুন্মালা মনে মনে খুশি হয়েছিলেন বোধহয় । কারণ রাজা দেবরায়কে বিয়ে করার কোনো আগ্রহই তাঁর ছিল না। তাই প্রতিটি মুহূর্তে ভেবেছে সে অর্জুন বর্মার কথা । রাজার একজন ভাবী বাগদত্তা হয়েও নিজ মনধর্মকে গুরুত্ব দিতে সে বারবার গোপোনে দেখা করেছে অর্জুন বর্মার সঙ্গে । বিদ্যুন্মালা জানে এক্ষেত্রে নানা বিপদ নেমে আসতে পারে আর্জুন বর্মার জীবনে । তবুও মনের গোপন ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিতে সে ছুটে গিয়েছে অর্জুন বর্মার কাছে । উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে দেখা যায় নানা ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়েও শেষ পর্যন্ত প্রেমের জয় ঘোষিত হয়েছে । অবশেষে রাজা দেবরায় অর্জুন বর্মার সঙ্গে বিদ্যুন্মালার বিয়ে দিয়েছেন । লেখক বিজয়নগরের প্রাচীন ইতিহাসের বর্ণনা দিতে গিয়ে ইতিহাসের ঘটনা ও চরিত্রের পাশাপাশি কাল্পনিক চরিত্র বিদ্যুন্মালকে রক্তমাংসে গড়া প্রেমের মানবীরূপ দান করেছেন । তাই উপন্যাসে নায়িকা চরিত্র হিসাবে বিদ্যুন্মালা স্থান পেয়েছেন সহৃদয় পাঠকের মনে ।

উপন্যাসের আর এক প্রধান মহিলা চরিত্র হলেন মণিকঙ্কণা , কলিঙ্গ রাজ ভানুদেবের অনার্যা স্ত্রী কম্পাদেবীর কন্যা তিনি । তৎকালে দক্ষিণ ভারতে একটি অভিনব রীতির প্রচলন ছিল । আর্যপুরুষেরা একজন আর্যা রমণীকে বিবাহকরার পাশাপাশি একজন অনার্যা রমণীকে বিবাহ করতেন । মূলত বংশবৃদ্ধির কারণে যে

এই বিবাহ তাতে কোনো সন্দেহ নেই । লেখক উপন্যাসটিতে তৎকালের এক সামাজিক প্রথা ও রীতিকে তুলে ধরেছেন মর্যাদার সঙ্গে । মণিকঙ্কণার বর্ণনা দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক লিখেছেন –

"সে তন্বী নয় , দীর্ঘাঙ্গী নয় , তাহার সুবলিত দৃঢ় পিনদ্ধ দেহটি যেন যৌবনের উদ্বেল উচ্ছ্বাস ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। চঞ্চল চক্ষু দুটি খঞ্জন পাখির মতো সঞ্চরণশীল, অধর নব কিশলয়ের ন্যায় রক্তিম ।"[১২]

বাস্তবিক মণিকঙ্কণা দেখতে ততটা সুন্দরী না হলেও তিনি ছিলেন সহজ-সরল, উদার ও কৌতুক মনের অধিকারিণী। তাঁর হৃদয় ছিল একরাশ সতেজ প্রেম-ভালোবাসা। এই মধুর প্রেমপূর্ণ হৃদয় বিজয়নগরের রাজা দ্বিতীয় দেবরায়কে মুগ্ধ করেছিল। যে দেবরায়ের কাছে এতদিন প্রেম ছিল একটি রাজনীতির চাল , মণিকঙ্কণাই সেই প্রেমকে ভিন্নতা দান করে রাজার মনে । এ প্রসঙ্গে সমালোচক ক্ষেত্র গুপ্ত লিখেছেন –

"রাজা দেবরায়ের কাছে দাম্পত্য ও রীতির বাইরে যায়নি প্রেম,বিয়ে প্রায় রাজনীতির চাল। মণিকঙ্কণা তার কাছে নতুন অভিজ্ঞতা , তার রাজকীয় চিত্তে প্রেমের সঞ্চার হল মণিকঙ্কণার চরিত্রের প্রতিক্রিয়ার । রাজা যে বিদ্যুন্মালার বিদ্রোহ হজম করে নিতে পারল তার একটি কারণ তার মধ্যে প্রেমিকের হৃদয় জন্ম নিয়েছে ।"[১৩]

প্রধান চরিত্রের পাশাপাশি একাধিক অপ্রধান চরিত্র ররেছে তুঙ্গভদ্রার তীরে উপন্যাসটিতে । স্বল্প পরিসরে চরিত্রগুলির পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয় । তাই চরিত্রগুলির নাম উল্লেখ করা হল মাত্র । এরা হলেন মন্দোদরী , কুমার কম্পন , রসরাজ বৈদ্য , মঞ্জিরা , চিপিটক , পিঙ্গলা , বীরভদ্র , লক্ষণ মল্লপ , কূর্মদেব প্রভৃতি ।

(৪)

মানবমনের ভাব প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হল ভাষা । কথা এবং লেখার মধ্য দিয়ে এই ভাষা প্রকাশিত । মানুষের মুখের ভাষা মূলত শ্রবণযোগ্য ; শ্রবণের পথ ধরেই তা মানব অন্তরে প্রবেশ করে, অন্যদিকে সাহিত্য বা লেখায় ভাষা একটু আলাদা । প্রত্যেক শিল্পী-সাহিত্যিক তাঁর চোখ দিয়ে যে বস্তু বিশ্ব ,মানব বিশ্বকে দেখেন তা তাঁর অন্তরের অনুভূতির জারকরসে জারিত করে তাকে ভাষাদান করেন । ফলে সাহিত্যের ভাষা অনেকখানি হৃদয়বোধ্য । প্রত্যেক শিল্পী - সাহিত্যিকের যেমন নিজস্ব ভাষা প্রয়োগের শৈলী রয়েছে তেমনি আবার সাহিত্যের প্রতিটি সংরূপেরই রয়েছে একটি নিজস্ব ভাষা ।প্রসঙ্গ স্বরূপ বলা যায়, কবিতা, নাটক , গান , কিংবা প্রবন্ধের ভাষা থেকে উপন্যাসের ভাষা একটু আলাদা। আবার , বিষয়ভেদে উপন্যাসের ভাষাও আলাদা হতে পারে। সামাজিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, আঞ্চলিক, মনস্তাত্ত্বিক চেতনাপ্রবাহী প্রভৃতি উপন্যাসের ক্ষেত্রে ভাষা হতে পারে ভিন্ন । তবে এক্ষেত্রে লেখকের নিজস্ব ভাষাশৈলীর উপরেই সবকিছু নির্ভর করে । প্রত্যেক লেখকই চেষ্টা করেন তাঁর নিজস্ব ভাষাশৈলীর প্রয়োগ ঘটিয়ে স্বাতন্ত্র্যতা গড়ে তুলতে । শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ঠিক এরকম

একজন শিল্পী , যিনি মৌলিক ভাবনা চিন্তাকে কাজে লাগিয়ে তাঁর বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস 'তুঙ্গভদ্রার তীরে'র ভাষাশৈলীর নির্মান করেছেন । আমাদের সর্বাগ্রে মনে রাখতে হবে এটি একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস । লেখকের কথায়- 'Fictionnised নয় Historical fiction ' অতএব উপন্যাসটি যেহেতু ঐতিহাসিক সেক্ষেত্রে তার ভাষার ঐতিহাসিক ভাব পরিমন্ডল কিংবা লক্ষণ ফুটে ওঠাই অনিবার্য ।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল-ভাষা । এই ভাষা প্রয়োগে লেখক সাধু ও চলিতের সহাবস্থানকে পাশাপাশি তুলে ধরেছেন । এছাড়াও বহুল সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় তাঁর রচনাগুলিতে । 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসের ক্ষেত্রে বলা যার-এখানে দ্বিভাষিকতার প্রয়োগ রয়েছে । শরদিন্দু যখন কোনো কিছুর বর্ণনা তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন , সেক্ষেত্রে তিনি সাধু গদ্যের ব্যবহার করেছেন , অপরদিকে চরিত্রগুলি যখন সংলাপ আকারে কথা বলছেন সেক্ষেত্রে চলিত গদ্যের আশ্রয় নিয়েছেন । দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় -

দৃষ্টান্ত - ১) "শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ মাথার উপর উঠিয়াছে । নৌকা তিনটি সঙ্গম ছাড়াইয়া তুঙ্গভদ্রার খাতে প্রবেশ করিয়াছে এবং একটি চরের পাশে পরস্পর হইতে শতহস্ত ব্যবধানে নোঙ্গর ফেলিয়াছে ।"[১৪]

(সাধুগদ্যের দৃষ্টান্ত)

দৃষ্টান্ত - ২) "রাজা বলিলেন – 'বলরাম, তুমি বঙ্গালা দেশের মানুষ ?' – বলরাম করজোড়ে বলিল - 'আঞ্জা , রাঢ় বঙ্গালা - বর্ধমান ভুক্তি, নগর বর্ধমান ।'"[১৫]

(চলিত গদ্য)

আবার লেখক যখন উপন্যাসে ঐতিহাসিক কোনো চরিত্র , স্থান কিংবা স্থাপত্য , ভাস্কর্যের বর্ণনা দিয়েছেন সেক্ষেত্রে তিনি অপ্রচলিত সাধুগদ্যের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।পাশাপাশি অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দেরও ব্যবহার করেছেন । দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় -

"কম্পনদেব বোধকরি কলিঙ্গ দেশীয়া বরাঙ্গনাদের কুহকভরা রূপলাবণ্যের সহিত ইতিপূর্বে পরিচিত ছিলেন না, তাঁহার সর্বাঙ্গ দিয়া ঈর্ষামিশ্রিত অভীপ্সার শিহরণ বহিয়া গেল ।"[১৬]

'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসে শরদিন্দু একদিকে যেমন বঙ্কিমি ভাষার কিছুটা অনুকরণ করেছেন, পাশাপাশি বহু অপ্রচলিত সাধুশব্দ, প্রচলিত চলিত শব্দ, আখ্যান বর্ণনায় ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম ব্যতীত অন্যান্য জায়গায় তিনি চলিত গদ্যরীতির ব্যবহার করেছেন। সংলাপের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের কাহিনি বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক একদিকে যেমন বহু কোটেশন চিহ্নের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন অন্যদিকে ড্যাশচিহ্নেরও ব্যরহার করেছেন । যেমন-

" দাসীরা প্রস্থান করিলে মণিকঙ্কণা বলিল – 'মালা, তুই কোন পালঙ্কে শুবি ?'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন –‘দুই পালঙ্কই সমান । যেটাতে হয় শুলেই হল । আয়, দু'জনে এক পালঙ্কে শুই ।’”[১৭]

সংলাপ তুলে ধরার ক্ষেত্রে লেখক ছোট ছোট বাক্যে, সহজ সরল ভাষার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। এছাড়া সংলাপ রচনার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক উপন্যাসে সৃষ্টি করেছেন এক নাটকীয় ভঙ্গী । দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় -

“ রাজা – ‘ ভয় নেই , তোমার গুপ্ত বিদ্যা প্রকাশ করতে হবে না ।’
বলরাম – ‘ধন্য মহারাজ । আর একটি নিবেদন আছে ।
রাজা – ‘আবার নিবেদন ! কী নিবেদন ? ’
বলরাম – ‘মহারাজ , আমি বিবাহ করতে চাই ।’”[১৮]

(৫)

সর্বোপরি ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ ঐতিহাসিক উপন্যাস হওয়ার কারণে লেখক ঐতিহাসিক পরিবেশ, স্থান, চরিত্র প্রভৃতি বর্ণনার ক্ষেত্রে গরুগম্ভীর সংস্কৃত শব্দ যেমন ব্যবহার করেছেন, পাশাপাশি প্রচলিত দেশি-বিদেশি, তদ্ভব শব্দেরও প্রয়োগ ঘটিয়েছেন । এছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র যেমন তাঁর উপন্যাসে ইতিহাসও রোমান্স বর্ণনায় কাব্যধর্মী সংলাপের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন , একই ভাবে শরদিন্দুও তাঁর উপন্যাসে কাব্যধর্মী সংলাপের ব্যবহার করেছেন। বিশেষ করে কলিঙ্গ থেকে বিজয়নগরের উদ্দেশ্যে নদীপথে যাত্রাকালে লেখক প্রকৃতির যে বর্ণনা দিয়েছেন কিংবা অর্জুন বর্মা ও বিদ্যুন্মালার সংলাপেও সেই কাব্যধর্মীতা ফুটে উঠেছে। তাই তাঁর গদ্যশৈলী সম্পর্কে সমালোচক সুকুমার সেনের মন্তব্য দিয়ে উক্ত বিষয়ের ইতি টানা যেতে পারে-

“শরদিন্দু বাবুর গল্পের গুন বহু গুনিত করেছে তাঁর ভাষা কাহিনীকে ভাসিয়ে তাঁর ভাষা যেন তর্ তর্ করে বয়ে গেছে সমাপ্তির সাগরসঙ্গমে। সে ভাষা সাধু না চলিত বলা মুশকিল। বলতে পারি সাধু-চলিত কিংবা চলিত- সাধু । শরদিন্দুবাবুর স্টাইল তাঁর নিজেরই – স্বচ্ছ, পরিমিত, অনায়াসসুন্দর ।”[১৯]

তথ্যসূত্র:

১। বন্দ্যোপাধ্যায় , শরদিন্দু – ঐতিহাসিক কাহিনী সমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. ১ম সংস্করণ, ১ অগ্রহায়ণ , ১৩৭২ , গ্রন্থপরিচয় অংশ, পৃষ্ঠা – ৮৩১ ।

২। মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ – চিঠি, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৬৫ ।

৩। মজুমদার, রমেশচন্দ্র – চিঠি, ২৬ নভেম্বর, ১৯৬৫ ।

৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু - ঐতিহাসিক কাহিনী সমগ্র, গ্রন্থ- পরিচয় অংশ, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা – ৮২১ ।

৫। মর্মর, ঊর্মি – শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়, তুঙ্গভদ্রার তীরে, আনন্দ – ২০১৭, কলকাতা – পৃষ্ঠা – ৪৮৫ ।

৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু, - ঐতিহাসিক কাহিনি সমগ্র , তুঙ্গভদ্রার তীরে , আনন্দ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা – ৬৯৭ ।

৭। পাল, শ্রাবাণী - শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় , সাহিত্য একাদেমি , প্রথম প্রকাশ – ২০১২, পৃষ্ঠা – ৫৫ ।

৮। শরদিন্দু অমনিবাস – ৩য় খন্ড , পৃষ্ঠা – ৪৩৯ ।

৯। বন্দ্যোপাধ্যায় , শরদিন্দু : ঐতিহাসিক কাহিনী সমগ্র , পৃষ্ঠা – ৭০৯ ।

১০। তদেব, পৃষ্ঠা – ৭০৮ ।

১১। তদেব – পৃষ্ঠা – ৭১২ ।

১২। তদেব – পৃষ্ঠা – ৪৩৮ ।

১৩। গুপ্ত, ক্ষেত্র : রমণীয় শরদিন্দু , গ্রন্থনিলয় , প্রথম প্রকাশ – ১৪০৮ , পৃষ্ঠা – ১১৩ ।

১৪। বন্দ্যোপাধ্যায় , শরদিন্দু : ঐতিহাসিক কাহিনী সমগ্র , পৃষ্ঠা – ৭০৪ ।

১৫। তদেব – পৃষ্ঠা – ৭৬৩ ।

১৬। তদেব – পৃষ্ঠা – ৭২৪ ।

১৭। তদেব – পৃষ্ঠা – ৭৩৮ ।

১৮। তদেব – পৃষ্ঠা – ৮১২ ।

১৯। শরদিন্দু অমনিবাস , ১ম খণ্ড 'ব্যোমকেশ উপন্যাস' শীর্ষক ভূমিকা দ্রষ্টব্য ।

গ্রন্থপঞ্জী

আকর গ্রন্থ

১) শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : ঐতিহাসিক কাহিনী সমগ্র , ১ম সংস্করণ – জানুয়ারি – ১৯৯৮ , আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ।

২। শরদিন্দু অমনিবাস ৩য় খণ্ড , শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত , সাহিত্য একাদেমি , নিউ দিল্লী , প্রথম সংস্করণ – শ্রাবণ ১৩৮০ ।

সহায়ক গ্রন্থ

১। গুপ্ত, ক্ষেত্র-রমণীয় শরদিন্দু, গ্রন্থনিলয়, পটুয়াটোলা লেন। কলকাতা-৯

২। রায় চৌধুরী গোপিকানাথ - দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যকালীন বাঙলা কথাসাহিত্য, দে'জ পাবলিশিং।

৩। বসু নিতাই - শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রন্থতীর্থ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

৪। ভট্টাচার্য, ড. প্রমীলা - কথাশিল্পী শরদিন্দু: মনও শিল্প, গ্রন্থনিলয়, পাটাটোলা লেন, কলকাতা-৯

৫। সেন, সুকুমার-বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস-পঞ্চমখন্ড, তৃতীয় সংস্করন , ১৯৯৬, মডার্ন বুক এজেন্সি,

৬। গুপ্ত, ক্ষেত্র-বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস- প্রথম ও চতুর্থ খন্ড, প্রথম প্রকাশ- ২০০২, গ্রন্থনিলয়,

৭। চৌধুরী ভূদেব,- ছোটগল্পের কথা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমি,১৯৯৪,

৮। ভট্টাচার্য জগদীশ - আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ১৯৯৪,

৯। চট্টোপাধ্যায় কুণ্ডল - সাহিত্যের রূপরাতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, কলকাতা,ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৩৫১।

১০। মুখোপাধ্যায় অরুণ কুমার - কালের পুত্তলিকা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৫, দে'জ পাবলিশিং।

১১। পাল, শ্রাবণী : শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য একাদেমি, প্রথম প্রকাশ – ২০১২।

১২। মণ্ডল, পুলকেশ – সম্পাদনা – বহুমাত্রিক দৃষ্টিতে তুঙ্গভদ্রার তীরে, প্রথম প্রকাশ – সেপ্টেম্বর, ২০২১, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ ।

“হরিজন উন্নয়ন কথা”: ভাঙ্গী সম্প্রদায়ের জীবনগাথা

তুহিনা মণ্ডল (মল্লিক)
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
কবি নজরুল মহাবিদ্যালয়, সোনামুড়া, ত্রিপুরা

ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় কর্মের উপর ভিত্তি করে চতুর্বর্ণ প্রথা প্রচলিত হয়েছিল। এই ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ ছিলেন সবার উপরে, তারপর ক্ষত্রিয়, তারপর বৈশ্য, তারপর শূদ্র। ব্রাহ্মণ করবেন জ্ঞান সঞ্চয়, ক্ষত্রিয় করবেন শাসন ও ধন সঞ্চয়, বৈশ্য করবে ধন আহরণ আর শূদ্রের জন্য নির্ধারিত একটিই কাজ- প্রশ্নাতীতভাবে অন্য তিন বর্ণের সেবা করা। হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় বহুকাল ধরে কিছু নিয়মের নিগড়ে বাঁধা---যে নিয়ম কোন আইন নয় কিন্তু আইনের মতই প্রত্যেকে মেনে চলেন। এই রকমই আইন প্রণয়ক একটি সংহিতা যা হিন্দু সমাজব্যবস্থার ভীত গড়ে তুলেছে তা হল মনু-সংহিতা। একটা সময় পর্যন্ত সমস্ত হিন্দু এর পবিত্রতায় বিশ্বাস করে এসেছে এবং এর সকল বিধান শিরোধার্য করেছে।

মনু চতুর্বর্ণ সমাজ বিভাজনকে বিস্তারিত করে আরও দুই রূপের কথা বলেন- (১) যারা চতুর্বর্ণ পরিধির মধ্যে এবং (২) যারা চতুর্বর্ণ পরিধির বাইরে। এই নতুন সমাজ বিভাজন মনুর মৌলিক সৃষ্টি এবং হিন্দু ধর্মে নব সংযোজন। শূদ্ররা চতুর্বর্ণ পরিধির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তাদের তাও একরকম মর্যাদা আছে, কিন্তু চতুর্বর্ণ পরিধির বাইরের মানুষরা হলেন অস্পৃশ্য-যাদের না আছে সম্মান না আছে মর্যাদা।

এইভাবে সমাজ প্রবর্তিত বর্ণ ব্যবস্থাকে মনু শুধু সমর্থন করেননি, অস্পৃশ্যতাকে বৈধতা দান করেছেন। এই অস্পৃশ্যতাই একসময় ব্যাধির রূপ ধারণ করে ভারতের সমাজ প্রগতির প্রধানতম প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় এমনভাবে কাজের বিভাজন করা হয়েছে যে বর্ণ হিন্দুরা করে পরিষ্কার ও মর্যাদাপূর্ণ কাজ এবং অস্পৃশ্যদের জন্য স্থির হয় নোংরা পরিষ্কারের মতো কাজ। যাতে বর্ণহিন্দুরা মর্যাদা পায় আর অস্পৃশ্যরা ঘৃণ্য রূপে গণ্য হয়। বাস্তব হলেও কোন বণহিন্দু এটা ভেবে দেখেন না যে, অস্পৃশ্যরা নোংরা পরিষ্কার করে বলেই তারা পরিচ্ছন্ন থাকতে পারেন, উপরন্তু তাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করা হয় যেন তাদের মত অপবিত্র জীব আর পৃথিবীতে নেই।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অস্পৃশ্যতার রূপও বিভিন্ন। কোথাও অস্পৃশ্যরা দৃষ্টিবর্জিত অর্থাৎ স্পৃশ্য হিন্দুদের একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে আসা তাদের নিষেধ---তাদের চোখে দেখাও ‘পাপ’। কিছু অস্পৃশ্যরা দৃষ্টি বর্জিত নয়, কিন্তু তাদের শরীরের স্পর্শ ‘অপবিত্র’। কোন অঞ্চলে সাধারণের ব্যবহার্য পানীয় জলের উৎস থেকে জল নেওয়া অস্পৃশ্যদের জন্য নিষিদ্ধ। কোথাও মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। ভারতবর্ষে প্রথম

জনগণনা ১৮৮১ সালে শুরু হলেও ১৯১১ সালের আগে পর্যন্ত অস্পৃশ্যদের জনসংখ্যা অজানা ছিল। কারণ জনগণনায় তাদের গুরুত্বই দেওয়া হয়নি (মানুষ হিসাবেই গণ্য নয়!!)। ১৯১১ সালের আদমশুমার মহাধ্যক্ষ প্রথম জনগণনায় অস্পৃশ্যদের গণনাকেও গুরুত্ব দেন।

অস্পৃশ্যদের সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে বিভিন্ন ধর্মপ্রচারকরা বিভিন্ন সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি, অস্পৃশ্যরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেছেন। এরপর অস্পৃশ্যদের হয়ে লড়াই করতে প্রথম অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। গান্ধীজির নেতৃত্বে ১৯২২ সালে ফেব্রুয়ারিতে কংগ্রেসের বরদৌলি কর্মসূচিতে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হয় তার মধ্যে অন্যতম-

অনুন্নত শ্রেণীদের সুসংগঠিত করা উন্নততর জীবনযাত্রার জন্য। তাদের সামাজিক, মানসিক ও নৈতিক অবস্থার উন্নতি বিধান করা, জাতীয় বিদ্যালয়ে তাদের সন্তানদের পাঠাতে উদ্বুদ্ধ করা এবং অন্যান্য নাগরিকরা যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে তাদের জন্যও তার ব্যবস্থা করা।[১]

১৯২২ সালের জুন মাসে লক্ষৌতে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে দেশজুড়ে অস্পৃশ্যদের অবস্থা উন্নততর করার লক্ষ্যে ৫ লক্ষ টাকার তহবিল গড়ে তোলার প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে কংগ্রেস ধীরে ধীরে অস্পৃশ্যদের জন্য গঠনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও রূপায়ণের পরিবর্তে কেবল আনুষ্ঠানিকতাতেই সীমাবদ্ধ রইল। অস্পৃশ্যতা উচ্ছেদের চেষ্টা করলেও কংগ্রেস যে শেষপর্যন্ত প্রচলিত ব্যবস্থাকে অতিক্রম করতে পারেনি তার প্রমাণ অস্পৃশ্যদের জন্য আলাদা কূপ খনন ও আলাদা বিদ্যালয় স্থাপন। সর্বসাধারণের জিনিসে অস্পৃশ্যদের অধিকার প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে অস্পৃশ্যদের জন্য সবকিছুর আলাদা ব্যবস্থা করে। তাদের সমাজে পৃথক করে রাখার ব্যবস্থাকেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল।

অস্পৃশ্যদের নিয়ে গৃহীত কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসে মতবিরোধ বাধলে গান্ধীজি বুঝলেন অস্পৃশ্যদের সমস্যা সম্পর্কে কাজ করার জন্য পৃথক সংগঠন প্রয়োজন। সেই অনুযায়ী ১৯৩২ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠিত হল নিখিল ভারত অস্পৃশ্যতা বিরোধী লিগ, যার নাম গান্ধীজি রাখলেন 'হরিজন সেবক সংঘ। অস্পৃশ্যদের নতুন নামকরণ করলেন তিনি 'হরিজন'-'ঈশ্বরের সন্তান'।

এই হরিজনদের উন্নয়ন প্রকল্পে হরিজন সেবক সংঘের গৃহীত প্রস্তাব ছিল-

১. প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সংঘ কয়েকটি বিদ্যালয় খুলবে। বিশেষত যেখানে সাধারণ বিদ্যালয় নেই বা থাকলেও অস্পৃশ্যদের ঢুকতে দেওয়া হয় না।

২. কলা, প্রযুক্তি, পেশাদারি পাঠ্যক্রমের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করে অস্পৃশ্যদের উচ্চশিক্ষায় উৎসাহ দিতে হবে।

৩. মহাবিদ্যালয় ও বিদ্যালয়ে পাঠরত অস্পৃশ্য ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. অস্পৃশ্যদের চিকিৎসা সংক্রান্ত সাহায্য করতে হবে। কিছু ঔষধালয় সংঘ চালাবে এবং সংঘের শিক্ষার্থী কর্মীরা বাড়ি গিয়ে অসুস্থ ও যন্ত্রনাগ্রস্ত অস্পৃশ্যদের চিকিৎসা করবে।

৫. সংঘের আর এক কল্যাণমূলক কাজ জল সরবরাহ-নূতন কূপ খনন বা পুরানো পাম্প মেরামত: অস্পৃশ্যদের জন্য কূপ খননে স্থানীয় সরকার ও সংস্থাগুলিকে রাজী করানো ইত্যাদি।

৬. সংঘ কয়েকটি শিল্প বিদ্যালয় চালাবে যাতে বেশ কিছু সংখ্যক শিল্প কারিগর তৈরি হয়ে স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে।[২]

এই সংঘটি পরিচালিত হত প্রধানত বর্ণহিন্দুদের দ্বারা খুব কম সংখ্যক অস্পৃশ্যরা সংঘের কাজকর্ম পরিচালনায় অংশ নিতে পারত।

গান্ধীজি কথিত এই হরিজন এবং হরিজন উন্নয়ন সম্পর্কে গৃহীত প্রকল্প ও প্রকল্পের বাস্তবায়নে আশমান-জমিন ফারাকই জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'হরিজন উন্নয়ন কথা' (১৯৮৪ খ্রি:) উপন্যাসের বিষয়বস্তু। উপন্যাসটি উৎসর্গ করা হয়েছিল 'এ যুগে অস্পৃশ্য অচ্ছুতদের হরিজন অভিধা দিলেন যিনি সেই মহাত্মা গান্ধীজির স্মরণে'। এছাড়া উপন্যাস শুরুর আগেই স্মরণ করা হয়েছে চার যুগমানব-চৈতন্যদেব, গুরুনানক, স্বামীজি এবং আম্বেদকরজিকে। "লেখিকার নিবেদন" অংশে জ্যোতির্ময়ী দেবী জানিয়েছেন- "উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা ভাঙ্গী বা মেথর সমাজের। তাদের সুখ-দুঃখ নৈরাশ্য বেদনাভরা জীবনকে যেভাবে দেখেছি এ তারই গল্প। চরিত্র কাল্পনিক, কিন্তু পটভূমি ১৯৪৯-৫৩ সালের দিল্লী ভাঙ্গী কলোনীর সমাজের বাস্তবচিত্র। তাদের মুখে যা শুনেছি, তাতে ভ্রান্ত ধারণা থাকতে পারে। কিন্তু সে ভ্রান্তি তাদের তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। তাদের মুখের ভাষা আমি বদলাইনি। তাই সমাজকে যেভাবে দেখেছি তাই আমি অকপটে প্রকাশ করেছি।"[৩]

উপন্যাসের শুরু হয় বাল্মীকিভবন-এর বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের বর্ণনা দিয়ে, যে বর্ণনা থেকে স্পষ্ট প্রয়োজন আর আয়োজনের পার্থক্য। হরিজন উন্নয়ন সংঘের নীতি ছিল অস্পৃশ্যদের সভ্য সমাজের উপযোগী শিক্ষা দান। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার পরিবর্তে চলে পড়া পড়া খেলা। এই পড়ার উদ্দেশ্য- কেউ স্বামীকে 'খত' লিখবে, কেউ বাপের বাড়িতে চিঠি দেবে, কেউ বা পুত্রের চিঠি এলে নিজেই পড়তে পারবে। শিক্ষাকে সম্পদ করে তোলার শিক্ষা তাদের কেউ দেয়ও না, তারা জানেও না। ভাঙ্গী সম্প্রদায়ের নতুন প্রজন্ম কিন্তু স্বপ্ন দেখে, রঙীন স্বপ্ন-"তারাও কোনোদিন-ঐ 'বামুন বেনিয়ার' মতো বা শেঠজীর মতো লেখাপড়া শিখে কাজ করবে। -চাকরি করবে, বেড়াতে বেরুবে, মোটরগাড়ি চড়ে? মন্ত্রী হবে?"[৪]

তারা পড়াশোনা করতে চায়, লেখাপড়া শিখে মানুষের মতো মানুষ হতে চায়। কিন্তু স্কুল কোথায়? তাদের জন্য পৃথক স্কুল নেই, সাধারণের স্কুলে তাদের প্রবেশাধিকার নেই। রামধারী, খসরু, রামসুখ, কিষাণরা যখন পড়াশোনা করবে বলে কাছাকাছি এক সাধারণ স্কুলে উপস্থিত হয় তখন তাদের ভর্তি নেওয়া হয় না হরিজন, জমাদার বলে। ব্রাহ্মণ, ছত্রি, বৈদ্য, রাজপুত, বর্ণহিন্দু ছাত্র ও শিক্ষকদের মাঝে কোন বিধিনিষেধ না থাকা সত্ত্বেও তারা ভর্তি হতে পারে না 'বর্ণ হিন্দু কমিটির বর্ণ হিন্দু সভ্যরা' সম্মত হবে না এবং টিফিনের সময় ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে বর্ণহিন্দুদের জাত যাবে এই কারণে। সরাসরি না বলে ছলনা করে বলা হয় নীচু ক্লাসে সিট ফাঁকা নেই, উঁচু ক্লাসে হলে নেওয়া যেত-যেন হরিজনদের উচ্চশিক্ষার প্রভূত ব্যবস্থা আছে! সুখমতিয়ার পড়াশোনার জন্যও কোনো মেয়ে স্কুল জোটে না, শেষ পর্যন্ত কুইন্স পার্কের বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে সুখমতিয়ার 'তালিম' চলে।

বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে পড়াশোনার অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনাতেও অগ্রগতি নয় নিয়মকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। প্রকৃত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত না নিয়ে 'সভ্য' ও 'সভাপতি'দের 'বিদেশের বয়স্ক শিক্ষাপদ্ধতি অনুসারেই চলতে হয় বিবিজী (শিক্ষিকা)-দের। জ্যোতির্ময়ী দেবীর গভীর অনুভূতিশীল মনের দীর্ঘশ্বাস স্পষ্ট হয়-"দেশের লোককে লেখাপড়া শেখাতে পারার চেয়ে প্রচার ও পরিকল্পনা প্রচারের প্রয়াসই যেন গোড়ার কথা। কাগজে কাগজে ছবি ও বক্তৃতা প্রচারে যার পরিসমাপ্তি।"[৫]

হরিজনদের নতুন প্রজন্ম চায় না বাপ-ঠাকুর্দার মত মেথরের কাজ করতে। উপন্যাসের প্রথম দিকে রামধারী রামসুখকে বলে-"দেখ, আমি এখানকার 'লিখাপঢ়াই' শেষ করেই বড় ইস্কুলে পড়তে যাবো, মাস্টার সাহেবকে বলে রেখেছি। ও 'ঝাড়ু ন্‌চম্‌ কুলো কভি ছোঁব না হাম"।[৬] রামসুখও পড়াশোনা করতে চায়। দরিয়াগঞ্জের মিশনারী স্কুলে ভর্তি হয় রামধারী কিষণদের সাথে। কিন্তু বাবার অসুস্থতায় সংসারের দায়িত্ব নিতে সাধের পড়াশোনা ছেড়ে জমাদারের কাজই নিতে হয়। যুগ-যুগান্ত ধরে দাসখত লিখে দিয়েছে যেন এই হরিজনরা, তাই উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন জলাঞ্জলি দিয়ে ইচ্ছা না থাকলেও কলম ফেলে ঝাড়ু তুলে নিতে হয় হাতে-মুক্তি নেই।

"হরিজন কলোনীর ছোট বড় নারী, বালিকা, বালক, বয়স্ক পুরুষরা সকলেই ছোট বড় ঝাড়ু, চামচ, ময়লা ফেলার টিন মাথায় নিয়ে, মাথায় গামছা বেঁধে অর্ধনগ্ন দেহে পথে বেরিয়ে যাচ্ছে ময়লা তোলার গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে সারি দিয়ে চিরকালের মতো।"[৭]

নেহেরু 'বালদিবস'-এ ভাঙ্গীরা উৎসবের জন্য নতুন দিল্লী আর পুরানো দিল্লীকে সাজাতে নোংরা নোংরা পথঘাট, লালকেল্লার রাস্তা দিনভোর, রাতভোর চকচকে রাখার আদেশে বিব্রতভাবে ঝাঁটা, কুলো, ঠেলাগাড়ি নিয়ে ঘুরতে থাকে আর তাদের ছোট ছোট সন্তানরা উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য আগ্রহের সঙ্গে পরিষ্কার কাপড় পরে, সেজেগুজে বসে থাকে 'কাট' (কার্ড) আর গাড়ির অপেক্ষায়; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা উৎসবে

যোগদান করতে পারেনি-তাদের জন্য কোনো প্রোগ্রাম করা হয়নি। কংগ্রেস যতই অস্পৃশ্যদের সমানাধিকার দাবি তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ঘোষণা করুক; আসলে সেইসব অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারে তাদের সন্তান যারা 'অনেক টাকা সরকারকে চাঁদা দেয়'।[৮] যারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে উৎসবের পরিবেশ তৈরি করে তাদের সন্তানরা নয়।

হরিজন উন্নয়ন ফান্ডে দু কোটির বেশি টাকা জমা থাকলেও হরিজনরা অর্থাভাবে বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। তাদের জন্য হাসপাতাল নেই, কোন প্রাথমিক সেবাকেন্দ্রও নেই বাল্মীকি ভবনে। রামসুখের বাবার অসুখ বাড়লেও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার উপায় নেই-"সর্বত্রই ১৬/৩২/৬৪ টাকা আরো বা বেশী টাকার সেলামী দিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে, তবে যদি তিনি ইচ্ছে করেন ভর্তি করিয়ে দিতে পারেন। এই হল অলিখিত গোপন ও প্রকাশ্য প্রথা এবং পন্থা।"[৯] হরিজন উন্নয়ন কমিটির সদস্যদের কাছে বলেও কোন লাভ হয় না। ফান্ডের টাকায় সেবাসদন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে তাঁরা জানান কমিটির পরিকল্পনায় আছে-'ধীরে ধীরে হোগা সব।'

আবারও ধ্বনিত হয় লেখিকার অসন্তোষ-"কমিটি স্কীম পরিকল্পনা টাকা মঞ্জুর হতে হতে ওরা রোগে ভুগবে। মুর্খ হয়ে, ধাঙড় হয়ে থাকতে থাকতে মরেও যাবে। হাঁ মরে যাবে। 'ভাঙ্গী' 'মেহতর' জমাদার ধাঙড় অচ্ছুৎ হয়েই শুকিয়ে শুকিয়ে মরে বাঁচবে আর মরবে।"[১০] রামসুখের বাবাও শেষ পর্যন্ত বিনা চিকিৎসায় মারা যায়।

গান্ধীজির ১৮ দফা প্ল্যানের প্রথমেই ছিল হরিজন উন্নয়ন; ফান্ডে টাকাও আছে কিন্তু শিক্ষা, চিকিৎসার পরিবর্তে ট্রাস্টিরা বাড়িঘর বানানোর স্বপ্ন দেখান---টাকা জমা থেকে বাড়লে বাড়িঘর বানাতে দেওয়া হবে---পরিচ্ছন্নতা শেখাতে হবে। শিক্ষা-স্বাস্থ্য নয়, পাকাঘর---প্রকৃত উন্নয়ন নয়, লোক দেখানো উন্নয়ন-বাণীদান আর পরিকল্পনাই সার। গান্ধীজি চেয়েছিলেন হরিজন ফান্ড বানিয়ে তাদের লেখাপড়া শিখিয়ে ভদ্র-শিক্ষিত-প্রতিষ্ঠিত করতে, মানুষের মতো মানুষ করতে। ট্রাস্টিরা বলেন, প্রত্যেকের বাড়িঘরের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে আর প্রতি ঘরে চরখা, খাদি ও তাঁতঘর রাখা হবে---প্রকৃত হিতসাধনের পরিবর্তে বাহ্যিক আড়ম্বর।

হরিজনদের প্রকৃত ভালো-মন্দ দলিত শ্রেণি ছাড়া অন্যদের পক্ষে বোঝা অসম্ভব। উপন্যাসেও দেখা যায়, হরিজন উন্নয়ন সংঘের ট্রাস্টীদের বড় বড় কর্ম পরিকল্পনার পরিবর্তে হরভজন, একজন শিখ হরিজন প্রস্তাব দেয় বাল্মীকি ভবনের মধ্যেই একটি একটি করে ঘর নিয়ে বালশিক্ষা ভবন আর বাল সেবাভবন বানাবার। সে নিজে কম্পাউন্ডারের কাজ করে প্রাথমিক চিকিৎসা কিছু জানে, অন্যদেরও শিখিয়ে দেবে-যাতে করে ছোটখাটো রোগে ভাঙ্গী সন্তানদের অকালমৃত্যু না হয়। কিন্তু ঘর বা টাকা পাওয়া যায় না। প্রয়োজন সত্ত্বেও, ফান্ডে টাকা পড়ে থাকা সত্ত্বেও হরিজনদের প্রকৃত উপকারে ব্যবহৃত হয় না। সীতা মেহেরা যখন মোতিরামজীদের কাছে হরিজন শিশুদের অকালমৃত্যু ঠেকাতে বালসেবাভবন ও শিক্ষার জন্য বালমন্দির পাঠশালা তৈরির কথা বলেন তখন তাঁরা সঙ্ঘের কার্যাবলির বিবরণ দিতে থাকেন যেখানে 'বক্তৃতার স্রোতে

নব উৎসাহে কর্মক্ষমতা ভেসে যায়'।[১১] লোকদেখানো পরিকল্পনা গৃহীত হলেও আন্তরিকতার অভাবে হরিজনরা না পেয়েছে প্রকৃত শিক্ষা, না তাঁত-চরকার কাজ শিখে কোন হরিজন কর্মসংস্থান করতে পেরেছে-সব শুধু সাজানো আছে।

অরুণার জায়ের মেয়ে লতিকা রায় ডাক্তারি পড়তে পারে, কৃষ্ণা সেনের কন্যা তরুলতা এম. এ. পড়তে পারে-উচ্চবর্ণ বলে। কিন্তু হরিজন সুখমতিয়া, সমরু, কিষণ, রামধারীদের উচ্চশিক্ষার অধিকার নেই। সন্ত কওরজীর ভাবনা তাই যুক্তি সংগত- 'উন্নয়ন তহবিলের ঐ দু'কোটি বা তারও বেশি টাকাতে কি এই এত বছর ধরে দু'একটি হরিজন বালক ডাক্তারি শিখতে পারতো না, শিক্ষক বা কম্পাউন্ডার হতে পারতো না?''[১২]

শিক্ষা থাকলেও প্রচলিত সংস্কার এতটাই মজ্জাগত যে সন্ত কওর বাল্মীকি ভবনের অন্যান্য বিবিজীদের সঙ্গে একপাত্র থেকে চা খেতে পারেন না নিজে হরিজন বলে। উচ্চবর্ণকে নিমন্ত্রণ দলিতের 'স্পর্ধা' তাই সহকর্মীদের তার বাড়িতে খাওয়ার অনুরোধ করতে পারেন না। অথচ বয়সে ছোট, ছাত্রী স্থানীয়া সুখমতিয়ার সঙ্গে তিনি অনেক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, চা খেতে বা খাবার খেতে। সুখমতিয়া যেন সন্ত কওরের অপূর্ণ জীবনে পূর্ণতার আলো---তার সাফল্য সন্ত কওরকে আপ্লুত করে।

সন্ত কওরের সংস্কার বা সংকোচ যাই বলি জীবন থেকে উপলব্ধ। জমাদারের কাজ করতে করতে তার মা শিখ গুরুর পরামর্শে তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে ধর্মান্তরিত হয় শিখ ধর্মে-খেতে পড়তে পারার বিনিময়ে দরবার সেবার কাজ করতে করতে 'মুংলী' হয়ে ওঠে সন্ত কওর, 'ভিখুয়া' হরভজন এবং 'বুধো' গুরুদাস সিং। ধর্মান্তরিত হয়েও তাদের মনের গ্লানি কখনো কাটেনি-সমাজ কাটতে দেয়নি। পুরোনো ধর্ম ত্যাগ করায়, পুরোনো তাদের ত্যাগ করে, কিন্তু নতুন ধর্মও তাদের স্বীকৃতি পুরোপুরি দেয়নি। সন্ত কওরের সুন্দর গানের গলায় মুগ্ধ চন্দন সিংরা তাই শিখ হয়েও শিখ হরিজন সন্ত কওরকে জীবনে স্বীকৃতি দিতে পারে নি; সন্ত কওর আজীবন অবিবাহিত থেকে গেছে। সন্ত কওর অবিবাহিত জেনে অবাক সুখমতিয়ার প্রশ্নের উত্তরে সে জানিয়েছে, "বিয়ে হওয়ার অনেক বাধা জানিস। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, আর্যসমাজী সকলের ভেতরেই একটা জাতি সংস্কার বা জাতিভেদ থাকেই। ধনী কি গরীব-সেটা ছাড়তে পারে না।''[১৩] 'না লেখা কানুনের মত' একটা বিভেদ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে থেকেই যায়, যে বিভেদের বীজ স্থান-কাল নির্বিশেষে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে।

হরিজনদের মধ্যেও আছে নিজস্ব বিবাহ সংস্কার---মেয়েরা অবিবাহিত থাকতে পারে না এবং নিজ সম্প্রদায়ে বিয়ের ঠিক হয় (কখনো জন্মের আগে থেকেই!) দাদু-ঠাকুমাদের পারস্পরিক কথা দেওয়ার ভিত্তিতে। সুখমতিয়ার বিবাহ সেভাবেই স্থির হয়েছিল রামসুখের সঙ্গে। কিন্তু দিন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুখমতিয়ার পড়াশোনা ও চালচলনের অগ্রগতি আর অকালে সংসারের দায়িত্ব কাঁধে এসে পড়া রামসুখের জীবনযাপন ক্রমশ ব্যবধান তৈরি করছিল দুই পাত্র-পাত্রীর। সুখমতিয়ার জীবনে

উন্নতির অন্যতম রূপকার সন্ত কওর যখন ঠিক করে তার নিজের ছোট ভাই-এর বউ করবে সুখমতিয়াকে, তখন বাল্মীকিভবনে হরিজন কলোনিতে ঝড় ওঠে-

"ওরা শিখ হরিজন। ওদের কী জাতপাত, কুটুম জ্ঞাতি-ভাই বেরাদর কে বা কারা তা এরা কেউ জানে না। কোথায় দেশ, কোথায় গ্রাম, আপনজন রিস্তেদার কারো কিছু জানা নেই...। বিয়ে অমনি হলেই হল? বিয়ের ব্যাপার! জাত-পাত কুলশীলের কথা।"[১৪] এমনকি সুখমতিয়াদের 'জাতবারে' করে 'খানাপিনা-তামাকু-হুক্কা-পানি' বন্ধ করে দেওয়ারও হুমকি দেওয়া হয়।

শুধু অস্পৃশ্যদের মনে নয়, উচ্চবর্ণের মনেও আছে সংস্কার। যুগ, শিক্ষা কিছুটা পরিবর্তন আনলেও সবটা বদলাতে পারে না। সেই সুর ধ্বনিত হয় করুণা রায়ের কণ্ঠেও-

"ওরা এত পরিচ্ছন্ন। বর্ণ হিন্দু সমাজে মেলামেশা করছে। আমরাও একসঙ্গে কাজ করছি, হয়ত চাও খাচ্ছি। ছোঁয়াছুঁয়ি তো করছিই। তবু কোনখানে যেন একটা অস্বস্তি লুকোনো বেড়ার বাধা। ওদেরও আছে, আমাদেরও আছে। ঐ সংস্কারের, যা ভাঙ্গি মেথর জমাদার ছাড়া অন্য কোন জাতের বেলা হয় না।"[১৫]

কৃষ্ণা সেনও ভাবেন, "কী যেন ওদের চাই-চ, রুটি নয়, খাদ্য নয়, পাকাবাড়ি নয়, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন নয়, দু-একটি মন্ত্রী হওয়া বা রাজ্যপালের পদ পাওয়া নয়, তবে? তবে কী?"[১৬]

তাদের অর্থাৎ হরিজনদের প্রকৃত চাওয়া কি তা ড. আম্বেদকর 'গান্ধী ও তার অনশন' প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন- "অস্পৃশ্যরা যা চাইছে তা শিক্ষা নয়, চাইছে সাধারণ বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার। অস্পৃশ্যরা চিকিৎসা সাহায্য চায় না, বরং চায় সাধারণ চিকিৎসালয়ে সমশর্তে ভর্তি হওয়ার অধিকার। অস্পৃশ্যরা জল চায় না, সাধারণের ব্যবহার্য কূপ থেকে জল নেওয়ার অধিকার চায়। নিজেদের দুঃখ দুর্দশার হাত থেকে মুক্তি চায় না অস্পৃশ্যরা, তারা চায় তাদের ব্যক্তিরূপে অস্তিত্বটাকে সম্মান জানানো হোক এবং তাদের কলঙ্কমুক্ত করা হোক। তাদের কলঙ্ক মোচন হলেই তাদের দুঃখ দুর্দশাও তিরোহিত হবে। এই কথাটাই উপলব্ধি করতে পারে নি হরিজন সেবক সঙ্ঘ"।[১৭]

হরিজন উন্নয়ন সংঘের কোন সদস্যের থেকে যে সহমর্মিতা কখনো পায়নি, সেই সহমর্মিতা রামসুখ পায় পথে---ট্রেনে সাধুজীর কাছে। চিরকালের অবজ্ঞাত লাঞ্ছিত হরিজন তনয় অভিভূত হয়ে ভাবে-তার মত অচ্ছুতের হাত থেকে চা খেল কী করে সাধু মহারাজ! এই সাধু মহারাজের সঙ্গই রামসুখকে নতুন জীবনের দিশা দেখায়-মন আনন্দে কৃতজ্ঞতায় ভরে যায়। যে সমাজে যে স্তরে যে পরিবেশে ওরা বড় হয়েছে সেখানে ওদের নোংরা কাজ। কর্মজগতে সাধারণ উচ্চবর্ণরা অপাংক্তেয় করে রাখে। কথাবার্তা শুধু কাজ করানোয় কখনো ভদ্রভাবে কখনো রূঢ়ভাবে তারা সে কাজ সম্পাদন করায়।

সাধু মহারাজদের সহজ ব্যবহার, স্বচ্ছন্দে সাথে চলা এই অধিকারটুকুই তাদের চাওয়া। সাধুসঙ্গে তীর্থদর্শন করে বেড়ালেও কেদারবদ্রী মন্দির প্রবেশ করতে পারেনি রামসুখ। এই গল্প সুখমতিয়ার কাছে বললে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হওয়া সুখমতিয়া প্রতিবাদী হয়ে ওঠে- 'অত দূরে অত খরচ করে কষ্ট করে গিয়েছিলি! আর মন্দিরে ঢুকতে দিল না?' 'খুব খারাপ তো! কেন আমরাও (মনে মনে) মানুষ তো। শুনেছি গান্ধীজি মন্দির খোলার কথা বড় বড় মন্দিরে বলেছিলেন।'[১৮]

স্বাধীনতা পাওয়ার আগে প্রতিশ্রুতি তো অনেক ছিল-বিদেশী শাসকের হাত থেকে ক্ষমতা পেলে দেশের কোন অভাব থাকবে না----অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-জীবিকা সব দেবে তারা। চাষী-মজুর-মুচি-মুর্দাফরাস-জেলে-মালো-জোলা-তাঁতি-মালি-ভিখারি-বিকলাঙ্গ-রোগী-দুঃখী এবং হরিজন-ধাঙড়-মেথর-যারা ভাবতে, কথা বলতে জানে না তাদের নিয়েও পরিকল্পনার অন্ত ছিল না। কিন্তু স্বাধীনতার পর মূঢ় জনতা সভয়ে দেখল-তার এক কোটি চোখে অপরিসীম লোভ। তার কোষাগারে ধন, প্রাসাদে বিলাসের উপকরণ, মুখে আধ্যাত্মিকতার স্থূল-সন্তুষ্ট বাণী আর নিরর্থক কর্ম পরিকল্পনা। মননশীল লেখিকা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষিকার ভাবনায় ব্যক্ত করেন নতুন বোধ-

"গান্ধীজি তো জানতেন মানুষের সমাজ এইরকম মিথ্যাচারী হয়। তবে তিনি কেন কিছু করতে চেষ্টা করেননি। চুপি চুপি ভাবেন বোধহয় আদর্শবাদ, সত্য, ধর্ম, দয়া চিরকাল এরকমই স্বার্থের ক্ষমতার লোভের চোরাবালিতে ডুবে যায়।"[১৯] নতুন প্রজন্মের মনেও ক্ষোভ। সীতারামজীর মন্দিরে কেন তাদের প্রবেশাধিকার নেই? "হরিজন ফান্ডের টাকা থেকেই তো এসব করা হয়েছে। যে টাকা আমাদের জন্যই ছিল---তা সে আমাদের স্কুল, মাদ্রাসা, সেবাভবনের জন্য খরচ কেন হয়নি? গান্ধী মহারাজ কেন করেন নি?"[২০] রামসুখের ভাবনাতেও একই প্রতিচ্ছবি-"হরিজন? একটু হাসে একালের আলো ছোঁয়া মন। কাকে উন্নত করেছেন গান্ধীজি? নাম'ই নতুন দিয়েছেন, কিন্তু 'কাম' (কর্ম) কাজ সেই একই রয়ে গেছে।"[২১] গান্ধীজি হরিজন নাম দিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু নতুন নামকরণে তাদের অবস্থার এতটুকু উন্নতি হয় নি। নতুন নাম না তো তাদের হিন্দুদের চোখে উন্নীত করেছিল, না তাদের অস্পৃশ্যতার অভিশাপ থেকে মুক্তি দিয়েছিল। নতুন নাম একাত্ম হয়ে গিয়েছিল পুরানো বিষয়বস্তুতে। ড. আম্বেদকর নামকরণের প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, যে কোন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন অস্পৃশ্য এই নামের অন্তর্নিহিত অর্থে অপমানিত বোধ করবে।

উপন্যাসের শেষে দেখা যায়, আম্বেদকর যেমন গান্ধীজিতে ভরসা রাখতে পারেন নি, দুই লক্ষ স্বজাতিসহ ধর্মান্তরিত হয়েছিল, বাল্মীকিভবনেও নতুন চেতনার আলো নিয়ে আসে হরিজন সেবক সংঘ নয়, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের মহারাজজিরা। গান্ধীজি যেখানে ব্রাহ্মণকে শূদ্রে পরিণত করতে চেয়েছেন-স্বামীজি শূদ্রকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করতে চেয়েছেন। এই ব্রাহ্মণত্ব কোন জাতি, বর্ণ বা সম্প্রদায় নয়-একটি আদর্শ। সেই

ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ যিনি সকল স্বার্থবুদ্ধি বিনাশ করে ত্যাগ ও সেবার আদর্শে নিজের জীবনকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং যাঁর একমাত্র শক্তি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বল।

রামসুখ বংশগত ভাঙ্গীর কাজ ছেড়ে পরিবার পরিজন নিয়ে চলে যায় কনখলে রামকৃষ্ণ আশ্রমে-দুই ভাইকে শিক্ষিত করে মানুষের মত মানুষ করে, নিজেকে নিয়োজিত করে সেবার কাজে। উপন্যাসে কৃপানন্দ স্বামীর প্রসঙ্গে মনে পড়ে ইতিহাসের শ্রদ্ধানন্দ স্বামীকে। যিনি কংগ্রেসের অস্পৃশ্যতা উপকমিটি থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন অস্পৃশ্যদের বিষয়ে গুরুত্বের পরিবর্তে খাদি ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছিল বলে এবং স্বাধীনভাবে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারবেন বলে।

সবেশেষে দেখা যায় হাজার বাধা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত সুখমতিয়া ও হরভজনের বিবাহ সম্পন্ন হয়ে। তাদের সন্তানকে তারা বড় করতে চায় বাল্মীকিভবনের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মাজীর আদর্শে নয়, আম্বেদকরের আদর্শে-'হরিজন' অচ্ছুৎদের মধ্যে দীপাবলীর প্রদীপ ড. আম্বেদকর---শোষিত ও দলিত মানুষের সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য আমৃত্যু সংগ্রামী আম্বেদকর---দলিত সম্প্রদায়ের আদর্শ প্রাণপুরুষ। হরিজনদের অর্থাভাব, শিক্ষা---কর্মসংস্থানের অভাব "কিন্তু অবেচতন মনে আশা বা আনন্দ উঁকি মারে। শিক্ষা! মানুষ হওয়া---সোজা হয়ে জীবনের পথে চলতে পারা...। সব মানুষের পাশে পাশে যেতে পারার সাহস ভরসা।"[২২]

বাংলা সাহিত্যে অন্ত্যজ শ্রেণী উঠে এসেছে বহু সাহিত্যিকের কলমে---কখনো তাদের সারল্য নিয়ে, কখনো সংস্কৃতি নিয়ে, কখনো বা জীবনযুদ্ধ নিয়ে। জ্যোতির্ময়ী দেবী 'হরিজন উন্নয়ন কথা'য় দেখালেন হরিজনদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-জীবনের মানোন্নয়ন নিয়ে স্বাধীনতার পূর্বে নেতাদের প্রভূত পরিকল্পনা ও উচ্চবর্ণের উন্নাসিকতা, সহানুভূতিশীলতার অভাবে সেইসব পরিকল্পনার চূড়ান্ত ব্যর্থতাকে। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশে বসবাস করেও দেশের মোট জনসংখ্যার ছাব্বিশ শতাংশ হয়েও এদেশের আদিবাসী সম্প্রদায় সবসময় সকল সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিতই থেকে গেছে চিরকাল। জীবনযুদ্ধে নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন "The Voiceless Section of Indian Society" (মহাশ্বেতা দেবী) বর্তমানের আধুনিক সমাজেও সমান নিপীড়িত। আজও শিক্ষাক্ষেত্রে সমান অধিকারের দাবিতে তাদের আন্দোলন করতে হয়। আজও শুধু দলিত হওয়ার অপরাধে তাদের নগ্ন-অর্ধনগ্ন করে অত্যাচার করে মেরে ফেলা হয়। নীরব দর্শক আমরা শুধু খবর দেখি আর দীর্ঘশ্বাস ফেলি। যারা তার বাইরে কিছু করতে চান তাঁদের মধ্যে অন্যতম জ্যোতির্ময়ী দেবী---যার কলম সমাজের যে কোন অনাচার অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে ওঠে। পুত্রের কর্মস্থল উপলক্ষে দিল্লীতে বসবাস কালে তিনি হরিজনদের সংস্পর্শে আসেন। গভীর অনুভূতিশীল মন নিয়ে নিপুন হাতে রচনা করেন 'হরিজন উন্নয়ন কথা'---যা আসলে দিল্লীর ভাঙ্গী সম্প্রদায়ের জীবন গাথা।

তথ্যসূত্র:

১. বাবা সাহেব ড. আম্বেদকর রচনা-সম্ভার (১০ম খণ্ড), আম্বেদকর ফাউন্ডেশন, কল্যাণ মন্ত্রক, ভারত সরকার, নতুন দিল্লী, ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ, পৃ.-১৮৩।

২. প্রাগুক্ত, পৃ.-২৭১।

৩. জ্যোতির্ময়ী দেবী রচনা সংকলন (৪র্থ খণ্ড), গৌরকিশোর ঘোষ (সম্পা:), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৯৪, পৃ.-৭।

৪. জ্যোতির্ময়ী দেবী রচনা সংকলন (৪র্থ খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ.-১০

৫. তদেব, পৃ.-২৩

৬. তদেব, পৃ-১০

৭. তদেব, পৃ.-৪৭।

৮. তদেব, পৃ.-১২।

৯. তদেব, পৃ.-৩১।

১০. তদেব, পৃ.-৩৫।

১১. তদেব, পৃ.-৩৮।

১২. তদেব, পৃ.-৪০।

১৩. তদেব, পৃ.-৬৭।

১৪. তদেব, পৃ.-৬৮।

১৫. তদেব, পৃ.-৬৫।

১৬. তদেব, পৃ.-৫০।

১৭. বাবা সাহেব ড. আম্বেদকর রচনা-সম্ভার (১০ম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ.-২৭৯।

১৮. জ্যোতির্ময়ী দেবী রচনা সংকলন (৪র্থ খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ.-৮৩।

১৯. তদেব, পৃ.-৮৭।

২০. তদেব, পৃ.-৯৩।

২১. তদেব, পৃ.-৯৬।

২২. জ্যোতির্ময়ী দেবী রচনা সংকলন (৪র্থ খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ.-১১২।

জাতি চেতনা সম্প্রসারণে জাতি সংগঠন : নমঃশূদ্র জাতির একটি পর্যালোচনা (১৮৭২-২০০০)

কৃষ্ণ কুমার সরকার
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
রাজা নরেন্দ্র লাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয় (স্বশাসিত)

অনুচিন্তন : উনিশ শতকের শেষের দিকে ভারত তথা বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে 'আত্মপরিচিতি' নির্মাণের আন্দোলন শুরু হয়। এই প্রবাহে পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্র অধ্যুষিত বাখরগঞ্জে ১৮৭২-৭৩ সালে নমঃশূদ্র আন্দোলনের গোড়াপত্তন হয়। মূলত ঔপনিবেশিক নথিতে সংজ্ঞায়িত 'চণ্ডাল'-এর পরিবর্তে তারা 'নমঃশূদ্র' নাম গ্রহণ করতে তৎপর হয়ে ওঠেছিলেন। নমঃশূদ্রদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থানকে সুনিশ্চিত করার তাগিদে হরিচাঁদ ঠাকুর (১৮১২-১৮৭৮) 'মতুয়া' ধর্মের গোড়াপত্তন করেছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর পার্ষদগণ (দ্বাদশ পাগল) ও পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর (১৮৪৭-১৯৩৭) নমঃশূদ্রদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণকে ত্বরান্বিত করার জন্য একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। যার মধ্যে সভা-সমিতি স্থাপন ছিল প্রধান। বর্তমান প্রবন্ধে নমঃশূদ্র জাতিসত্তার আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করতে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সভা-সংগঠনের কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

সূচক শব্দ : নমঃশূদ্র, জাতি চেতনা, জাতি সংগঠন, সভা-সমিতি, ইত্যাদি।

নমঃশূদ্ররা পশ্চিমবঙ্গের সরকার স্বীকৃত তপশিলি কৌমগোষ্ঠীগুলির মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম জাতি।[১] প্রাচীনকালে বঙ্গদেশে তারা 'চণ্ডাল' নামে পরিচিত ছিল। বাংলার আদি অধিবাসীদের মধ্যে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি হিসেবে পরিগণিত ছিল। অষ্টম শতকের পূর্বে বাংলায় অ-ব্রাহ্মণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাদের সংখ্যা 'অতিশয় বহুল' হলেও তাদের অবস্থান 'চণ্ডাল' বা 'চাঁড়াল' জাতি হিসেবে চতুর্বর্ণের বাইরে ছিল। ঔপনিবেশিক কালে জনগণনার সময় জনগণনার আধিকারিক ই.এ.গেইট নমঃশূদ্রদের সম্পর্কে বলেছেন- 'The Namasudras or Chandals are the great race caste of East Bengal.'[২] উনিশ শতকের শেষদিকে তারা অন্যান্য তপশিলি জাতির মতো সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা স্বরূপ বিভিন্ন জাতি সভা প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেন। নমঃশূদ্র জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হল মতুয়া মহাসংঘ। এই সংঘের মাধ্যমেই নমঃশূদ্র জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ত্বরান্বিত হয়েছিল। তবে, মতুয়া মহাসংঘ তৈরি হওয়ার আগে নমঃশূদ্র জাতির সংস্কারকরা বিভিন্ন জাতিসভা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের জাতিচেতনা প্রসারের চেষ্টায় ব্যাপৃত হয়েছিলেন। এই পর্বে প্রধান কান্ডারীর ভূমিকা পালন করেছিলেন গুরুচাঁদ ঠাকুর। তিনি বিভিন্ন সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠার

মাধ্যমে নমঃশূদ্রদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থানকে সুনিশ্চিত করতে জনমুখী প্রচারে ব্যাপৃত হয়েছিলেন। এখানে ধারাবাহিকভাবে সেই সভাগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উত্তোলনী সভা

মতুয়া মহাসংঘ তৈরি হওয়ার আগে নমঃশূদ্র আন্দোলনের প্রধান কান্ডারী রূপে হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ বিভিন্ন কীর্ত্তন আসর, মহোৎসব ও জাতিসভা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নমঃশূদ্রদের জাতিচেতনা প্রসারের চেষ্টায় ব্যাপৃত হয়েছিলেন। তবে গুরুচাঁদ নমঃশূদ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন সামাজিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি বলেন "নমঃশূদ্রদের মধ্যে ভেদাভেদ দূর করে 'সভা-সমিতি'র মাধ্যমে একত্রিত হওয়া, ঐক্যবদ্ধভাবে সমাজ-সংস্কৃতির নানা ত্রুটি ও সমস্যার অনুসন্ধান এবং সভার ঐক্যমতে গণতান্ত্রিক নীতি গ্রহণ করতে হবে, তবেই পতিত সমাজের উত্তরণ হবে।" এই জাতীয় সভার নাম ছিল 'উত্তোলনী সভা'। এই ধরণের সভা সাধারণত মৃত পিতা-মাতার শ্রাদ্ধ আসরে অনুষ্ঠিত হত। বিভিন্ন জেলার গ্রামগুলির মোড়লগণ এই সভার প্রতিনিধিত্ব করতেন, সভা অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রতিনিধিদের 'পান-সুপারি' দিয়ে সম্মানিত করা হত। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সমাজের সমস্যা এবং গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে বক্তব্য রাখতেন, আবার সভায় প্রস্তাবিত গুণী ব্যক্তির বিভিন্ন মতাদর্শগুলি প্রতিনিধিবর্গ বহন করে নিয়ে যেতেন নিজসমাজের কল্যাণার্থে।[৩] ১৮৮১ সালের প্রথম দিক থেকে এই ধরনের সভা শুরু হয়। প্রকৃত অর্থে এই ধরনের সভার আদর্শ গৃহীত হয়েছিল হরিচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে 'কীর্ত্তন আসর' ও 'মহোৎসব' থেকে। কেননা এই আসর থেকেই নমঃশূদ্র জাতির একতা, মানব ধর্ম ও সমাজ কল্যাণমূলক আদর্শ প্রচার হত।

দত্তডাঙ্গার ঐতিহাসিক সভা (১৮৮১)

গুরুচাঁদ ঠাকুরের সভাপতিত্বে প্রথম উল্লেখযোগ্য 'উত্তোলনী সভা' অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৮১ সালে খুলনা জেলার মোল্লার হাট থানার দত্তডাঙ্গা গ্রামে নমঃশূদ্র জমিদার ঈশ্বর গায়েনের বাড়িতে, তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে। এই সভায় প্রায় ৫,০০০ লোকের উপস্থিতিতে বিভিন্ন জেলার ১৬জন নমঃশূদ্র নেতৃত্ব আত্ম-সহায়তা, আত্ম-বিশ্বাসের মাধ্যমে আত্ম-মর্যাদা ও আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধি করা বিষয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন। এই সভায় অনুসরণীয় ব্যবস্থা হিসাবে ঠিক হয় 'এরকম সভা নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে'।[৪] এই সভায় সভাপতি হিসেবে গুরুচাঁদ প্রদত্ত বক্তব্য ও বার্তা পরবর্তীকালে নমঃশূদ্র সমাজগঠনের মূলমন্ত্র ও আদর্শ হিসাবে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল। গুরুচাঁদ ঠাকুর বিদ্যাবিমুখ পতিত মানবগোষ্ঠীর আত্মচৈতন্যে বিদ্যার প্রবল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মূঢ় মানবাত্মার জয়গানে ব্রতী হয়েছিলেন।[৫] তিনি চেয়েছিলেন ভারতের প্রখর শক্তিসম্পন্ন মানব সম্পদের সদ্ব্যবহার। গুরুচাঁদের অভিভাষণে তাই সকল বন্ধন, সকল শৃঙ্খল মোচনের এবং জ্ঞান-ঐশ্বর্য্যের প্রখর দীপ্তিতে উদ্দীপ্ত হওয়ার চিরায়ত নির্দেশই প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। তিনি জাতির উদ্দেশ্যে তাই ঘোষণা করলেন-,

"তাই বলি ভাই মুক্তি যদি চাই
বিদ্বান হইতে হইবে
পেলে বিদ্যাধন দুঃখ নিবারণ
চিরসুখী হবে ভবে।।
আমি বলি বাণী যতেক পরাণী
গুণ দিয়া সবে মন।
বিদ্যা যদি পাও কাহারে ডরাও
কার দ্বারে চাও ভিক্ষা।
রাজশক্তি পাবে বেদনা ঘুচিবে
কালে হবে সে পরীক্ষা।।
বিদ্যার অভাবে অন্ধ হয়ে সবে
অন্ধকারে আছে পড়ে।
জ্বেলে দাও আলো মোহ দূরে ফেল
আঁধার ছুটিবে দূরে।।"[৬]

দত্তডাঙ্গার এই ভাষণ গুরুচাঁদ যখন সদর্পে ঘোষণা করছেন তখন ভারতে প্রকৃত অর্থে কোন রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব ঘটে নি। সেই দিকে থেকে এটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, ১৯৮১ সালের ২০ থেকে ২২ মার্চ 'দত্তডাঙ্গার নমঃশূদ্র সভার' শতবর্ষ পূর্তি উৎসব ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুর মহাকুমার শান্তিনগরে। এই অনুষ্ঠানে সভাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন ডা. সুধীরকুমার বাগচী।[৭] এককথায় নমঃশূদ্র সমাজের চেতনাবোধের বিকাশ, সামাজিক সংস্কার, প্রগতিশীল প্রস্তাব গ্রহণ ও কার্যকরণের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধতার কৌশল হিসাবে দত্তডাঙ্গার সমাবেশের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

নমঃশূদ্র কল্যাণ সমিতি (১৮৮১)

গুরুচাঁদের সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজের অপর গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হল 'নমঃশূদ্র কল্যাণ সমিতি' গঠন। ১৮৮১ সালে তাঁর নির্দেশে খুলনা শহরে 'নমঃশূদ্র কল্যাণ সমিতি' গঠিত হয়। শিক্ষা বিস্তার, রাস্তাঘাট নির্মাণ, মজা পুকুর খনন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা, বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ানো, অন্যায়-অবিচার ও অত্যাচারের প্রতিবাদ করা, আদালতে না গিয়ে গ্রাম্য সালিশীর মাধ্যমে বিরোধের মিমাংসা করাই ছিল এই সমিতির প্রধান কাজ। সমিতির অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্তিশালী করার জন্য গুরুচাঁদ 'লক্ষ্মীর গোলা' গঠনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশ অনুসারে ওড়াকান্দি, আড়ুয়াকান্দি, রামদিয়া, নড়াইল, বেথুড়িয়া, মাছকান্দি, জিকাবারী, শৈলের কূল, ধোপড়া, গাতী, শ্রীপুর, গাড়লগাতী, মাঝিগাতী, বহুগ্রাম, দূর্বাসুর, ইন্দোহাটি, মহাটালা, মামুদপুর, বাসুদেবপুর, হাতিয়াড়া প্রভৃতি গ্রামের সমিতিগুলি 'লক্ষ্মীর গোলা' গঠন করেন। লক্ষ্মীর গোলার অর্থ দিয়ে অনেক সময় গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষকদের বেতনও দেওয়া হত এবং দরিদ্র মেয়ের

বিবাহে সাহায্য করা হত। আবার সমিতির আয়ের স্বার্থে ঋণ হিসাবেও ধার দেওয়া হত। এক মন ধান নিলে দশ সের ধান বা তার বেশি অতিরিক্ত দিতে হত।[৮] নমঃশূদ্র কল্যাণ সমিতি শুধুমাত্র নমঃশূদ্রদের উন্নয়নের কাজ করে নি, স্থানীয় সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ এমনকি মুসলিম সম্প্রদায়ের কল্যাণার্থেও কাজ করেছে।

১৮৯১ এর উত্তোলনী সভা

গুরুচাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে যশোহরের 'ছিয়ানব্বই' গ্রামের নমঃশূদ্র সমাজপতি রাইচরণ মহালদার ১৮৯১ সালে কালিয়া থানার হাড়িয়াগোপ গ্রামের নিতাই মণ্ডলের পিতৃশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে ২২টি পরগনার নমঃশূদ্র প্রতিনিধি ও আমন্ত্রিতদের নিয়ে 'উত্তোলনী সভা' করেন। পরবর্তী সময়ে রাইচরণ ও স্থানীয় সুজাতপুর গ্রামের অধর বিশ্বাসের নেতৃত্বে আত্মোন্নতি ও আত্মসম্মান আন্দোলন চলতে থাকে। তাঁরা নমঃশূদ্র সমাজের প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলেন।[৯]

১৯০৬ এর জনসভা

১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন কল্পে ফরিদপুরের ওড়াকান্দিতে ব্রজেন্দ্রনাথ মণ্ডলের সভাপতিত্বে নমঃশূদ্রগণের এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। নমঃশূদ্র জাতির সমাজ উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধিকল্পে শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুরের সৌজন্যে ওড়াকান্দি থেকে 'নমঃশূদ্র সুহৃদ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত (১৯০৬) হয়। পত্রিকায় বঙ্গভঙ্গের পক্ষে নমঃশূদ্রদের প্রতিবাদী বক্তব্যসমূহ প্রকাশিত হতে থাকে। নমঃশূদ্রদের এই বিরোধীতার কারণে কংগ্রেসিদের দ্বারা নমঃশূদ্র কর্মীবৃন্দ নিগৃহীত হতে থাকায় এই পত্রিকার মাধ্যমে নমঃশূদ্র নেত্রীবৃন্দ বর্ণ হিন্দুদের বিরুদ্ধে এক সর্বাত্মক বয়কটের ডাক দেন। এই পর্বেই সরকারি চাকরিতে মুসলমানদের ন্যায় নমঃশূদ্ররাও সংরক্ষণ দাবি করেন। ১৯০৭ সালে ব্রিটিশ সরকার 'সরকারি নিয়োগে জাতি সমূহের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব' আইন ঘোষণা করেন। ফলে সদ্যশিক্ষিত কতিপয় নমঃশূদ্র যুবক প্রথম সরকারি চাকুরী লাভের সুযোগ পান। তাতে নমঃশূদ্র সমাজ অনুপ্রাণিত হয়। প্রথম বিভক্ত বঙ্গে মুসলমানদের সঙ্গে নমঃশূদ্র বা অনুন্নত হিন্দুদের এটাই ছিল প্রথম চাকরীতে সংরক্ষণের সুযোগ।

১৯০৮ এর সম্মেলন

১৯০৮ সালে যশোহরের নড়াইলে নমঃশূদ্র জাতির এক বিরাট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনেই সংগঠনের ব্যয় ও জাতির উন্নতির জন্য একটি স্থায়ী 'নমঃশূদ্র তহবিল' গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই অনুযায়ী গ্রামবাসীদের কাছ থেকে মুষ্টিভিক্ষার চাউল সংগ্রহ করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয় গ্রাম সমিতিগুলির ওপর। গ্রামসমিতির সদস্য চাঁদা ছিল এক আনা, ইউনিয়ন সমিতির চাঁদা দুই আনা ও জেলা কমিটির চাঁদা চার আনা ধার্য করা হয়। বিবাহ বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে যা ব্যয় হবে তার তিন শতাংশ তহবিলে জমা দেওয়ার সিদ্ধান্তও এখানে ঘোষিত হয়।[১০] নবগঠিত এই সব সমিতির সংগঠিত কার্যক্রমের ফলে নমঃশূদ্র সমাজে একটা প্রবল উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। ১৯০৯ সালে

মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইনে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের দাবি গৃহীত হওয়ায় নমঃশূদ্র নেতৃবর্গও অস্পৃশ্যদের জন্য পৃথক নির্বাচনের দাবি জানায়। ১৯১১ সালে দীর্ঘ তিরিশ বছরের দাবি জয়যুক্ত হয়। ১৯১১ সালের জনগণনায় 'চণ্ডাল' নামটির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটিয়ে নমঃশূদ্রদের জাতিপরিচয়ে শুধুমাত্র 'নমঃশূদ্র' লেখা হয়।

বঙ্গীয় নমঃশূদ্র সমিতি (১৯১২)

১৯১২ সালে নমঃশূদ্র প্রতিনিধিগণ গভর্ণর লর্ড কারমাইলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে নমঃশূদ্র জাতির প্রতি সরকারি সহায়তা প্রার্থনা করে একটা স্মারকলিপি প্রদান করেন। ১৯১২ সালে ২২টি জেলার প্রতিনিধি নিয়ে 'বঙ্গীয় নমঃশূদ্র সমিতি নামে' সংগঠন তৈরি হয়। এই সংগঠনের মধ্য দিয়ে গ্রামে গ্রামে নমঃশূদ্র সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা শুরু হয়। যশোহর জেলায় গড়ে ওঠে এগারো গ্রাম, ছাপ্পান্ন গ্রাম, ছিয়ানব্বই গ্রাম ও একশো সাতাশ গ্রাম নামে বিশিষ্ট নমঃশূদ্র সমিতি। এর মধ্য দিয়ে অস্পৃশ্যতা বিরোধী জাতি মর্যাদা পুনরুদ্ধারের আন্দোলন ক্রমে জাতির সার্বিক বিকাশের আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়।

নিখিলবঙ্গ নমঃশূদ্র সমিতি (১৯১৫)

১৯১৪ সালে রাজনৈতিক নেতা মুকুন্দবিহারী মল্লিকের সুযোগ্য সম্পাদনায় নমঃশূদ্র জাতির মুখপত্র হিসাবে 'পতাকা' নামে পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি নমঃশূদ্র জাতির রাজনৈতিক চিন্তাধারার বাহক হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। ১৯১৫ সালে মুকুন্দবিহারী মল্লিকের সভাপতিত্বে 'নিখিলবঙ্গ নমঃশূদ্র সমিতি' নাম দিয়ে নতুন করে নমঃশূদ্র জাতীয় সংগঠন তৈরী হয়। ১৯২৩ সালে 'নিখিলবঙ্গ নমঃশূদ্র সমিতি'র উদ্যোগে খুলনার টাউন হল ময়দানে গুরুচাঁদ ঠাকুরের সভাপতিত্বে নমঃশূদ্র জাতির এক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে গুরুচাঁদ ঠাকুর সদর্পে ঘোষণা করলেন,

"আত্মোন্নতি, অগ্রভাগে প্রয়োজন তাই।
বিদ্যাচাই, ধনচাই, রাজ কার্য চাই।
সাগর ডিঙ্গাতে চাই,
দেখি সেথা কিবা পাই।
হতে চাই জজ, ব্যরিস্টার।"[১১]

গুরুচাঁদ ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন, নিম্নবর্ণের সমাজের মানুষরা শিক্ষার্জন করার জন্য বিদেশে গমন করবে, তাঁরা বিদেশী ডিগ্রীতে সম্মানিত হবেন।[১২] সমগ্র পূর্ব ভারত জুড়ে নমঃশূদ্র জাগরণ আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি পায়। নিখিলবঙ্গ নমঃশূদ্র সমিতি ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বরে পুনা চুক্তির সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করে স্বতন্ত্র নির্বাচকমন্ডলী ও সংখ্যার অনুপাতে তপশিলি সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষণের দাবি জানাতে থাকে। সমিতি মনে করে এই চুক্তিতে ভারতীয় সমাজের লক্ষ লক্ষ অস্পৃশ্য মানুষের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে। তবে পুনা চুক্তি বাতিল করা সম্ভব নয় দেখে নিখিলবঙ্গ নমঃশূদ্র সমিতি পরবর্তীকালে অনিচ্ছা সত্ত্বেও চুক্তিটিকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।[১৩]

১৯৩৩ সালে প্রচুর উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে বরিশাল টাউন হলে বঙ্গীয় নমঃশূদ্র সমিতির দুদিনব্যাপী প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সমাজের অনেক গুণী ব্যক্তি ছাড়াও সাধারণ মানুষজন স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন।

হরিগুরুচাঁদ মিশন (১৯৩২) ও মতুয়া মহাসংঘ (১৯৩৩)

গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে ১৯১৫ সাল থেকে ওড়াকান্দি ও অন্যান্য অঞ্চলে তাঁর অনুগামীরা মতুয়া সংঘ বা মতুয়াদল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯২৩ সালে গুরুচাঁদ ঠাকুর খুলনা জেলার মতুয়াখালি গ্রামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই আশ্রমের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নমঃশূদ্র তথা নিম্নবর্ণের মানুষের সামাজিক প্রগতি, শিক্ষাবিস্তার, ও মতুয়া ধর্মের প্রসার ঘটানো। মতুয়াধর্মের কেন্দ্রীকরণ এবং সাংগঠনিক গুরুত্ব অনুধাবন করে আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে ওড়াকান্দিতে 'শ্রী শ্রী হরিগুরুচাঁদ মিশন' নামে মতুয়া কেন্দ্রীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের সংঘাধিপতি, সভাপতি, সহ সভাপতি ও সম্পাদক হয়েছিলেন যথাক্রমে গুরুচাঁদ ঠাকুর, প্রমথরঞ্জন ঠাকুর, গোপাল সাধু, ও মহানন্দ হালদার। ১৯৩৩ সালে গুরুচাঁদ ঠাকুর নিজেই এই মিশনের নাম পরিবর্তন করে 'মতুয়া মহাসংঘ' নামকরণ করেছিলেন। ১৯৪৩ সালে এটি সরকারি নথিভুক্ত হয়।[১৪] প্রমথরঞ্জন ঠাকুর এই মহাসংঘের সঙ্ঘাধিপতি হন। মতুয়া মহাসংঘের বিভিন্ন বিষয় আলোচনার জন্য প্রতি বুধবার শান্তি সভার আয়োজন করা হত। এই সংঘ জাতি বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে বিপন্ন আর্তদের সেবা করা, অসহায় বিধবাদের জন্য আশ্রম তৈরি, দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা, দুর্ভিক্ষ, বন্যাপীড়িত ব্যক্তিদের সাহায্য এবং পল্লী সংস্কার সাধনে যুক্ত হয়েছিল।[১৫] ১৯৪৭ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী ওড়াকান্দি মতুয়া মহাসংঘের সাধারণ সভায় ৫৬জন গোঁসাই ও ৬১জন প্রচারক ও ধার্মিক বক্তার নাম পাওয়া যায়।[১৬] প্রমথরঞ্জন ঠাকুরের সভাপতিত্বে উক্ত সভায় মতুয়া মহাসংঘের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছিল 'শ্রী শ্রী হরি-গুরুচাঁদের ক্রমবর্ধমান ভক্ত সম্প্রদায়কে সুপরিচালনার দ্বারা তাঁহাদিগকে আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক জীবনে উন্নত করিয়া শান্তির পথে অগ্রসর করা ও মানব জীবনে পূর্ণতা লাভে সাহায্য করা'।[১৭]

গুরুচাঁদ ঠাকুরের ইচ্ছানুযায়ী ১৯৩৮ সালে মতুয়াখালি গ্রামে 'শ্রী শ্রী হরি-গুরুচাঁদ আশ্রম ও ছাত্রাবাস' তৈরি হয়েছিল। এই আশ্রমবাসী ছাত্রদের বেশীরভাগই ছিল মতুয়া অনুগামী। গৌরাঙ্গ সাধু ঠাকুরের বক্তব্য থেকে জানা যায় মতুয়খালি আশ্রমে থেকে পড়াশুনা করা ২৩জন ছাত্র এবং ধর্ম প্রচারক সাধুগণ মতুয়া ধর্ম বিস্তারে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন।[১৮] আবার হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মতিথি কেন্দ্রিক 'বারুণী মেলা ও 'ছায়া বারুণী' মেলাকে কেন্দ্র করে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে মতুয়া ভক্তগণ নিজেদের ঐক্যবদ্ধ মতুয়া দল নিয়ে হাজির হন।[১৯] স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে ওড়াকান্দি কেন্দ্রিক মতুয়া ধর্ম আন্দোলন চলতে থাকে। গুরুচাঁদ পরবর্তী সময়ে তাঁর চারপুত্রের মধ্যে শশীভূষণের পুত্র প্রমথরঞ্জন ঠাকুর এবং সুধন্যকুমারের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীপতি ঠাকুরই

(ছোটবাবু) মতুয়া ধর্ম আন্দোলন চালনার নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। স্বাধীনতার পূর্বে ১৮৮১ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ এবং কলিকাতার ডালহৌসী ইনস্টিউট, কলেজ স্কোয়ার স্টুডেন্ট হল প্রভৃতি স্থানে ৩০টি উল্লেখযোগ্য সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[২০]

বঙ্গভঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে নমঃশূদ্র সংগঠনের সম্প্রসারণে মতুয়া মহাসংঘ

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগ জনিত কারণে বাংলা বিভাজিত হলে প্রমথরঞ্জন ঠাকুর নমঃশূদ্র তথা মতুয়া ভক্তদের পশ্চিমবঙ্গে চলে আসার আহ্বান জানান। কিছু সংখ্যক মতুয়া ভক্ত পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে তবে একটি বড় অংশ পূর্ববঙ্গে থেকে যায়। পূর্ববঙ্গে ওড়াকান্দিতে 'মতুয়া মহাসংঘের' নেতৃত্বে ধর্ম ও সামাজিক আন্দোলন চলতে থাকে। এখানে শ্রীপতি ঠাকুরের নেতৃত্বে এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী 'ছোট মা'র নেতৃত্বে মতুয়া আন্দোলন চলতে থাকে। শ্রীপতি ঠাকুরের তিনপুত্র অংশুপতি, শচীপতি এবং হিমাংশুপতি পারিবারিক দিক দিয়ে মতুয়া আন্দোলন পরিচালনায় যোগ্য সহযোগিতা করেছেন। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে আগত নমঃশূদ্র তথা মতুয়াদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য প্রমথরঞ্জন ঠাকুর উত্তর ২৪ পরগনার ঠাকুরনগর কলোনী স্থাপন করেন এবং সেখানে মতুয়াদের জন্য নতুন করে 'মতুয়া মহাসংঘ' প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে প্রমথরঞ্জন ঠাকুর নমঃশূদ্রদের একত্রিত করে তাঁদের ধর্মীয়, আত্মিক ভাব বিনিময় ও মিলনক্ষেত্র নির্মাণের চেষ্টা করেন।

পশ্চিমবঙ্গে ঠাকুরনগরে প্রতিষ্ঠি 'মতুয়া মহাসংঘ'ই হল মতুয়াদের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান। প্রমথরঞ্জন ঠাকুর ছিলেন যার সংঘাধিপতি। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রমথরঞ্জন ঠাকুর এবং 'বড়মা' বীণাপানি দেবীর উপস্থিতিতে, গোপাল সাধু, মহানন্দ হালদার, বিধুভূষণ বিশ্বাস, হাজারীলাল মন্ডল, নকুল সাধু, যাদব বিশ্বাস, উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, বিশ্বেশ্বর হালদার, হরিনাথ রায় প্রমুখ প্রায় ৫০০জন ভক্ত মিলে 'খড়ের ঘরে হরি মন্দিরে হরিচাঁদ ঠাকুর ও শান্তি মাতার ফটো বসিয়ে ঠাকুরনগরকে মতুয়াদের মিলনতীর্থ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন'।[২১] ১৯৪৭ সাল থেকে ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে রাজার মাঠের কালাচাঁদ বিশ্বাসের চেষ্টায় প্রতি বুধবার 'শান্তি সভা' অনুষ্ঠিত হত। বগুলার কেশব গোঁসাই, ঘোষপুরের শরৎ ঠাকুর, বিনোদ মিস্ত্রী, নতুন ঠাকুর, উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস প্রমুখের পরিচালনায় বিভিন্ন সময় 'শান্তি সভার' আলোচনায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন উদ্বাস্তু কলোনীতে ছড়িয়ে থাকা মতুয়া ভক্তদের সমস্যা ও সমাধানের বিষয় নিয়ে আলোচনা হত। ১৯৪৭ সালে হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মোৎসবের সময় প্রমথরঞ্জন ঠাকুর 'মতুয়া মহাসংঘের' পুনর্গঠন করেন।[২২] মহাসংঘের পারিবারিক কর্তৃত্ব মহাসংঘ পরিচালনায় গণতান্ত্রিক নীতি নির্ধারণ, মতুয়া মহাসংঘ প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে তৎকালীন মতুয়া মহাসংঘের নেতৃত্ব স্থানীয় ভক্ত প্রচারক মহানন্দ হালদার, নিত্যানন্দ হালদার, মৃণাল বিশ্বাস, সুধীরকুমার বাগচী প্রমুখ ঐক্যমতে পৌঁছাতে ব্যর্থ হন। এই বাক্‌বিতণ্ডাকে কেন্দ্র করে ১৯৬৫ সালের মে মাসে

মহানন্দ হালদার মতুয়া মহাসংঘর বিকল্প রূপে নদীয়ার পলাশীর বড়চাঁদ ঘরে প্রতিষ্ঠা করেন 'হরিচাঁদ সেবা সংঘ'।[২৩] গুরুচাঁদ নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে মতুয়া ধর্মবিস্তার, শিক্ষা প্রসারে ছাত্রাবাস তৈরি ও নমঃশূদ্রদের সার্বিক উন্নয়ন করাই ছিল এই সেবা সংঘের মূল উদ্দেশ্য।

'মতুয়া মহাসংঘ' ও 'হরিচাঁদ সেবা সংঘ'কে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য প্রমথরঞ্জন ঠাকুর ১৯৬৫ সালেই একটি সাধারণ সভার আহ্বান করেন। তিনি সেবা সংঘের সদস্যদের ঐক্যবদ্ধভাবে মতুয়া মহাসংঘের আন্দোলন পরিচালনায় সামিল হওয়ার প্রস্তাব আনেন। এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নির্ধারিত নতুন কমিটিতে স্থান পান প্রমথরঞ্জন ঠাকুর (সংঘাধিপতি), সুধীরকুমার বাগচী (সভাপতি), সুশীলকুমার বিশ্বাস (সাধারণ সম্পাদক) এবং অধ্যাপক নরেশ দাস (সহ সভাপতি)। এই সভায় মহানন্দ হালদার উপস্থিত না থাকায় তাঁকে কার্যকারী কমিটিতে যুক্ত করা হয় নি। ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত সুধীরকুমার বাগচীর সভাপতিত্বে মতুয়া মহাসংঘের কার্যক্রম চলতে থাকে। সহ সভাপতি নরেশ দাস এবং সভাপতি সুধীরকুমার বাগচী মতুয়া মহাসংঘের কার্যক্রম প্রধানত শাখা বিস্তার, ছাত্রাবাস তৈরি এবং সমাজ সংস্কারমূলক পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিচালনার পক্ষপাতী ছিলেন। অন্যদিকে সাধারণ সম্পাদক সুশীল বিশ্বাস, নিত্যানন্দ হালদার প্রমুখরা মতুয়া মহাসংঘের কার্যক্রম স্বরূপ ধর্ম বিস্তার ও ধর্মীয় প্রচার আন্দলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে প্রয়াসী হন। ১৯৮৬ সালের শেষের দিকে মতুয়া মহাসংঘের কার্যকরী সমিতি পুনরায় গঠিত হয়। নিত্যানন্দ হালদার মহাশয় সাংগঠনিক সম্পাদক হিসাবে মনোনীত হন।[২৪]

অন্যদিকে নদীয়ার পলাশীর বড়চাঁদ ঘরে মহানন্দ হালদারের নেতৃত্বে নব প্রতিষ্ঠিত 'হরিচাঁদ সেবা সংঘ'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে পলতার শান্তি নগরে সুধীরকুমার বাগচী মহাশয়ের বাড়িতে আনুষ্ঠানিক সভার মাধ্যমে 'হরিচাঁদ সেবা সংঘের' নতুন কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সভাপতি সুধীর কুমার বাগচী, সহ-সভাপতি নরেশ চন্দ্র দাস, হরিশচন্দ্র বিশ্বাস সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।[২৫] ১৯৮৫ সালের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে এবং পশ্চিমবঙ্গের বাইরে নমঃশূদ্র অধ্যুষিত কলোনীগুলিতে মতুয়া ধর্মান্দলনের প্রসার ও বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক কার্যক্রম 'মতুয়া মহাসংঘ' এবং 'হরিচাঁদ সেবা সংঘ' এই দুটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চলে আসছে। উভয় সংঘই আঞ্চলিক শাখা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা এবং শাখা সংগঠনগুলির অনুমোদন দান করে থাকে। যে প্রবাহ আজও বিদ্যমান। মতুয়া মহাসংঘের অফিস রেজিস্টার থেকে জানা যায় ১৯৮৬ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত মোট ২১০টি শাখা সংঘ ছিল। ১৯৯২ সালে সেই সংখ্যাটা পৌঁছায় ৪২৩টিতে এবং ১৯৯৭ সালে এর সংখ্যা হয় ১০৮৫টি এবং ২০০০ সালে মতুয়া মহাসংঘের শাখা সংঘ হয় ২১৫১টি।[২৬] পশ্চিমবঙ্গে নমঃশূদ্রদের মাতৃসংগঠন স্বরূপ দুটি সংগঠন 'মতুয়া মহাসংঘ' ও 'হরিচাঁদ সেবা সংঘ' ভারতের

অন্যান্য রাজ্যেও নমঃশূদ্র কলোনীগুলিতে তাদের শাখা সংগঠন বিস্তার করার লক্ষ্যে আজও বদ্ধপরিকর।

পর্যবেক্ষণ

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় নমঃশূদ্ররা বিভিন্ন জাতি সংগঠন ও মতুয়া মহাসংঘের মাধ্যমে তাদের সম্মানজনক অবস্থানকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। হরিচাঁদ, গুরুচাঁদ প্রদর্শিত পথেই নমঃশূদ্র সমাজে জাতিচেতনার জাগরণ স্ফুরিত হয়েছিল। ফলে দেশভাগও তাদের ঐক্যে ফাটল ধরাতে পারেনি। ছিন্নমূল হয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসেও তারা নমঃশূদ্র চেতনার জাগরণে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিভিন্ন নমঃশূদ্র তথা মতুয়া সংগঠন। মতুয়াবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিম্নবর্ণীয় নমঃশূদ্র সমাজে জাতি চেতনার স্ফুরণ ঘটে, মতুয়া তাত্ত্বিকদের সমাজ গঠনের পরিকল্পনা, কৃষিকাজ ও গৃহকর্মের উন্নতিসাধন, শিক্ষাবিস্তার ও ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক সংস্কার বর্জন প্রভৃতি বিষয়গুলি সাধারণ মানুষের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল।

নমঃশূদ্র সমাজ ও সাহিত্য ক্ষেত্রে মতুয়াবাদের প্রভাবের ফলে উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে প্রতিবাদী চরিত্রে স্বতন্ত্র 'মতুয়া সাহিত্য সাংস্কৃতিক' ধারার জন্ম হয়েছে। বিভিন্ন মতুয়া তাত্ত্বিকরা এই ধারার মধ্যে চরিতামৃত কাব্য, জীবনীমূলক সাহিত্য, প্রবন্ধ, কাব্য, কবিতা ও সঙ্গীত অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এককথায় বলা যায় মতুয়া সাহিত্য সংস্কৃতি বাংলার দলিত সাহিত্য, সংস্কৃতিকে পুষ্ট করে বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতিকেই পূর্ণতা প্রদান করেছে। এগুলির পাশাপাশি মতুয়া মহাসংঘ নমঃশূদ্রদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে চলেছে। ১৯৫২ থেকে ২০২১ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে বলা যায়, এই মতুয়া মহাসংঘ রাজনৈতিক নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যার ফলস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গে নমঃশূদ্ররা মন্ত্রীসভায় গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রীত্বের আসন অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সবশেষে তাই বলা যায়, নমঃশূদ্র জাতি চেতনা প্রতিষ্ঠায় মতুয়া মহাসংঘের ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

তথ্যসূত্র:

১. ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারেও পশ্চিমবঙ্গে নমঃশূদ্রদের স্থান দ্বিতীয়। তাদের জনসংখ্যা ৩৫,০৪,৬৪২ জন।

২. E.A. Gait, *Census of India, Bengal, Part-1*, Calcutta: Secretariat Press, 1901, p. 395

৩. মনোশান্ত বিশ্বাস, *বাংলার মতুয়া আন্দোলনঃ সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি,* কলকাতা: সেতু প্রকাশনী, ২০১৬, পৃ. ১২৬।

৪. মহানন্দ হালদার, *শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ চরিত, ৪র্থ সংস্করণ,* ঠাকুরনগর: উত্তর ২৪ পরগনা, ২০০৬, পৃ.পৃ.১১০-১২০।

৫. *তদেব,* পৃ. ১২৪।

৬. *তদেব,* পৃ. ১৩০।

৭. নরেশ দাস, *নমঃশূদ্র সম্প্রদায় ও বাংলাদেশ,* কলকাতা: দীপালি বুক হাউস, ১৯৯৭, পৃ.পৃ.১৯-২২।

৮. বাদল কৃষ্ণ সরকার, 'সমাজ কল্যাণে গুরুচাঁদ', ঠাকুর, কপিল কৃষ্ণ (সম্পা)., *অন্ত্যজ সমাজ জাগরণের পথিকৃৎ গুরুচাঁদ ঠাকুর,* কলকাতা: চতুর্থ দুনিয়া, ১৯৯৭ পৃ. ৯৩।

৯. সুকৃতিরঞ্জন বিশ্বাস, *গ্রাম বাংলার রেনেসাঁসের জনক গুরুচাঁদ ঠাকুর,* মছলন্দপুর: রিপাবলিকান প্রকাশনী, ২০০১, পৃ. ২৪।

১০. বাদল কৃষ্ণ সরকার, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৮৯।

১১. তারকচন্দ্র সরকার, *শ্রী শ্রী হরিলীলামৃত, প্রথম সংস্করণ,* ওড়াকান্দি: বাংলাদেশ, ১৩২৩, পৃ. ৪৪২।

১২. *তদেব,* পৃ.পৃ. ৪৪৯-৪৫০।

১৩. http://bn.banglapedia.org/index.php, Access date, 18.03.2020.

১৪. *মতুয়া মহাসংঘ পত্রিকা, ১৪তম সংখ্যা,* ১লা পৌষ, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ, পৃ.পৃ. ১০-১১।

১৫. *'মতুয়া দর্পন'* পত্রিকা, বিশেষ স্মরণিকা সংখ্যা, ঢাকা: বাংলাদেশ, ১৯৯৩, পৃ.৪৪; কপিল কৃষ্ণ বিশ্বাস, *শ্রীধাম ওড়াকান্দি, ঠাকুরনগর ও মতুয়াদের নানা প্রসঙ্গ,* নিখিল ভারত, বামনগাছি : উত্তর ২৪ পরগনা, ২০১০. পৃ.পৃ. ৪৫-৪৬।

১৬. ওড়াকান্দি মতুয়া মহাসংঘের সভার কার্য্য বিবরণী, ৬ই জৈষ্ঠ্য, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ।

১৭. মনোশান্ত বিশ্বাস, *প্রাগুক্ত,* পৃ.৯৫।

১৮. *তদেব।*

১৯. নন্দদুলাল মোহান্ত, *মতুয়া আন্দোলন ও দলিত জাগরণ,* কলিকাতা: অন্নপূর্ণা প্রকাশনী, ২০০২, পৃ. ৬৮।

২০. সুকৃতিরঞ্জন বিশ্বাস, *প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ২৯১-২৯৬।

২১. কপিল কৃষ্ণ বিশ্বাস, *শ্রীধাম ওড়াকান্দি, ঠাকুরনগর ও মতুয়াদের নানা প্রসঙ্গ,* নিখিল ভারত, বামনগাছি : উত্তর ২৪ পরগনা, ২০১০, পৃ.৭৯।

২২. *তদেব,* পৃ. ৮৯।

২৩. *হরিচাঁদ সেবা সংঘ পত্রিকা,* এপ্রিল-জুন, দুর্গানগর: উত্তর ২৪ পরগনা, ২০০১, পৃ. ১৩।

২৪. *'অনুক্ত' ১২ তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা,* ১৪ই ফেব্রুয়ারী, হেলেঞ্চা: উত্তর ২৪ পরগনা, ২০০৭, পৃ. ৮।

২৫. *হরিচাঁদ সেবা সংঘ পত্রিকা,* এপ্রিল-জুন, দুর্গানগর: উত্তর ২৪ পরগনা, ২০০১, পৃ.পৃ. ১০-১১।

২৬. *মতুয়া মহাসংঘ পত্রিকা,* ৩৫ তম সংখ্যা, ১৯৯৬, পৃ.পৃ. ৩০-৩২।

বর্তমান ভারতবর্ষের দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার দার্শনিক ভাবনা ও তার প্রাসঙ্গিকতা

পায়েল গিরি
গবেষক, শিক্ষা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারাংশ: ভগিনী নিবেদিতা একজন অ্যাংলো আইরিশ বংশোদ্ভুত সমাজকর্মী, লেখিকা এবং স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা হিসেবে বেশি পরিচিত। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর থেকে তিনি মনস্থির করেন ভারতকে তাঁর কর্মক্ষেত্র হিসাবে মেনে নিতে। ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ নভেম্বর তিনি কলকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর সঙ্গে তিনি নানা ধরনের কল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। সকল বর্ণের ভারতীয় নারীর জীবন যাত্রার উন্নতির লক্ষ্যে তিনি কাজ শুরু করেন। অন্যদিকে বেগম রোকেয়া একটি বিখ্যাত মুসলিম পরিবারে জন্মেছিলেন এবং সারাজীবন কখনই মুসলিম ধর্মের আবেগ ও রীতি রেওয়াজ থেকে বেরিয়ে আসেননি বরং তিনি বিশ্বাস করতেন যে "ধর্মই হল জাতীয়তাবোধ, আধ্যাত্মিকতা, নৈতিক অগ্রগতির উৎস" ('মতিচূর', ২য় খণ্ড, প্রবন্ধ 'নূর'- ই- ইসলাম', পৃ. ৭১)। যদিও আজকের দিনে মেয়েরা অনেকাংশ ক্ষেত্রেই স্বাধীনতা লাভ করেছে। তবে তার বেশিরভাগই পুরুষ জাতির ইচ্ছা আর সহানুভূতির সার্বিক ক্ষমতায়নে সহায়ক নয়। তিনি লিখেছেন, "আমরা ভিক্ষা বা সহানুভূতি চাই না, আমরা চাই জন্মগত অধিকার, যা ইসলাম ধর্ম মহিলাদের ১৩০০ বছর পূর্বেই দেওয়ার কথা বলেছেন।" ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়া দুজনেই নারীদের ক্ষমতায়ন ও নারী কল্যান এর উপর অত্যাধিক গুরুত্ত আরোপ করেছিলেন। নারীর ক্ষমতায়ন এর পাশাপাশি সমাজের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সাম্প্রতিক বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যা যেমন দারিদ্র্য দূরীকরণ, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদির সমাধানে তাঁদের চিন্তা ভাবনার দূরদর্শিতা আজও সমভাবে প্রাসঙ্গিক। এই গবেষণা পত্রের মূল উদ্দেশ্য হল বর্তমান ভারতবর্ষের দারিদ্র্য দুরিকরন এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার দার্শনিক ভাবনা তুলে ধরা ও বর্তমান সমাজে তার প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে বের করা। মুখ্য ও গৌণ উভয় ধরনের তথ্য নিয়ে এই গবেষণাপত্রটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

মুখ্যশব্দ : ভগিনী নিবেদিতা, বেগম রোকেয়া, নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণ, সাম্প্রদায়িকতা।

ভুমিকা:

দারিদ্র্য দূরীকরণে নিবেদিতা ও রোকেয়ার ভাবনা :

একসময় ভারতবর্ষের বিপুল ধন সম্পদের প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে মধ্যপ্রাচ্য থেকে লুণ্ঠনকারীরা বারেবারে ভারতে এসেছিলেন এবং যথেচ্ছ ভাবে ধনরত্ন লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছেন। শেষ পর্যন্ত কিছু কিছু লুণ্ঠনকারী ভারতবর্ষেই স্থায়ীভাবে থেকে যান এবং ভারতের শাসনভার নিজেরা গ্রহণ করেন। মধ্যযুগ থেকেই ইংরেজ রাজত্ব পর্যন্ত শাসক শ্রেণী ভারতবর্ষে প্রজা সাধারণকে ছলে-বলে-কৌশলে যৎপরোনাস্তি শোষণ করেছেন। একই সঙ্গে ভারতীয়রা যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে তাই ভারতবর্ষের চিরন্তন শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেন। এর সবচেয়ে মারাত্মক প্রভাব পড়েছিল সাধারণ প্রজাবর্গ এবং মেয়েদের উপর। ক্রমশ মানুষ শিক্ষার আলোক থেকে দূরে সরে গিয়ে অশিক্ষা, কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার অতলে ডুবে যেতে থাকে। মানুষ শিক্ষার অভাবে প্রথমে চিন্তন শক্তি ও পরবর্তীতে কর্মশক্তি হারিয়ে দারিদ্র্যের কবলে পড়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত সর্বসাধারণ তথা মেয়েরা কর্মহীন হয়ে দারিদ্র্যকে বরণ করতে বাধ্য হয়। এই রূপ প্রেক্ষাপটে ভারতবর্ষে এসেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা এবং এখানেই জন্মেছিলেন বেগম রোকেয়া।

দারিদ্র্য দূরীকরণে নিবেদিতার ভাবনা :

নিবেদিতা যে সময় কলকাতায় আসেন তখন চারিদিকে অর্ধউলঙ্গ পুরুষ ও নারীর মধ্যে তিনি নিজেকে আবিষ্কার করেন। বঙ্গবাসীদের মধ্যে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, ধর্মান্ধতা এবং দারিদ্র্য ছিল রন্ধ্রে রন্ধ্রে। বিবেকানন্দের আন্তরিক আহ্বানে মার্গারেট নোব্‌ল এদেশে এসেছিলেন ভারতীয় ভাবে ভারতীয় মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটাবার লক্ষ্যে। স্বামীজীর কথায় শূদ্র ও নারী জাতির উত্থান ব্যতিরেকে দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। কারণ যে পাখির একটি ডানা কাটা গেছে সে তার অপর ডানাটির দ্বারা আকাশে উড়তে পারে না। সুতরাং নারী এবং শূদ্র জাতির উন্নয়ন ব্যতিরেকে ভারত রাষ্ট্রের উন্নতি সম্ভব নয়। বিবেকানন্দের এই সুদূর প্রসারী চিন্তা নিবেদিতার অন্তঃকরণকে স্পর্শ করেছিল। বিবেকানন্দ রূপ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সংস্পর্শে মার্গারেট নোব্‌ল ভগিনী নিবেদিতাতে পরিবর্তিত হলেন এবং নিজেকে পুরোপুরি ভারতীয় ভাবে গড়েপিটে নিতে লাগলেন। স্বামীজীর লক্ষ্য ছিল ভারতমাতার দারিদ্র্য দূরীকরণ। অর্থাৎ সমস্ত ভারতবাসী যেন দারিদ্র্যমুক্ত জীবন-যাপন করতে সমর্থ হয়। স্বামীজী বুঝেছিলেন এক দারিদ্র্য থেকে সমস্ত ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়। দেশের যুব সম্প্রদায়কে দারিদ্র্যের অভিশাপ মুক্ত করতে তাদের উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। আর এই কাজে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন মা-বোনেরা। কিন্তু এ জন্য মা-বোনেদের সুশিক্ষার প্রয়োজন।

নিবেদিতা বুঝেছিলেন কেবলমাত্র ভাষা শিক্ষা ও তাত্ত্বিক শিক্ষা দিয়ে মেয়েদের তথা বাঙালী সমাজের উন্নতি ঘটানো সম্ভব নয়। পরিবারে উন্নতি ঘটাতে গেলে মেয়েদের তাত্ত্বিক শিক্ষাদানের সাথে সাথে হাতে-কলমে প্রয়োগিক শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা ভগিনী অনুভব করেন। তাই মেয়েদের তিনি আচার তৈরী, বড়ি তৈরী, সূচি শিল্প, সেলাই এবং পরবর্তী সময়ে, রন্ধনশিক্ষা, বিভিন্ন ধরনের আলপনা, মাটির ছাঁচ, মাটির বেনেপুতুল, পুরান কাশ্মীরী শালের কাজ, কাঁথার কারুকার্য, ছবি আঁকা ও রং তুলির কাজ ইত্যাদি শেখানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। হাতে-কলমে এই প্রায়োগিক শিক্ষাদানের মাধ্যমে তিনি তার ছাত্রীদের স্বাবলম্বী এবং উপার্জনশীলা করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন কেবলমাত্র স্বামীর উপার্জনে সংসারে স্বচ্ছলতা আসবে না। সংসারকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে হলে স্বামীর পাশে থেকে স্ত্রীকে উপার্জন করতে হবে। আবার উপার্জনে সক্ষম নারী স্বাধীনতা, মুক্তি এবং ক্ষমতায়ন লাভ করতে পারে। মুক্তি বলতে এখানে অজ্ঞতা, ধর্মান্ধতা এবং কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে মহিলাদের স্বাধীনতার আলো দেখবার কথা বলেছেন। যুবক তরুণদেরও তিনি নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকার বিরোধী ছিলেন। সব সময় নিজের মনকে কোন কাজে নিবিষ্ট করে রাখতে পারলে মনের মধ্যে কুচিন্তা এবং অলসতার স্থান থাকবে না। দুপুরবেলা রান্নার শেষে মেয়েদের ঘুমানো অথবা গল্পগুজব ও পরচর্চা করবার তিনি বিরোধী ছিলেন। তাঁর মত ছিল ওই অবসর সময়টুকুতে মেয়েরা বড়ি, আচার, সূচের কাজ করলে সময় যেমন ভালোভাবে কাটবে তেমনি ওইগুলি বিক্রি করে মেয়েরা আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জন করবে। স্বাভাবিকভাবেই এরূপ মেয়েরা পরিবার তথা নিকট সমাজের দারিদ্র্য মোচনে সহায়ক হবে।

দারিদ্র্য দূরীকরণে রোকেয়ার ভাবনা :

বেগম রোকেয়ার সমাজ ভাবনার একটি অন্যতম দিক হল ভারতবাসী তথা বঙ্গবাসীকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা। নারীবাদী রোকেয়ার সমস্ত চিন্তা ভাবনা এবং কর্মকাণ্ড কেন্দ্রীভূত হয়েছে মেয়েদের শিক্ষা, ক্ষমতায়ন এবং মুক্তির লক্ষ্যে। মেয়েদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি কখনো কখনো পুরুষদের কথা বলেছেন, যদিও পুরুষদের নিয়ে রোকেয়ার সুস্পষ্ট কোন ভাবনা উঠে আসেনি। নারীবাদী রোকেয়া মেয়েদের কথা বললেও তিনি মূলত মুসলমান মেয়েদের কথাই বলেছেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর শিক্ষা ভাবনা, সমাজ ভাবনা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে মুসলমান মেয়েদের প্রসঙ্গই মূলত উঠে এসেছে। রোকেয়া বলেছেন, "...পুরা কালে যখন সভ্যতা ছিল না, সমাজ বন্ধন ছিল না তখন আমাদের (মেয়েদের) অবস্থা এরূপ ছিল না। কোন অজ্ঞাত কারণ বশত মানবজাতির এক অংশ (নর) যেমন ক্রমে নানা বিষয়ে উন্নতি করিতে লাগিল, অপর অংশ (নারী) তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেরূপ উন্নতি করিতে পারিল না বলিয়া পুরুষের সহচরী বা সহধর্ম্মিণী না হইয়া দাসী হইয়া পড়িল।" (রোকেয়া রচনাবলী, ২০০৬। পৃ. ১১-১২)

রোকেয়ার মতে মেয়েদের এই বিশ্বব্যাপী অধঃপতনের কারণ মেয়েদের সুযোগ-সুবিধা লাভের অভাব। ধীরে ধীরে মেয়েরা অক্ষম ও অকর্মণ্য হয়েছে। একসময়ে মেয়েদেরকে অলস ভিক্ষুকদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বহুকাল ধরে মেয়েরা দাসী থাকতে থাকতে দাসত্বে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং তাদের মন পর্যন্ত দাস (enslaved) হয়ে গিয়েছে। ফলে মেয়েরা আর সাহসী নয়, স্বাবলম্বী নয়। তারা এখন অযোগ্য, পরনিন্দাকারী, অপরের উন্নতিতে হিংসাকারী, মূর্খ এবং সবকিছুতেই তাদের অসন্তোষ। অনেকেই বলে থাকেন যে, মেয়েরা 'যুক্তি জ্ঞানহীন' (unreasonable)। অতিরঞ্জিত কথা বলা এবং মিথ্যা ভাষণ তাদের অলংকার হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুরুষের কাছে বঙ্গবালারা 'ক্ষীণাঙ্গী', 'কোমলাঙ্গী', 'অবলা', 'ভয়-বিহ্বলা'। পুরুষের অধিক যত্নে মেয়েদের ঘটেছে সর্বনাশ, তাই আজ বাংলার মেয়েরা যেন জড়পিণ্ড। এর ফলশ্রুতিতে মেয়েদের দেহে এবং মনে দারিদ্র্য আজ প্রকট।

বেগম রোকেয়ার মতে মেয়েরা যদি নিজেরা সচেষ্ট না হয়, নিজেদের উন্নতির দ্বার নিজেরা খুলতে এগিয়ে না আসে, ভাগ্যের উপরে নিজেদের ভবিষ্যৎকে ছেড়ে দেয় তাহলে তারা পুরুষের ধন হয়ে থেকে যাবে। স্বাধীনতা, ওজস্বিতা এবং উপার্জনের শক্তি অর্জন করতে অপারগ হবে। যতক্ষণ না মেয়েরা যুগোপযোগী শিক্ষা লাভ করে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের জন্য সচেষ্ট না হবে ততক্ষণ তারা দরিদ্র থাকবে। এই প্রসঙ্গে রোকেয়া 'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধে লিখেছেন, "যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডী কেরানি হইতে আরম্ভ করিয়া লেডী ম্যাজিস্ট্রেট, লেডী ব্যারিস্টার, লেডী জর্জ– সবই হইব!

মেয়েরা যদি পুরুষদের সমকক্ষ হয়ে উপার্জন করে তাহলে পরিবারে দারিদ্র্য ভূষণ হয় না। যে সকল মেয়েরা শরীর এবং বুদ্ধিকে ব্যবহার করে উপার্জন করে তারা ধন উপার্জনের গুরুত্ব বোঝে এবং কাপড়, গয়না, দাস-দাসী ইত্যাদির পেছনে অনর্থক ব্যয় করতে অস্বীকার করে। সুতরাং মুসলমান পরিবার গুলিতে যদি দারিদ্র্যকে দূরীকরণের চেষ্টা করা হয় তাহলে মুসলমান মেয়েদের শিক্ষিতা হতেই হবে এবং উপার্জনের পথে অগ্রসর হতেই হবে। মেয়েদেরকেও কৃষিকার্যে অংশগ্রহণ করে শস্য উৎপাদন করতে হবে এবং অর্থ উপার্জনের জন্য সচেষ্ট হতে হবে। যে পরিবারের মেয়েরা শিক্ষিতা, পরিশ্রমী এবং উপার্জনশীলা সেই পরিবারে দারিদ্র্য বা অন্নকষ্ট বাসা বাঁধতে পারে না।

দারিদ্র্য থেকে মুক্তির জন্য রোকেয়া 'সুগৃহিণী' নামক নিবন্ধে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মেয়েদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন –

১. গৃহ যেমনই হোক তাকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলা সুগৃহিণীর কর্তব্য। আর এর জন্য প্রয়োজন মেয়েদের শিক্ষা। সুগৃহিণী পরিবারকে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত রাখতে সমর্থ হবেন।

২. পরিমিত ব্যয় করা সুগৃহিণীর একটি প্রধান গুণ। পুরুষরা বহু কষ্ট করে যে অর্থ উপার্জন করেন, শিক্ষিতা সুগৃহিণী সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করবেন, স্বামীর অল্প আয়ের জন্য কটু কথা বলবেন না, এরূপ শিক্ষিতা গৃহিণী দারিদ্র্যমুক্ত পরিবার তৈরী করতে সক্ষম।

৩. "স্বামীর আয় অনুসারে ব্যয় করাই অর্থের সদ্ব্যবহার।" (তদেব, পৃ. ৩৫)

৪. সুশিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে আমরা (গৃহিণীরা/মহিলারা) টাকার সদ্ব্যবহার শিখিব কিরূপে?" (তদেব) গৃহিণীর সুশিক্ষার অভাবে বহু প্রেমিক পুরুষের অনিষ্ট সাধিত হয়।

৫. শিক্ষিতা গৃহিণীর কেবলমাত্র রান্না শিখলেই চলবে না তাকে কিছুটা চিকিৎসা বিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, ধাত্রীবিদ্যা, খাবার স্থানের পরিবেশ, উদ্যানবিদ্যা, সেলাই, সূচিকার্য্য, পরিবারভুক্ত লোকদের সেবা যত্ন করা, রোগীর সেবা শুশ্রূষা ইত্যাদি গুণে গুণান্বিতা হতে হবে।

রোকেয়ার মতে শিক্ষা মেয়েদেরকে উপরের বিভিন্ন গুণাবলী অর্জনে সহায়তা করবে। মেয়েরা উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত না হলে সমাজও উন্নত হবে না। পরিবার ও সমাজের দারিদ্র্যও ঘুচবে না। তিনি লিখেছেন, "আমরা উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে সমাজ ও উন্নত হইবে না। যতদিন আমরা আধ্যাত্মিক জগতে পুরুষদের সমকক্ষ না হই, ততদিন পর্যন্ত উন্নতির আশা দুরাশা মাত্র। আমাদিগকে সকল প্রকার জ্ঞানচর্চা করিতে হইবে।" (তদেব, পৃ. ৪৫)

রোকেয়ার বিভিন্ন লেখা থেকে এটুকু স্পষ্ট যে মেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষা ছাড়া একটি সুস্থ-সুন্দর সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। শিক্ষিতা মেয়েরাই পারে দারিদ্র্যমুক্ত পরিবার ও সমাজ গড়ে তুলতে।

সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার চিন্তা ভাবনার দূরদর্শিতা:

বেগম রোকেয়া এবং নিবেদিতার চিন্তাভাবনা এবং সমাজদর্শন বর্তমান সমাজের সাম্প্রদায়িক হিংসার নিস্পত্তিকরণে কতখানি প্রাসঙ্গিক তা নিম্নে আলোচনা করা হল...
যখন বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং স্বার্থপরতায় মাতৃভূমি আচ্ছন্ন, তখন নিবেদিতা বলেছেন– "আমি বিশ্বাস করি ভারতবর্ষ এক, অখন্ড, অবিভাজ্য।" (তদেব, পৃ. ৫২) "জাতিগত, ভাষাগত অথবা রাজনৈতিক কোন একটি বিচ্ছিন্ন কাহিনী কখনো ভারতের প্রকৃত ইতিহাস হতে পারে না।" (তদেব, পৃ. ৫৪) "ভারতীয়দের ঐক্য সূত্রটি কোথায় রয়েছে? তা আছে জনগণের অন্তরের দেশপ্রেমে।" (তদেব) রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, "And Sister Nivedita has uttered the vital truths about Indian life." অর্থাৎ নিবেদিতা ভারতীয় জীবন সম্বন্ধে গভীর সত্য সমূহ উচ্চারণ করেছেন। ('The Web of Indian Life' গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন।)

নিবেদিতা পরোক্ষভাবেও সাম্প্রদায়িকতাকে স্বীকার করেননি। তিনি জাতীয়তাবাদে, ঐক্য ও অখণ্ড ভারতবর্ষের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই সংকীর্ণ হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও পার্সি ধর্মের বিভাজনকে আলাদা করে দেখেননি। তাঁর স্বচ্ছ, মুক্ত ও সত্য দৃষ্টি দিয়ে ভারতের জাতীয়তা স্পন্দনকে হৃদয়ে অনুভব করেছিলেন এবং তাকেই তুলে ধরেছিলেন তাঁর বজ্র-নির্ঘোষ বাণীতে।

নিবেদিতার মতে ভারতবর্ষ গড়ে উঠেছে গোষ্ঠীর পর গোষ্ঠী, সভ্যতার পর সভ্যতা, যুগের পর যুগ, বহিরাগত মানবগোষ্ঠীর বন্যা প্রবাহ মিলেমিশে এক হয়ে একটি জাতীয় সত্তায় পরিণত হয়েছে। তাই এই অখণ্ড, অবিভাজ্য ভারতবর্ষে জাতীয় চেতনা একটি সুরেই স্পন্দিত – সেখানে জাতির নামে, ধর্মের নামে সংকীর্ণ সম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নেই। নিবেদিতা সম্পূর্ণত জাতিভেদ প্রথা তথা সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণ ভাবনার বিরোধিতা করেছেন।

বেগম রোকেয়ার জন্ম এমন একটি সন্ধিক্ষনে হয়েছিল যখন সম্পূর্ণ দক্ষিণ এশিয়ার হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও রক্তক্ষরণের এক চূড়ান্ত অভিজ্ঞতা ছিল বেগম রোকেয়ার। এই সময় বাংলার স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৫-১৯১১) ও গান্ধিজীর স্বরাজ আন্দোললনের সময়, যে সময় ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি চূড়ান্ত টানাপোড়নের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল সেই সময় সমগ্র ভারতের রাজনীতি ছোট ছোট খন্ড শিবিরে বিভক্ত হয়ে ব্রিটিশ রাজকে উৎখাত করার জন্য সমগ্র শক্তি এক করে দেয় দেশীয় স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য। আর সেই সময় হিন্দু, মুসলিম, শিখ ও অন্যান্য ধর্মের মানুষেরা নিজেদের অধিকারের দাবীতে পরস্পরের মধ্যে দাঙ্গায় জড়িয়ে যায়, যার ফলস্বরূপ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদকে কেন্দ্র করে এক তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বেগম রোকেয়া তাঁর জীবনে অনেকগুলি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সাক্ষী হয়েছেন, যেমন-- ১৯৩০ সালের কানপুর দাঙ্গা, কাশ্মীর দাঙ্গা, এবং ভেলোরের সাম্প্রদায়িক হানাহানি—এই সবকিছুই ভারতের অখন্ডতা এবং শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে। বেগম রোকেয়া নিজে একজন মুসলমান মহিলা, তিনি নিয়মিত কোরান পড়তেন এবং কোরানের সারমর্ম থেকে নিজের আদর্শ গড়ে তুলেছিলেন এবং এই আদর্শকে সমাজকল্যানের জন্য ব্যবহার করতেন। তিনি কোরান পড়ে জানতে পারেন যে জাতির মুক্তি সম্পূর্ণভাবে মানসিক এবং সামাজিক স্তরে না হলে সমাজের সার্বিক বিকাশ সম্ভব নয়। বেগম রোকেয়া একজন মহান দেশপ্রমিকও ছিলেন। তিনি সারাজীবন ভারতীয় মূল্যবোধের চর্চা করেছেন এবং ভারতের ঐতিহ্যকে জাতীয় স্তরে উপস্থাপন করার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। একই রকম ভাবে তিনি তাঁর প্রবন্ধ 'সুগৃহিণী'-তে লিখেছেন, "...আমরা শুধু হিন্দু বা মুসলমান কিংবা পার্সি বা খ্রিস্টান অথবা বাঙালী, মান্দ্রাজী (মাদ্রাজী), মাড়ওয়ারী বা পাঞ্জাবী নহি– আমরা ভারতবাসী। আমরা সর্বপ্রথমে ভারতবাসী তারপরে মুসলমান, শিখ বা আর কিছু। সুগৃহিণী এই সত্য আপন পরিবার মধ্যে প্রচার করিবেন। তাহার ফলে তাঁহার পরিবার হইতে ক্ষুদ্র

স্বার্থ, হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি ক্রমে তিরোহিত হইবে এবং তাঁহার গৃহ দেবভবন সদৃশ ও পরিজন দেবতুল্য হইবে।" (রোকেয়া রচনাবলী, ২০০৬ পৃ. ৩৯-৪০)

হিন্দু মুসলমান শিখ নির্বিশেষে তিনি ধর্মকে সরিয়ে রেখে সমস্ত বাঙালী তথা ভারতবাসীকে পরস্পরের ভাই হিসেবে গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। তাঁর বিভিন্ন লেখার মধ্যে এই ভাবটি উঠে এসেছে। তাঁর কথায়, "...ধার্ম্মিক হও বা নাস্তিক হও, যাই হইতে চাও, তাহাতেই মানসিক উন্নতির (Mental Culture) প্রয়োজন।" (তদেব, পৃ. ৪১) তাঁর মতে সাম্প্রদায়িকতাকে সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দিতে হলে "শিক্ষা বিস্তারই এইসব অত্যাচার নিবারণে একমাত্র মহৌষধ।" (তদেব, পৃ. ২৪) আর এজন্য প্রথমে মেয়েদেরকে প্রকৃত সুশিক্ষা দিতে হবে– "যাহা তাহাদিগকে নাগরিক অধিকার লাভে সক্ষম করিবে।" (তদেব) সুতরাং রোকেয়ার মত ছিল ভারতবাসীকে সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হলে পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মুসলমান মেয়ে এবং মহিলাদেরও উপযুক্ত সুশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

উপসংহারঃ

বর্তমান ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল দারিদ্র্যতা এবং সাম্প্রদায়িকতা। সামগ্রিক ভাবে ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য এই দুই সমস্যার সমাধান একান্ত ভাবেই কাম্য। এই সমস্যার সমাধানে ভারতবর্ষের বিখ্যাত দুই মহীয়সী ব্যক্তিত্ত তথা ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার চিন্তা ভাবনা এবং তাঁর দূরদর্শিতা ভীষণ ভাবে প্রাসঙ্গিক। এই গবেষণা পত্রে তারই এক নিদর্শন তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া সাম্প্রদায়িক ঐক্যের কথা বলতে গেলে গান্ধিজির অমুল্য কথাটি না বললেই নয়---- "Always aim at complete harmony of thought and word and always aim at purifying yours thoughts and everything will be well."

তথ্যসূত্রঃ

- 'Karma- Yoga', *Complete Works of Swami Vivekananda,* vol- 1, P. 99
- Swami Lokeswarananda, (2018). Impact of Sister Nivedita on Indian Society, *কালোত্তীর্ণ নিবেদিতা। রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সিটিউট অফ কালচার, গোলপার্ক।* পৃ. ৩০৫
- বিষ্ণুপদ নন্দ, *সমকালের প্রেক্ষিতে আলোর দ্যুতি নিবেদিতা,* লালমাটি, যন্ত্রস্থ
- বিষ্ণুপদ নন্দ (যন্ত্রস্থ)। তদেব।
- বিষ্ণুপদ নন্দ (যন্ত্রস্থ)। তদেব।
- বিষ্ণুপদ নন্দ (যন্ত্রস্থ)। তদেব।
- বিষ্ণুপদ নন্দ (যন্ত্রস্থ)। তদেব।

- শঙ্করীপ্রসাদ বসু (তৃতীয় খণ্ড), লোকমাতা নিবেদিতা, পৃ. ৪৮-৪৯
- শঙ্করীপ্রসাদ বসু (তৃতীয় খণ্ড), তদেব।
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। God Gives, Man Robs, রোকেয়া রচনাবলী। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পৃ. ৪৯১
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব।
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। Letter to Mujibar Rahaman; R.S. Hossain, The Mussalman, Nov 30, 1917, রোকেয়া রচনাবলী। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পৃ. ৫২০
- মল্লিকা ব্যানার্জী (২০14)। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে দু একটি ভাবনা, *ইতিহাসে নারী শিক্ষা,* প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স। পৃ. ৫১
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। রোকেয়া রচনাবলী। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পৃ. ১১-১২
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব, পৃ. ২৪৯
- শামসুন নাহার (১৯৮৭)। রোকেয়া জীবনী। বুলবুল পাবলিশিং হাউস, শান্তিনগর, ঢাকা। পৃ. ২২
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব, পৃ. ২৩
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব, পৃ. ২৯০-২৯১
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব, পৃ. ৩২৯
- ‘পথে প্রান্তরে’(১৩.১২.১৯৯৮) । *দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা।*
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। রোকেয়া রচনাবলী। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পৃ. ৪৯১
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব, পৃ. ৩৯১
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব, পৃ. ২৫৭
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব, পৃ. ৩৮
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব, পৃ. ৩০
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব, পৃ. ৩৭
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব, পৃ. ৪২
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব, পৃ. ১০৬
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব, পৃ. ১১১-১১৫
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব, পৃ. ২৮৯
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব, পৃ. ৪৮৮
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব, পৃ. ২৮৯
- রোকেয়া জীবনী’, (২০০৯) সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ৬২-৬৩)

- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। রোকেয়া রচনাবলী। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পৃ. ১৩৩-৩৪
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব, পৃ. ১৪৭
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব, পৃ-১৫৩
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব, পৃ-৪০০
- গোলাম মুর্শিদ (১৯৯৩)। *নারী প্রগতির একশো বছরঃ রাস সুন্দরী থেকে রোকেয়া।* বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা পৃ. ১৫৫
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। রোকেয়া রচনাবলী। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পৃ. ১১-১২
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব, পৃ. ২১
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব। পৃ. ৩১-৩২
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব। পৃ. ৩৫
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব। পৃ. ৪৫
- প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা (সম্পাদনা) (২০১৭)। *নিবেদিতা : চিরন্তন প্রেরণা। শ্রী সারাদা মঠ, দক্ষিনেস্বর, কোলকাতা।* পৃ. ৫২
- প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা (সম্পাদনা) (২০১৭)। তদেব।
- প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা (সম্পাদনা) (২০১৭)। তদেব, পৃ. ৫৪
- প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা (সম্পাদনা) (২০১৭)। তদেব।
- সান্তনা দাসগুপ্তা (২০১৭)। নিবেদিতার ভারত চেতনা। *দক্ষিনেস্বর, কোলকাতা।* পৃ. ৬০
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। রোকেয়া রচনাবলী। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পৃ. ৩৯-৪০
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব, পৃ. ৪১
- আব্দুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব, পৃ. ২৪
- আব্দুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘ভীম বধ’ ; নাটকের মধ্যে নাটক

দিবাকর দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
সিকম স্কিলস ইউনিভার্সিটি

সারাংশ: বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, সাহিত্য সমালোচনার পাশাপাশি নাটক লিখে আমাদের বিস্ময়কর জগতে নিয়ে গিয়েছেন। তিনি জীবনী নাটক, কৌতুক নাটক, শিশুদের জন্য নাটক, গুরু রসাত্মক নাটক ও একাঙ্ক নাটক লিখেছেন। সেগুলির মধ্যে থেকে আমরা এই আলোচনায় 'ভীম বধ' একাঙ্ক নাটক নির্বাচন করেছি। আমাদের আলোচনায় ‘নাটকের মধ্যে নাটক’ বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। আমরা বলতে চেয়েছি দুই দৃশ্যের নাটক হলেও অভিনেতাদের মধ্যে যে নিরাপত্তাহীনতা এবং এর ফলে তাদের নিজের ইচ্ছে মতো চরিত্র নির্বাচন করা, সংলাপ নিজের মতো বলা, দৃশ্যপট নির্মাণ কাহিনী অনুযায়ী হয় না সব কিছুই নাটককে এক অন্য মাত্রা দিয়েছে। নাটকে উল্লিখিত চরিত্রগুলি পোশাক সজ্জাও নিজের ইচ্ছে মত করে। পরিচালক কোনো ভাবেই অভিনেতাদের অভিনীত চরিত্রে সম্পুর্ণরূপে জড়াতে পারছে না। বরং তারা তাদের উদ্ভটতত্ত্ব দিয়ে নাটককে একটি কমেডি নাটক সৃষ্টি করেছে। ফলে নাট্য পরিচালক যে উদ্দেশ্য নিয়ে দূর্যোধনের উরুভঙ্গ নাটক অভিনয় করাতে চেয়েছিলেন তা শেষ পর্যন্ত ভীম বধের নাটকে পরিনত হয়েছে। তবে পরিচালকের উপস্থিত বুদ্ধিতে মহাকাব্যের অন্যথা হয় নি। একমাত্র তারই সক্রিয় ভূমিকায় ভীম বধ না হয়ে দূর্যোধনের উরুভঙ্গ হয়েছে। মহাকাব্যের মান্যতা রক্ষা হয়েছে। দর্শকও চরম আনন্দ পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। আমাদের আলোচনা এইসব নিয়ে।

চুম্বক শব্দ: জঙ্গলের সিন- সিরিয়াস মানুষ- ক্যাজুয়াল- পুরোনো ট্যাঙক- জগঝম্প দাড়ি- ভীষ্মের শয্যা- কদম্ব বৃক্ষ- শঙ্খ চক্র- প্রম্পটার- কেলো-ভুলো-কলামুলো- অডিয়েন্স ভদ্রলোক- কালী কেত্তন।

মূল লেখাঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে একজন প্রাবন্ধিক,কথাসাহিত্যিক রূপেই অধিক পরিচিত। উপন্যাস এবং ছোটগল্প রচনায় তিনি বিষ্ময়কর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। একজন সফল জনপ্রিয় অধ্যাপক,লব্ধ প্রতিষ্ঠ সমালোচক,কবি,নাট্যকার। তাঁর প্রকৃত নাম তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ‘নারায়ণ’ তাঁর সাহিত্যিক ছদ্মনাম। ১৯১৮ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি দিনাজপুর জেলার বালিয়াডিঙ্গিতে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। দারোগা হিসাবে কর্মরত পিতা প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের আদি নিবাস ছিল বাংলাদেশের বরিশাল জেলার বাসুদেব পুরের নলচিরায়।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যচর্চা শুরু হয় ছাত্রজীবনে কাব্য রচনার মধ্য দিয়ে। পরবর্তীতে তিনি গল্প,উপন্যাস,প্রবন্ধসহ সাহিত্যের বেশ কিছু শাখায় বিচরণ করেন। 'শণিবারের চিঠি' পত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। জীবনের শেষ সময়ে 'দেশ' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকায় 'সুনন্দ' ছদ্মনামে লেখেন। তাঁর আর একটি বিশেষ পরিচয় হলো তিনি একজন সফল নাট্যকার। 'ভ্রমর' তাঁর লেখা প্রথম নাটক। এছাড়াও বহুবিধ নাটক তিনি রচনা করেছেন। যেমন-জীবনীনাট্য, কৌতুক রঙ্গমূলক নাটক,শিশু নাট্য, গুরু রসাত্মক নাটক, একাঙ্ক নাটক ইত্যাদি। আমরা তাঁর লেখা একটি বিখ্যাত নাটক 'ভীম বধ'-এ মহাভারতের উলোটপূরাণ করার চেষ্টা হলেও পরিণতিতে মহাভারতের কাহিনী কতখানি মান্যতা পেয়েছে সেই সব নিয়েই আলোচনা করার চেষ্টা করবো। মুল আলোচনায় যাওয়ার আগে নাটকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা জেনে নিই।

'ভীমবধ' নাটকে মাত্র ছয়টি চরিত্র-কালুদা,হারাধন,নিমাই,নিখিল,প্রম্পটার এবং পান্নালাল। নাটকে কোনো স্ত্রী চরিত্র নেই। সীমিত পরিসরে মাত্র দুই দৃশ্যপট সম্বলিত এই একাঙ্ক নাটকটি রচিত। দৃশ্যপট ও মঞ্চের বিবরণ যৎসামান্য। একটি থিয়েটারের মঞ্চ হল মূল নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্র। অথচ সেখানে টাঙ্গানো আছে একটি জঙ্গলের সিন। নাটকটির পরিচালক কালুদা। তিনি খুব ব্যতিব্যস্ত মানুষ,সিরিয়াস প্রকৃতির। মঞ্চের দৃশ্যপট দেখেই তিনি ভীষণ ক্ষুব্ধ। কারণ নাটকের বিষয়ের সঙ্গে তা সঙ্গতিপূর্ণ নয়। 'ভীমবধ'-এর প্রেক্ষাপট কুরুক্ষেত্রের রণভূমি, সেখানে অরণ্যের চিত্রপট কোন যুক্তিতে? হারাধন সিন টাঙিয়েছে। তার জবাব হলো হ্রদ সে কোথায় পাবে, কেমন ভাবে তা প্রস্তুত করবে? পরিচালক তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে দ্বৈপায়ন হ্রদের কথা, দুর্যোধনই বা আত্মগোপন করবে কোথায়? ক্ষিপ্ত হারাধন জবাব দেয় সে কি স্টেজ কেটে হ্রদ তৈরি করবে? তবে একটা সমাধানের কথা সে বলেছে,পরিচালক সম্মতি দিলে সে গঙ্গা জলের একটা পুরনো ট্যাঙ্ক নিয়ে আসতে পারে। যেখানে দুর্যোধন ঘাপটি মেরে বসে থাকতে পারবে। হারাধনকে রেগে মেগে তাড়িয়ে দেয় পরিচালক। মেনে নেয় অগত্যা অরণ্যের দৃশ্যপট দিয়েই কাজ সারতে হবে। লোকে ধরে নেবে দূর্যোধন জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করে বসেছিল। পরিচালক কালুদা খুবই চিন্তিত উত্তরাবে তো! কেননা রিহার্সালই তো ভালো করে হয়নি। অন্যান্য অভিনেতাদের খোঁজ পড়ে। একে একে তারা উপস্থিত হয় বিভিন্ন সজ্জায়। তাদের কেউই নিজ নিজ চরিত্রের সজ্জায় সজ্জিত নয়। যে যার ইচ্ছেমতো সেজেছে। নাটকের দাবির কথা কেউই ভাবেনি। পরিচালক কালুদা নাট্যাভিনয় সম্পর্কে যতটা সিরিয়াস,অন্যান্যরা ততটা নয়। সবাই বড় ক্যাজুয়াল। যেমন নিমাই ভীমের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে অথচ সে দিব্যি জগঝম্প দাড়ি লাগিয়ে বসেছে। মনে হচ্ছে যেন সে ধৃতরাষ্ট্রের ভুমিকায় অবতীর্ণ হতে চলেছে। এবারে নিমাই তার জগঝম্প দাড়ি লাগানো নিয়ে অকাট্য যুক্তি দেয়-

"বা রে দাড়ি গজাবে না? কদ্দিন ধরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ চলছে। দিন নেই,রাত নেই- খালি যুদ্ধ। এর মধ্যে ভীম কখন দাড়ি কামাবে শুনি! পরামানিক পাবে কোথায়?”

কালুদাও পাল্টা জবাব দেয়-

"এঃ- এঃ। খুব যে পন্ডিত হয়ে গেছিস। ভীম দাড়ি কামাবে কেমন করে? কেন, অর্জুন বাণ দিয়ে মেজদার দাড়ি কামিয়ে দেবে।"

নিমাই বিস্মিত হয়ে বলেছে,"বাণ দিয়ে?"

কালুদাও যুক্তি দেয়, "অমন ভীষ্মকে শর শয্যায় শুইয়ে দিতে পারল, আর দাদার দাড়ি কামাতে পারবে না?"

যাইহোক, এ পর্ব মেটার পর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে অকুস্থলে শ্রীকৃষ্ণের ভুমিকায় অবতীর্ণ নিখিলের। সে পরিচালকের কাছে জানতে চেয়েছে তার সাজ কেমন হয়েছে। কালুদা বক্রোক্তি করেছে, “এখন গিয়ে কদম্ব বৃক্ষে উঠে বসলেই হয়।” কালুদার প্রশ্ন কেন নিখিলের হাতে বাঁশি? মনে করিয়ে দিয়েছে যে, কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের হাতে শোভা পাচ্ছিল শঙ্খ, চক্র। নিখিল নিজের অপারগতা জানিয়েছে এবং বলেছে সে শাঁখ বাজাতে অক্ষম। হাতে শঙ্খ রাখার সঙ্গে বাজানোর প্রসঙ্গ আসে কি করে? তবে সে চক্রের একটা ব্যবস্থা করে ফেলবে বলে জানিয়েছে-‘দাদার সাইকেলের টায়ার’। কালুদা রেগে তাকে ফায়ার করতে চেয়েছে। নিমাই নিখিলের জুতোর প্রতি কালুদার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কালুদা হতবাক, নিখিলের পায়ে ডার্বি জুতো শোভা পাচ্ছে। নিখিল যুক্তি দেখায় তার পা মচকে গেছে। অন্য জুতো পড়লে পায়ে লাগে। তাকে জুতো খোলার নির্দেশ দেয় কালুদা। নিখিল জানিয়ে দেয় সেক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ খোঁড়া হয়ে নেঙচে নেঙচে হাঁটবে। কালুদার যুক্তি সেক্ষেত্রে দর্শক ধরে নেবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ আহত হয়েছেন।

শেষ মুহূর্তে পান্নালাল জানিয়েছে সে নাটকে অভিনয় করবে না। তার অভিনয়ের ভূমিকা চরিত্র দুর্যোধন। কিন্তু এতেই তার আপত্তি। নিমাই হবে ভীম যাকে কিনা সে এক ল্যাং মেরে পটকে দিতে পারে। ঐ শুঁটকো ফড়িংটা কিনা তার উরুভঙ্গ করবে! তার স্বাগোক্তি, “ঐ রোগা পটকা নিমেকে আমার উরু ভঙ্গ করতে দেব না”। তার আরও খেদোক্তি -

"উরু ভঙ্গ হয়ে আমি মাটিতে পড়ে হাহাকার করবো, আর নিমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তড়পাবে। জ্যাক দেখাবে। উঁহু! ইমপসিবল।"

এ পর্যন্ত গেল নাটকের প্রথমাংশ অর্থাৎ মূল অভিনয়ে অবস্থিত পূর্ববর্তী কালের ঘটনা। নাট্যাভিনয়ের সময়ও অনেক অকল্পনীয় মজাদার ঘটনার সাক্ষী আমরা থেকেছি। অভিনয় শুরু হয়েছে পান্নালালের সংলাপ দিয়ে। সংলাপ সে নিজের মতো করে নিয়েছে-

"আজি লুকাইয়া হ্রদে,
কুরুক্ষেত্র রণ হতে পলাতক আমি।“

এ পর্যন্ত ঠিক আছে, কিন্তু লক্ষনীয় পরবর্তী অংশ -

"না না এ তো হ্রদ নয়, এ যে বনভূমি!
কালুদা বলিয়াছে মোরে।"

কালুদা মানে পরিচালকের নাম উল্লেখিত হয়েছে। প্রম্পটার তাকে সতর্ক করে ঠিকমতো পাঠ করার কথা বলেছে। কিন্তু পান্নালাল তার প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছে তার প্রচন্ড প্রতিবাদ-

"চোপরাও। আমি দুর্যোধন,
ভাঙ্গিবে আমার উরু-
ওই নিমে?"

'নিমে' হলো ভীমের ভুমিকায় অভিনয় করা নিমাই। পরবর্তী সংলাপ আরও মজাদার -

"হাঃ-হাঃ-হাঃ-পায় অট্টহাসি -
আসুক অর্জুন এইখানে একবার।
পাবে টের মজা কারে বলে!"

বোঝা গেল এই সংলাপ তার স্বরচিত। নাটকের সংলাপ নয়। প্রম্পটার পান্নালালের এই অনাটকীয় বেয়াদবি সহ্য করতে পারেনি। সে অন্তরাল থেকে প্রায় মঞ্চে ঢুকে পড়েছে। পান্নালালকে ঠিকমতো পাঠ করতে ও সংলাপ বলতে বলেছে বারবার। পান্নালাল শোধরাবার নয়। সে নিজের মতো করে সংলাপ বলে গেছে-

"নিকালো হিঁয়াসে, মোরে দিবে উপদেশ। অর্বাচীন যত।"

খোঁড়াতে খোঁড়াতে শ্রীকৃষ্ণরূপী নিখিল মঞ্চে উপস্থিত হলে পান্নালাল তাকে নিয়ে শুরু করেছে ব্যঙ্গক্তি-

"খোঁড়া ল্যাং ল্যাং ল্যাং,
কার বাড়িতে গিয়েছিলি,
কে ভেঙেছে ঠ্যাং? হাঃ-হাঃ-হাঃ।

বলাবাহুল্য এসব অনাটকীয়,নিয়ম বহির্ভূত সংলাপ। প্রম্পটার এসে থামাতে চাইলে পান্নালালের জবাব-

"কি বারবার হাঁসের মতো করিস প্যাঁক প্যাঁক
বহু সহিয়াছি তোর এই ধৃষ্টতা রে বর্বর।
এইবারে পাবি সমুচিত প্রতিফল-"

সত্য সত্যই প্রম্পটার প্রতিফল পেয়েছে। পান্নালাল তাকে সজোরে পদাঘাত করেছে। প্রম্পটার পালিয়ে বেঁচেছে। এরপর পান্নালাল পড়েছে কেষ্টকে নিয়ে-

" তারপর খোঁড়া- কেষ্ট? কী মতলবে হেথা আগমন?"

কৃষ্ণরূপী নিখিল পান্নালালকে সচেতন করে দিয়েছে তার কারণে দর্শকমন্ডলী হাস্যরত। কিন্তু পান্নালালের তাতে কোন হেলদোল নেই।

"হাসুক হাসুক যত খুশি।
আমি নাহি করি ভয়।

রাজা দুর্যোধন আমি- হাতে মোর গদা।
ওরে, ল্যাং ল্যাং খোঁড়া কেষ্ট কি বুঝাস মোরে?"

কৃষ্ণরূপী নিখিল তার নির্দিষ্ট সংলাপ বলেছেন আর পান্নালাল বলে গিয়েছে---

" এঃ, খুব লেকচার দিচ্ছিস! তবু যদি খোঁড়া না হতিস। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ!"

নিতাইকে উপস্থিত হতে দেখে পান্নালালই তাকে সজোরে গদার ঘা দিয়েছে। আর সে বলেছে-

"রোগা পটকা নিমে ভাঙিবে আমার উরু।... তোর মতো অনেক ভীমকে আমি গিলে খেতে পারি।..."

এবারে নিখিল তার নির্দিষ্ট সংলাপ না বলে পরিবর্তিত সংলাপ বলে উঠেছে -

" এ কী কান্ড। দুর্যোধন-এ কী ব্যবহার?
কথা আছে ভীম ভাঙিবে তব উরু।
তুমি কেন ভাঙিতেছ পিঠ তার,
কহ, কোন অধিকার বলে হেন কার্য করিতেছ?

পান্নালাল নিখিলের পিঠে পদাঘাত করে বসেছে। আহত নিখিল দ্রুত মঞ্চ ত্যাগ করেছে। পান্নালাল তবু থামবার পাত্র নয়। সে বলতে থাকে-

"রেখে দে তোর কেলো, ভুলো, কলামুলো -পিটিয়ে পিটিয়ে তোকে করে দেব তুলো-"

শেষ পর্যন্ত পান্নালালকে সামলাতে স্বয়ং পরিচালককে মঞ্চে উপস্থিত হতে হয় এবং সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হয়। সে নিমাইকে আশ্বস্ত করে -

"ভয় নাই, ভয় নাই,ভীম বধ হতে নাহি দিব।
সৈন্যগণ- চেপে ধর এই পাষন্ড দুর্যোধনের ঠ্যাং -
ফেলে দাও চিৎ করে
অবিলম্বে ভূমিতলে।"

পান্নালাল নিরস্ত হয়। পরিচালক শেষ পর্যন্ত নাটকের শিরোনাম রক্ষা করে। পান্নালাল এবার দর্শকমুখী হয়ে বলতে থাকে -

> "দেখলেন মশাইরা, দেখলেন? ব্যাটা ভীমকে দিয়েছিলুম ঠাণ্ডা করে- সবাই মিলে কিভাবে আমায় বিধ্বস্ত করলে-দেখলেন? এটা কি রকম ব্যাভার হল, অ্যাঁ? ও মশাইরা, ও অডিয়েন্সের ভদ্রলোকেরা, দেখলেন তো একবার?"

কালুদাকেও পাল্টা বক্তব্য পেশ করতে হয়-

> "থাক-থাক, খুব হয়েছে! প্লে করতে এলুম দুর্যোধনের উরুভঙ্গ- বানিয়ে দিলে ভীম-বধ। এদের নিয়ে থিয়েটার মশাই? এর চাইতে খোল করতাল নিয়ে যদি কালী কেত্তন গাইতুম, অনেক ফল হত এর চেয়ে। থিয়েটার এই পর্যন্তই থাক। এই ড্রপ ফ্যাল। "

এই বক্তব্যে পরিচালকের স্বস্তির নিঃশ্বাস বের হয়।

দর্শকও নাটকের শিরোনাম রক্ষা পেয়েছে বলে স্বস্তি পায়। আসলে ছোটদের নাটক হিসেবে নাট্যকার এটি কমেডির স্বাদ দিয়েছেন। তবে এটি আসলে একটি পরীক্ষামূলক নাটক বলে মনে হয়। মহাভারত যদি এই নাটকে উল্লিখিত কাহিনি অনুসারে লেখা হতো তাহলে কেমন হতো সেটি যেমন নাট্যকার দেখতে চেয়েছেন, ঠিক তেমনই যদি নাটকের চরিত্রাভিনেতাদের নিজের চরিত্র, পোশাক, সংলাপ নিজেদেরকে নির্বাচন করতে হয় তাহলে কেমন হয় সেটিও নাট্যকার দেখতে চেয়েছেন। এই নাটকে আমরা দেখেছি পরিচালক যেভাবে নাটক পরিচালনা করতে চাইছেন তেমনটি হচ্ছে না। যেভাবে মঞ্চায়ন, দৃশ্যপট, চরিত্রানুসারে পোশাক, সংলাপ চেয়েছেন তেমনটি হয় নি। এমনকি নাটকের মূল বিষয় মহাভারত অনুসারে কৌরব শ্রেষ্ঠ দুর্যোধন বধ এবং তাকে বধ করবে দ্বিতীয় পান্ডব ভীম সেটিও দুর্যোধনরূপী পান্নালালের সৌজন্যে উল্টে গিয়ে দুর্যোধন ভীমকে বধ করে দিচ্ছিল। যাইহোক পরিচালকের উপস্থিত বুদ্ধিতে মহাকাব্যের অন্যথা হয় নি।

এছাড়াও নাটকের মধ্যে বেশ কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাই যা নাট্যকারকে একজন সফল নাট্যকার করে তুলেছে। সেগুলি যথাক্রমে -

১. পৌরাণিক নাটকের আদলে লেখা হলেও সংলাপ, কাহিনী ও অভিনয় কৌশলে বাস্তবধর্মী নাটক হয়ে উঠেছে।
২. 'ভীমবধ' নাটকখানি স্বল্প দৈর্ঘ্যের একাঙ্ক নাটক।
৩. পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এই নাটক সম্পূর্ণ নারী চরিত্র বর্জিত।
৪. সংলাপ ও কাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও অভিনয় এই নাটকের সাফল্যের চাবিকাঠি। সংলাপ উচ্চারণের সময়জ্ঞান নাটককে সফল করে তোলে।
৫. সবকটি চরিত্রের মধ্যে উদ্ভটত্ত্ব নাটকে কমেডি সৃষ্টি করেছে।
৬. তথাকথিত নাটকের টাইপ চরিত্রের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।
৭. সংলাপ হাস্যরসাত্মক হলেও তেমন শাণিত নয়।
৮. নাট্যকার কমেডি নাটক লেখার আগ্রহ নিয়ে লিখলেও কৌতুকের পরিমাণ তুলনামূলক কম পাওয়া যায়।
৯. আলোচ্য নাটকে কোনো তত্ব বা উপদেশ মেলে না।
১০. চরিত্র অনুযায়ী সংলাপের ভাষা পরিবর্তন হয় নি।
১১. নাটকের নামকরণ 'ভীম বধ' হলেও আসলে দুর্যোধন বধই নাটকের মূল উদ্দেশ্য।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি, নাট্যকার বাংলা নাট্যসাহিত্যে অভিনব চিন্তা ভাবনা প্রয়োগ করেছিলেন। অনেক সময় কিছু না বলেও গভীর বার্তা,কখনও কখনও মুক্ত চিন্তার,কখনও কখনও চরিত্রের মধ্যে ক্রাইসিস প্রকাশ করে। আলোচ্য নাটকে তা ফুটে উটেছে। যাইহোক,আলোচ্য নাটকের পাঠ করতে

করতে বা অভিনয় দেখতে দেখতে আমাদের ভীষণ বাস্তব লেগেছে। কখনও মনে হয় না আমরা তথাকথিত কোনো নাটক পড়ছি বা দেখছি। তাই এই আলোচনার শিরোনাম নাটকের মধ্যে নাটক সঠিক হয়েছে বলে মনে হয়।

সাহায্যকারী গ্রন্থ:

১. বন্দ্যোপাধ্যায় সৌরভ(সম্পাদক),প্রথম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি,২০১৩,হাফ চকলেট কলাভৃৎ পাবলিশার্স,পরিবেশক, নব গ্রন্থ কুটির, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৬১ থেকে ৭০।

২. ভট্টাচার্য ড:সাধন কুমার, প্রথম সংস্করণ, ২০১৬ ,নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার; প্রজ্ঞাবিকাশ।

৩. ঘোষ ড:অজিত কুমার, জানুয়ারি, ২০০৫, বাংলা নাটকের ইতিহাস,দে'জ পাবলিশিং।

৪. হোসেন ও ইসলাম,সেলিনা ও নুরুল(সম্পাদক), ফেব্রুয়ারি,১৯৯৭,বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান,বাংলা একাডেমী, কলকাতা,পশ্চিম বঙ্গ।

৫. সাহা কমল (সম্পাদক), বিশ্বনাট্য দিবস,২৭ মার্চ ,২০১২ বাংলা নাট্যকোষ (১৭৯৫-২০১০); বাংলা নাট্যকোষ পরিষদ ও সপ্তর্ষি প্রকাশন।

৬. বাংলা পিডিয়া।

নারীর কলমে নারীকণ্ঠ : প্রসঙ্গ রাসসুন্দরী দাসীর ‘আমার জীবন’

অরবিন্দ সরকার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : আজকের দিনে দাঁড়িয়ে মেয়েরা যে এতটা স্বাধীন, স্বচ্ছন্দ, স্বতঃস্ফূর্ত— এমনকি পুরুষদের সঙ্গে সমানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে— এই পথটা কি এতটা সহজ ছিল? সেকালের দিকে ফিরে তাকালে দেখতে পাই মেয়েদের অবহেলিত, লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত, পদদলিত, অশিক্ষিত, অবগুণ্ঠিত, সর্বোপরি পরাধিনতার এক জ্বলন্ত চিত্রকে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েরা পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মতো মুক্ত আকাশে মুক্তির জন্য ডানা ঝাপটালেও মুক্তির স্বাদ তারা পায়নি। এমত অবস্থায় দাঁড়িয়ে রাসসুন্দরী দাসী প্রথম মহিলা আত্মজীবনী ‘আমার জীবন’ লিখেছেন। এটি শুধুমাত্র তাঁর আত্মজীবনী নয়, তৎকালীন সমাজ জীবনের জীবন্ত দলিলও বটে। এক বৃহৎ কাল পরিসর মিশে আছে তাঁর আত্মজীবনীর প্রতিটি পাতায়। আসলে এটি রাসসুন্দরীর নিজের কথা নয়, তৎকালীন সময়ের হিন্দু রমণীগণের সকলের কথা। অত্যন্ত সুচারুভাবে, সুদক্ষতার সঙ্গে সে সময়ের মেয়েদের বিভিন্ন সমস্যাকে তুলে ধরেছেন তিনি। বাল্যবিবাহ প্রথাকে তিনি বলির পশুর সঙ্গে তুলনা করে তৎকালীন সমাজকে এই প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছেন যে, এই বলি কি শুধুমাত্র স্বামীর কাছে বলি নাকি পিতৃতন্ত্রের কাছে? নিজেকে বারবার পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির সাথে তুলনা করে সেকালের পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েছেন তিনি। তাঁর আত্মখেদোক্তির মধ্য দিয়ে তিনি একদিকে যেমন সে সময়ের নারী-পুরুষের পার্থক্যকে বুঝিয়েছেন অন্যদিকে তেমনি একজন মেয়ে হিসাবে জন্মগ্রহণ করার করুণ সুরটিকেও অনুধাবন করিয়েছেন। আর তাই তিনি তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে বারবার গর্জে উঠেছেন। কখনো কারাগারে বন্দী, কখনো কয়েদী আসামী, আবার কখনো কলুর বলদ প্রভৃতি উপমার মধ্য দিয়ে তাঁর কলমে উঠে এসেছে প্রতিবাদী সুর। স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি সে সময়ে সমাজের বিরোধিতা কতটা প্রবল ছিল, সেইসঙ্গে স্ত্রী-শিক্ষা নিষিদ্ধ করার জন্য যে সব যুক্তি প্রচলিত ছিল তার প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট বিবরণ জানা যায় তাঁর আত্মজীবনী থেকে। শিক্ষাই যে নারীমুক্তির একমাত্র উপায়, একথা তিনি মনে প্রাণে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে পেরিয়ে নিরলস প্রচেষ্টায় স্বশিক্ষিত হয়ে উঠে প্রথম মহিলা আত্মজীবনী ‘আমার জীবন’ লিখতে পেরেছিলেন। পুরুষের প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত কর্তৃত্বকে উপেক্ষা করে লিখনের মাধ্যমে তাঁর নীরব প্রতিবাদ, অনুভব, উৎকণ্ঠা পাঠককে কতটা ছুঁতে পেরেছে, উনিশ শতকের নারীর আত্মজাগরণের সুর

কতটা ধ্বনিত হয়েছে তাঁর কণ্ঠে, বিদ্যাশিক্ষার প্রয়াসের মধ্য দিয়ে তাঁর আত্মজীবনী নিছক একটা গল্প না হয়ে কতটা আত্ম-র কাহিনি হয়ে উঠতে পেরেছে, আদৌ কি এটি হয়ে উঠেছে প্রাচীন হিন্দু রমণীর একটি খাঁটি নক্সা, নারীর কলমে নারীকণ্ঠ সত্যিই কি হতে পেরেছে সময়ের কণ্ঠ, প্রতিবাদের কণ্ঠ, প্রতিরোধের কণ্ঠ— এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খোঁজার প্রয়াসই আমার এই প্রবন্ধ।

সূচক শব্দ : পরাধীন মেয়ে, আত্মজীবনী, সময়ের দলিল, বাল্যবিবাহ, প্রতিবাদী কণ্ঠ, স্ত্রী-শিক্ষা, পর্দাপ্রথা, বৈধব্য যন্ত্রণা, উপসংহার।

মূল প্রবন্ধ :

"দেবী নহি, নহি আমি সামান্য রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি।"

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে মেয়েদের কণ্ঠে এই সহজ উচ্চারণ এই পথটা কি এতটাই মসৃন ছিল? আজ যে তারা এতটা স্বাধীন, স্বচ্ছন্দ, স্বতঃস্ফূর্ত— এমনকি পুরুষদের সঙ্গে সমানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে— এই পথটা কি এতটা সহজ ছিল? তৎকালীন মেয়েদের অবস্থান সম্পর্কে রামমোহন রায়ের একটা ছোট্ট উক্তির মধ্য দিয়ে এই গভীর প্রশ্ন চিহ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করি— "একই সঙ্গে রান্না করতে পারে, শয্যাসঙ্গিনী হতে পারে এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে এরূপ উপযোগী জন্তু ব্যতীত মহিলাদের আর কিছু বলে বিবেচনা করা হয় না।"[১] আমরা আলোকপাত করার চেষ্টা করছি 'জন্তু' শব্দটির দিকে। ভাবা যায়! একজন মেয়েকে জন্তুর সাথে তুলনা করা হচ্ছে। সেকালের দিকে ফিরে তাকালে আমাদের চোখে সহজেই ভেসে ওঠে মেয়েদের অবহেলিত, লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত, পদদলিত, অশিক্ষিত, অবগুন্ঠিত, সর্বোপরি, পরাধিনতার এক জ্বলন্ত চিত্র। সত্যি কথা বলতে কী, সেই সময়ের নারীর জীবন ছিল এক তমসাচ্ছন্ন রাত্রির মতো। উনিশ শতকের সমাজ ছিল মূলত পুরুষতান্ত্রিক। নারীর জীবন নির্বাহ হতো পরিবারের কর্তার নির্দেশে। শৈশবে পিতা, যৌবনে স্বামী, বার্ধক্যে পুত্ররা ছিল নারীর রক্ষাকর্তা। এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তারা সম্পূর্ণ পরাধীন ছিল। ব্যক্তিগত জীবন বলতে কিছুই ছিল না তাদের। সেই সঙ্গে তারা ছিল পর্দানসীন। মুখ বুজে সংসারের সব দায়িত্ব পালন করা আর সন্তান ধারণ করা ছিল তাদের একমাত্র কর্তব্য। সুখ-দুঃখ বেদনাভরা জীবনের কথা শোনার মতো কেউ ছিল না তাদের। নিজেদের অন্তরের কথা চেপে রেখে একদিন নিঃশেষ হয়ে যেত তারা। সেই সময় মেয়েদের লেখাপড়া তো দূরে থাক, লেখাপড়া শিখতে চাওয়াটাই ছিল প্রবল অপরাধের। অর্থাৎ শিক্ষা থেকে তারা ছিল বঞ্চিত। মেয়েদের অবস্থান ছিল অন্দরমহলে। পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মতোই মেয়েরা বাইরের আকাশে পাখা মেলবার জন্য ডানা ঝাপটাত কিন্তু মুক্তির স্বাদ তারা পায়নি। এমত অবস্থায় দাঁড়িয়ে রাসসুন্দরী দাসী

প্রথম মহিলা আত্মজীবনী ‘আমার জীবন’ লিখেছেন। তৎকালীন সমাজে মেয়েদের অসহায় ও করুণ অবস্থা, বিভিন্ন সামাজিক কুপ্রথা, স্ত্রী-শিক্ষা ও বিবাহের কথা, সেকালের মেয়েদের বিভিন্ন নিয়ম ও লোকাচার, গৃহধর্ম ও কর্মসাধনের পদ্ধতি ইত্যাদি তাঁর কলমের আঁচড়ে ‘আমার জীবন’ নামক আত্মজীবনীতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরেছেন তিনি।

রাসসুন্দরী দাসী হলেন প্রথম মহিলা আত্মজীবনীকার। এই আত্মজীবনী বলতে আমরা কী বুঝি? যে লেখার মধ্যে মানুষ নিজের জীবনের কথা নিজে বলেন, নিজের অনুভূতিগুলিকে প্রকাশ করেন, তাকে আমরা আত্মজীবনী বলি। আত্মজীবনীর মধ্যে ব্যক্তি শুধু নিজের কথাই বলেন না, তার লেখনীতে ধরা পড়ে অপরের কথা এবং সেই সঙ্গে তৎকালীন সময় ও সমাজের কথা, যা ইতিহাসের মূল্যবান দলিল। এককথায় আত্মজীবনী আসলে আত্মবিনির্মাণ। নিজের পরিচিত তথ্যের সাহায্যে নিজের অভিজ্ঞতাজাত পরিসরের পুনর্নির্মাণ। সে কারণেই আত্মজীবনী এক অনন্য শিল্পসৃষ্টি, যা স্বমহিমায় উজ্জ্বল। আমাদের সমাজের পিতৃতান্ত্রিক আবহে মেয়েদের জীবনচর্চা দীর্ঘকাল ধরে অবরোধের বেড়াজালে ঘেরা ছিল। সেই বেড়াজাল টপকে একজন মেয়ে যখন আত্মকথনে ব্রতী হন তখন তাঁর চোখে সমাজকে নতুন করে চেনা যায়। রাসসুন্দরী দাসী তাঁর ‘আমার জীবন’- এর মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজকে সুচারুভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এটি শুধুমাত্র তাঁর আত্মজীবনী নয়, তৎকালীন সমাজ জীবনের জীবন্ত দলিলও বটে। উনিশ শতকের অন্দরমহলের ছবি পাওয়া যায় এ গ্রন্থে। এক বৃহৎ কাল পরিসর মিশে আছে তাঁর আত্মজীবনীর প্রতিটি পাতায়। মধ্যযুগের কাব্যময়তার কাল অতিক্রম করে বাংলা সাহিত্য যখন গদ্যের জগতে একান্তই শৈশবকাল অতিক্রম করছে, সেই সময় রাসসুন্দরী দাসীর ‘আমার জীবন’ সময়ের নিরিখে শুধু গুরুত্বপূর্ণ বা মূল্যবান নয়, এক অমোঘ উদাহরণ। এ প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেনের এই মন্তব্যটি স্মরণ করতে পারি— “এই জীবনখানি ব্যক্তিগত কথা বলিয়া উপেক্ষা করা চলে না। ইহা প্রাচীন হিন্দু রমণীর একটি খাঁটি নক্সা। যিনি নিজের কথা সরলভাবে কহিয়া থাকেন, তিনি অলক্ষিতভাবে সামাজিক চিত্র অঙ্কন করিয়া যান। ‘আমার জীবন’ পুস্তকখানি শুধু রাসসুন্দরীর কথা নহে, উহা সেকেলে হিন্দু রমণীগণের সকলের কথা; এই চিত্রের মত যথাযথ ও অকপট মহিলা চিত্র আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যে আর নাই। এখন মনে হয়, এই পুস্তকখানি লিখিত না হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি অধ্যায় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত।”[২]

রামনারায়ণ তর্করত্নের ‘কুলীন কুলসর্বস্ব’ নাটকে ছোট মেয়েটি বিয়ের কথা শুনে মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল— ‘মা আমার বিয়ে হবে, তোর বিয়ে হবে না?’ বাল্যবিবাহের এই একই চিত্র আমরা রাসসুন্দরীর ‘আমার জীবন’- এ পাই। রাসসুন্দরীর যখন বারো বছর বয়স তখন খিড়কির ঘাটে পাড়ার মেয়েদের বলাবলি থেকে তিনি বুঝতে পারেন তাঁর মা তাঁকে অন্যের বাড়িতে পাঠিয়ে দেবার আয়োজন করছেন। মাত্র বারো বছরের

মেয়ে এই বিয়ের ব্যাপরটা আসলে কী তা জানতেন না; এমনকী এই ব্যাপারটি তিনি বিশ্বাস করতেও পারেননি। তাই বাড়িতে এসে মাকে জিজ্ঞাসা করেন— "মা ! আমাকে যদি কেহ চাহে, তবে কি তুমি আমাকে দিবে?"[৩] এমনকি বিয়ের দিন শাড়ি, গয়না, লোকজন, বাজনা, ধূমধাম দেখে ছোট মেয়েটির বেশ ফূর্তিই হয়। কিন্তু অপরিচিত মানুষজনের সঙ্গে নিজের চিরপরিচিত পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার মুহূর্তে তিনি বুঝতে পারেন বিয়ে হয়ে তিনি শ্বশুরবাড়ি চলে যাচ্ছেন। সেই সঙ্গে তিনি এও বুঝতে পারেন যে, মেয়েদের ক্ষেত্রে বিয়ে মানে স্বাধীনতা খোয়ানো, আর অধীনতা স্বীকার— 'পিঞ্জরেতে পাখি বন্দী, জালে বন্দী মীন।।"[৪] তখন তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তাঁর মানসিক অবস্থার বর্ণনা পাই নিজস্ব জবানিতে— "যখন দুর্গোৎসবে কি শ্যামাপূজায় পাঁঠা বলি দিতে লইয়া যায়, সে সময়ে সেই পাঁঠা যেমন প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া হতজ্ঞান হইয়া মা মা মা বলিয়া ডাকিতে থাকে, আমার মনের ভাবও তখন ঠিক সেই প্রকার হইয়াছিল।।"[৫] এই খেদোক্তির মধ্য দিয়ে রাসসুন্দরী আসলে তৎকালীন সমাজের এই ঘৃণ্য প্রথাকে বিদ্রুপ বাণে বিদ্ধ করেছেন। কেননা বাল্যবিবাহের বালিকাকে তিনি বলির পশুর সঙ্গে তুলনা করেছেন। এখানে তিনি সমাজকে এই প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছেন যে, এই বলি কি শুধুমাত্র স্বামীর কাছে নাকি পিতৃতন্ত্রের কাছে? আসলে রাসসুন্দরী ছিলেন আত্মসচেতন, তাই বলির পশু হিসাবে নিজেকে দেখতে পেয়েছেন। সেই সঙ্গে তিনি সচেতনভাবে হিন্দু বিবাহ প্রথা নিয়ে কটাক্ষ করেছেন। বিবাহ সম্পর্কে তাঁর ধারণা— "লোকে আমোদ করিয়া পাখী পিঞ্জরে বন্ধ করিয়া রাখিয়া থাকে, আমার যেন সেই দশা ঘটিয়াছে। আমি ঐ পিঞ্জরে এ জন্মের মত বন্দী হইলাম, আমার জীবদ্দশাতে আর মুক্তি নাই।"[৬] এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে আমরা সহজেই এই সামাজিক প্রথার প্রতি তাঁর বিদ্বেষকে বুঝতে পারি। সেই সঙ্গে তৎকালীন মেয়েদের অবস্থান সম্পর্কে অবগত হতে পারি। সমাজে মেয়েদের স্বাধীনতা না থাকার আক্ষেপ তীব্র ভাষায় এখানে প্রকাশ করেছেন তিনি। আর তাই আমরা দেখতে পাই, সাংসারিক জীবনে তিনি নিজেকে বারবার 'পিঞ্জরাবদ্ধ' পাখি উপমায় ভূষিত করেছেন। বাপের বাড়ি তাঁর কাছে হয়েছে 'নিজের বাড়ি' আর শ্বশুরবাড়িকে তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন 'ঐ দেশ' বলে। বিয়ে তাঁকে করতেই হতো, নচেৎ 'মেয়েছেলে হওয়া মিছা' আর বিবাহ 'ঈশ্বরাধীন কর্ম' তাই তাকে 'প্রশংসার যোগ্য' বলতেও বাধ্য হন রাসসুন্দরী। কিন্তু বলব না, বলব-না করেও ঘোমটার তলা থেকে বলেই ফেলেন কথাটা— বাস্তবিক নিজের মা ও নিজেদের সকলকে ছেড়ে ভিন্ন দেশে গিয়ে বাস করা এবং যাবজ্জীবন তাদের অধীনতা স্বীকার, মাতা-পিতা কেউ নয়— এটা কি সামান্য দুঃখের বিষয়। একুশ শতকের চাকুরিরতা স্বাধীনচেতা একটি মেয়ের কল্পনা কি রাসসুন্দরীর বুকের মধ্যে ছিল না?

রাসসুন্দরী দাসী আত্মজীবনী লেখার ছলে তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিভিন্ন অসামঞ্জস্য বিধির বিরুদ্ধে স্পর্ধাবর্ণ উচ্চারণ করেছেন তাঁর 'আমার জীবন'

গ্রন্থের পাতায়। তিনি বারবার দেখাতে চেয়েছেন পুত্রসন্তান ও কন্যাসন্তানের পার্থক্যের দিকটা। মায়ের অসুখে সেবা করতে না পারার আক্ষেপ, তাঁকে মৃত্যুকালে দেখতে না পওয়ার আক্ষেপ রাসসুন্দরীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে এভাবে— "আমার নারীকুলে কেন জন্ম হইয়াছিল? আমার জীবনে ধিক্। পৃথিবী মধ্যে মাতার তুল্য স্নেহময়ী আর কে আছে। মাতাকে পরমেশ্বরের প্রতিনিধি বলিলেও বলা যায়। এমন যে দুর্লভ বস্তু মা, এই মায়ের সেবা করিতে পারি নাই। আহা! আমার এ দুঃখ রাখিবার কি স্থান আছে? আমি যদি পুত্রসন্তান হইতাম, আর মার আসন্ন কালের সম্বাদ পাইতাম, তবে আমি যেখানে থাকিতাম, পাখীর মত উড়িয়া যাইতাম। কি করিব, আমি পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গী।"[৭] এর মধ্য দিয়ে আমরা তৎকালীন সময়ে নারী- পুরুষের পার্থক্য যেমন বুঝতে পারি, তেমনি একজন মেয়ে হিসাবে জন্মগ্রহণ করার করুণ সুরটিকে অনুধাবন করতে পারি। রাসসুন্দরী তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে বারবার গর্জে উঠেছেন। বিভিন্ন উপমার মধ্য দিয়ে তাঁর কলমে উঠে এসেছে প্রতিবাদী স্বর। এই সূত্রেই এসেছে জেলখানার উপমা— "আমি এখানে আসিয়া অবধি দারমালী কারাগারে বন্দী হইয়াছি। এই সংসারের কাজ চলিবে না বলিয়া প্রাণান্তেও আমাকে পাঠান হইত না। তবে যদি কোন ক্রিয়া উপলক্ষে আমার যাওয়া হইত, কিন্তু কয়েদী আসামীর মত দুই চারিদিন মধ্যে আমাকে ফিরিয়া আসিতে হইত।"[৮] এ প্রসঙ্গে আরও একটি মন্তব্য উল্লেখ না করলেই নয়— "বিশেষতঃ তখন মেয়েছেলের এই প্রকার নিয়ম ছিল, যে বৌ হইবে, সে হাতখানেক ঘোমটা দিয়া ঘরের মধ্যে কাজ করিবে, আর কাহারও সঙ্গে কথা কহিবে না, তাহা হইলেই বড় ভাল বৌ হইল। সেকালে এখনকার মত চিকণ কাপড় ছিল না, মোটা মোটা কাপড় ছিল। আমি সেই কাপড় পরিয়া বুক পর্যন্ত ঘোমটা দিয়া ঐ সকল কাজ করিতাম। ...... সে কাপড়ের মধ্য হইতে বাহিরে দৃষ্টি হইত না। যেন কলুর বলদের মত দুইটি চক্ষু ঢাকা থাকিত। আপনার পায়ের পাতা ভিন্ন অন্য কোন দিকে দৃষ্টি চলিত না।"[৯] তিনি কখনো কারাগারে বন্দী, কখনো কয়েদী আসামী আবার কখনো কলুর বলদ প্রভৃতি উপমার মধ্য দিয়ে তৎকালীন পুরুষশাসিত সমাজের চোখে আঙুল দিয়ে মেয়েদের প্রতি তাদের নিষ্ঠুরতাকে তুলে ধরেছেন। রাসসুন্দরী দাসীর এই নারীবাদী সত্তার প্রতি আলোকপাত করে সুতপা ভট্টাচার্য বলেছেন— "সামাজিক অধিকার এবং অবস্থানের দিক থেকে নারী-পুরুষের পার্থক্য নির্দেশ করা, সে বিষয়ে প্রতিবাদ করা— অভিধান অনুসারে ফেমিনিজমের সংজ্ঞা তাই-ই। রাসসুন্দরীর মতো ঘরোয়া ভক্তিমতী গৃহকর্ম নিপুণা মেয়েটির বয়ানেও তবে থাকতে পারে নারীবাদের কথা, সেই ১৮৭০ সালেই ! কেনই বা থাকবে না, আত্ম বিষয়ে যদি কেউ সচেতন থাকে, তবে তো তার নারীত্ব বিষয়ে, তার পরাধিনতার বিষয়েও তাকে সচেতন হতেই হবে।"[১০]

রাসসুন্দরী দাসী তাঁর আত্মজীবনীর বহু জায়গায় সেকালের সমাজে মেয়েদের স্থান যে খুব নীচুতে ছিল তার বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু সবচেয়ে ক্ষোভের সঙ্গে যে

বিষয়টিকে তিনি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন সেটি হল মেয়েদের লেখাপড়া। তৎকালীন সমাজে মেয়েদের লেখাপড়ার কোন অধিকার ছিল না। শুধু যে অধিকার ছিল না তা নয়, স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি সে সময়ে সমাজের বিরোধিতা কতটা প্রবল ছিল, সে বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট বিবরণ জানা যায় তাঁর 'আমার জীবন' গ্রন্থ থেকে। তাঁর নিজের দৃষ্টান্ত থেকে এ অবস্থার একেবারে জীবন্ত চিত্র দেখা যায়। সে সময়ের স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধিতার একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন বিনয়ভূষণ রায় তাঁর 'অন্তঃপুরের স্ত্রী-শিক্ষা' নামক প্রবন্ধে— "শিক্ষিত মানুষের মন সর্বদায় কুসংস্কারমুক্ত থাকে। তাকে যে কোনো নির্দেশ দেওয়া হোক না কেন সে তা সহজেই মেনে নেবে না। তাই অজ্ঞনতার অন্ধকারে মেয়েদের ঠেলে দেওয়ার জন্যই সমাজে স্ত্রী-শিক্ষা নিষিদ্ধ হয়।"[১১] আবার সমকালীন লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী তাঁর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' নামক উপন্যাসে মেয়েদের শিক্ষার অধিকারের সীমা নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। সেখানে দেখা যায় সত্যবতী তালপাতায় হাত দিলে নেড়ু তাকে বলেছে, "তুই না মেয়ে মানুষ? মেয়ে মানুষের তালপাতায় হাত ঠেকলে কি হয় জানিস না?..... পড়লে চোখ কানা হয়ে যায় জানিস?"[১২] সে সমাজে স্ত্রী-শিক্ষা নিষিদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন যুক্তি প্রচলিত ছিল। যেমন— শাস্ত্রে স্ত্রী-শিক্ষার উল্লেখ নেই, মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে ব্যভিচারিণী হবে এবং স্বামীসহ অন্যান্য গুরুজনদের অবজ্ঞা করতে শিখবে, মেয়েদের যখন অর্থ উপার্জন করতে হয় না তখন বিদ্যাশিক্ষারও প্রয়োজন নেই, মেয়েরা শিক্ষিত হলে বিধবা হবে, স্তনের দুধ শুকিয়ে যাবে, রাতারাতি মেয়েরা ছেলে হয়ে যাবে, ধর্মীয় রীতিনীতি কিছু পালন করবে না, নাটক নভেল পড়ে অকারণে সময় নষ্ট করবে— তাতে নাকি সংসার উচ্ছন্নে যাবে ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের মন্তব্যটি স্মরণযোগ্য— "যদি ছোট ছোট কন্যারা বাটীর বালকের লেখাপড়া দেখিয়া সাদ করিয়া কিছু শিখে, ও পাততাড়ি হাতে করে তবে তাহার অখ্যাতি জগৎ বেড়ে যায়। সকলে কহে যে এই মদ্দা ঢেঁটি ছুঁড়ি বেটা ছেলের মত লেখাপড়া শিখে, এ ছুঁড়ি বড় অসৎ হবে; এখনি এই, শেষে না জানি কি হবে। যে গাছ বাড়ে তাহার অঙ্কুরে জানা যায়।"[১৩] এই একই চিত্রের পুনরাবৃত্তি আমরা রাসসুন্দরীর 'আমার জীবন' গ্রন্থে দেখতে পাই— "তখনকার লোক বলিত, বুঝি কলিকাল উপস্থিত হইয়াছে দেখিতে পাই। এখন বুঝি মেয়েছেলেতেও পুরুষের কাজ করিবেক। এতকাল ইহা ছিল না, একালে হইয়াছে। এখন মাগের নামডাক, মিনসে জড়ভরত, আমাদের কালে এত আপদ ছিল না। এখন মেয়ে রাজার কাল হইয়াছে। দিনে দিনে বা আর কত দেখিব ! এখন যেমত হইয়াছে, ইহাতে আর ভদ্রলোকের জাতি থাকিবে না। এখন বুঝি সকল মাগীরা একত্র হইয়া লেখাপড়া শিখিবে।"[১৪] এই সব কিছু থেকে আমরা খুব সহজেই অনুমান করিতে পারি, সে সময়ে মেয়েদের লেখাপড়া কতটা দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। রাসসুন্দরী দাসীর লেখনীতে মেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কে যেমন আক্ষেপের সুর শোনা গেছে, তেমনি এর বিরুদ্ধে সমালোচনায় মুখর হয়েছেন তিনি— "সকলেই ছেলেমেয়েকে বিদ্যায় বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তখনকার

মেয়েছেলেগুলা নিতান্ত হতভাগ্য, প্রকৃত পশুর মধ্যে গণনা করিতে হইবেক।"[১৫] কখনও বা আরেকটু তীব্র স্বর তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। সেই স্বর শুধু সমালোচনার নয়; তা যেন তীব্র প্রতিবাদ— "সম্পূর্ণ পরাধিনতার কাল যাপন হইত। ..... আহা কি আক্ষেপের বিষয়! মেয়েছেলে বলিয়া কি এতই দুর্দশা। চোরের মত যেন বন্দী হইয়াই থাকি, তাই বলিয়া কি বিদ্যা শিক্ষাতেও দোষ?"[১৬] এই সব উক্তির মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজের প্রতি তাঁর প্রতিবাদী সত্তা ফুটে ওঠে। স্ত্রী-শিক্ষাই যে নারীমুক্তির একমাত্র উপায়, একথা তিনি মনে প্রাণে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আর তাই সমস্ত বাধা বিপত্তিকে পেরিয়ে নিরলস প্রচেষ্টায় স্বশিক্ষিত হয়ে উঠে প্রথম মহিলা আত্মজীবনী 'আমার জীবন' লিখতে পেরেছিলেন। রাসসুন্দরী ভালোমতোই জানতেন মেয়েদেরকে লেখাপড়া শিখতে নেই। তার উপর তিনি একটি বাড়ির বউ। যেখানে সকলে স্ত্রী-শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে নিষেধ বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেখানে সকলের বিপরীতে দাঁড়িয়ে একক সিদ্ধান্ত নেওয়ার বাঙালির যে ইতিহাস, তাতে রামমোহন থাকতে পারেন, বিদ্যাসাগর থাকতে পারেন, রাসসুন্দরীও কি নেই? তার থেকেও বড় কথা, সে আমলে সবাই জানত লেখাপড়া শিখলে মেয়েদের বিধবা হতে হয়। তার মানে বৈধব্যযোগের পূর্ণ সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নিয়েও তিনি লেখাপড়া শেখা থেকে পিছপা হননি। এই পথ যে কতটা কঠিন ও দুঃসাধ্য ছিল 'আমার জীবন' এর প্রতিটা পৃষ্ঠা তার স্বাক্ষ্য দেয়। ঘরে-বাইরে, সমাজ-সংসারে প্রতিনিয়ত লড়াই করে নিজের কাঙ্খিত লক্ষে পৌঁছাতে হয়েছে তাঁকে। 'আমার জীবন' তাঁর সেই আত্মসংগ্রামের পরিচয় বহন করে। সেই সঙ্গে কোথাও যেন উনিশ শতকের নারী শিক্ষা, নারী উন্নয়নের প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে গুরুত্ব পায়। আর এই সমস্ত কারণেই তাঁর বীরগাথা আজও সমানভাবে সমাদৃত হয়ে চলেছে।

তৎকালীন সময়ে অপর একটি নিষ্ঠুর প্রথা ছিল পর্দাপ্রথা। মেয়েদের স্বাধীনতা তো ছিলই না, তার উপর ছিল এই পর্দাপ্রথা। রাসসুন্দরী দাসী তাঁর 'আমার জীবন' নামক আত্মজীবনীতে পর্দাপ্রথার চিত্র সুনিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন। বিয়ের পর লজ্জাশীলা, ভীরু বধূ রাসসুন্দরী বুক পর্যন্ত মোটা কাপড়ের ঘোমটা দিয়ে সংসারের সমস্ত কাজ নির্বাহ করতেন। সে কাপড়ের মধ্য দিয়ে বাইরে দেখতে পাওয়া যেত না। নিজের পায়ের পাতা ছাড়া আর কিছুই দেখা যেত না। এমনকি কর্তার ঘোড়া দেখে লজ্জা পেয়ে মাথায় ঘোমটা দিয়ে ঘরের মধ্যে লুকাতে দেখি তাঁকে। রাসসুন্দরী দাসী একবার যখন মৃত্যুর সম্মুখীন হন, তখন তাঁর স্বামী কাছে যেতে না পেরে ঘরের দরজায় বসে স্ত্রী মরল না বাঁচল তার খবর নেয়। রাসসুন্দরীর স্বামীর চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়লেও তিনি কিন্তু স্ত্রীর কাছে যাননি। এ সমস্ত কিছুই সে সময়ের পর্দাপ্রথার প্রমাণ বহন করে।

রাসসুন্দরী দাসীর 'আমার জীবন' গ্রন্থে সেকালের বৈধব্য যন্ত্রণার ছবি ফুটে উঠেছে। ১২৭৫ সালের ২৯ মাঘ শিবচতুর্দ্দশীর দিন বেলা আড়াই প্রহরে তাঁর স্বামী মারা যান। তার ফলে তাঁকে মস্তক মুণ্ডন করতে হয়। এই মস্তক মুণ্ডন করাকে তিনি মৃত্যুর

অধিক বলেছেন। মেয়েদের সধবা অবস্থাকে তিনি স্বর্ণমুকুটের সঙ্গে তুলনা করেন। সেই স্বর্ণমুকুটটি খসে পড়ায় তিনি ব্যথিত হয়েছেন। তিনি মনে করেন বিধবা শব্দটি এমন একটি শব্দ যা বলতেও লজ্জা বোধ হয়, আবার শুনতেও দুঃখ লাগে। এই বৈধব্য অবস্থা সম্পর্কে তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে জানিয়েছেন—

"শত পুত্রবতী যদি পতিহীনা হয়।
তথাপি তাহাকে লোকে অভাগিনী কয় ।।"[১৭]

রাসসুন্দরী দাসী যখন আত্মজীবনী রচনা করেন তখন বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনীর কোনো মডেল ছিল না। তাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম নারীর কলমে লেখা আত্মজীবনী 'আমার জীবন' সমস্ত পাঠক বর্গকে চমকে দেয়। তাঁর আত্মজীবনী নতুন একটা দিকের উন্মোচন ঘটায়। রাসসুন্দরী ছিলেন আত্মসচেতন মহিলা, আর তাঁর 'আমার জীবন' সেই প্রখর আত্মচেতনারই ফল। আর তাই আত্মজীবনী রচনা করতে গিয়ে, একজন বালিকা সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে কীভাবে ক্রমান্বয়ে বার্ধক্যে পৌঁছালেন তার ইতিবৃত্ত নির্মাণ করতে গিয়ে শুধু নিজের কথাই বললেন না; বললেন উনিশ শতকের সমাজ জীবনের কথা। 'আমার জীবন'- এর মধ্যে দিয়ে তাই আমরা পেলাম উনিশ শতকের সামাজিক দলিলকে। যে সমাজে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন ছিল না, যে সমাজে নারীর বাল্যবিবাহ ছিল এক স্বাভাবিক প্রথা, যে সমাজে প্রচলিত ছিল ন' বছরের কন্যার গৌরীদান রীতি; যে সমাজে মেয়েদের পর্দাপ্রথা মেনে চলতে হতো; সেই সমাজকে 'আমার জীবন' গ্রন্থের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় প্রতিভাত করেছেন রাসসুন্দরী। শুধু প্রতিভাত করেছেন নয়, তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে তাঁর কলমের আঁচড়ে বিভিন্ন উপমায় ব্যাঙ্গ বিদ্রুপ বাণে বিদ্ধ করেছেন তিনি। অত্যাচারিত, পদদলিত, লাঞ্ছিত, অশিক্ষিত, পরাধীন মেয়েদের জন্য তাঁর জ্বালাময়ী কণ্ঠে উঠে এসেছে প্রতিবাদের সুর। এ প্রসঙ্গে বারিদবরণ ঘোষ বলেছেন, "নারী জীবনের যে বেদনা সেই সমাজকে কুরে কুরে খেয়েছিল তার একটা আপাত প্রতিবাদ এই প্রগতিশীলা রমণী করতে চেয়েছিলেন।"[১৮] পুরুষের প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত কর্তৃত্বকে উপেক্ষা করে লিখনের মাধ্যমে তাঁর নীরব প্রতিবাদ, অনুভব, উৎকণ্ঠা পাঠককে ছুঁয়ে গেছে। তাঁর লেখনীতে উনিশ শতকের নারীর আত্মজাগরণের সুর ধ্বনিত হয়েছে। সুতপা ভট্টাচার্যের কথায়— "রাসসুন্দরী রচিত সেই প্রথম আত্মজীবনী প্রকৃত অর্থেই 'আত্ম'র জীবনী। ..... সামাজিকভাবে যে মেয়ে অচ্ছুত, ক্ষমতাহীন, সে তো আত্মকাহিনির মাধ্যমেই নিজের ব্যক্তিগত স্বর উপস্থাপিত করতে পারে .... এই প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে, বিদ্যাশিক্ষার প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে রাসসুন্দরীর আত্মজীবনী নিছক একটা গল্প না হয়ে যথার্থভাবে আত্ম-র কাহিনি হয়ে উঠেছে।"[১৯] রাসসুন্দরী দাসী তাঁর জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, কীভাবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলে সাফল্যকে স্পর্শ করা যায়। উনিশ শতকের প্রতিকূল অন্ধকারময় সময়ে তাঁর এই সাহসী লড়াই এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে সমগ্র মানবকূলের কাছে। রাসসুন্দরীর এই জীবন সংগ্রামের ইতিবৃত্ত তৎকালীন সময়ের হাজার হাজার

বাঙালি নারীর জীবন ইতিবৃত্তের প্রতীক হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে তাই গোলাম মুরশিদ বলেছেন, "সেকালের বাঙালি মহিলাদের চিত্র পুনর্নির্মাণের জন্য রাসসুন্দরীর আত্মজীবনী রীতিমতো অমূল্য বলে বিবেচিত হতে পারে।"[২০] আর এই সমস্ত কারণেই উনিশ শতকে রাসসুন্দরীর কলমে লেখা প্রথম আত্মজীবনী 'আমার জীবন' স্থায়ী আসন লাভ করেছে। তাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'প্রস্তাবনা' অংশে সদর্পে ঘোষণা করেছেন— "এই গ্রন্থখানি প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে রাখা আবশ্যক। এমন উপাদেয় গ্রন্থ অতি অল্পই আছে।"[২১]

তথ্যসূত্র :

১. মুরশিদ, গোলাম, ২০০১, নারী প্রগতি : আধুনিকতার অভিঘাতে রঙ্গরমণী, কলকাতা, নয়া উদ্যোগ, জানুয়ারি, পৃষ্ঠা- ১৯

২. ঘোষ, বারিদবরণ (সম্পাদিত), ২০১৭, রাসসুন্দরী দাসী : আমার জীবন, নিউ দিল্লি, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, পৃষ্ঠা- ৯

৩. বিশ্বাস, অহনা, ঘোষ, প্রসূন (সম্পাদিত), ২০১৬, অন্দরের ইতিহাস : নারীর জবানবন্দি, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, গাঙচিল, এপ্রিল, পৃষ্ঠা- ১৩৭

৪. তদেব, পৃষ্ঠা– ১৪১

৫. তদেব, পৃষ্ঠা– ১৩৯-১৪০

৬. তদেব, পৃষ্ঠা– ১৪১

৭. তদেব, পৃষ্ঠা– ১৫৪

৮. তদেব, পৃষ্ঠা– ১৫৩-১৫৪

৯. তদেব, পৃষ্ঠা– ১৪৭

১০. ভট্টাচার্য, সুতপা, ২০১৭, মেয়েদের স্মৃতিকথা, কলকাতা, সিগনেট প্রেস, জানুয়ারি, পৃষ্ঠা- ১০

১১. আকাদেমি পত্রিকা, ১৪০২, অষ্টম সংখ্যা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, আষাঢ়, পৃষ্ঠা- ২৪২

১২. দেবী, আশাপূর্ণা, ১৩৭১, প্রথম প্রতিশ্রুতি, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিকেশন, ফাল্গুন, পৃষ্ঠা- ১২৩

১৩. বসু, স্বপন (সম্পাদিত), ২০১৯, উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা, *গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক',* কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, চতুর্থ সংস্করণ, জানুয়ারি, পৃষ্ঠা- ৬৮

১৪. বিশ্বাস, অহনা, ঘোষ, প্রসূন (সম্পাদিত), ২০১৬, অন্দরের ইতিহাস : নারীর জবানবন্দি, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, গাঙচিল, এপ্রিল, পৃষ্ঠা- ১৪৮

১৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৫৫

১৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৫৭ - ১৫৮

১৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৭৮

১৮. ঘোষ, বারিদবরণ (সম্পাদিত), ২০১৭, রাসসুন্দরী দাসী : আমার জীবন, নিউ দিল্লি, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, পৃষ্ঠা- ২৫

১৯. ভট্টাচার্য, সুতপা, ২০১৭, মেয়েদের স্মৃতিকথা, কলকাতা, সিগনেট প্রেস, জানুয়ারি, পৃষ্ঠা- ৩

২০. মুরশিদ, গোলাম, ২০১৩, নারী প্রগতির একশো বছর : রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া, ঢাকা, অবসর, বইমেলা, পৃষ্ঠা- ২৬

২১. ঘোষ, বারিদবরণ (সম্পাদিত), ২০১৭, রাসসুন্দরী দাসী : আমার জীবন, নিউ দিল্লি, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, পৃষ্ঠা- ৮

লুক্কায়িত প্রবৃত্তির জীবন্ত ক্যানভাস : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্প

নার্জিয়া পারভীন
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান অনস্বীকার্য। তিনি তাঁর লেখায় নিম্নস্তরের মানুষের জীবনছবি এঁকেছেন বারম্বার। সমাজের অন্যান্য লেখকরা যখন নাগরিক জীবনের ছবি আঁকতে ব্যস্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তখন তাঁর লেখা উপন্যাস ও গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন নিম্নস্তরের মানুষের ছবি। অশ্লীল জীবন ও জীবিকা স্থান পেয়েছে তাঁর লেখায়। 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের ভিখু চরিত্রের মধ্যে সেই অশ্লীল নিম্নমানের জীবনাচরণের ছবিই ফুটে উঠেছে। ভিখু চরিত্রের কথা ভাবলেই আমাদের চোখের সামনে ফুটে আসে অকৃতজ্ঞ, কামুক, বর্বর, নৃশংস, আদিম ও বন্য এক মানুষ। ডাকাত সে, আদিমতায় ঠাসা। মনুষ্যত্বের সামান্যতম লক্ষণের আভাস তার চরিত্রে নেই। দৈহিক চাহিদা মেটানোর জন্য এমন কিছু নেই যা সে করতে পারে না। খুন, নারীহরণ, ডাকাতি তার কাছে প্রায় ডালভাতের মতো। অসভ্য যুগের প্রবৃত্তি তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। ভদ্রতার মুখোশ সে পড়ে না। এমন নোংরা, প্রবৃত্তির তাড়নায় উন্মত্ত চরিত্র বাংলা সাহিত্যে বিরল। ভিখু চরিত্র আদিম সমাজের নগ্নতার এক জ্বলন্ত প্রকাশ। এই নগ্নতা আধুনিক সমাজের শিরায় শিরায় বিদ্যমান। আধুনিক সমাজ এখনও তাদের কবল থেকে মুক্তি পায়নি। গল্পকার 'ভিখু' চরিত্রের মধ্য দিয়ে সমাজের সেই লুকিয়ে থাকা নগ্নতাকেই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন।
সূচক শব্দ: প্রাগৈতিহাসিক, বর্বরতা, নগ্নতা, লুক্কায়িত প্রবৃত্তি, ভিখু।

প্রবৃত্তির মায়াজালে আবদ্ধ প্রাণীজগৎ। ভালোমন্দ মেশানো কিছু সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে জন্ম, সৃষ্টির প্রত্যেকটা জীবের। এই সমস্ত জীবের মধ্যে মানুষ উন্নত কেননা, সে তার প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সমাজ, সভ্যতা, সংস্কারের চাপ মানুষকে শিখিয়েছে, খাদ্য সংগ্রহ মানে ছিনিয়ে নেওয়া বোঝায় না, বংশবৃদ্ধি বলতে জোর করে ভোগ করা নয়। কিন্তু এই সভ্যতা, সমাজ, সংস্কারের স্পর্শবিহীন প্রাগৈতিহাসিক মানুষেরা জোর করে ভোগ করা বা ছিনিয়ে নেওয়াকেই সমাজের নিয়ম ভাবত। যে কোনও উপায়ে জঠরের ক্ষুধা ও শারীরিক ক্ষুধা মেটানোই ছিল তাদের বৈশিষ্ট্য। তাদের আচরণ ছিল পশুর মতো। সমাজের দিকে চোখ ফেরালে আমরা দেখতে পাই, আদিম এই পশুত্ব ছড়িয়ে পড়েছে বর্তমানেও। প্রাগৈতিহাসিক কালের এই প্রবৃত্তি বহমান নদীর মতো, এক যুগ থেকে একযুগে ভেসে যায়। আদিম প্রবৃত্তির জীবন্ত জীবাশ্ম আজও ঘুরে

ফেরে হাটে-বাটে, পথে-ঘাটে। আসলে প্রবৃত্তির এই অন্ধকার কারাগারে বন্দি মানুষ। অদৃশ্য ফিতে দিয়ে মানুষ বেঁধে রাখে প্রবৃত্তিগুলোকে। যা ছিল তা আজও আছে সভ্যতা, সংস্কারের অন্তরালে, রঙিন পোশাকের নীচে সজাগ। “অলো ঝলমলে সভ্যতার চোখ ধাঁধানো ঔজ্জ্বল্যের অন্তরালে বর্বরযুগের আদিম অন্ধকার এখনো সমভাবে প্রবাহমান”।[১] বর্বর যুগের আদিম অন্ধকার আমাদের অজান্তেই বর্তমান জীবনকেও নিয়ন্ত্রণ করে চলছে।

শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুলিতে ফুটে উঠেছে আদিম প্রবৃত্তির এক নগ্ন বাস্তব চিত্র। উদঘাটিত হয়েছে মানুষের অন্তর্নিহিত আদিম সত্তার চিরন্তন ভয়ংকর রূপ। নাম তার ‘ভিখু’, নির্ভীক সে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘প্রাগৈতিহাসিক’ নামক গল্পের মূল চরিত্র এই ‘ভিখু’। গল্পটি আবর্তিত হয়েছে ‘ভিখু’ নামের এই দস্যুকে কেন্দ্র করেই। তাকে আশ্রয় করেই গল্পের বাকি চরিত্রগুলি বিকশিত হয়েছে। মানিক বন্দোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে, সাঁওতাল পরগনার দুমকা নামক স্থানে। বারবার বাবার চাকরির বদলির কারণে বিভিন্ন জায়গার, ভিন্ন পেশার, ভিন্ন ধরনের মানুষকে কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ ঘটেছে, যা তাঁর আঁকা গল্প, উপন্যাসের চরিত্র গুলোতে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর লেখায় স্থান পেয়েছে বাস্তবতা। খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে চোর, ডাকাত, শিক্ষা-সংস্কৃতির আলো থেকে বিছিন্ন নর-নারীরা হয়ে উঠেছে তাঁর গল্প, উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র।

'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পসংকলনের 'প্রাগৈতিহাসিক' নামক গল্পের প্রধান চরিত্র এই ভিখু। ‘ভিখু’ নামক এই চরিত্রটি লেখকের এক অনন্য সৃষ্টি। হিংস্রতা ও পৈশাচিক উন্মাদনায় ভরপুর এক মানুষরূপী পশু। যার প্রিয় পেশা মানুষখুন, চুরি বা ডাকাতি। সে ভালোবাসে নারী সঙ্গ, পরস্ত্রী হরণ করে তার আনন্দ। নারী সঙ্গহীন জীবন যার কাছে অসহনীয়। সে পৃথিবীর সমস্ত নারী ও খাদ্য ছিনিয়ে নেওয়া বা কেড়ে নেওয়াতে বিশ্বাসী। উদরেরক্ষুধা আর যৌন ক্ষুধা সবসময় তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। গল্পে ভিখুকে বর্ণনা করতে লেখক লিখেছেন,“ পৃথিবীর যত খাদ্য ও যত নারী আছে একা সব দখল করিতে না পারিলে তাহার তৃপ্তি হইবে না”।[২]

আদিম প্রবৃত্তিতে ঠাসা ভিখু নামের এই জীবন্ত চরিত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অমর করে রেখেছে। অদ্ভুত এক চরিত্র, পৈশাচিকতায় ঠাসা। আদিম উল্লাসে সে মাতিয়ে বেড়ায়। সমগ্র গল্পতে চলেছে তার একার রাজত্ব। ‘প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের সে রাজা। গল্পের শুরু থেকে শেষ অব্দি যে অপরাধ জগতের বর্ণনা করা হয়েছে তার কেন্দ্রে আছে ভিখু। গল্পের শুরুতে বৈকুণ্ঠ সাহার মেজ ভাইকে হত্যা করেছ ভিখু; পেহ্লাদের বৌয়ের প্রতি খারাপ নজর দিয়েছে ভিখু; রাতে পেহ্লাদের ঘরে আগুন ধরিয়েছে অকৃতজ্ঞ ভিখু; শ্রীপতি বিশ্বাসের বোনকে চুরি করেছ ভিখু; রাখুর বৌকে নিয়ে পালিয়েছে ভিখু; গল্পের শেষে ভিখারিনী পাঁচীকে পাওয়ার জন্য বসিরকে হত্যা করেছ সেই ভিখু। ভিখুর এই সমস্ত অপরাধমূলক কাজ কর্মে সাহায্য করে গেছে তার শরীর।

ভিখুর শরীরটাই তাকে চালনা করেছে, নির্ধারিত করেছে তার সবল-দুর্বল অবস্থা কালীন বৃত্তিগুলি। সবল শরীর নিয়ে সে ডাকাতি করেছে, খুন করেছে , ধর্ষণ করেছে, অন্যের স্ত্রী-কে নিয়ে পালিয়েছে। তোয়াক্কা করেনি সমাজ, সংসারের। অন্যদিকে দুর্বল শরীর, অবশ হয়ে যাওয়া ডান হাত নিয়ে গ্রহণ করেছে পৃথিবীর প্রাচীন এক বৃত্তি, ভিক্ষাবৃত্তি। থেমে থাকেনি ভিখু, নারী সঙ্গহীন জীবন থেকে মুক্তি পেতে, শরীরের ক্ষুদা মেটাতে বসিরকে হত্যা করে জয় করেছে দগদগে ক্ষত বিশিষ্ট পাঁচীকে। তার চাহিদা সে, যে কোনও উপায়ে মেটাতে প্রস্তুত। শুধু বাঁচা নয়, নারী, খাদ্য সব কিছু দখল করে রাজার মতো বেঁচে থাকার ইচ্ছা তার। নিজের কামনা, লোভ, ক্ষুদা মেটাতে যে কোনো পথ গ্রহণ করতে দ্বিধাহীন ভিখু। আদিম মানুষের মতো সব কিছু ছিনিয়ে নেওয়ার ধারণাই বিশ্বাসী ভিখু। লেখক এই গল্পে আদিম প্রবৃত্তির জ্বলন্ত চিত্র, মানুষের যৌন কামনা, লোভ, লালসার দারুণ ক্যানভাস ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পের কেন্দ্র চরিত্র ভিখুর মধ্য দিয়ে।

গল্পের ঘটনা শুরু হয়েছে আষাঢ় মাসে, বসন্তপুরে। বৈকুন্ঠসাহার গদিতে ডাকাতি করতে গিয়ে বর্শার আঘাতে আহত হয়ে ফেরে ভিখু। গিয়েছিল বন্ধু পেহ্লাদের বাড়ি আশ্রয়ের আশায়। পেহ্লাদ নিজের বাড়িতে আশ্রয় না দিলেও গভীর বনে “সিনজুরি গাছের নিবিড় ঝোপের মধ্যে তাহাকে একটা মাঁচা বাঁধিয়ে দিল”।[৩] পুরো গল্পে একমাত্র পেহ্লাদ চরিত্রের মধ্যেই কিছুটা হলেও মানুষ সুলভ বৈশিষ্ট্য চোখে পরে। পেহ্লাদ প্রয়োজনে একজন সাচ্চা বন্ধুর মত ভিখুর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে। বনের প্রতিকূল পরিবেশে শুরু হয়েছে ভিখুর জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়। বনের প্রতিকূলতার মধ্যে ভিখুর বেঁচে থাকা যেন আদিম গুহাবাসী মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই। ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক-অপ্রাকৃতিক দুর্যোগ, হিংস্র জন্তু জানোয়ার হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার আদিম লড়াই। গল্পকার ভিখুর বনজীবন অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন “অসহ্য ক্ষুধা পাইলে চিড়া চিবাইয়া সে পেট ভরাইল। একহাতে ক্রমাগত পোকা ও পিপঁড়াগুলি টিপিয়া মারিল। বিষাক্ত রস শুষিয়া লইবে বলিয়া জোঁক ধরিয়া নিজেই ঘায়ের চারিদিক লাগাইয়া দিল”।[৪] পচে যাওয়া ঘা নিয়েও বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছা, ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করেও শরীরকে টিকিয়ে রাখার প্রাণপন প্রচেষ্টা, একটা দুর্বিষহ সময় ভিখুকে জড়িয়ে ধরেছিল। “জোঁকেরা তাহার রক্ত শুষিয়া শুষিয়া কচি পটোলের মত ফুলিয়া উঠিয়া আপনা হইতেই নীচে খসিয়া পড়িয়া যায়, সে টেরও পায় না। পায়ের ধাক্কায় জলের কলসীটা এক সময়ে নীচে পড়িয়া ভাঙিয়া যায়, বৃষ্টির জলে ভিজিয়া পুঁটুলির মধ্যে চিড়াগুলি পচিতে আরম্ভ করে, রাত্রে তাহার ঘায়ের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া মাচার আশেপাশে শিয়াল ঘুরিয়া বেড়ায়”।[৫] হাজার কষ্টসহ্য করেও ভিখু বেঁচেছিল, তার অসামান্য জীবনীশক্তি তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। গল্পকার জানাচ্ছেন “মরিবে না। সে কিছুতেই মরিবে না। বনের পশু যে অবস্থায় বাঁচে না, সেই অবস্থায় মানুষ সে বাঁচিবেই”।[৬] পরিস্থিতি জয় করে বেঁচে থাকার সংগ্রাম, যে কোনও পরিস্থিতিতে সে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে।

কথায় বলে, একজন হিতৈষী বন্ধু হাজার প্রয়োজনীয় ঔষধের থেকে কার্যকর। ভিখুর শারীরিক অবস্থার অবনতি লক্ষ্য করে বন্ধু পেহ্লাদ ভিখুকে নিজের গৃহে নিয়ে আসে। বিনা চিকিৎসায়, আদর, স্নেহ , যত্ন ছাড়ায় একমাসের মধ্যে সুস্থ হয়ে ওঠে ভিখু। সুস্থতার সঙ্গে সঙ্গে মাথা চাড়া দেয় শরীরের আদিম প্রবৃত্তিগুলি। অকৃতজ্ঞ, লোভী ও দুশ্চরিত্র ভিখু পেহ্লাদের অনুপস্থিতে পেহ্লাদের বৌয়ের দিকে লোভনীয় দৃষ্টি ফেলে। ভিখু সবসময় যে থালাতে খাই সেই থালা ছেদ করার সুযোগ খোঁজে। ফলস্বরূপ জোটে পেহ্লাদের হাতে বেদম প্রহার। বৈজ্ঞানিক সূত্র অনুযায়ী, প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান বিপরীত প্রতিক্রিয়া বর্তমান। কৃতঘ্ন, হিংস্র, অশিক্ষিত, বর্বর ভিখু প্রবল প্রতিশোধ স্পৃহায় পেহ্লাদের ঘরে রাত্রে আগুন দিয়ে পালিয়ে গিয়ে জীবনের নতুন পর্যায় শুরু করে।

পুরোনো জীবনকে লুকিয়ে রেখে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহন করে শুরু করে জীবনের নতুন অধ্যায়। আসলে ভিক্ষা করা তার জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। বাজারের তেঁতুল গাছের নীচে বসে পথচারীদের মন গলাবার বিভিন্ন কলাকৌশল সে আয়ত্ত করে নিল খুব দ্রুত। অশন ও বসনের যথাযথ ব্যবস্থা হওয়ার কারণে পূর্ব স্বাস্থ্য ফিরে এলে নারী সঙ্গ কামনায় অস্থির হয়ে ওঠে ভিখু। পেটের ক্ষুধা মিটে গেল জেগে ওঠে যৌন ক্ষুধা। ভিখু ডাকাতকালীন উন্মত্ত জীবনের স্মৃতিচারণা করতে থাকে। কামুক ভিখু স্নানরতা মেয়েদের শরীরের ভাঁজ দেখে যৌন উত্তেজনা লাঘব করার চেষ্টা করে। নারী- বিহীন তিক্ত জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার কামনায় আসক্ত হয় বাজারের অন্য এক ভিখারিনী পাঁচীর প্রতি। ভিখুর জীবনে প্রেম কামেরই অন্যনাম। পৃথিবীর সমস্ত নারী- একান্ত ভাবে পেতে চাওয়ার বাসনা তার। নারী তার কাছে যৌন উত্তেজক বস্তু, তার কামনা বাসনার উপকরণ ব্যতীত কিছুই নয়। সে নারীকে চেয়েছে শুধুমাত্র রাতের শয্যায় সঙ্গিনী হিসেবে, যৌনক্ষুধা থেকে মুক্তির উপকরণ রূপে। গল্পে ভিখু পাঁচীকে বসিরের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে নিজের রক্ষিতা বানাতে চেয়েছে। প্রলোভিত করেছে পাঁচীকে, বসিরকে ত্যাগ করে তার সঙ্গিনী হাওয়ার জন্য। যৌন জ্বালা মেটাতে, পাঁচীর সঙ্গ পাওয়ার জন্য নরঘাতক ভিখু পাঁচীর বর্তমান মালিক বসিরের খুন করতেও পিছুপা হয়নি। বসিরকে হত্যা করার পরিকল্পনা অনুযায়ী রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া লোহার শিককে ঘষে ঘষে ছুঁচালো করে রেখেছিল। আসলে শিক সান দেওয়ার রূপকে নিজের পরিকল্পনাকে সান দিতে থাকে। বসিরকে হত্যা করে পাঁচীকে জয় করার পর আদিম উল্লাসে মেতে উঠেছে। ইতিহাস শুরুর আগে থেকেই মানুষ নিজের অধিকারের জন্য লড়াই করে আসছে একে ওপরের সঙ্গে, বেশিরভাগ সময় সেই লড়াইয়ের কারণ হত খাদ্য বা কাঙ্ক্ষিত নারী। বীর সে, তাই নারী, খাদ্য সব তার ভোগ্য। পাঁচীকে হরণ করেছ বসিরের কাছ থেকে। এরপর পাঁচীকে নিয়ে অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়িয়েছে। বর্তমান যাদের পাঁকে ভরা তারাও ঘর বাঁধার আশা নিয়ে অজানা পথে পাড়ি দেয়। গদ্গদে ঘা নিয়ে হাটার সময় পাঁচির কষ্ট হয়, তা দেখে ভিখুর লুকিয়ে থাকা প্রেমিক সত্ত্বাও জেগে ওঠে। এ যেন ঘন মেঘের মাঝে হঠাৎ আলোর আভা। দেখে মনে

হয়, হিংস্র ভিখুর মনেও প্রেম আছে। তাহলে কি ভিখু পাঁচীকে সত্যিই ভালোবেসে ছিলো? ভুলে গেলে চলবে না, এই ভিখুই রাখুর বৌকে ভালোবাসার জালে ফাঁসিয়ে নিয়ে গিয়ে ছ'মাস ভোগ করার পর ফেলে রেখে চলে আসে। পাঁচীর দেহের স্বাদ সে তখনও পাইনি তাই হয়তো এত যত্ন। পৃথিবীর সমস্ত নারী যার কামনার বস্তু, এক্ নারীর প্রতি আসক্ত থাকা তার পক্ষে কষ্টকর।

গল্পে ভিখু চরিত্রে যে আদিমতা প্রকাশ পেয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে বাস্তব। স্বপ্ন বা কল্পনার জগত ভেঙ্গে দিয়ে স্থান দিয়েছেন আদিম বাস্তবতাকে। আদিম প্রবৃত্তি প্রত্যেক মানুষের অন্তরে থাকে। মানুষ শিক্ষার আবরণ দিয়ে সেগুলোকে ঢেকে রাখে। শিক্ষা, সংস্কৃতির আবরণ দিয়ে মুড়ে রাখা জীবনের পাশাপাশি আর একটা দিক আছে যা যৌনতা, হিংসা, কামনা, লোভ, ঈর্ষা দিয়ে ঠাসা। অতৃপ্ত বাসনার যেখানে নিত্য আসা-যাওয়া। মানুষ শিক্ষার প্রভাব দিয়ে জন্মসূত্রে পাওয়া আদিম স্বভাবগুলি লুকিয়ে রাখতে চায়। সমাজের শাসনে এই প্রবৃত্তিগুলিকে দমন করতে বাধ্য হলেও, স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ পেলেই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে আদিম অসভ্য অবস্থার এই প্রবৃত্তিগুলি। আমাদের চারপাশে ঘটে চলা ধর্ষণ, খুনের মতো অ-মানবিক ঘটনা গুলি তার প্রমাণ বহন করে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের ভিখু যেন সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ। হৃদয়াবেগের থেকে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে আদিম প্রবৃত্তির দ্বারা তাড়িত 'ভিখু' নামক চরিত্রটি তিনি অঙ্কন করেছেন। মানুষের অন্তরের চিরন্তন আদিম প্রবৃত্তি ও কুশ্রীতার দিকটি প্রকাশিত হয়েছে ভিখু চরিত্রে। পৃথিবীর সমস্ত হিংস্র আদিম প্রবৃত্তি নিয়ে তার জন্ম। কাম, ক্রোধ, ঈর্ষা, লোভ, লালসা রক্তের মত তার শিরায় শিরায় বহমান। সাধারণত পাপ-পূণ্য, ভালো-মন্দ মিশিয়ে মানুষ, কিন্তু কোনও কালের কোনও পুণ্য ভিখুকে কোনোদিন স্পর্শ করেনি। পুণ্যের পরিধির বাইরে তার বাস। সভ্যতা, সংস্কৃতির আলোর একটু আভা তাকে কোনোদিন ছুঁয়ে যায়নি, সে আজও আদিম, আদিম তার পেশা, নিজের কাঙ্খিত বস্তু হরণ করে নেওয়াতে তার শান্তি। অপরাধ জগতের শীর্ষে তার নাম।

" গভীর অরণ্যে ক্ষত-দুষ্ট ঘা শরীরে নিয়ে বাঁশের মাচায় জীবনযাপনে তাকে একেবারে আদিম মানুষই করে তোলে। পেহ্লাদের স্ত্রীর প্রতি আসক্তি, ভিক্ষাবৃত্তির জীবনে পাঁচীর জন্য আকর্ষণ, যৌন আর্তি, বসির মিঞাকে প্রবলতম ঈর্ষায় সভ্য সমাজের সমস্ত রকম নীতি- নিয়ম- বহির্ভূত শ্বাপদ স্বভাবে নির্মম হত্যা—এ সবই ভিখুর রক্তের বৈশিষ্ট্য। তার এই রক্ত সভ্যতায় পরিশীলিত নয়, আদিমতায় অকৃত্রিম"।[৭]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক অনন্য সৃষ্টি এই ভিখু নামক চরিত্রটি। প্রাগৈতিহাসিক যুগের সকল লক্ষণ তার শরীরে বর্তমান। কামের ক্ষুধা ও পেটের ক্ষুধা মেটানোর জন্য সে আজও আদিম মানুষের পথ অনুসরণ করতে অভ্যস্ত। যেন প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার যুগের মানুষ সে। হৃদয়ের যে সমস্ত আবেগ, অনুভূতি আমাদের মানুষ করে তোলে, তার চরিত্রের সেগুলির কোনও স্থান নেই। প্রাগৈতিহাসিক বর্বরতায়

ঠাসা, বন্য, আদিম ও অসভ্য এক মানুষ ভিখু। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ভিখুর আচরণ ও ব্যবহারের মধ্যে মানুষের অসভ্য অবস্থাকালীন বৈশিষ্ট্যগুলিকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। আদিম সমাজের নগ্নতার এক জ্বলন্ত প্রকাশ ফুটে উঠেছে তার মধ্য দিয়ে। এই নগ্নতা আজও সমাজের শিরায় শিরায় বিদ্যমান। ভিখু নামক এই বর্বর চরিত্র আজও সমাজে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ভিখুর সমগোত্রীয় মানুষ আজও সমাজে বর্তমান। সমাজের বুকে ঘটে চলা ঘৃণ্য অমানবিক অপরাধ সেই প্রমাণ বহন করে। সমাজ আজও তাদের কবল থেকে মুক্ত হতে পারেনি। আদিম এই প্রবৃত্তি ছড়িয়ে পড়েছে বর্তমান সমাজের শিরায় শিরায়। হয়তো প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বয়ে আসা এই প্রবৃত্তি, নগ্নতা, অন্ধকার ধীরে ধীরে ছড়িয়ে যাবে ভবিষ্যতেও।

তথ্যসূত্র :

১) মিত্র সরজমোহন, বৈশাখ ১৩৭৭, ‘ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য’, ১১-এ, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রিট কলিকাতা -১২, গ্রন্থালয় প্রা: লি:, পৃ- ১৪০।

২) চক্রবর্তী যুগান্তর, শ্রাবণ ১৩৫৭, ‘ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প’, ১৪ বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি ট্রিট কলকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, পৃ- ১৯।

৩) তদেব, পৃ-১১।

৪) তদেব, পৃ-১২।

৫) তদেব, পৃ-১২।

৬) তদেব, পৃ-১২।

৭) দত্ত বীরেন্দ্র, আগস্ট ১৯৫৫, ‘ বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ’(প্রথম খণ্ড), কলকাতা ৯, পুস্তক বিপনি, পৃ-৭৩০।

সহায়ক গ্রন্থ :

১) চক্রবর্তী সুমিতা, জানুয়ারি ২০০৪, ‘ছোট গল্পের বিষয় আশয়’, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, পুস্তক বিপণি।

২) দত্ত বীরেন্দ্র, আগস্ট ১৯৫৫, ‘ বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ’(প্রথম খণ্ড), কলকাতা ৯, পুস্তক বিপনি,

৩) বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার, পুনর্মুদ্রণ: ২০০০-২০০১, ‘বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’, ১০ বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি স্ট্রিট, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড।

৪) ভট্টাচার্য বিশ্ববন্ধু, জুন ২০০০, 'ছোটগল্পে ত্রয়ী, তারাশংকরঃ মানিকঃ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়’, ১১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট , গ্রন্থবিকাশ।

৫) মিত্র সরজমোহন, বৈশাখ ১৩৭৭, ‘মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য’, ১১-এ, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রিট, কলিকাতা -১২’ গ্রন্থালয় প্রা: লি:।

৬) সরকার সুনীলকুমার, তৃতীয় সংস্করণ জুলাই: ১৯৫৯, ‘ফ্রয়েড’, , ভিআইপি রোড কলিকাতা-৫৯, শ্রীমহানব্রত কালচারাল এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ।

বাংলা মঞ্চ ও অভিনয়ের বিবর্তনরেখা : শম্ভু মিত্রের বুদ্ধিদীপ্ত আলোকপাত

লিপিকা সরকার
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
মাইকেল মধুসূদন মেমোরিয়াল কলেজ

সারসংক্ষেপ : শম্ভু মিত্র, জন্ম ১৯১৫ সালের ২২ আগষ্ট, মৃত্যু ১৯ মে ১৯৯৭। কলকাতার ডোভার রোডে মাতামহ আদিনাথ বসুর বাড়িতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শরৎকুমার মিত্র, মাতা শতদলবাসিনীদেবী। শম্ভু মিত্রের পুর্বপুরুষ হুগলি জেলার কলাছড়া নামক গ্রামে জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন, এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। তবে এই জমিদারির প্রতি কোনোপ্রকার আগ্রহ যেমন তাঁর পিতা শরৎচন্দ্রের ছিল না, তেমনি পুত্র শম্ভু মিত্রও এসব ক্ষেত্রে একটু বেশিই উদাসীন ছিলেন। শম্ভু মিত্রের মা শতদলবাসিনীদেবী বেশিদিন বাঁচেননি। কিন্তু শম্ভু মিত্রের জীবনে তাঁর মা গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তিনি আজীবন বিশ্বাস করেছেন, মা তাঁর সমস্ত কাজ অলক্ষ্যে থেকে দেখছেন। তাই ভালো কাজ করাই ছিল শম্ভু মিত্রের ব্রত। এভাবেই শুদ্ধ জীবন ও সৎ চিন্তার ধারক ও বাহক হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তাঁর সৃষ্টির সমগ্রতায় সেই সাধনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। আজীবন নাটকের সঙ্গে যুক্ত থেকে তৎ-সম্পর্কিত যে লেখিলেখি তিনি করেছেন তাতে নাট্য প্রাবন্ধিকের সেই বোধের গভীরতা প্রকাশ পেয়েছে। বাংলা থিয়েটারের বর্তমান প্রেক্ষিত সম্পর্কিত তাঁর প্রবন্ধটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং তাৎপর্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে শিশিরকুমার ভাদুড়ী থেকে শুরু করে শম্ভু মিত্রের নিজস্ব সময়কাল পর্যন্ত বাংলা থিয়েটারের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কিত একটা সুস্পষ্ট পথরেখা নির্মিত হয়ে যায়। কালানুসারে পূর্বের দুটি সংখ্যায় আলোচিত বিষয়ের প্রথম দুটি পর্ব প্রকাশিত হয়েছে, বর্তমানে তৃতীয় বা শেষ পর্ব আলোচনার চেষ্টা রইলো।

মূল শব্দ : শিশিরকুমার, থিয়েটার, নাটক, অভিনয়, মঞ্চ, দৃশ্য, গণনাট্য, নবান্ন, নবনাট্য, ধ্বনিমাধুর্য, শিল্পরীতি, সমকাল, শম্ভু মিত্র, স্বরক্ষেপ, অনুভব, উপলব্ধি।

মূল বিষয় : শিশিরকুমার থেকে শুরু করে নাট্যপ্রাবন্ধিক শম্ভু মিত্রের সময়কাল পর্যন্ত আধুনিক বাংলা থিয়েটারের নানা বিষয় নিয়ে প্রাবন্ধিক আলোকপাত করেছেন। বাংলা থিয়েটারে ব্যক্তিবিশেষের অবদান আলোচিত হয়েছে। বর্তমান আলোচনার সূত্রপাত শিশিরকুমারের যুগ থেকে। শিশিরকুমারকে নিয়ে ইতিপূর্বে শম্ভু মিত্র 'শিশিকুমার', 'নাট্যমুহূর্ত ও শিশিরকুমার', 'শিশিরকুমারের প্রয়োগকলা' ইত্যাদি বেশ শকিছু প্রবন্ধে শিশিরকুমারের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এমন কী 'কিছু স্মরণীয় অভিনয়' প্রবন্ধ লিখতে বসেও তিনি বার বার শিশিরকুমারের অভিনয়ের কথা স্মরণ করেছেন।

শুধু অভিনয় নয়, অভিনয়ে যে ধরনের শিল্পরীতির প্রয়োগ তিনি বাংলা থিয়েটারে আমদানি করেছিলেন তা একেবারে আলাদা করে চোখে পড়ার মতো। শিশিরবাবুর অভিনয় যে শম্ভু মিত্রকে কী পরিমানে মুগ্ধ করতো, এবং তাঁর অভিনয় জীবনকে অনুপ্রাণিত করেছিল, তা উপরোক্ত প্রবন্ধগুলি পড়লেই বোঝা যায়। শিশিরকুমার সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের বক্তব্য এইরকম--- "শিশিরকুমার হলেন প্রকৃত অর্থে বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রথম নির্দেশক। নাট্য অভিনয়কে একটি সামগ্রিক শিল্পকর্ম হিসেবে তিনিই প্রথম দেখেন। 'নাট্যমন্দির'এ তাঁর প্রযোজনাতে তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর সূক্ষ্ম শিল্পবোধের পরিচয়। তার মঞ্চশজ্জা, তার পোশাক-পরিচ্ছদ, আগের কালের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁর প্রযোজিত যোগেশ চৌধুরীর সীতা এবং দিগবিজয়ী নাটক, শরৎচন্দ্রের ষোড়শী এবং রমা, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নরনারায়ণ, আলমগীর এবং রঘুবীর আজ কিংবদন্তীর মতো।"[১]

গিরিশ যুগের সঙ্গে শিশির যুগের সুক্ষ্ম তফাৎ প্রাবন্ধিক এখানে স্পষ্ট করেছেন, সেদিকটা আমরা আগে একবার দেখে নিতে পারি, গিরিশচন্দ্রের নাটক ছিল মূলত গান সর্বস্ব। শিশিরকুমারের নাট্যাভিনয়ে গানের চেয়ে অভিনয়ের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 'সংগীতের চেয়ে সংঘাতে'র ব্যাপারটাকে সেখানে বড়ো করে দেখানো হয়েছে। তাই বলে নাচ-গান একেবারে ছিল না, এমনটি নয়। 'নাট্যমন্দির'এ নাচ-গানের জন্য যে 'সখীর দল' ছিলো, তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা শহরে। তবে এসবের উর্দ্ধে শিশিরকুমার ছিলেন মহৎ অভিনেতা, এবং অভিনয়ে তিনি একটি নতুন ধারা নিয়ে এসেছিলেন। এবিষয়ে সমালোচকরা অনেক সময় বলে থাকেন তিনি নাকি বড্ড বেশি 'ন্যাচারাল', তাঁর অভিনয় তাই 'ন্যাচারালিস্টিক্'। আর শিশিরকুমারের অভিনয় দেখে শম্ভু মিত্র বুঝেছিলেন, তিনি অনেক বড়ো মাপের শিল্পী। শম্ভু মিত্রের সমৃদ্ধি ঘটেছিল শিশিরকুমারের অভিনয় দেখে। সময়ের নিরিখে এই মানুষটির শিল্পসত্ত্বা নিয়ে বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক স্পষ্ট করেছেন, ''প্রত্যেক মহৎ শিল্পীও তাঁর সমসাময়িক কালের সঙ্গে অচ্ছেদ্যবন্ধনে বাঁধা। তিনি শুধু শব্দের ব্যঞ্জনাকে প্রকাশ করেন তাই নয়, সমসাময়িক যুগের ভাবনা-চিন্তাকেও মূর্ত করে তোলেন তাঁর অঙ্গের চালনায় ও শব্দব্যবহারের ভঙ্গিতে। এর সাহায্যেই তিনি নাটকে বর্ণিত বিষয়কে অতিক্রম করে যান, কেননা তিনি শিল্পী।"[২] বিষয়কে অতিক্রম করে বিষয়ান্তরে প্রবেশ ক্ষমতা একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতার প্রধান শক্তি। সেই শক্তিবলে বলিয়ান শিশিরকুমারের অভিনয়ে আরও একটি সম্পদ হোল আবেগ। আর সেই আবেগের সঙ্গে বুদ্ধি ও মনন প্রতিফলিত হয়েছে শিশিরকুমারের অভিনয়ে। যা সমকালিন থিয়েটারকে উদ্দীপিত ও উজ্জীবিত করেছে।

যেকোনো শিল্পকর্মে বাস্তবের প্রতিফলন ঘটে। অভিনয়ে রূপায়িত বিষয়ের সঙ্গে আমাদের 'অন্তর্নিহিত আশা-আকাঙ্ক্ষা'র স্বপ্ন মিশে থাকে। এই স্বপ্ন সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হতে পারে। পুরনো যুগের চিন্তা ভাবনা পরবর্তীকালের কাছে অর্থহীন মনে হতে পারে, কেননা আগের যুগের অভিনয়ের ধরন পরে পাল্টে যেতে থাকে, ফলে কিছু

অস্বাভাবিক লাগলেও লাগতে পারে। প্রাবন্ধিক যে সময়ের অভিনেতাদের কথা বলছেন, সেই সময় শিশিরবাবুর মতো অভিনেতারা অভিনয়ে যে নতুন নতুন অভিনয়রীতি নিয়ে এসেছিলেন, তার মধ্যে একটি হোল অভিনয়ে নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি করা। শিশিরকুমার সৃষ্ট নাট্যমুহূর্ত অসম্ভব কাব্যময় ও আবেগপ্রবণ হয়ে উঠতো, সেই আবেগে দর্শক আপ্লুত হয়ে উঠতেন।

যদিও সেই সময়ের অনেক অভিনয়ে এই ধরনের আবেগ কখনো কখনো হয়ে উঠতো বেশ 'প্রদর্শনলোভী' এবং 'মোটা দাগের'। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রাবন্ধিকেরও এমনটি মনে হয়েছে বৈকি। 'ন্যাচারালিস্টিক' বলতে যে স্বাভাবিকতা বোঝায়, প্রকৃত অর্থে সেই বাস্তবতা কিন্তু সকলের অভিনয়ে মেলে না। বরং শীশিরকুমার ছাড়াও প্রাবন্ধিক সেই সময়ের অসাধারণ দুইজন অভিনেতার নাম করেছেন, যাঁদের অভিনয়ে এই ধরনের স্বাভাবিকতা বজায় ছিল। এই দুইজন অভিনেতা হলেন শ্রীযোগেশ চৌধুরী এবং শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। তাঁদের অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেও শম্ভু মিত্র প্রবন্ধ লিখেছেন। সেই সঙ্গে এই গুণী অভিনেতাদের নিয়ে প্রাবন্ধিকের আক্ষেপ ছিল। আক্ষেপ ছিল এই কারণে যে, "এই দু-জন অভিনেতা কোনোদিন সে-যুগের থিয়েটার-মালিক বা দর্শক সমাজের কাছ থেকে সেরকম বড় অভিনেতা বলে স্বীকৃতি পাননি। কেননা তাঁদের অভিনয়ে এই উজ্জ্বল বর্ণশোভার কারুকার্য ছিল না।"[৩] এইভাবে অভিনয়ের ধরণ, মঞ্চসজ্জা সবকিছুতে এক ধরনের পরিবর্তন এসেছিলো। তবে সেই পরিবর্তন যেমন বিদেশে এসেছিল, সেখানে তারা বিজ্ঞান ও জ্ঞান চেতনার দ্বারা সমৃদ্ধি লাভ করেছিল, ইউরোপের যে 'রিয়ালিস্টিক থিয়েটার'এর আবির্ভাব হয়েছিল, আমাদের দেশে ঠিক তেমনটি হয়নি। শম্ভু মিত্র মনে করেন, আমরা আকার প্রকারের অন্ধ অনুকরণ করেছি কিন্তু মূলের অনুসরণ করতে পারিনি। তবে কেউ কেউ যাঁরা এটা করতে পেরেছিলেন, তাঁরা কালজয়ী শিল্পীর অভিধায় ভূষিত। সেভাবেই শিশিরকুমার একটা যুগকে ('শিশির যুগ') প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

গণনাট্য সংঘ এবং 'নবান্ন' নাটকের ওপর প্রাবন্ধিক বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন। গণনাট্য সংঘের প্রথম প্রযোজনা বিজন ভট্টাচার্যের। 'নবান্ন'এ মানুষের সেই আশা-আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়ে উঠেছিল। এই নাটককে ঘিরে বাংলা নাটকের পালা বদল সূচিত হয়েছিল। ১৯৪৪ এর এই নাটকটি জনসাধারণের মনে সারা জাগিয়েছিল, চেতনা এনেছিল নবনাট্যের। 'নবান্ন' প্রযোজনার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লেখক এখানে উল্লেখ করেছেন। এ নাটকের ধরন ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। নির্দিষ্ট ছক মেনে 'নবান্ন' নাটক লেখা হয়নি, এই ছক-ই 'বাস্তববাদী' রীতি হিসেবে চিহ্নিত। 'ছক-কাটা' কোন গল্পের কাঠামো না থাকায় 'চরিত্রগুলির সংঘাত হয় এবং ঘটনা চরমে' ওঠে। 'নাটকটির গঠন ছিল পর্বে পর্বে বিবরণমূলক'। 'নবান্ন'র গঠনপ্রকৃতির দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, নাটকটি বিবৃতিমূলক। দুর্ভিক্ষের সময়ে চাষীদের দুর্ভোগের ধারাবাহিক বিবরণ মেলে নাটকটিতে। নিজেদের গ্রাম, নিজেদের ভিটে মাটি ছেড়ে শহরে চলে আসে মানুষগুলো।

কেউ কেউ আবার গ্রামে ফিরে গিয়ে নতুন করে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে। এই বিবরণধর্মী নাটকটিতে রয়েছে অজস্র চরিত্রের সমাহার। সে সময়ে অবশ্যই এটা একটা অভিনব দিক। কারণ এর আগে নাটকে এত সাধারণ মানুষের একসাথে উপস্থিতি দেখা যায়নি সেভাবে। তবে 'নবান্ন'এর প্রযোজনায় সেদিন যেভাবে গবেষণালব্ধ কাজ হয়েছিল, তা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। এই নাটকটির মধ্যেও কোন কোন 'বুদ্ধিজীবী কিঞ্চিত উদ্ভট রসের প্রাধান্য' খুঁজে পেয়েছিলেন, তাদের এই অনুসন্ধিৎসু মানসিকতার জন্য প্রাবন্ধিককে বলতে হয়েছিল, 'সত্যিই বড় মর্মস্পর্শী, তবে দুর্ভাগ্যবশত কিঞ্চিৎ উদ্ভট রসের' প্রাধান্যই তাদের খুঁজে বেড়াতে হয়েছে, অনেক ভালোকিছু থাকা সত্ত্বেও সেগুলো তারা দেখতে পেলেন না। তবে প্রাবন্ধিক এটা ভেবে অবাক হয়ে যান যে, পরবর্তী সময়ে এই ধারায় যখন ব্রেখ্ট্-এর নাট্যশৈলীর প্রচলন হয়, তখন সকলে বিনা বাক্যব্যায়ে উৎসাহের সঙ্গে তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি নবান্ন নাটকের ক্ষেত্রে অত্যন্ত মনোগ্রাহী হয়েছিল, সেটি হল এর মঞ্চ-সজ্জা। 'নবান্ন'এর মঞ্চসজ্জা এতই 'বাস্তবানুগ' ছিল যে, 'রঙ্গমঞ্চে একই দৃশ্যে দু'টি ভিন্ন স্তরের প্রয়োগ হয়'। এই স্তর দুটিতে যেমন একইসঙ্গে স্থানগত বিভিন্নতা ছিল তেমনি এর চরিত্রচিত্রণে ছিল অভিনব প্রয়োগ।

তৃতীয় যে বিষয়টি 'নবান্ন' নাটককে অভিনবত্ব দান করেছিল তা হল এর অভিনয়রীতি। নাটকটির আগাগোড়া অভিনেতাদের অভিনয় অনেক বেশি সাবলীল এবং স্বাভাবিক ছিল। এ বিষয়ে প্রাবন্ধিকের বক্তব্য, ''এই স্বাভাবিকতার মধ্য দিয়েই নাটকটিতে অনেক গভীর কাব্যমুহূর্ত সৃষ্টি হোত। শুধুই নীরবতার মাধ্যমে নয়, (সাধারণত বাস্তবধর্মী নাটকে এইভাবেই কাব্যময় অভিঘাতের সৃষ্টি হয়), আবেগময় দৃশ্যে কথা বলার বিশিষ্ট ভঙ্গিতেও এই অনুভূতি জাগাতো।...আমাদের থিয়েটার তখন সমাজমানসের একটা কেন্দ্র খুঁজে পেয়ে যেন মুক্তি পেয়েছে, সেই কেন্দ্রের বোধ তখন যেন অবাধ স্বাধীনতার আস্বাদ এনেছে নাট্যরূপের মধ্যে।...নাট্যটি বিপুল সাফল্য লাভ করে, এবং প্রত্যেকের কাছে নতুন যুগের সূচনা বলে স্বীকৃত হয়।''[৪]

১৯৪৮ সালে গণনাটা সংঘে ভাঙ্গন ধরে। বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রচারের জন্য নাট্যকর্মীদের ওপর প্রেসার আসতে থাকে। কোনো শিল্পী কাজ করবে তাঁর স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত চিন্তাভাবনা দিয়ে। সেখানে এই ধরনের চাপ শিল্পীর কাজে বাধা দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। স্বাভাবিকভাবেই গণনাট্য সংঘ ভাঙতে থাকে। এতদিন ধরে, এত ভালো কাজ ক'রে এই সংগঠন অনেক দক্ষ মানুষ, ও সুদক্ষ কলাকুশলী ব্যক্তিবর্গকে আকর্ষণ করতে পেরেছিল, কিন্তু সেদিন গণনাট্য সংঘের ভাঙ্গনকে কেউ ঠেকাতে পারেনি। তাই বলে গণনাট্য সংঘ থেকে সেদিন যাঁরা বেড়িয়ে এসেছিল তাঁরা কেউ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকেননি। বরং গণনাট্য সংঘের আদর্শকে আত্মস্থ করে তাঁরা এই কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৯৪৮ সালেই প্রতিষ্ঠিত হয় 'বহুরূপী' নাট্যদল। মাত্র 'কয়েক বছরের মধ্যে আরো বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এই কাজ চালিয়ে যাওয়ার

জন্য'। বহুরূপীর উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা 'নতুন ইহুদি' নাটক, যার ঘটনার বিষয়বস্তু ছিল পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তু সমস্যা। 'বহুরূপী'র কোন নির্দিষ্ট রঙ্গমঞ্চ ছিল না। সম্পূর্ণ আত্মনিষ্ঠ এবং অব্যবসায়িক একটি নাট্যসংস্থা 'বহুরূপী'। এঁরা আখ্যায়িত হয় 'অন্য থিয়েটার' নামে। নিষ্ঠার সঙ্গে 'ভালো করে ভালো নাটক' করে যাওয়াই এদের একমাত্র উদ্দেশ্য। নাট্যপ্রাবন্ধিক শম্ভু মিত্র তাঁর বক্তব্যে উপস্থাপন করেন বহুরূপীর কৃতিত্ব, "অনেক প্রযোজনার দ্বারা 'অন্য থিয়েটার' বহুলভাবে প্রমাণ করে যে, সে সামাজিকভাবে দায়িত্বসম্পন্ন, যা সাধারণ রঙ্গমঞ্চগুলিতে তখন মোটেই ছিলো না। 'সাধারণ থিয়েটার' যারা বাঁধা প্রেক্ষাগৃহে নিয়মিত অভিনয় করতো--- তারা ক্রমশই আরো বেশি করে ব্যবসায়িক মনোভাবাপন্ন হতে থাকে, আর বাংলা নাট্যের যা কিছু মানমর্যাদা তা প্রতিষ্ঠা করেছে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের বাইরের ঐ 'অন্য থিয়েটার'।"[৫]

তবে অনেকে অনেকভাবে বহুরূপীর এই নতুন নতুন সফলতাকে আটকে দিতে চেয়েছেন, তাঁদের চিন্তাভাবনাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। মঞ্চ মালিকরা তাদের নিয়মিত মঞ্চ ভাড়া দিতে পর্যন্ত অস্বীকার করেছে। যে দিনগুলোয় দর্শক কম থাকে, সেই দিন ছাড়া তারা মঞ্চ ভাড়া পায়নি, প্রবল প্রতিবন্ধকতা সত্বেও বহুরূপী অপ্রতিরোধ্য। 'নাট্যকর্মীদের নিঃস্বার্থ নিষ্ঠার জন্য এই নবনাট্যের প্রসারকে কোনো মতেই রোধ করা যায়নি'। বেশকিছু নাটক অভিনয়ের সফলতা প্রাপ্তির পরে তাঁদের নতুন চিন্তাভাবনা শুরু হয় রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। বহুরূপীর পরবর্তী উন্নতির ধাপ সূচিত হয়েছে নাটককার রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করার মধ্য দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয় করতে গিয়ে শম্ভু মিত্রের নিজস্ব অভিজ্ঞতা তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে--- "তাঁর দু-একটি নাটক অভিনীত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেলো যে, তাঁর লিখিত সংলাপ অত্যন্ত জীবন্ত ও দ্যুতিসম্পন্ন এবং বিস্ময়করভাবে সূক্ষ্মতামণ্ডিত, --- যে-সূক্ষ্মতা অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকমনে নাটকীয় অভিঘাত জাগাতে সক্ষম। বোঝা গেলো যে এই বাস্তব জগৎ, এ সম্বন্ধেই তিনি লিখেছেন, এই বাস্তব জগতের বাস্তব সমস্যাগুলিই তাঁর লেখবার বিষয়।"[৬]

শম্ভু মিত্রের বিভিন্ন প্রবন্ধে নাটক বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি দেশীয় ঐতিহ্যের উল্লেখ করেছেন বারবার। শুধুই পশ্চিমী অনুকরণ নয়, অথবা 'পশ্চিমী রীতি' দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বিচার করলে তাঁকে 'অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য' বলে মনে হবে, এতদিন রবীন্দ্র-নাটকের সঙ্গে এটাই হয়ে এসেছে। প্রাবন্ধিক আরো বলেছেন যে, 'নবান্ন' নাটককে কেন্দ্র করে তাঁদের যে 'নতুন নাট্যধারার সূচনা' হয়েছিল, যার "লক্ষ্য ছিল এমন এক নাট্যরূপের যা একদিকে যেমন আধুনিক অপরদিকে তেমনিই বিশিষ্টভাবে ভারতীয়। এবং এই বুদ্ধিদীপ্ত ভারতীয় থিয়েটার গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষাই এই নাট্যকর্মীদের রবীন্দ্রনাথের নাটক মঞ্চস্থ করার বিশিষ্ট নাট্যরূপে পৌঁছে দিয়েছে।... অথচ বুঝতে পারা যায় যে নানা শিল্পকলা প্রকাশের যে পরম্পরা আছে আমাদের, তারই মধ্যে তাঁর শিকড় প্রোথিত, এবং সেই শিকড় থেকেই তিনি আহরণ করেছেন তাঁর প্রাণশক্তি। নিরক্ত

নন্দনতাত্ত্বিক নয় তাঁর নাটক, যেমন নয় ধার-করা সংস্কৃতির উন্নাসিক মুষ্টিমেয়-র লক্ষ্যে উদ্দিষ্ট।"[৭]

'থিয়েটারকে সমৃদ্ধ' করতে গেলে, 'কিছু ধ্রুপদী নাটক' প্রয়োজন, যা 'নতুন ভাষ্য' তৈরি করে। প্রাবন্ধিক মনে করেন, তাহলেই নাটকের অভাব পূরণ হতে পারে, কেননা যুগে যুগে সেগুলোই উপস্থাপিত করা যায়। আর সেক্ষেত্রে 'অভিনেতা এবং প্রযোজকদের বিকাশ অব্যাহত থাকে'। কলকারখানায় অর্ডার দিয়ে যেমন ভালো নাটক তৈরি করানো যায় না, তেমনি 'নতুন ধরনের ও গভীর উন্মোচনের' নাটক জন্ম নিতে পারে বহু সামাজিক কার্যকারণের মধ্য দিয়ে। আবার নাটক যখন অবনতির পথে ধাবিত হয়, তারজন্যেও 'বহু সামাজিক কারণ থাকে'। রবীন্দ্রনাথের নাট্যধারা সঙ্গে রেখে শম্ভু মিত্ররা সারা বিশ্বের সেরা নাট্যসাহিত্য থেকে অভিনয়ের জন্য নাটক বাছাই করে নিয়েছেন। পাশাপাশি রাজনৈতিক থিয়েটারগুলো চলছিল রাজনৈতিক বক্তব্য প্রচার করার জন্য। এছাড়া ছিল পথ নাটক। আর ততদিনে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হওয়ার সুবাদে গ্রামাঞ্চলে যাত্রার জনপ্রিয়তা বেড়ে গিয়েছিলে বহুগুণ। সেই যাত্রাগুলির অভিনীত বিষয় ছিল 'স্বাধীনতা আন্দোলনের নানা কাহিনী', হিটলার, লেনিন প্রমুখের কাহিনিও যাত্রাপালার বিষয় হয়ে উঠেছিল। এ সমস্ত বিষয়গুলো তখন দর্শক সাধারণকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করেছিল।

বাদল সরকারের গবেষণালব্ধ নাটকগুলোও তখন চলছিল। বাদলবাবুর নাটক নিয়ে সেইসময় মানুষের মধ্যে উৎসাহ ও আলোচনার শেষ ছিলনা। এছাড়াও বিভিন্ন মতের ও বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির 'অসংখ্য গোষ্ঠী নতুন নতুন রীতি নিয়ে পরীক্ষা-সমীক্ষা' চালাচ্ছেন। প্রসঙ্গক্রমে শম্ভু মিত্র বলেছেন,"অনেক তরুণ-তরুণী অবশ্য আধুনিকতম হবার উৎসাহে পশ্চিম গোলার্ধে যখনই যা হাওয়া বইছে তখনই তার সুরে গলা মেলাবার চেষ্টা করছেন। এবং ফলে তাদের মাথা যাচ্ছে ঘুলিয়ে, শেকড় যাচ্ছে হারিয়ে,--- ঠিক যেমন ঘটেছিলো তাঁদের বাপ-ঠাকুর্দাদের আমলে, ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির সন্তান হবার হিসেবে।"[৮]

আসলে শম্ভু মিত্র চান সেই ঐতিহ্যবাহী নাটক, যা মানুষকে চেতনা সম্পন্ন করবে ও মুক্ত আনন্দ প্রদান করবে। স্বাধীন-মুক্তচিন্তা নিয়ে শিল্পের জন্ম দিতে হবে। যে সমস্ত কারণে আমাদের শেকড় হারিয়ে যাচ্ছে, তার কয়েকটি নীচে সূত্রাকারে দেখানোর চেষ্টা করা হলো:- প্রথমত, দেখা যাচ্ছিল 'ব্রেখ্ট্, ইয়নেস্কো, টেনেসি উইলিয়ামস্, এডওয়ার্ড অলবি' প্রমুখের নাটক যেভাবে অভিনীত হয়েছে, সেখানে ভাবানুবাদের ক্ষেত্রেও 'কুম্ভীলকবৃত্তি' গৃহীত হয়েছে। সেক্ষেত্রে চিন্তাভাবনায় শিল্পবোধ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। দ্বিতীয়ত, নতুন নতুন নাটক লেখা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু যে নাটক দিয়ে নতুন যুগের সূচনা হতে পারে, সেরকম নাটকের সন্ধান মিলছে না। তৃতীয়ত, অভিনয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু পরিবর্তন ঘটেনি। গত দশকগুলোতে যে ধারায় অভিনয় হয়ে আসছিল, মোটামুটি সেই ধারাই অব্যাহত রয়েছে। শম্ভু মিত্র বলেছেন, 'বরং কিছু

কিছু নতুন অভিনেতার অভিনয়ের ধরন মধ্য-চল্লিশের ব্যবসায়িক মঞ্চের অভিনয়ের কথাই মনে করিয়ে দেয়'। চতুর্থত, 'অন্য থিয়েটার' এবং 'ব্যবসায়িক থিয়েটার' দুটো নাম এবং তার কার্যকারিতার যে পার্থক্য, তা যেন ক্রমাগত হারিয়ে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিকের অভিমত, "খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার মোহে অনেক অভিনেতা ও নির্দেশক ব্যবসায়িক দৃষ্টিতে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছেন। ফলে, যে সুস্থ বিভেদ নিয়ে কাজ শুরু হয়েছিলো তার অবলুপ্তি ঘটছে, আবহাওয়া কলুষিত হয়ে উঠছে।"[৯] পঞ্চমত, "এই রাজ্যের ভয়াবহ রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা হয়তো নাট্যজগতের এই বিভ্রান্তির কারণ। প্রাণ এখন খুব সুলভ এবং নীতিজ্ঞান তেমনই দুর্মূল্য। বেকারের সংখ্যা প্রতি বছর বেড়েই চলেছে। স্বাধীনতার পর থেকে এখনো লাখেলাখে উদ্বাস্তু আসছেন। রাজ্যের অর্থনীতি ভেঙে পড়ছে।"[১০] প্রাবন্ধিকের এই কথাগুলি বর্তমান রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে ভীষণভাবে মিলে যায়, তাই বাস্তববাদী, স্বচ্ছ দৃষ্টি ও স্পষ্ট ভাষা সরাসরি কোট করা হলো। ষষ্ঠত, শিল্পীরা যেন তাঁদের কেন্দ্র হারিয়ে ফেলতে বসেছেন। অদ্ভুতভাবে 'ব্যায়বেলের মিনারের মতো চারপাশের কোলাহল' কানে ভেসে আসবে, কিন্তু সে নির্বিকার, হাজার কোলাহলেও ভাবের বিনিময় নেই। যেখানে রাজনীতির নামে একজন মানুষকে উত্তেজিত ও প্ররোচিত করা হয় অপর একজন মানুষকে খুন করার জন্য, সেখানে অবশ্য 'ভাবসংযোগ সম্ভব বলে' প্রাবন্ধিক মনে করেন না।

শত অপমান, শত দুঃখ, শত প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও যিনি সতত চলমান সেই মহান নাট্যপ্রাবন্ধিক শম্ভু মিত্র জীবনে কখনো আশাহত হননি। তাঁর সহকর্মীরাও যখন তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছেন, তখনো তিনি বীনা বাক্যব্যয়ে ক্ষমা করে দিয়েছেন সকলকে এবং নিজে থেকেছেন নির্বিকার। নিজের প্রতি অত্যন্ত সচেতন এবং বিশ্বস্ত থেকে তিনি আশা করেছেন, চাঁদ সওদাগরের ডিঙ্গি ঠিক ভেসে উঠবে। তাই ভবিষ্যৎ স্বপ্ন প্রয়াসী প্রাবন্ধিক আশা রাখেন, স্বপ্ন দেখেন, "হয়তো এরই মধ্যে, কিংবা এর ভিতর দিয়ে চ'লে, উত্তীর্ণ হয়েই, নতুন জন্ম নেবে সমাজ। থিয়েটারেরও হয়তো তখনি আসবে এক নতুন রূপ,----আরো অনেক উন্নত বোধ আর প্রখরতর কোন নতুন চেতনা নিয়ে।"[১১]

তথ্যসূত্র :

১) রচনা সমগ্র-২, শম্ভু মিত্র, সম্পাদনা-শাঁওলী মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-২০১৭, পৃষ্ঠা-১৭১

২) রচনা সমগ্র-২, শম্ভু মিত্র, সম্পাদনা-শাঁওলী মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-২০১৭, পৃষ্ঠা-১৭২

৩) রচনা সমগ্র-২, শম্ভু মিত্র, সম্পাদনা-শাঁওলী মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-২০১৭, পৃষ্ঠা-১৭৩

৪) রচনা সমগ্র-২, শম্ভু মিত্র, সম্পাদনা-শাঁওলী মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-২০১৭, পৃষ্ঠা-১৭৭

৫) রচনা সমগ্র-২, শম্ভু মিত্র, সম্পাদনা-শাঁওলী মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-২০১৭, পৃষ্ঠা-১৭৮

৬) রচনা সমগ্র-২, শম্ভু মিত্র, সম্পাদনা-শাঁওলী মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-২০১৭, পৃষ্ঠা-১৭৯

৭) রচনা সমগ্র-২, শম্ভু মিত্র, সম্পাদনা-শাঁওলী মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-২০১৭, পৃষ্ঠা-১৭৯

৮) রচনা সমগ্র-২, শম্ভু মিত্র, সম্পাদনা-শাঁওলী মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-২০১৭, পৃষ্ঠা-১৮০

৯) রচনা সমগ্র-২, শম্ভু মিত্র, সম্পাদনা-শাঁওলী মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-২০১৭, পৃষ্ঠা-১৮০

১০) রচনা সমগ্র-২, শম্ভু মিত্র, সম্পাদনা-শাঁওলী মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-২০১৭, পৃষ্ঠা-১৮০

১১) রচনা সমগ্র-২, শম্ভু মিত্র, সম্পাদনা-শাঁওলী মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্সষষ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-২০১৭, পৃষ্ঠা-১৮০

বাঙালি নারীর স্মৃতিকথায় আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অনুভব

অতনু রায়
গবেষক, বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: আদি ও মধ্যযুগের খন্ড কবিতায় কবি নিজের নাম উল্লেখ করতেন একেবারে শেষের দিকে ভণিতায়। কিন্তু বাংলায় স্মৃতিরোমন্থনমূলক রচনার সূত্রপাত একেবারেই অর্বাচীন। পূর্ণাঙ্গ স্মৃতিকথা লেখা হল উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে। কাজটা সহজ ছিল না, কেননা রেখে ঢেকে বলতে হবে অনেক কিছু। এই জাতীয় রচনায় যেমন কল্পনার আশ্রয় নিতে হয় না তেমনই সত্য তথ্য উপস্থাপনের ফলে রচনাকারকে সমাজের একশ্রেণির মানুষের ক্ষোভের শিকার হতে হয়। আর জীবনীকার যদি নারী হন, তাহলে তিনি যেমন সংখ্যালঘুত্বের দাবীতে গুরুত্ব লাভ করেন সেইসঙ্গে পাঠকও বেশি কৌতূহল হয়ে ওঠে অন্দরমহলের আন্তরিক তথ্য ও চিত্র জানার জন্য। শুধু অন্দরমহলের চিত্র নয়, পাশাপাশি উনিশ শতকের নারী আন্দোলনের উদ্ভাবনী নারীশক্তি নারী-স্বাধীনতার বাতায়ন খুলে দিলে নারী তার নিজের বয়ানে লিখল স্মৃতিকথা। নারীর লিখিত এই আত্মকথন তারই সংকট থেকে উত্তরণের অন্যতম দলিল বলা যায়। শুধু কি নারীর সংকট থেকে উত্তরণের দলিল? বলা যায়, নারীর স্মৃতিকথায় বাংলার সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক আন্দোলনের যে দিকগুলি উঠে এসেছে তাতে বাংলার ও বাঙালির ইতিহাসের এক নতুন পাঠ আবিষ্কৃত হয়ে যায়।
সূচক শব্দ: স্মৃতিকথা রচনার প্রেক্ষাপট, সমাজ ও স্ত্রীশিক্ষা, ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্ম আন্দোলন, গঠনমূলক কাজে নারী ও তার স্বদেশ-চেতনা।

মূল আলোচনা:

বাংলায় আত্মকথনমূলক রচনার সূত্রপাত ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে এবং রাসসুন্দরী দাসীর *আমার জীবন* এই ধারার প্রথম রচনা।[১] স্বাভাবিকভাবেই সেকালের পাঠকমনে এই রচনা যথার্থ বিস্ময় তৈরি করেছিল। রাসসুন্দরীর পরবর্তীকালে আত্মকথনমূলক রচনায় কলম ধরতে দেখা যাবে বহু নারীকে। গোটা উনিশ শতকেই সেই সংখ্যা প্রায় কুড়ির উপর। এই ধারা বিশ ও একুশ শতকেও বহমান। তবে একথাও মনে রাখতে হবে, রাসসুন্দরীর পূর্বে বেশ কয়েকজন নারী কবি ও গদ্য লেখিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। যদিও তাঁদের রচনায় সময়ের ছাপ ততটা স্পষ্ট নয়। স্মৃতিকথা আসলে সরলতম এক শিল্পমাধ্যম যার নির্মাণ কার্যত জটিল। তাছাড়া স্মৃতিকথাকে জীবনের ধারাবাহিক বিবরণও বলা যায় না। আবার এই সমস্ত রচনার

মধ্যে ইতিহাসের সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়াও মুস্কিল। একটা ছবি কল্পনা করা যায় মাত্র। তাই নিজের কথা বলা নাকি নিজের কথা বলতে বলতে লেখার ভেতর সমসাময়িক সময়কে ধরে রাখা—এমন নানা জিজ্ঞাসা তৈরি হয় স্মৃতিকথাকে কেন্দ্র করে। এ-বিষয়ে বলা যায়, স্মৃতিকথা লেখার অন্তরালে নারীর মনে কাজ করেছে দুটি বিষয়। এক. পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত সমাজে নারীর সামাজিক অবস্থার প্রকাশ ও নীরব বিদ্রোহ। দুই. নারীর 'আমি' নামক 'আইডেন্টিটি' নির্মাণ। পাশ্চাত্যে খুল্লামখুল্লা রীতিতে আত্মকথা লেখার যে কৌশল সেই প্রবণতা বাঙালি নারীর লেখায় পাওয়া যায় না ঠিকই, কিন্তু উনিশ শতকে লেখা নারীর আত্মকথার তুলনায় বিশ কিংবা একুশ শতকে লেখা নারীর আত্মকথা অনেক বেশি কঠোর ও গভীর। রাসসুন্দরীর *আমার জীবন* ও বেবি হালদারের *আলো-আঁধারি* পাশাপাশি রেখে পাঠ করলেই বিষয়টি বোঝা যাবে। তবে শতাব্দীর ব্যবধানে যে সংযোগসূত্র লক্ষ করা যাবে তা হল, যতটুকু বলা শোভন যতটুকু বলা শালীন তাই মূলত উঠে আসবে লেখার মধ্যে। উনিশ শতকে পুরুষের চোখে নারীর অবস্থান যেমন এই লেখায় উঠে আসবে তেমনই উঠে আসবে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে নানা প্রসঙ্গ। আবার বিশ শতকে নারীস্বাধীনতার যে চরম রূপ দেখা গেল উনিশ শতকে নারীমুক্তি আন্দোলনে যার সূচনা তার প্রসঙ্গও উঠে আসবে। ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠবে নারীর অবস্থান পরিবর্তনের স্বরূপ। 'স্বদেশী যুগে' দেখা যাবে নারী শুধু পুরুষের সহযাত্রী হয়ে থাকছে না, সে গ্রহণ করেছে 'নেত্রী'-র ভূমিকা। পয়লা বৈশাখ 'প্রতাপাদিত্য উৎসব'[২] সম্পর্কে *বঙ্গবাসী* পত্রিকার বক্তব্য এ-প্রসঙ্গে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িত বিপ্লবী নারীর আত্মকথনে শোনা যায়—

> দেশের মুক্তি আহরণের দুর্গমতম পথে ওরা পা বাড়িয়েছে, নিজেদের জীবন-পণ করেছে, ওদের রক্ত দিয়ে ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে দেশের বহুদিনের সঞ্চিত যত কালিমা- সে পথে আমি ওদের সঙ্গে থাকব না, আমি পিছিয়ে থাকব, এটাই বা কেমন করে হবে।[৩]

আসলে নারীর 'দাসী' থেকে 'দেবী' হয়ে ওঠার যে যাত্রা সেই যাত্রার প্রথম পর্বে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। অন্তঃপুরের জেনানা ছেড়ে নারী বেরিয়ে এল বাহিরের জগতে। শুরু হল দ্বন্দ্ব। একদিকে প্রগতিশীল মানুষের ধ্যান-ধারণা অন্যদিকে প্রাচীনপন্থী মানুষের প্রহসন—এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব সমাজে দেখা দিতে লাগল। আর, এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের মধ্যেই নারীকে দেখা গেল নিজের 'আইডেন্টিটি' নির্মাণ করতে। তবে একথাও ঠিক, বাঙালি নারীর আত্মকথার পাঠ বিচারে সমগ্র বাংলার নারীর অবস্থান ও সমাজের চিত্র পাওয়া যাবে না ঠিকই কিন্তু যেটুকু পাওয়া যায় তা একান্তই নারীর আত্মগত অনুভবের ফসল।

দুই

এক চূড়ান্ত বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছে উনিশ শতক। রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থী বনাম প্রগতিপন্থীদের ধ্যান-ধারণা, মিশনারীদের ধর্মপ্রচার বনাম রামমোহনের

একেশ্বরবাদ, কৌলিন্য প্রথা বনাম বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলন—এমন নানা বৈপরীত্য লক্ষ করা যাবে উনিশ শতকের প্রথম পর্বে। এই বৈপরীত্যের মধ্যে বেথুন সাহেব ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যৌথ উদ্যোগে ১৮৪৯ সালের ৭মে 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' তৈরি হয়, যা পরে 'বেথুন স্কুল' নামে পরিচিতি লাভ করে। এরপরই স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাবে। এর আগে ১৮১৯ সালে খ্রিস্টান মিশনারীদের উদ্যোগে কলকাতায় 'বালিকা বিদ্যালয়' এবং ১৮২৪ সালে মিস কুক-এর উদ্যোগে ২৪টি বালিকা বিদ্যালয় তৈরি হলেও দেখা গেছে সেখানে পড়তে আসছে মুচি, বাগদী, জেলে প্রভৃতি নীচু জাতের মেয়েরা। আসলে তখনও রক্ষণশীল কিংবা অভিজাতবর্গ কেউই স্ত্রীশিক্ষাকে সেভাবে গুরুত্ব দেয়নি। তবে সমাজের অভিজাতবর্গের কিছু অংশ মেয়েদের স্কুলে পাঠিয়ে শিক্ষালাভের ব্যাপারে অসম্মত থাকলেও অন্তঃপুরে লেখাপড়ার ছাড়পত্র দিয়েছিল। রাসসুন্দরী দাসীর স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, তাঁদের বাড়িতে বাংলা স্কুল ছিল এবং সেখানে পাড়ার ছেলেরা লেখাপড়া শিখত। শিক্ষক ছিলেন এক মেমসাহেব। রাসসুন্দরী সারাদিন সেই স্কুলেই বসে থাকতেন। তবে প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যাশিক্ষায় অধিকার তাঁর ছিল না। এমনকি তিনি যে 'চৈতন্যভাগবত' পাঠ করতে পারেন বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে সেকথা প্রকাশ করাটাও ছিল ভীতিকর ও লজ্জার। কেননা মেয়েদের শিক্ষা নিয়ে কতগুলি ধারণা তখনও বদ্ধমূল ছিল। লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা অসৎ হবে, বিধবা হবে এমনকি বিবাহের অযোগ্য বলে গণ্য হবে। ১৮৩০ সালে অ্যাডামের রিপোর্টেও একই কথা শোনা যাবে—

> ... it is considered highly improper to bestow any education on women and no man would marry a girl who was known to be capable of reading...the husbands are sometimes deceived, and find on receiving their wives that, after marriage they have acquired that sort of knowledge which is supposed to be most inauspicious to their husbands.[8]

সুদক্ষিণা সেনের স্মৃতিকথাতেও পাওয়া যাবে, লেখিকা লেখাপড়া শিখছে বলে তাঁর মাকে এক আত্মীয় জিজ্ঞেস করে, তিনি চোখ বুঝেও কিছু দেখতে পাচ্ছেন না অর্থাৎ এই মেয়ের উপযুক্ত পাত্র পাওয়া মুস্কিল। একটু তলিয়ে দেখলে এই অংশে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে বৈপরীত্য ধরা পরবে। লেখিকার মা স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে ও সমাজমানসিকতা তৈরিতে আগ্রহী থাকলেও সমাজে কিন্তু আত্মীয় তারাপদ রায়ের মতো স্ত্রীশিক্ষা বিরোধী মানুষের অভাব ছিল না। সুদক্ষিণা যে সময়ের কথা বলছেন তা উনিশ শতকের সাতের দশক। ইতিমধ্যে আলোচিত 'বেথুন স্কুল'-এর প্রসঙ্গ আবার ইতিহাসের আর্কাইভ থেকেও জানা যায়, ১৮৫৯ ও ১৮৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ব্রাহ্ম বিদ্যালয়' ও 'ব্রাহ্মবন্ধু সভা'। 'ব্রাহ্মবন্ধুসভা'-র উদ্দেশ্য ছিল অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা দান। অন্যদিকে

১৮৯১ সালে 'ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা পেলে সূচিত হল নারীপ্রগতি। লক্ষণীয় এ-সবই ছিল কলকাতা কেন্দ্রিক। স্বাভাবিকভাবেই রাসসুন্দরীর জন্মস্থান পোতাজিয়া গ্রাম কিংবা সুদক্ষিণার মাতুলালয় সোহাগদল গ্রাম এই নারীপ্রগতি থেকে অনেক দূরে অবস্থান করেছে। সুদক্ষিণার কথাতেও উঠে আসে পড়াশুনা শিখলে নারীর বিধবা হবার প্রসঙ্গ। অন্যদিকে উনিশ শতকের তিনের দশকেই বাঙালি সমাজে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন দেখা দিচ্ছে, যা ছিল মূলত কলকাতা কেন্দ্রিক।*সমাচার দর্পণ* (১৩ এপ্রিল, ১৮২২) লিখছে—

> ইদানীন্তন বিদ্যাবতী অনেক স্থানে অনেক স্ত্রী আছেন [।] এই কলিকাতা মহানগরের মধ্যে ভাগ্যবান লোকেরদিগের অনেক স্ত্রী প্রায় লেখাপড়া জানেন।[৫]

'বেথুন স্কুল'-এর 'ছাত্রী-সম্মিলনী'-তে স্কুলজীবনের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে লীলাবতী মিত্রও এই 'একই কথা'[৬] বলেছেন- যা *ভারতী* পত্রিকায় জ্যৈষ্ঠ **১৩১৫** বঙ্গাব্দে ছাপা হয়। উল্লেখ্য, এই সময়ের প্রায় এক দশক আগে স্বর্ণকুমারী দেবী এই পত্রিকার সম্পাদক হন। স্বর্ণকুমারী তৎকালীন রীতি অনুযায়ী বাড়িতে শিক্ষা লাভ করেন। পরে প্রগতিশীল স্বামীর উৎসাহে সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রতিভার ছাপ ও জোড়াসাঁকোর সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে নিজেকে নিযুক্ত রাখেন। এবং স্বামীর পরামর্শে 'পর্দা' পরিত্যাগ করেন। আসলে, পশ্চিমী সভ্যতার সংস্পর্শে এসে শিক্ষিত বাঙালির কাছে দাম্পত্য-জীবনের চরম আদর্শ হয়ে ওঠে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিকতা। অর্থাৎ শিক্ষিত ও জ্ঞানী মেয়ের কদর শুরু হয়। স্বর্ণকুমারী দেবীও 'সেকেলে কথা' বলতে গিয়ে লিখছেন—

> স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধে এই বলিতে পারি যে, এখনকার দিনের মত বি-এ, এম-এ তখন না থাকিলেও বিদুষীর আদর তখনও যথেষ্ট ছিল।[৭]

উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বের প্রথম তিন দশকে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারে ব্রাহ্মদের ভূমিকাও ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রক্ষণশীল বাঙালি সমাজের যুক্তিকে খন্ডন করে ব্রাহ্মরাই স্ত্রীশিক্ষার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে পেরেছিল। শুধু স্ত্রীশিক্ষা নয়, উন্নত সমাজগঠনের কাজে এই ব্রাহ্মরাই নারীস্বাধীনতা ও নারীমুক্তির পথ সন্ধান করেছিল সেদিন। অন্তঃপুরে স্বামীর সঙ্গে কথা বলা ছিল সময় নির্ধারিত। মোটা কাপড়ের শাড়িতে ঘোমটা দিয়ে থাকতে হতো বিবাহিত মহিলাদের। রাসসুন্দরীর আত্মকথাতেও এমন বর্ণনা পাওয়া যায়। নারীর এমন বেশভূষা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন ব্রাহ্ম আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর এই ক্ষোভ দূর হয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে নিয়ে বোম্বাই থেকে জোড়াসাঁকো ফিরে এলে। জ্ঞানদানন্দিনী গুর্জন মহিলার অনুকরণে যে পরিচ্ছদে আবৃত্ত হয়ে ফিরলেন তাতে মহর্ষি দেখলেন দেশীয়তা ও শোভনতার সম্মিলন। বাঙালি বধূরা গাউন পরতে পারবে না আবার বাঙালিকেতায় শাড়ি জড়ানোতে নেই কোনো সৌষ্টব। এমত অবস্থায়

জ্ঞানদানন্দিনীর শাড়ি পরার ভঙ্গিমা বঙ্গনারীর ঐকান্তিক একটি অভাব দূর করতে পেরেছিল বলা যায়। সরলা দেবীর *জীবনের ঝরাপাতা* থেকে জানা যায়—

> যখন আমার মায়ের সঙ্গে মেজমামী দেশে ফিরলেন, দুইজনেই সেই রকমে শাড়িপরা-তাই বাড়িশুদ্ধ সকলেই সেই ধাঁচটাই ধরে নিলেন। ক্রমে তাঁদের দেখাদেখি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের রুচিশালিনী কতকগুলি মেয়েরাও এটা গ্রহণ করলেন। পরে সব ব্রাহ্মপরিবারে এটা ছড়িয়ে পড়ল। এই রকমে পরা শাড়ির নাম ব্রাহ্মরা রেখেছিলেন 'ঠাকুরবাড়ির শাড়ি'। ব্রাহ্ম মেয়েরা সবাই পরতে আরম্ভ করায় দেশের লোক তার নাম দিলে 'ব্রাহ্মিকা শাড়ি'।[৮]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জ্ঞানদানন্দিনীর স্বামী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন প্রগতিবাদী ও নারীস্বাধীনতায় বিশ্বাসী। ১৮৭৭ সালে তিনি স্ত্রী ও সন্তানদের এক ইংরেজ দম্পতির সঙ্গে ইংল্যান্ডে পাঠাবার মতো দুঃসাহসিক কাজ করেছিলেন। সে-সময় যা ছিল অকল্পনীয়। পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতা ও জীবন দর্শনকে কাজে লাগিয়ে জ্ঞানদানন্দিনী ফিরে এসে ভারতীয় মহিলাদের সামনে খুলে দিলেন নতুন জীবনের দরজা। পুরুষের সঙ্গে একত্রে আহার কিংবা কথোপকথনও যেন খানিকটা সহজ হয়ে উঠল এরপর। তবে এ-সবকিছুই ছিল সমাজের নির্দিষ্ট অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ঘরের মেয়ের এমন বাইরে বেরিয়ে আসা কিংবা পুরুষকে দেখে আত্মগোপন না করা সর্বোপরি পুরুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, এই নিয়ে সমাজে কিংবা সংবাদপত্রের পাতায় কম সমালোচনা হয়নি। ১২৮৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় *পরিচারিকা পত্রিকা*-য় 'প্রমীলার শিক্ষা' বলে এক গল্প প্রকাশিত হয়। গল্পে দেখানো হয় শিক্ষিতা প্রমীলার আচার ব্যবহার, প্রমীলার স্বামী সুরেশের বন্ধুদের সঙ্গে প্রমীলার পরিচয় কিংবা একত্র আহার গল্পকারের পছন্দ নয়। বিষয়ের গভীরে খেয়াল করলে জানা যাবে, উনিশ শতকে পত্রিকায় এমন অনেক লেখাই বের হয় যেখানে লেখকের নাম থাকত না। সুতরাং এমন মতামতকে ব্যক্তি বিশেষের মত হিসেবে না ধরে পত্রিকার নিজস্ব মতামত বলেই ধরে নেওয়া যায়। আসলে প্রগতিপন্থীদের সমর্থনে পত্রিকা যেমন ছিল তেমনই তাদের বিরুদ্ধে কথা বলার মতো পত্রিকারও অভাব ছিল না। শুধু উনিশ শতক নয়, বিশ শতকের প্রথম পর্বেও দেখতে পাওয়া যাবে এমন নানা বিরুদ্ধ মতামত পাশাপাশি সহাবস্থান করে প্রকাশ পেয়েছে।

উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে অন্যান্যদের তুলনায় ব্রাহ্মরা অনেক বেশি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তবে একটা স্তরের পর নারীদের শিক্ষা নিয়ে তাদের সংশয় তৈরি হয়েছে। বাঁধা দিয়েছে উচ্চশিক্ষায়। তবে সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মদের মূল্যবোধ, ভাবাদর্শ-বিবাহ সম্পর্কে প্রচলিত ধ্যান-ধারণা পরিবর্তনে সহায়ক হয়েছে। স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের পরিপূরক। ব্রাহ্মরা বুঝিয়েছে বাল্যবিবাহ আদতে বিয়ে নয়, 'পুতুল খেলা'। শুধু উনিশ শতক নয়, বিশ শতকেও দেখা যাবে বাঁধাধরা সংস্কারের

দাসত্বের মধ্য থেকে নিজেদের সংকীর্ণ করে অল্প বয়সে মেয়ের বিয়ে দেবার প্রবণতা প্রাচীনদের মধ্যে ছিল। পুণ্যলতা চক্রবর্তী তাঁর স্মৃতিকথা*একাল যখন শুরু হল*-তে লিখেছেন—

> ধনে জনে পরিপূর্ণ সংসারে তাঁদের একটি বেদনার কারণ বালবিধবা নাতনীটি। বড় স্বাদ করে অষ্টম বর্ষে গৌরীদান করেছিলেন। কিন্তু দু'বছর যেতে না যেতে মেয়েটি বিধবা হল। মেয়ের এক কাকা বলেন কিসের বিধবা? ওর তো বিয়েই হয়নি- বিয়ের নামে তোমরা একটা পুতুলখেলা করেছিলে।[৯]

আবার এও ঠিক, বিধবা বিবাহের রীতিকে নব্যপন্থীরা মান্যতা দিয়েছিল ইতিমধ্যে। পুণ্যলতার স্মৃতিকথায় উঠে আসে বিধবা বিবাহের প্রসঙ্গ। ১৯৬৪ সালে *আনন্দবাজার পত্রিকা*-র একটি প্রতিবেদনের উল্লেখ তিনি করেন। মৃতপ্রায় ব্যক্তি তার নাবালিকা স্ত্রীকে লক্ষ করে প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে ও মেয়েকে ডেকে বলে, এই মেয়ে তোমাদের মা নয়। মেয়ের মতোই একে তোমরা লেখাপড়া শিখিয়ে আবার বিয়ে দিও। কৌলিন্য প্রথার দোহাই দিয়ে কুলীন ঘরের মেয়েদের উপযুক্ত পাত্রের অভাবে কুলীন বংশের বৃদ্ধের সঙ্গে বিয়ে দেবার রেওয়াজ যে তখনও ছিল বোঝা যায়। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নারীর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটেছে। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে মেয়েরা হয়েছে উচ্চশিক্ষিত। সমাজে প্রাধান্য পেয়েছে নারী স্বাধীনতা। উপার্জনে সক্ষম হয়েছে ভারতবর্ষীয় নারী। শুধু পুরুষের সমর্থনে নয়, নিজের জীবনের সিদ্ধান্তগুলোকে, ভালো থাকার উৎসগুলোকে তারা নিজেরাই সন্ধান করেছে। অস্বীকার করতে শিখেছে দাম্পত্য সম্পর্কের বন্ধন। নিজের জীবনের কথা বলতে গিয়ে প্রতিভা বসু তাঁর ছোটো মেয়ে রুমির দাম্পত্য সম্পর্কে অশান্তির কথা বলেন। যে অশান্তির সমাপ্তি ঘটে বিবাহ বিচ্ছেদে। আসলে ভালো থাকবার অধিকার, টিকে থাকবার অধিকার তো শুধু পুরুষের একার নয়। দেখা গেল বিশ শতকের শেষে কিংবা এই একুশ শতকে নারী নির্দ্বিধায় ডিভোর্স চাইতে শিখল।*জীবনের জলছবি*-তে আছে—

> অতি নিঃশব্দে রুমির ডিভোর্স হয়েছিল। আমি মা হয়েও সামান্যতম আভাসটুকুও জানতে পারিনি। কলেজ খোলা ছিল, পরের দিনই রুমি চলে গেল।[১০]

তিন

নারীশিক্ষা ও নারীস্বাধীনতার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মদের ভাবাদর্শ সম্পর্কে ইতিমধ্যে আলোচিত। উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষিত বাঙালি সমাজ যখন ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হতে থাকল তখন রক্ষণশীল হিন্দুদের মধ্যে দেখা দিল উদ্বেগ। ব্রাহ্মরা পৌত্তলিক বিরোধী। সুতরাং সমাজের কাছে তারা বিধর্মী। তাদের জাত নষ্ট হয়েছে। এই অবস্থায় বাড়ির একমাত্র ছেলে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হলে পরিবারে অশান্তির শেষ ছিল না। পিতার

শ্রাদ্ধ কে করবে? এই প্রশ্নই তখন বড়ো আকারে দেখা দিত। অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হবার অর্থ ছিল জাতিচ্যুত ঘটা। কামিনী রায়ের স্মৃতিকথায় আছে—

> ইতিপূর্বে পিতৃদেব ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া আত্মীয়গণের বিরাগভাজন ও ভীতির কারণ হইয়াছিলেন। তাঁহারা বলাবলি করিতেন, বৃদ্ধের একমাত্র পুত্র বিধর্মী, শ্রাদ্ধ করিবে কে? পিতামহ স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তির ন্যায় বলিতেন, শ্রাদ্ধ করিবেন আমার বউমা।[১১]

তবে সমাজের কাছে ব্রাহ্মদের অবস্থান যাই হোক না কেন নারীদের চোখে ব্রাহ্মরা হয়ে উঠেছিল উদ্ধারকর্তা। সুদক্ষিণার স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, লেখিকার অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ ঘটলে তাঁর মা চিন্তিত হয়ে পড়েন। একে কুলীন বংশ। আবার মৃত্যুর আগে স্বামীর আদেশ, মেয়েদের শিক্ষিত করে তবে বিয়ে দিতে হবে। সুদক্ষিণার মা আর কিছু না ভেবে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করলেন এবং ব্রাহ্মসমাজও তাঁদের আপন করে নিল। তবে সব নারীদের ব্রাহ্মসমাজ সেদিন স্থান দেয়নি। ভাগ্যের কাছে প্রতারিত হয়ে মানোদা দেবী প্রায় বাধ্য হয়ে প্রবেশ করে পতিতাবৃত্তিতে। যদিও এই পঙ্কিল জগৎ থেকে বেরিয়ে আসার প্রবল ইচ্ছাও ছিল তাঁর। মানোদা দেবী আশ্রয়ের খোঁজে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দিরে গেলে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। কেননা তাঁর পূর্বজীবন কুলষিত এবং তাঁকে স্থান দিলে ব্রাহ্মসমাজে পাপ প্রবেশ করবে। মানোদা লিখেছেন—

> আমরা নিরাশ হইয়া চলিয়া আসিলাম। বিদায় লইবার সময় পুনরায় প্রণাম করিতে গেলে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় আমাদের প্রণাম গ্রহণ করিলেন; কিন্তু অপর লোকটি পরে শুনিয়াছিলাম তাহার নাম হেরম্ববাবু-'না-না-' বলিয়া সরিয়া গেলেন।[১২]

ইতিপূর্বে নারীর স্মৃতিকথার সূত্র ধরে সমাজের চোখে নারীর অবস্থান ও সমাজের প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হল। এবার সমাজের গঠনমূলক কাজে নারীর ভূমিকা ও স্বদেশী যুগে নারীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি আলোকপাত করে আলোচনার ইতি টানবো। বালিকা নববধূ কিংবা বিবাহিতা বালিকা কন্যাদের শিক্ষা দেবার জন্য অন্তঃপুরে বৈষ্ণবীদের আনাগোনা ছিল। তবে অবিবাহিতা বালিকা কন্যাদের গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় যাবার অনুমতি ছিল। অন্যদিকে এই পর্বেই খ্রিস্টান মিশনারীরা দরিদ্র বালিকা ও বিধবাদের (অপেক্ষাকৃত নীচু জাতের মেয়েদের) বৃত্তি দিয়ে শিক্ষিত করে তুলবার প্রয়াস চালিয়েছে। তবে এরমধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল ধর্মান্তরিত করার সুপ্ত বাসনা। খানিকটা এমনই প্রয়াস দেখা গেল শতকের শেষপর্বে এসে। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র যারা অর্থাৎ দরিদ্র বিধবা কিংবা দরিদ্র বালিকাদের শিক্ষা দেবার জন্য এবং তাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য স্বর্ণকুমারী দেবীর ঐকান্তিক চেষ্টায় তৈরি হল 'সখি-সমিতি'। এই 'সখি-সমিতি' বাংলার প্রথম নারীবাদীসংগঠন—যার নামকরণ করলেন রবীন্দ্রনাথ। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল, যে সমস্ত অনাথ ও বিধবাদের কোনো

আত্মীয় নেই এবং থাকলেও তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে অক্ষম তাদের দায়িত্ব নেওয়া এবং তাদের শিক্ষিত করে তুলে ক্রমশ স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ঘটানো। যাতে তারা অন্যান্যদের লেখাপড়া শেখাতে পারে। পাশাপাশি ভারতীয় মহিলাদের তৈরি করা পণ্য মেলায় বিক্রি করার ব্যবস্থাও এই সমিতি করেছিল। সদস্যদের চাঁদায় এই সংগঠন চালানোর পাশাপাশি নাটকের অভিনয় করে অর্থ সংগ্রহও চলত। রবীন্দ্রনাথের *মায়ার খেলা* নাটকের প্রথম অভিনয় এই 'সখি-সমিতি'-তেই হয়। সরলা দেবী এই নারীবাদী সংগঠনের কার্যকলাপ সম্পর্কে লিখেছেন—

> কুমারী ও বিপন্না বিধবাদের বৃত্তি দিয়ে পড়ান, পড়া সাঙ্গ হলে তাদের শিক্ষায়ত্রী রূপে বেতন দিয়ে অন্তঃপুর-মহিলাদের শিক্ষার জন্যে নিযুক্ত করা, মফস্বলে ধর্ষিতা নারীদের জন্যে প্রয়োজন হলে উকিল ব্যারিস্টার নিযুক্ত করে মোকদ্দমা চালান, বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে শিল্প সংগ্রহ করে মেলা করা, তাতে মেয়েদের দ্বারা অভিনয় করান, প্রভৃতি নানা আয়োজনে 'সখি-সমিতি' বিখ্যাত হয়ে উঠল।[১৩]

মায়ের এই ঐতিহ্যকে পরবর্তীকালে এগিয়ে নিয়ে গেছেন সরলা দেবীও। তবে তাঁর কাজকর্মে সমাজগঠনের প্রবণতা যতটা ছিল তারচেয়ে অনেক বেশি ছিল দেশ গঠনের প্রবণতা। ঠাকুরবাড়ির মতো পরিবারে লালিত ব্যতিক্রমী চরিত্রের সরলাকে পথে নেমে প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দিতে দেখা গেল--- যা সেযুগে মেয়েদের পক্ষে ছিল অকল্পনীয়। পিতা জানকীনাথ ঘোষাল সমাজ সংস্কারমূলক নানা আন্দোলন ও জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পিতার এই মানসিকতা সরলার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল বলা যায়। স্বদেশের নারী কল্যাণকর্মের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রেখে সরলা নারী জাতির সর্ববিধ উন্নতিকল্পে নিজেকে যুক্ত করেছেন। ১৯২৮ সালে গ্রহণ করলেন 'ভারত-স্ত্রী মহামন্ডল'-এর স্থানীয় শাখার কর্মভার। পাশাপাশি 'বীরাষ্টমী ব্রত' পালনের মধ্য দিয়ে তাঁর স্বদেশপ্রেমের প্রকাশ বাংলার ইতিহাসে একটি দৃষ্টান্ত। দুর্গাপূজার অষ্টমীতে যুবকেরা তরবারিকে পুষ্প চন্দনে সুসজ্জিত করে, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ থেকে প্রতাপাদিত্য, সীতারাম সমস্ত বীর সন্তানদের নামে স্তোত্র পাঠ করে অঞ্জলি দিতেন।শক্তিমন্ত্রের চিহ্ন স্বরূপ মায়েরা নিজেদের সন্তানের হাতে রাখী পরাতেন। এছাড়া দেশগঠনে ও স্বদেশী জিনিস ব্যবহারে বাঙ্গালীদের আগ্রহ উৎসাহ বাড়াতে সরলার সার্থক প্রতিষ্ঠান 'লক্ষীর ভান্ডার'। শুধু গঠনমূলক কাজ নয়, স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লবী নারীর কথাও উঠে আসে স্মৃতিকথার পাতায়। উঠে আসে মেয়েদের পরিচালিত মাসিক পত্রিকা *মন্দিরা*-র প্রসঙ্গ। যার উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্যের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক মতবাদ ও আদর্শ প্রচার। শুধু প্রচার নয় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশও নিয়েছিল বহু মহিলা। আত্মকথায় উঠে আসে অনেক অজানা ইতিহাস। বীণা দাস লিখেছেন—

> দেশের স্বাধীনতা যতদিন আসছে, দেশের মানুষের লাঞ্ছনা আর দুর্গতি যতদিন না ঘুচছে, ততদিন দেশের তরুণ-তরুণীর সুখী হবার কোনো অধিকার নেই, ব্যক্তিগত জীবন যাপনের কোনো অবকাশ নেই।[১৪]

এই 'অবকাশ নেই' থেকেই বীণা দাস আন্দোলনে জড়িয়েছেন, হয়েছেন কারারুদ্ধ।

পূর্বেই বলেছি বাঙালি নারীর আত্মকথার পাঠ বিচার করতে বসে সমগ্র বাংলার নারী ও বাংলার সমাজের চিত্র পাওয়া যায় না। কিন্তু যেটুকু পাওয়া যায় তা একান্তই নারীর আত্মগত অনুভবের ফসল। পুরুষের পক্ষে সম্ভব নয় সেই ভাবের ঘরে ভাষা চুরি করা।প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, লক্ষীপ্রিয়ার মৃত্যুর পর চৈতন্যদেবের অবস্থা কেমন হয়েছিল বৃন্দাবন দাস বাইরে থেকে তার একটা বিবরণ দেবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু একই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে নতুন বৌঠানের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথের মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল তার বর্ণনা পাই *জীবনস্মৃতি*-তে। যা তার একান্ত অনুভবের অভিব্যক্তি। নারীর রচিত স্মৃতিকথাও তেমনই নারীর অন্দর ও অন্তরের একান্ত অনুভবের ফসল। আর সেই অনুভবের প্রকাশেই লুকিয়ে আছে নারীর আত্মআবিষ্কার ও আত্মসংগ্রামের কাহিনি।

তথ্যসূত্র:

১. ঘোষ, বিজিত, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৪, *প্রমীলাস্মৃতিকথা সংগ্রহ,* প্রথম খন্ডের ভূমিকা অংশে লিখেছেন—

> রাসসুন্দরীর আমার জীবন বাংলায় প্রকাশিত প্রথম আত্মজীবনী। ১৮৬৮ সালে এ-গ্রন্থ যখন প্রকাশিত হয় তখন তাঁর সামনে আত্মজীবনীর কোনো আদর্শ ছিল না।

কলকাতা, পুনশ্চ, পৃষ্ঠা ১৯।

২. পয়েলা বৈশাখে অনুষ্ঠিত সরলাদেবী চৌধুরানীর নেতৃত্বে 'প্রতাপাদিত্য উৎসব' সম্পর্কে *বঙ্গবাসী* পত্রিকায় লেখা হয়—

> মরি মরি কি দেখিলাম!এ কি সভা! বক্তিমে নয়, টেবিল চাপড়া-চাপড়ি নয়- শুধু বঙ্গবীরের স্মৃতি আবাহন, বঙ্গ-যুবকদের কঠিন হস্তে অস্ত্রধারণ ও তাদের নেত্রী এক বঙ্গললনা- ব্রাহ্মণ কুমারীর সুকমল হস্তে পুরস্কার বিতরণ। দেবী দশভূজা কি আজ সশরীরে অবতীর্ণা হইলেন? ব্রাহ্মণের ঘরে কন্যা জাগিয়েছে, বঙ্গের গৌরবের দিন ফিরিয়াছে।

উল্লেখসূত্র: চৌধুরানী, সরলাদেবী, বৈশাখ ১৪২৩, *জীবনের ঝরাপাতা,* চতুর্থ দে'জ সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ, পৃষ্ঠা ১২২।

৩. দাস, বীণা, জানুয়ারি ২০১৫,*শৃঙ্খল ঝঙ্কার,* কলকাতা, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, পৃষ্ঠা ২৬।

8. Rev. James Long(ed.), 1868,*Adam's Reports on Vernacular Education in Bengal and Bihar*, London p.76

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ (সম্পা.) ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ,*সংবাদপত্রে সেকালের কথা,* প্রথম খন্ড, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃষ্ঠা ১৩।

৬. মিত্র, লীলাবতী, সেপ্টেম্বর ১৯৪৯, "পুরাতন বেথুন স্কুল", *সেকেলে কথা শতক সূচনায় মেয়েদের স্মৃতিকথা,* অভিজিৎ সেন ও অভিজিৎ ভট্টাচার্য (সম্পা.), কলকাতা, নয়া উদ্যোগ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থে বলা আছে—

> নারীজীবন যে আর অবহেলা অবজ্ঞার জীবন নয় তাহা দেশীয় লোকেরা কমে বুঝিতে পারিতেছেন। রমণী সুশিক্ষিতা হইলে যে সংসারের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয় এই দৃষ্টান্ত এখন আর কেবল পাশ্চাত্য দেশের মধ্যেই আবদ্ধ নহে।

পৃষ্ঠা ১৫।

৭. দেবী, স্বর্ণকুমারী, সেপ্টেম্বর ১৯৪৯, *সেকেলে কথা,* তদেব, পৃষ্ঠা ৬১।

৮. চৌধুরানী, সরলাদেবী, বৈশাখ ১৪২৩, *জীবনের ঝরাপাতা,* কলকাতা, দে'জ, পৃষ্ঠা ৫৮-৫৯।

৯. চক্রবর্তী, পুণ্যলতা, শ্রাবণ ১৪২৫,*একাল যখন শুরু হল,* কলকাতা, দে'জ, পৃষ্ঠা ২৮।

১০. বসু, প্রতিভা,শ্রাবণ ১৪২৫,*জীবনের জলছবি,* কলকাতা, আনন্দ, পৃষ্ঠা ৩৫১।

১১. রায়, কামিনী, সেপ্টেম্বর ১৯৪৯, "স্বর্গীয়া বামাসুন্দরী দেবী", *সেকেলে কথা শতক সূচনায় মেয়েদের স্মৃতিকথা,* তদেব, পৃষ্ঠা ৯০।

১২. দেবী, মানোদা, জানুয়ারি ২০১৪, "শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত", *প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ,* দ্বিতীয় খন্ড, বিজিত ঘোষ (সম্পা.), কলকাতা, পুনশ্চ, পৃষ্ঠা ৩৬৫।

১৩. চৌধুরানী, সরলাদেবী, বৈশাখ ১৪২৩, *জীবনের ঝরাপাতা,* তদেব, পৃষ্ঠা ৬৪।

১৪. দাস, বীণা, জানুয়ারি ২০১৫, *শৃঙ্খল ঝঙ্কার,* তদেব, পৃষ্ঠা ২৯।

বনফুলের ছোটগল্পে মানবজীবনের বিচিত্র রূপ

রেন্টু মন্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : মানুষের জীবন বিচিত্র। এই বিচিত্র জীবনে ঘটে অসংখ্য বিচিত্র ঘটনা। হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, ভালো-মন্দের মিশ্রণে মানুষের জীবন এগিয়ে চলে কখনো খরস্রোতা নদীর মতো আবার কখনো মন্থর গতিতে। বনফুলের ছোটগল্পে মানবজীবনের এই বিচিত্র রূপের কথা ফুটে উঠেছে। তাঁর গল্পে উঠে এসেছে বিভিন্ন প্রথা, কুসংস্কার যা মানুষের জীবনে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে। এছাড়াও তাঁর গল্পে সৎ-অসৎ, সরল-দাম্ভিক, সাহসী-ভীতু, চোর-ডাকাত প্রভৃতি সমস্ত শ্রেণির মানুষের কথা উঠে এসেছে। তিনি কখনো মানুষের অমানবিক আচরণকে সমর্থন করেননি। তিনি তাঁর ছোটগল্পে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনের অন্ধকারময় দিকগুলির উপরে যেন তীক্ষ্ণ আলোকরশ্মি নিক্ষেপ করেছেন। সেখানেই মানুষের জীবনের আবৃত সমস্যাগুলি যেন পাঠকের সামনে হাস্যময় পরিবেশের আবহে পরোক্ষভাবে ধরা দেয় তাঁর ছোটগল্পে। ফলে পাঠক সমাজ সহজেই চিহ্নিত করতে পারে রূপের আড়ালে অরূপের অবয়বকে। মানবজীবনের এই বিচিত্র রূপ সৃষ্টিতে বনফুলের অবদান আলোচনা সাপেক্ষে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ : পুঙ্খানুপুঙ্খ, আত্মসুখপরায়ণতা, অতিসঙ্কীর্ণ, পরার্থে, আত্মোৎসর্গ, বীভৎস, পরিহাস, ব্যঙ্গ, কেতাদুরস্ত, মমত্ববোধ, স্নেহময়ী, প্রশ্রয়, সংসারকার্য, মুখোরোচক, ভেকধারী, বহু-বিসর্পিত, উচ্চাঙ্গ, বর্ণাঢ্য, ভদ্রগোছের, শিল্পীসত্ত্বা।

মূল আলোচনা :

বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় একটি উল্লেখযোগ্য নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯)। তিনি বনফুল নামেই সর্বাধিক পরিচিত। বাংলা সাহিত্যের সর্বশাখায় তিনি লেখনি ধারণ করেছেন। কবিতা, উপন্যাস, নাটক ও ছোটগল্পে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। ছোটগল্পের শাখায় বনফুলের বিচরণ 'কল্লোল' পরবর্তী যুগকে বিশেষভাবে আলোকিত করেছিল। তাঁর মৌলিক বিশ্লেষণী দক্ষতা তাঁকে বাংলার ছোটগল্পের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয় করে তুলেছে। মানবজীবনের বিভিন্ন দিকের তিনি বর্ণনা করেছেন। সমাজে বসবাসকারী উঁচু-নীচু সমস্ত শ্রেণির মানুষের কথাই তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তুলে

ধরেছেন। এমন অনেক গল্প আছে, যার পরিসর খুবই ছোট, কিন্তু গল্পের তার বিস্তৃতি প্রচুর। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল জুড়ে তাঁর শিল্পীসত্ত্বা নতুন নতুন বিষয়ের অন্বেষণ করেছে। আমরা যে বিষয়গুলি নিয়ে ভাবতেও পারি না; সে সব বিষয়ও বনফুল অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ছোটগল্পের সীমায় আবদ্ধ করেছেন। এই বিষয় বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে একটি বড় ভূমিকা পালন করেছে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের চরিত্র।

জীবনরসিক বনফুল সামাজিক মানুষকে মানুষ হিসেবেই প্রাধান্য দিয়েছেন। যেখানে মানুষের ভালো-মন্দ, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, ভণ্ডামি-শঠতা, স্খলন-পতন-ত্রুটি প্রভৃতি আচার-আচরণ নিবিড় পর্যবেক্ষনী শক্তিতে প্রকাশিত হয়েছে। বনফুলের ছোটগল্প প্রসঙ্গে জগদীশ ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন—"স্বভাবত রূপে, বর্ণে, স্বাদে ও গন্ধে ছোটগল্পের বৈচিত্র্য অন্তহীন। জীবনসত্য সেখানে বহুরূপী হয়ে স্রষ্টার কাছে ধরা দেয়। বনফুলের ছোটগল্পে মানবজীবনের এই বহুরূপী রূপটিই বিচিত্রভাবে ধরা দিয়েছে। কখনো তা সুন্দর, কখনো তা কুৎসিত, কখনো তা উদার, কখনো তা নীচ, কখনো আত্মসুখপরায়ণতায় অতিসঙ্কীর্ণ, কখনো পরার্থে আত্মোৎসর্গের মহিমায় গৌরবান্বিত। মানুষ স্বর্গের দেবতাও নয়, আবার নরকের শয়তানও নয়, মানুষ মানুষই। সে ভুল করে, অন্যায় করে, পাপাচারণ করে, আবার ভুলের মাশুলও তাকেই দিতে হয়। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় মহার্ঘ্য মূল্যে। সব কিছু মিলিয়েই মানবজীবন।"[১]

গল্প আকারে ছোট হোক বা মাঝারি কিংবা বড়ো হোক, নিছক মাপ বা আয়তন তো বাইরের খোলস; কাজেই ছোটগল্পের প্রাণবস্তুর হদিশ তার আয়তনের মধ্যে পাওয়া যায় না। কয়েকটি লাইন বা দুই-তিন পাতার মধ্যেও ছোটগল্প স্বার্থকভাবে সীমায়িত থাকতে পারে। আর এই শর্তই যেন বনফুল তাঁর ছোট ছোট গল্পে যথাযথভাবে পরিস্ফুটিত করে তুলেছেন। মানুষের জীবনের রূপ দেখিয়েছেন অতিসাধারণ কথাই। 'তিলোত্তমা' নামক গল্পে তিনি নিজেই বলেছেন—"গল্পে উপন্যাসে বিধৃত যে জীবনে বিচিত্র নাটকীয় মুহূর্তের স্বাদ পাঠক লাভ করেন, সে জীবন বর্ণাঢ্য অসামান্য হইবার কোন প্রয়োজন নেই। সাধারণ মানুষের জীবনেই এসব হয়। ইহার জন্য রাম বা রাবণ হইবার কোন প্রয়োজন নাই।"[২] বনফুল যে বিশেষভাবে আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সম্পন্ন লেখক তা তাঁর ছোটগল্পগুলিকে নিরীক্ষণ করলেই বোঝা যায়। সমাজের উঁচু-নীচু সর্বস্তরের মানুষের যা কিছু খারাপ হিসেবে বিবেচিত, তার পক্ষপাতিত্ব তিনি করেননি। সর্বস্তরের মানুষেরই অবচেতন সত্ত্বার বীভৎস ঘৃণ্য রূপটিই তিনি অকপটে তুলে ধরেছেন। বনফুলের পরিহাস অনেক ক্ষেত্রেই জীবন সম্পর্কে, মানুষের আচার-আচরণ এক তির্যক ব্যঙ্গের আকারে আত্মপ্রকাশ করেছে। মানবজীবনের বিচিত্র রূপের ব্যাখ্যায় 'শ্রীপতি সামন্ত' গল্পটি সাধারণ হয়েও আসাধারণত্বের দাবি

রাখে। কেননা এই গল্পে শ্রীপতি সামন্তের মতো আধময়লা, থানপরা, চোখে কাচফাটা চশমাপরা, খালি-গা, গ্রাম্য দরিদ্র চেহারার মানুষটি ট্রেনের প্রথম শ্রেণির যাত্রী সাহেবি কেতাদুরস্ত বাঙালী ভদ্রলোকের নকল ভদ্রতার মুখোশ একেবারে খুলে দিয়েছেন। অন্যদিকে বাঙালী হয়ে বাঙালীর মান বাঁচিয়েছেন। এইরকম দরিদ্র বাঙালীর কাছে সাহেবও যেন তুচ্ছরূপে পরিগণিত হয়েছে। এই গল্পে আমরা দুটো চরিত্রকে দেখতে পেলাম যারা বাঙালী হয়েও পরস্পরের বিরোধী। একজন সাহেবি পোশাকপরা ভদ্রগোছের অভদ্র বাঙালী, অপরজন সাদামাটা স্বচ্ছ মানুষ, যে অনায়াসে পাঞ্জাবী ক্রুকেও বলতে ছাড়েননি—"কটা বাঙালী আপ দ্যাখা হ্যায়? জাত তুলকে গালাগালি দেওয়া কোন দিশি ভদ্রতা রে বাপু।"[৩] বনফুল বিকৃতিকে কখনো সমর্থন করেননি। যে কারণে মুখোশধারী ভদ্রলোক গল্পের শেষে চুপ হয়ে গেছেন।

অসহায় অক্ষম মানুষের প্রতি বনফুলের গভীর মমত্ববোধ গল্পের মধ্যে গাঢ় গভীর রসের স্বাদ বহন করে এনেছে। অদৃষ্টের কাছে মানুষ অসহায়, নিরুপায়; তাই বলে অদৃষ্টকে লেখক ভাগ্য বলে মানতে চাননি, যথোপযুক্ত যুক্তি ও কারণ দেখিয়েছেন। এইরকম কয়েকটি গল্প হল- 'অজান্তে', 'সমাধান', 'ক্যানভাসার', 'ছেলে-মেয়ে', 'জৈবিক নিয়ম' ইত্যাদি। 'অজান্তে' গল্পে গল্পকথকের অন্ধ, বোবা, ভিক্ষুক মানুষটির প্রতি অমানবিক আচরণ খুব দুঃখজনক। গলির পাশের বাড়ির ভদ্রলোকটির কথায় গল্পকথক যখন জানতে পারে, গায়ে পড়ে যাবার জন্য সে যাকে কিল, চড়, ঘুষি মেরে নাজেহাল অবস্থা করে দিয়েছে সে আসলে অন্ধ ও বোবা মানুষ। এই গল্পের স্বল্প পরিসরেও আমরা তিনটি চরিত্রের দেখা পেলাম। একজন অসহায়, একজন দাম্ভিক আর একজন নিছক ভদ্রলোক, যার একটি কথার মাধ্যমে গল্পকথক নিজের প্রতি ঘৃণায় জর্জরিত হয়েছেন।

তৎকালীন সমাজ তথা বর্তমান সময়েও আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের প্রাধান্য এমনিতেই অনেক কম। তারপরে সে নারী যদি কালো, কুৎসিত, কুরূপা হয় তাহলে তো তার সমাজে বেঁচে থাকার কোন অধিকারই নেই। এরই চরম রূপ দেখতে পাওয়া যায় 'সমাধান' গল্পটিতে। গল্পটিতে শেষপর্যন্ত বুঁচি নামের মেয়েটি মারা গেছে। লেখক এই গল্পে দেখিয়েছেন; যে মেয়েটি মারা গেছে তার সম্পুর্ণ দায়ভার আমাদের সমাজের। যে সমাজ নারীর রূপ দেখে নারীর বিচার করে, নারীকে নারীর মর্যাদায় প্রতিপন্ন করে না।

'বুধনী' গল্পেও বুধনী নামক এক নারীর অসহায়ত্বের রূপ দেখতে পাওয়া যায়। সমাজে নারী হয়ে জন্মানো পাপ নয়, কিন্তু কোন কোন জায়গায় শুধুমাত্র কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে মানুষ নারীর জীবনকে ধ্বংসের মুখে চালিত করছে। নারীর ইচ্ছাকে

সেখানে কোনভাবেই প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে না, তাতে যদি তার মৃত্যু ঘটে সেও ভালো। হাজারীবাগের পার্বত্য প্রদেশে বিবাহের এক বিচিত্র প্রথায় বুধনীর জীবনে নেমে আসে এক চরম বিপর্যয়। বিবাহের বিচিত্র নিয়ম সম্পর্কে গল্পকার বলেছেন—“কোনও অবিবাহিত যুবক কোনও কুমারীর পাণিপ্রার্থী হইলে তাহাকে সেই কুমারীর কপালে ওই সিঁদুর লাগাইয়া দিতে হইত। সিঁদুর লাগালেই কিন্তু যুবকের প্রাণ-সংশয়। সেই কুমারীর আত্মীয়-স্বজন তৎক্ষণাৎ ধনুর্বাণ সড়কি বল্লম লইয়া যুবাকে তাড়া করিবে। এবং যুবা যদি আত্মরক্ষা করিতে না পারে, মৃত্যু সুনিশ্চিত। কিন্তু সে যদি সমস্ত দিন আত্মরক্ষা করিতে পারে তাহা হইলে সূর্যাস্তের পর আত্মীয়-স্বজনেরা মহা আনন্দে মাদল বাঁশি বাজাইয়া কলরব করিতে করিতে কন্যাকে বরের গৃহে পৌছাইয়া দিবে।”[৪] কাজেই বুধনীকে আসতে হয়েছে বিল্টুর ঘরে। বিল্টু যে বুধনীকে নিজের প্রাণ অপেক্ষা বেশী ভালোবাসত, একথা গল্পটি পড়লেই বোঝা যায়। কিন্তু বিপর্যয় ঘটল বুধনীর সন্তান প্রসবের পর। যে বুধনী মাতৃত্বের স্বাদ পেয়ে স্নেহময়ী জননীর কল্যাণী মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছিল, সেটা বিল্টু কোনভাবেই সহ্য করতে পারেনি—“বিলটু দেখিল—একি! বুধনীকে দখল করিয়া বসিয়া আছে এই শিশুটা! বুধনী তো তাহার আর একার নয়! অসহ্য।”[৫] এখানেই গল্পের চরমক্ষণ উপস্থিত হয়। বিলটু শিশুটিকে হত্যা করে। বনফুল এখানেই কিন্তু গল্প শেষ করেননি; বিলটুকে ফাঁসির কাঠে ঝুঁলিয়েছেন। কোনভাবেই এই অমানবিক অত্যাচারকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। লেখক বনফুল তাঁর ‘অমলা’ গল্পটিকেও এই ধাঁচেই গড়েছেন। আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের প্রাধান্য যে অনেকাংশেই কম তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ অমলা চরিত্রটি। যদিও রবীন্দ্রনাথের ‘দেনা-পাওনা’ গল্পটির ছাপ এখানে সুস্পষ্ট কিন্তু বিষয় এবং বৈচিত্র্যে সম্পূর্ণই তা ভিন্ন ধরনের। প্রথমবার যখন অরুণের (পাত্র) ভাই বরুণ অমলাকে দেখতে এলো, অমলা তাকে দেখেই ভেবে নিয়েছিল—‘আমার ঠাকুরপো’। অমলাকে দেখে যদিও পাত্রপক্ষের পছন্দ হয়েছে, তবু—“বিয়ে কিন্তু হল না- দরে বনল না।”[৬] দ্বিতীয়বার হেমচন্দ্র দেখতে আসলে দরে বনল কিন্তু অমলাকে কারো পছন্দ হয়নি। অবশেষে তৃতীয়বার দরে বনেছে, বিয়েও হয়েছে, পাত্র—“মোটা কালো গোলগাল হৃষ্ট-পুষ্ট ভদ্রলোক- বি. এ. পাস, সদাগরী অফিসে চাকরি করেন।”[৭] এই গল্পে গল্পকার দেখাতে চেয়েছেন—অমানবিক পণপ্রথার শিকার নারীর যন্ত্রনাকে সমাজ তথা সমাজের মানুষ প্রাধান্য দেয়নি; প্রাধান্য পেয়েছে অর্থ, প্রাধান্য পেয়েছে রূপ। তাই অমলা শেষ পর্যন্ত শান্ত-শিষ্ট নিরীহ স্বামী বিশ্বেশ্বর বাবুকে পেয়েই মুগ্ধ হয়েছে।

বনফুলের ‘আত্ম-পর’ গল্পটিতে সন্তান হারানো মাতা-পিতার আর্তনাদের চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। গল্পকথকের আদরের একমাত্র পুত্র শচীন সর্পাঘাতে মারা গেলে

পাঁচ বছর আগে ঘটে যাওয়া এক কাহিনি কথকের স্মরণে আসে। ঘুমের মধ্যে গল্পকথকের মুখের ওপর একটা কদাকার কুৎসিত পাখির ছানা পড়লে বিরক্ত হয়ে পাখির ছানাটিকে ঘৃণায় কথক উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। আর সেটাকে একটা বেড়াল এসে ভক্ষণ করেছিল। এতে পক্ষীমাতাদের আর্তনাদ কথকের সেই সময়ে ততটা কর্ণগোচর হয়নি। পাঁচ বছর পরে এসে সে বুঝতে পেরেছে—"সেই চার-পাঁচ বছর আগে নিস্তব্ধ দুপুরে বেড়ালের মুখে সেই অসহায় পাখির ছানাটি আর তার চারিদিকে পক্ষীমাতাদের হাহাকার। হঠাৎ যেন একটা অজানা ইঙ্গিতে শিউরে উঠলাম।"[৮] বনফুল এই গল্পে দেখাতে চেয়েছেন সন্তান হারানোর বেদনা সকলেরই এক, হোক সে মানুষের কিংবা পাখিদের। পাখির ছানাটিকে ফেলে দেওয়ার সাথে শচীনের মারা যাওয়ার হয়তো কোন কার্য-কারণ সম্বন্ধ নাই; তারপরেও কথকের মনে কোথাও একটা খটকা থেকেই গেছে। তিনি বুঝতে পেরেছেন, তাঁর ভুল হয়েছিল।

'ক্যানভাসার' গল্পটিতেও একটা আলাদা ধাঁচ লক্ষ্য করা যায়। এই গল্পে প্রধান দুটি চরিত্রকে দেখতে পাওয়া যায়, হীরালাল এবং ভৈরব। দুজনেই সমাজের নিম্নসীমায় বাস করে। ভৈরব একটু শৌখিন গোছের মানুষ, কিন্তু অর্থাভাবের কারণে শখ মিটাতে পারে না, কাজের প্রতিও তেমন তার ঝোঁক নেই তথায় গঞ্জনা সহ্য করা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে আমরা ক্যানভাসার হীরালালকে দেখতে পাই, যে সংসার বাঁচানোর জন্য অন্য মানুষকে ঠকাতে দ্বিধাবোধ করেনি। ক্যানভাসার হীরালাল দাঁতের মাজন বিক্রি করার জন্য ভৈরবের কাছে গেলে ভৈরব তা নিতে অসম্মতি জানায়, কেননা তার কাছে বাজে মাজন কেনার মত পয়সা নাই। অন্যদিকে হীরালাল মাজন বিক্রি করতে না পারলে তার সংসারকার্য নির্বাহ হবে না। কাজেই হীরালাল নাছোড়বান্দা, সে ভৈরবকে এক কৌটো দাঁতের মাজন নেওয়ার অনুরোধ জানায়। আতঃপর তাদের মধ্যে মাজন নেওয়া না নেওয়া নিয়ে বচসা শুরু হয় এবং শেষপর্যন্ত মারা-মারির রূপধারণ করে, যার ফলে হীরালালের বাঁধানো দন্তপাটি খুলে যায়। এখানেই দেখা যায় হীরালালের অসহায়ত্বের চিত্রটি, কেননা মার খেয়ে দন্তপাটি খুলে যাবার পরেও সে হাসিমুখে ভৈরবকে ভালো কলপ নেওয়ার কথা বলে—"ভালো কলপও আমি রাখি। নেবেন? কেন মার-ধোর করছেন মশাই? গরিব মানুষ- এই করেই কষ্টে-সৃষ্টে সংসার চালাই। বুড়ো বয়সে উপযুক্ত ছেলেটি মারা গেছে।"[৯] সন্তান হারানো পিতার আর্তিতে, মানুষকে ঠকিয়েও সংসারের হাল ধরে থাকা ক্যানভাসার হীরালালের চরিত্রে ভৈরবও নির্বাক হয়ে গেছে। শেষপর্যন্ত ভৈরব হীরালালের কাছে এক কৌটো মাজন নিতে বাধ্য হয়েছে। এই গল্পে বনফুল দেখিয়েছেন সংসারকার্য নির্বাহ করার জন্য মানুষ মার খাওয়ার পরেও হাসে, কেননা তাতে যদি দুবেলা দুমুঠো খেতে পাওয়া যায়।

'বৈষ্ণব ও শাক্ত' গল্পে ধর্মের ভেকধারী দুটি চরিত্রের কথা পাওয়া যায়, যারা ধার্মিক নয় ছদ্মবেশী। একজন ডিটেকটিভ কালীকিঙ্কর বর্মা মহাশয়, অপরজন দুর্ধর্ষ খুনী পলাতক বজ্রধর মিশ্র। বর্মা মহাশয় বজ্রধর মিশ্রকে ধরার জন্যে শাক্তধর্মের ভেক ধরেছেন, বজ্রধর মিশ্র বৈষ্ণবধর্মের ভেক ধরে বর্মা মহাশয়ের পাশেই বসে আছে। এই চরম রহস্যের মধ্যে দিয়েই লেখক গল্পের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। এখানে বলাবাহুল্য আমাদের সমাজেও এইরকম ধর্মের ভেকধারী অনেক খুনী আসামী অহরহ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ইন্দ্রিয়ের সর্বদ্বার রুদ্ধ করে যে, মনের কামনা-বাসনাকে আটকানো যায় না- তা যে স্বভাবতই তার স্বধর্মকে অনুস্মরণ করে চলে তা 'ঐরাবত' গল্পে ত্রিগুণানন্দ বাবুর চরিত্রের মধ্যে দিয়ে লেখক খুব সুন্দরভাবে রূপায়িত করেছেন। গল্পটির কাহিনি অংশ সামান্য। ত্রিগুণানন্দবাবু শুধু ত্রিগুণের অধিকারীই নন, তিনি বহুগুণের আকর। প্রচণ্ড ধার্মিক, সংযমী, শরীরের প্রতি তাঁর ভীষণ লক্ষ, খুব ভোরে উঠেই তিনি শরীরচর্চা করে। লেখাপড়াও কিছুটা জানে, তাই কিষাণপুর গ্রামের বালকদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য সে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিল। সে মনে করত—"আমাদের দেশের সকলে যদি ব্রহ্মচর্যের মর্মবস্তুটির সহিত সম্যকভাবে পরিচিত হয়, তাহা হইলে আমাদের দুঃখ দুর্দশা অচিরেই লুপ্ত হইবে।"[১০] কিন্তু যে উদ্দেশ্যে সে বিদ্যালয় স্থাপন করেছিল তা তার অধরা থেকে যায়। একদিন বিদ্যালয়ে গিয়ে সে দেখে বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্র একটি মাসিক পত্রিকা পড়ছে, সে তার পাতা উলটিয়ে দেখে একটি নগ্ন নারী মূর্তির ছবি, তার পরেই একটি কবিতা। ত্রিগুণাবাবু কবিতাটি পড়ল—"পড়িবামাত্র মৌলিক ত্রিগুণাবাবুও একটি অমৌলিক উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন।"[১১] সেদিনই সে কলকাতার 'মরমী' পত্রিকার অফিসে গিয়ে সকলকে মারধোর করে পুলিশের ভয়ে আত্মগোপন করে। এখানেই গল্পের মোড় যায় বদলে। কলকাতা শহরের যেখানে যত মাসিক পত্রিকা বিক্রি হয়, সমস্ত তন্ন তন্ন করে খুঁজে, আধুনিক যুবক-যুবতিদের সংস্পর্শে এসে, সিনেমা দেখে সে বুঝেছে 'বখেরা' মেটানো অত সহজ নয়। তাই সমস্ত বখেরা মেটানোর জন্য হাল ফ্যাশন দুরস্ত এক তন্বী মেয়েকে বিয়ে করে ফেলেছে। এখানেই তার চরিত্রের রূপ পাল্টে গিয়েছে। যে একসময় শারীরিক কামনা-বাসনাকে ত্যাগ করে জীবন অতিবাহিত করতে চেয়েছিল, সেও শেষ পর্যন্ত কামনা-বাসনার বশবর্তী হয়েছে। গল্পের সমস্ত কাহিনিতে লেখক বাড়তি কোন বিবৃতি দেননি। ত্রিগুণাবাবুর মধ্যে দিয়ে লেখকের জীবনদর্শন প্রকাশে যতটুকু পরিসর প্রয়োজন ছিল ঠিক ততটুকুই তিনি গ্রহণ করেছেন। 'ঐরাবত' গল্পটির নামকরণ ভাবকেন্দ্রিক হলেও গল্পটি ত্রিগুণাবাবুর

জীবনকেন্দ্রিক। এখানে লেখক দেখাতে চেয়েছেন কামনা-বাসনাকে পরিত্যাগ করে জীবন চলে না।

'পাশাপাশি' গল্পটিতে বনফুল তৎকালীন সমাজের বেকারত্বের সমস্যাকে তুলে ধরেছেন। গল্পকথকের ভাবনা—"পেটের চিন্তার মতো সহজ অথচ জটিল চিন্তা আর নাই। দিন রাত সেই চিন্তাই করিতেছি। চিন্তাশীল নই, আমি চিন্তাগ্রস্ত।"[১২] গল্পকথক কাজের সন্ধানে কলকাতায় আসলে সেখানেও কাজ মেলা ভার। কলকাতায় এসে তিনি বিকাশ বাবুর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, কথক ভেবেছিলেন বিকাশ হয়তো কোন বড় অফিসে চাকরি করে। কিন্তু গল্পের শেষে দেখতে পাওয়া যায়, বেকারত্বের জ্বালায় বিকাশবাবুও হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। গল্পকথক শেষ পর্যন্ত বিকাশ বাবুকেই অনুসরণ করলেন—"পাশাপাশি দুইজনে দ্রুত বেগে হাঁটিয়া চলিয়াছি। ইডেন গার্ডেনের খালি বেঞ্চিটা না হাতছাড়া হইয়া যায়।"[১৩]

আরও এক ভিন্নধরনের ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠেছে 'সনাতনপুরের অধিবাসীবৃন্দ' গল্পে। লেখক এখানে গ্রামীনজীবনের বিকৃত অবক্ষয়িত রূপের কথা তুলে ধরেছেন। সনাতনপুরের ধনী মানুষ শৈলেশ্বর মোক্তার এবং শ্যামা ধোপানীর অকস্মাৎ গ্রাম থেকে হারিয়ে যাওয়ার পর গ্রামের মধ্যে দুজনকে জড়িয়ে যে মুখোরোচক কুৎসা কাহিনীর জাল বিন্যস্ত হয়েছে তা এককথায় অভাবনীয়। কিন্তু গল্পের শেষে বনফুল এক ঝটকায় সেই মিথ্যা কাল্পনিক কাহিনির কুৎসার জাল ছিঁড়ে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়েছেন। সমগ্র গল্পের মধ্যেই বনফুলের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের সুরটি কোনভাবেই কোথাও অব্যক্ত থাকেনি। শৈলেশ্বর মোক্তার ও শ্যামা ধোপানীর কুৎসার কাহিনি সমগ্র গ্রামের মানুষের প্রিয় বিষয় হয়ে উঠেছিল। অথচ দুজন গেছে দুদিকে। গল্পের শেষে শ্যামা ধোপানী মামা বাড়ি থেকে ফিরেছে আর শৈলেশ্বর মোক্তার ফেরেনি—"কারণ তিনি মারা গিয়াছিলেন। প্রেমে পড়িয়া নয়, কূপে পড়িয়া।...মল্লিক মহাশয় আবিষ্কার করিলেন।"[১৪] শৈলেশ্বর বাবুর মৃতদেহ উদ্ধারের মধ্যে দিয়ে লেখক সমগ্র গ্রামবাসীকে ব্যঙ্গের মাধ্যমে চরম কষাঘাত করেছেন।

বনফুলের গল্পে যে সমস্ত নর-নারীদের কথা উঠে এসেছে, আমাদের বাস্তবিক অভিজ্ঞতার ভূমিতে তারা হয়তো কেউ কখনো দেখা দেয়নি, অথচ তাঁর গল্প পড়ে মনে হয় তারা যেন কেউ আমাদের অপরিচিত নয়। তাদের মতো কাউকে যেন দেখে থাকবো, তাদের কথা শুনে থাকবো। বনফুলের বিশেষত্ব মূলত এখানেই সর্বাধিক। অভিজ্ঞ সমালোচক শ্রী সুকুমার সেন তাঁর 'বনফুলের ফুলবন' গ্রন্থে বলেছেন—"বনফুলের গল্পে একতারা-দোতারা বাজেনি, বেজেছে বহুস্বর কলকণ্ঠ।... বনফুলের গল্পে কারিগরির দিকে ঝোঁক নেই, ঝোঁক আছে আস্ত জীবনের দিকে। যে জীবন বহু-

বিচিত্র, বহু-বিসর্পিত।”[১৫] বনফুল তাঁর গল্পে সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, খুশি-অখুশির আলোছায়ার আলপনা এঁকেছেন, সাথে মানবজীবনের বহু এবং বিচিত্র রসের সমাগমে মজলিশি গল্পকে আধুনিক সাহিত্যের শ্রেণিতে উন্নীত করেছেন। এ কাজ যে বাংলা সাহিত্যে অন্য কোন লেখক কখনো করেননি তা নয়। তবে বনফুল এ কাজ করে এসেছেন অনায়াসে। সহজ ও সাবলীল দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তিনি তাঁর গল্পে এনে দিয়েছেন উচ্চাঙ্গের মাত্রা। বনফুলের গল্পে মানবজীবনের বিচিত্র রূপ যে, নতুন নতুন রূপে এসেছে তা পাঠক-পাঠিকারা গল্পগুলি পড়লে অতি সহজেই অনুধাবণ করতে পারবে।

তথ্যসূত্র:

১। ভট্টাচার্য, জগদীশ, পঞ্চম বাণীশিল্প সংস্করণ এপ্রিল ২০১০, বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা-০৯, অক্ষর বিন্যাস, পৃষ্ঠা ০৮

২। বনফুল, পঞ্চম বাণীশিল্প সংস্করণ এপ্রিল ২০১০, বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা-০৯, অক্ষর বিন্যাস, পৃষ্ঠা ১৩১

৩। বনফুল, পঞ্চম বাণীশিল্প সংস্করণ এপ্রিল ২০১০, বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা-০৯, অক্ষর বিন্যাস, পৃষ্ঠা ৫৯

৪। বনফুল, পঞ্চম বাণীশিল্প সংস্করণ এপ্রিল ২০১০, বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা-০৯, অক্ষর বিন্যাস, পৃষ্ঠা ৩৮

৫। বনফুল, পঞ্চম বাণীশিল্প সংস্করণ এপ্রিল ২০১০, বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা-০৯, অক্ষর বিন্যাস, পৃষ্ঠা ৩৮,৩৯

৬। বনফুল, পঞ্চম বাণীশিল্প সংস্করণ এপ্রিল ২০১০, বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা-০৯, অক্ষর বিন্যাস, পৃষ্ঠা ৪০

৭। বনফুল, পঞ্চম বাণীশিল্প সংস্করণ এপ্রিল ২০১০, বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা-০৯, অক্ষর বিন্যাস, পৃষ্ঠা ৪০

৮। বনফুল, পঞ্চম বাণীশিল্প সংস্করণ এপ্রিল ২০১০, বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা-০৯, অক্ষর বিন্যাস, পৃষ্ঠা ৩৯

৯। বনফুল, পঞ্চম বাণীশিল্প সংস্করণ এপ্রিল ২০১০, বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা-০৯, অক্ষর বিন্যাস, পৃষ্ঠা ৫৫

১০। বনফুল, পঞ্চম বাণীশিল্প সংস্করণ এপ্রিল ২০১০, বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা-০৯, অক্ষর বিন্যাস, পৃষ্ঠা ৪৪

১১। বনফুল, পঞ্চম বাণীশিল্প সংস্করণ এপ্রিল ২০১০, বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা-০৯, অক্ষর বিন্যাস, পৃষ্ঠা ৪৫

১২। বনফুল, পঞ্চম বাণীশিল্প সংস্করণ এপ্রিল ২০১০, বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা-০৯, অক্ষর বিন্যাস, পৃষ্ঠা ৬২

১৩। বনফুল, পঞ্চম বাণীশিল্প সংস্করণ এপ্রিল ২০১০, বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা-০৯, অক্ষর বিন্যাস, পৃষ্ঠা ৬৫

১৪। বনফুল, পঞ্চম বাণীশিল্প সংস্করণ এপ্রিল ২০১০, বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা-০৯, অক্ষর বিন্যাস, পৃষ্ঠা ২৮

১৫। সেন, সুকুমার, দোল পূর্ণিমা ১৩৬৫, বনফুলের ফুলবন, ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট কলকাতা-০৬, বঙ্গবাণী প্রিন্ট্রার্স, পৃষ্ঠা ৬৮

সহায়ক গ্রন্থ:

১। বনফুল, পঞ্চম বাণীশিল্প সংস্করণ এপ্রিল ২০১০, বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা-০৯, অক্ষর বিন্যাস

২। সেন, সুকুমার, দোল পূর্ণিমা ১৩৬৫, বনফুলের ফুলবন, ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট কলকাতা-০৬, বঙ্গবাণী প্রিন্ট্রার্স

৩। রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ, প্রথম প্রকাশ ১৩৮০, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট কলকাতা-৭৩, দে'জ পাবলিশিং

৪। চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল, অষ্টম মুদ্রণ মে ২০১১, সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ৫৫ডি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট কলকাতা-০৯, রত্নাবলী

৫। চৌধুরী, শ্রীভূদেব, দ্বিতীয় সংস্করণ নববর্ষ ১৩৭২, বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প গল্পকার, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, মর্ডান বুক এজেন্সী

‘বিদেশী নায়িকা’ কবিতায় অদ্বৈতের অনন্য অনুভূতি

মৌসুমী পাল
অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বি.বি.এম কলেজ, আগরতলা

মূলত 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের জন্য পরিচিত ও জনপ্রিয় অদ্বৈত মল্লবর্মনের বেশ কিছু গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা বিশেষভাবে উল্লেখ ও আলোচনার দাবি রাখে। আসলে অদ্বৈত মল্লবর্মণ একজন সফল ঔপন্যাসিক হবার পাশাপাশি তিনি একজন সফল গল্পকার, প্রাবন্ধিক এবং সর্বোপরি একজন কবি ও বটে। বিষয় এবং অঙ্গিকের ভিন্নতায় অদ্বৈত মল্লবর্মন বেশ কিছু কবিতা রচনা করেছেন। 'বিদেশী নায়িকা', 'শুশুক', 'যোদ্ধার গান', 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবস', 'ধারা শ্রাবণ', 'মোদের রাজা মোদের রাণী', 'ত্রিপুরা লক্ষী', 'শ্রীমতি শান্তি বর্মনকে', 'সন্ধ্যা বিরহিনী', 'মোহনলালের খেদ', 'সিরাজ', 'পলাশী', 'হলওয়েল স্তম্ভ', 'হীরামতি' প্রভৃতি কবিতা সমূহ বিষয়, ভাব ও অঙ্গিকের দিক থেকে স্বকীয়তার দাবি রাখে। অদ্বৈত মল্লবর্মনের কবিতা নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা প্রসঙ্গে কবিতা সম্পর্কে স্বয়ং অদ্বৈত মল্লবর্মনের ব্যক্তিগত একটি পত্রালাপ এখানে তুলে ধরা অপ্রাসঙ্গিক হবে না- “--- আমার যা বক্তব্য তা আমি এই পত্রে আপনার নিকট বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব।--- কাব্যকে তিনভাগে ভাগ করিয়া ফেলুন। গীতিকাব্য (Lyrical Poems), খন্ডকাব্য (Narrative Poems) ও মহাকাব্য (Epic)। আপনাকে প্রথমত গীতি কবিতায় হাত পরিস্কার করিতে হইবে। Picture-ই গীতি কবিতার প্রাণ। কাজেই আপনি Picture ফুটাইয়া তুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন। তারপর খন্ডকাব্যে হাত দিবেন। অতীত বা বর্তমান ঘটনাবলি লইয়া আপনি খন্ডকাব্যে লিখিতে পারেন, তবে অতীতকে নিয়ে লেখাই প্রথমত আপনার সুবধিাজনক হইবে। কারণ অতীতের উপর লেখকের কল্পানকে উদ্দাম গতিতে চালানো যায়। বর্তমান সমন্ধে অনেক বিপদের আশঙ্কা, আপনি উহা ক্রমে ক্রমে বুঝিবেন।[১] (অনুজপ্রতীম জনাব মতিউল ইসলামে কবিতায় বইয়ের পান্ডুলিপি পড়ে তার সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রেরিত পত্র) এই সমালোচনায় যে সরলতার মাধ্যমে তিনি কবিতা রচনার প্রাথমিক পর্যায়কে বর্ণনা করেছেন, এতেই বোঝা যায় তিনি জন্মগত ভাবেই কবি প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। অদ্বৈত মল্লবর্মনের সংযমী ব্যক্তিত্বে ভীষণরকম রোমান্টিকতার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে তাঁর ‘বিদেশী নায়িকা’ কবিতাটি।

সামাজিক পরিচিতি ও স্বীকৃতির অভাব এবং অর্থনৈতিক দৈন্যতার টানপোড়েন অদ্বৈত মল্লবর্মনের জীবনযুদ্ধকে কী ভীষন ভাবে দুর্বিষহ করে তুলেছিল সে প্রসঙ্গ অদ্বৈতের পাঠক ও গবেষক মাত্র

সকলেই জানেন। জীবন যুদ্ধের সমস্ত রকম প্রতিকূলতার মধ্যেও চরম রহস্যময়তার প্রতিক রূপে প্রতিটি মানুষের জীবনেই প্রেমানুভূতির আবির্ভাব ঘটে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে। আর এক্ষেত্রে অদ্বৈত মল্লবর্মনও যে ব্যাতিক্রম নন তারই সাক্ষ্য বহন করে চলেছে তাঁর 'বিদেশী নায়িকা' কবিতাটি। ছয়টি স্তবকে বিন্যস্ত এই কবিতার শুরুতেই তিনি নিজের স্বপ্নচারিণীর ঠিকানা জানিয়েছে-

“বাধাহীন বারিধির কালো কলধ্বনি/ তারই ওপারে তোমার দেশসেই শ্বেতদ্বীপে।”[২]

- এরপরই কবি অদ্বৈত মল্লবর্মন নিজের বিদেশী নায়িকার অপূর্ব সৌন্দর্যের এক অপার্থিব বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, কবির এই নায়িকা কখনোই ঈশ্বরের অপুট হাতের খেয়ালে সৃষ্ট হতে পারে না, নিশ্চয় কোনো এক কথাশিল্পী নিজের কল্পনার রাজ্যকে উজাড় করে সৃষ্টি করেছেন তাকে; তাই তার এতো অসীম রূপ। এই রূপ কখনোই বাস্তবে হতে পারে না বলেই কবির বিশ্বাস, তাই একমাত্র কবির কল্পনা জগতেই সে বিরাজ করে চলেছে। রূপমুদ্ধতা প্রকাশে কবি অদ্বৈত অদ্বিতীয়-

"রূপসী সপ্তদশী তুমি-
সপ্ত সমুদ্রের শূন্যতা পেরিয়ে
আমার তটে এসে মূর্ছনা জাগায়-তোমার রূপের ঢেউ।”[৩]

নারীর সৌন্দর্যের এই বর্ণনা এই মুগ্ধতা প্রসঙ্গে জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কবিতায় নারীরূপের বর্ণনা আমাদের মনে পড়তে বাধ্য। এখানেও কবি জীবনানন্দ দাশ বনলতা সেনের সৌন্দর্যের বর্নণা প্রসঙ্গে বলেছিলেন-

"চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য, "[৪] ('বনলতা সেন', জীবনানন্দ দাশ)

এই প্রসঙ্গে পল্লীকবি জসিম উদ্দীনের 'নকশী কাঁথার মাঠ' কবিতায় নায়িকা সাজুর বর্ণনাও কবিতাপ্রিয় পাঠক মাত্রেই অবশ্য স্মরণ করবেন-

"মুখখানি তার ঢলঢল ঢলেই যেত পড়ে,/ রাঙা ঠোঁটের লাল বাঁধনে না রাখলে তায় ধরে।
কচি কচি হাত পা সাজুর, সোনায় সোনার খেলা,
তুলসী তলায় প্রদীপ যেন জ্বলছে সাঝের বেলা।/ গাঁদা ফুলের রঙ দেখছি, আর যে চাঁপার কলি,
চাষীর মেয়ের রূপ দেখে আজ তাই কেমনে বলি?"[৫]
('নক্সী কাঁথার মাঠ' জসীম উদ্দিন)

-'বিদেশী নায়িকা'-র দ্বিতীয় স্তবকেই কবি অদ্বৈত্যমল্লবর্মণ জীবনের চরম ট্র্যাজেডির কথা বর্ণনা করেছেন। কবি বলছেন, যে কথাশিল্পীর উজার করে দেওয়া কল্পনার জগতে এই অপূর্ব রূপবতীর সৃষ্টি হয়েছিল, সেই নির্মম কথাশিল্পীই তাঁর গল্পের মাঝখানে 'পুষ্প হিন্দোলায়িত এক সারোবরের জলে' এই নায়িকাকে ডুবিয়ে মেরেছেন। আর এই ক্ষণিকার বুকেই লেখা হয়ে রইলো 'ডিভাইন কমেডির এক অক্ষয় স্বর্গ।'

পরের স্তবকে কবি অদ্বৈত মল্লবর্মণ কিছুটা আক্ষেপের সুরেই আবার বলছেন, বর্তমান সময়ের এই 'ক্ষয়িষ্ণু ধরিত্রীর' বিবর্তনের নির্মমতায় যদি কল্পনার জগতের এই 'সপ্তদশ বসন্তে রসায়িত' নায়িকা বেঁচে থাকতো, তবে কালের নির্মম রথচক্রের তলায় এত রূপ এত যৌবন 'জরার কুঞ্চনে কুঁচকে যেতো' দলিত দ্রাক্ষার ন্যায়। মুগ্ধ মধুপের মতো স্পর্শকাতর মন নিয়ে কবি কখনোই এই নায়িকাকে তেমন ভাবে ভালোবাসতে পারতেন না। তাই কবি এখানে জানতে চাইছেন-

"সপ্তদশ বসন্তে রসায়িত তোমার ঐ তনুমনের কূপে কূপে / মেলাত কি নিষ্ঠার বহু বেণী সঙ্গম।"[৬]

এরপরের স্তবকে কবির কাছে কল্পনার জগৎ ও বাস্তব জগৎ যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। তিনি বলছেন, এই রূপবতী চির যৌবনবতী নায়িকার বয়স দু'শো বছর। অষ্টাদশ শতাব্দীর এক প্রাচুর্যময় প্রাতে তার আবিভাব হয়েছিল। আর এই নির্মম শতাব্দীর বীভৎস বাস্তব রূপের কারণেই হয়তো এই নায়িকার জীবনে আসতে পারতো ব্যর্থতা, গ্লানি, ঈর্ষা, নৈরাশ্য প্রভৃতির পাশাপাশি আরো হয়তো আসতো 'কল্পনাস্তিক সত্যের ছাঁচে ঢালাই করা সেই রোগশয্যায় বিশ্রি রকমের মৃত্যু'। কবিতার শেষে কবি বলছেন, সেই যে কথাসাহিত্যিকের কল্পনায় এই নায়িকা ডুবেছিল, তাই মৃত্যুর বিধাতাকে সে ফাঁকি দিতে সক্ষম হয়েছে। তাই যারা এই নায়িকাকে জানতো ভালোবাসতো, নির্মম- নিষ্ঠুর অনন্ত তারা কেউ দেখেনি। ভাগ্যিস এই নায়িকা কাহিনীর অর্ধেক পথে 'মরে গিয়েছিল' তাই আজো সে বেঁচে আছে-

"আজো তুমি রূপসী, সপ্তদশী, যৌবনবতী
-আজো তুমি প্রিয়া!"[৭]

'মৃত্তিকা' ১ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, হেমন্ত ১৩৪৯ এ- প্রকাশিত এবং 'অদ্বৈত রচনা সমগ্র' ২০০০ এ সংকলিত এই 'বিদেশী নায়িকা' কবিতাটি অদ্বৈত মল্লবর্মনের শক্তিশালী কবিত্বশক্তির পরিচয় বহন করে চলেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের স্বপ্ন দেখা ও স্বপ্ন ভাঙ্গার বাস্তব রূপায়ন হল এই কবিতা। যুগের ভয়াবহতা, ব্যর্থতা, সামাজিক রেষারেষি, ব্যক্তিত্বের অবমাননা, নৈরাশ্য ও মূল্যবোধের সংকটের জীবন্ত দলিল রূপে অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'বিদেশী নায়িকা' কবিতাটি অবশ্যই আলাদা ভাবে পর্যালোচনার দাবি রাখে।

তথ্যসূত্র:

১) 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনাবলী' (অখন্ড), জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, সংগ্রহ ও সম্পাদনা ড. ইসরাইল খান, সূচীপত্র, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০১৫, পৃষ্টা- ৩২-৩৩।

২) ঐ, পৃ-৮৫৩

৩) ঐ, পৃ-৮৫৩

৪) 'বনলতা সেন', জীবনানন্দ দাশ, নিউ স্ক্রিপ্ট, কোলকাতা ৭, ১৯৪২ অষ্টমমুদ্রণ ২০১৭, প্রকাশক - অমিতানন্দ দাশ, পৃ- ৯

৫) 'নকশী কাঁথার মাঠ', জসীম উদ্দিন, Bengallibook.com, ২০২২, পৃ- ৯-১০

৬) 'অদ্বৈত মল্লবর্মনের রচনাবলী' (অখন্ড), ঐ, পৃ-৮৫৩

৭) ঐ, পৃ-৮৫৪

রামেশ্বরের 'শিবায়ন' কাব্যের নির্বাচিত পাঠে কারক-বিভক্তির প্রয়োগ বৈচিত্র্য

মিন্টু নস্কর
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
খড়্গপুর কলেজ

সারসংক্ষেপ : কৃষিভিত্তিক সমাজ কাঠামোর স্বপ্নে পুরাতন অবক্ষয়িত যুগের অবসান এবং আসন্ন সম্ভাবনাপূর্ণ নতুন যুগের সূচনা যিনি করতে চেয়েছিলেন তিনি হলেন রামেশ্বর ভট্টাচার্য। তাঁর রচিত 'শিবায়ন' কাব্য পাঠে কারক- বিভক্তির নানা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। 'শিবায়ন' এর ষষ্ঠ পালার মধ্যে আমরা কারক-বিভক্তি ও অনুসর্গ প্রয়োগের নানান বৈচিত্র্য দেখতে পাই। কারক-বিভক্তির নির্দিষ্ট ব্যাকরণগত রীতির পাশাপাশি কিছু নতুন ধরনের বৈচিত্র্য লক্ষ করি। যেমন— কর্তৃকারকে আমরা 'র' বিভক্তির প্রয়োগ দেখি কিন্তু সাধারণ ভাবে আমরা জানি কর্মকারক, করণকারক ও অপাদান কারকে 'র' বিভক্তি হয়ে থাকে; কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা কর্তৃকারকে 'র' বিভক্তির প্রয়োগের বৈচিত্র্য দেখতে পাই। তাই এটা যতটাই ব্যতিক্রম ততটাই নব্য। আবার নিমিত্ত কারকে 'এর' বিভক্তির প্রয়োগ দেখা গেছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও আমরা জানি যে সম্বন্ধ পদের ক্ষেত্রে 'এর' বিভক্তি হলেও নিমিত্ত কারকে 'এর' বিভক্তি হয় না। তাই এক্ষেত্রেও আমরা কারক-বিভক্তির বৈচিত্র্য দেখতে পাই। এছাড়াও আমরা কাব্যের পংক্তির মধ্যে বিভক্তির অনুপস্থিতি লক্ষ করি। আবার সম্বন্ধ পদ ও সম্বোধন পদের ব্যবহারে বিভক্তির অনুপস্থিতি দেখা যায়। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে কাব্য স্বার্থে বিভক্তির বা অনুসর্গের প্রয়োগ ঘটানো হয় নি। আমরা জানি করণকারকে 'দ্বারা' অনুসর্গের ব্যবহার হয় কিন্তু কারক-বিভক্তির প্রয়োগ বৈচিত্র্য নির্ণয়ের সময় দেখা যায়, কাব্যের স্বার্থে বিভক্তি, অনুসর্গের ব্যবহার না করে শব্দের পরিবর্তন ঘটিয়েই তিনি কাব্য রচনায় সাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

সূচক শব্দ : শিবায়ন, রামেশ্বর, বিভক্তি, অনুসর্গ, কারক, প্রয়োগ বৈচিত্র্য।

মধ্যযুগের কবি কাননে যারা স্বমহিমায় কবিত্ব শক্তির ঝঙ্কারে দেশবাসীর হৃদয়ে চিরতরে স্থান করে নিয়েছেন, 'শিবসঙ্কীর্তন' বা 'শিবায়ন' কাব্যের কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি আবার 'সত্যনারায়ণ পাঁচালী' কাব্য প্রণেতা। এই রামেশ্বর ভট্টাচার্য হলেন অষ্টাদশ শতকের কবি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাঁর জীবনের ইতিহাস খুব বেশি জানা যায় না। 'শিবসঙ্কীর্তন' কিম্বা 'সত্যনারায়ণ পাঁচালী' যে কাব্যই পড়ি না কেন, তাতে তার জন্ম সন এবং কাব্যরচনার সাল-তারিখ সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারি না। যদিও রামেশ্বর 'শিবসঙ্কীর্তন' কাব্যের শেষে হেঁয়ালির ঢঙে শ্লোক ব্যবহার করেছেন।

প্রদত্ত শ্লোকের উপর ভরসা করেই কাব্যের রচনাকাল নির্ণয় করতে হয়। অনুমান করা হয় ১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দে রামেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন। কাব্যে নিজের বংশ পরিচয় সম্পর্কে যে তালিকা তিনি দিয়েছেন তা থেকেই আমরা কবি রামেশ্বরের বংশ পরিচয় পেয়ে থাকি। রামেশ্বর ভট্টাচার্য ভট্টনারায়ণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কবির প্রপিতামহের নাম নারায়ণ চক্রবর্তী, পিতামহের নাম গোবর্দ্ধন চক্রবর্তী। কবির পিতামহ ছিলেন বেদজ্ঞ পন্ডিত। কবির পিতার নাম লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য, পাণ্ডিত্য ও যজন-যাজন ক্রিয়ার জন্য তিনি ভট্টাচার্য পদবী গ্রহণ করেন। কবির মাতার নাম রূপবতী। এক ভাই, তার নাম শম্ভুনাথ। দুই পত্নী সুমিত্রা ও পরমেশ্বরী। কবির পূর্বনিবাস ছিল যদুপুর গ্রামে। বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে হেমৎসিংহের সঙ্গে সংঘাত শুরু হলে কবি পরাস্ত হয়ে কর্ণগড়ে চলে আসেন। কর্ণগড়ের রাজা রামসিংহের আশ্রয় লাভ করেন এবং রাজা রামসিংহ তাঁকে কাঁসাই নদীর তীরে অযোধ্যানগরে বসবাসের জায়গা দেন। কবির পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে রাজা রামসিংহ তাকে পুরাণ পাঠে নিযুক্ত করলেন এবং শিবমহিমার গীত লেখার অনুরোধ করেছিলেন এবং তিনি কাব্যটি শেষ করেছিলেন রাজা রামসিংহের পুত্র রাজা যশোমন্ত সিংহের আমলে। এর পরিচয় পাওয়া যায় কাব্যমধ্যে—

আরাধিয়া গৌরীহর রামেশ্বর মাগে বর
যশোবন্ত সিংহের কল্যান। (শিবায়ন, পৃ. ১৬)

শিব পুরাণের কাহিনি নিয়ে রচিত কাব্যধারার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি হলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য। রামেশ্বরের কাব্যরচনা কাল সম্পর্কে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। আমরা ইতিহাস থেকে জানতে পারি ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা যশোমন্ত সিংহ কর্ম ত্যাগ করে 'ঢাকা' থেকে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন অর্থাৎ মেদিনীপুর আসেন। মেদিনীপুর আসার পর কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য যশোমন্ত সিংহের সভাপণ্ডিতের কাজ গ্রহণ করেন এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে, ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০-১৫ বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে 'রামেশ্বরের শিবসঙ্কীর্তন' বা 'শিবায়ন' পালা রচিত হয়। রামেশ্বর ভট্টাচার্য ছিলেন শিক্ষিত, ভদ্ররুচি সম্পন্ন এবং সংস্কৃত ভাষাশিক্ষায় অত্যন্ত অভিজ্ঞ পণ্ডিত, তাই তাঁর কাব্যটিও হয়েছে সেই মানের। 'শিবসঙ্কীর্তন' পালার শুরুতেই রামেশ্বর ভট্টাচার্য দেব-দেবীর বন্দনাগান গেয়েছেন। রামেশ্বরের 'শিবসঙ্কীর্তন' সাতপালা ও জাগরণ পালায় সমাপ্ত। প্রত্যেক দিন ও রাত্রিতে এক পালা গীত হওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। প্রথম পালায় রয়েছে পুরাণানুসারী সৃষ্টি ও দেবতাদির উৎপত্তি কথন। দ্বিতীয় পালায়, দক্ষযজ্ঞ নাশ ও সতীর দেহত্যাগ, দক্ষের ছাগমুন্ডের কাহিনী। তৃতীয় পালায় রয়েছে, হিমালয় গৃহে গৌরীর জন্ম, হিমালয় গৃহে শিবের আগমন, মহাদেবে ধ্যানভঙ্গের অপরাধে মদনভগ্ন ও রতিবিলাপ, গৌরীর তপস্যা, গৌরী ও ছদ্মবেশী শিবের বাক্যপ্রবন্ধ, শিবের বিবাহ প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। এই পর্যন্ত পৌরাণিক কাহিনির ধারা ঘনিষ্ঠভাবে অনুসৃত হয়েছে। হর-পার্বতীর বিবাহের পর থেকে পৌরাণিক কাহিনি ধীরে ধীরে অপসৃত হয়েছে এবং কৃষিপ্রধান

জীবন উত্থিত হয়ে লৌকিক শিবের কাহিনি জাজ্বল্যমান হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনির সমাবেশ থাকলেও কাব্যটিতে কবি নিজ কবিত্ব ও মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়ে নিজ প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিয়েছেন। তৃতীয় পালার মাঝামাঝি সময়ে কবি লৌকিক কাহিনী অনুসরণ করেছেন। বরবেশী শিবকে দেখে মেনকার বিলাপ, শিবের মোহনমূর্তি ধারন, হরগৌরী-র বিবাহ- এই স্থানে তৃতীয় পালা সমাপ্ত হয়েছে। চতুর্থ পালায়, শিবের গার্হস্থ্য জীবনের লৌকিক কাহিনির চিত্র বর্ণিত হয়েছে। মহাদেবের জীবিকা হিসাবে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ, হরগৌরীর কলহ, ঝুলি থেকে শিবের ধনরত্ন বাহির করা, হরগৌরীর নানা তত্ত্বকথা আলোচনা, রামনাম মাহাত্ম্য ও হরিনাম মাহাত্ম্য ঘোষনা এই স্থলে চতুর্থ পালার পরিসমাপ্তি। পঞ্চম পালায় রয়েছে, কৃষ্ণের রুক্মিনীহরণ ও বিবাহ এবং বাণরাজার কন্যা উষার সঙ্গে কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের গোপন মিলন এবং সেই প্রসঙ্গে হরিহরের যুদ্ধ। ষষ্ঠ পালায়, যথাক্রমে বৃকাসুর উপাখ্যান, শিবরাত্রি বিধি, শিবরাত্রি ব্রতের প্রভাব, একাদশী মাহাত্ম্য, হরপার্বতীর কলহ, শূলের গুণ বর্ণনা, কৃষির উদযোগ, শিবের চাষ করতে গমন, ভীমের ভোজন, শিবের ক্ষেতে শসোৎপত্তি। সপ্তম পালায় রয়েছে, নারদের কৈলাস যাত্রা, পার্বতীকে নারদের মন্ত্রনা দান, শিবের কাছে উঙানি মশা প্রেরণ, মাছি ও ডাঁশ প্রেরণ, মশার উপদ্রব, জোঁকের উপদ্রব, মহামায়ার বাগদিনী রূপগ্রহণ, ভীমের সঙ্গে বাগদিনীর কলহ, শিবকে ছলনাপূর্বক ভগবতীর প্রস্থান, শিবের কৈলাস গমন। জাগরণ পালায়, নারদের প্ররোচনায় পার্বতী স্বামীর নিকট শাঁখা পরার বাসনা, শিবের অসামর্থতা জেনে দেবী পার্বতীর সাভিমানে পিত্রালয়ে গমন, শাঁখারী রূপে শিবের হিমালয় গৃহে গমন ও গৌরীকে শাঁখা পরিয়ে মানভঞ্জনের চেষ্টা ও অতঃপর হরপার্বতীর পুনর্মিলনে কাহিনি সমাপ্ত হয়েছে। আসলে হরগৌরীরের মাহাত্ম্য প্রচারই হল কাব্যেরর মূল বিষয়।

আলোচ্য প্রবন্ধে রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবায়ন' এর ষষ্ঠ পালার ওপর নির্ভর করে কারক-বিভক্তির প্রয়োগ দেখানো হয়েছে। ষষ্ঠ পালার কাহিনিটি মোটামুটি এরকম। বৃক নামে এক অসুর নারদমুনির উপদেশে শিবের সাধনায় সিদ্ধ হয়ে বর চাইলেন যে যারই মস্তকে বৃকাসুর হাত দেবেন সেই ভস্ম হয়ে যাবে। বর প্রাপ্ত হয়ে বৃকাসুর পরীক্ষা করতে শিবের মাথাতে হাত দিতে গেলে শিব পলায়ন করেন। কেবলমাত্র শিব নয়, অন্যান্য দেব-দেবীরাও বৃকাসুরের ভয়ে পলায়ন করেন বিষ্ণুর কাছে। বাকপটু বিষ্ণু বৃকাসুরকে নিজ মস্তকে হাত রেখে পরীক্ষা করতে বলেন। নিজ শিরে বৃকাসুর হাত রাখতেই ভস্ম হয়ে যায়। দেবকুল রক্ষা পাওয়ায় পশুপতি পদ্মনাভের প্রশংসা করেন। ষষ্ঠ পালায় রয়েছে শিবরাত্রি বিধির কথা—

> ফাল্গুনে যে চতুর্দ্দশী কৃষ্ণপক্ষে হয়।
> তাহার যে রাত্রি তাকে শিবরাত্রি কয়।। (শিবায়ন, পৃ. ২০০)

মণিমুক্তা প্রবালে নয় বিল্বপত্রে শিব তৃপ্ত হন। প্রহরে প্রহরে স্নান পূজা করে অর্থাৎ প্রথম প্রহরে দুগ্ধ, দ্বিতীয়ে দধি, তৃতীয়ে ঘৃত, চতুর্থতে মধু দিয়ে স্নান-পূজা করে পুষ্প

বিল্বপত্র দিয়ে পূজা। ও পরদিন আগে ব্রাহ্মণ ভোজন এই হল শিবরাত্রি বিধি। এরপরে ব্যাধের মৃগয়া গমনের কাহিনি রয়েছে। মৃগয়ায় ব্যাধ বিস্তর শিকার করে মাংস আহরণ করে এবং পথশ্রমে সে ক্লান্ত হয়ে বনের মধ্যেই শুয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে বেলা গড়িয়ে অন্ধকার হলে ভয়ে সে বিল্ববৃক্ষের ওপর উঠে বসে। ভাগ্যক্রমে বৃক্ষের নীচে ছিল শিবলিঙ্গ। গাছের ওপর ব্যাধ প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কাঁপতে থাকে। তার কম্পনে বিল্বপত্র এবং হিম নীচে থাকা শিবলঙ্গে এসে পড়লে তিথির মাহাত্ম্যে ব্যাধের বহুল পুণ্যলাভ হয়। পরবর্তীকালে মৃত্যুকালে ব্যাধকে নিয়ে যাওয়ার জন্য যমদূতেরা এলে শিবদূতের সাথে যমদূতের যুদ্ধ হয় ও ব্যাধের শিবলোক প্রাপ্তি হয়। এরপর রয়েছে শিবমন্দিরে যম ও নন্দীর কথোপকথন, শিবরাত্রি ব্রতের প্রভাব, একাদশী ব্রতের মাহাত্ম্য—

বাসুদেব বিনা যেন বস্তু নাই আর।
একাদশী তেমন সকল ব্রতসার।। (শিবায়ন, পৃ. ২১২)

সংসারে অভাব-অনটন থাকায় গৌরী শিবকে চাষ করতে বলেন। শিব ব্যবসা করতে চান; উমা শিবকে বুঝিয়ে বলেন বাণিজ্যে করার মতো পুঁজি তাদের নেই। তখন একপ্রকার নিরুপায় শিব গৌরীর কথায় চাষে রাজি হন। এরপরে পাই শূলের গুণ বর্ণনা ও চাষের উদ্যোগ, গৌরীর অনুরোধে শিব চাষ করার জন্য ইন্দ্রের কাছ থেকে জমি নেন। বিশ্বনাথের ত্রিশূল ভেঙ্গে বিশ্বকর্মা লাঙ্গল, জোয়াল, মই প্রভৃতি সঙ্গে সঙ্গে বানিয়ে দেন। এরপর চাষের সাজসজ্জা প্রস্তুত করা হয় ও কুবেরের কাছ থেকে শিব ধান বীজ ধার নেন। এবারে শিব কৃষিভূমিতে যাত্রা করেন, পার্বতীও সাথে যেতে চান। কিন্তু কৈলাস শূন্য করে যাওয়া অসম্ভব তাই পার্বতী সন্তানদের নিয়ে কৈলাসে থাকেন এবং শিব চাষভূমিতে যাত্রা করেন বৃষ ও ভীমের সহিত। মাঘের শেষে বৃষ্টি হওয়ায় শিব অনুচর ভীমের সাহায্য নিয়ে চাষ করলেন। সারাদিন পরিশ্রমের পর ভীম ভোজন করতে চাইলে শিবের আপত্তি। শিব বলেন বাড়ী থেকে খেয়ে আসতে। এ কথায় ভীমের গা জ্বলে ওঠে। ভীম বলে, যে বাড়ি গিয়ে মামীকে বলবে মামা কোচনীকে নিয়ে পালিয়েছে একথা শুনে বিশ্বনাথ ভীমের ভোজনের ব্যবস্থা করেন। দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান হয় শিবের ক্ষেত্রে শস্যোৎপত্তি হয়। শস্য দেখে শিব আনন্দে আত্মহারা—

হর্ষ হৈয়া হর ধান্য দেখে অবিরাম।
কালিন্দীর কূলে যেন নবঘনশ্যাম।। (শিবায়ন, পৃ. ২৩৮)

এতো ধান ভানার জন্য শিব নারদের কাছ থেকে ঢেঁকি চেয়ে আনলেন। অনুচর ভূত-প্রেত সবাই ধান ভেনে (কুটে) চাল তৈরী করল। গৌরীর সংসারে অভাব দূর হল। দাম্পত্য জীবনেও এল শান্তি। মূলত ষষ্ঠ পালার এই কাহিনিকে ভিত্তি করেই আমরা প্রবন্ধের মূল আলোচনায় অগ্রসর হব। তবে তার আগে কারক-বিভক্তি, অনুসর্গ বিষয়ে একটু ধারণা করে নেওয়া প্রয়োজন।

কারক-বিভক্তি : সংজ্ঞা ও পরিসর

বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের সঙ্গে বাক্যের ক্রিয়াপদের যে সম্বন্ধ থাকে তাকে কারক বলে।

ক্রিয়ার সঙ্গে বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের সম্বন্ধ ছয় রকমের বলে কারক ছয় প্রকারের। যথা- কর্তৃকারক, কর্মকারক, করণকারক, নিমিত্তকারক, অপাদানকারক এবং অধিকরণ কারক। একটি বাক্যে ক্রিয়াপদগুলিকে ছয় রকম ভাবে প্রশ্ন করা যায় এবং প্রশ্ন করার পর যে উত্তরগুলো পাওয়া যায় সেগুলিই হল এক একটি কারক। একটি বাক্যের মধ্যে দিয়ে তা তুলে ধরা হল—
'মা রান্নাঘরে হাঁড়ি থেকে হাতা দিয়ে ছেলেমেয়েদের জন্য ভাত বেড়ে দিচ্ছেন।'

নং	প্রশ্ন	উত্তর	কারক
১	কে বেড়ে দিচ্ছেন	মা	কর্তৃকারক
২	কি বেড়ে দিচ্ছেন	ভাত	কর্মকারক
৩	কিসের দ্বারা বেড়ে দিচ্ছেন	হাতা দিয়ে	করণকারক
৪	কাদের জন্য বেড়ে দিচ্ছেন	ছেলেমেয়েদের জন্য	নিমিত্ত কারক
৫	কোথা থেকে বেড়ে দিচ্ছেন	হাঁড়ি থেকে	অপাদান কারক
৬	কোথায় বেড়ে দিচ্ছেন	রান্নাঘরে	অধিকরণ কারক

১. কর্তৃকারক : যে পদ বাক্যে ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে কর্তা বলে। বাক্যে সমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে যে পদ (বিশেষ্য বা সর্বনাম) সরাসরি বা প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত হয়ে অর্থ প্রকাশে সহায়তা করে তাকে বলে কর্তৃকারক। যেমন— শিক্ষক ছাত্রদের শিক্ষা দান করছেন। এখানে 'দান করছেন' ক্রিয়াটি 'শিক্ষক' সম্পাদন করছেন। তাই এই বাক্যে 'শিক্ষক' কর্তৃকারক।

২. কর্মকারক : কর্তা যাকে কেন্দ্র করে কাজটি করে তাকেই বলে কর্ম। বাক্যের কর্মসূচক পদকে কর্মকারক বলে। যেমন— শিক্ষিকা ছাত্রীটিকে বই পড়াচ্ছেন। এই বাক্যে কর্তা 'শিক্ষিকা', 'বই'-কে কেন্দ্র করে কর্ম করেছেন তাই 'বই' হল কর্মকারক।

৩. করণকারক : কর্তা যার সাহায্যে ক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকে করণ বলে। বাক্যে করণসূচক পদকেই বলা হয় করণকারক। যথা— সে ছুরি দিয়ে পেন্সিল কাটছে। এই বাক্যে কর্তা 'সে', 'কাটছে' ক্রিয়া এবং 'পেনসিল' কর্ম। কর্তা 'ছুরি দিয়ে' ক্রিয়া সম্পন্ন করছে তাই 'ছুরি দিয়ে' করণকারক।

৪. নিমিত্তকারক : বাক্যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ যখন সমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে কোনও কারণ, প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য সম্পর্কযুক্ত হয় তাকে নিমিত্ত কারক বলে। যেমন— তিনি ব্যবসার জন্য দিল্লী গেলেন। এখানে বিশেষ্য 'তিনি', ক্রিয়াপদ 'গেলেন'। তিনি কী উদ্দেশ্যে দিল্লি গেলেন প্রশ্ন করলে উত্তর হবে 'ব্যবসা'। তাই 'ব্যবসা' নিমিত্তকারক।

৫. অপাদানকারক : যে ব্যক্তি বা বস্তু থেকে কোনও কিছু চলিত, ভীত, গৃহীত, পতিত, উৎপন্ন, রক্ষিত বা বিরত হয় সেই ব্যক্তি বা বস্তুবাচক পদকেই অপাদানকারক বলে।

যেমন— দুঃখে তাঁর চোখ থেকে জল ঝরে পড়ল। এই বাক্যে 'চোখ'

৬. অধিকরণকারক : বাক্যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ যখন ক্রিয়ার স্থান, কাল, আধার প্রকাশ করে তখন তাকে অধিকরণকারক বলে। যেমন— গতকাল তাকে মাঠে দেখেছি। এই বাক্যে 'মাঠ' বিশেষ্য পদ 'দেখেছি' ক্রিয়াপদের স্থান নির্দেশ করছে। তাই 'মাঠে' অধিকরণকারক।

১. সম্বন্ধ পদ : যে পদের সঙ্গে ক্রিয়া ছাড়া বাক্যের অন্য আর এক পদের সম্বন্ধ থাকে, তাকে সম্বন্ধ পদ বলে। যেমন— রবীন্দ্রনাথের রচনা, দুঃখীর সেবা, তুলির টান, জলের মাছ প্রভৃতি।

২. সম্বোধনপদ : যে পদের দ্বারা কাউকে আহ্বান করা বোঝায় সেই পদকে সম্বোধন পদ বলে। সম্বোধন পদের প্রয়োগ—

(ক) ভাই একটু সরে দাঁড়াবেন।

(খ) ওরে দুষ্টু ছেলে!

(গ) এই যে এদিকে আসুন।

(ঘ) হ্যাঁরে, তোর বাড়ি কোথায়? প্রভৃতি।

বিভক্তি : যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি শব্দ বা ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দ বা ধাতুকে বাক্যে ব্যবহৃত হতে সাহায্য করে তাদের বিভক্তি বলে। বিভক্তি দুই প্রকার। যথা— শব্দবিভক্তি ও ধাতুবিভক্তি।

(ক) শব্দবিভক্তি : যে বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দটিকে পদে পরিণত করে তাকে বলে শব্দবিভক্তি। যেমন— কলমে জোর না থাকলে রচনায় ভালো নম্বর পাওয়া যায় না ('এ' বিভক্তি)।

রাজার ঔদার্য ও মহত্ত্বই অপরাধীকে বাঁচিয়ে দিল (**'র'** বিভক্তি)।

বুলবুলিতে মিষ্টি সুরে গান করছে (**'তে'** বিভক্তি)।

(খ) ধাতুবিভক্তি : যে বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠন করে তাকে বলে ধাতুবিভক্তি। যেমন—

পরিতোষবাবু একমনে বই পড়ছেন। পড়ছেন ক্রিয়াপদটিতে 'পড়্' ধাতু এবং 'ছেন' ধাতুবিভক্তি।

কর্তৃকারকে বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ :

(১) 'শূন্য' বিভক্তি : পাখি পাকা পেঁপে খায়।

(২) 'এ' বিভক্তি : সকলে হাততালি দিল।

(৩) 'তে' বিভক্তি : পাখিতে ধান খেয়ে গেল।

(৪) 'য়', 'য়ে' বিভক্তি : ঘোড়ায় গাড়ি টানে। ভাইয়ে ভাইয়ে মিল থাকা প্রয়োজন।

(৫) 'এতে' বিভক্তি : মূর্খেতে বিদ্যার মূল্য জানে না।

কর্মকারকে বিভিন্ন বিভক্তির চিহ্ন :

(১) 'শূন্য' বিভক্তি : গরু ঘাস খায়।

(২) ‘কে’ বিভক্তি : মা মেয়েকে গান শেখাচ্ছেন।

(৩) ‘রে’ বিভক্তি : কর্মকারকে 'রে' বিভক্তি সাধারণত কবিতায় ব্যবহৃত হয়। রেখো মা দাসেরে মনে।

(৪) ‘র’, ‘এর’ বিভক্তি : পাপীর বিচার করো। দুষ্টের দমন করো।

(৫) ‘এ’ বিভক্তি : রামে দেখে তিনি খুশি হলেন। (রামকে অর্থে)

(৬) ‘য়’ বিভক্তি : সুদীপ আমায় বইটা দিয়েছিল।

(৭) ‘এর’ বিভক্তি : তুমি আমারে আজও চিনিলে না।

করণকারকে বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ :

(১) ‘শূন্য’ বিভক্তি : বড়োরা তাস খেলে।

(২) ‘এ’ বিভক্তি : মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে।

(৩) ‘য়’ বিভক্তি : টাকায় সবকিছু কেনা যায় না।

(৪) ‘তে’ বিভক্তি : ছেলেরা আনন্দেতে নাচছে।

(৫) ‘র’, ‘এর’ বিভক্তি : বর্শার আঘাতে লোকটির দেহ ক্ষত বিক্ষত হল। তাঁতের তৈরী কাপড় সুদৃশ্য।

নিমিত্তকারকে বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ :

(১) ‘কে’ বিভক্তি : গরিবকে দুটো পয়সা দিয়ে সাহায্য করো।

(২) ‘রে’ বিভক্তি : ছেলেরে সব দিয়ে তিনি তীর্থে গেলেন।

(৩) ‘এ’ বিভক্তি : অন্ধজনে আলো কে দেবে?

(৪) ‘শূন্য’ বিভক্তি : তোমা দিনু মম সকলই।

অপাদানকারকে বিভক্তির প্রয়োগ

(১) ‘শূন্য’ বিভক্তি : ট্রেন হাওড়া ছাড়ল।

(২) ‘কে’ বিভক্তি : বাঘকে ভয় পায় না এমন সাহসী কজন আছে?

(৩) ‘এ’ বিভক্তি : তিলে তেল হয়।

(৪)‘তে’ বিভক্তি : সরষেতে তেল হয়।

(৫) ‘র’, ‘এর’ বিভক্তি : আমার বোনের খুব ভূতের ভয়।

অধিকরণকারকে বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ

(১) ‘শূন্য’ বিভক্তি : ট্রেনটি দেরীতে বিহার পৌঁছল।

(২) ‘এ’ বিভক্তি : তিনি সকালে এসেছেন।

(৩) ‘য়’ বিভক্তি : আমরা গঙ্গায় স্নান করলাম।

(৪) ‘তে’ বিভক্তি : তাদের বাড়িতে একটা বিড়াল আছে।

(৫) ‘কে’ বিভক্তি : আজকে বৃষ্টি হতে পারে।

অনুসর্গ : যে সকল শব্দ বাক্যে পদের মতোই ব্যবহৃত হয়ে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের পরে বিভক্তির কাজ করে তাদের অনুসর্গ বলে। বিভিন্ন কারকে ব্যবহৃত অনুসর্গগুলি একটি ছকের সাহায্যে দেখানো হল—

নং	কারক	অনুসর্গ
১ ২	করণ নিমিত্ত	দ্বারা, দিয়া (দিয়ে), করিয়া (করে), হইতে (হতে), লইয়া (নিয়ে), কর্তৃক ইত্যাদি। জন্য, তরে, নিমিত্ত, লাগিয়া (লাগি) ইত্যাদি।
৩	অপাদান	হইতে (হতে), থেকে, চেয়ে, অপেক্ষা, নিকট, কাছে, কাছ থেকে ইত্যাদি।
৪	অধিকরণ	মধ্যে, মাঝে, ভিতর (ভিতরে), উপর (উপরে, পরে) ইত্যাদি।

শিবায়ন কাব্যে কারক-বিভক্তির প্রয়োগ বৈচিত্র্য :

এবারে মূল আলোচনায় অর্থাৎ রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবায়ন' কাব্যের ষষ্ঠ অধ্যায়ের নির্বাচিত অংশের ওপর কিভাবে কারক-বিভক্তির প্রয়োগ করেছেন কবি সে সম্পর্কে আলোকপাত করা যাক—

গৌরী সঙ্গে জ্ঞানগোষ্ঠে গেল কত কাল।
পর্বতপুত্রিকা পুনঃ পাতিল জঞ্জাল।। (শিবায়ন, পৃ. ২১৫)

প্রথম পংক্তিতে সম্বন্ধ পদে 'র' বিভক্তির অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। আমরা জানি ক্রিয়াপদের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক না থাকলে তা কারক হয় না। তাই এক্ষেত্রে 'গৌরী' এই বিশেষ্য পদটির 'গেল' ক্রিয়াপদের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক না থাকায় এটি সম্বন্ধ পদ হয়েছে। তবে 'র' বিভক্তির লোপ লক্ষ করা যায়।

শিবে বলে সেই যে সম্পত্তি দিয়াছিলে।
মনে কর মহাপ্রভু কতকাল খালো।। (শিবায়ন, পৃ. ২১৫)

এক্ষেত্রে প্রথম পংক্তিতে কর্মকারকে 'কে' বিভক্তির প্রয়োগ হয়নি। আমরা জানি সাধারণত ক্রিয়াকে কী বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে কর্মকারক বোঝায়। এক্ষেত্রেও 'বলে' ক্রিয়াকে কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তর হবে 'শিবে'। তাই এক্ষেত্রে 'শিবে' কর্মকারক। কিন্তু এখানে কাব্যের স্বার্থে 'শিবে' করা হয়েছে।

পুণ্যবান লোক পান লক্ষ্মীরূপা নারী।
উত্তম উদযোগ কর‍্যা উথলয়ে গারি।। (শিবায়ন, পৃ. ২১৫)

এক্ষেত্রে কর্মকারকে 'এ' বিভক্তির প্রয়োগ হয়নি। আমরা জানি কর্মকারকে সাধারণভাবে 'এ' বিভক্তির প্রয়োগ হয়ে থাকে কিন্তু এখানে প্রথম পংক্তিতে কর্মকারকে 'এ' বিভক্তির অনুপস্থিতি লক্ষ করি।

চাষ অভিলাষ ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করী।
আর কিছু ব্যবসায় বল তাহা করি।। (শিবায়ন, পৃ. ২১৭)

প্রথম পংক্তিতে সম্বন্ধ পদে 'এর' বিভক্তি অনুপস্থিত। এক্ষেত্রে 'ক্ষমা কর' এই ক্রিয়াপদের সাথে 'চাষ' বিশেষ্যপদের সরাসরি সম্পর্ক না থাকায় এটি সম্বন্ধ পদ

হয়েছে। কিন্তু ‘এর’ বিভক্তি চিহ্ন লুপ্ত হয়েছে।

বিচক্ষণা ব্যবসায় বিচারিয়া কয়।
বাণিজ্যে বসেন লক্ষ্মী সে তোমার নয়।। (শিবায়ন, পৃ. ২১৭)

এক্ষেত্রে অধিকরণকারকে ‘তে’ বিভক্তি প্রয়োগ করা হয় নি। এক্ষেত্রে ‘লক্ষ্মী’ বিশেষ্যপদটি ‘বসেন’ ক্রিয়াপদের স্থান নির্ণয় করছে তাই ‘বাণিজ্যে’ অধিকরণকারক। অধিকরণ কারকে সাধারণত ‘তে’ বিভক্তির প্রয়োগ লক্ষ করা যায় কিন্তু এক্ষেত্রে তা লুপ্ত।

ভিক্ষে দুঃখ গেল নাই জানিলাম আমি।
চাষ বিনে আর কোন যোগ্য বল তুমি।। (শিবায়ন, পৃ. ২১৭)

প্রথম পংক্তিতে করণকারকে ‘দ্বারা’ নেই, বরং তার জায়গায় ‘শূন্য’ বিভক্তির প্রয়োগ ঘটেছে। কিন্তু এখানে কাব্যের স্বার্থে ‘ভিক্ষা’ টাকে ‘ভিক্ষে’ করা হয়েছে।

কাত্যায়নী কন কান্ত কিছু নাই কেন।
কুবেরের বাড়ী বীজ বাড়ি কর‍্যা আন।। (শিবায়ন, পৃ. ২১৮)

দ্বিতীয় পংক্তি অপাদানকারকে ‘থেকে’ অনুসর্গটি অনুপস্থিত। অপাদানকারকে সাধারণত ‘থেকে’ অনুসর্গটি ব্যবহৃত হয় কিন্তু এক্ষেত্রে এটি বিভক্তি ও অনুসর্গহীন।

যাদবের যে হলে যমুনা আকর্ষণ।
হেলায় হস্তিনাপুরী হৈল উৎপাটন।। (শিবায়ন, পৃ. ২১৮)

প্রথম পংক্তিতে অপাদানকারকে ‘হইতে’ (হতে) অনুসর্গটি অনুপস্থিত। অপাদানকারকে ‘হইতে’ (হতে) অনুসর্গটির ব্যবহার সাধারণত হয়ে থাকে কিন্তু এক্ষেত্রে এটি বিভক্তি ও অনুসর্গহীন। দ্বিতীয় পংক্তিতে করণকারকে ‘‘দিয়ে’ অনুসর্গের ব্যবহার আমরা সাধারণত পাই। কিন্তু এক্ষেত্রে দিয়ে অনুসর্গটি অনুপস্থিত। তাই এখানে এটি অনুসর্গহীন।

শিবা বলে যদ্যদি সে হলে পাল্যে ভয়।
বিশ্বকর্মা হৈতে কোন কর্ম নাই হয়।। (শিবায়ন, পৃ. ২১৯)

এক্ষেত্রে দ্বিতীয় পংক্তিতে কর্তৃকারকে ‘র’ বিভক্তির প্রয়োগ হবে দেখা যাচ্ছে। আমরা জানি কর্তৃকারকে ‘র’ বিভক্তির প্রয়োগ হয় না, কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। তাই এক্ষেত্রে আমরা কর্তৃকারকে ‘র’ বিভক্তির প্রয়োগ বৈচিত্র্য দেখতে পাই।

শূলে যত কর্ম্ম হয় কয় দয়ানিধি।
শূল হইতে শঙ্করে সঙ্কোচ করে বিধি।। (শিবায়ন, পৃ. ২১৯)

প্রথম পংক্তিতে করণকারকের ‘এর’ বিভক্তি ও ‘দ্বারা’ অনুসর্গের প্রয়োগ হয়নি। আমরা জানি করণকারকে সাধারণত ‘এর’ বিভক্তি ও ‘দ্বারা’ অনুসর্গের প্রয়োগ দেখা যায় কিন্তু কাব্যস্বার্থে এক্ষেত্রে তা ব্যবহার হয়নি।

দাগাবাজ বাঘা বড় কান পাত্যা শুনে।
চাক পারা চক্ষু কর‍্যা চায় বৃষ পানে।। (শিবায়ন, পৃ. ১২০)

দ্বিতীয় পংক্তিতে সম্বন্ধপদে ‘এর’ বিভক্তির প্রয়োগ হয় নি। ক্রিয়াপদের সাথে

বিশেষ্যপদের সরাসরি সম্পর্ক না থাকায় সম্বন্ধ পদ হয়েছে। কিন্তু বিভক্তি চিহ্ন লুপ্ত হয়েছে।

বলে শিবা বুড়ার বিলম্ব আর কেন।
শিব বলে বাপু নন্দী বৃষ সাজ্যা আন।। (শিবায়ন, পৃ. ২২১)

দ্বিতীয় পংক্তিতে কর্মকারকে 'কে' বিভক্তির প্রয়োগ হয়নি। এক্ষেত্রে কাব্যস্বার্থে 'শূন্য' বিভক্তির প্রয়োগ করা হয়েছে।

ঘরে বস্যা পরকে প্রার্থনা ভালো নয়।
একবার আশ্রমে অবশ্য যাত্যে হয়।। (শিবায়ন, পৃ. ২২১)

অপাদানকারকে সাধারণত 'থেকে' অনুসর্গটি ব্যবহৃত হয় কিন্তু এক্ষেত্রে দ্বিতীয় পংক্তিতে অপাদানকারকে 'থেকে' অনুসর্গটি অনুপস্থিত।

কহে কহ কৃপানিধি কি করিয়া মনে।
দেবদেব দরশন দিলে অকিঞ্চনে।। (শিবায়ন, পৃ. ২২২)

প্রথম পংক্তিতে 'হে' সম্বোধন পদের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। আমরা জানি কোন ব্যক্তি, প্রাণী বা বস্তুকে আহ্বান বা সম্বোধনের জন্য ব্যবহৃত পদকে সম্বোধন পদ বলে। কিন্তু এক্ষেত্রে 'কৃপানিধি' সম্বোধন করার জন্য 'হে' সম্বোধন পদের প্রয়োগ হয়নি।

প্রভু কন পাঠায়্যাছে গণেশের মা।
শুন্যা ইন্দ্র উদ্দেশ্য বন্দিলা তান পা।। (শিবায়ন, পৃ. ২২২)

এক্ষেত্রে দ্বিতীয় পংক্তিতে নিমিত্তকারক 'এর' বিভক্তির প্রয়োগ হবে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আমরা জানি নিমিত্তকারকে 'এর' বিভক্তির প্রয়োগ হয় না, অপাদানকারকে হয় কিন্তু এক্ষেত্রে নিমিত্তকারকে 'এর' বিভক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা কারক-বিভক্তির বৈচিত্র্য লক্ষ্য করি।

ধন্য উমা আমাকে করিতে পরিত্রান।
প্রাণনাথে পাঠাইলা আমি ভাগ্যবান।। (শিবায়ন, পৃ. ২২২)

দ্বিতীয় পংক্তিতে কর্মকারকে 'এ' বিভক্তি রয়েছে। কিন্তু এখানে কাব্যস্বার্থে 'এ' বিভক্তির প্রয়োগ করা হয়েছে কারণ সাধারণভাবে বলা হয় 'প্রাণনাথকে' তাই এখানে ব্যতিক্রম দেখা গেছে তাই এক্ষেত্রে 'কে' বিভক্তি হবে।

চতুর্দ্দশ ভুবন ভরণকর্তা কন।
দশাহীন দোষে দুঃখ পায় পরিজন।। (শিবায়ন, পৃ. ২২২)

অধিকরণকারকে 'এর' বিভক্তি অনুপস্থিত। আমরা জানি অধিকরণকারকে 'এর' বিভক্তি হয় না, অপাদানকারকে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা গেছে। এখানেই আমরা কারক-বিভক্তির বৈচিত্র্য লক্ষ করি।

ইন্দ্র বলে আজি হতে অর্থ দিব আমি।
কাজ নাই চাষে বাসে বস্যা থাক তুমি।। (শিবায়ন, পৃ. ২২৩)

দ্বিতীয় পংক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে 'চাষে বাসে' কিন্তু গদ্যরূপ করলে বলা হয় 'চাষ

বাস করে' তাই এক্ষেত্রে কাব্যস্বার্থে পদ্যরূপে 'চাষে বাসে' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

ভূত্যে তুমি কেন মাগ ভূমিস্বামী হয়্যা।
যত পার জোত কর কাজ নাই কয়্যা।। (শিবায়ন, পৃ. ২২৩)

প্রথম পংক্তিতে অপাদানকারকে 'র' বিভক্তি ও 'হইতে' অনুসর্গ এর অনুপস্থিতি লক্ষা করা যায়। এক্ষেত্রে 'এ' বিভক্তির প্রয়োগ করা হয়েছে।

শিব বলে শত্রু কিছু চক্র বক্র আছে।
ক্ষেতে খন্দ দেখ্যা তুমি দ্বন্দ্ব কর পাছে।। (শিবায়ন, পৃ. ২২৩)

দ্বিতীয় পংক্তিতে সম্বন্ধপদে 'র' বিভক্তির অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বিশেষ্যপদের সাথে ক্রিয়াপদের সরাসরি সম্পর্ক না থাকায় সম্বন্ধপদ হয়েছে।

হালাহাল উপরে বিরাজমান শশী।
শত্রুমুখে শুনিয়া শঙ্কর হৈল খুশী।। (শিবায়ন, পৃ. ২২৪)

দ্বিতীয় পংক্তিতে অপাদানকারকে 'থেকে' অনুসর্গ নেই বরং তার জায়গায় 'শূন্য' বিভক্তির প্রয়োগ ঘটেছে। কিন্তু এখানে কাব্যস্বার্থে 'শত্রুমুখ'-কে 'শত্রুমুখে' করা হয়েছে।

বৈসে বৃষে মহিষে বান্ধিয়া বেল গাছে।
কৃতকীর্তি কৃত্তিবাস কুমুদার কাছে।। (শিবায়ন, পৃ. ২২৪)

প্রথম পংক্তিতে কর্মকারকে 'কে' বিভক্তি অনুপস্থিত। সাধারণভাবে কর্মকারকে 'এ' বিভক্তির প্রয়োগ হয়ে থাকলেও এক্ষেত্রে 'কে' বিভক্তি হবে। কাব্যস্বার্থে এক্ষেত্রে 'এ' বিভক্তির প্রয়োগ করা হয়েছে।

পূর্বে পরামর্শ ছিল পার্বতীর সাথে,
শূল হতে শূল দেহ মূল থাউক হাতে।। (শিবায়ন, পৃ. ২২৫)

প্রথম পংক্তিতে অধিকরণকারকে 'তে' বিভক্তি অনুপস্থিত। সাধারণভাবে অধিকরণকারকে 'তে' বিভক্তির প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই কিন্তু এক্ষেত্রে 'তে' বিভক্তির প্রয়োগ হয় নি। দ্বিতীয় পদে সম্বন্ধ পদে 'র' বিভক্তির অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

বন্ধ কর্য্যা বাঘছালে জাঁত দিল তায়্যা।
পাবকে ফেলিছে প্রেত চিতাঙ্গার বয়্যা।। (শিবায়ন, পৃ. ২২৫)

প্রথম পংক্তিতে কর্মকারকে 'কে' বিভক্তি অনুপস্থিত বরং 'এ' বিভক্তির প্রয়োগ হয়েছে। কর্মকারকে 'এ' বিভক্তি প্রয়োগের রীতি থাকলেও সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে 'বাঘছালকে' কিন্তু এক্ষেত্রে 'কে' বিভক্তির প্রয়োগ হয়নি।

কিন্নরী গন্ধর্বে গান পঞ্চাননে বেড়্যা।
কৃপাময়ী কৃষ্ণের কীর্তন দিল যুড়্যা।। (শিবায়ন, পৃ. ২২৭)

প্রথম পংক্তিতে অপাদানকারকে 'এর' বিভক্তির অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

অপাদানকারককে সাধারণত ‘এর’ বিভক্তি হয় কিন্তু এক্ষেত্রে তার প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে না।

পিতামহ কত কৈল আল্য কোন কাজে।
সুবর্ণের পুরী গেল সমুদ্রের মাঝে।। (শিবায়ন, পৃ. ২৩০)

দ্বিতীয় পংক্তিতে অধিকরণ কারকে ‘তে’ বিভক্তি অনুপস্থিত। আমরা জানি অধিকরণকারকে ‘তে’ বিভক্তির প্রয়োগ হয়ে থাকে কিন্তু এক্ষেত্রে ‘শূন্য’ বিভক্তি রয়েছে।

হাসিয়া কুবের কহে শুন শুন তুমি।
যক্ষরাজে দয়া কর্‌য়া রাখ্যা আছ তুমি।। (শিবায়ন, পৃ. ২৩১)

দ্বিতীয় পংক্তিতে কর্মকারকে ‘কে’ বিভক্তির প্রয়োগ করা হয়নি। সাধারণত কর্মকারকে ‘এ’ বিভক্তির প্রয়োগ হলেও এক্ষেত্রে ‘কে’ বিভক্তি হবে। কাব্যের স্বার্থে এক্ষেত্রে ‘এ’ বিভক্তির প্রয়োগ করা হয়েছে।

গদগদ স্বরে গৌরী গঙ্গাধরে কহে।
বসনে ভিজিয়া গেল লোচনের লোহে।। (শিবায়ন, পৃ. ২৩২)

প্রথম পংক্তিতে কর্মকারকে ‘কে’ বিভক্তি অনুপস্থিত। এবং কাব্যস্বার্থে ‘এ’ বিভক্তির প্রয়োগ হয়েছে। দ্বিতীয় পংক্তিতে কর্মকারকে ‘এ’ বিভক্তির অতিরিক্ত ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে কর্মকারকে ‘শূন্য’ বিভক্তি ‘বসন ভিজিয়া গেল’ হত কিন্তু কাব্যস্বার্থে ‘বসনে ভিজিয়া গেল’ করা হয়েছে।

সম্বরিতে নারে শিবা শঙ্করের মোহ।
চঞ্চল হইল চিত্ত চক্ষে বহে লোহ।। (শিবায়ন, পৃ. ২৩৩)

দ্বিতীয় পংক্তিতে অপদান কারককে ‘হইতে’ অনুসর্গ অনুপস্থিত। অপাদানকারকে ‘হইতে’ অনুসর্গটির ব্যবহার সাধারণভাবে হয়ে থাকে কিন্তু এক্ষেত্রে এটির প্রয়োগ হয়নি। বরং ‘এ’ বিভক্তির প্রয়োগ ঘটেছে।

যদুরায় যেন যায় ছাড়িয়া গোকুল।
গোবিন্দ বিহনে যেন গোপিনী আকুল।। (শিবায়ন, পৃ. ২৩৩)

দ্বিতীয় পংক্তিতে কর্তৃকারকে ‘র’ বিভক্তি অনুপস্থিত। আমরা জানি কর্তৃকারকে সাধারণত ‘র’ এর বিভক্তি হয় না। কর্মকারক, করণকারক ও অপাদানকারককে ‘র’ বিভক্তি হয়ে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে কর্তৃকারকে ‘র’ বিভক্তি হওয়ায় আমরা কারক বিভক্তির বৈচিত্র্য দেখতে পাই।

শিববাক্য শুনিয়া সর্বাঙ্গ গেল জ্বল্যা।
ডাক্যা বলে ডাকাত্যে মাল্যেক মোকে বল্যা।। (শিবায়ন, পৃ. ২৩৪)

প্রথম পংক্তিতে সম্বন্ধপদে ‘এর’ বিভক্তি অনুপস্থিত। সাধারণভাবে বলা হয় ‘শিবের বাক্য’ কিন্তু এক্ষেত্রে কাব্যস্বার্থে ‘শিববাক্য’ করা হয়েছে।

সর্বকাল সারা দিন কর্ম্ম করি তবু।

পেট ভর‍্যা ভাত মোর দিলে নাই কভু।। (শিবায়ন, পৃ. ২৩৪)

দ্বিতীয় পংক্তিতে গদ্যরূপ করলে হয়, ‘আমাকে (মোকে) পেট ভরে ভাত দিলে না কখনো’। কিন্তু এক্ষেত্রে ওই ‘মোকে’ পদ্যরূপটি অনুপস্থিত, পরিবর্তে রয়েছে ‘মোর’। এক্ষেত্রে কারকের প্রয়োগ বৈচিত্র্যকে চিহ্নিত করছে।

অষ্টাদশ শতকে ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে বাঙ্গালী নর-নারীদের পারস্পরিক মিলন সম্প্রীতি ও ধর্ম সমন্বয়ের আকাঙ্খাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টায় আজীবন যারা ব্রতী ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম একজন রামেশ্বর ভট্টাচার্য। নতুনত্বের সুর প্রতিফলিত হয়েছে রামেশ্বর ভট্টাচার্যের ‘শিবসঙ্কীর্তন’ বা ‘শিবায়ন’ কাব্যে। মঙ্গলকাব্যের ধারা থেকে ভিন্ন পথে গিয়ে তিনি কাব্যটি রচনা করেন। মঙ্গলকাব্যগুলির বেশির ভাগেই যেখানে দেব-দেবী মানুষকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে পূজা গ্রহণ করেছেন সেখানে ‘শিবায়ন’ কাব্যে নতুনত্বের সুর প্রতিফলিত হয়েছে মানবতাবোধের ইঙ্গিতে। দারিদ্রপীড়িত, শ্রমজীবী মানুষের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি ও ভালোবাসা হল নবমানবিকতাবোধের মূলমন্ত্র। রামেশ্বর ভট্টাচার্য যে ‘ভদ্রকাব্য’ রচনা করেছেন তাতে কৃষিকাজের ও কৃষিজীবীর সম্মানবৃদ্ধি হয়েছে। পয়ার ত্রিপদী ছন্দের রচনায় স্থানে স্থানে অসাধারণ কারুকার্য দেখিয়েছেন। এছাড়া ভাষা ব্যবহার ও সুরের মধ্যে যেমন বৈচিত্র্য রয়েছে ঠিক তেমনি তার কাব্যপাঠে কাব্যমধ্যবর্তী কারক-বিভক্তির বৈচিত্র্যও আমরা দেখতে পাই। সুর মাধুর্য্যে ও শব্দের বৈচিত্র্যে ভাষা যেমন মধুর ও প্রাঞ্জল হয়েছে ঠিক তেমনি কাব্যের স্থানে স্থানে তিনি বিভক্তি ও অনুসর্গের প্রয়োগ না করেই সাবলীল ও রুচিশীল ভাষায় শিবসঙ্কীর্ত্তন কাব্য রচনা করেছেন। আমরা সাধারণভাবে পাঠ্যপুস্তকে কারক-বিভক্তির যে ব্যাকরণগত রীতির পরিচয় পেয়ে থাকি সেগুলির প্রয়োগ যেমন কাব্যমধ্যে খুঁজে পাই ঠিক তেমনিই আবার কারক-বিভক্তির বৈচিত্র্যও কাব্যমধ্যে লক্ষ করি। সম্বন্ধ পদ, সম্বোধন পদ, বিভক্তি, অনুসর্গের কিছু অনুপস্থিতি লক্ষ্য করি। আবার কারকের মধ্যে বিভক্তি অনুসর্গের প্রয়োগ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করি। কারক-বিভক্তির ব্যাকরণগত রীতির বাইরেও কিছু নতুন বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন, কর্তৃকারকে আমরা ‘র’ বিভক্তির প্রয়োগ দেখি আবার নিমিত্তকারকে ‘এর’ বিভক্তির প্রয়োগ দেখি। এইভাবে কারক- বিভক্তির নানা বৈচিত্র্য আমাদের সামনে ধরা পড়ে। কিছু ক্ষেত্রে বিভক্তি ও অনুসর্গ ছাড়াই বাক্যের শব্দের পরিবর্তন ঘটিয়ে পংক্তি তৈরি হয়েছে। সে ক্ষেত্রে যথাযথ বিভক্তি ও অনুসর্গ ব্যবহার করে কারক বিভক্তির বৈচিত্র্য তুলে ধরা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে ভাবে-ভাষায়, যুগগত আবেদনে কাব্যটি যেমন জাজ্বল্যমান হয়েছে ঠিক তেমনিই কারক- বিভক্তির বৈচিত্র্যতাও এখানে পরিস্ফুট হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. শ্রীযোগিলাল হালদার, 'রামেশ্বরের শিব-সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন', কলকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭।

২. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ', দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২।

৩. পবিত্র সরকার ও গণেশ বসু, 'মাধ্যমিক ভাষা সন্ধান', সর্বাধুনিক সংস্করণ, কলকাতা, গ্রন্থতীর্থ, ২০১০।

৪. অলক দত্ত, 'আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি', পুনর্মুদ্রন, কলকাতা, নবোদয় পাবলিকেশনস্, ২০০৯।

মনোজ বসুর ছোটগল্পে যুগ ও জীবনের অসঙ্গতি

সৌমেন মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁকুড়া

সারসংক্ষেপ: জীবনে সঙ্গতির জন্য প্রয়োজন যথার্থ মিলন বা সমন্বয়। অর্থাৎ, জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য যা কিছু অনুকূল সেই সবের সঙ্গে যখন সমন্বয় ঘটে তখনই জীবন সঙ্গতি পায়। যখন তা ঘটে না কিংবা তার উল্টোটা ঘটে তখন দেখা দেয় অসঙ্গতি। মনোজ বসু শুভবোধসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। জীবন সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রবলভাবে ইতিবাচক। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাঁর মধ্যে তৈরি হয়েছিল সঙ্গতি ও অসঙ্গতির নিজস্ব বোধ। ফলে যা কিছুকে তাঁর সুস্থ ও স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে তাকেই তিনি সুন্দর বলে মনেপ্রাণে ভালোবেসেছেন। আবার সেই সুন্দর যখন নানা অসঙ্গতিতে বিনষ্টির সম্মুখীন হয়েছে তখন তাঁর চৈতন্য বেদনাবোধ করেছে। বেদনার নানা রঙ দিয়ে তিনি সেই সব অসঙ্গতিগুলিকে গল্পের পটে চিত্রিত করেছেন। যন্ত্র-মোহ তথা যন্ত্রের প্রতি মানুষের অতিরিক্ত নির্ভরতা, অসঙ্গত বাতুলতা, মানুষ চেনার প্রচলিত মনোভাবের দুর্বলতা, বিকৃত রুচিবোধ, সাম্প্রদায়িক সমঝোতার অভাব, অর্থলিপ্সা, মনোবিকার, ধার্মিকের লাম্পট্য, সন্ন্যাসীর চোরাকারবার, সারশূন্য সংস্কৃতিপ্রেম, অন্ধ সন্দেহপ্রবণতা প্রভৃতি যুগ ও জীবনের নানা ত্রুটি তাঁর এই শ্রেণির গল্পগুলিতে উঠে এসেছে।
সূচক শব্দ: রুচিবোধ, অর্থলিপ্সা, মনোবিকার, লাম্পট্য, চোরাকারবার, সন্দেহ প্রবণতা।

মূল আলোচনা:

মনোজ বসু (১৯০১-১৯৮৭) যে সময়ে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন সেই তিনের দশকের যুগ-পরিবেশ ছিল দ্বিধাবিভক্ত। একদিকে ব্রিটিশ শোষণ ও যুদ্ধোত্তর বিপর্যয় জনিত অবক্ষয়, অন্যদিকে জাতীয় আন্দোলন, অভিনব সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং নব নব আদর্শের জন্ম – "জীবনে অবক্ষয় ও অন্তরে উত্থানের আন্তরিক প্রেরণা এই হল আমাদের এই সময়কার জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য।"[১] তাই এ সময়ের কথাসাহিত্যিকদের সৃষ্টিচৈতন্যও একই যুগপরিবেশে অবস্থান করে দু'ভাবে প্রভাবিত হয়েছে। কেউ যুগের অবক্ষয়কে তুলে ধরেছেন, কেউ বা অবক্ষয়ের উজানে একটি সংগঠনের আদর্শ সৃষ্টি করেছেন। মনোজ বসু এই দ্বিতীয় গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে অগ্রগণ্য। সমকালের প্রতিচ্ছায়ার মধ্যেও জীবনের জাগরণ, সংগঠন ও সুন্দরের স্বপ্নকে নিজের লেখায় সঞ্চারিত করতে তিনি গ্রামবাংলার দেশজভূমির চিরন্তন জীবনস্রোতের সহজ মাধুর্যকে গ্রহণ করেছেন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'বাঘ' গল্পের মাধ্যমে

বাংলা সাহিত্যে তিনি যে পরিচিতি লাভ করেন পরবর্তী অর্ধশতাব্দীকাল সাহিত্যচর্চায় তা আরও প্রসারিত হয়। যে সব বিষয় নিয়ে তিনি গল্প লিখেছেন তার মধ্যে যুগ ও জীবনের নানা অসঙ্গতি অন্যতম। এই অসঙ্গতি অবলম্বনে মনোজ বসু যে গল্পগুলি লিখেছেন সেগুলি আলোচনা করে বর্তমান প্রবন্ধে জীবন সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব সঙ্গতিবোধের ওপর আলোকপাত করব।

যন্ত্রসভ্যতা মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অনেক দাবি মেটাতে পারে। কিন্তু সবকিছুর মতো যন্ত্রেরও সীমাবদ্ধতা আছে। যে দাবি মানুষের অন্তরের সঙ্গে একান্ত ভাবে জড়িত যন্ত্রসভ্যতা তাকে পরিপূর্ণভাবে মেটাতে পারে না। কেননা যন্ত্র কৃত্রিম। তার নিজস্বতা কিছু নেই। তবু নতুন যন্ত্রের আশ্চর্য ক্রিয়াকৌশল মানুষকে সম্মোহিত করে। কিন্তু সেই মোহিনী শক্তি মানুষের অফুরন্ত প্রাণের প্রত্যাশার সঙ্গে পাল্লা দিতে যখন ব্যর্থ হয় তখন সেই মোহ কাটিয়ে এই সত্যই প্রকাশিত হয় যে যন্ত্র মানুষের সহায়ক হলেও বিকল্প নয়। এই ভাবনাকে লেখক 'বাঘ' গল্পে প্রকাশ করেছেন। আলোচ্য গল্পে হরসিত পরামানিক কলের গান শুনিয়ে অনেক অর্থ রোজগার করলেও সমঝদার শ্রোতার প্রাণের দাবি মেটাতে পারেনি। বনকাপাসি গ্রামে দিনেদুপুরে ব্যঘ্রগর্জনের বিরল ঘটনায় গ্রামবাসী ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলে দেখা যায় 'বাঘ নয়, দুজন মানুষ' এগিয়ে আসছে। বুঝতে অসুবিধা হয় না তাদের চোঙা-নিঃসৃত আওয়াজই এই বিভ্রান্তির কারণ। সমাজপতির কাছে অগ্রিম বায়না নিয়ে হরসিত পরামানিক তার ওই 'কল' দিয়ে এক টাকায় ন'টি গান শোনাতে রাজি হয়। কল থেকে কনসার্ট-বাদ্য ও অবিকল মানুষের গলা বেরিয়ে এলে বাক্সের মধ্যে গায়ক ও বাদকদের অবস্থান কল্পনায় শ্রোতাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। যন্ত্রমোহিত অশ্বিনী শীল তাই বলে ওঠে, – "কি কল বানায়েছে সাহেব কোম্পানি! দেবতা– দেবতা– বেহ্মা-বিষ্টুর চেয়ে ওরা কম কিসে? বাঁড়ুজ্জে মশায়, আপনার সেতারের টুং-টাং আর রামপ্রসাদীগুলো এবার ছাড়ুন।"[২] কিন্তু, যন্ত্রযুগ চমক সৃষ্টি করলেও প্রাণের তৃষ্ণা মেটাতে পারে না। তাই সংগীত-অন্তপ্রাণ বাঁড়ুজ্জে মশায় যখন একটি পূরবী শুনতে চায় তখন হরসিত সোজা বলে, – "হুকুম-টুকুম চলবে না মশাই, যা বাজাই শুনে যান– আমার সাহেব-বাড়ির কল–"[৩]। দিনের শেষে কলের মধ্যে গোলযোগ ঘটলে অবশিষ্ট গানগুলি না শুনিয়েই বায়নার টাকা নিয়ে হরসিত সকালবেলা পিতলের ঘটি চুরি করে গ্রামবাসীকে ফাঁকি দিয়ে চলে যায়। যন্ত্রযুগ চমকপ্রদ, কিন্তু হৃদয়হীন, তাই তা প্রাণের দাবি মিটিয়ে শেষরক্ষা করতে পারে না। হরসিতের ঘটি চুরি করে চলে যাওয়ার ঘটনার উল্লেখ আসলে যন্ত্রসভ্যতার প্রতি লেখকসত্তার বিরূপ মনোভাবেরই ইঙ্গিত।

ধারাবাহিকভাবে অসঙ্গত আচরণ করা পাগলের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু সুস্থ মানুষ কখনো কখনো এমন পাগলামি করে যা কোনো পাগলের মধ্যেও দেখা যায় না। অথচ এর ধারাবাহিকতা না থাকায় মানুষগুলোকে ঠিক পাগলও বলা যায় না। 'বাতুলাশ্রম' গল্পে তেমনই এক অসঙ্গত বাতুলতার কথা বলা হয়েছে। এই গল্পে সুদর্শন

পাগলের ডাক্তার হওয়া সত্ত্বেও নিজের পাগলামি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অসচেতন। মনোচিকিৎসক সুদর্শন বাতুলাশ্রমের অন্তরালবর্তী এক জায়গায় 'বেঢপ-মোটা কুৎসিত-দর্শন একটি মেয়ের হাত জড়িয়ে' ধরে প্রেম নিবেদন করেন ও তার হাতে নিগৃহীত হন। এই দৃশ্য দেখে রাসু নামের এক পাগল ভদ্রলোকের মতো বলে ওঠে, – "পাগলের পাগলামি দেখুন মশায়।"[৪] 'পাগলে'র কাছেও যা পাগলামি বলে মনে হয়, 'পাগলের ডাক্তার' সুদর্শনের কাছে তা স্বভাবসম্মত। তাই একটু পরে পূর্ব-প্রণয়ের কথা ভুলে তিনি যখন স্ত্রীর সাথে গভীর প্রেমালাপে পথ হাঁটেন, তখন মনে হয় পৃথিবীতে তাদের মতো সুখী দম্পতি আর দ্বিতীয় নেই। সুদর্শন-ডাক্তারের এই দ্বিচারী প্রেমাচার আপাত সুস্থ ব্যক্তির বিকৃত ভাবনার একটি রূপ।

ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে তার অর্থনৈতিক স্তরের ভূমিকা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও ঘটে। বহু মানুষ আছেন যাঁরা নিজেদের মনঃপ্রকৃতিকে নিজস্ব অর্থনৈতিক স্তরের তুলনায় অনেক উঁচুতে উন্নীত করতে পারেন। বিপরীতে এমন মানুষও থাকেন যাঁদের চেতনা উন্নত আর্থিক পরিবেশ পেয়েও উপযুক্ত ভাবে বিকশিত হতে না পেরে অবনমিত হয়। তাই মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থান তার ব্যক্তিত্বের নিশ্চিত মানদন্ড নয়। এই বিষয়টি 'উপহার' গল্পে দেখানো হয়েছে। গল্পের কথক কালীতারা ও ইন্দিরাকে সমাজ-প্রচলিত দৃষ্টিতে দেখতে গিয়ে ভুল করেছেন। গল্পকথক ডুয়ার্সের এক সাহিত্যসভায় আমন্ত্রণ পেয়ে সেখানকার চা-বাগানের ম্যানেজারের বাড়িতে আতিথ্য নেন। সেখানে ম্যানেজারের মেয়ে ইন্দিরা ও কাজের মেয়ে কালীতারার সাথে পরিচয় হয় তাঁর। বিদায়বেলা অভ্যস্ত সামাজিকতায় ঝি কালীতারাকে বকশিশ হিসেবে কিছু অর্থ এবং অভিজাত-কন্যা ইন্দিরাকে সভায়-পাওয়া ফুলের মালা উপহার দেন। কিন্তু নিজস্ব রুচি ও বিচারের বৈপরীত্যে এরা কেউই খুশি হতে পারেনি। কালীতারা ঝি হলেও কবিতা লেখে, অর্থের তুলনায় ফুলের মূল্য তার কাছে অনেক বেশি। অন্যদিকে ইন্দিরার এই সুকুমার অনুভূতি নেই, তাই ফুলের মালাকে সে জঞ্জাল ভেবে নর্দমায় ফেলে দেয়। দুই নারীর এই আশাতীত ভিন্ন প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে লেখক বলতে চেয়েছেন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নির্ণয়ে তার অর্থনৈতিক স্তরকে মাপকাঠি করা সম্পূর্ণ অসঙ্গত।

পরোপকার মানবতার ধর্ম। কিন্তু কেউ যদি অন্যের দ্বারা উপকৃত হয়ে পাল্টা তার অপকার করে তবে তার মতো নিকৃষ্ট কাজ বিরল। কথায় বলে ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। তাই যে ব্যক্তি উপকারীর অপকার করে, অনুরূপ ফল পেতে তারও দেরি হয় না। কার্যকারণ সম্পর্কের এই রসায়নকে 'উপকার বিফলে যায় না' গল্পে দেখানো হয়েছে। গল্পে নাগেশ ঊর্মির উপকার করলেও পরে তারই দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঊর্মি তার মেজোবৌদির ভালোমানুষির সুযোগ নিয়ে বহুমূল্য গয়না হাতিয়ে নেয়। তারপর নাগেশের প্রেমের সুযোগ নিয়ে গয়না হারিয়ে বিপদে পড়ার মিথ্যে বাহানায় তার কাছে অনেক টাকা ঋণ নিয়ে বেপাত্তা হয়। উদ্দেশ্য, গয়না ও টাকা দিয়ে হিরণ্ময়কে বিদেশে পড়তে পাঠিয়ে উঁচু পদের চাকরিতে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা এবং তার

সাথে সুখে সংসার করা। কিন্তু অলংকার ও অর্থ নিয়ে হিরণ্ময়ও নিখোঁজ হয়। ঊর্মির কাছে টাকা ফেরৎ না পাওয়ায় অফিসে হিসেবের গরমিলে নাগেশের চাকরি যায়। দশ বছর পরে রিসেপশনিস্ট পোস্টের প্রাথমিক পরীক্ষায় নাগেশ ঊর্মিকে বাতিল করে খানিকটা প্রতিশোধ চরিতার্থ করতে পারত, কিন্তু সে তা না করে তাকে নির্বাচন করে আবারও উপকার করে। উচ্চপদস্থ হিরণ্ময় ঊর্মিকে চাকরি দিয়ে কিছুটা কৃতজ্ঞতা দেখালেও বিয়ের প্রস্তাব তোলে না। এইভাবে দেখা যায় নাগেশ ঊর্মির উপকার করেছে, কিন্তু ঊর্মি হিরণ্ময়কে উপকার করতে গিয়ে নাগেশের অপকার করেছে। তবে লক্ষণীয় নাগেশ ঊর্মির উপকার করেছে প্রেমের খাতিরে, বিপরীতে হিরন্ময়ের প্রতি ঊর্মির উপকারের পিছনে রয়েছে প্রবল স্বার্থ। তাই হিরণ্ময়ের কাছে তার প্রতারিত হওয়া নাগেশের প্রতি তার প্রতারণারই যেন সমুচিত ফল। এই ফলাফল গল্পনাম হিসেবে ব্যবহৃত আপ্তবাক্যটির শ্লেষকে স্পষ্ট করেছে।

আদিম যুগে পশুদের মতো মানুষেরও পোশাক ছিল না। ধীরে ধীরে মানুষের বুদ্ধির বিকাশ হয়, সেই সঙ্গে গড়ে ওঠে রুচিবোধ। তখন থেকে বস্ত্র পরিধানের রীতি প্রচলিত হয়। বর্তমানে মানুষ নিজেকে সভ্য বলে গর্ব করে। কিন্তু এই সভ্যতার যুগে কেউ কেউ ফ্যাশনের নামে এমন স্বল্প কাপড়ের বস্ত্র পরে যে তা দিয়ে দেহের আব্রু রক্ষিত হয় না। রুচিবোধের এই অবনতিকে পাশবিক লজ্জার বিপরীতে দাঁড় করিয়ে লেখক ‘চিড়িয়াখানা’ গল্পে মানুষকে নাড়া দিয়েছেন। এই গল্পে মানুষের অসুস্থ রুচিবোধ দেখে বেবুনরা লজ্জিত হয়েছে। চিড়িয়াখানায় ‘কুকুরে বাঁদরে মিশাল’ বেবুনের চেহারার কদর্যতা দেখে গল্পকথক যখন শিহরিত তখন খাঁচার বাইরে মা-মেয়ে সম্পর্কিত ‘দুটি প্রাণী’ এসে উপস্থিত হয়। নারীত্বের ছলাকলায় ও প্রসাধনের জৌলুসে তারা প্রতিস্পর্ধী ‘সমবয়সি সখী’ হয়ে বেবুনের খাঁচার সামনে এসে দাঁড়ায়। তাদের সাজসজ্জা দর্শকদের নজর কাড়ে। ভিড় থেকে বেবুনদের সম্পর্কে কথা ভেসে আসে, – “পশুর লজ্জা থাকতে নেই, কিন্তু যারা দেখে তাদের তো লজ্জা। সাহস করে কেউ কাপড় জড়িয়ে দিতে পারে না।”[৫] কিন্তু পরক্ষণেই গল্পকথক অবাক হন, যখন দেখেন কুৎসিত-দর্শন বেবুনরাও পিছন ফিরে চোখের উপর হাত তুলেছে। কথকের মনে হয় স্বল্পবস্ত্রা মা-মেয়েকে দেখেই বেবুনদের এই প্রতিক্রিয়া। তিনি ভাবেন “বোধ হয় ভিড়ের মানুষ নয়—বেবুনদের কথাবার্তা এতক্ষণ শুনতে পাচ্ছিলাম।”[৬] ফ্যাশনের নামে মানুষের বস্ত্রহ্রস্বতার লজ্জাহীন রুচির প্রতি এই শাণিত ইঙ্গিত সংস্কৃতির যুগলব্ধ অবক্ষয়কে তুলে ধরে।

প্রাপ্য বখরা পেলে সকলেই সন্তুষ্ট হয়। চোর-ডাকাতও বাদ যায় না। অথচ সাধারণ মানুষের মধ্যে নাগরিক সুযোগ-সুবিধার সব সময় সম বন্টন হয় না। এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে ঠকিয়ে তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে। সাধারণ মানুষের সমঝোতার এই অভাব মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধায়। লেখক ‘বখরা’ গল্পের মধ্য দিয়ে এই সাম্প্রদায়িক অসঙ্গতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই গল্পে অপরাধ-জগতের দুই ব্যক্তি লালমামুদ ও পরশুরামের পারস্পরিক সততাপূর্ণ সমঝোতার

বিপরীতে সাধারণ মানুষের সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের অসঙ্গতি ধরা পড়েছে। পকেটমার লালমামুদ ও চোরাকারবারি পরশুরাম পরস্পরকে শুধু নিজেদের সত্য পরিচয়ই দেয় না, সেইসঙ্গে তারা অনৈতিক অর্থকে নৈতিকভাবে ভাগ-বাটোয়ারাও করে। দুনিয়াকে ঠকালেও 'চোর-ডাকাত জালিয়াত-জুয়াচোর নিজেদের ভিতরে বড় সাচ্চা'। উপযুক্ত বখরা পেয়ে সন্তুষ্ট লালমামুদ হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার খবর শুনে বিচলিত হয়। সে এই হানাহানির কারণ জানতে চাইলে পরশুরাম ঘৃণাভরে বলে, – "বখরা মেরে দেয় বলে— আবার কি!"[৭] ন্যায্য পাওনা-গন্ডা'র যে সামঞ্জস্যবোধ অপরাধ-জগতেও দেখা যায় সম্প্রদায়গত ক্ষেত্রে তার একান্তই অভাব। এই সমঝোতার অভাব থেকে প্রাপ্য 'বখরা'র অনুচিত বণ্টনে জাতীয় জীবনে নেমে আসে রক্তক্ষয়ী অপচয়।

পূর্বপুরুষরা বংশধরদের সুখ-সমৃদ্ধির আশায় জীবনসঞ্চিত ধনসম্পত্তি রেখে যায়। কিন্তু উত্তরপ্রজন্ম সব ক্ষেত্রে তার পূর্বপুরুষদের মতো কর্মতৎপর ও পরিশ্রমী হয় না। অলস ও অকর্মণ্য হয়ে বিলাসব্যসনে তারা জীবন কাটাতে চায়। ফলে পূর্বপুরুষের কষ্টার্জিত সম্পত্তি যোগ্য দাম না পেয়ে অপচয়ের সম্মুখীন হয়। পরিশ্রমী মানুষদের কাছে এ ঘটনা খুবই দুঃখজনক। 'পারলৌকিক' গল্পে প্রাণকৃষ্ণ ও নিতাই সামন্ত নামে পরলোকগত দুই পিতার মধ্যে এই দুঃখের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাণকৃষ্ণ পরলোক থেকে নিজের পুত্র ও পুত্রবধূদের অমিতব্যয়ী বিলাসিতা দেখে বিলাপ করেছেন। ইহলোকে তিনি ঘোর বৈষয়িক ছিলেন, – "জীবনে কোনদিন ভালো খাইনি, ভালো পরিনি। ন্যায়-অন্যায় ধর্মাধর্ম বিসর্জন দিয়ে টাকা জমিয়ে গেছি, বিষয়সম্পত্তি বাড়িয়েছি।"[৮] অথচ দেহত্যাগের পর তাঁর কষ্টার্জিত অর্থ পেয়ে পুত্র ও পুত্রবধূরা অমিতব্যয়ী হয়ে ওঠে। এই দৃশ্য দেখে পরলোক থেকে প্রাণকৃষ্ণ ও তাঁর স্ত্রী অনুতাপ করেন। একইরকম ভাবে, নিতাই সামন্তের পুত্ররাও পিতার মৃত্যুর পর পৈতৃক সম্পত্তির অপচয় শুরু করেছিল। সেই বিষয় একদা প্রাণকৃষ্ণ ফাঁকি দিয়ে দখল করেছিলেন। তাই পরলোকবাসী নিতাই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান, –

> "সম্পত্তি রেখে এসে ভুল করেছিলাম, সেই ভুলের সংশোধন হয়ে গেছে। তাকিয়ে এখান থেকে ছেলেপুলের ভিখারিবৃত্তি দেখি। অনেকখানি তৃপ্তি। আমরা বেঁচে নেই-বেটারা দিব্যি তো বেঁচেবর্তে রইল। তার উপরে স্ফূর্তি করে বাঁচছে—মনোকষ্ট এতে ডবল হয় কিনা বলুন।"[৯]

অলস ও অকর্মণ্য হয়ে পৈতৃক সম্পত্তির অপচয়ের চেয়ে ভিক্ষা করে জীবন কাটানো যে বেশি সঙ্গত এই মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে এখানে।

কর্মসিদ্ধির জন্য উৎকোচ দেওয়া বা নেওয়া উভয়ই অনৈতিক। এতে যোগ্য মানুষ নিজের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়। অথচ উৎকোচের এই অপসংস্কৃতি বর্তমানে এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে মানুষ ভাবতেই পারে না তদ্বির ছাড়া কোনো কাজ হবে। তবু এখনো এমন মানুষ আছেন যারা শুভ বোধে আস্থা রাখেন। 'তদ্বির' গল্পে এই

শুভবোধসম্পন্ন মানুষের জয় দেখানো হয়েছে। এই গল্পে কার্তিক ও ফটিকের উৎকোচ প্রবৃত্তি সফল হয়নি। ঠিকেদারি পাওয়ার বাসনায় দুর্নীতিবাজ কার্তিক ফটিক নায়েবের কাছে ঘুষ দিতে গেলে ফটিক তাঁর কাছে মোটা অঙ্কের অর্থ আদায় করেন। সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে ফটিক অন্য এক ঠিকেদারি-প্রার্থী নবাগত রাখহরির কাছে গিয়ে তদ্বির চাইতে যান। কিন্তু এবার ফল ভিন্ন হয়, রাখহরি তাঁকে চপেটাঘাত করে বিদায় করেন। অপমানের প্রতিশোধ নিতে নায়েব ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে ন্যায়পরায়ণ রাখহরির বদনাম করলে শাপে বর হয়। ঠিকেদারির টেন্ডার পেয়ে খুশি রাখহরি প্রচুর অর্থ বকশিশ দিয়ে হতবাক ফটিকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, – "যত গালিগালাজ করেন, উপরওয়ালা ততই ভাবে অতিশয় সাচ্চা ফার্ম—আমলার সঙ্গে যোগসাজস নেই, ঠিক মতো কাজকর্ম হবে। আপনার সুপারিশ থাকলে বড়বাবু বিগড়ে যেত।"[১০] উৎকোচ বৃত্তির নীতিগত অসঙ্গতিকে কেন্দ্র করে মধ্যস্বত্বভোগীদের অপসংস্কৃতির উচিৎ ব্যর্থতায় গল্পরস জমেছে।

অর্থ যেমন পরমার্থ, তেমনি অর্থই আবার অনর্থের মূল। অতিরিক্ত অর্থলোভের কারণে মানুষ মানবিকতা হারাচ্ছে। পারিবারিক সম্পর্কের মূল্যবোধেও থাবা বসাচ্ছে এই সর্বগ্রাসী লোভ। অর্থলোভকে চরিতার্থ করতে সম্পর্কের মূল্য ভুলে কীভাবে একে অপরকে টেক্কা দেওয়া যায় সেই চিন্তায় মানুষ সর্বদা মশগুল। মানুষের এই কুৎসিত অর্থগৃধ্নু চেহারাকে লেখক 'চাবি' গল্পে দেখিয়েছেন। এই গল্পে করুণাকিঙ্করকে কেন্দ্র করে তাঁর পরিবার ও পরিজনদের মধ্যে সর্পিল লুব্ধতার প্রকাশ ঘটেছে। নিঃসন্তান করুণাকিঙ্কর জীবনব্যাপী অজস্র মানুষকে ফাঁকি দিয়ে প্রচুর সম্পত্তি উপার্জন করেছেন। তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হলে 'মুখে মধু মনে বিষ' নিয়ে ভাইপো, ভাইঝি, স্ত্রী ও দিদি সিন্দুকের চাবির লোভে শকুনের মতো তাঁর মৃত্যুর অপেক্ষা করে। কিন্তু করুণাকিঙ্করের মৃত্যুর পরে উইল অনুসারে তাঁর সিন্দুক পায় ভাগ্নে সমর। উইলে লেখা ছিল, – "যত লোক দেখলাম, সবাই মিথ্যাচারী স্বার্থপর।...একমাত্র সত্যনিষ্ঠ আমার ভাগিনেয় শ্রীমান সমর চৌধুরি। সত্যের জন্য নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে সে দ্বিধা করেনি।"[১১] কিন্তু ধুরন্ধর করুণাকিঙ্কর জানতেন না সমর আরও বড় ফাঁকিবাজ। একদিন সে মামার অনৈতিক কাজ কর্তৃপক্ষের কাছে ফাঁস করেছিল সত্যের পথিক বলে নয়, এর পিছনে ছিল অর্থলাভের উদ্দেশ্যে কন্ট্রাক্টর বীরেনের সঙ্গে চক্রান্ত। আবার সমরকে ফাঁকি দিয়েছে বীরেন। সমর তাই তাকে বলেছে, – "আধাআধি দেবার কথা, ঠেকালেন শেষ পর্যন্ত হাজার আড়াই কি তিন। অনেস্টি ছাড়া ব্যবসা হয় না।"[১২] দুটি প্রবাদের কাঠামোয় আমরা এই গল্পের চরিত্রবিন্যাসকে ধরতে পারি, – ১. ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় (করুণাকিঙ্কর ও তাঁর পরিবার) এবং ২. চোরের উপর বাটপাড়ি (করুণাকিঙ্কর < সমর < বীরেন)। মূল্যবোধের অবক্ষয়ে এই অর্থগৃধ্নুরা প্রত্যেকে পরস্পরকে টেক্কা দিয়েছে।

ঘর-গৃহস্থালী সাজসজ্জা একটি আর্ট বা কলা। ঘরকে আবর্জনা-মুক্ত করে গৃহসজ্জার উপকরণগুলিকে উপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশ করার জন্য চাই যথাযথ সৌন্দর্যবোধ। এই বোধ সবার সমান থাকে না। কারো প্রয়োজনের তুলনায় কম থাকে, কারো বা মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। কথায় বলে অতিরিক্ত কোনো কিছুই ভালো নয়। সৌন্দর্য-সচেতনতার ক্ষেত্রেও মাত্রাছাড়া ভাব মনের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে কমিয়ে মনোরোগের জন্ম দেয়। 'ঘরণী' গল্পে পুষ্পিতার মধ্যে এই রোগের বস্তুনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়। ঘর সম্পর্কে অতিসচেতনতার জন্য সে মনোরোগের শিকার হয়েছে। ঘর ঘরণীর সবথেকে বড় অহঙ্কার। অন্তত পুষ্পিতাকে দেখে তেমনই মনে হয়। তাই নিজের ঘরের দারিদ্র্যকে গোপন করতে তার চেষ্টার অন্ত নেই। অভাব ঢাকতে মাঝে মাঝে তাকে ছলনারও আশ্রয় নিতে হয়। এরই মধ্যে ঘরের দারিদ্র্য একদিন সত্যি সত্যি ঘোচে। কিন্তু ঘর সম্পর্কে অতিসচেতনতার জেরে এবার তার মধ্যে দেখা দেয় নতুন এক উপসর্গ। সাধারণে যা দেখে না 'অদৃশ্য চোখ' দিয়ে সে তাও দেখতে পায়। তার নিজের হাতে সাজানো গৃহস্থালি একটু এদিক-ওদিক হলেই সে চরম ব্যস্ত হয়ে পড়ে। স্ত্রীর এই বাতিক সম্পর্কে বিষণ্ণ সমীরণ বলে, –

> "একদিন সোয়াস্তি ছিল না ঘরের গরিবানা চাউর হয়ে পড়ে পাছে। এখনকার অস্বস্তি, যেমনটি যেখানে তেমনি সব ছিমছাম থাকে যাতে। ঘরবাড়ি আসবাবপত্তোর আদবকায়দার মধ্যে ওর প্রাণ—রূপকথার রাক্ষসীদের যেমন ভোমরার মধ্যে প্রাণ থাকত।"[১৩]

গৃহসজ্জা সম্পর্কে পুষ্পিতার এই মাত্রাছাড়া সতর্কতা চিকিৎসাবিজ্ঞানের নিরিখে অবশ্যই একটি মনোরোগ।

কল্পতরু এক পৌরাণিক বৃক্ষ। কথিত আছে ইন্দ্রলোকে অবস্থিত এই বৃক্ষ সমস্ত কামনা পূরণ করতে সক্ষম। আমাদের আশেপাশে কিছু মানুষ আছেন যাঁরা নিজেদেরকে কল্পতরুর মতো দানশীল বলে প্রচার করতে চান। অথচ অর্থলোভে নিজেরা আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকেন। এঁরা মানুষের ধর্মভক্তির সুযোগ নিয়ে তাদের কাছ থেকে অর্থ-সম্পত্তি আত্মসাৎ করতে চান। 'কল্পতরু' গল্পে এমনই এক ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীর ভণ্ডামিকে লেখক তুলে ধরেছেন। এই গল্পে বাসু মল্লিক ধর্মের নামে চোরাকারবার ফেঁদেছে। ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করতে সে 'শ্রীমান বাসবানন্দ স্বামী' নাম নিয়ে কল্পতরু রূপে বিভিন্ন স্থানে পরিব্রাজন করেন। ভক্তকুল ভব-বন্ধন মোচনের উপদেশ পেয়ে অজস্র বহুমূল্য প্রণামী দিলে সন্ন্যাসীর চেলা বেচু তা জমা করে। সন্ন্যাসী জনসমক্ষে বেচুকে বলেন, – "ঐশ্বর্যের ছায়া মাত্র দেখলে মন আমার কুঁকড়ে আসে।...কথা দাও তবে, যত-কিছু জমা হয় কল্পতরুর সময়টা সমস্ত হাতের কাছে ধরে দেবে তুমি।"[১৪] বহু মানুষ সন্ন্যাসীর কল্পতরুর সেই বিশেষ আধ্যাত্মিক মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করলেও কেউ তার নাগাল পায় না, কারণ কল্পতরু হওয়ার নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। একদিন রাতুল নামে এক ব্যক্তির পরামর্শে কন্যাদায়গ্রস্ত বনমালী রাত্রিবেলা অনুরোধপূর্বক সন্ন্যাসীর হাত

ধরতে উদ্যত হলে সন্ন্যাসী বিপন্ন বোধ করেন। তিনি তৎক্ষণাৎ কল্পতরু হয়ে ভক্তের মনোবাঞ্ছা (অর্থ ও আংটি) পূরণ করতে বাধ্য হন। কিন্তু ভক্তবিদায়ের পর যা ঘটে তাতে সন্ন্যাসীর প্রকৃত পরিচয় পেতে আর অসুবিধা হয় না, –

> "মহারাজ বললেন, পা ধরলে ক্ষতি ছিল না। হাত ধরবার বায়নাক্কা মাথায় কে ঢুকিয়ে দিল রে! ইন্দ্রত্ব চাইলেও তো না দিয়ে উপায় ছিল না। দুয়োর এঁটে দাও বেচু, আবার এসে কেউ না জ্বালায়। বেচারাম দরজায় খিল দিল, হুড়কো তুলে দিল। মহারাজের হাতে বিলাতি কারণবারি—এক বোতল হুইস্কি। পশমি অঙ্গবাসের নিচে ঢাকা। গুরু আর প্রধান শিষ্য অতঃপর ধ্যানঘরে প্রবেশ করলেন।"[১৫]

ভন্ডের ভন্ডামিকে লেখক এইভাবে শ্লেষবিদ্ধ করে প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছেন।

সকলে নিজের ইন্দ্রিয় দমন করতে পারেন না। অতিরিক্ত কামভাবনাসম্পন্ন এই মানুষরা স্ত্রী থাকতেও অন্য নারীতে আসক্ত হন। পাপাচারে লিপ্ত থাকার কথা প্রকাশ্যে এলে সম্মানহানি হবে এই আশঙ্কায় তাঁরা ধার্মিক সাজেন। পাপকে চাপা দিতে পুনরায় পাপ করতেও তাঁদের বিবেকে বাধে না। ভিতরে পূর্ণ লাম্পট্য ও বাইরে আপাদমস্তক পুণ্যবান সাজার এই ভন্ড মনোবৃত্তিকে 'পুণ্যের সংসার' গল্পে দেখানো হয়েছে। এই গল্পে হরিমোহন পুণ্যের আড়ালে সাংসারিক পাপাচারে লিপ্ত হয়েছেন। সাত সন্তানের পিতা হরিমোহন স্ত্রী পূরবীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সকালসন্ধ্যা ধর্ম-কর্ম করলেও অন্তরে লালন করেন লাম্পট্য। কাজের মেয়ে নিশার বৈধব্যের সুযোগ নিয়ে তার গর্ভে অযাচিত শিশুর জন্ম দিয়ে সংসারের পুণ্যহানির আশঙ্কায় নিশাকে তাড়িয়ে দিতে বলেন। পাপ চাপা দিতে নিশাকে তিনি অর্থ দিলে নিশা তা প্রত্যাখ্যান করে চিঠি লেখে। এই চিঠি ঘটনাচক্রে পূরবীর হাতে পৌঁছলে পূরবী হরিমোহনের দুষ্কর্ম জানতে পেরে সংসারে হুলস্থুল ঘটানোর উপক্রম করলে আত্মীয় সুপ্রসন্ন সমস্ত বদনাম মাথা পেতে নেন। তাঁর কৈফিয়ৎ, – "ওঁদের পুণ্যের সংসারে অশান্তি আসবে, সে তো হতে পারে না।"[১৬] সুপ্রসন্নর সঙ্গে তুলনা করলে হরিমোহনকে অনেক নিম্নমানের মানুষ বলে মনে হয়। গল্পের নামকরণ ব্যঙ্গাত্মক।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বলেছেন "মানুষ আপন টাকা পর, যত পারিস মানুষ ধর"[১৭]। কিন্তু অর্থলোভীদের কাছে বিষয়টি ঠিক উল্টো। তাদের কাছে মানুষের থেকে টাকা আপন। টাকার জন্য তারা রক্তের সম্পর্ককেও মূল্য দেয় না। তাদের কাছে টাকাই পরমার্থ। তাদের অর্থলোভ প্রিয়জনদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। অর্থলিপ্সার এই ভয়ঙ্কর দিক 'যুগল আত্মহত্যা' গল্পে উঠে এসেছে। এই গল্পে অর্থলোভী পরিবারের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়ে নিরুপম ও কুশলচন্দ্র নামে দুই প্রৌঢ় আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। নিরুপম ও কুশলচন্দ্রের দাম্পত্যজীবন যৌবনে মধুর থাকলেও প্রৌঢ় অবস্থায় অর্থাভাবে তিক্ত হয়ে ওঠে। দুই বন্ধু পরিবারের লোভ থেকে বাঁচতে নিজেদের সঞ্চিত অর্থ গোপন স্থানে রেখে এলেও শেষরক্ষা হয় না। নিরুপম তাঁর স্ত্রী ও পুত্রের

হাতে এবং কুশলচন্দ্র তাঁর স্ত্রী ও শ্যালকদের দ্বারা চরমভাবে নিগৃহীত হন এবং এই লাঞ্ছনা সহ্য করতে না পেরে উভয়ে একত্র আত্মহত্যা করেন। স্বামী-স্ত্রীর হার্দিক সম্পর্ক, শ্যালক-সম্বন্ধীর আত্মীয়তা ও পিতা-পুত্রের রক্তের টান অর্থের কাছে মূল্যহীন হয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথ বাঙালি সংস্কৃতির একটি মুখ। তাঁর বই কিনে বাঙালি আত্মতৃপ্তি বোধ করে। বই কেনে অনেকে, কিন্তু সবাই পড়ে না। বাড়িতে সাজিয়ে রেখে তারা সংস্কৃতি-সচেতনতা প্রকাশ করে। রবীন্দ্রসাহিত্য না পড়ে তারা রবীন্দ্রপ্রেমী হওয়ার ভাণ করে। ‘সঞ্চয়িতা’ গল্পে লেখক রবীন্দ্র-গর্বী শিক্ষিত আধুনিক সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিচর্চার এই ছদ্ম অনুরাগকে প্রকাশ করেছেন। এই গল্পে স্বাতী-নিবেদিতারা নিজেদের সংস্কৃতি-সচেতনতা জাহির করতে ‘সঞ্চয়িতা’ প্রভৃতি বই সাজিয়ে রেখেছে, কিন্তু পড়ে দেখেনি। চারজন শিক্ষিতা মেয়ে একসঙ্গে থাকে, – “দু-জনে হাসপাতালের নার্স, একটি স্কুলের মিস্ট্রেস আর একটি টুইসানি করে ও এম-এ পড়ে। বয়স কম, অতএব কবিতায় বড় অনুরাগ। ঘরে গাদা গাদা কবিতার বই।”[১৮] একদিন কবিসুলভ উদাসীন চেহারার এক ব্যক্তির কবিতাপাঠ শুনে স্বাতী তাকে নিজেদের মেসে নিয়ে আসে। সেখানে আগন্তুক তিনটি কবিতা শোনায় ও নলেনের পাটালি চুরি করে। কবিতাগুলি তারই লেখা কিনা জানতে চাইলে সে বলে সবগুলিই স্বলিখিত (মুগ্ধ শ্রোতারা ভাবে স্বরচিত)। পাঞ্জাবি ও প্রসাধনের অর্থ উপহার দিয়ে কবিতাপ্রেমীরা তাকে আরেকদিন আসার অনুরোধ জানায়। ইতিমধ্যে গিটারের আসর বসার উদ্যোগ হওয়ায় নিবেদিতা ‘ভাল ভাল’ কয়েকটি কবিতা টুকে নিতে চেয়ে আগন্তুককে তার ডায়েরী রেখে যাওয়ার অনুরোধ করলে সে বলে, – “রবি ঠাকুরের কবিতা ভাল হবে না? কিন্তু খাতা থেকে টুকতে হবে কেন? সঞ্চয়িতা বই আছে আপনাদের—ঐ দেখতে পাচ্ছি।”[১৯] অপঠিত ‘সঞ্চয়িতা’ শৌখিনতার উপকরণমাত্র হয়ে রবীন্দ্র-গর্বী শিক্ষিত আধুনিক সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিচর্চার ছদ্ম অনুরাগকে প্রকাশ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘দেনাপাওনা’ গল্পে পণপ্রথার কুফলকে দেখিয়েছিলেন। মনোজ বসু ‘পুত্রদায়’ গল্পে পণ না নেওয়ার ক্ষতিকর প্রভাবকে দেখিয়েছেন। সুদূর অতীত থেকে বহমান বর্তমান পর্যন্ত এই প্রথায় মানুষ এতটাই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে কেউ পণ ছাড়া বিয়ে করবে শুনলে পাত্রের গুণমান নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। অর্থাৎ বর্তমান যুগে পণ না নেওয়াটাও সন্দেহের কারণ হয়ে ওঠে। এই দৃষ্টিতে পণপ্রথাকে কেন্দ্র করে লেখক আসলে মানুষের জটিল সন্দেহপরায়ণ মনোবৃত্তিকেই প্রকাশ করেছেন। আলোচ্য গল্পে দেখা যায় বিয়ের বাজারে অত্যন্ত সুপাত্র হওয়া সত্ত্বেও শশধর উপযুক্ত গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। কন্যার বিবাহে ধরণীধর বরপণের বড় অর্থাঘাত পেলে সবাই আশা করেছিল পুত্রের বিয়েতে তিনি তার শোধ নেবেন। কিন্তু উচ্চশিক্ষিত পুত্র শশধরের ক্ষেত্রে বিরাট বরপণের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সরলপ্রাণ ধরণীধর আশ্চর্যভাবে যখন বলেন ‘একটা পয়সাও পণ লাগবে না’, তখন উল্টো বিপত্তি ঘটে। পাত্রের সুস্থতা

সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হয়ে একের পর এক কন্যাপক্ষ ফিরে যায় এবং অপমানিত শশধর বিবাহবিমুখ হয়। ধরণীধরের কনিষ্ঠ পুত্র জলধর পাত্র হিসেবে শশধরের তুলনায় অনেক নিম্নমানের হলেও অবিশ্বাস্যরকম মোটা অঙ্কের বরপণ চাওয়ায় তার সম্বন্ধ কনেপক্ষ লুফে নেয়। হতবাক ধরণীধরের ভাই অরবিন্দ রহস্য উন্মোচন করে বলেন, – "কলিকাল, দাদা। মানুষ ভাল, এ কেউ বিশ্বাস করে না—তক্ষুনি ভাবে, গোলমাল আছে নিশ্চয় ভিতরে।"[২০] সততার প্রতি এই নির্বিচার সন্দেহপ্রবণতা এযুগের মানুষের এক মজ্জাগত অসঙ্গতি।

বীরকে তাঁর বীরত্বের স্বীকৃতি দেওয়া সভ্যতার ধর্ম। কিন্তু এই ধর্ম সর্বদা পালিত হয় না। মৃত্যুর পরে সাড়ম্বরে তাঁদের স্মৃতিস্তম্ভ রচিত হয়। অথচ জীবিত অবস্থায় তাঁদের সকলে যোগ্য সম্মান পান না। অবহেলায় বিস্মৃতির অন্ধকারে তাঁরা হারিয়ে যান। তাঁদের খোঁজখবর কেউ রাখে না। অনাদরে অবহেলায় তাঁদের এইভাবে বেঁচে থাকা খুবই যন্ত্রণাদায়ক। বীরদের প্রতি জাতির এই অকৃতজ্ঞ মনোভাবকে লেখক 'বীরপূজা' গল্পে দেখিয়েছেন। এই গল্পে সন্ত সিং তাঁর বীরত্বের যোগ্য সম্মান পাননি। প্রবাসে ভ্রমণরত গল্পকথকের সাথে নিউজিল্যান্ডের একজন প্রাক্তন সৈনিক আলাপ করেন। ভারতের শরিফপুরা গ্রাম প্রসঙ্গে তিনি ওই গ্রামের বরকত সিং ও সন্ত সিং নামে বীর ভ্রাতৃদ্বয়ের কথা বলেন। এই দুই ভারতীয় তাঁর সহযোদ্ধা ছিলেন। যুদ্ধে বরকতের মৃত্যু ঘটে ও সন্ত সিংয়ের পা-দুটি কাটা পড়ে। দেশে ফিরে কথক কর্মসূত্রে অমৃতসর পৌঁছে কৌতূহলবশে অদূরবর্তী শরিফপুরা গ্রামে যান। সেখানে বরকত সিংয়ের স্মৃতিস্তম্ভের কাছে গিয়ে সন্ত সিংয়ের খোঁজ করলে পা-কাটা এক ভিখারি নিজেকে সন্ত সিং বলে পরিচয় দেয়। বর্ণিত লক্ষণের সাথে মিলে যাওয়ায় কথকেরও আর সংশয় থাকে না। বীর সৈনিকের এই মানহীন পরিণামে তাঁর দুঃখপূর্ণ কটাক্ষ, – "তা গুণগ্রাহী সরকার বাহাদুর! সিমেন্ট-বাঁধানো পাকা চাতাল বানিয়ে দিয়েছে বরকত সিং-এর স্মৃতিস্তম্ভের সঙ্গে। নইলে নিচের ঐ কাদার মধ্যে বসে ভিক্ষে করতে হত।"[২১] এদেশের বহু বীর মরণোত্তর সম্মান পান, অথচ জীবিতাবস্থায় তাঁরা অনেকেই অবহেলায় দলিত হন। সন্ত সিং যোগ্য সম্মান না পাওয়া সেই সব উপেক্ষিত বীরদের প্রতিনিধি।

আলোচনার উপান্তে এসে বলা যায়, মনোজ বসুর এই শ্রেণির গল্পগুলিতে মানবপ্রকৃতির চিরকেলে ও যুগলব্ধ বহু অসঙ্গতির পরিচয় বিচিত্রভাবে ধরা পড়েছে। এই অসঙ্গতিগুলিকে তিনি যেভাবে তুলে ধরেছেন তাতে বোঝা যায় বহমান জীবনের সাথে তাঁর শিল্পীমন কতটা একাত্ম ছিল। এই একাত্মতার জন্য তাঁর আহত চিত্তের হাসি গল্পগুলিকে কখনো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আকার দেয়নি, বরং লেখকের স্পর্শকাতর চিত্তবৃত্তির কৌতুক-কটাক্ষ পাঠককে পৌঁছে দেয় জীবনসঙ্গতির কাঙ্ক্ষিত কূলে।

তথ্যসূত্র:

১. রামেশ্বর শ, আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৮, পৃ. ৫০।
২. ভূদেব চৌধুরী সম্পাদিত, মনোজ বসুর গল্প সমগ্র (আদি পর্ব), বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ এপ্রিল ১৯৮২, পৃষ্ঠা ৫৪।
৩. তদেব, পৃষ্ঠা ৫৬।
৪. মনোজ বসু, খদ্যোত, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ শ্রাবণ ১৩৫৭, পৃষ্ঠা ২৪।
৫. ভূদেব চৌধুরী সম্পাদিত, মনোজ বসুর গল্প সমগ্র (উত্তর পর্ব), বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ মার্চ ২০১৫, পৃষ্ঠা ১১২।
৬. তদেব।
৭. পৃষ্ঠা ১১৭।
৮. পৃষ্ঠা ১১৮।
৯. পৃষ্ঠা ১১৯।
১০. পৃষ্ঠা ১৪৯।
১১. পৃষ্ঠা ১৮০।
১২. তদেব।
১৩. পৃষ্ঠা ১৮৭।
১৪. পৃষ্ঠা ১৮৯।
১৫. পৃষ্ঠা ১৯২।
১৬. পৃষ্ঠা ৩২৭।
১৭. https://www.bangla-kobita.com/po123/praner-thakur-hridoyer-devota/
১৮. ভূদেব চৌধুরী সম্পাদিত, মনোজ বসুর গল্প সমগ্র (উত্তর পর্ব), বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ মার্চ ২০১৫, পৃষ্ঠা ৩১৬।
১৯. তদেব, পৃষ্ঠা ৩৩৬।
২০. পৃষ্ঠা ৩৪৫।
২১. বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত, মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ১৩৫৭, পৃষ্ঠা ১১৬।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় চিত্রকল্প

সুব্রত মাহাত
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি

সারসংক্ষেপ: বিশ শতকের গোড়ার দিকে পাশ্চাত্য কাব্য-সাহিত্যে চিত্রকল্পবাদী আন্দোলন শুরু হয়। টি.ই হিউম, এজরা পাউণ্ড, এমি লাওয়েল প্রমুখ সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। অবশ্য কয়েকবছর পরে আন্দোলনটি স্তিমিত হয়ে যায়। পাশ্চাত্য কাব্য-সাহিত্যের চিত্রকল্পবাদী আন্দোলন আধুনিক বাংলা কাব্যকেও প্রভাবিত করে। আধুনিক বাংলা কাব্যে জীবনানন্দ দাশ ও অন্যান্য কয়েকজন কবির মধ্যে চিত্রকল্পের সার্থক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। জীবনানন্দোত্তর যুগের বাংলা কাব্য জগতে শক্তি চট্টোপাধ্যায় অন্যতম বিশিষ্ট কবি। তাঁর কবিতাতেও চিত্রকল্পের সুনিপুন প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। বহুবিধ ব্যঞ্জনায় স্পর্শ-ঘ্রাণ-শ্রুতি ইত্যাদি ইন্দ্রিয়বেদ্য সংবেদনায় তা গভীরভাবে নাড়া দেয়। তাঁর চিত্রকল্পের মধ্যে উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি অলংকারের প্রয়োগ, কখনো প্রতীকী শব্দের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সার্থক চিত্রকল্পের প্রয়োগ-নৈপুণ্যে তিনি বিশিষ্ট হয়ে আছেন। তাঁর ব্যবহৃত চিত্রকল্পগুলোর স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যকে আলোচ্য গবেষণামূলক অভিসন্দর্ভটিতে তুলে ধরা যেতে পারে।

সূচক-শব্দ: চিত্রকল্প, বাকপ্রতিমা, রূপক, রোম্যান্টিকতা, দৃশ্যময়তা, পরাবস্তববাদী, সাংকেতিকতা, ইন্দ্রিয়বেদ্য, ইত্যাদি।

মূল প্রবন্ধ:

> "যে-মুখ অন্ধকারের মতো শীতল, চোখদুটি রিক্ত হ্রদের মতো কৃপণ
> করুণ, তাকে তোর মায়ের হাতে ছুঁয়ে ফিরিয়ে নিতে বলি।"[১]

- শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'জরাসন্ধ' কবিতার উক্ত পংক্তিদ্বয় এমন সুন্দর স্বরূপভাষ্য নির্মিত করতে পারত না চিত্রকল্পের প্রয়োগ ছাড়া। চিত্রকল্পের প্রয়োগ নৈপুণ্যেই কাব্যপংক্তিটি এতসুন্দর মোহমায়া বিশিষ্ট হয়েছে।এতে দেখা যায় চিত্রকল্প প্রয়োগে কবির সুদক্ষ প্রতিভার দিকটিকে। 'অন্ধকারের মতো শীতল মুখের বর্ণনা যেখানে দৃশ্যময়তাকে নির্মাণ করেছেন কবি। কিন্তু শুধু দৃশ্যময়তার নির্মাণ করলেও তা সার্থক চিত্রকল্প হয়ে উঠত না। এখানে এই শীতলতার অনুভূতিটি আমাদের সংবেদনশীলতায় স্পর্শকাতর রূপে ধরা পড়ে। এই শীতলতাকে আমরা অনুভব করতে থাকি অন্ধকারের নিজস্ব জগতে। অন্ধকারের একটা স্বরূপ আমাদের কাছে, আমাদের ইন্দ্রিয় সঞ্জাত অভিজ্ঞতার গহ্বরে আবেদন রাখছে। অন্ধকার এখানে শুধু চোখে দেখার বিষয় নয়। অন্ধকার আমাদের স্পর্শানুভূতিতে ফুটে উঠছে। অন্যদিকে 'চোখদুটি রিক্ত হ্রদের মতো কৃপণ

করুণ' যেখানে কবি শুষ্ক, ক্লান্ত ও নিষ্ফলতায় জরাজীর্ণ এক দুঃখ-ক্লিষ্ট জীবনের মুখচ্ছবিকে নির্মাণ করেছেন কবি। আবার এই কবিতাটিতেই কবি যখন বলছেন -

"আমি কখনো অনঙ্গ অন্ধকারের হাত দেখি না, পা দেখি না।"[২]

তখন সেই অন্ধকার যেন শরীরি রূপের আবেদন জাগায় মনে। তবে এখানে শরীরি রূপের মধ্যেও রয়েছে বিমূর্ততা। যার কারণে বর্ণনাটি হয়ে উঠেছে রহস্যময়। 'Metaphorical' বা রূপকের উপাদান এর মধ্যে থাকলেও সুগভীর সাংকেতিকতার ব্যঞ্জনা যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে চিত্ররূপময়তার আভাস। তবে তা যেন রূপক বা উপমার চেয়েও আরও বেশি কিছুর আবেদন জাগায় মনে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যে এভাবে চিত্রকল্পের সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে। তবে তার পূর্বে দেখা যাক চিত্রকল্পের কিছু গোড়ার কথা, চিত্রকল্পের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যের কথা।

চিত্রকল্প বা বাকপ্রতিমা শুধু দৃশ্যায়িত রূপের বর্ণনা নয়। কাব্যের কলেবরে আঁকা শুধু রূপচ্ছবির বর্ণনা মাত্র নয়। চিত্রকল্প শুধু বহিরাঙ্গিক বা 'External' বিষয়ের সৌন্দর্যচিত্রণ নয়। বাইরের রূপচিত্রের সঙ্গে থাকে অন্তরের ভাবনাবিশ্ব। কবি চিত্রকল্পের ব্যবহারের দ্বারা কাব্যভাষাকে যেমন সুন্দর করে তোলেন তেমনি কাব্যের ভাব ও রসাস্বাদনকেও আরও বেশি ব্যঞ্জনাপ্রবণ করে তোলেন। চিত্রধর্মীতার বৈশিষ্ট্য অঙ্কন বা চিত্রকল্প নির্মাণের পূর্বাভাস যা কাব্যসৃষ্টির আদিকাল থেকেই চলে আসছে। তবে আধুনিক কালের কাব্য-কবিতায় চিত্রকল্পের ব্যবহারকে এত বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যার পরিচয় পূর্বে তেমনভাবে পাওয়া যায় না। বিশ শতকের গোড়ার দিকে পাশ্চাত্য কাব্যসাহিত্যে প্রথম সচেতনভাবে চিত্রকল্পবাদী আন্দোলন শুরু হয়। ১৯১৪ সালে এজরা পাউণ্ডের সম্পাদনায় 'Imagist' কবিদের কবিতাকে নিয়ে একটি কাব্যসংকলন গ্রন্থ (Des Imagistes) প্রকাশ পায়। যা চিত্রকল্পবাদী আন্দোলনের পরাকাষ্ঠা রূপেই বিবেচিত।১৯১৫ সালে এমি লাওয়েলের সম্পাদনায় প্রকাশ পায় ‘Some Imagist Poets' নামে অন্য একটি সংকলন গ্রন্থ। এছাড়াও ১৯১৬ ও ১৯১৭ সালে আরও দুটি ইমেজিস্ট কবিদের সংকলন গ্রন্থের প্রকাশ করা হয়। লণ্ডন থেকে প্রকাশিত 'The Egoist' নামের পত্রিকাটিও ছিল ইমেজিস্ট কবিদের অন্য একটি আশ্রয়স্থল। এই আন্দোলন কাব্যসাহিত্যে সুবিপুল প্রাধান্য পেতে শুরু করে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত। তারপর ধীরে ধীরে স্তিমিত হতে শুরু করে। এই আন্দোলনের কবিরা হলেন - টি.ই হিউম, এজরা পাউণ্ড, টি. এস এলিয়ট,এফ.এস ফ্লিন্ট,এমি লাওয়েল, ডি. এইচ লরেন্স, জেমস জয়েস প্রমুখ।

রোম্যান্টিকতা বা ক্লাসিক কাব্যধারার ভাবটিকে অস্বীকার করেই বিভিন্ন কবি যাঁরা চিত্রকল্পবাদী আন্দোলন শুরু করেছিলেন।রোম্যান্টিক কল্পনার বদলে বাস্তবতাবাদী ভাবনা-চিন্তার প্রকাশ ঘটাতে চেয়েছিলেন কাব্য-কবিতায়। সাধারণ লৌকিক জীবনের ভাষা ব্যবহারও যার অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। পাশ্চাত্য কবিদের প্রভাব আধুনিক বাংলা কবিতার উপরেও নিঃসন্দেহে পড়েছিল বলা যায়। জীবনানন্দ দাশের কবিতায়

চিত্রকল্প ব্যবহারের চরমোৎকর্ষ রূপ ফুটে উঠেছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের কাব্য পাঠ করে বলেছিলেন 'চিত্ররূপময়'।

চিত্রকল্প শুধু মূর্তভাবটিকেই ফুটিয়ে তোলে না, অমূর্ত ভাবটিকেও ফুটিয়ে তোলে।স্থূলধর্মীতায় একমাত্র বাস্তবতা নয়, অন্তর্চেতনার অনুভূতি গুলোর মধ্যে রয়েছে চরম বাস্তবতা।কবি-মনের সংবেদনশীলতা যে বিষয়গুলোতে নাড়া দিয়ে ওঠে তাই হয়ে এঠে চিত্রকল্পের উপাদান।শুধু চিত্রধর্মীতার রপটিকে কাব্যে নির্মাণ করাকেই চিত্রকল্প বলা যেতে পারে না।চিত্রধর্মীতা ও চিত্রকল্পের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। চিত্রকল্পের মধ্যে রয়েছে কল্পনা তবে তা বাস্তবতার অভিমুখী। কিন্তু শুধু বস্তুবাচক বা জৈবিক দিকটি নয় সেখানে মানসিক বাস্তবতা নির্মাণের সফল প্রয়াস দেখা যায়।চিত্রকল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ইন্দ্রিয়সঞ্জাত অভিজ্ঞতাকে ফুটিয়ে তোলা এবং ইন্দ্রিয় ঘনত্বের প্রকাশ। মনন ও উপলব্ধির মধ্যে, অনুভূতির মধ্যে, সংবেদনশীলতার মধ্যে তথা দৃশ্য, শ্রুতি, ঘ্রাণ-স্পর্শ-স্বাদ ইত্যাদির মধ্যে চিত্রকল্পের সচল সম্প্রসারণ রয়েছে।জীবনানন্দ দাশ তাই রৌদ্রের গন্ধকেও চিত্রকল্পের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। চিত্রকল্প শুধু বস্তুরূপের নিশ্চল বর্ণনা নয় বরং প্রাণসত্তা মিশ্রিত সচল জীবনের লাবণ্যের মতো। যেখানে শব্দের মধ্যে দিয়েও প্রাণের প্রতিষ্ঠা হয়। শব্দের মধ্যেও সত্যের নির্মাণ হয়। তবে চিত্রকল্পের সঙ্গে প্রতীক বা উপমার পার্থক্য রয়েছে। প্রতীকের মধ্যে সাংকেতিকতা প্রকাশের নির্দিষ্ট পরিসর থাকে। অন্যদিকে চিত্রকল্পে সেই পরিসর অনেক বড়। তাছাড়া চিত্রকল্পের মধ্যে দৃশ্যময়তাকে নির্মাণ করার সুযোগ অত্যন্ত বেশি যা প্রতীকের থাকে না।

চিত্রকল্পের সঙ্গে অলংকারেরও পার্থক্য রয়েছে। চিত্রকল্পকে ফুটিয়ে তোলার জন্য উপমা, উৎপ্রেক্ষা, সমাসোক্তি, রূপকের সাহায্য নেওয়া হলেও অলংকার মানেই চিত্রকল্প নয়। চিত্রকল্পের নিজস্ব ভাব ও ঐশ্বর্য রয়েছে। চিত্রকল্পের মধ্যে একজন কবির ইন্দ্রিয় সঞ্জাত আবেগ-অনুভূতির আকর্ষণ-বিকর্ষণ, মনন-চিন্তন, অভিজ্ঞতার বাচনিক প্রকাশ ঘটে। চিত্রকল্প যা পাঠকের চেতনালব্ধ জ্ঞান ও বোধিকে বাস্তবতার অন্য এক স্তরে জাগ্রত করে দেয়। বিভিন্ন ধরণের ইন্দ্রিয়সঞ্জাত চিত্রকল্পের ব্যবহারের দ্বারা সংশ্লেষণ ঘটে নতুন এক সৃষ্টিচেতনার। চিত্রকল্পের মধ্যে বিশেষণবাচক শব্দ, উপমা বা রূপকের মায়াজাল থাকলেও বাহ্যবস্তুর সুনির্দিষ্ট স্বরূপ নির্মাণের চেয়েও আরও বেশি কিছুর ইঙ্গিত দেয় চিত্রকল্প। এই বিষয়টি সম্পর্কেই সি. ডে. লুইস তাঁর 'The poetic Image' গ্রন্থে লিখেছেন -

"An epithet, a metaphor, a simile may create an image; or an image may be presented to us in a phrase or passage on the face of it purely descriptive, but conveying to our imagination something more than the accurate reflection of an external reality.[3]

জীবনানন্দোত্তর যুগে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় চিত্রকল্প অনেক সুগভীর ব্যঞ্জনাবাহিত হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। বস্তুবাচক ভাবের প্রতিনিধির স্বরূপ না হয়ে দেখা

গেছে ইন্দ্রিয় সংবেদনার ও ভাবের প্রতিবিম্ব রূপে। তাঁর কবিতায় চিত্রকল্পের উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে প্রকৃতি থেকে, মানব জীবনের আসক্তি-বেদনায় ভারাক্রান্ত প্রেমের রহস্য থেকে, কখনো মৃত্যুর উপলব্ধি কবিকে ভাবিয়েছে অনেক বেশি। দৈনন্দিন জীবনের সাদামাটা বিষয়গুলোকে তিনি তাঁর চিত্রকল্পে প্রয়োগ করেছেন। যেখানে তাঁর শব্দ প্রয়োগের কুশলতাও ভাষা ব্যবহারের নৈপুণ্যতার দিকটিও ফুটে উঠেছে। তাঁর চিত্রকল্পের মধ্যে রয়েছে প্রতীক সর্বস্বতা এবং দৃশ্যময়তাকে অঙ্কনের পাশাপাশি সুগভীর আত্মমগ্ন উচ্চারণ। কখনো পরাবস্তববাদী ভাবনাচিন্তা এবং অবচেতনার নিগূঢ় স্তর থেকে উঠে আসা চিন্তাবীজ। তাঁর চিত্রকল্পের মধ্যে রয়েছে সাংকেতিকতার নিজস্ব ভাব-প্রদর্শন। ইন্দ্রিয়বেদ্য ভাব ও ভাষা চয়ন। উপমান, উপমিত, সাদৃশ্যবাচক শব্দ ও রূপকের চেয়েও আরও বেশি কিছু ইঙ্গিতময়তার আভাস সেখানে ফুটে উঠেছে।শুধু দৃশ্যরূপের সৃজন নয় কিংবা আলংকারিক সৌন্দর্যবিন্যাস নয় তার চেয়েও আরও বেশি কিছুর আবেদন ও অনির্দিষ্ট আলোক-উদ্ভাস তাঁর কবিতার কেন্দ্রীয় সত্য।জনৈক সমালোচকের মতে -

> "কেবলমাত্র উপমান ও উপমিতের মধ্যে সহজ সাদৃশ্যবাচক চিত্রকল্পে এই বেপরোয়া কবির তৃপ্তি হয়নি ; তাই তুলনাত্মক চিত্রকল্পের মসৃণতা ত্যাগ করে বার বার তিনি মেটাফরের ব্যঞ্জনা ও দুরধিগম্যতায় তাঁর কবিতাকে নির্দিষ্ট অর্থের বন্দীত্ব থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন।"[৪]

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় চাঁদ, বৃষ্টি, গাছ-গাছালি, ঝর্ণা, সমুদ্র, অরণ্য, পাহাড়, জড়ত্বের প্রতীক রূপে পাথর ইত্যাদি চিত্রকল্পের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। যেখানে চিত্রিত হয়েছে কবির প্রকৃতি প্রীতির সজল আকর্ষণ।চাঁদ ও জ্যোৎস্না রাত্রির প্রসঙ্গ, অন্ধকারের প্রসঙ্গ, বৃষ্টির প্রসঙ্গ তাঁর চিত্রকল্পে ব্যবহৃত অন্যতম প্রিয় বিষয়। আবার পর্যটন বিলাসী মনের ভ্রমণ প্রসঙ্গকে নিয়েও পাহাড়, নদী, ঝর্ণার চিত্রকল্প ব্যবহৃত হয়েছে। কখনো আসক্তি পূর্ণ প্রেমের তথা যৌনতা বাচক চিত্রকল্পের ব্যবহারেও দক্ষতা দেখিয়েছেন কবি।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'ঝর্ণা'কবিতাটির প্রতি আলোকপাত করা যেতে পারে। দেখা যায় যে প্রকৃতির কোল থেকেই উপাদান সংগ্রহ করে কবি অদ্ভূত চিত্রকল্পের নির্মাণ করেছেন। ঝর্ণার মধ্যে কবি নৃত্যরত নারীর সৌন্দর্য আরোপ এবং সেই ঝর্ণায় শেষ পর্যন্ত কিভাবে ভালোবাসায় মুখর হয়ে ফুটে উঠল কবি তার কথা লিখেছেন। এই কবিতাটিতেই কবি একটি পংক্তিতে লিখেছেন -'গাছের শিরায় ফেটেছে নূপুর অমন নূপুর জলে ভাসবে কি।' ৫এখানে ঝর্ণার শব্দকে কবি নূপুরের ধ্বনির সঙ্গে উপমিত করেছেন। যার মধ্যে দিয়ে চিত্রকল্পটি শ্রবণবেদ্য হয়ে ফুটে উঠেছে। কবতাটিতে নৃত্যরত এক নারীর রূপাভাস ফুটে উঠতে দেখা যায়।

'অন্ধকার শালবন' কবিতাটিতে কবি এক অপরূপ দৃশ্যময়তাকে সৃষ্টি করেছেন। যেখানে ভালোবাসার মোহাবিষ্ট দৃশ্যরূপের ছবি আবার শুধু ছবি নয় ভালোবাসার অন্তর্গূঢ় আকর্ষণের কথাকেও লিপিবদ্ধ করেছেন। কবি সেই ভালোবাসার বন্ধনকে ছড়িয়ে যেতে পারছেন না। সুগভীর ইন্দ্রিয়বেদ্য হয়ে ওঠে যখন কবি বলেন -"কেউ কি জাগালে শালবন, বাহুবন্ধন চারিধারে ?"[৬]। এই কবিতাতেই কবি নারীর চুলের সৌন্দর্যময় রূপচিত্রকে অঙ্কন করেছেন এইভাবে-"ঝরছে পাতার শিখর-গলানো কার এলোচুল।[৭]" গাছের পাতার ভেতর দিয়ে ঝরে পড়া সূর্যের আলোর ছটার প্রবাহরূপটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। উৎপ্রেক্ষা অলংকারের সৌন্দর্য সুষমার দ্বারা কবি এই চিত্রকল্পটি অঙ্কন করেছেন। ছায়াময় শালবনের ভেতর দিয়ে ঝরে পড়া সূর্যের রশ্মির ছটা যা কোন এক নারীর এলোচুল বলে মনে হচ্ছে কবির কাছে। এভাবে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের চিত্রকল্পে কখনো উৎপ্রেক্ষা, কখনো সমাসোক্তি অলংকারের প্রয়োগে চিত্রকল্পগুলি নিদারুন সৌন্দর্য বিশিষ্ট হয়ে প্রকাশ পায়। পাশাপাশি প্রখর বস্তু চেতনার মধ্যেও ঘটে মানবিকীকরণের প্রাণময় বাকপ্রতিমা।

চাঁদ ও জ্যোৎস্নার প্রসঙ্গকে নিয়ে কবি বারংবার তাঁর চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন। চাঁদ বহুব্যঞ্জিত রূপে তাঁর কবিতায় ফুটে উঠেছে। কখনো স্মৃতি চেতনার উদ্রেক, কখনো যুগের অবক্ষয়ী রূপটিকে তুলে ধরার জন্য, কখনো মানসিক অবসাদের প্রকাশ রূপে, কখনো নারী রূপের প্রতিচ্ছায়া নির্মাণে চাঁদকে কবি অঙ্কন করেছেন। 'অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে' কবিতায় কবি যে চাঁদের কথা লিখেছেন, সেই চাঁদ অপার্থিব সৌন্দর্যের আলোক মাখা অথচ বস্তুবিশ্বের সঙ্গে যার সুগভীর সম্প্রীতির নিদর্শন। এই চিত্রকল্পটি বহু বিস্তৃত এক চেতনার অনুভূতিতে ঐশ্বর্যময়। কিন্তু এই চাঁদ সম্পর্কেই কবি 'আমি কেবলই বাতাপি' কবিতায় কবি লিখেছেন -'প্রবল কুচক্রী চাঁদ ফাঁদে পড়ে রয়েছে উঠানে!"[৮] তখন চাঁদের মধ্যে রোম্যান্টিক সৌন্দর্যবোধের প্রকাশ নেই। এখানে চাঁদকে কবি ষড়যন্ত্রকারী রূপে অভিহিত করেছেন। যে চিরদিনই মানুষকে তার মোহমায়ার ফাঁদে বন্দী করে রাখে। আজকের যুগের মানুষ আজ সেই চাঁদকেই তাদের নিজস্ব কৃত্রিমতার ফাঁদে আটকে রেখেছে। অর্থাৎ চাঁদকে নিয়ে এখনকার মানুষ আর সৌন্দর্য খুঁজে পায় না। প্রকৃতির কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে মানুষ।

'চাঁদের ভিতরে' কবিতায় কবি লিখেছেন -"চাঁদের ভিতরে কতকাল/পড়ে আছে তোমার কঙ্কাল"[৯]। অর্থাৎ অবলুপ্ত প্রেমের রূপচ্ছবিকে কবি অঙ্কন করতে চেয়েছেন। চাঁদের সৌন্দর্যের মতোই অবসিত প্রেমের রূপটিকে কবি তুলে ধরতে চেয়েছেন কঙ্কালের প্রতীকে।কবি যে নারীকে ভালোবেসেছেন আজ সেই নারীর লাবণ্যময় শরীর কঙ্কালে পর্যবসিত। অর্থাৎ মানবজীবনে যেখানে প্রেমের মৃত্যু ঘটে গেছে। 'প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই' কাব্যগ্রন্থের 'গাধা আর চাঁদ' কবিতায় কবি লিখেছেন -

> "এক গাধা আর চাঁদ নিঃশব্দে হেঁটে চলেছে বনের মধ্যে দিয়ে কেউ
> কারুর দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না"[১০]

এই চিত্রকল্পটিতে কবির একাকীত্বের অনুভূতি, নির্জনতা ও শোকস্তব্ধ উপলব্ধির পরিচয় রয়েছে।চাঁদের সঙ্গে গাধাটির আন্তরিক যোগ নেই। গাধাটি যেন কবির অবচেতন মনের প্রতীকী উদ্ভাসন। আবার 'অস্ত্রের গৌরবহীন একা'কাব্যগ্রন্থে 'আমরা দুজন ছড়িয়ে বসছি' কবিতায় কবি লিখেছেন -''আকাশে চাঁদ শায়া শুকোচ্ছে কি নরম জোছনা-আলোয়'[১১]। যেখানে এক দারিদ্রজীর্ণ নারীর অসহায় জীবনযাপনের দৃশ্যরূপ সুনিবিড় সাংকেতিকতার দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। তাই দেখা যায় চাঁদের সঙ্গে কবি তাঁর পরিচিত জগতের সম্পর্ককে স্থাপিত করতে চেয়েছেন চিত্রকল্পগুলির মধ্যে দিয়ে।

মেঘ ও বৃষ্টির চিত্রকল্পও তাঁর কবিতাকে অন্যমাত্রা দিয়েছে। মেঘ ও বৃষ্টির প্রসঙ্গকে বর্ণিত করতে গিয়ে একদিকে রয়েছে তাঁর নিসর্গপ্রীতি অন্যদিকে রয়েছে তাঁর সুগভীর ইন্দ্রিয়বেদ্য অনুভূতির পরিচয়। মেঘ বা বৃষ্টি কবির চেতনাকে, সুখ,দুঃখ বা বিরহের অনুভূতির দিকে নিয়ে যায়। বৃষ্টি শুধু বাইরের প্রকৃতিতে নয় কবির অন্তরেও বৃষ্টি ঝরে পড়ে বেদনার উৎস রূপে। কবির বিরহী মনের সঙ্গে বৃষ্টির অন্তর্গূঢ় যোগ। তাই প্রিয়াকে না দেখতে পেয়ে কবির বুকের মধ্যে বৃষ্টি নেমে এসেছে-'বুকের মধ্যে বৃষ্টি নামে, নৌকা টলোমলো'[১২]। নৌকা এখানে যেন দৈহিক জীবনভাবনার প্রতীক। প্রেমের বিরহের বৃষ্টিতে দৈহী রূপ নৌকা হৃদয় রূপ নদীতে স্থির ও অবিচল থাকতে পারছে না।

'আনন্দ-ভৈরবী' কবিতায় কবি লিখেছেন -"এখনো বরষা কোদালে-মেঘের ফাঁকে/বিদ্যুৎ-রেখা মেলে"[১৩]। কোদালে মেঘের চিত্রকল্পটি এখানে বজ্র-বিদ্যুৎ মুখর মেঘের চিত্ররূপটিকে ফুটিয়ে তোলার জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে।আবার 'অবনী বাড়ি আছো' কবিতায় কবি লিখেছেন -

"বৃষ্টি পড়ে এখানে বারোমাস
এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে"[১৪]

এখানে মেঘ এবং বৃষ্টিকে নিয়ে অসাধারণ চিত্রকল্পের নির্মাণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে পরাবস্তবতার অনুভূতিও। মেঘের মন্থর গতিতে চলার গতিভঙ্গীটিকে কবি গাভীর সঙ্গে উপমিত করে দেখিয়েছেন। কবি নিজের অবচেতন মনের স্বরূপটিকেও এই ধরণের চিত্রকল্পের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন। অন্তঃসারশূন্য হৃদয়ে কবি তাঁর বৃহত্তর চেতনাটিকে উপলব্ধি করতে না পারার জন্যই বারোমাস বৃষ্টি পড়ে। এখানে বৃষ্টি হল নিজেকে উপলব্ধি করতে না পারার অপরিসীম দুঃখ ও যন্ত্রণার অশ্রুবৃষ্টি। মেঘের মতো গাঢ় অন্ধকার সহজে সরে যেতে চায় না বলেই এই ধরণের চিত্রকল্পকে কবি অঙ্কন করেছেন।

কবি কখনো ফুলকে নিয়েও চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন। কিন্তু ফুলের রোম্যান্টিক সৌন্দর্যের বদলে আমিষগন্ধী ভাবনার আলাপন কবির শরীর কেন্দ্রিক ভাবটিকে ফুটিয়ে তুলেছে। কবি চন্দ্রমল্লিকার ফুলের ঝরে পড়ে থাকার বিষয়টিকে দৈহিক দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রত্যক্ষ করলেন -''চন্দ্রমল্লিকার মাংস ঝরে আছে ঘাসে।''[১৫]

নগরজীবন কবির জীবনে ক্লেদাক্তকর অনুভূতির জন্ম দিয়েছে। নগর জীবনের জটিলতা, বিতৃষ্ণা, হিংসা-র অগ্নিদহনে কবি হয়েছেন ক্ষতবিক্ষত। স্বাধীনতা-উত্তর জটিল যুগ-পরিবেশে কবির দুচোখ অসুখে আক্রান্ত। আর তাই অনেকসময় তাঁর চিত্রকল্পগুলির মধ্যেও তা প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। মানবিকচেতনার অবক্ষয়, নিষ্প্রাণ জীবনের শুষ্কতা ও অসুস্থতার দিকটি বোঝাতে কবি অনেকসময় পাথরের চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন। ' একবার তুমি' কবিতায় কবি লিখেছেন -

"একবার তুমি ভালোবাসতে চেষ্টা করো -
দেখবে, নদীর ভিতরে, মাছের বুক থেকে পাথর ঝরে পড়ছে
পাথর পাথর পাথর আর নদী-সমুদ্রের জল
নীল পাথর লাল হচ্ছে, লাল পাথর নীল
একবার তুমি ভালোবাসতে চেষ্টা করো।"[১৬]

এখানে ভালোবাসার মাধুর্যের কথা চিত্রিত করা হয়েছে। যে ভালোবাসা মানুষের জীবনকে অপরিসীম প্রাণপ্রাচুর্যে ভরিয়ে তুলতে পারে। ভালোবাসা মানুষের মনের ভেতরে থাকা জড়ত্বগুলোকে মুছে ফেলে আলোকময় জগতে মুক্তি দিতে পারে। কিন্তু পাথর শুধু জড়ত্ব বা স্থবিরতার প্রতীক মাত্র নয়। পাথরের মধ্যেও বহুবিধ ব্যঞ্জনার কথাকে প্রকাশ করেছেন কবি। পাথর কখনো স্মৃতিচেতনার নামান্তর কখনো মানবিকীকরণের স্পষ্ট প্রতিচ্ছায়া নির্মাণ. কখনো জীবনের বহুবিস্তৃত চেতনার প্রতীক। 'হেমন্ত যেখানে থাকে' কাব্যগ্রন্থের 'পাথর নদীর কাছে' কবিতায় কবি লিখলেন-'পাথর নদীর কাছে চুপ করে আছে'[১৭]। এখানে পাথরের মধ্যেও মানবিক দিকটি প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। পাথরের মধ্যেওএখানে নিস্তব্ধ অনুভূতির সঞ্চার ঘটেছে।

অরণ্য, পর্বত, গাছ, গাছের পাতা, শিকড় ইত্যাদি কবির অন্যকিছু প্রিয় প্রসঙ্গ। গাছ কবির কাছে মানব-অস্তিত্বের চিরন্তন আশ্রয়। গাছের মধ্যে মানবীর রূপের প্রতিফলন রয়েছে। গাছ জীবনের সম্ভাবনা ও সৃষ্টির আদিম উৎসের প্রতীকও। গাছের শিকড় মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের গভীরতাকেও আভাসিত করে। গাছের চিত্রকল্পে কবি নারীর রূপচিত্রকেও প্রতিফলিত করেছেন। তার একটি উদাহরণ হল-

"একটি নিষ্পাপ গাছ আমাদের মাটিতে বসেছে
বাস্তুর নিকটে আছে, বুক ভরা মায়ার নিকটে
পিতৃপুরুষের স্নিগ্ধ স্মৃতির মতন কেশপাশ
এলিয়ে রয়েছে ছায়া, সীমাহীন রোদের ভিতরে -"[১৮]

এই চিত্রকল্পটিতে রমণীর প্রেম, ভালোবাসা, স্নেহ, মায়া মমতার আশ্চর্য নিদর্শন রয়েছে। গাছের চিত্রকল্পের প্রয়োগ বিষয়ে কবি নিজেই বলেছেন -

"মানুষকে গাছ হিসবে দেখা আমার প্রিয় ব্যসন। বিশেষত নিজেকে। আমার স্বভাবটা তাই।যেখানে যাই শিকড় নিই।"[১৯]

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের চিত্রকল্পে রয়েছে বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা, বস্তুরূপের চিত্রময়তা একই সঙ্গে বিমূর্ত অনুভূতির প্রগাঢ় উপলব্ধি। যা আমাদের ইন্দ্রিয়সংবেদনায় গভীর ভাবে দাগ কাটে। প্রেম বা ভালোবাসার বেদনা প্রকাশে কিংবা মৃত্যুর উপলব্ধিতেও কবি চিত্রকল্পের বিশিষ্ট প্রয়োগ করেছেন। 'সে বড়ো সুখের সময় নয়, সে বড়ো আনন্দের সময় নয়' কবিতায় কবি মৃত্যুকে আঁকলেন কালো গাড়ির চিত্রকল্পে -

> "কালো গাড়ির ভিতরে আবার কালো গাড়ি, তার ভিতরে আবার কালোগাড়ি সারবন্দী জানলা, দরজা, গোরস্থান -ওলোটপালোট কঙ্কাল কঙ্কালের ভিতরে শাদা ঘুণ, ঘুণের ভিতরে জীবন, জীবনের ভিতরে মৃত্যু –সুতরাং মৃত্যুর ভিতরে মৃত্যু "[২০]

আবার কবি মৃত্যু সম্পর্কেই কখনো লিখেছেন যে মৃত্যু যেন খাপছাড়া স্টেশনের টিফিনের ছেলে। এইভাবে কবি তাঁর চিত্রকল্পের মধ্যে জীবন, প্রেম ও মৃত্যুর নিগূঢ় উপলব্ধিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। পাশাপাশি ভ্রামণিক জীবনের প্রসঙ্গ, প্রকৃতির নিবিড় প্রতিচ্ছায়া নির্মাণেও চিত্রকল্পগুলি বিশিষ্ট। কবির সুগভীর ইন্দ্রিয়বেদ্য অনুভূতির চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে চিত্রকল্পগুলির মধ্যে। যেখানে সাংকেতিকতা ও ব্যঞ্জানার অবাধ বিস্তার। সুনির্দিষ্ট দৃশ্যরূপেই চিত্রকল্পগুলি সীমাবদ্ধ নয়। সীমাবদ্ধতাকে ছাড়িয়ে অনন্ত জগতে যার বন্ধন মুক্তি ঘটে। অনন্ত ব্যঞ্জনায় পাঠকের প্রজ্ঞা ও বোধিকে আলোকদীপ্ত করে।

তথ্যসূত্র :

১. চট্টোপাধ্যায় শক্তি, জরাসন্ধ, 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য' কাব্যগ্রন্থ, পদ্যসমগ্র-১ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, অষ্টম মুদ্রণ আগস্ট ২০১৯, পৃ-২২

২. তদেব

৩. Lewis C. Day,The Poetic Image, The Alden Press Bound by A.W. Bain & Co.Ltd, London, Tenth Impression 1961, Page-18

৪. চট্টোপাধ্যায় কুন্তল, মৃত্যুর পরেও যেন হেঁটে যেতে পারি, রত্নাবলী, প্রথম প্রকাশ কবিপক্ষ মে ১৯৯৮, পৃ-১৫২

৫. চট্টোপাধ্যায় শক্তি, ঝর্ণা, 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য' কাব্যগ্রন্থ, পদ্যসমগ্র-১ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, অষ্টম মুদ্রণ আগস্ট ২০১৯, পৃ-৩৩

৬. চট্টোপাধ্যায় শক্তি, অন্ধকার শালবন, 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য' কাব্যগ্রন্থ, পদ্যসমগ্র-১ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, অষ্টম মুদ্রণ আগস্ট ২০১৯, পৃ-৫০

৭. তদেব

৮. চট্টোপাধ্যায় শক্তি, আমি কেবলই বাতাপি, 'ধর্মেও আছো জিরাফেও আছো' কাব্যগ্রন্থ, পদ্যসমগ্র-১ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, অষ্টম মুদ্রণ আগস্ট ২০১৯, পৃ-৮৪

৯. চট্টোপাধ্যায়শক্তি, চাঁদের ভিতরে, 'ধর্মেও আছো জিরাফেও আছো' কাব্যগ্রন্থ, পদ্য সমগ্র- ১মখণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, অষ্টম মুদ্রণ আগস্ট ২০১৯, পৃ-১০৯
১০. চট্টোপাধ্যায় শক্তি, গাধা আর চাঁদ, 'প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই' কাব্যগ্রন্থ, পদ্যসমগ্র-২য় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, অষ্টম মুদ্রণ আগস্ট ২০১৯, পৃ-১১৩
১১. চট্টোপাধ্যায় শক্তি, আমরা দুজন ছড়িয়ে বসছি, 'অস্ত্রের গৌরবহীন একা' কাব্যগ্রন্থ, পদ্যসমগ্র-৩য় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, অষ্টম মুদ্রণ আগস্ট ২০১৯, পৃ-৮৪
১২. চট্টোপাধ্যায় শক্তি, যখন বৃষ্টি নামলো, 'ধর্মেও আছো জিরাফেও আছো' কাব্যগ্রন্থ, পদ্য সমগ্র-১ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, অষ্টম মুদ্রণ আগস্ট২০১৯, পৃ-১২৫
১৩. চট্টোপাধ্যায়শক্তি, আনন্দ ভৈরবী, 'ধর্মেও আছো জিরাফেও আছো' কাব্যগ্রন্থ, পদ্যসমগ্র- ১মখণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, অষ্টম মুদ্রণ আগস্ট ২০১৯, পৃ-১০০
১৪. চট্টোপাধ্যায়শক্তি, অবনী বাড়ি আছো, 'ধর্মেও আছো জিরাফেও আছো' কাব্যগ্রন্থ, পদ্যসমগ্র-১মখণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, অষ্টম মুদ্রণ আগস্ট ২০১৯, পৃ-৯৭
১৫. চট্টোপাধ্যায়শক্তি, কোনোদিনই পাবে না আমাকে, 'ধর্মেও আছো জিরাফেও আছো' কাব্যগ্রন্থ, পদ্যসমগ্র-১মখণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, অষ্টম মুদ্রণ আগস্ট ২০১৯, পৃ-১০৯
১৬. ট্টোপাধ্যায়শক্তি, একবার তুমি, 'পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি'কাব্যগ্রন্থ, পদ্যসমগ্র-২ য় খণ্ড, আনন্দপাবলিশার্স,অষ্টম মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪২৫, পৃ-৫৪
১৭. চট্টোপাধ্যায়শক্তি, পাথর নদীর কাছে, 'হেমন্ত যেখানে থাকে' কাব্যগ্রন্থ, পদ্যসমগ্র-৪ র্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ষষ্ঠ মুদ্রণ জুলাই ২০১৮,পৃ-৫৫
১৮. চট্টোপাধ্যায়শক্তি, ঐ গাছ, 'পরশুরামের কুঠার' কাব্যগ্রন্থ, পদ্যসমগ্র-৩ য় খণ্ড, আনন্দপাবলিশার্স, ষষ্ঠ মুদ্রণ অক্টোবর ২০১৫, পৃ-১৮১
১৯. চট্টোপাধ্যায়শক্তি, হারাতে হারাতে তাকে (পদ্য প্রসঙ্গে কবির স্বগতোক্তি), 'পরশুরামের কুঠার' কাব্যগ্রন্থ, পদ্যসমগ্র-৩ য় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ষষ্ঠ মুদ্রণ অক্টোবর ২০১৫, পৃ-১৮৫
২০. চট্টোপাধ্যায় শক্তি, সে বড়ো সুখের সময় নয়, সে বড়ো আনন্দের সময় নয়, 'সোনার মাছি খুন করেছি' কাব্যগ্রন্থ, কাব্যগ্রন্থ, পদ্যসমগ্র-২ য় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, অষ্টম মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪২৫, পৃ-১৫

উনিশ শতক ও সমাজ সংস্কার : প্রসঙ্গ কালীপ্রসন্ন সিংহের কলকাতা

ইতিষা নন্দী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : মধ্যযুগীয় পরিসমাপ্তির রেশকে কাটিয়ে বাংলা সমাজ ও সাহিত্য এসে পৌঁছাল উনিশ শতকে। এই সময় নয়া নগরী কলকাতায় উচ্ছৃঙ্খলতার সাথে সমগামী হয়েছে উদ্যম। প্রচণ্ড আকর্ষণের সাথে যুক্ত হল বিপুল আয়োজন। যুগের দাবিতে নতুন নগরের সাথে পাল্লা দিয়ে বাবুমশাইদের অবসর বিনোদনের আসরে যুক্ত হল নটীর নুপূর ও মদের পেয়ালা। উনিশ শতকের পুঁজির দাম্ভিকতায় শ্যাম্পেনের ফোয়ারায় ভরে উঠল তাদের উল্লাস ও বিনোদনের আসর। বিবি, বাইজি, বারাঙ্গনা, বাণিজ্য, বাজি, বুলবুলি, বোতল, বাগানবাড়ি, বটতলা, বৌ-বাজার – এই 'ব-কালচার'কে ঘিরেই তাঁরা তৈরি করেছিলেন 'বাবু-কালচার'। বাবুদের এই আমোদের চিত্রে নাগরিক রুচির পাশাপাশি নবচেতনার দল বিদ্যাকে হাতিয়ার করে এতদিন ধরে চলা কুসংস্কারময় সমাজের কাছে প্রশ্ন রাখতে থাকলেন একের পর এক। মুখ থুবড়ে পড়ল চিরাচরিত সমাজ জীবন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, ডিরোজিওর ইয়ংবেঙ্গলদল প্রমুখদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় উনিশ শতক হয়ে উঠল সংস্কার আন্দোলনের ভিত্তিভূমি। এইরকম এক পরিস্থিতিতে সমাজের রূপান্তরের চিত্রকে চোখের সামনে দেখেছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে গিয়েছিলেন উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে। তাই তিনি সহজেই ধরতে পেরেছিলেন নতুন গড়ে ওঠা বাঙালি সমাজের বাবু-কালচার ও ভয়ঙ্কর কুপ্রথার নগ্নরূপটিকে। সমাজের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত সমাজপতিদের তৈরি করা হাজারো প্রতিবন্ধকতার নিয়মে সমাজ যখন জেরবার; তখন বিদ্যাসগরের সহযোদ্ধা হয়ে সমাজকে যুক্তির বোধে ও মুক্তির আলোতে দীক্ষিত করতে এগিয়ে এলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। তিনি 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' ও 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'কে হাতিয়ার করে নিজের উদ্যোগে সমাজের বুকে স্বাক্ষর রাখতে থাকলেন একের পর এক সংস্কারমূলক কঠোর পদক্ষেপের। বিধবাবিবাহ আইন, বহুবিবাহ রদ, কৌলীন্যপ্রথা দূরীকরণ, স্বতন্ত্র বেশ্যাপল্লী প্রতিষ্ঠাকরণ, জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনমত গঠন, শিক্ষাবিস্তারের উদ্যোগ, দাতব্যলয় প্রতিষ্ঠা ও বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহকরণ – প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি উনিশ শতকের সমাজের কাছে বার্তা রেখে গেলেন, সমাজ চাইলেই পারে দমন করতে তার কোনায় কোনায় লুকিয়ে থাকা দুরারোগ্য ব্যধিগুলিকে। তিনি যথার্থই মানুষের বন্ধু ছিলেন। তাঁর গুণে লাভবান হয়েছে উনিশ শতক। তাঁর চিন্তায় অগ্রবর্তী হয়েছে সমাজের পদক্ষেপ। কালীপ্রসন্ন সিংহের

যুক্তিপূর্ণ মানসিকতা, সত্যনিষ্ঠা ও স্বদেশপ্রেম মহাত্মার ভূমিকায় চিরকাল শিক্ষা দিয়ে গেছে ও যাবে আগামীকে। আগামী প্রজন্ম ও সময়কে।

সূচক শব্দ : উনিশ শতক, পুঁজির দাম্ভিকতা, বাবু-কালচার, নবচেতনার দল, কুপ্রথা, সংস্কার আন্দোলন, বিদ্যোৎসাহিনী সভা, বার্তা, অগ্রবর্তী চিন্তা, মহাত্মা।

মূল আলোচনা :

সময় উনিশ শতক। সমাজটা অবশ্যই কলকাতার। উনিশ শতকে দাঁড়িয়ে এই নতুন নগরী যখন বিচিত্র কোলাহলের শহরে রূপ নিয়েছে, তখন তার উচ্ছৃঙ্খলতার সাথে সমগামী হয়েছে উদ্যম। বিপুল তার আয়োজন, প্রচন্ড তার আকর্ষণ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বৃহত্তম শহর হিসেবে সে গড়ে উঠেছে এক মহা মহোৎসবে। একটি সামন্তবাদী, কৃষিনির্ভর মূলত স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম নিয়ে গঠিত বা এক অর্থে সুনির্দিষ্ট অবয়বহীন কলকাতার অবস্থান তখন পুঁজিবাদের প্রতিনিধি ও পরিপোষক হিসেবে। আমারা যে সময়পর্বের আলোচনায় মনোনিবেশ করাছি সেটি এমন একটি সময় যখন সবেমাত্র শেষ হয়েছে নবাবি আমল, ইংরেজ শাসনের শিকড় তখনও ছড়িয়ে পড়েনি সমাজের গভীরে। তখন অস্তর্মিত মুর্শিদাবাদ, জেগে উঠল কলকাতা। গেল ফার্সী, এল ইংরেজি। এই নয়া শাসকশ্রেণি এদেশে তাদের ভীত মজবুত করতে চালু করলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। লক্ষ লক্ষ মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেললেন তারা। গোটা সমাজে চলতে লাগল এক শোষণের চক্ররেখা। ইংরেজ শোষণ করে জমিদারকে, জমিদার শোষণ করে কৃষককে, আর কৃষকের কাঁধে জমা হতে থাকল বিরাট এক ভারী বোঝা। তার সাথে সাথে শোষণের মাত্রাকে বাড়াতে জমিদারদের সাথে যোগ দিল মধ্যসত্ত্বভোগী কিছু ফেউ দল। জন্ম হল সরকারের পরম বিশ্বস্ত বিত্তবান নতুন এক জমিদার শ্রেণির। বাংলা নবাবদের শাসককালীন সময়পর্বে দীর্ঘদিন পর্যন্ত মুর্শিদাবাদই ছিল স্বাধীন বাংলার রাজধানী। পলাশির যুদ্ধ জয় ও দেওয়ানি লাভের পর রাজ্য শাসনের সুবিধার কথা মাথায় রেখে নতুন শাসক ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে নগর কলকাতাকে প্রতিষ্ঠা দিলেন বাংলার নতুন রাজধানী হিসাবে। এই সময় থেকেই কলকাতা হয়ে ওঠে সমগ্র বাংলার প্রাণকেন্দ্র। গড়ে ওঠে কলকাতা কেন্দ্রিক এক নতুন জীবন, সমাজ ও সংস্কৃতি। অন্যদিকে নতুন রাজশক্তি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার ক'বছরের মধ্যেই স্বাক্ষর রাখল আপন শোষণ-কৃতিত্বের। এল মন্বন্তর। ১৭৭০-এর দুর্ভিক্ষ ভেঙে দিয়েছিল বাংলার সমাজ ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে। ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল বাংলার অগনিত মানুষের প্রাণ। ১৭৭২-এ পাঁচশালা, ১৭৯০-এ দশশালা ও ১৭৯৩-এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যেমন বদলেছে বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামো, তেমনই বিনষ্ট হয়েছে গ্রাম ও নগর জীবনের সুস্থিরতা। একদিকে দুর্ভিক্ষ, অন্যদিকে নয়া শাসকের রাজস্ব বৃদ্ধির চাপ -এই দুই-এর যাঁতাকলে পড়ে মৃতপ্রায় মানুষ বাঁচার তাগিদে পাড়ি জমাচ্ছে নগর কলকাতায়। সেই সুযোগে ধ্বংস হয়ে যাওয়া প্রাচীন অভিজাত বংশের শূন্যস্থান

দখল করতে এগিয়ে এল ইংরেজ সান্নিধ্যে অর্থশালী ভুঁইফোড় এক সম্প্রদায়। আঠারো শতকের শেষভাগ থেকে ইংরেজ অনুগৃহীত শহরবাসী এই হঠাৎ নবাবের দল বাঙালি সমাজ জীবনে রাতারাতি আপন আসর করে নিল। এই সময় থেকেই কলকাতা নগরী চলে গেল বেশকিছু মধ্যস্বত্ত্বভোগী ধনী উঠতি জমিদার ও হঠাৎ করে বড়োলোক হয়ে ওঠা বাবুদের হাতে। গবেষেক বিনয় ঘোষ এই প্রসঙ্গে বলেছেন-

> "বাংলার নতুন শ্রেণীবিন্যাসের যুগে যাঁরা এইভাবে সমাজকে ভেঙেচুরে ফেললেন তাঁরা হলেন ব্রিটিশ পুঁজিপতি সাম্রাজ্যবাদীশ্রেণী এবং তাঁদেরই প্রধান পৃষ্ঠপোষক হলেন বাংলার বনেদী ও নতুন হঠাৎ-জমিদারশ্রেণী।" [১]

মানুষের আশ্রয়ের রূপ ধর্মের থেকে বদলে হল কর্মে। প্রতিষ্ঠা পেল অর্থ যার সম্মান তার। ক্ষমতা যার সমাজ তার। বাঙালি সমাজে এতদিনে বর্ণকৌলীন্যের সমাপ্তি হয়ে ঘোষণা হল বিত্তকৌলিন্যের সূচনা।

এই নয়া নগরী তখন আস্তে আস্তে গড়ে উঠতে শুরু করেছে। ইংরেজদের সংস্পর্শে কলকাতা তখন কাঁচাটাকার মুখ দেখছে। সেই টাকার লোভে বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, মামলা- মোকদ্দমা, চাকরি বাকরির জন্য দলে দলে মানুষ ভিড় জমাচ্ছে এই নতুন শহরে। কলকাতা বৃদ্ধি হয়ে উঠছে কল্লোলিনী তিলোত্তমায়। বৃদ্ধি পেতে শুরু করে কলকাতাকে কেন্দ্র করে মানুষের উন্মাদনা। এই সুযোগে দেওয়ানি-দালালি-মুৎসুদ্দিগিরি করে অনেকের কপাল রাতারাতি ফিরে যেতে থাকে। উদ্বৃত অর্থ তাঁরা বিনিয়োগ করছেন ভূ-সম্পত্তি ক্রয়ে। নতুন শহর কলকাতা হয়ে উঠল এইসব ধনীদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র। টাকাই হয়ে উঠল এইসব শিক্ষাদীক্ষাহীন হঠাৎ নবাবদের শক্তির মূল উৎস। বংশকৌলীন, আভিজাত্যকে পিছনে সরিয়ে, টাকার জোরে সমাজে দাপিয়ে বেড়াতে লাগলেন এই বিশেষ শ্রেণির প্রতিনিধিরা। যারা সমাজের কাছে 'বাবু' সম্প্রদায়ের সাথে পরিচয় ঘটালেন। তাদের চোখের সামনে ভাসত নবাব মহলের আভিজাত্য। স্বপ্ন দেখতেন নবাবি বিলাসিতার। নটীর নুপূরে ও মদের পেয়ালায় তারা দুবিয়ে দিলেন তাদের বৈভবময় জীবনকে। গ্রামের রাজপ্রাসাদ ছেড়ে শহরের অট্টালিকায় আসা এই বাবুরা বুলবুলি, কবির লড়াই, আখড়াই, কবিগান, শখের যাত্রাপার্টি ও মদমেয়ে মানুষের জন্য অর্থব্যয় করতে লাগলেন অনর্গল। খ্যামটা নাচ আর ঝুমুর গানের নেশাসক্তিতে বেসামাল হয়ে রইল নতুন নগরের নাগরিক কালচার। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'কলিকাতা কমলায়', 'নববাবুবিলাস', 'নববিবিবিলাস'-এ আঠারো শতকে কলকাতার কল্লোলিনী হয়ে ওঠা এবং তাকে কেন্দ্র করে নতুন 'বাবু' সম্প্রদায়ের উদ্ভবের ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন। তিনি তাঁর 'নববাবুবিলাস' গ্রন্থে এই নতুন ধনী বাবুদের সম্পর্কে বলেছেন –

> "এই কলিকাতা নামক মহানগর আধুনিক কাল্পনিক বাবুদিগের পিতা কিংবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া স্বর্ণকার বর্ণকার কর্মকার চর্মকার চটকার

> পটকার মঠকার বেতনোপভুক হইয়া কিংবা রাজের সাজের কাঠের খাটের ঘাটের মঠের ইটের সয়দারি চৌকিদারী জুয়াচুরি পোদ্দারী করিয়া অথবা অগম্যগমন মিথ্যাবচন পরকীয়রমনী সংঘটনকামি ভাঁড়ামি ও রাস্তাবন্দ দাস্য দৌত্য গীতবাদ্যতৎপর হইয়া কিংবা পৌরোহিত্য ভিক্ষাপুত্র গুরুশিষ্য ভাবে কিঞ্চিৎ অর্থ সঙ্গতি করিয়া কোম্পানির কাগজ কিংবা জমিদারী ক্রয়াধীন বহুতর দিবসাবসনে অধিকতর ধণাঢ্য হইয়াছেন।” [২]

এই ধনী সম্প্রদায়ের টাকায় কলকাতা যেন প্রাণ পেল। তাদের ধন সম্পত্তির জৌলুস ও বৈভবে বদলে গেল সংস্কৃতির অভিমুখ। বদলে যেতে থাকল তিনটি গ্রামকে নিয়ে গড়ে ওঠা কলকতার স্বরূপ।

অন্যদিকে এই পরিস্থিতিতে সমাজের সাথে যুক্ত হয়েছিলো নতুন এক স্রোতধারা। পাশ্চাত্য চেতনার আলোকে ঘুমন্ত ভারতবাসী জেগে উঠেছিল নতুন প্রভাতে। সমাজের বুকে এই নতুন চিন্তার ঢেউ এই উঠতি বাবুরা আনেননি, আনতে চানও নি। তা চাইলেন অন্য একদল। এই অন্যদল নটীর নূপুরে বা মদের পেয়ালায় ডুব দিলেন না, চোখ খুলে সামনের দিকে তাকালেন। স্বপ্ন দেখলেন এক নতুন সমাজের। এঁরা আলালের ঘরে দুলাল নন, এঁরা মধ্যবিত্ত। বিদ্যাই ছিল এই শ্রেণির প্রধান হাতিয়ার। কিছু কিছু বাঙালির মনে ধীরে ধীরে আসতে লাগল নবচেতনা ও নবজিজ্ঞাসার সূত্র। এতদিন ধরে সমাজকে কড়া শিকলে বেঁধে রাখার জন্য প্রচলিত সতীদাহপ্রথা, কৌলীন্যপ্রথা, দাসপ্রথার মতো হাজারো প্রতিবন্ধকতাকে ঘিরে প্রশ্ন উঠল একের পর এক। যুক্তি জন্ম দিল সংশয়ের। তা থেকে এল জিজ্ঞাসা। এই প্রথম প্রবাহমান সমাজ মুখ থুবড়ে পড়ল। এক্ষেত্র সমাজের মধ্যে দেখা দিল দুটি রেখাপাত বিভাজনের। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাব্ধারা সমাজ জীবনে প্রবেশ করার ফলে প্রাচীন ও নবীন আদর্শের যে ঘোরতর সংঘাত বেঁধেছিল তাতে তৎকালীন জনহিতৈষী সমাজ নায়কদের মধ্যে কেউ কেউ ধারণ করলেন নবীন আদর্শের জয়ধ্বজা, আবার কেউ বা আঁকড়ে রাখলেন প্রাচীন আদর্শের সনাতন দণ্ডটিকেই। এক্ষেত্রে প্রথম দলে নাম লেখালেন রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্ন সিংহের মতো ব্যক্তিরা। অন্যদিকে দ্বিতীয় দলের পাল্লা ভারি করলেন রাধাকান্ত দেব ও ভবানীচরণের মতো ব্যক্তিরা। এই প্রসঙ্গে ‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ’ গ্রন্থে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখছেন-

> “বলিতে কি, ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ (খৃষ্টাব্দ) প্রর্যন্ত এই কাল বঙ্গসমাজের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ তিয়ার।হয়। এই কালের মধ্যে বিধবা বিবাহের আন্দোলন, ইন্ডিয়ান মিউটিনি, নীলের হাঙ্গামা, হরিশচন্দ্রের আবির্ভাব, সোম প্রকাশের অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা, ঈশরচন্দ্র গুপ্তের তিরোভাব ও মধুসূদনের আবির্ভাব, কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশ ও ব্রাহ্ম সমাজে নবশক্তির সঞ্চার

> প্রভৃতি ঘটনা ঘটিয়েছিল। ইহার প্রত্যেকটিই বঙ্গসমাজকে প্রবলরূপে আন্দোলিত করিয়াছিল, প্রত্যেকটিরই ইতিবৃত্ত গভীর অভিনিবেশ সহকারে আলোচনার যোগ্য।" [৩]

রাজধানী কলকাতার যখন এই অবস্থা, তখন কলকাতার বাইরে সুবিস্তৃত পল্লীঅঞ্চল জুড়ে চলছিল বৃহৎ বাংলাদেশে সমাজপতিদের অনিয়ন্ত্রিত শাসন। তারা সমাজের কাছে নিজেদের আভিজাত্যকে বজায় রাখতে ও অস্তিত্বের প্রশ্নে সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে বিরাজ করতে ধর্মরক্ষার নামান্তরে প্রবর্তন করেছিলন নিয়ম, বিধি-নিষেধের, বজ্রআঁটুনি। তার ফলশ্রুতিতেই দেখি কৌলিন্য প্রথা, সতীদাহ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহের মতো কুপ্রথা, দুর্নীতি ও ব্যভিচারের বন্যাস্রোত বয়ে গেছে সমাজের বুকে। সমাজের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত এই সমাজপতিরাই তৈরি করেছিলেন হাজারো প্রতিবন্ধকতার নিয়ম। যার জালে জর্জরিত হয়ে পড়েছিল অগণিত সাধারণ মানুষ। এক্ষেত্রে তাদেরকে উদ্ধার করে, কুসংস্কার আচ্ছন্ন অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে যুক্তির বিচারে ও মুক্তির আলোতে তাদেরকে নতুন করে বাঁচার রসদ জোগাতে যে সমস্ত সংস্কারকরা এই মানুষদের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। তাই শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্যে নয়, বাংলা সমাজেও মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ একটি অন্যন্য নাম। সাহিত্যের মতো সমাজেও তাঁর প্রচেষ্টা ছিল বহুমুখী। তাঁর এই সমাজ চেতনা ও সমাজ হিতৈষণার ছবি যে সমাজের সর্বস্তরেই প্রসারিত হয়ে পড়েছিল তা আমরা একটি পর্যায়ক্রমে পরিচয় গ্রহণ করবার চেষ্টা করব। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পরিচালিত বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ, বহুবিবাহ নিবর্তন আন্দোলনে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা, কৌলীন্য প্রথা রহিতকরণে চেষ্টা, কলকাতার বারবনিতাদের বাসস্থান নির্দেশ করণে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব, কৃষকদের কৃষি বিষয়ে উৎসাহ প্রদান, শিক্ষা বিস্তারে তাঁর সহযোগিতা, সমাজের সার্বিক উন্নতির জন্য প্রধান স্তম্ভ সাহিত্য ও সংবাদপত্রে উন্নয়নে দান, দুর্ভিক্ষ ও নানা জনহিতকর কার্যে সরাসরি যুক্ত হওয়া, নীল চাষীদের অকৃত্রিম বন্ধু হয়ে পাশে থাকা, সমাজব্রতী হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সাথে শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার সম্বন্ধ স্থাপন করা ও সর্বপরি জমিদার হলেও প্রজার পক্ষ অবলম্বন করা। এই বিষয়গুলি আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সমাজচেতনা ও সমাজকর্মে উদ্যোক্তা কালীপ্রসন্ন সিংহকে এক নতুন আঙ্গিকে খুঁজে দেখার চেষ্টা করব।

এই আলোচনার প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা যায় উনিশ শতকে আইন করে সতীদাহ প্রথা নিবারিত হওয়ার পর বাঙালি সংস্কারকদের কাছে বিধবা বিবাহ প্রশ্নটি বিশেষভাবে উৎসাহিত করে তোলে। এই সূত্রে আধুনিক বাংলার সচেতন ব্যক্তিত্ব রামমোহন দেখা দিলেন নারী মুক্তি আন্দোলনের পুরোধা হিসেবে। রাজা রামমোহন রায় যদিও প্রকাশ্যে বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের জন্য কোন চেষ্টা করেছিলেন, বা বিধবা বিবাহ সমর্থনে কিছু বলেছিলেন কিনা তা জানা যায় না। তবু, তিনি **১৮১৫** খ্রিস্টাব্দে যে আত্মীয় সভার স্থাপন করেন, তার বৈঠকে যে বাল্য বৈধব্য ও বাল্যবিবাহ বিষয়টিও আলোচনায়

আলোচ্য ছিল তার তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়াও ১৮২৮-২৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্র শিষ্যদের Academic Association-এর বৈঠকেও বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার আলোচনা প্রসঙ্গে নিয়মিতভাবে বিধবা বিবাহ ও বাল্যবিবাহ বিষয়টিও স্থান করে নিয়েছিল তর্কবিতর্কের আসরে। এই আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের বহু পূর্ব থেকেই বাংলার বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্তভাবে চেষ্টা চলেছিলো বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের। যার শিলমোহর এসে পরে কালীপ্রসন্ন সিংহের সহযোগিতায় বিদ্যাসাগরের হাত ধরে। এছাড়াও একটু সন্ধান করলেই দেখা যায় ১৮৩৭-এ 'জ্ঞানান্বেষণে' প্রকাশিত সংবাদে মতিলাল শীল, হরধর মল্লিক প্রমুখ কলকাতার কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ স্ত্রী শিক্ষা ও বিধবা বিবাহ প্রচলনে উৎসাহ দেবার জন্য মনস্থ করেন এক সভা আয়োজনের। এছাড়াও তার সাথে যুক্ত হয় সেই সময়ের 'বেঙ্গল হরকরা', 'ক্যালকাটা কুরিয়ার', 'ইংলিশম্যান', 'ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া', 'রিফর্মার', 'সমাচার দর্পণ', 'জ্ঞানান্বেষণ' প্রভৃতি পত্রিকাগুলি। এদের উদ্যোগে যেমন বিধবা বিবাহের সপক্ষে লেখালেখি শুরু হয়, তেমনই এই প্রস্তাবের বিপক্ষে বিরুদ্ধতা করতে থাকে 'সমাচার চন্দ্রিকা'র মতো কিছু পত্রিকা। এই প্রসঙ্গে পুরোধা ব্যক্তিত্ব রূপে এগিয়ে এলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। যিনি তাঁর সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে এক পত্রে লেখেন – 'বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম'। এই প্রেক্ষিতে বিধবাবিবাহ ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের চেষ্টা এবং কালীপ্রসন্নের সহযোগিতা বিশেষভাবে আলোচ্য। প্রথমে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায়' কয়েকটা প্রবন্ধ লিখে বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ সমর্থনে তাঁর মত প্রকাশ করেন। তারপর ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে তাঁর 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' নামক বইটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশে উপস্থিত হয় এক তুমুল আন্দোলনের। সেই সময় বাংলার প্রায় অধিকাংশ সংবাদপত্রই যখন নিন্দা করতে তৎপর হয়ে ওঠে তখন কেবল সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দেন 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা, 'সম্বাদ ভাস্কর', 'মাসিক পত্রিকা' এবং কালিপ্রসন্ন সিংহের 'বিদ্যোৎসাহিনী' পত্রিকা। আবার যশোহর 'হিন্দু ধর্মরক্ষিনীসভা' এবং 'কলকাতা ধর্মসভা' যখন বিদ্যাসাগরের মতকে আক্রমণ করতে থাকে প্রবলভাবে, তখন কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' বিদ্যাসাগরের আন্দোলনকে প্রবলভাবে সমর্থন জানাতে থাকে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, কালীপ্রসন্নের সহযোগিতায় বিদ্যাসাগর ক্ষান্ত হলেন না শুধুমাত্র মত প্রকাশ করেই, বিধবা বিবাহের ফলে জাত সন্তান যাতে সমাজের কাছে স্বীকৃতি হয় বৈধ সন্তান রূপে সেজন্য ১৮৫৫, ৪ অক্টোবর সরকারের কাছে প্রেরণ করা হয় ১০০০ ব্যক্তির স্বাক্ষর সম্বলিত একটি দীর্ঘ আবেদন পত্র। সেখানে দেখা যায় কালীপ্রসন্ন সিংহের উদ্যোগে বিদ্যোৎসাহিনী সভা থেকে এই আন্দোলনের সমর্থনে আদালতে পেশ করা হয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির স্বাক্ষর যুক্ত একটি আবেদন পত্র। এই সম্পর্কে 'বিদ্যোৎসাহিনী' পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায়-

"বিদ্যোৎসাহিনী সভা বিধবাবিবাহ পক্ষে লেজিসলেটিব কৌন্সেলে যে দরখাস্ত দিতে ইচ্ছা করিতেছেন তাহাতে তিন সহস্র ভদ্রলোকের স্বাক্ষর হইয়াছে, যদ্যপি কেহ স্বাক্ষর করেন ইচ্ছার কারণে বিদ্যোৎসাহিনী সভায় আগমন করিলেই স্বাক্ষর পুস্তক পাইবেন।" [৪]

এইসব আবেদনে ও যুক্তি তর্কের বাদানুবাদে শেষ পর্যন্ত ভারত সরকার ১৮৫৬, ২৬ জুলাই বিধবাবিবাহ প্রস্তাব সমর্থনে এটিকে একটি বিধিবদ্ধ আইনের পরিনতি দান করেন। এরপরই এই আইনকে কাজে লাগিয়ে বিধবাদের নতুন করে জীবন দানের প্রচেষ্টায় আরও উদ্যোগী হয়ে কালীপ্রসন্ন সিংহ সেই বছরই নভেম্বর মাসে সংবাদপত্রে ঘোষণা করেন যে, যারা বিধবা বিবাহ করতে ইচ্ছুক হবেন, বিদ্যোৎসাহিনী সভা স্বীকৃত হবে তাদের প্রত্যেকে এক সহস্র টাকা পুরস্কার দিতে। এই বিষয়ে ২২ নভেম্বর ১৮৫৬ 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার একটি বিজ্ঞাপনে পাওয়া যায়-

বিজ্ঞাপন।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা বিধবাবিবাহেচ্ছু ব্যক্তিবর্গকে জ্ঞাত করিতেছেন যে ১৭৭৭ শকীয় ঊনবিংশ সভায় সভার অধ্যক্ষ মহোদয়গণ প্রতি বিবাহে এক এক সহস্র মুদ্রা প্রদানে স্বীকৃত হইয়াছেন, অতএব প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ পত্রে স্বাক্ষরিত হইলেই বিবাহের পূর্ব্বে বিদ্যোৎসাহিনী সভা সঙ্কল্পিত অর্থ প্রদান করিবেন।

শ্রী কালীপ্রসন্ন সিংহ
বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক

কিন্তু প্রশ্ন উদ্যোগ তো নেওয়া হল, আইন তো পাশ হল, কিন্তু সমাজের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে বিধবাকে বিয়ে করবে কে? আর কেই বা নিজের বিধবা মেয়ের বিয়ে দেবে? বিদ্যাসাগর ও কালীপ্রসন্ন তাই বলে নিরাশ হলেন না। চেষ্টা চালাতে লাগালেন অবিরত। এই প্রসঙ্গে 'বাংলায় নব চেতনার ইতিহাস (১৮২৬-১৮৫৬)' গ্রন্থে স্বপন বসু জানাচ্ছেন-

> "অবশেষে আইন পাশ হবার মাস চারেক পরে করে পাত্র-পাত্রী সন্ধান মিলল। ঘটখালী করলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার। আইনসিদ্ধ হবার সাড়ে চার মাস পরে ৭ ডিসেম্বর, ১৮৫৬ -এ বিদ্যাসাগর বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুকিয়া স্ট্রীটের ১২ নম্বর বাড়িতে, প্রথম বিধবাবিবাহের আসর বসল। পাত্র রামধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, পাত্রী বর্ধমানের পলাশ ডাঙ্গার ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের এগারো বছরের বিধবা মেয়ে কালীমতী দেবী।" [৫]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য কালীপ্রসন্ন সিংহ ও সর্বক্ষেত্রে বিধবা বিবাহকারীকে হাজার টাকা পারিতোষিক প্রদান করতে পারেননি, বা বলা ভালো চাননি। কারণ বিধবাবিবাহ আইন পাশ হবার পর যখন রক্ষণশীল সমাজের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় পাওয়া গেল তখন কিছু লোক অর্থলোভে বিধবা বিবাহে অগ্রসর হলেও অর্থ প্রাপ্তির পর বিবাহের অল্প কিছুদিনের পরেই বিলম্ব করতেন না স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে। আসলে এদের মধ্যে

অনেকেই অর্থের লোভে বিধবাবিবাহের নামে করেছেন বহুবিবাহ। বিধবাবিবাহ আন্দোলনের ফলাফল বিচারে আজ অবশ্য আমাদের এ কথা স্বীকার করিতেই হবে যে, বিদ্যাসাগরের এই প্রাণান্তকর পরিশ্রম ও অর্থব্যয় এবং কালীপ্রসন্নের বিশেষ সহযোগিতায় বেশ কিছু বিধবা সমাজে নতুনভাবে বাঁচতে শিখেছিল বটে, তবে তা বিশেষ প্রচলন হয়নি। তাঁরা দুজনেই বুঝেছিলেন বহুবিবাহ রহিত না হলে এবং মানুষের মনে সামাজিক দায়িত্ববোধ না জাগলে শুধুমাত্র আইনের হুমকিতে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হলেও তা সার্থক হবে না। কারণ আইনের উপরেও প্রয়োজন মানুষের মানসিকার পরিবর্তনের। তা যে হয়নি সেই সময় বাঙালি সমাজ জীবনই তার সাক্ষ্যবহ। অন্যদিকে ইতিবাচক প্রসঙ্গে বলা যায়, এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সমাজের কাছে এই বার্তা প্রেরণ করা গিয়েছিল যে, স্ত্রীজাতি শুধু পুরুষের ভোগ্যপণ্য সেবাদাসী নয়, তাদেরও আছে সুখ-দুঃখ, স্বাধীনসত্তা। এই সত্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে উনিশ শতকের বুকে মানবতাবোধের উত্তরণের কয়েকধাপ এগিয়ে দিতে পেরেছিলেন এই সংস্কারকরা।

বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের পরে এল কৌলিন্যপ্রথা নিবর্তনের জন্য লড়াই। এই লড়াই-এও বিদ্যাসাগরের সাথে একই পথে এসে দাঁড়িয়েছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। বাংলাদেশে কৌলিন্য প্রথার অত্যাচার যে কি বীভৎস ছিল, বর্তমান পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায় তা আঁচ করা যাবে না। পূর্ববঙ্গে কুলীনের চাহিদা এত বেশি বৃদ্ধি পেল যে দশবছর বয়স হলেই আলোচিত হতো কুলীন সন্তানের বিবাহের কথা। এবং বিশ বছর বয়সের পূর্বেই সেই কুলীন সন্তান বহুপত্নী লাভের সমর্থ হতেন। সমাজ ভরে গেল নানাপ্রকার অনাচার ও দুর্নীতিতে। কৌলীন্যপ্রথার ফলে হতে থাকল একদিকে বালিকার সঙ্গে বৃদ্ধের বিবাহ, অন্যদিকে বিগতযৌবনার সঙ্গে বালকের বিবাহ। কৌলিন্যের প্রভাবে চারমাস থেকে সত্তর বছর পর্যন্ত সমবয়সী সমমেলের আইবুড়ো মেয়েকে একপাত্রে সমর্পণের ঘটনা যেমন ঘটত, তেমনই সাত বছরের ছেলের ঘাড়েও চাপিয়ে দেওয়া হত তিরিশ থেকে ষাট বছর পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সী আট নয়টি স্ত্রী। শুধু তাই নয়, এই ভয়ংকর দৃষ্টান্তেরও হদিশ পাওয়া যায় যে, একই দিনে একটি কুলীন পাণিগ্রহন করেছেন চার বা ততোধিক কন্যার। এমনকি এও শোনা যায়, কোন গৃহকর্তা পাত্রে অভাবে তার সমস্ত অবিবাহিতা ভগ্নী ও কন্যাদের সমর্পণ করেছেন একই কুলীনের হাতে। বিবাহের পর এইসব পত্নীদের মধ্যে অধিকাংশেরাই সারা জীবন কাটাতেন পিত্রালয়ে। এবং তাদের গর্ভজাত সন্তানরাও পালিত হতেন মাতুলালয়ে। এমনকি কুলীন পিতারা সব সময় তাদের চিনতেও পারতেন না। এই প্রসঙ্গে 'উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি গ্রন্থে' অমিতাভ মুখোপাধ্যায় বলছেন-

> "অনেক কুলীন কন্যা বিয়ের রাতেই প্রথম ও শেষবারের মতো স্বামীর মুখ দেখতেন। না, ভুল বললাম, ভাগ্যবতী যাঁরা, তাঁরা, বিবাহবাসরের পর সহমরণে যাবার সময় দ্বিতীয়বারও এই সুযোগ

> পেতেন! শেষ নিঃশাস ফেলা পর্যন্ত কুলীনদের বিয়ে করার কথা গল্পকথা নয়।” [৬]

এমনকি বিবাহে রাত্রে স্ত্রীর কাছে আলাদা অর্থ উপহার না পেলে অনেক কুলীন অস্বীকার করতেন স্ত্রীদের সাথে এক শয্যায় শুতে - এমন চিত্রও সমকালীন বিভিন্ন পত্রিকায় খোঁজ করলেই পাওয়া যায়। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর ‘বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার’ গ্রন্থে যে তালিকা দিয়েছেন তা দেখলে অবাক হতে হয়। সেখানে উল্লেখ রয়েছে, হুগলি জেলার ছিয়াত্তরটি গ্রামে ১৩৩ জন কুলীনের পত্নী ছিল ২১৫১ জন। সত্যিই আজকের সময় দাঁড়িয়ে এই সংবাদ বিস্মিত করে তোলে আমাদের। সেই সঙ্গে বিদ্যাসাগর এও বলেছেন যে, যেসব কুলীনের পত্নী সংখ্যা পাঁচ-এর কম ছিল, তিনি তাদের তালিকাভুক্ত করেননি। একগাছি পৈতার জোড়ে দরিদ্র কুলীন ব্রাহ্মণরা যেভাবে সহস্র সহস্র বঙ্গনারীর সর্বনাশ করেছেন অথবা সর্বনাশের আশায় বসেছিলেন, সত্যি তার তুলনা নেই। এসবের ফলে সমাজদেহ যে কলুষিত হচ্ছিল তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখেনা। এর ফলশ্রুতিতে অনেক কুলীনের মেয়েকে শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করতে হতো বেশ্যাবৃত্তি। একটি সমীক্ষায় জানা যায়, কলকাতার চীফ ম্যাজিস্ট্রেটের হিসেব অনুযায়ী ১৮৫৩ সালে কলকাতার ১২,৪১৯ জন দেহোপজীবিনীর মধ্যে অনেকেই ছিলেন কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যা। এই চিত্রকে তুলে ধরতে স্বপন বসু তাঁর ‘বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস (১৮২৬-১৮৫৬)” গ্রন্থে দেখান –

> “উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ যারা অর্থলোভে অথবা পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য ২০/৩০ টি বিবাহ করে, তাদের স্ত্রীদের দুঃখের শেষ থাকে না। স্বামীর মৃত্যুর পর এঁদের সামনে দাসীবৃত্তি করা, বাঁচার জন্য পাপের পথে পা বাড়ান, বা ‘সতী’ হওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ থাকে না । বাংলাদেশে এই বহুবিবাহের ফলে আত্মহত্যার সংখ্যাও বহুগুণ বেড়ে যায়।” [৭]

কৌলীন্য প্রথার এই মর্মান্তিক সামাজিক অবস্থায় বিদ্যাসাগরের সঙ্গে একইসাথে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহও। তিনি ১৮৫৫ সালের মে মাসে বাল্যবিবাহ ও কৌলীন্যপ্রথার বিরুদ্ধে প্রবন্ধ রচনা করে প্রকাশ করেন স্বপ্রতিষ্ঠিত ‘বিদ্যোৎসাহিনী’ পত্রিকায়। এই বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় কালীপ্রসন্ন কৌলীন্য প্রথা সম্বন্ধে বলেন-

> “... যদ্যপি এক্ষণে অনেক ব্যক্তির মনোমধ্যে কৌলীন্য প্রথা রহিত, বিধবাদিগের পুনরুদ্বাহদান, এবং এক স্ত্রী বিদ্যমানে পত্ন্যন্তর পরিগ্রহ নিষেধাদি পরম মঙ্গলাকর কার্য্যসফল কর্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু তাঁহারা কেবল লোক নিন্দাভয়ে এতদনুষ্ঠানে সাহসী হইতেছেন না। সকলে যাবৎ না সাহস পূর্বক ঐকমত অবলম্বন করিয়া এইসকল বিষয় প্রচলন করিবেন তাবৎ অস্মদেশের দুরবস্থা সকল

> নির্বাসিত হইতে পারিবে না। অতএব সকলেরই হিতকর নিয়ম স্থাপনে যত্নবান হওয়া কতব্য।” [৮]

এই কারণে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের ১ ফেব্রুয়ারি আইন প্রণয়ন করে কৌলীন্যপ্রথা রহিত করার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় যে আবেদনপত্র প্রেরিত হয়েছিল, কালীপ্রসন্ন ছিলেন তারও অন্যতম উদ্যোক্তা।

ইতিপূর্বে আলোচিত সমাজ পরিবর্তনের বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনে কালীপ্রসন্ন সিংহ যেমন অংশগ্রহণ করেছিলেন সক্রিয়ভাবে, তেমনই তার পাশাপাশি ‘বিদ্যোৎসাহিনী সভা’র পক্ষ থেকে তিনি উদ্যোগী হয়ে কলকাতার ভদ্রপল্লীর মধ্য থেকে বেশ্যাগণের বসবাসকে তুলে নিয়ে গিয়ে সচেষ্ট হয়েছিলন নগর প্রান্তে তাদের একটি স্বতন্ত্র বাসস্থান নির্দেশকরনের কাজে। এই সম্বন্ধে ‘বিদ্যোৎসাহিনী’ সভার পক্ষ থেকে যে আবেদনপত্র ব্যবস্থাপক সভায় পাঠাবার জন্য প্রস্তাব হয়েছিল তা প্রকাশিত হয় ১৯ নভেম্বর ১৮৫৬ তারিখে ‘সংবাদ প্রভাকরে’র পাতায়। এবং ২২ নভেম্বর ১৮৫৬ -এ তার অনুলিপি প্রচারিত হয় ‘সম্বাদ ভাস্কর’ পত্রিকাতেও। তাঁর এই আবেদনের মাধ্যমে বুঝতে পারা যায় তৎকালীন কলকাতার নাগরিক সমাজের অবক্ষয় ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে কালীপ্রসন্ন সিংহ কতটা চিন্তাবহুল ছিলেন। তিনি বলেছেন – উঠ্‌তি বাবুরা সমস্ত রাত্রি মদ্যপান করে গীতবাদ্যের কোলাহলে এত বেশি উৎপাত করতে আরম্ভ করেন যে ভদ্রলোকেরা বাধ্য হন সেই গ্রামে বাস পরিত্যাগ করতে। এই অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে গৃহে যেমন কলহের মাত্রা বেড়ে শান্তিভগ্নের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, ঠিক তেমনই এটি পৌঁছেছিল জীবনসংহারের পর্যায়েও। কালীপ্রসন্নের এই উদ্যোগ ও আবেদনের ফলে অবশেষে ভদ্রপল্লীর মধ্যে বেশ্যাদের বসবাস বন্ধ করে নগরপ্রান্তে সোনাগাছি প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ স্থানে নির্দিষ্ট করা হয় তাদের স্বতন্ত্র বাসস্থানের। একদিকে বিধবাবিবাহ প্রবর্তন, বহুবিবাহ নিবর্তন, কৌলীন্যপ্রথা রদ করার চেষ্টার পাশাপাশি বারবনিতাদের জন্য একটি স্বতন্ত্র বাসস্থানের নির্দিষ্ট করার মাধ্যমে আমরা পরিচয় পাই কালীপ্রসন্ন সিংহের নারীসমাজ সম্পর্কে সময় অগ্রগতি যুক্তিপূর্ণ ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির।

এই বিষয়গুলি ছাড়াও কালীপ্রসন্ন যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন দেশের শিক্ষাবিস্তারের উদ্যোগে। এই প্রসঙ্গে আমাদের স্বাভাবিকভাবেই নজর দিতে হয় সেই সময় দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কিরূপ ছিল। সেই সময় ইংরেজি শিক্ষার প্রচলনে অনেকেই কৃতবিদ্য হয়েছিলেন বটে, তবে তা এই বৃহৎ রাজ্যের অসংখ্য মানুষের বিদ্যাশিক্ষার তুলনায় ছিল অতি নগণ্য। বেশিরভাগ মানুষ-ই ডুবে ছিলেন অজ্ঞানতার অন্ধকারে। সেই সময় বেশ কিছু বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে এই অন্ধকার দূরীভূত করার চেষ্টা করলেও সরকারি আগ্রহ ও অর্থ সাহায্য এতটাই অকিঞ্চিৎকর ছিল যে, তা যেন ক্ষুধিতের সামনে কণামাত্র অন্ন পরিবেশন করে তার ক্ষুধাকে আরো বাড়িয়ে দেওয়ার নামান্তর ছিল। সেই সূত্রে বলা যায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগর উদ্যোগী হয়ে বিভিন্ন জায়গায়

৩৫ টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলেও সরকারের নিয়মিত অর্থপ্রদান ও সাহায্যে অস্বীকৃত হওয়ায় নতুন স্কুল স্থাপন করা তো দূরের কথা, বন্ধ হয়ে যায় চালু হওয়া বিদ্যালয়গুলিও। বিদ্যাসাগর যদিও ব্যক্তিগত চেষ্টায় কিছু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির থেকে চাঁদা তুলে আর্থিক সাহায্য দানের মাধ্যমে কোনোরকমে ব্যবস্থা করেন বিদ্যালয়গুলিকে টিকিয়ে রাখার। কিন্তু তা-ই বা কতদিন। দেশের শিক্ষার যখন এই রকম অবস্থা তখন, কালীপ্রসন্ন সিংহ বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করেন অবৈতনিক বিদ্যালয় এবং কোন কোন দুঃস্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাহায্যদান করে দেশবাসীর কৃতজ্ঞভাজন হন। এখানে উল্লেখ্য ভারত সরকার যখন ৩৫ টি বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যয়নির্বাহের অক্ষমতা প্রকাশ করেন, তখন কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার নিজের প্রচেষ্টাতে স্থাপন করেন 'বিদ্যোৎসাহিনী পাঠশালা' সমেত সাতটি অবৈতনিক বিদ্যালয়। এবং একটি বিদ্যালয়ের মাসিক একশত টাকা বেতনে ইংরেজি শিক্ষক ও পন্ডিতও নিযুক্ত করেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহের সামাজিক হিতকারী পদক্ষেপ কেবল নারীমুক্তি ও শিক্ষা অগ্রগতির ধারায় নয়; তিনি সরব হয়েছিলন জমিদার শ্রেণির বিভিন্ন অত্যাচারের বিরুদ্ধেও। সেকালের ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাবো, ১৮৪২ সাল থেকে পরবর্তী তিন-চার দশক জুড়ে ফরিদপুর, পাবনা, নদিয়ায় এবং বিক্ষিপ্তভাবে বাংলার সর্বত্র জায়গাতেই চলেছে প্রজা বিদ্রোহ। প্রজারা এই বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন কখন জমিদারদের বিরুদ্ধে, কখন নীলকরদের বিরুদ্ধে আবার কখন বা উভয়ের বিরুদ্ধেই। কিন্তু প্রশ্ন, কেন ঘটতো ঘন ঘন এই প্রজা বিক্ষোভ? তার কারণ জানতে হলে জ্ঞাত থাকা প্রয়োজন প্রজা নিপীড়নের নির্মম ইতিহাস। এ সম্বন্ধে ১৭৭২ শকাব্দের (১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দ) 'তত্ত্ববোধিণী পত্রিকা'য় 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা' শিরোনামে যে ধারাবাহিক রচনা প্রকাশিত হয় তাতে পাওয়া যায় বাঙালি জমিদারের লোমহর্ষক অত্যাচারের বিবরণ। সেখানে জানা যায় যে, জমিদাররা প্রজাদের স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি দূরে থাকুক, তাদের শরীরও নিজেদের অধিকারভুক্ত জ্ঞান করতেন। সেই হিসেবে তাদের কায়িক পরিশ্রমও নিজেদের মনে করে দয়া করতেন তাদের উপর। এই পরিস্থিতিতে কালীপ্রসন্ন সিংহ একজন জমিদার হয়েও সামিল হয়েছিলেন প্রজাদের দুঃখ লাঘবে। দুঃখের বিষয়, ঐ সময়ের পুরাতন সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্রের অনেক সংখ্যা দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় বহু চেষ্টা করেও আরোহন করা সম্ভব হয়নি কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রজাদরদি পদক্ষেপের বিবরণ। তবুও এ সমন্ধে 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে শিবনাথ শাস্ত্রীর একটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে –

> "...সাধারণের কল্যানকর কার্য্যে তাঁহার বিলক্ষণ যত্ন ছিল। তিনি দয়ার সাগর ও বদান্যতার আকর ছিলেন। এই নিমিত্ত জমিদার হইয়াও প্রজার পক্ষ অবলম্বন করেন।" [৯]

এই একটিমাত্র তথ্যই জমিদারদের বিরুদ্ধে কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রজাদের পক্ষ অবলম্বনের সত্যভাষী স্বাক্ষ্যরূপে বিবেচিত হতে পারে।

এই বিষয়গুলি ছাড়াও সমাজের সার্বিক উন্নতির উদ্দেশ্যে তিনি দান করেছেন অকাতরে। এমনকি সাহিত্য ও সংবাদপত্রের উন্নয়নের জন্যও তিনি ছিলেন যথেষ্ট সচেষ্ট। বিভিন্ন সময়ে প্রতিযোগীমূলক প্রবন্ধ ও কবিতা রচনার জন্য পুরস্কার ঘোষণা ও বহুলেখকের নতুন গ্রন্থ প্রকাশের সাহায্য ছাড়াও কালীপ্রসন্ন সিংহ 'সোমপ্রকাশ', 'তত্ত্ববোধিনী', 'ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্র', 'মুখার্জিস ম্যাগাজিন', 'দূরবীন, 'বেঙ্গলী', 'হিন্দুপেট্রিয়ট' প্রভৃতি বাংলা, ইংরেজি ও উর্দু সংবাদপত্র প্রকাশেও সাহায্য করেছেন প্রভূত অর্থ। তাঁর সমাজসেবার আরো একটি প্রধান পরিচয় ছড়িয়ে আছে দুর্ভিক্ষে দান ও নানা জনহিতকর কার্যে দানের মধ্য দিয়ে। এই প্রসঙ্গে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তাতে মুক্ত হস্তে দান করেছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। তার সাথে সাথে 'মনুষ্যের প্রকৃত মহত্ব কোথায়' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেন বিনামূল্যে দুর্ভিক্ষ দমনে এগিয়ে আসতে। এছাড়াও তাঁর জনহিতকর কার্যের নমুনায় চোখ রাখতে গিয়ে নজরে আসে নিজের অর্থ ব্যায়ে দাতব্য ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গও। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে চিৎপুরে একটি দাতব্য ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা করে কালীপ্রসন্ন সিংহ যে স্থানীয় জনসাধারণের অসুবিধা দূর করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন সে সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায় ১২৭২ সালে কার্তিক সংখ্যায় 'বামাবোধিনী' পত্রিকায়। তাছাড়াও কলকাতায় যখন বিশুদ্ধ পানীয় জলের কোন পরিকল্পিত ব্যবস্থা হয়নি, তখন তিনি মনোস্থির করেন বিলাত থেকে চারটি ধারাযন্ত্র নিয়ে এসে শহরের বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করবেন। সেই সময় কলকাতা শহরে এই সুখ যখন পর্যাপ্ত ছিল না, হাত বাড়ালেই যখন পাওয়া যেত না জল এবং অসুখ-বিসুখের প্রাদুর্ভাব যখন লেগেই থাকত বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে, তখন কালীপ্রসন্ন সিংহের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এই উদ্যোগ বাহবার দাবিদার।

এইভাবে তৎকালীন সমাজব্যবস্থার পটভূমিতে কালীপ্রসন্নের সমাজকর্মের ধারাবাহিক ইতিহাসের আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, হঠাৎ কোন উত্তেজনা বা ভাবাবেগের বসে নয়, একটি সুস্থ, পরিচ্ছন্ন সামাজিক দায়িত্ববোধের দ্বারা পরিচালিত হয়েই তিনি তাঁর স্বল্প জীবনে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীস্বার্থ, প্রজাস্বার্থ ইত্যাদি বিভিন্ন দিকে অব্যাহত রেখেছিলেন তাঁর চিন্তা ও প্রচেষ্টাকে। সমাজের কাছে স্বাক্ষর রেখে গিয়েছিলেন সময় অগ্রবর্তী চিন্তা ও মানসিকতার। উনিশ শতকের বুকে রেখে যাওয়া তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলি মহাত্মার ভূমিকায় চিরকাল শিক্ষা দিয়ে গেছে ও যাবে আগামীকে। আগামী প্রজন্ম ও সময়কে।

তথ্যসূত্র :

১।	ঘোষ, বিনয়, ২০০9, বাংলার নবজাগৃতি, কলকাতা, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা – ৫

২। সর, রমেনকুমার (সম্পা.), ২০১৩, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা-সংগ্রহ, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃষ্ঠা – ১৭২
৩। শাস্ত্রী, শিবনাথ, ১৯৫৭, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, কলকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা – ৬২
৪। সংবাদ প্রভাকর, ১২ মে, ১৮৫৬, পৃষ্ঠা – ৩৪
৫। বসু, স্বপন, ২০০৯, বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস (১৮২৬-১৮৫৬), কলকাতা, পুস্তক বিপণি, পৃষ্ঠা – ১৪৮
৬। মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ, ১৯৭১, উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, পৃষ্ঠা – ৩১
৭। বসু, স্বপন, ২০০৯, বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস (১৮২৬-১৮৫৬), কলকাতা, পুস্তক বিপণি, পৃষ্ঠা – ১৫৬
৮। বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা, মে, ১৮৫৬, পৃষ্ঠা – ৪৪
৯। শাস্ত্রী, শিবনাথ, ১৯৫৭, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, কলকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা – ১৫০

সহায়ক গ্রন্থ :

ঘোষ, বিনয়, ২০০৯, বাংলার নবজাগৃতি, কলকাতা, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড

ঘোষ, মন্মথনাথ, ১৩২২, মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ, কলকাতা

বসু, দীপেন্দ্রনাথ, ১৪১৯, কালীপ্রসন্ন সিংহ : জীবন ও সাহিত্য, কলকাতা, অক্ষর প্রকাশনী

বসু, স্বপন, ২০০৯, বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস (১৮২৬-১৮৫৬), কলকাতা, পুস্তক বিপণি

বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, দাস, সজনীকান্ত (সম্পা.), ১৪২১, হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা, সমাজ কুচিত্র, পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব, কলকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, ১৩৫০, সাহিত্যসাধক চরিতমালা, কলকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

বসু, স্বপন, চৌধুরী, ইন্দ্রজিৎ (সম্পা.), ২০০৩, উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি, কলকাতা, পুস্তক বিপণি

মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ, ১৯৭১, উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি, ঢাকা, বাংলা একাডেমী

শাস্ত্রী, শিবনাথ, ১৯৫৭, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, কলকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

সর, রমেনকুমার (সম্পা.), ২০১৩, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা-সংগ্রহ, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

সেন, সুকুমার, ১৩৯৮, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স

পত্র পত্রিকা :

বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা, মে, ১৮৫৬

সংবাদপ্রভাকর পত্রিকা, ১২ মে, ১৮৫৬

সমীর রক্ষিতের ছোটোগল্পে মহানগর : জীবন ও জীবিকার লড়াই

সৈকত মাহাতো
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

সারসংক্ষেপ: স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে আমাদের দেশে নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার যে বিপুল পরিবর্তন লক্ষ করা যায়, সেই আঁচের উত্তাপ থেকে রক্ষা পায়নি মহানগর কলকাতাও। একদিকে বেকারত্ব বৃদ্ধি, খাদ্যাভাব ও অপরদিকে উদ্বাস্তু সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়ে তিলোত্তমা। ফলে নগরের বুকে জীবিকারা সন্ধানে আসা মানুষজনেরা হয়ে ওঠে অনেকবেশি স্বার্থপর। কৃত্রিমতা বাসা বাঁধে তাদের হৃদয়ে। এর অদৃশ্য প্রভাব আজও শহরের আনাচে-কানাচে, পথচলতি মানুষজনের মধ্যে লক্ষ করা যায়। বহু সাহিত্যিক এই দায়কে স্বীকার করে নিয়েই, সমাজের বুকে সাহিত্য সৃষ্টি করে চলেছেন। গল্পকার সমীর রক্ষিত তাদেরই একজন। শিক্ষালাভ ও জীবিকার উদ্দ্যেশ্যে জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতার বুকে পা রাখেন তিনি, পরবর্তীতে আর ফিরে যাননি ফেলে আসা ভিটেমাটিতে। আজও প্রত্যহ নতুন ভাবে দেখেন মহানগর কলকাতাকে। অনুধাবন করার চেষ্টা করেন এখানকার মানুষের প্রতিদিনের দিনযাপনকে। ফলশ্রুতি স্বরূপ তাঁর নগরকেন্দ্রিক লেখাগুলিতে কলকাতা ভিন্নভিন্ন রূপে ধরা দিয়েছে। নগরের বুকে প্রতিদিন হেঁটে চলা মানুষজনের জীবনের কাহিনি জায়গা করে নিয়েছে তাঁর গল্পে; যা গল্পকারের গল্পগুলিকে আরও সমৃদ্ধশালী ও বাস্তবমুখী করে তুলেছে।
সূচকশব্দ: সমীর রক্ষিত, ছোটোগল্প, মহানগর, সামাজিক শোষণ, অর্থনৈতিক শোষণ।

মূল আলোচনা:

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে আমাদের দেশে নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার যে বিপুল পরিবর্তন লক্ষ করা গিয়েছিল, সেই আঁচের উত্তাপ থেকে রক্ষা পায়নি মহানগর কলকাতাও। একদিকে বেকারত্ব বৃদ্ধি, খাদ্যাভাব ও অপরদিকে উদ্বাস্তু সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়েছিল তিলোত্তমা। ফলে নগরের বুকে জীবিকারা সন্ধানে আসা মানুষজনেরা হয়ে উঠেছিল অনেকবেশি স্বার্থপর। কৃত্রিমতা বাসা বেঁধেছিল তাদের হৃদয়ে। যার অদৃশ্য প্রভাব আজও শহরের আনাচে-কানাচে, পথচলতি মানুষজনের মধ্যে লক্ষ করা যায়। আজও বহু সাহিত্যিক এই দায়কে স্বীকার করে নিয়েই, সমাজের বুকে সাহিত্যসৃষ্টি করে চলেছেন। গল্পকার সমীর রক্ষিত তাদেরই একজন। শিক্ষালাভ ও জীবিকার উদ্দ্যেশ্যে জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতার বুকে পা রেখেছিলেন তিনি, পরবর্তীতে আর ফিরে যাননি ফেলে আসা ভিটেমাটিতে। আজও প্রত্যহ নতুন ভাবে দেখছেন মহানগর

কলকাতাকে। অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন এখানকার মানুষের প্রতিদিনের দিনযাপনকে। ফলশ্রুতি স্বরূপ তাঁর নগরকেন্দ্রিক লেখাগুলিতে কলকাতা ভিন্নভিন্ন রূপে ধরা দিয়েছে। নগরের বুকে প্রতিদিন হেঁটে চলা মানুষজনের জীবনের কাহিনি জায়গা করে নিয়েছে তাঁর গল্পে। যা গল্পকারের গল্পগুলিকে আরও সমৃদ্ধশালী ও বাস্তবমুখী করে তুলেছে।

১৯৭০ সালে 'রানার' পত্রিকার শারদ সংখ্যায় 'পাখি' নামক গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়। গল্পের প্রেক্ষাপট নীলরতন সরকার হসপিটালের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। কলকাতা শহরে রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে যে মেলা অনুষ্ঠিত হয়, সে সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন গল্পকার। পাশাপাশি মেলাকে কেন্দ্র করে বহু মানুষের অন্নের সংস্থানের দিকটিও ফুটিয়ে তুলেছেন। নগরজীবনের যে যান্ত্রিকতা, সেই যান্ত্রিকতার প্রভাব সেখানকার মানব হৃদয়কে কীভাবে ধীরে ধীরে গ্রাস করছে, তা গল্পের মাধ্যমে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন তিনি। নূন্যতম সৌজন্যবোধের অভাব দেখা দিচ্ছে শহরের বুকে হেঁটে বেড়ানো মানুষজনের মধ্যে। গল্পের নায়ক প্রবীর শহরের এই গোলকধাঁধায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। একদিকে নগরের ঝলকানি এবং অপরদিকে নিজের আদর্শ, দু'য়ের দোলাচলতা বারবার কর্তব্যচ্যুতি ঘটাচ্ছে প্রবীরের। ক্রমশ হতাশা এবং নৈরাশ্যের জালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলছে। মানুষের মধ্যে জন্ম নেওয়া কৃত্রিম সৌজন্যবোধ তাকে হতাশার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই নৈরাশ্যের জাল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে গিয়ে বারবার ব্যর্থ হয়েছে। আর সেই মুহূর্তে নিজেকে বড় একা মনে হয়েছে প্রবীরের। গল্পে উল্লিখিত পাখিটার কল্পনায় বেড়ে ওঠার মধ্যে নিজের শৈশবের বেড়ে ওঠার দিনগুলি দেখতে পেয়েছিল প্রবীর। মানব জীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতাকে খাঁচায় বন্দী পাখির জীবনচক্রের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন গল্পকার। নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার আঙিনায় প্রবীরকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন তিনি। প্রবীরের চোখ দিয়ে সেখানকার চিত্র এবং অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার, আমাদের সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চেয়েছেন।

বিংশ শতাব্দীর সাতের দশকে সারা বাংলা জুড়ে যে অস্থির পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল, সেই বিষয়টিকে সামনে রেখে 'হীরকের লেখাপড়া' নামক গল্পটি লিখেছেন গল্পকার। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭১ সালে 'রবিবাসরীয় আনন্দবাজার' পত্রিকায়। গল্পটির প্রেক্ষাপট ঘনীভূত হয়েছে কলকাতার দমদম অঞ্চলকে কেন্দ্র করে। গল্পের শুরুতেই আমরা দেখতে পাই একজন মা তার সন্তানের আগামী দিনের জীবন নিয়ে খুবই চিন্তিত। প্রতিটা মুহূর্তে সন্তান হারানোর ভয় অদৃশ্য ছায়ার মতো তাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। তাই সে প্রতিদিন সন্তানকে রক্ষা করার জন্য নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছে। মায়ের এই ব্যস্ততাকে ভালো চোখে নেয়নি সদ্য যৌবনে পা দেওয়া হীরক। তার মনে হয়েছিল—

> "তাকে চালান করে দেবার ব্যবস্থা হয়তো পাকা হয়ে গেছে।"[১]

একদিকে সন্তানের মধ্যে জন্ম নেওয়া আদর্শ এবং অপরদিকে মায়ের সন্তানকে রক্ষা করার তাগিদ, দু'য়ের লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত জয় হয় মায়েরই। গল্পে নারী চরিত্রের দুটি ভিন্ন রূপ ফুটে উঠেছে। যেখানে একজন মা তার সন্তানকে রক্ষা করার জন্য সদা তৎপর, অপরদিকে অন্য এক মায়ের কাছে তার সন্তানের থেকে বেশি স্নেহের হয়ে উঠেছে বাড়ির পোষ্যটি। সেই সময় শহরের বুকে কীভাবে সদ্য যৌবনে পা দেওয়া যুবকেরা শহর থেকে হারিয়ে যাচ্ছিল তার ইঙ্গিত দিয়েছেন গল্পকার। পাশাপাশি শহরের বুকে দিনের আলোতে বিত্তশালী পরিবারের গৃহবধূদের অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের চিত্র ধরা দিয়েছে। আসলে সেই সময় শহরের বুকে জন্ম নেওয়া দুটি ভিন্ন পরিবেশ সম্পর্কে আমাদেরকে জানান দিয়েছেন গল্পকার। একদল মানুষ প্রতিটা মুহূর্তে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, অন্যদিকে আরেক দল মানুষের বিলাসিতা পর্বত শিখরে পৌঁছে গেছে। যা আমাদের সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে কোনো ইতিবাচক ইঙ্গিত বহন করে না।

'ভালোবাসার এপার ওপার' নামক গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালে 'রবিবাসরীয় আনন্দবাজার' পত্রিকায়। গল্পের প্রেক্ষাপট ডানলপ ও বরাহনগরের মধ্যবর্তী অঞ্চল। নারীর স্থান কেবলমাত্র ঘরের অন্দরমহলেই, এই ধারনার বাঁকবদল আমাদের সমাজে অনেকদিন আগেই শুরু হয়ে গেছে। তবে গ্রামীণ অঞ্চলে কিছু ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতার ছোঁয়া লক্ষ করা যায়। আর সেই রক্ষণশীলতা কীভাবে নগর সভ্যতার মুক্তচেতা মানুষজনের মনে থাবা বসিয়েছে, সেই দিকটিই গল্পকার তুলে ধরেছেন গল্পে। শহুরে পরিবেশে বেড়ে ওঠা শাশ্বতী কখন যে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে, ঘুণাক্ষরেও তার আভাস পায়নি সুজয়। শাশ্বতীর চাকরি করার ইচ্ছার কথা শুনে রক্ষণশীল মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিল সুজয়। সে শাশ্বতীকে বলেছিল—

> "চাকরি করতে যাবে কোন দুঃখে,... না আমি তোমাকে চাকরি করতে দেব না।"[২]

পারিবারিক জীবনের যে পবিত্র সম্পর্ক, সেই সম্পর্ক কীভাবে শুধুমাত্র রক্ষণশীল মানসিকতার জন্য ক্রমশ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তারই বাস্তব উদাহরণ এই গল্পটি। সুজয়ের মতো বহু মানুষ আছে, যারা শুধুমাত্র গহনা দিয়ে ঢেকে রাখতে চায় শাশ্বতীর মতো মেয়েদের মুক্ত চিন্তাকে। আর তার ফলেই সম্পর্কগুলির অকাল মৃত্যু ঘটে। ফলে পরবর্তীতে ওই সকল পরিবারগুলির নবপ্রজন্ম হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। যা একটি সুস্থ সমাজব্যবস্থার জন্য কখনোই কাম্য নয়। এছাড়াও শহরের বুকে প্রাইভেট বাসের রেষারেষির চিত্র গল্পে ধরা দিয়েছে। গল্পকার বাসগুলির রেষারেষিকে পাগলা ঘোড়ার ছুটে চলার সঙ্গে তুলনা করেছেন। পাশাপাশি সদ্য যৌবনে পা দেওয়া ছেলেদের বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণের দিকটিও ধরা দিয়েছে।

বর্তমান সময়োপযোগী একটি গল্প হল 'এখন বন্ধুরা'। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালে 'অন্বিষ্ট' পত্রিকায়। গল্পকার দেখিয়েছেন কীভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার ক্ষেত্রে উচ্চগুণ সম্পন্ন মেধাকে পিছনে ফেলে অসৎ উপায়ে এগিয়ে যাচ্ছে নিম্ন

মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিরা। যেখানে অর্থ হয়ে উঠছে যোগ্যতার মাপকাঠি। গল্পকার দেখিয়েছেন একপ্রকার চুরির পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে গল্পের নায়ক শংকর। কারণ কলেজের প্রথম সারির মেধার সার্টিফিকেট নিয়ে সারাবছর হন্যে হয়ে শহরের বুকে ঘুরেও, একটা স্থায়ী কাজ জোগাড় করতে পারেনি। ওপরদিকে বড়লোক বাবার ছেলে অলকের সাফল্য যেন তার শিক্ষগত যোগ্যতার সার্টিফিকেটে থুথু ছেঁটায়। তাইতো অলকের পরিবারের কথা ভাবলে আরও বেশি প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে ওঠে শংকর। অলকের চাকরির সংবাদ শুনে সে বলেছিল—

> "শালা একটা ফাস্ট ক্লাস ডিগ্রি নিয়ে তিন বছর কলকাতা চষে বেড়িয়েছি।"[৩]

এ শুধু শংকরের হতাশার বহিঃপ্রকাশ নয়, তার আড়ালে অলকের সাফল্যকেও বিবেকের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন গল্পকার। এ শুধু শংকরের জীবনের ট্রাজেডি নয়। শংকরের মতো নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা প্রতিটা ছেলের ট্রাজেডি। যারা জীবনের সৎ পথে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার রাস্তায় বারবার ব্যর্থ হয়ে, অসৎ জগতের পথ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে। ফলত তাদের শেষ জীবনটা খুবই বেদনাদায়ক হয়ে উঠছে। এছাড়াও গল্পকার পথশিশুদের কথা উল্লেখ করেছেন গল্পে। তিনি দেখিয়েছেন এই সমস্ত শিশুরা বিদ্যালয়ে যাওয়ার পরিবর্তে, ট্রাফিক সিগন্যালের নিচে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। যা আমাদের সমাজের জন্য অত্যন্ত লজ্জার।

শহরের ব্যস্ততম রাস্তা পারাপারের সময় পথচারী মানুষজনের কারণেও যে দুর্ঘটনা ঘটে, সেই বিষয়টিকেই গল্পকার ফুটিয়ে তুলেছেন 'শব্দের ভিতরে' নামক গল্পে। গল্পটি প্রথম ১৯৭০ সালে 'রবিবাসরীয় আনন্দবাজারে' প্রকাশিত হয়। বালিগঞ্জের রাসবিহারী মোড়ে দিনের আলোতে শুধুমাত্র দীপ্তেনের অসতর্কতার কারণে প্রাণ গেল এক বাস চালকের। তার ভুলের জন্য জনরোষের শিকার হতে হল চালকটিকে। তাইতো চালকটির মৃত্যুর সংবাদ শুনে দীপ্তেন নিজেকে দায়ী করেছিল। সে সুনন্দাকে বলেছিল—

> "আমার দোষে আমি চাপা পড়লাম, আমি সেরেও উঠলাম, কিন্তু ও লোকটা আমার জন্য মরে গেল, আমি একথা কাকে বলব?"[৪]

গল্পকার সচেতনভাবেই চালকের পরিচয় আমাদের কাছে গোপন রেখেছেন। মৃত্যুকালীন সময় পর্যন্ত তার পরিচয় আমরা জেনেছি একটি বাসের চালক রূপে। কারণ এ শুধু একজন চালকের করুণ পরিণতির কাহিনি নয়। শহরের বুকে প্রতিদিন জনরোষে প্রাণ হারানো সকল চালকদের কাহিনি। যাদের পরিবার আজও সেই প্রিয় মানুষটিকে হারানোর পিছনের সঠিক কারণটি সম্পর্কে অবগত নয়। আসলে তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন, প্রতিটি পথ দুর্ঘটনার জন্য শুধুমাত্র চালকদের অসতর্কতাকে দায়ী করা যায় না। কলকাতার বুকে পথচলতি মানুষজনের অসতর্কতাও অনেকাংশে দায়ী থাকে।

পাশাপাশি কলকাতা শহরের বুকে বাসচালকদের বেপরোয়া দৌরাত্ম্যের কারণে কীভাবে অসহায় মানুষজনের প্রাণহানি ঘটে, তা ফুটে উঠেছে 'খবরের জীবন' নামক গল্পে। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০৬ সালে 'সংবাদ প্রতিদিন' পত্রিকায়। গল্পের প্রেক্ষাপট জি টি রোড। গল্পকার দেখিয়েছে প্রাইভেট বাসগুলির একে অন্যের সঙ্গে রেষারেষির সেই ভয়ংকর চিত্র। যার ফলস্বরূপ প্রাণ হারাতে হয়েছিল রিকশায় বসে থাকা মা ও মেয়েটিকে। পাশাপাশি দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে পরিবেশ জন্ম নেয়, সে সম্পর্কে একটি চিত্র তুলে ধরেছেন গল্পে। চারপাশের জনরোষের আঁচ গিয়ে পড়ে বাসচালক ও বাসের উপর। আর যার পরিণতি হয় খুব বেদনাদায়ক—

> "বাসের যাত্রীদের হাঁকিয়ে ঝেঁটিয়ে নামিয়ে দেয়। তৎক্ষণাৎ পেট্রল ঢেলে দেয় এরা বাসের গায়ে। তারপর জ্বালিয়ে দেয় আগুন। চোখের নিমেষে হাওয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে আগুনের শিখা লেলিহান হয়ে ওঠে।"[৫]

সাধারণ মানুষজন এই দুর্ঘটনার জন্য বাসচালককে দায়ী করলেও, এর পিছনে থাকা মালিকশ্রেণির মুখোশ উন্মোচন করতে চেয়েছেন গল্পকার। যাদের অর্থলালসা পূরণ করতে গিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিতে বাধ্য হয় বাসচালকেরা। মেতে ওঠে নিজেরই সহকর্মীদের সঙ্গে মরণ খেলায়। আর তাদের সামান্য ভুলের জন্য প্রাণ হারায় পথচলতি মানুষজন। আর এই ভুলের মাশুল স্বরূপ অনেকসময় প্রাণহানিও ঘটে বাসচালকদের। তাই গল্পকার আইনকে নিজের হাতে তুলে নেওয়ার পরিবর্তে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্য আইনি পথ অবলম্বন করতে পরামর্শ দিয়েছেন।

১৯৭৩ সালে 'শারদ গল্পবিচিত্রা' পত্রিকায় 'ফ্যাচাং দলুই' নামক গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ফুটপাতেবসবাসকারী মানুষজনের প্রতিদিনের জীবনসংগ্রামকে তুলে ধরেছেন গল্পকার। গল্পের প্রধান চরিত্র ফ্যাচাং। যে বেঁচে থাকার জন্য প্রতিনিয়ত সমাজের সঙ্গে লড়াই করে চলেছে। জীবিকার সন্ধানে পাড়ি দিয়েছে কলকাতায়। এ শুধু ফ্যাচাং এর কাহিনি নয়। তার মতো বহু মানুষ, যার শুধুমাত্র দু'মুঠো ভাতের জন্য গ্রাম থেকে শহরের দিকে পা বাড়াচ্ছে, তাদের কাহিনি। তাদের শহরমুখী হওয়ার কারণ অন্বেষণ করার চেষ্টা করেছেন গল্পকার। যার প্রধান কারণ হিসেবে উঠে এসেছে প্রতিদিনের দারিদ্র। তিনি শহরের রাস্তার দুপাশের চিত্রকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়েছেন। একদিকে প্রাসাদপম অট্টালিকা এবং অপরদিকে ফুটপাতের গাঁ ঘেঁষে ক্রমান্বয়ে গজিয়ে ওঠা ঝুপড়ি। যা আমাদের সমাজের জন্য কোনো ইতিবাচক ইঙ্গিত বহন করে না। পাশাপাশি কলকাতার বড়বাজার অঞ্চলের ব্যবসায়ী মানুষজন আয়কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য যে সকল পন্থা অবলম্বন করে, তা পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন গল্পকার।

কর্পোরেট সেক্টরগুলিতে কীভাবে দিনের পর দিন কর্মচারীদের শোষণ করা হয়, সেই চিত্র ফুটে উঠেছে 'যে ভয় পায়না' নামক গল্পে।১৯৭৪ সালে 'অমৃত' পত্রিকায়গল্পটি

প্রথম প্রকাশিত হয়। গল্পকার দেখিয়েছেন কেমন করে একটি পারিবারিক সম্পর্ক ভেঙে যাচ্ছে শুধুমাত্র সময়ের অভাবে। ফলে স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে ব্যবধান তৈরি হচ্ছে। রণু যখন দীপেনের কাছে সারাদিনে একটু সময় চাইছে, তখন দীপেন তাকে জানাচ্ছে—

> "আমি একটা ঘোড়াদৌড়ের মধ্যে আছি একটু পিছিয়ে পড়া মানেই হেরে যাওয়া,...এর নাম ফ্রি কমপিটিশন। দাও আর নাও, কাজ কর খুশি কর নয়তো আউট হয়ে যাও।"[৬]

এ শুধু দীপেনের কাহিনি নয়। দীপেনের মতো কর্পোরেট সেক্টরে কাজ করা প্রতিটা মানুষের জীবনের কাহিনি। যারা প্রতিটা মুহূর্তে ঘরে এবং বাইরে ক্রমাগত লড়াই করে চলেছে।

কর্পোরেট সেক্টরকে সামনে রেখে লেখা আরেকটি গল্প হল 'প্রলয় গুপ্ত' নামক গল্পটি। গল্পটি ১৯৭১ সালে 'রবিবাসরীয় আনন্দবাজার' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। গল্পে গল্পকার দেখিয়েছেন, দুটি পবিত্র সম্পর্কের মাঝে কেমন করে কৃত্রিমতা জন্ম নেওয়ার পাশাপাশি শুধুমাত্র আর্থিক কারণে সম্পর্কের দিকবদল ঘটছে। সমাজ অর্থের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। সমাজ থেকে ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে বসেছে সরলতা, সজীবতা। তার পরিবর্তে কৃত্রিম আভিজাত্য ছাপ ফেলছে আমাদের চারপাশের পরিবেশে। আর এর জন্য কর্পোরেট সেক্টরগুলির পুঁজিবাদী মনোভাবকেই দায়ী করেছেন গল্পকার।

পাশাপাশি কর্পোরেট সেক্টরগুলির মালিকেরা অতিরিক্ত মুনাফা লাভের আশায় কীভাবে দু'জন সহকর্মীকে একে অন্যের বিরুদ্ধে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে, তা ফুটে উঠেছে 'সাবধান, সব দরজা জানালা বন্ধ রাখো' নামক গল্পে। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালে দেশ পত্রিকায়। গল্পকার দেখিয়েছেন শহরের একটি নামজাদা কলেজ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে কর্মক্ষেত্রে যোগদান করেছে ব্রতীশ। কিন্তু মালিক পক্ষের কাছে নিজের শিরদাঁড়া বিক্রি না করায়, পদে পদে হেনস্তার মুখে পড়তে হচ্ছে ব্রতীশকে।

> "ব্রতীশ দত্তকে কোম্পানি কার্যত ইন-অ্যাকটিভ করে রাখতে চাইছে।"[৭]

আসলে সংস্থাগুলিতে কর্মচারীদের মধ্যে জন্ম নেওয়া ভ্রাতৃত্ববোধকে ভয় পায় মালিকপক্ষ। তাইতো ব্রতীশের উপর নেমে এসেছিল অভিশাপের খাঁড়া। কারণ ব্রতীশের মতো মানুষেরাই স্বপ্ন দেখায় হাতে হাত রেখে চলার। শক্তি জোগায় মেরুদণ্ড সোজা রেখে কথা বলার। যা মালিক পক্ষের কাছে অত্যন্ত দুশ্চিন্তার বিষয়। কারণ এদের মধ্যে যদি একবার অধিকারবোধ জাগ্রত হয়, তাহলে তা তাদের জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারে। আর সেই কারণেই কর্পোরেট সেক্টরগুলিতে এই ধরণের নিম্মরুচির পরিচয় আজও সমানভাবে লক্ষ্য করা যায়।

বড় বড় প্রাইভেট কোম্পানিগুলিতে কর্মচারীদের প্রোমোশনের নামে যে নোংরা খেলাটি চলে তা ফুটে উঠেছে 'সোনার জলে ধোয়া জীবন' নামক গল্পে। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০২ সালে 'শিস' নামক পত্রিকায়। গল্পকার দেখিয়েছেন কীভাবে এই দৌড়ে নারীরা পুরুষদের থেকে এগিয়ে যায়। শরীর কেমন করে হয়ে ওঠে সাফল্যের প্রধান চাবিকাঠি। কর্পোরেট জগতের সেই অপ্রিয় সত্যের দিকটি পাঠকদের কাছে উন্মোচন করতে চেয়েছেন গল্পকার।

১৯৭৫ সালে 'দরবারী সাহিত্য' পত্রিকার শারদ সংখ্যায় 'বালকপুত্রের অহঙ্কার' নামক গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়। গল্পকার শহরের কৃত্রিমতার বেড়াজালের মাঝখানে একজন বাবা ও সন্তানকে মুখোমুখি বসিয়েছেন। একদিকে বাবার সহকর্মীকে রক্ষার পরিবর্তে নিজের আখের গোছানোর ফন্দি, অপরদিকে সন্তানের সহপাঠীকে বিপদ থেকে রক্ষার কাহিনি। যা ব্রতীনের পিতৃসত্তাকে প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছিল। আসলে শহরের পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিল ব্রতীন। এতদিন পর দীপের সহপাঠীকে রক্ষার বুকভরা কাহিনি কোথাও যেন তাকে বিবেকের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিল। তাইতো এই মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভের আশায় সে ভারি গলায় দীপকে বলেছিল—

> "দীপ, তুমি ঠিক করনি। ওরকম ভাবে তপুকে জাপটে ধরা উচিত হয়নি। তোমাকে সুদ্ধু ও তো পড়ে যেতে পারত দরজা দিয়ে। তপুও শেষ হতো, তুমিও বাঁচতে না।"[৮]

স্বাভাবিকভাবে গল্পটি পাঠ করে সকলে ব্রতীনকে দায়ী করলেও, এই চরিত্রটির আড়ালে যে সমাজ সম্পর্কে সচেতন একজন বাবা অবস্থান করছে, যে তার সন্তানের ভবিষ্যতের রাস্তা সুগম করার জন্য যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। বিসর্জন দিতে পারে নিজের শুভ চিন্তাকে। নগর সভ্যতার বুকে জন্ম নেওয়া সেই নির্মম সত্যটি তুলে ধরেছেন গল্পকার।

শহরের ঝাঁ চকচকে ফ্লাটে বসবাসকারী মানুষজনের অন্দরে জন্ম নেওয়া এক অন্ধকার অধ্যায়ের কাহিনি 'ছা' নামক গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পকার। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮০ সালে 'যুগান্তর সাময়িকী' পত্রিকায়। ক্রমশ নিজের আদর্শ মানা মানুষটির আসল রূপ দেখে হাঁপিয়ে উঠেছে ছোট্ট অভী। চার দেওয়ালের বন্ধন থেকে খুঁজে পেতে চেয়েছিল মুক্তির স্বাদ। ফ্লাটের পাশের খোলা বস্তিতে বেড়ে ওঠা ছেলেগুলির মধ্যে খুঁজে পেতে চেয়েছিল নিজেকে। তাইতো শ্রেয়া যখন বস্তির ছেলেগুলোর সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করেছিল, তখন গর্জে উঠেছিল অভী—

> 'বস্তির ছেলে তো কী হয়েছে?'[৯]

তার এই প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে কোথাও যেন প্রতিটি বাবা-মাকে সমাজের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতার কথা মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন গল্পকার। পাশাপাশি মিথ্যা আভিজাত্যের

যে বেড়াজাল, সেই বেড়াজালকে অভীর মতো নব প্রজন্মের হাত দিয়ে ভেঙে দিয়ে নতুন এক সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখেছেন তিনি।

নগরের কৃত্রিমতার বেড়াজাল ছাপিয়ে জন্ম নেওয়া নতুন এক প্রাণের সন্ধান দিয়েছেন গল্পকার 'স্টেশনে যথাযথ' নামক গল্পে। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় **১৯৮০** সালে 'রবিবাসরীয় আনন্দবাজার' পত্রিকায়। মূলত এটি একটি প্রেমের গল্প। গল্পের প্রধান চরিত্র দেবী ও আদিত্যের সম্পর্কের গভীরতা বোঝাতে গিয়ে গল্পকার রামায়ণের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন—

> "গুহক চণ্ডালের নৌকো থেকে রামচন্দ্র আগে নিজে নেমে এমনি করে সীতার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল।"[১০]

লাইনটির মধ্য দিয়ে একদিকে সমাজে নারীর প্রতি পুরুষের কর্তব্যবোধ ফুটে উঠেছে, অপরদিকে গল্পকারের ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহের দিকটিও ধরা পড়েছে। গল্পে আমরা মোট তিনটি চরিত্রের কথা জানতে পারি- দেবী, আদিত্য ও সুধী। তিনি কোথাও যেন রামায়ণের চরিত্রের সঙ্গে সমকালীন এই চরিত্রগুলির মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছেন। পাশাপাশি প্রেমিক-প্রেমিকার যে পারস্পরিক সম্পর্ক তা পাঠকসমাজের কাছে তুলে ধরেছেন। গল্পে বাংলার ঐতিহ্য হাওড়া ব্রিজ, হাওড়া রেলস্টেশন ও ট্রামগাড়ির প্রসঙ্গ এসেছে।

২০০১ সালে 'ত্রিবৃত্ত' নামক পত্রিকায় 'ঠিক তিনটের অ্যালার্ম' নামক গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়। শহরের বুকে চোখ ঝলসানো বিনোদনের আড়ালে জন্ম নেওয়া নিষিদ্ধ ব্যবসার চিত্র ফুটে উঠেছে গল্পে। সমাজ স্বীকৃত ব্যবসার আড়ালে কীভাবে এই নিষিদ্ধ ব্যবসাটি কলকাতার বুকে ক্রমান্বয়ে বেড়ে উঠছে, সে সম্পর্কে পাঠককুলকে অবগত করতে চেয়েছেন গল্পকার। শহরের বুকে অর্থের বিনিময়ে ভালোবাসা বিক্রির কথা উঠে এসেছে গল্পের চরিত্রদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে—

> "মিঠুদির ভাষায় ভালোবাসা বিক্রি হবে। ঠিক বিক্রি নয়, দাম পাবে ভালোবাসা।"[১১]

গল্পে উল্লেখিত চরিত্রদের যে নাম আমরা জানতে পারি, সেগুলি তাদের অন্ধকার জগতের নাম। ব্যবসাটির মতোই যেন নিজেদের পরিচয় গোপন রাখতে চায়, এই পেশার সঙ্গে যুক্ত নারীরা। আসলে সমাজের কিছু স্বার্থলোভী মানুষ এই সকল অসহায় নারীদের আর্থিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে, দিনের পর দিন এদেরকে যন্ত্রের মতো ব্যবহার করে চলেছে। যেখানে তাদের ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়া কোথাও যেন হারিয়ে যেতে বসেছে। গল্পকার সেই সকল মুখোশধারীদের মুখোশ সমাজের সামনে খুলে দিতে চেয়েছেন।

অন্যদিকে জীবিকার সন্ধানে কীভাবে মানুষ এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে, তা গল্পকার তুলে ধরেছেন 'বাবুলালের ছেলে রাজু' নামক গল্পে। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় **১৯৯৮** সালে 'শারদ গল্পগুচ্ছ' পত্রিকায়। গল্পকার দেখিয়েছেন

ভিনরাজ্য থেকে আসা বাবুলাল ও তার ছেলে রাজু কীভাবে বেঁচে থাকার জন্য কলকাতার রাস্তার পাশের ঝুপড়িতে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে চলেছে। শারীরিক অক্ষমতাকে উপেক্ষা করেছে প্রতিনিয়ত। ব্যর্থতাকে নিজের মনে ধিক্কার জানিয়েছে। সেই ছোটবেলায় বাবার হাত ধরে কলকাতায় এসেছিল বাবুলাল। আজ সে রাজনৈতিক নেতাদের হাত ধরে নিজের একটা মাথা গোঁজার জায়গা করে নিয়েছে। কিন্তু বর্তমানে তার বার্ধক্যজনিত অসুখ যেন প্রধান বাঁধা হিসাবে দেখা দিয়েছে। সারাজীবনের সঞ্চিত অর্থকে সে আঁকড়ে ধরে বাঁচার চেষ্টা করছে। তাইতো চিকিৎসা করানোর কথা বললে সকলের সামনে ভালো থাকার অভিনয় করে বেড়ায়। আসলে এটি শুধু বাবুলাল ও রাজুর কাহিনি নয়। তাদের মতো শত শত পরিযায়ী শ্রমিকদের কাহিনি। যারা জীবিকার সন্ধানে পশ্চিমবঙ্গে অথবা ভিনরাজ্যে পাড়ি দিয়েছে। লেখক তাদের জীবন সংগ্রামকে লিপিবদ্ধ করেছেন গল্পে। তুলে ধরেছেন তাদের প্রতিদিনের জীবনসংগ্রামের চিত্র।

গল্পকার নগর কলকাতার নানা টুকরো টুকরো ছবি তুলে ধরেছেন তাঁর গল্পে। নগরের বুকে জন্ম নেওয়া শ্রেণিগত বৈষম্য, অর্থনৈতিক শোষণ, দাম্পত্য কলহ প্রভৃতি নানান দিকগুলি ফুটে উঠেছে তাঁর লেখায়। গল্পকার তাঁর লেখনীর মাধ্যমে সমাজের বাস্তবরূপটি পাঠক তথা, শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষজনের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন। কারণ তিনি মনে করেন সমাজের পরিবর্তন একমাত্র শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষজনের দ্বারাই সম্ভব। তাই তিনি সকলকে এক শ্রেণিবৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

উৎসের সন্ধানে:

১. রক্ষিত,সমীর,‘গল্প সমগ্র’-১, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৩, পৃ. ৩০৩
২. তদেব, পৃ. ১৯৬
৩. তদেব, পৃ. ২০১
৪. তদেব, পৃ. ২১১
৫. রক্ষিত,সমীর,‘গল্প সমগ্র’-৪, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ৫৩
৬. রক্ষিত,সমীর,‘গল্প সমগ্র’-২, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৯৫
৭. তদেব, পৃ. ১০১
৮. তদেব, পৃ. ১৩২
৯. রক্ষিত,সমীর,‘গল্প সমগ্র’-৩, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৫৭
১০. তদেব, পৃ. ৭৫
১১. রক্ষিত,সমীর, ‘গল্প সমগ্র’-৪, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ১০১

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ‘বেণের মেয়ে’ : অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের আখ্যান

অভিজিৎ মান্না
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ড: গৌরমোহন রায় কলেজ, পূর্ব বর্ধমান

সারসংক্ষেপ : হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ‘বেণের মেয়ে’ উপন্যাসটি বাংলার দশম-একাদশ শতাব্দীর সমাজ ইতিহাসের দলিল। হাজার বছর আগের বৌদ্ধ-হিন্দু ধর্মের সংঘাতের প্রেক্ষাপটে হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থান আখ্যানের পিছনে উনিশ শতকীয় জাতীয়তাবাদী ভাবোন্মেষের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত উপন্যাসটিতে লেখক একদিকে যেমন প্রাচীন বাংলার সমাজ ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন তেমনি অন্যদিকে সমকালীন বাংলার বাণিজ্য বিশেষত নৌবাণিজ্যকেন্দ্রিক অর্থনীতি উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চালিকাশক্তি। সমকালীন বাংলার শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ব্যবস্থায় বণিকরা তথাকথিত নিম্নবর্ণের অন্তর্গত হলেও কেবলমাত্র অর্থশক্তির জোরেই এই বণিক সম্প্রদায় বাংলার একসময়ের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রকগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিলেন। তাই উপন্যাসের কাহিনিকেন্দ্রে বৌদ্ধ-হিন্দু ধর্মের যে সংঘাত লিপিবদ্ধ হয়েছে তার মূলে রয়েছে দত্ত ও ধনী বণিক পরিবারের প্রভূত সম্পদ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাণিজ্যিক প্রতিপত্তিকে উপন্যাসে তুলে ধরতে গিয়ে বিহারী দত্তের জাভা-সুমাত্রা-বোর্ণীয় প্রমুখ দেশে বাণিজ্যযাত্রার বিবরণ দিয়েছেন। এমনকি সমকালীন বাংলার একাধিক বণিকের উল্লেখ রয়েছে উপন্যাসে যা লেখক হয়তো সংগ্রহ করেছেন মঙ্গলকাব্য বিশেষত ‘চণ্ডীমঙ্গল’, ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যের চাঁদ সওদাগর ও ধনপতি-শ্রীমন্তের আখ্যান থেকে। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় বাংলার অতীত ইতিহাসের সঙ্গে কখনো বাংলা কাব্যের মধ্যযুগীয় নিদর্শন আবার কখনো সপ্তগ্রাম বাণিজ্যবন্দরকে কেন্দ্র করে ঔপনিবেশিক বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ‘বেণের মেয়ে’ উপন্যাস তাই একদিকে অতীত বাংলার ধর্মীয় পালাবদলের দলিল অন্যদিকে অর্থনীতির প্রভাবে বদলে যাওয়া সমাজ ইতিহাসের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ভিত্তিক পুনর্পাঠ তাই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ‘বেণের মেয়ে’ উপন্যাসকে বাংলার অতীত ইতিহাসের জীবন্ত দলিল করে তুলেছে।

সূচক শব্দ : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বেণের মেয়ে, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, বৌদ্ধ-হিন্দু সংঘাত, নৌবাণিজ্য, সপ্তগ্রাম বন্দর, সমাজ-ইতিহাস, হিন্দু পুনরুত্থান।

মূল আলোচনা :

বাংলা উপন্যাসে বাঙালির অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন আলোচনা কালে মাইলফলক আখ্যান হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর (১৮৫৩- ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ) 'বেণের মেয়ে' উপন্যাস। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে ৬ ডিসেম্বর উত্তর চব্বিশ পরগণার নৈহাটিতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর জন্ম।[১] ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ থেকে এম.এ. পরীক্ষায় একমাত্র তিনিই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে 'শাস্ত্রী' উপাধি পান। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করেন তিনি। বাংলা সাহিত্যে তার প্রধান পরিচিতি বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদের উদ্ধারকর্তা হিসাবে। নেপালের রাজদরবার থেকে প্রাপ্ত একাধিক পুঁথির সঙ্গে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে 'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোঁহা' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। দুষ্প্রাপ্য ও লুপ্তপ্রায় সংগ্রহের পাশাপাশি প্রাচীন লিপি বিশারদ রূপেও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তিনি। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় এবং 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ঔপন্যাসিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ ঘটে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর। কাঞ্চনমালা উপন্যাস নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরোধ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে উপন্যাস রচনা থেকে বিরত রেখেছিল। বিশ শতকের প্রথম দিকে ঐতিহাসিক ও সামাজিক ঘটনা অবলম্বনে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচিত 'কাঞ্চনমালা' (১৯১৬) এবং 'বেণের মেয়ে' (১৯১৯) উপন্যাস দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দেশের ইতিহাস বলতে মনে করতেন জনজীবনের ইতিহাসকে। তাই 'বেণের মেয়ে' উপন্যাসে হাজার বছর আগের বৌদ্ধ ও হিন্দু অধ্যুষিত জনজীবনে দুই ধর্মের সংঘাত ও হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানকে উপন্যাসের আখ্যান করেছেন।[২] জনপদ হিসাবে প্রাচীন সপ্তগ্রাম বন্দর শহর ও গ্রাম-গ্রামান্তরের জন-জীবন-ইতিহাস উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে উঠেছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লেখায় বাঙালি জাতির ইতিহাসের পুনরুজ্জীবন প্রয়াস, একেবারেই উনিশ শতকীয় জাতীয়তাবাদী ভাবোন্মেষের ফলশ্রুতি।[৩] উপন্যাসটি চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকায় ১৩২৫ বঙ্গাব্দের কার্তিক থেকে ১৩২৬ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ (১৯১৮-১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত মোট ১৪ টি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স থেকে আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালায় 'বেণের মেয়ে' উপন্যাসটি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। পরবর্তীকালে বসুমতি সাহিত্য মন্দির থেকে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী'তে সংযোজিত হয়েছিল উপন্যাসটি।

উপন্যাসে দেখা যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঔপনিবেশিক যুগের অনেক আগেই দশম-একাদশ শতাব্দীর পটভূমিকায় তাঁর আখ্যান সন্নিবিষ্ট করেছেন। অর্থাৎ বঙ্গভূমি তার নিজস্ব স্বতন্ত্র নিয়ে গড়ে ওঠার কালেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর উপন্যাসটির পরিকল্পনা করেছেন। তিনি প্রাচীন ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ ছিলেন, সেই সঙ্গে ছিলেন নিবীড় গবেষক। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সাহিত্যিক নিদর্শন 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'কে একালের

বাঙালি পাঠকদের সামনে তুলে ধরার কৃতিত্ব তাঁরই। সেইযুগের ইতিহাসকেই তিনি প্রাচীন যুগের বাণিজ্যের বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে আখ্যান মিশ্রিত করে তুলে ধরেছেন।

গ্রন্থের 'মুখপাত' অংশে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গ্রন্থটিকে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'এর পরিবর্তে প্রাচীন বাংলার সামাজিক ইতিহাস অবলম্বনে রচিত উপন্যাস হিসেবে উল্লেখ করতে চেয়েছেন। গ্রন্থে প্রাচীন বাংলার উল্লেখ প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন "এতে এ-কালের কথা নাই। সব সেই কালের, যে কালে বাংলার সব ছিল। বাংলার হাতি ছিল, ঘোড়া ছিল, জাহাজ ছিল, ব্যবসা ছিল, বাণিজ্য ছিল, শিল্প ছিল, কলা ছিল।"[৪] বাংলায় বৌদ্ধ প্রভাবের অবসান এবং হিন্দু ব্রাহ্মণ্য প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার জটিল সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে বাঙালির প্রাচীন নৌবাণিজ্য ইতিহাসের বিবরণ বর্ণিত হয়েছে 'বেণের মেয়ে' উপন্যাসে। মঙ্গলকাব্যে লোকায়ত দেব-দেবীদের পূজা প্রচারের জন্য সমাজের সর্বাপেক্ষা প্রতিপত্তি যুক্ত বণিক সম্প্রদায়কে ব্যবহার করা হয়েছে, আলোচ্য উপন্যাসেও ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায় নিজ নিজ সামাজিক প্রভাব বজায় রাখতে বণিক বিহারী দত্ত ও সাধু বেণের সম্পদ করায়ত্ত করতে চেয়েছে।[৫] উপন্যাসের শুরু ৯২২ শকাব্দ অর্থাৎ ১০০০ খ্রিস্টাব্দের বৈশাখ মাসে সাতগাঁ (বর্তমান আদি সপ্তগ্রাম) অঞ্চলের গাজন অনুষ্ঠানের বর্ণনায়। সাতগাঁ অঞ্চলের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাজা রূপনারায়ণ সিংহ তাঁর গুরু লুই সিদ্ধার সম্মানে তারাপুকুর গ্রামে বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে মহাসমারোহে গাজন উৎসবের আয়োজন করেছেন। সাতগাঁ বা সপ্তগ্রাম বহু প্রাচীনকাল থেকে বাংলার সমৃদ্ধ বাণিজ্য জনপদ রূপে পরিচিত। সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত এই জনপদে বাংলার বহু বণিকের বাস ছিল। এর প্রধান কারণ সপ্তগ্রাম বন্দর। বন্দরটি সরস্বতী নদীর মাধ্যমে গঙ্গা নদীর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হওয়ায় বাংলায় উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী সহজেই জলপথে গঙ্গা পার হয়ে বঙ্গোপসাগর এবং সেখান থেকে বহির্ভারতে পণ্য আমদানি-রপ্তানির কেন্দ্র হয়ে ওঠে। নদীবেষ্টিত সপ্তগ্রামের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির বর্ণনা দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক শত শত মহাজনি নৌকার উল্লেখ করেছেন। তাই রূপা রাজার গাজন পরিক্রমা নদী পার হয়েছে "সরস্বতীর উপর সাঁকো নাই, পুল নাই, খেয়ার নৌকাও নাই। মহাজনি নৌকার ছইয়ের উপর দিয়া পারাপার হয়।... যেন একটি একটি নৌ-সেতু হইয়াছে।"[৬]

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিহারী দত্ত, সাতগাঁ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ বণিক। বিহারী দত্ত ছাড়াও সাতগাঁ অঞ্চলের আরও অনেক বণিকের উল্লেখ করেছেন ঔপন্যাসিক, যাদের নাম আমরা 'চণ্ডীমঙ্গল'[৭] ও 'মনসামঙ্গল'[৮] কাব্যে পাই- হাতিরাম রায়, স্বরূপ দে, শ্যাম লাহা, যদু কুণ্ডু, মধু ঘোষ, রাম মিত্র প্রমুখ। বিহারী দত্তের ব্যবসায়িক প্রতিপত্তি শুধু বাংলায় নয়, "জাবা, বোর্ণিও, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে যত জাহাজ যাইত, সবই তাহার ছিল। সেখানকার সব মাল তাহার একচেটিয়া ছিল।"[৯] বিহারী দত্তের পৈতৃক সম্পদ বেশি না থাকলেও বহুবার সমুদ্রযাত্রা করে প্রচুর সম্পদ আহরণ করেছিলেন তিনি।

সপ্তগ্রামের বণিকমহলে বিহারী দত্তের যথেষ্ট প্রভাব ছিল, এমনকি যেকোন ব্যবসায়িক সমস্যা বা সিদ্ধান্তগ্রহণ কালে তার সিদ্ধান্তই সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হতো।

উপন্যাসে সপ্তগ্রামের বণিকরা কী কী পণ্য আমদানি-রপ্তানি করত তারও বর্ণনা দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। বিহারী দত্ত রান্নার মশলা, পানের মশলা, আমদানি করত জাভা, বোর্ণিয়ো, সুমাত্রা থেকে। লেখক দেখিয়েছেন বণিকদের মধ্যে তখন ব্যবসায়িক পণ্যের ভাগাভাগি ছিল- "বেনেদের ভিতর তখন চারিটি আশ্রম ছিল- ছত্তিক-আশ্রম, দেশ-আশ্রম, সজ্ঘ-আশ্রম ও রাউত-আশ্রম। যাহারা ভিক্ষুদের ধূপধুনা অগুরুচন্দন বেচিত, তাহাদিগকে সজ্ঘ আশ্রম বলিত। যাহারা ছাউনিতে আতর, গোলাপ ও অন্যান্য সখের জিনিস বেচিত তাহাদের আশ্রম রাউত-আশ্রম। যাহারা দশগাঁয়ে গিয়া রান্নার মশলা ও পানের মশলা বেচিত, তাহাদিগকে দেশ-আশ্রম বলিত। আর যাহারা নগরে বসিয়া ছত্রিশ জাতিকে নানাবিধ সুগন্ধ দ্রব্য বেচিত, তাহাদের আশ্রমের নাম ছত্তিক-আশ্রম।"[১০] ব্যবসার জন্য প্রয়োজন মজুতঘর বা গোলা। নৌকায় যাতায়াতের সুবিধার জন্য বিহারী দত্তের গোলা ছিল গঙ্গা তীরবর্তী গোলান গ্রামে। সেখানেই তিনি ব্যবসার সামগ্রী মজুত করতেন এবং ব্যবসায় ব্যবহৃত সওদাগরী 'শত শত ডিঙা' গোলীনের ঘাটে বাধা থাকতো। বিহারী দত্তের ব্যবসার পরিমান এতটাই বড় ছিল যে ব্যবসার কাজে অনেক লোকের কাজের সংস্থান ও তিনি করেছিলেন।

প্রাচীনকালে বাঙালি বণিকদের ধর্ম পরিচয় দিতে গিয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন প্রাচীন বাঙালি বণিকরা হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মমতের প্রতিই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সপ্তগ্রামের বণিক বিহারী দত্তের হিন্দু ধর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থাকলেও বৌদ্ধগুরু শান্তশীলের আশীর্বাদে নিঃসন্তান বিহারী দত্তের একটি কন্যাসন্তান জন্ম, তাকে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। সমকালে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম তাদের প্রচার ও প্রচারের জন্য বণিককুলকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করত। বাঙালি সমাজব্যবস্থায় বণিকরা জাতিবিন্যাসের দিক থেকে তেমন উচ্চসম্মান না পেলেও তাদের আর্থিক সমৃদ্ধি সমাজজীবনে প্রভূত প্রতিপত্তি এনে দিয়েছিল। তাই 'বেণের মেয়ে' উপন্যাসে বিহারী দত্তের বিপুল সম্পদের উত্তরাধিকারের লোভে হিন্দু ও বৌদ্ধ দুই ধর্মের প্রবল বিরোধ বাংলার সমাজ ইতিহাসের এক ঐতিহাসিক কালখণ্ডকে চিত্রিত করেছে। ঔপন্যাসিক বিহারী দত্তের উত্তরাধিকারী একমাত্র মেয়ে মায়াকে নিজ নিজ ধর্মে আনার প্রবাল চেষ্টা হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মের সংঘাতকে ত্বরান্বিত করেছিল। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে দক্ষিণ রাঢ়ের হিন্দু রাজা রণশূর, পূর্ববঙ্গের রাজা হরিবর্মার মিলিত শক্তি সাতগাঁ অঞ্চলের বৌদ্ধ রাজা রূপনারায়ণকে পরাজিত করে সপ্তগ্রামে বৌদ্ধধর্মের প্রসারকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দশম-একাদশ শতকের বাংলার সমাজ ইতিহাসকে হিন্দু-বৌদ্ধ সংঘাতের কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন। বৌদ্ধধর্মের বিস্তারকে রুদ্ধ করে বাংলায় বিশেষত দক্ষিণবঙ্গে হিন্দুধর্মের একাধিপত্য বিস্তারে বণিক বিহারী দত্তের নৌবাণিজ্যের

মাধ্যমে সংগৃহীত সম্পদ নির্ণায়ক শক্তি হয়ে উঠেছিল যার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ বর্ণিত হয়েছে 'বেণের মেয়ে' উপন্যাসে।

উপন্যাসে বাঙালি বণিকদের প্রতিনিধি সাতগাঁর প্রসিদ্ধ বণিক বিহারী দত্ত। 'বেণের মেয়ে' উপন্যাসের মূল কাহিনির সূত্রপাত ৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে বিহারী দত্তের নৌবাণিজ্যে লোকসানের বর্ণনার মাধ্যমে। নৌবাণিজ্যে প্রভূত লভ্যাংশের (শতকরা ২০০ টাকা) বদলে বিহারী দত্ত দেখলেন তিন চার বার বাণিজ্যযাত্রায় লোকসান হচ্ছে, তাই তিনি নিজে বাণিজ্যযাত্রায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। বিহারী দক্ষ বণিক, ব্যবসার সবটুকু তার জানা। তাই তিনি গোলীনের ঘাটে বাণিজ্যযাত্রার প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। মাঝি মাল্লা নিয়োগ, নৌকা সাজানো এবং যে যে দেশে বাণিজ্যজাত যেসব দ্রব্যের বিপুল চাহিদা রয়েছে সেইসব দ্রব্য নৌকায় মজুত করতে লাগলেন। সমুদ্রযাত্রায় বিপদের প্রবল সম্ভাবনা, প্রাণহানির আশঙ্কায় বিহারী দত্তের স্ত্রী তাকে বাণিজ্যে যেতে দিতে রাজি নন। মূলত এই পারিবারিক কারণেই বিহারী দত্ত শেষ কয়েকবছর নিজে বাণিজ্যযাত্রা করেননি। কিন্তু বিহারী জাত বেণে, তাই বিপুল লাভের ব্যবসায় লোকসান হতেই তিনি আবার সমুদ্র পেরিয়ে বাণিজ্যে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, এবারের বাণিজ্যযাত্রায় তার সঙ্গী স্ত্রী ও কন্যা। সপরিবারে বাণিজ্যযাত্রা প্রসঙ্গে বাঙালি সমাজে বিভিন্ন বাধা নিষেধ ছিল- "পরিবার সঙ্গে বিদেশে যাওয়া! এতো আমাদের দেশে কখনও হয় নাই। গেলে ভারী নিন্দা হবে।"[১১] সম্ভবত বিহারী দত্ত সামাজিক প্রতিপত্তি ও বিপুল অর্থের প্রভাবেই সমুদ্রযাত্রা সম্পর্কিত সামাজিক বাধা নিষেধকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাঙালি বণিক বিহারী দত্তের সমুদ্রযাত্রার বর্ণনা দিতে গিয়ে 'মনসামঙ্গল' কাব্যের বণিক চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্যযাত্রার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। "ডিঙ্গা একখানা নয়, দুইখানা নয়, এক এক সাজ্ঘায় সাতখানি করিয়া ডিঙ্গা- এমন সাত সাজ্ঘা ডিঙ্গা ভাসিল। প্রত্যেক সাজ্ঘায় এক একজন বুড়া পাটনী। আর মধুকর নামে যে ডিঙ্গায় বিহারী দত্ত ও তার পরিবার ছিল তার পাটনী এই সকল সাজ্ঘার কর্তা।"[১২] সাহিত্যে বাঙালির নৌবাণিজ্যের ইতিহাস বর্ণনাকালে বাঙালি সাহিত্যিকদের একটি সাধারণ প্রবণতা মঙ্গলকাব্যের প্রসঙ্গ উল্লেখ। সেক্ষেত্রে মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্যযাত্রার উল্লেখের একাধিক উদাহরণ আমরা পাই। এ প্রসঙ্গে আমিয়ভূষণ মজুমদার এবং সেলিনা হোসেন রচিত 'চাঁদবেনে' উপন্যাসের কথা, উৎপল দত্তের 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকের উল্লেখ করতে পারি। বাণিজ্যযাত্রায় প্রতি নৌকার নিরাপত্তার জন্য দশজন করে তীর, ধনুক, ঢাল, তরবারি সজ্জিত সৈন্য সদাপ্রস্তুত।

বিহারী দত্তের নৌকায় যে সমস্ত পণ্য বিক্রির জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তার বিবরণ বাংলা থেকে বিদেশে রপ্তানি দ্রব্যের বিবরণের আভাস দিয়েছে- "সব নৌকার খোলে মাল বোঝাই, এ সব বিক্রির মাল- ভাল কাপড়, বারাণসী শাড়ি, ঢাকাই মসলিন, খেলনা, গাঁজা, সিদ্ধি, চন্দনকাঠ, পাট, থলে, রেশম, তসর, গরদ, ক্ষীরোদ ইত্যাদি।"[১৩] এমনকি ঔপন্যাসিক নৌকার মাঝি, মাল্লা, যাত্রীদের জন্য সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্যের ও উল্লেখ

করেছেন- "এক একখানা নৌকায় কেবল খাবার জিনিস- চাল, আটা, লবণ, নারিকেল, চিড়া, ছাতু, তেল, ঘি, চিনি।"[১৪]

'মনসামঙ্গল' বা 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের কবিরা যতটা বিস্তৃতভাবে চাঁদ সওদাগর কিংবা ধনপতি-শ্রীমন্তের নৌকার বিবরণ দিয়েছেন ততটা বিস্তৃত না হলেও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাঙালি বণিক বিহারী দত্তের বাণিজ্যযাত্রার নৌকাগুলির গঠন-কাঠামোর বিবরণ দিয়েছেন- "কতকগুলি হালের দিকে খুব উঁচা, অপরদিকে তত উঁচা নয়। এগুলি প্রায় গোল। ইহাদের খোল ফাঁদাল ও গভীর- অনেক মাল ধরে- প্রায় আগাগোড়া ছইয়ে ঢাকা। ...এক এক খানি ছইয়ের নীচে অনেকগুলি কামরা। ...ছইয়ের উপর একটি প্রকাণ্ড মাচা, মাচার উপর একটি ঘর। বুড়া পাটনী রাতদিন সেই মাচার উপর হাল ধরিয়া বসিয়া থাকিত। হালখানি দেখিতে মাছের লেজের মত। ... প্রত্যেক নৌকার দুই ধারে পিতলের দুইটা করিয়া বড় বড় চোখ। মাঝখানে বড় বড় বেণের নাম লিখা।
আর এক সজ্ঘার নৌকাগুলি লম্বা ছাঁদের। ... এক এক নৌকায় ৩০/৪০ খানি করিয়া দাঁড়, প্রকাণ্ড মাস্তুল ও অনেকগুলি করিয়া শাল।"[১৫] নৌকার মাঝিদের বাণিজ্য যাত্রাপথের সম্যক জ্ঞান থাকতো। তাই নদীপথে কোথায় নাব্যতা কম, কোথায় চড়া বাঁচিয়ে নৌকা নিয়ে যেতে হবে- যাত্রাপথের সবটা তাদের নখদর্পণে ছিল। সমুদ্রযাত্রার পূর্বে মাঝি-মাল্লারা কিছু ধর্মীয় রীতি মেনে চলেন, উপন্যাসে তারও বিবরণ রয়েছে। তাই সমুদ্রপূজা করে মাঝিরা বরুণদেবের সারি গান করতে করতে সমুদ্রপথে এগিয়ে চলল।

বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে বাংলার বণিকরা বালিদ্বীপ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বোর্ণিয়ো প্রভৃতি অঞ্চলে তাদের ব্যবসাকে ছড়িয়ে দিয়েছিল। বালিদ্বীপের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্যিক সম্পর্ক অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। লেখকের বর্ণনা থেকে দেখা যাচ্ছে অনেক বাঙালি সেখানে কর্মসূত্রে বসবাস করতেন- "অনেক বাঙালি বহুদিন ধরিয়া বিদেশে বিহারীর কাজ করতেছিল, তাহারা অনেকে ছুটি লইয়া, অনেকে ইস্তফা দিয়া, অনেকে বৃত্তি বার্ষিক লইয়া, অনেকে আবার বরখাস্ত হইয়া দেশে ফিরিল।"[১৬] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বর্ণনা 'অনেকে বৃত্তি বার্ষিক লইয়া'- থেকে বোঝা যায় বিদ্যাশিক্ষাচর্চার আদান-প্রদানের দিক থেকেও বাংলার সঙ্গে বালিদ্বীপের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সাতটি সাজ্ঘায় ঊনপঞ্চাশটি নৌকা নিয়ে বিহারীর বহির্বাংলায় বাণিজ্যের যে ছবি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বেণের মেয়ে' উপন্যাসে তুলে ধরেছেন তা বাংলার অতীত ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল পুনরুদ্ধার।

বাণিজ্য যাত্রাকালে বিবিধ বিপদের কথাও উল্লেখ করেছেন ঔপন্যাসিক। বালিদ্বীপে যাত্রাকালে 'রাক্ষসদ্বীপ' এর কথা বলেছেন ঔপন্যাসিক। সম্ভবত এই রাক্ষসদ্বীপ হল সিংহল বা বর্তমান শ্রীলঙ্কা। লেখক সেখানকার নর মাংসভোজী রাক্ষসদের বিবরণ দিয়েছেন সত্য, তবে সে বর্ণনায় কিছুটা অতিকথন আছে। সমুদ্রযাত্রায় সব থেকে বড় বিপদ সামুদ্রিক ঝড়। বিহারীর নৌবহর সামুদ্রিক ঝড়ে

কিভাবে বিপদে পড়ে তার বর্ণনাও দিয়েছেন লেখক। বাতাসের প্রচণ্ড ঝাপটায় নৌকাগুলি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। "সিকি মাইল, আধমাইল এমনকি এক মাইল লম্বা এক একটি ঢেউ আসিয়া নৌকায় ধাক্কা লাগিল। নৌকা যেন চুরমার হইয়া যাইতে লাগিল। ...দশ হাত, কুড়ি হাত, ত্রিশ হাত পর্যন্ত জল ফুলিয়া উঠে; সেই ফুলা জলের মাথায় নৌকাগুলি মোচার খোলার মতো উঠিয়া পড়ে।"[১৭] শেষ পর্যন্ত বুড়া মাঝির তৎপরতায় বিহারীর বাণিজ্যযাত্রায় সংগৃহীত পঞ্চাশ পিপা গর্জনতেল সমুদ্রে ঢেলে দেওয়ায়, তবে সমুদ্রের ঝড় থামে। গঙ্গার মোহনায় যখন বিহারীর নৌকাগুলি নোঙর করেছিল তখন সুন্দরবনের বাঘ ও কুমিরের বিপদের কথা উপন্যাসে উল্লিখিত হয়েছে। বিহারী দত্তের মেয়ে সুন্দরবনের বাঘের আক্রমণে পড়লে সাতগাঁর বণিকপুত্র জীবন ধনী তাকে রক্ষা করেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সাতগাঁ অঞ্চলের সঙ্ঘ-আশ্রমের শ্রেষ্ঠ বণিক ধনী বংশের সাধু ধনীর উল্লেখ করেছেন। তিনি বৌদ্ধ সঙ্ঘে ধূপ, ধূনা, মধু, অগুরুচন্দন, কর্পূর, গন্ধতেল, পানমশলা, রান্নার মশলার ব্যবসা করতেন। এমনকি সুন্দরবন থেকে সংগৃহীত বাঘের ছাল, বাঘের নখ, কুমিরের হাড়-চামড়া, সুন্দরী কাঠ, গোলপাতা, মাদুরের একচেটিয়া ব্যবসা ছিল সাধু ধনীর। সপ্তগ্রাম বন্দরকে কেন্দ্র করে বাংলার বণিকদের সমৃদ্ধ জনপদ গড়ে উঠেছিল। মঙ্গলকাব্য থেকে পরবর্তী একাধিক সাহিত্যে সমৃদ্ধ জনপদ সপ্তগ্রামের বণিকদের উল্লেখ রয়েছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বেণের মেয়ে' উপন্যাসে সেই পরম্পরা অনুসরণ করে বাংলার বাণিজ্য ইতিহাসের ছবিকে তুলে ধরেছেন অতীতচারিতার মাধ্যমে।

'বেণের মেয়ে' উপন্যাসে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যেমন সাতগাঁর প্রসিদ্ধ বণিক বিহারী দত্তের ব্যবসায়িক প্রতিপত্তির উল্লেখ করেছেন তেমনি একমাত্র কন্যা মায়ার বিধবা হওয়ার পর বিহারীর ব্যবসার অবনতিরও ইঙ্গিত দিয়েছেন। জামাই, জীবন ধনীর মৃত্যুর পর ধনী পরিবার ও নিজের ব্যবসা সবটাই সামলান বিহারী। কিন্তু বিহারীর পরবর্তীকালে পূর্বেকার মতো বহির্বাংলায় নৌবাণিজ্য যাত্রার কোন উল্লেখ উপন্যাসিক করেন নি। এমনকি বিদেশে বাণিজ্য করে যে মুনাফা অর্জন করতেন তা বন্ধ হওয়ায় বিহারী- "নগদ টাকা সুদে খাটাইতেছেন।"[১৮] যে বণিক দেশে-বিদেশে ব্যবসা করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করতো তার ঘরে বসে সুদে টাকা ধার দেওয়ার কারবারি হয়ে ওঠার মধ্যদিয়ে বাংলার অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ছবিই উঠে এসেছে। একসময়ের সমৃদ্ধ সপ্তগ্রামের বণিকদের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ইঙ্গিতকে তুলে ধরেছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। পঞ্চদশ-সপ্তদশ শতকে সরস্বতী নদীর নাব্যতাহ্রাস, পোর্তুগিজ জলদস্যুদের লুটতরাজ, বাংলার দুর্বল রাজশক্তির ফলে সপ্তগ্রাম বন্দরের পতন এবং সপ্তগ্রামের বণিকদের হুগলি, কলকাতা বন্দরকে কেন্দ্র করে ব্যবসা পরিচালনা- এ যেন সপ্তগ্রাম বন্দরের অবক্ষয়ের ধারাবাহিক ইতিহাসের ইঙ্গিত।

অন্যদিকে বৌদ্ধ সঙ্ঘের ভিক্ষুকদের ব্যবসা-বাণিজ্য করে সম্পদ আহরণের ইতিহাসও উঠে এসেছে উপন্যাসে। গৌতম বুদ্ধের অনেক শিষ্যই ব্যবসা করতেন, ইতিহাসে তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের ব্যবসা-বাণিজ্যের উল্লেখ প্রসঙ্গের প্রমাণ পাওয়া যাবে রাধাকুমুদ মুখার্জি রচিত 'ইন্ডিয়ান শিপিং' গ্রন্থে।[১৯]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দশম-একাদশ শতাব্দীর বাংলার সমাজ ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন উপন্যাসে। সেইসময় বাংলায় যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ছিল জলপথে নৌকার ব্যবহার। সাতগাঁ বন্দরকে কেন্দ্র করে সরস্বতী ও গঙ্গা নদীর মাধ্যমে বাংলা, বহির্বঙ্গের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিল। মায়ার অপহরণকে কেন্দ্র করে বাংলার হিন্দু রাজার সঙ্গে সাতগাঁর বৌদ্ধ রাজার বিরোধ সম্মুখ সমরে উপনীত হয়। এই যুদ্ধে নির্ণায়ক শক্তি হয়ে উঠেছিল সাতগাঁ বণিকদের নৌকা। মূলত নৌশক্তির জোরেই রাজা রণশূর, হরিদেব বর্মা প্রমুখের মিলিত বাহিনী বৌদ্ধ রাজা রূপনারায়ণকে সহজেই পরাজিত করতে পেরেছিল। শুধু যুদ্ধজাহাজ হিসেবেই নয় পণ্য পরিবহণেও তৎকালে নৌকার বহুল ব্যবহার প্রচলিত ছিল। তাই সাতগাঁ অঞ্চলে যুদ্ধ শুরু হলে নৌকার অভাবে পণ্য পরিবহণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধি- "তাহাতে বেণেদের নৌকা না থাকায় বিদেশী জিনিস কিছুই পাওয়া যায় না। জিনিসপত্র দুর্মূল্য হইয়া উঠিল। প্রজা-বিরাগ আরও বাড়িয়া যাইতে লাগিল।"[২০]

প্রাচীন বাংলায় নৌবাণিজ্যে ব্যবহৃত একাধিক নদীপথের উল্লেখ রয়েছে উপন্যাসে। কুন্তী নদী বর্তমাণ পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গায় মিশেছে। খড়ি ও বল্লুকা নদী দুটি বর্তমান বর্ধমান জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গানদীতে মিশেছে। সরস্বতী নদীর তীরেই সপ্তগ্রাম বন্দর গড়ে উঠেছিল যা বেতড়ে গিয়ে পুনরায় গঙ্গার মূল প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ভৈরব ও বেঙ নদী গঙ্গার শাখানদী, যার জলপথ নৌবাণিজ্যে ব্যবহৃত হতো। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দক্ষিণবঙ্গের নদীপথ বেষ্টিত বাংলার ভূ-ভাগের ভৌগোলিক চিত্র নির্মাণ করেছেন। এই নদীবেষ্টিত জলপথগুলিই নিম্নবাংলার বণিকদের নৌবাণিজ্যে পারদর্শী করে তুলেছিল।

বণিক হিসাবে বিহারী দত্তের প্রতিপত্তি তাকে সামাজিক স্বীকৃতি এনে দিয়েছিল। শ্রেণীবিভক্ত বাঙালি সমাজে তারা শূদ্র হিসেবে গণ্য হলেও শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষমতার জোরে বিহারী দত্ত সাতগাঁর রাজা হয়েছেন। তাই যুদ্ধ জয়ের পর রাজা রূপনারায়ণের রাজ্য যখন ভাগ-বাটোয়ারা চলছে তখন জাত বণিক বিহারী দত্ত ভূখণ্ডের বদলে বাণিজ্যিক ছাড়পত্র চেয়েছে- "বেণেরা জমী-জমীদারী চায় না, ...তাহারা চায় বাণিজ্যের একটু সুবিধা। ...বিদেশী মাল ...যাহাতে অবাধে বিনা মাশুলে সাতগাঁ পৌঁছিতে পারে এইটুকু করিয়া দিলে বেণেদের যথেষ্ট উপকার করা হইবে।"[২১] এ ছবি যেন বাংলার নবাবের থেকে ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার ফরমান আদায়ের সঙ্গে তুলনীয়। দশম-একাদশ শতাব্দীর বাঙালি বণিকের ব্যবসায়িক বুদ্ধি আর

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ বণিকের বাংলায় একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার আদায়- বাংলার বাণিজ্য অধিকারের পরস্পরবিরোধী দুই অভিমুখ এক হয়ে গেছে উপন্যাসে। বিহারী দত্তের ব্যবসায়িক বুদ্ধি কতটা প্রখর ছিল তার আরেকটি প্রমাণ নিঃশুল্কে বাণিজ্য অধিকার অর্জনের প্রসঙ্গে উঠে এসেছে- "এখন যা মাশুল আদায় হয়, তাহার উপর ৩/৪ টা মুনাফা চড়িয়া মাল মহার্ঘ্য করিয়া দেয়। যদি ঐ মাশুলটা এক টাকা কমে, তবে মালের দাম দুই টাকা কমিবে, সারা বাংলার উপকার হইবে।"[২২] ভাবতে অবাক লাগে দশম-একাদশ শতাব্দীর একজন বণিকের ভাবনায় বিংশ শতাব্দীর ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাজাত এই পরিণত বাণিজ্যবুদ্ধি এল কোথা থেকে? এমনকি দক্ষ অর্থনীতিবিদের মতো বাজার ব্যবস্থার জটিল সমীকরণকেও বিহারী দত্ত আয়ত্ত করেছে- "প্রজার দুই টাকা লোকসান করিয়া রাজার এক টাকা লাভ- বড় ভালো কথা নয়। সে দুটা টাকা প্রজার ঘরে থাকিলে প্রজাও দশের জন্য, দেশের জন্য দশ টাকা খরচ করিতে পারিবে। রাজাও দরকার হইলে মাঙ্গন-মাথট[২৩] করিয়া যথেষ্ট আয় করিতে পারিবেন।"[২৪] এযেন ধনতান্ত্রিক উদারনীতিবাদের কথা বলছে বিহারী। বিংশ শতাব্দীর মুক্ত বাণিজ্যনীতির প্রসঙ্গই যেন উঠে এসেছে বাঙালি বণিক বিহারী দত্তের কণ্ঠে।

মস্করী 'রাজসভা'য় আমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে পূর্ব ভারতের বহু রাজ্যে গিয়েছিলেন, এই যাত্রার বেশিরভাগটাই ছিল জলপথে। মস্করী কনৌজ, রাজগৃহ, উত্তররাঢ়, দক্ষিণরাঢ়, বারেন্দ্র, কামরূপ, শ্রীহট্ট, সমতট, বঙ্গ, চম্পানগর, বিক্রমশীলা বিহার, দুগ্গগিরি (মুঙ্গের), মগধ, নালন্দা প্রমুখ জায়গায় আমন্ত্রণ উপলক্ষে গমন বাংলার সঙ্গে উক্ত রাজ্যের যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তার প্রমাণ। এবং সে যোগাযোগ বাণিজ্যিক- এ ভাবনাও কষ্টকল্পিত নয়। এমনকি মস্করী সেখানে পারসী, বৌদ্ধ, রোম দেশের বণিকদের দেখা পেয়েছিলেন। আসলে বহু প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য, রোম প্রভৃতি অঞ্চলের সরাসরি বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। উপন্যাসের শেষে গুরুপুত্রের সুবর্ণদ্বীপ যাত্রা বাংলার সঙ্গে বহির্বাংলার বাণিজ্যিক যোগাযোগের ইঙ্গিত বহন করে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাংলার বাণিজ্যের সেই অতীত ইতিহাসকেই তুলে ধরেছেন 'বেণের মেয়ে' উপন্যাসে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যতটা ঔপন্যাসিক ছিলেন তার চেয়ে বেশি ছিলেন ইতিহাসবিদ। সেইজন্য 'বেণের মেয়ে' উপন্যাসটিতে আখ্যান অংশ যেটুকু আছে তা যদিও সক্ষ্যম কথাসাহিত্যিকেরই নির্মাণ, তা সত্ত্বেও আখ্যানের আকর্ষণের চেয়ে প্রকৃতপক্ষে 'বেণের মেয়ে' উপন্যাসে বড় হয়ে ওঠে বাংলার বণিক সমাজের বিবরণ এবং সমাজের সামগ্রিক প্রেক্ষিতে বণিককুলের অবস্থানের খুঁটিনাটি। বাণিজ্যসূত্রে নৌবাণিজ্যের বিষয়টি তাই প্রাধান্য পেয়েছে উপন্যাসে। উপন্যাসে একাধিক ঐতিহাসিক চরিত্রের উপস্থিতি- লুই সিদ্ধা, হরিবর্মদেব, ভবদেব ভট্ট, প্রশস্তপাদ, শান্তিদেব, পান্ডুদাস, বাচস্পতি মিশ্র, মহীপাল, ইন্দ্রভূতি, বজ্রদত্ত, শ্রীহর্ষ প্রমুখ চরিত্রকে ঔপন্যাসিক দীর্ঘ কালখণ্ড থেকে গ্রহণ

করতে গিয়ে অনিবার্যভাবে উপন্যাসে কালাতিক্রমণ দোষ ঘটেছে। তবে এই ঐতিহাসিক বিচ্যুতি সত্ত্বেও ‘বেণের মেয়ে’ উপন্যাসের সাহিত্যমূল্য অনস্বীকার্য।

তথ্যসূত্র :

১।https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A6_%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80
২। সরকার, বিজলী, মে-আগস্ট ২০১৪, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বেণের মেয়ে, কলকাতা, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, পৃ. ১৮৪-১৮৬
৩। চৌধুরী, সত্যজিৎ ও অন্যান্য (সম্পা.), ১৯৮০, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পৃ. ৩১০
৪। চৌধুরী, সত্যজিৎ ও অন্যান্য (সম্পা.), ১৯৯১, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড), কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পৃ. ১৯৮
৫। সাহানা, বিথীকা, ২০১৫, বিস্মৃত বিশ্রুত ঔপন্যাসিক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও চণ্ডীচরণ সেন, কলকাতা, সাহিত্য তক্কো, হেমন্ত ১৪২২ সংখ্যা, পৃ. ২০৬-২০৭
৬। চৌধুরী, সত্যজিৎ ও অন্যান্য (সম্পা.), ১৯৯১, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৮
৭। সেন, সুকুমার (সম্পা.), ১৯৯৩, চণ্ডীমঙ্গল, মুকুন্দ চক্রবর্তী, নয়াদিল্লি, সাহিত্য একাদেমি, পৃ. ১৭৮
৮। মিত্র, তন্ময়, মীর রেজাউল করিম ও সুবোধ কুমার যশ (সম্পা.), ২০১০, মনসামঙ্গল, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, পৃ. ১৩৪
৯। চৌধুরী, সত্যজিৎ ও অন্যান্য (সম্পা.), ১৯৯১, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ২২০
১০। তদেব, পৃ. ২২০-২২১
১১। তদেব, পৃ. ২২৪
১২। তদেব, পৃ. ২২৪
১৩। তদেব, পৃ. ২২৪
১৪। তদেব, পৃ. ২২৪
১৫। তদেব, পৃ. ২২৫
১৬। তদেব, পৃ. ২২৮
১৭। তদেব, পৃ. ২৩০
১৮। তদেব, পৃ. ২৮২

১৯। Mookherji, Radha Kumud, 1957, Indian Shipping, Allahabad, Kitab Mahal Pvt. Ltd., p. 18-21
২০। চৌধুরী, সত্যজিৎ ও অন্যান্য (সম্পা.), ১৯৯১, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৭
২১। তদেব, পৃ. ৩১৪
২২। তদেব, পৃ. ৩১৪
২৩। বিবিধ রাজকর। জমিদাররা বিভিন্ন উপায়ে করের অতিরিক্ত মাথা পিছু যে অর্থ আদায় করতেন তাই মাঙ্গন-মাথট।
২৪। চৌধুরী, সত্যজিৎ ও অন্যান্য (সম্পা.), ১৯৯১, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৪

সহায়ক গ্রন্থ :

১। নাহার, মোসা. শামসুন, ২০১৬, উপন্যাসে প্রাচীন বাংলা, ঢাকা, বাংলা একাডেমি।
২। মুখার্জি, উদয় রতন ও রঞ্জনা ভট্টাচার্য (সম্পা.), ২০১৫, বাংলা উপন্যাসের দেড়শ বছর (প্রথম পর্ব: ১৮৬৫-১৯১৪), কলকাতা, সাহিত্য তক্কো।
৩। মুখোপাধ্যায়, মীনাক্ষী, ২০০৩, উপন্যাসে অতীত ইতিহাস ও কল্প ইতিহাস, কোলকাতা, থীমা প্রকাশনী।
৪। চৌধুরী, সত্যজিৎ ও অন্যান্য (সম্পা.), ১৯৯১, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড), কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।
৫। চৌধুরী, সত্যজিৎ ও অন্যান্য (সম্পা.), ১৯৮০, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।
৬। সেন, সুকুমার (সম্পা.), ১৯৯৩, চণ্ডীমঙ্গল, মুকুন্দ চক্রবর্তী, নয়াদিল্লি, সাহিত্য একাদেমি।
৭। মিত্র, তন্ময়, মীর রেজাউল করিম ও সুবোধ কুমার যশ (সম্পা.), ২০১০, মনসামঙ্গল, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।
৮। ঘোষ, দীনেশ চন্দ্র, ২০০৪, সপ্তগ্রাম: উদয়-অস্ত, বর্ধমান, ভারত বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র।
৯। গোস্বামী, সত্রাজিৎ (সম্পা.), ২০০৮, সপ্তগ্রাম-স্মৃতিপত্র (সপ্তগ্রামের বণিক ও বাণিজ্য), হুগলি, ইতিহাস-সাহিত্য-সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র।
১০। ভট্টাচার্য, তন্ময়, ২০২৪, বাংলার কাব্য ও মানচিত্রে উত্তর ২৪ পরগনা ও হুগলি জেলার গঙ্গা-তীরবর্তী জনপদ (১৪৯৫-১৮৭৩), হুগলি, মাস্তুল।
১১। Mookherji, Radha Kumud, 1957, Indian Shipping, Allahabad, Kitab Mahal Pvt. Ltd.

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে সুন্দরবন অঞ্চলের জনজীবন, জীবিকা ও বিপন্নতা

অনুময় মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

সারসংক্ষেপ: পশ্চিমবঙ্গের যে দক্ষিণকে মুখের কথায় নিচু বাংলা, আবাদ, সাগর বলে, সুন্দরবন হিসেবে যা বেশি পরিচিত, তার দক্ষিণ বিন্দু ক্রমেই দক্ষিণে গড়িয়ে যাচ্ছে। সমুদ্র সন্নিহিত এই সুন্দরবনের মানুষদের প্রতিনিয়তই জীবিকার জন্যে প্রাকৃতিক সম্পদের উপরই নির্ভর করতে হয়। ফলত, অনুন্নত এই অঞ্চলের মানুষদের নানা বিপন্নতার সম্মুখীন হতে হয়। এছাড়াও শাসকশ্রেণী, জোতদার, জমিদারদের দ্বারাও এরা দিনের পর দিন শোষিত হয়, অবহেলিত হয়। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় এখানকার সরকারি ভূমি ও ভূমি-সংস্কার দপ্তরে কর্মরত থাকার জন্যে সহজেই সুন্দরবন অঞ্চলের জনজীবনের জীবিকা সংগ্রহ ও নানা সংকটের চিত্র তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। এটিই আমার প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।
সূচকশব্দ : জনজীবন, জীবিকা, তেভাগা, চাষাবাদ, নদীরচর, নোনাজল, বিপর্যয়, উচ্ছেদ প্রভৃতি।

মূল আলোচনা:

হিমালয় ও ছোটনাগপুর পর্বতমালার মৃত্তিকা ও পাথরের টুকরো গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রসহ অন্যান্য শাখা নদী দিয়ে বঙ্গোপসাগরের নোনাজলের সংস্পর্শে এসে পৃথিবীর বৃহত্তম লবণাম্বু উদ্ভিদের বনভূমি তথা সৃষ্টিশীল ব-দ্বীপ গড়ে তোলে। এই ব-দ্বীপই ‘সুন্দরবন’। স্থানীয় ভাষায় এই অঞ্চলটি ‘আবাদ’ নামেও পরিচিত। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ১৩ টি ও উত্তরচব্বিশ পরগনার ৬টি অর্থাৎ একত্রে ১৯ টি উন্নয়নশীল ব্লকের মধ্যে সুন্দরবন প্রায় ৪৩৬৩ বর্গ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে অবস্থিত। যার মধ্যে ২৪০০ বর্গ কিলোমিটার লোকালয়, কৃষিক্ষেত্র ও মাছ চাষের ভেড়ি, অবশিষ্ট অংশ নদী বা নদীর চর।

স্বাভাবিকভাবেই সুন্দরবন অঞ্চলে সৃষ্ট এই চর বা দ্বীপগুলোতে ধীরে ধীরে কলোনি ও জনবসতি গড়ে ওঠে। আর এই অঞ্চলের মানুষদের প্রধান জীবিকা মূলত নদী-সমুদ্রে মাছ ধরা, চাষাবাদ, জঙ্গলের কাঠ সংগ্রহ, ইটভাটায় কাজে যাওয়া প্রভৃতি। কিন্তু আড়তদার এবং ফিশারীর মালিকরা সমুদ্রে উন্নত প্রযুক্তিতে নির্মিত ট্রলারে করে মাছ ধরায়, ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা সেখানে পরিমাণ মতো মাছ সংগ্রহ করতে বিফল হচ্ছে। ফলত তারা আড়তে এবং ফিশারীতে মালিক পক্ষের অধীনে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। অন্যদিকে, জোতদার, জমিদাররা জমির মালিকানা বা স্বত্ব ভাগ চাষীদের দিতে নারাজ।

সেইজন্য সেইসব চাষিরা নিজেদের জীবিকা হারিয়ে অর্থনৈতিকভাবে বিপন্ন হয়ে পড়েছে। এছাড়াও সরকার কর্তৃক বাদা অঞ্চলের চরে অবস্থিত মানুষদের নিজস্ব জনবসতি থেকে উচ্ছেদ করায়, তারা অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। ফলস্বরূপ, যেসব জেলে, চাষীরা তাদের নিজস্ব জীবিকা নিয়ে জীবনধারণ করতো তারা বর্তমানে সংকটের মুখে! তারা যেন নিজেদের জন্মভূমিতে থেকেও এদেশের নাগরিক নয়, কোনো এক 'মানচিত্রের মানুষ'!

বাদা অঞ্চলের এই জনজীবনকে বহু কথা সাহিত্যিক তাঁদের লেখনীতে তুলে ধরেছেন। তাঁদের মধ্যে ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় একজন বিশিষ্ট কথাকার। লেখকের বহু গল্প-উপন্যাস মূলত এই বাদা অঞ্চলকে কেন্দ্র করে লেখা। নোনাজলের গাঙ, বারবার ভাঙ্গন, ছোবল হানে প্রান্তিক মানুষজনের বিপন্ন জীবনযাত্রায়। তার সাথে মিশে থাকে তেভাগা আন্দোলনের স্মৃতি। বর্তমান পঞ্চায়েতি উদ্যোগের ও প্রশাসনিক উন্নয়নের খতিয়ান থেকে ওই অঞ্চলের অন্তেবাসি মানুষদের জীবনযাত্রার ভয়াবহ দূরত্বের ছবি ফুটে উঠেছে ঝড়েশ্বরের নানান গল্পে ও উপন্যাসে। অরুণকুমার বসু বলেন—

> "ঝড়েশ্বরের কথাসাহিত্যে সর্বাঙ্গ জেগে রয়েছে অ-নাগরিক জীবন, নদনদী-পলিমাটি- নোনাজল-জঙ্গল অধ্যুষিত প্রত্যন্ত দক্ষিণবঙ্গ। তিনি সুন্দরবন বেষ্টিত সাহিত্যিকদের অন্যতম প্রতিনিধি।... প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ, আঞ্চলিক শব্দ, সময়ের ঘ্রাণ—সমস্ত মিলিয়ে ঝড়েশ্বর জীবনকে এত কাছ থেকে ছুঁতে পারেন। জীবন তাঁর কাছে বড়ো কম্পমান, বড়ো স্নিগ্ধ।"[১]

লেখক বহু উপন্যাস এবং ছোটগল্প লিখেছেন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। সেগুলির মধ্যে শুধুমাত্র উপন্যাসে সুন্দরবন অঞ্চলের জনজীবন, জীবিকা এবং বিপন্নতা কিভাবে উঠে এসেছে সেটায় আলোচ্য।

❖ রামপদর অশন-ব্যসন (১৯৯৩)

সুন্দরবন অঞ্চলের জঙ্গল পরিষ্কার করে বসতি স্থাপন বা সৃষ্ট চর কিভাবে বেঁচে থাকার প্রধান ক্ষেত্র হয়ে ওঠে তারই প্রতিকৃতি 'রামপদর অশন-ব্যসন' উপন্যাসটি।এই উপন্যাসের চরিত্ররা মূলত খেটে খাওয়া মানুষ। তাদের জীবিকা নির্বাহ হয় প্রধানত কৃষিকাজের মাধ্যমেই। এর পরিশ্রমে তারা যে ধান উৎপন্ন করে সেটাই তাদের বেঁচে থাকার অবলম্বন। কারণ, ধান যেমন তারা দূরবর্তী জায়গায় চালান করতে পারে, তেমনি ধান থেকে উৎপন্ন 'খড়' – এক নতুন ব্যবসার সূত্রপাত করে এই অঞ্চলে। তাই ধান ব্যবসার পাশাপাশি খড় ব্যবসার রমরমা বাজার তৈরি হয় এই চরে। যার জন্য এই চরবাসীরা কিছুটা স্বচ্ছলভাবে জীবনযাপন করতে পারে। এছাড়াও মাছ ধরা, আড়তে কাজ করা, নুন উৎপাদন, মোষ ব্যবসা প্রভৃতি জীবিকার সঙ্গে যুক্ত এখানকার নারী পুরুষ উভয়ই। চরবাসীদের এই বাঁচা মরার কাহিনীকে কেন্দ্রে রেখেই উপন্যাসের কায়া নির্মাণ করেছেন ঔপন্যাসিক।

ঔপন্যাসিক ঝড়েশ্বর ‘রামপদর অশন-ব্যসন’ দিয়ে বাংলা উপন্যাসে এক নতুন প্রেক্ষিত তৈরি করেন।এতদিন পর্যন্ত সুন্দরবনের বিরুদ্ধ প্রকৃতি ও প্রতিকূলতাকে কেন্দ্র করেই বহু সাহিত্য রচিত হলেও ‘খড়’ ব্যবসাকে কেন্দ্র করে জীবিকা নির্বাহের আখ্যান এই প্রথম।লেখক বর্ণনা দিয়েছেন—

> “পরপর সাজানো খড়ের গাদি। ভোরের সূর্যে সোনার খড়।...পরপর একচল্লিশটা ছোটবড় গাদি।... খড়ের গাদাগুলোর পিছনে নি কোন উঠোন দাবা।”[২]

অনুকূল পরিবেশে সংগ্রামী এই চরবাসীদের জীবনযাত্রা যাকে কেন্দ্রে রেখে লেখক দেখিয়েছেন সে উপন্যাসের নায়ক রামপদ।সুন্দরবন অঞ্চলে প্রতিনিয়তই নতুন নতুন দ্বীপের সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে সভ্য সমাজের বহু মানুষ সেখানে আসছে জীবিকার তাগিদে। উপন্যাসে বার্নপুরের রামপদ, বসিরহাটের গোপেশ্বর প্রমুখরা অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যেই এই অঞ্চলে এসেছে। লেখক প্রসঙ্গক্রমে বুঝিয়েছেন রামপদর মূল ডেরা কাকদ্বীপ আর ব্যবসাস্থল হল এই চরভূমি—“এক চরে বসবাস আর একচরে রোজগার”।[৩]

ঔপন্যাসিক রামপদকে কেন্দ্রবিন্দু করে চর জীবনের নিয়ত ঘটনা তুলে ধরেছেন। এই চর সুন্দরবনে গজিয়ে ওঠা এক নতুন চর। এই দ্বীপে গাঙ পাড়ের বহু মানুষের বসবাস। যার চারিদিকে রয়েছে মত্ত ঠাকুরণের নোনা জল আর গেমুয়া, কেওড়ার ঘন ঝোপ। এর মাঝে বেঁচে থাকাটা একটা লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছে চরবাসীদের কাছে। ঔপন্যাসিক চরের বর্ণনা করেন এভাবে—

> “চারিদিকে জল, জলের মধ্যে পাঁচ-ছ’হাজার বিঘে জমিজমা বাস্ত পুকুর নিয়েদু’চারশ মানুষের বসবা। গাঙপাড়ের মানুষগুলো বসবাস উঠিয়ে নিয়ে দ্বীপের মাঝখানে। খানিক উঁচুতে আপাত নিরাপদ বাসস্থান।”[৪]

এই আবাদ অঞ্চলে এত সংখ্যক মানুষের বসবাস হলেও তাদের অনেকাংশই এসেছে অন্যত্র থেকে। একসময় সুন্দরবন অঞ্চলের বহু দ্বীপ বা চরে বসবাসকারী মানুষজনদের একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত পাঠিয়ে দেওয়া হত। কারণ, চরগুলো মূলত সরকারি ভেস্টেট সম্পত্তি। সেখানে বসতি পত্তন করার কোন আইনি অধিকার সাধারণের নেই! তাই সরকার কর্তৃক তাদেরকে উচ্ছেদ করে দেওয়া হত। এই উপন্যাসে দেখা যায় পঞ্চানন, বিশ্বম্ভরের পরিবার বহু আগেই ঘোড়ামারা দ্বীপে এসেছে। বর্তমানে এই চরকে অবৈধভাবে নিয়ন্ত্রিত করছে ঘোষবাবু, মাস্টারবাবু, পেল্লাদ সর্দারদের মতো উচ্চবিত্ত ক্ষমতাশালী মানুষেরা। এই ঘোষবাবুই একদা চরে এনেছিলেন পঞ্চানন, বিশ্বম্ভরের পরিবারদের। মূলত জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষাবাদ ও বসতি স্থাপনের উদ্দেশ্যেই এই পরিকল্পনা। তারপর ভাগচাষী হিসাবে উৎপাদিত ধান তারা খাজনা হিসেবে ঘোষবাবুদের দিত বছরের পর বছর। পঞ্চাননের মায়ের উক্তিতে স্পষ্ট হয়—

> “তোর বাপের সঙ্গে জঙ্গল হাসিল করতে আসি। তখন মাত্তর দশঘর। ঘোষেরা ডেকে এনেছিল। ঝড়-ঝাপটা সাপ-খোপ। বিশালাক্ষীর থান বসিয়ে পুজো আর গাঙের হাবসানি। সেইদশ ঘরবাড়বাড়ন্তহয়ে বাহান্ন উঠোন।”[৫]

চরে বসবাসকারী প্রত্যেক নারী-পুরুষই সংগ্রামী মনোভাবাপন্ন। তারা বর্গাচাষী হিসাবে চাষা বাদ করার জন্য বিত্তশালী শ্রেণীদের বিরুদ্ধে এক জোটে যেমন লড়াই করে তেমনি জীবিকার অন্যান্য ক্ষেত্রে তারা পরস্পরের সহায়ক। গণেশ, দুলাল, যতীন, ব্রহ্মপদ, ভাগ্যধর, কুন্ডু, উত্তরা, আঙুর সকলেই জীবন্ত ও প্রাণবন্ত। অন্যদিকে রামপদর চরে কোন স্থায়ী বসবাস না থাকলেও ব্যবসার জন্য সে চরবাসীদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরি করে। আসলে রামপদর চরে আসার মূল উদ্দেশ্যখড়ের গাদা ক্রয় করা। তাই সে অজিতবাবু, জানাবাবুদের মত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করে। লেখক খড় বিকিকিনির চিত্রকে নিজস্ব ভঙ্গিমায় উপন্যাসে প্রকাশ করেছেন—

> “কালনাগিনী খাল একটু বড়সড়ো জায়গা রেখে বাঁক নিয়েছে। ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে তড়পা। মাথায় গামছা টুপি করে বাঁধা মজুর। জন-তিনেক মজুর ডিঙির খোপ থেকেতড়পাছুঁড়ে দিচ্ছে পাড়নে।...কাহনপিছু রোজ তিন টাকা, খোরাকি বাবদ আড়াই টাকা বাড়তি।”[৬]

একসময় সুন্দরবনের সাধারণ মানুষেরা লবণ তৈরি করত, তাদেরকে বলা হত মালঙ্গি। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ব্রিটিশ সল্ট এজেন্সি এই অঞ্চলে লবণ শিল্প গড়েছিল। “সমগ্র বাংলার লবণ উৎপাদনের অর্ধেক তমলুক হিজলিতে হত আর তিনভাগের একভাগ উৎপাদিত হতো সুন্দরবনের অভ্যন্তরে বারুইপুর, বসিরহাট, রায়মঙ্গল মহলগুলিতে।”[৭] চরজীবনে এই বিনা পুঁজির জীবিকাকে লেখক তাঁর এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। এই পেশার উপর নির্ভর করে বহুচরবাসী বাঁচতে চেয়েছে। তাই দারিদ্রতার সঙ্গে তারা জীবনযাপন করলেও নুনের অভাব তাদের কখনো হয়নি। এছাড়াও উলুপি, কান্তার মতো নারীরা ঘাস কেটে, নদীতে দোন ফেলে জীবিকা নির্বাহ করছে। চরই হয়ে উঠেছে তাদের জীবিকা স্থল। চরজীবনের এই ব্যতিক্রমী আখ্যান লেখক বাস্তব অভিজ্ঞতার নিরিখেই নির্মাণ করেছেন।

❖ চরপূর্ণিমা (১৯৯৫)

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় ‘চরপূর্ণিমা’ উপন্যাসে দক্ষিণচব্বিশ পরগনার একটি ছোট্ট অঞ্চল বেছে নিয়েছেন, যে অঞ্চলটি কাকদ্বীপ, নামখানা কাছাকাছি বা অন্তবর্তী। যে এলাকায় ফরেস্ট অফিস আছে, যেখানে সাগরের নোনা জল ঢুকে পড়ে, মাছের ভেড়ি আছে, সেখানেবাগদা ভেটকির চাষ হয়, সাগর থেকে ট্রলার ধরে আনে রাশি রাশি মাছ, সেই মাছ শুটকি হয়ে চালান যায় ভারতের নানা বাজারে, এমনকি বাইরেও।ঔপন্যাসিক সুন্দরবনের এক প্রান্তিক অঞ্চলকেই তুলে ধরেছেন। যেখানে সভ্য সমাজের প্রযুক্তি কাঠামো এখনো সঠিকভাবে পৌঁছায়নি। আশির দশকে যেসব লেখকরা এইগ্রাম জীবনকে কেন্দ্র করে সাহিত্য রচনা করছেন তাঁদের সম্পর্কে বিমল কর কিছু ব্যক্তিগত

মতামত দিয়েছেন ‘তরুণ গল্প লেখকদের মানসিকতা’ নামক প্রবন্ধে। সেই বক্তব্যটি এখানেও প্রাসঙ্গিক—

> “ইদানীং একাধিক লেখক গ্রামীণ জীবনের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। কারণ কৃষিনির্ভর আমাদের এই দেশে শহুরে সমাজটি সীমাবদ্ধ। বৃহত্তর সমাজটি পড়ে আছে তফাতে, গ্রামে।...ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, তপন বন্দোপাধ্যায়, নলিনীবেরা—আরো কত লেখকের লেখায় গ্রামীণ সমাজকে আমরা দেখতে পাই।”[৮]

‘চরপূর্ণিমা’ উপন্যাসটি বাদা অঞ্চলের চর জীবনের এক ব্যতিক্রমী আখ্যান। যার মূল পটভূমি বকখালীর অদূরে বালিস্থান নামক চরভূমি। শীতের মরশুমের মাত্র চার মাসের সময়ে এই চরভূমিতে সুন্দরবনের মাছমারাদের বেঁচে থাকার কঠোর জীবন এখানে উঠে এসেছে। কিন্তু দারিদ্র্য মানুষদের এই সাধারণ জীবন যাপনে আগ্রাসী লালসা নিয়ে তেড়ে আসে প্রশাসন। শুরু হয় চর দখলের লড়াই—“পাঁচ-ছ’হাজার লোকের আটদশ মাসের নগদ মজুরি প্রাপ্তির জায়গা হল চার মাসের এই চর।”[৯]

দেশভাগের পরে বহু মানুষই বাংলাদেশ থেকে সুন্দরবনের অঞ্চলে উঠে এসেছিল পেটের টানে। এই উপন্যাসে মিন্টু দাস, নির্মল দাস, সুচিত্র দাসেরা সেই ‘অনুপ্রবেশকারী উদ্বাস্তর’ দল। এই চরভূমিতে শীতের সিজনের শুটকি মাছের ব্যবসাকে জীবিকা করে মিন্টু দাসের মত সাবাড়ে খটিদাররা নিজেদের অন্ন সংস্থান নিশ্চিত করেছিল। ট্রলার মাঝি বিলু দাস, সারেং কেতন, লেবার চালানকারী নারান প্রত্যেকেই মিন্টু দাসের কর্মচারী। সুন্দরবনের এই জেলে-মাঝিরা রুজি-রোজগারের টানে ট্রলার নিয়ে একমাস ব্যাপী উন্মুক্ত সমুদ্রের বুকে জাল নিয়ে ভেসেবেড়ায়। নোনাজলের সমুদ্র অন্য খুঁজতে তারা নিজের প্রাণকেও উৎসর্গ করতে ভয় পায় না। মাছমারাদের এই জীবন সংগ্রামে বালিস্থানের এই চর হয়ে উঠে অন্নদাত্রী। এই মানুষদের কাছে চরের কতটা প্রয়োজনতা বুঝিয়েছেন লেখক নিজেই—

> “নোনা জল কেটে কেটে ট্রলারগুলো এগোয়। গাছপালার ঝোপ জঙ্গল পার হয়ে বাঁয়ে বাঁক নিতেই বালিস্থানের চরভুমি।বেলা দশটার রোদ পড়ে সাদা মিহি বালিচর হাজার রুপোর গহনা গায়ে পরে যেন শুয়ে আছে।বুড়ো সুচিত্র দাস প্রণাম করে বালিচরের উদ্দেশ্যে, আমাগো মা। অন্নদাত্রী মা।”[১০]

উপন্যাসে দেখা যায় বালিস্থানের এইচরে বিজয়বাটি, দেবপ্রকাশ এবং তার সংলগ্ন অঞ্চল থেকে আগত দারিদ্র পীড়িত মাছমারাদের অস্থায়ী সংসার পত্তন। ফলে চর আর চর থাকে না, কলোনির চেহারা পায়। চরের ভালো জায়গায় ছাউনি বানানোর জন্য আশ্চর্য প্রতিযোগিতাওশুরু হয়।এভাবে অনেকেই সংসার নিয়ে চলে আসে অস্থায়ী এই চরে। এই অস্থায়ী ঠিকানায় ম্যানেজার জলধরের খাতায় নাম নথিভুক্ত হয়ে যায়—-যতীন, মলিন, গুরুপদ, কমলাপতি, বিনয়বাবুদের।এমনকি বাড়ির গৃহবধূরা—কুসুমী

কিংবা বিভারাও মাছ মারতে ও বাছাই করতে ভোর রাতে চলে আসে চরে। এদের প্রত্যেকের কাছে বালির চর শুধু বালির চর নয়, 'বিশ পঞ্চাশ একশো পাঁচশ টাকার নোটের চর' হয়ে ওঠে। এরই পাশে গজিয়ে ওঠে বনবিহারীর— 'হঠাৎ কলোনি'— প্রাইভেট সম্পত্তি। সেখানেও যারা ওঠে তাদের মাথাপিছু একটাকা করে ট্যাক্স দিতে হয়। তাতেও পিছপা হয় না। কেননা সারা বছরের ভাগ্য এই চার মাসের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে।

কিন্তু চরের দখল নিয়ে মাছমারাদের সঙ্গে সংঘাত বাধে প্রশাসনের। ফরেস্টার অফিসার মুখার্জীবাবু, সীতাকান্ত প্রমুখরা সমস্ত চর জুড়ে ঝাউ গাছ বসাতে চায়। কারণ, ভিন্ন জায়গা থেকে এই বাদা অঞ্চলে এসে ব্যবসা করে চলে যাবে – এই ব্যাপারটা মুখার্জীবাবুরা মানতে পারেনি। প্রশাসন নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একপ্রকার জোড় করে সেইসব মাছমারাদের বিপন্নতার মুখে ঠেলে দেয়। ঔপন্যাসিক সেইসব মানুষদের অসহায়তার ছবি তুলে ধরেছেন এইভাবে—

> "নোনা জল বালি আঁচড়ে রোজগার। সেই রোজগারের পথ বন্ধ...। তা হইলে প্যাটের ভাত? মাছ শুকাইলে বোমলা রূপোবটি লালপাতি শুটকি করিলে তবে তা বিক্রি? রোজগার। উপায়। সেই রোজগার কি বনবিভাগ দিবে? মন্ত্রী, রাষ্ট্র এস পি দিবে? আমাগো সংসার খাবা কি?"[১১]

তবে শেষপর্যন্ত আইনের বেড়াজাল ভেঙে জয়ী হয় সাবাড়ের দল। তারা ঝাউ চারা উপড়ে দিয়ে নিজেদের জীবিকা সুরক্ষিত করতে ট্রলারে করে নেমে পড়ে সমুদ্রে। বালিস্থানের চার মাসের সিজনে একদণ্ডও বসে থাকার উপায় নেই কারোর! নারী পুরুষ প্রত্যেকেই রাত্রি যাপন বাড়িতে করতে পারবে না, চরের খটিতেই গড়বে তাদের আশ্রয়। আড়তদার, ম্যানেজার, সাধারণ কর্মচারী—সকলের ক্ষেত্রেই একই নিয়ম। কারণ টাকা রোজকারই তাদের মূল উদ্দেশ্য। ঔপন্যাসিক এই কঠোর বাস্তবতাকে তুলে এনেছেন 'চরপূর্ণিমা' উপন্যাসে।

❖ স্বজনভূমি (১৯৯৪)

চর দখলের লড়াই নিয়ে লেখক যেমন আখ্যান রচনা করেছেন, তেমনি জমির ফসলের তিনভাগের দুভাগ নিয়েও সুন্দরবনের কৃষক নারী-পুরুষরা যে'তেভাগা' আন্দোলনে সামিল হয়েছিল; তার প্রেক্ষাপট নিয়ে লেখেন 'স্বজনভূমি'(১৯৯৪) উপন্যাসটি। সুন্দরবনের জঙ্গল সাফ করে আবাদ পত্তন এবং সেই জমির জন্য সশস্ত্র শাসক জোতদার, জমিদারদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ধ্বনি তুলেছিলেন অতুল কামিল্যা, খগেন মাইতি, গুণধর, গজের মালির মত মানুষরা। 'সুন্দরিকা দোয়ানিয়া'র পার্শ্ববর্তী কাকদ্বীপ, চন্দনপিঁড়ি প্রভৃতি এলাকায় এদেরই নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল জমি হাসিলের লড়াই। নারীরাও আন্দোলন থেকে বিমুখ ছিল না। অহল্যা, সরোজনী, বাতাসীর মতো দুঃসাহসী নারীরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নিজেদের প্রাপ্য মাটির জন্য। ফলস্বরূপ সশস্ত্র বাহিনীর হাতে তারা মৃত্যুবরণ করলেও অমর হয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়, সুন্দরবন অঞ্চলের নতুন

প্রজন্মের কাছে। তেভাগা তাই শুধু ভাগ আদায়ের লড়াই নয় কৃষকের আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই ছিল।

তিনভাগের একভাগ জমির মালিক পাবে এ দাবী শুধুমাত্র চাষীর ফসলের ভাগ পাওয়ার দাবি ছিল না, এ ছিল জমির উপর চাষীর স্বত্ব কায়েম করার লড়াই। এই লক্ষ্য নিয়েই স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে ১৯৪৬ সালের মাঝামাঝি সুন্দরবন অঞ্চলের কাকদ্বীপ, বুধাখালি, চন্দনপিঁড়ি থেকে উত্তরের সন্দেশখালির বেড়মজুর গ্রাম পর্যন্ত উত্তাল হয়ে ওঠে কৃষক শ্রেণীর মানুষ। ১৯৪৬ সালের ১৬ই নভেম্বর "স্বাধীনতা" পত্রিকায় এক প্রতিবেদনে সুনীল চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—

> "গত ৮ ই নভেম্বর কাকদ্বীপ পৌঁছে বুধাখালি যাই। সুন্দরবনের গ্রামে গ্রামে কৃষক সমিতি লাল ঝাণ্ডার নিচে দাঁড়িয়ে...দাবি তুলেছে জমিদারের খামারে ধান তুলব না।"[১২]

এই কৃষক বিদ্রোহে ব্রিটিশ রাজশক্তি প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়ে ওঠে দেশীয় জমিদার, জোতদারদের।এই দুর্ভিক্ষের সময় চাষীদের রিলিফ দিতে কাকদ্বীপে এসেছিলেন ডায়মন্ডহারবার মহাকুমা কৃষক সমিতির সম্পাদক কংসারি হালদার। তিনি সুন্দরবনের যতীন মাইতি, জগন্নাথ, গুণধরদের নিয়ে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। অতএব লড়াই করে জমি দখল করা, লাটদার জোতদারদের হাত থেকে জমি কেড়ে নেওয়া বাস্তবে পরিণত হতে লাগলো। হেমন্ত ঘোষাল লিখেছেন—

> "তেভাগা ছিল চাষী মজুরের নিজের লড়াই। এতদিন ধরে তারা যা চেয়েছে, যা না-পাওয়ার ব্যথায় গুমড়ে কেঁদেছে, তেভাগার লড়াই সেই ব্যথা বেদনা প্রতিবাদকেই ভাষা দিল। তাই এই লড়াইতে আমরা যারা তাদের সংগঠিত করার উদ্যোগ নিয়েছিলাম, যারা বাইরে থেকে গিয়েছিলাম, গ্রামের সমস্ত পরিবার তাদের প্রাণের মানুষ বলে গ্রহণ করেছে।"[১৩]

১৬ই নভেম্বর ১৯৪৮ সালে এই আন্দোলন হেতু চন্দনপিঁড়ি দ্বীপে মর্মাহত ঘটনা ঘটে। কংগ্রেস নেতা পরেশ দাসের নেতৃত্বে সেখানে হঠাৎ ঝটিকাবেগে সৈন্যবাহিনী প্রবেশ করল। অশ্বিনী, গর্ভবতী অহল্যা, সরোজিনী, বাতাসী ও উত্তমীরা নিজেদের সর্বস্ব দিয়ে যুদ্ধ করেও সশস্ত্র বাহিনীর হাতে পরাজিত হলো। এছাড়া ১৯৪৯ সালে ১৫ই ডিসেম্বর নাগাদ চোদ্দ পনেরোটি কাছারি, পুলিশ ক্যাম্প, স্কুল বাড়ির পুলিশ ঘাঁটিতে আগুন লাগিয়ে জনপ্রিয়তার অভিলাষে বহিরাগত নেতা অশোক বসু, নৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখরা পালিয়ে যান। গজেন মালি, বিজয় মন্ডলের মতো ভূমিস্তরের নেতারা কলকাতায় পলাতক নেতাদের সহযোগী ছিলেন। তারা সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় আশ্রয় নিলেও ধরা পড়ে এবং কারাদণ্ড হয়। আসলে মাটির সঙ্গে যোগসূত্রহীন কতিপয় নেতাদের ভুল সিদ্ধান্তই আন্দোলনকে ক্ষয় করে দিয়েছিল।

সুন্দরবনের এই রক্তক্ষয়ী তেভাগা সংগ্রামতাঁর 'স্বজনভূমি' উপন্যাসে বর্ণিত করেছেন। তাই কেবল ইতিহাস পড়ে নয়, তৎকালীন কৃষক নেতাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ

কথোপকথনের মাধ্যমেই উপন্যাসটিকে আরো জীবন্ত করে তুলেছেন লেখক। স্বজনভূমি রক্ষার্থে নারী-পুরুষভেদে এই সাধারণ কৃষকগুলোর দুঃসাহসিকতা ও আত্মবলিদান উপন্যাসকে পরিপূর্ণতা দান করেছে।

❖ সমুদ্র দুয়ার (২০১০)

ঝড়েশ্বরের 'সমুদ্র দুয়ার'(২০১০) উপন্যাসটি সুন্দরবনের সেই প্রান্ত সীমায় অঙ্কুরিত হয়েছে যেখানে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে চরের মাটি। যেখানে সাগর এসে গ্রাস করে নেয় বাদা অঞ্চলের মানুষদের 'বাপকেলে বাস্ত জমি'। জীবিকার জন্য যেখানে ধু ধু নির্জনতায় বাস করতে হয় মানুষকে। যেমন ছিল হাসেম, তার যুবতী স্ত্রীর সালেয়া আর শিশু পুত্র-কন্যা নিয়ে। সেখানে ঝাউ গাছের পাঁচিল তুলে মাটি বাঁচাবার প্রয়াস; সেখানে লোক মুখে শোনা আশ্বাস— আর বোধহয় এদিকে জল উঠবে না।অথচ হাসেমের মধ্যবর্তিতায় পাঠক জানবেন যে কিভাবে মাটি গিলতে গিলতে একটা সময় সমগ্র লক্ষীপুরকে হিংস্র সমুদ্র নিঃস্ব করে দেবে। কি অনায়াসে উদ্বাস্তু হয়ে যাবে ঘরের পর ঘর বহু মানুষজন। হাসেমের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে— "মৌজা মাটি ভাঙতে ভাঙতে গোটা লক্ষ্মীপুরটাকে খেয়ে নিল উন্মাদ সমুদ্র। কত মানুষ যে ভূমি হারা ... বাস্তু হারা..."[১৪]

'সমুদ্র দুয়ার' উপন্যাসটি 'চরপূর্ণিমা' প্রকাশের ঠিক পনেরো বছর পরে লেখা। এই সময়কালে সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চলের অর্থনৈতিক, সংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বহু পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। উভয় উপন্যাসেই মাছমারাদের জীবন সংগ্রাম ও বেঁচে থাকার যন্ত্রণা উঠে এসেছে।তবে 'চরপূর্ণিমা'য় মাত্র চার মাসের জন্য অস্থায়ীভাবে আগমনে সাধারণ জেলেদের জীবিকা নির্বাহ হয়েছে।কিন্তু 'সমুদ্র দুয়ারে' ৫৫টি পরিবার নিয়েযে বসতি স্থাপন সেই নয়া আবিষ্কৃত দ্বীপে হয়েছে, সেখানকার জলজীবীদের জীবন বর্ণিত হয়েছে। এখানে শীতের শুটকির সিজনে বাইরে থেকে বহু আড়োদারদের আগমন হয়। তারা মাছ উপার্জনের মধ্য দিয়েই নিজেদের ব্যস্ত রাখে।তবে পরিশ্রমী মানুষদের আত্মত্যাগ এ উপন্যাসে উঠে এলেও প্রযুক্তিগত দিক থেকে এ অঞ্চল অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। বায়ুবিদ্যুৎ, এস.টি.ডিবুথ, টেলিফোনের মত উন্নত যোগাযোগমাধ্যম ও প্রযুক্তি এই দ্বীপে রয়েছে।

তবে উপন্যাসটি কেবল হাসেমের নয়, হাসেমের মতো আরও অনেকেরই গল্প। প্রধান একটি চরিত্র মধ্যবয়সী মালিনী। তাকে স্বামী নেয় না, তার বাপ মরে গেছে। গাঙের মাছ মারা মানুষদের সঙ্গে তার বসবাস। একজন নারী হয়েও সে বারে বারে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেয়। এবং আছে আদিবাসী বৃদ্ধ জনার্দন হেমব্রম আর তার মেয়ে মিতা মাণ্ডি। দেখা যায়, হিন্দু, মুসলমান এবং আদিবাসীদের মধ্যে জাত-ধর্ম-সম্প্রদায় নিয়ে বিরোধ এখানে বড় হয়ে ওঠে না। এখানে সকলেরই সমবেত সংগ্রাম জলের বুক থেকে মাছ সংগ্রহ করা। নিজেদের জীবিকাকে এভাবেই তারা মজবুত করে রাখে।

ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসটিকে মূল লক্ষ্যে নিয়ে যাবার জন্য যে চরিত্রকে সৃষ্টি করেছেন তার নাম মিতা মাণ্ডি। 'চরের দিদি' বলেই সে সম্বোধন পেয়েছে। সে দায়িত্ববানও। কারণ অল্প বয়সেই সে তার বাবা জনার্দন ও মাকে নিয়ে এই দ্বীপে চলে আসে। তারপর থেকে এই সংসারের সমস্ত দায়ভার মিতার উপরেই। এখানে এসে মিতাসাধারণ লেবার থেকে মাটি কাটার 'খাতাদারের' দায়িত্ব পায়। একটা উত্তরণ ঘটিয়েছেন উপন্যাসিক তার জীবনে। চরের মানুষদের যন্ত্রনা সে বোঝে। তাই মাটি কাটা লেবারদের মজুরি পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকা করার জন্য আড়তদারদের কাছে আবেদন জানায়। এখানে মাটির কাজ কিভাবে সম্পন্ন হয় তা লেখক মিতা মাণ্ডির আলোকে দেখিয়েছেন—

> "আট দশটা ভাঙন।অনেক মাটির কাজ। একজন কোদালি মাটি কাটবে চারজন ঝড়া মাথায় মাটি বয়ে ফেলাবে ধসের মুখে। তাহলে এক কোদালি চারমাথালি। এক খাতা করে লোক পাঁচছ' জায়গায় লাগাইতে হবে।"[১৫]

তবে শুধু মিতা মাণ্ডি নয়, প্রত্যেক অসহায়ের সহায় এই 'নতুন দ্বীপ'। ঊষা ও ভীমা বুড়ির মতো সন্তান পরিত্যাক্তাদেরও একমাত্র আশ্রয়স্থল এই দ্বীপ।তারা মাছ কুড়ায়, কাঁকড়া ধরে, মীন ধরে জাল পেতে—এইভাবেই জীবিকার মাধ্যমে তারা বেঁচে থাকে।এই হাহাকারময় যন্ত্রনার ছবি লেখক তুলে ধরেছেন বিরজার মাধ্যমে—

> "ভাত সংগ্রহ করতে গেলে একটা জীবিকা চাই। নিয়মিত ভাত পেতে গেলে তো জীবিকাটার নিশ্চয়তা চাই? সেটাই বা কোথায় এই নোনা দ্বীপ দেশে...! এ সংসারে যে আপনজন পাক কাঁদা ঘেঁটে কাঁকড়া ধরতো, সৌ মানুষটাবা কোথায়! কোন দেশে... কোন জগতে!"[১৬]

এই অঞ্চলে সমুদ্রের মাছই এখানকার সাধারণ মানুষদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান অবলম্বন। নতুন দ্বীপের পঞ্চান্নটি পরিবারের প্রত্যেকেই ধস্ত হয়েও বেঁচে থাকে।এই দ্বীপই তাদের মূল ভিত।এখানেই তারা অন্নখুঁজে পায়।

তথ্যসূত্র:

১। অরুণকুমার বসু, ভূমিকা 'সেরা ৫০ টি গল্প' ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০১১, পৃষ্ঠা- ১০

২। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, 'রামপদর অশন ব্যসন', দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৩৫

৩। তদেব, পৃষ্ঠা-৯৫

৪। তদেব,পৃষ্ঠা-১৭

৫। তদেব,পৃষ্ঠা-৫০

৬। তদেব, পৃষ্ঠা-১০৫

৭। শশাঙ্ক মন্ডল, 'প্রাচীন সুন্দরবনের তাঁত ও লবণ শিল্প', দ্বীপভূমি সুন্দরবন, সম্পাদনা বরেন্দু মন্ডল, ছোঁয়া প্রকাশনী, ২০২০ পৃষ্ঠা- ৭৬৩

৮। বিমল কর,'তরুণ গল্পলেখকদের মানসিকতা', 'দেশ পত্রিকা', এপ্রিল ১৯৮৭, পৃষ্ঠা-৬৫

৯। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, 'চরপূর্ণিমা', দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ১৯৯৫, পৃষ্ঠা- ৯০

১০। তদেব, পৃষ্ঠা-৮৮

১১। তদেব, পৃষ্ঠা-৮৩

১২। ক্ষিতিরঞ্জন মন্ডল, 'সুন্দরবনে তেভাগা', 'দ্বীপভূমি সুন্দরবন', সম্পা বরেন্দু মন্ডল, ছোঁয়া প্রকাশনী ২০২০, পৃষ্ঠা-২৪০

১৩। হেমন্ত ঘোষাল, 'তেভাগার লড়াই', 'পশ্চিমবঙ্গ', তেভাগা সংখ্যা,পৃষ্ঠা-৫৭

১৪। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, 'সমুদ্র দুয়ার', দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১০, পৃষ্ঠা- ১১

১৫। তদেব, পৃষ্ঠা-৫৩

১৬। তদেব, পৃষ্ঠা-৭৭

বঙ্গভঙ্গ ও মুসলিম সমাজ : এক ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

জগবন্ধু সরদার
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
পাঁচুড় কলেজ

সারসংক্ষেপ: ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে, এক গুরুত্বপূর্ণ জলবিভাজিকা হল স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৩-১৯০৮)। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে প্রধানত হিন্দু বাঙালীদের নেতৃত্বে, যে জাতীয় চেতনার জাগরণ শুরু হয়েছিল- তাকে দমন করার জন্য ঔপনিবেশিক ইংরেজ সরকার ‘বিভাজন কর ও শাসন কর’ নীতি হিসেবে ১৯০৫ খ্রিঃ বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা ঘোষণা করে। বাঙালীরা এই ‘Settled fact’ কে ‘Unsettle’ করার জন্য স্বদেশী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। একদিকে ইংরেজদের ভেদনীতি, অন্যদিকে স্বদেশী আন্দোলনের ধারাগুলির টানাপড়োনে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক জটিল হয়ে ওঠে। তাই দেখা যায়, একদিকে ইংরেজদের ভেদনীতির ফাঁদে পা দিয়ে, একদল ক্ষুদ্র স্বার্থান্বেষী ও রক্ষণশীল মুসলিম স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধিতা করে। অপরদিকে, প্রগতিশীল জাতীয় চেতনা সম্পন্ন মুসলিম সমাজ বংলা ভাগের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে স্বদেশী আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল। ফলে এই আন্দোলনে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক চেতনা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল–যা ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

সূচক শব্দ: জলবিভাজিকা, বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশী, বয়কট, ‘বিভাজন কর ও শাসন কর’, ভেদনীতি, জাতীয় চেতনা, সাম্প্রদায়িক চেতনা, নরমপন্থী, চরমপন্থী, জাতীয় শিক্ষা।

১৮৫৭ খ্রিঃ-র মহাবিদ্রোহের পর ভারতে জাতীয় চেতনা নতুন ভাবে গড়ে উঠতে থাকে। অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাংলাতে এর তীব্রতা বেশী ছিল-যা ঔপনিবেশিক ইংরেজ সরকারের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তখন ইংরেজ সরকার ভেদনীতির আশ্রয় নিয়ে বঙ্গভঙ্গের চেষ্টা করে। ১৯-শে জুলাই, ১৯০৫ খ্রিঃ লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে, তার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু বিভিন্ন কারণে, বাঙালী মুসলিমরা ধর্মীয় পরিচয় ত্যাগ করে ঐক্যবদ্ধভাবে স্বদেশী আন্দোলনে অংশ নিতে পারেনি। তাই স্বদেশী আন্দোলনে মুসলিম সমাজের ভূমিকা পর্যালোচনা করা খুবই প্রাসঙ্গিক।

মূলবিষয় পর্যালোচনা করার পূর্বে স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা প্রয়োজন। লর্ড কার্জন ১৯০৫-এর ১৯-শে জুলাই, বঙ্গভঙ্গের চুড়ান্ত পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। সরকারের পক্ষ থেকে এর কারণ হিসেবে বিভিন্ন প্রশাসনিক সুবিধার কথা বলা হয়। কিন্তু অনেকেই তা স্বীকার করেন না। ইতিহাসবিদ সুমিত সরকারের মতে, বঙ্গভঙ্গের উদ্দেশ্য ছিল- “পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার প্রভাবশালী হিন্দু

রাজনীতিবিদদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা।”[১] ইংরেজ সরকার প্রকাশ্যে বঙ্গভঙ্গের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অস্বীকার করলেও, লর্ড কার্জন ও রিজলের গোপন চিঠিপত্রে তা প্রকাশ পায়। লর্ড কার্জন তৎকালীন ভারত সচিব ব্রডরিককে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন,- “আমরা যদি এই প্রতিবাদের সামনে আত্মসমর্পন করার মত দুর্বল হয়ে থাকি, তাহলে আমরা আবার বাংলাকে ভাঙ্গার বা দুর্বল করার মত সুযোগ পাব না।”[২] সুতরাং বঙ্গভঙ্গের পশ্চাতে সরকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক।

যাইহোক বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বাঙালীরা বিভিন্নভাবে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। সুমিত সরকার তার ‘THE SWADESHI MOVEMENT IN BENGAL’ গ্রন্থে স্বদেশী আন্দোলনের চারটি ধারা উল্লেখ করেছেন-

১. The Moderate Tradition (নরমপন্থী ধারা)
২. The Gospel of Atmasakti-Constructive Swadeshi (গঠনমূলক স্বদেশী)
৩. Political Extremism-The Passive Resistance Technique (নিষ্ক্রীয় প্রতিরোধ)
৪. The Shift to Terrorism (সন্ত্রাসবাদ).[৩]

১৯০৩ খ্রিঃ ‘রিজলে রিপোর্ট’ জানাজানির পর থেকেই পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি, প্রতিবাদ সভা ও পিটিশনের মাধ্যমে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা শুরু হয়। ৭-ই আগস্ট, ১৯০৫ খ্রিঃ কলকাতার টাউনহলে বাঙালী নেতৃবৃন্দ আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ঘোষণা করেন। ১৬-ই অক্টোবর, ১৯০৫ খ্রিঃ বঙ্গভঙ্গ কার্যকরের দিন সারা বাংলায় ‘জাতীয় শোক দিবস’ পালন করা হয়। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নেতৃত্বে, বিষাদের চিহ্ন হিসেবে ‘অরন্ধন’ পালন করা হয়। কলকাতায় হরতাল পালন করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে ‘রাখি বন্ধন’ উৎসব পালন কারা হয়। ঐদিন বিকেলে আনন্দমোহন বসুর নেতৃত্বে, কলকাতায় বাংলার ঐক্যের প্রতীক হিসেবে ‘মিলন মন্দির’-এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়।

ইংরেজ সরকার এই নিয়মতান্ত্রিক প্রতিবাদে কর্ণপাত না করলে, নিষ্ক্রীয় প্রতিরোধ হিসেবে ‘বয়কট’-এর আদর্শ গ্রহণ করা হয়। এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আদিত্য মুখার্জী তার ‘স্বদেশী আন্দোলন(১৯০৩-১৯০৫)’ প্রবন্ধে বলেছেন,- “দেশকে শোষণ ও শাসন করতে, ব্রিটিশ আমলাদের সাহায্য করে এমন কাজ সংগঠিতভাবে অস্বীকার করে প্রশাসনকে অচল করে দেওয়া।”[৪] নিষ্ক্রীয় প্রতিরোধ আন্দোলনে দরিদ্র সাধারণ মাণুষ, লোভী ব্যবসায়ী, ছাত্রসমাজ, সরকারী চাকরিজীবী ও উকিলদের মধ্যে বাস্তব ও আদর্শের দ্বন্দ্ব এই আন্দোলনকে দুর্বল করে দেয়। তাই বয়কটের পরিপূরক ও আত্মশক্তির জাগরণ হিসেবে গঠনমূলক ‘স্বদেশী’ আদর্শ গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন স্বদেশী দোকান, শিল্প, সমিতি ও শিক্ষালয় গড়ে উঠেছিল।

১৯০৬ খ্রিঃ-এর সূচনা থেকে সরকারী দমননীতি, সাংগঠনিক শক্তি ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাব এবং কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফলে স্বদেশী আন্দোলন শিথিল হয়ে

পড়ে। তখন বাংলায় বিপ্লবী গুপ্ত সমিতিগুলির কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। আত্মোন্নতি সমিতির সদস্য বারীন্দ্র ঘোষ ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯০৬ খ্রিঃ-এর মার্চ মাসে ‘যুগান্তর’ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ক্রমে এই ‘যুগান্তর’ পত্রিকার নাম অনুযায়ী আত্মোন্নতি সমিতির নাম হয় ‘যুগান্তর দল’। এই দলের সদস্যরা বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর এ্যাণ্ড্রু ফ্রেজারকে (৬-ই দিসেম্বর, ১৯০৬) এবং অত্যাচারী কিংসফোর্ড সাহেবকে (৩০-শে এপ্রিল, ১৯০৮) হত্যার চেষ্টা ক’রে ব্যর্থ হন। সরকার ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার (১৯০৮) মাধ্যমে সাময়িকভাবে বাংলার সন্ত্রাসবাদকে দমন করে। এরপর থেকেই স্বদেশী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়।

স্বদেশী আন্দোলনে মুসলিম সমাজের ভূমিকা সঠিকভাবে বুঝতে হলে, মুসলিমরা কেন স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল তা জানা প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, এর বহু পূর্বে মুসলিম সমাজ ফরাজী ও ওয়াহাবি আন্দোলনের মাধ্যমে, ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল। মহাবিদ্রোহেও মুসলিমরা অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু এই আন্দোলনের সূচনা লগ্ন থেকেই হিন্দু-মুসলিম দূরত্ব বাড়তে থাকে। মুসলিম সমাজের একাংশ সক্রিয়ভাবে বিরোধিতা শুরু করে। এর পশ্চাতে বিভিন্ন কারণ দায়ী ছিল। যেমন-

১. সরকার প্রথম থেকেই ঘৃণা-বিদ্বেষ ও পরস্পর বিরোধী স্বার্থের সলতে পাঁকিয়ে পথে নেমেছিল, আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্য। সরকার বঙ্গভঙ্গের পক্ষে মুসলিম সমাজের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভের জন্য তাদেরকে ‘মগজ ধোলাই’-এর চেষ্টা করে। ইতিহাসবিদ বিপান চন্দ্র ঢাকার এক জনসমাবেশে (১৮-ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৪) লর্ড কার্জনের বক্তব্য তুলে ধরেছেন, “নবগঠিত প্রদেশে মুসলমানরাই সংখ্যাধিক্য থাকবে। তারা একতার সুযোগ পাবে। যে ঐক্য তারা মুসলমান রাজা বা নবাবদের পরে আর ভোগ করতে পারেনি”।[৫] লর্ড কার্জন মুসলিমদের আশ্বাস দেন যে, তারা আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ পাবে। সরকার পক্ষ শিলং থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হ্যাণ্ডবিল-এর মাধ্যমে প্রচার করে যে, স্বদেশী আন্দোলন হিন্দু স্বার্থের পরিপোষক। এমনকি সরকার প্রভাবশালী ও ঋণভারে জর্জরিত ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহকে অতি অল্প সুদে ১৪ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়ে, তাকে নিজেদের পক্ষে আনে। এ ছাড়া ফুলার-গভর্ণমেন্ট নতুন প্রদেশে ‘পয়সা-পদ-পদবী ও চাকরী’-র প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুসলমানদের নিজেদের পক্ষে আনার চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে তারা অনেকটাই সফল হয়।

২. হিন্দু-ধর্ম সংস্কৃতিও রক্ষণশীল মুসলিমদের এই আন্দোলন থেকে দূরে ঠেলে দেয়। যেমন- চরমপন্থীদের দ্বারা গণপতি ও শিবাজী উৎসব পালন, গীতা পাঠ ও হিন্দু দেবীর আরাধনার মধ্যে বহু মুসলমান হিন্দু জাতীয়তাবাদ-এর গন্ধ পায়। এ ছাড়া অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ভারত মাতা’ চিত্র এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রার্থনা সংগীতে ‘ভগবান’-এর কাছে প্রার্থনা ; কালীঘাটের মন্দিরে শপথ গ্রহণ ইত্যাদি রক্ষণশীল

মুসলিম সমাজকে স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দুদের সঙ্গে একাত্ম হতে দেয়নি। হিন্দু নেতারাও এই সূক্ষ্ম বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি।

৩. স্বদেশী আন্দোলনের সময় হিন্দু-মুসলিম অনৈক্যের কারণ হিসেবে, ইংরেজ আমলারা ও তাদের সহযোগী মুসলিম নেতাগণ বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাদের মতে- হিন্দুরা স্বদেশী আন্দোলনে, জোর করে মুসলিমদের যোগদানে বাধ্য করার চেষ্টা ক'রে দাঙ্গায় ইন্ধন জুগিয়েছে। এমত গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, ব্যক্তিগত স্বার্থে নবাব সলিমুল্লাহের হিন্দু বিরোধিতা, মুসলিমদের অজ্ঞানতা ও অনগ্রসরতা, ইংরেজদের ভেদনীতি, আলিগড় রাজণীতির বিবর্তন ও মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বাংলায় সাম্প্রদায়িক পরিবেশ গড়ে তুলেছিল।

৪. অবশ্য এক্ষেত্রে হিন্দু সমাজেরও দায়িত্ব কম ছিল না। বাংলার নবজাগরণে হিন্দু সমাজের প্রাধান্য এবং মুসলিম সমাজের উন্নয়ণে হিন্দুদের আন্তরিকতার অভাব, হিন্দু-মুসলিম বিভেদের জন্য অনেকাংশে দায়ী ছিল। কংগ্রেসের নেতারা হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের কথা বললেও, মুসলিমদের সনাতন স্বাতন্ত্র্যকে গুরুত্ব দেয়নি। তারা বাস্তবকে অস্বীকার করে আদর্শবাদকে আঁকড়ে ছিলেন। পশ্চাদপদ মুসলিম সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নতির প্রতি তাদের নজর ছিল না। এ ছাড়া সংখ্যালঘু মুসলিম সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি হিন্দু সমাজের কোন সহানুভূতি ছিল না। তারা মুসলিমদের মন ও হৃদয়ের কথা শোনার চেষ্টা করেনি। ভাই বলে মুসলিমদের কাছে টেনে নেয়নি। তাদের আচার-আচরণে বিমাতৃসুলভ ব্যবহার ফুটে উঠত। শেখ মুজিবর রহমানের 'হিন্দুস্থান রিভিউ' থেকে জানা যায় যে, স্বাদেশী আন্দোলনের সময়ে বেশিরভাগ হিন্দু নেতাদের চোখে মুসলমানরা বিদেশীই ছিলেন এবং তাদের সঙ্গে মিশতেন না। ফলে মুসলিমরা ঘৃণা, অবজ্ঞা ও নিরাপত্তাহীণতার শিকার হত। এ ক্ষেত্রে সেমন্তী ঘোষ তার 'স্বজাতি স্বদেশের খোঁজে' গ্রন্থে 'বঙ্গভঙ্গকাল এবং মুসলিম আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, নওসের আলি খান ইউসুফ বঙ্গভঙ্গের আগে, কলকাতা থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'নব নূর'-এ(১৩১০) একটি পদ্য লেখেন। পদ্যটির কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এইরকম-

"বিজাতি ছিলাম, আচার বিচার সকলই মোদের পৃথক ছিল
প্রাণের বন্ধন, সমাজ-মিলন তোমার সহিত কিছু না ছিল।

....

তোমারি সহিত মিশিয়ে গেলাম, সুখের বাজার খুলিয়ে গেল
কৃতজ্ঞতাপাশে চিরবাঁধা মোরা, হায় কি দুর্দিন আজিকে এল...।"[৬]

এখানে 'বিজাতি'-র স্মৃতি থাকলেও এদেশের সাথে কবির একাত্ম হওয়ার অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। তেমনি তিনি সাম্প্রদায়িকতাকে 'দুর্দিন' হিসেবে দেখেছেন। অনুরূপ অনুভূতির কথা আমরা জানতে পারি তৎকালীন পূর্ববঙ্গ ও আসামের ডি. আই. জি. স্টুয়ার্ট বেকার- এর লেখায়। তিনি বিভিন্ন জেলা পরিদর্শনের সময় কয়েকজন মুসলিম ভদ্রলোকের সাথে আলাপচারিতার পর লেখেন,-"...they are nervous about

expressing themselves freely ;"[৭] এ ক্ষেত্রে সমাজে সংখ্যালঘু শ্রেণির মানসিক অবস্থা ফুটে উঠেছে। অবজ্ঞা, ঘৃণা ও নিরাপত্তাহীণতার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে মুসলিম সমাজের মধ্যে শ্রেণি চেতনা গড়ে ওঠে। তাই মুসলিমরা অনেকেই নিজ সমাজের উন্নতির জন্য ইংরেজ শাসনকে সমর্থন ও স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন।

এখন দেখাযাক মুসলিম সমাজ কিভাবে স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল। প্রগতিশীল হিন্দু-মুসলিম ব্যক্তিত্বের উদ্যোগ এবং ময়মনসিংহের 'চারু-মিহির'-এর মত পত্রিকা, ইংরেজদের ষড়যন্ত্র ও ভেদনীতির কুফল তুলে ধরে, হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বার্তা দিলেও, মুসলিম সমাজের একাংশ বিভিন্নভাবে স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। যদিও মুসলিম সমাজের মুখপত্র 'সুলতান' পত্রিকা মুসলিম সমাজকে নিরপেক্ষ নীতি নিয়ে আত্মোন্নতিতে মনোনিবেশ করার কথা ঘোষণা করেছিল। মূলত সরকারী মদতে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ খাঁ, বম্বের ধনী খোজা সম্প্রদায়ের নেতা আগাঁ খাঁ (সুলতান মহম্মদ শাহ), নবাব ভিকার উল মুলক ও নবাব মহসীন উল মুলক প্রমুখের নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ও স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতি আন্দোলন শুরু হয়েছিল। যেমন-

১. সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতায় বঙ্গভঙ্গের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সলিমুল্লাহের নেতৃত্বে ফরিদপুর, কুমিল্লা, মাদারিপুর, ময়মনসিংহ, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে উৎসব পালিত হয়।

২. ফরিদপুরের এক জনসভায় জনৈক মোক্তার সরাসরি হিন্দুদেরকে মুসলমানদের শত্রু বলে উল্লেখ করে স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধিতা করতে বলেন।

৩. আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ আর্চবোল্ড-এর পরামর্শে নবাব মহসীন উল মুলক-এর উদ্যোগে ও আগা খাঁ-র নেতৃত্বে মুসলিম সমাজ ইংরেজ আনুগত্যের বিনিময়ে মুসলিম স্বার্থরক্ষার প্রতিশ্রুতি আদায় করে 'সিমলা ডেপুটেশন'-এর মাধ্যমে। যার পরিণতিতে ৩০-শে ডিসেম্বর, ১৯০৬ খ্রিঃ গড়ে ওঠে মুসলিমদের পৃথক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান "All India Muslim League"

৪. ১৫-ই জানুয়ারী, ১৯০৭ খ্রিঃ মুন্সিগঞ্জের এক সভায় ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ বঙ্গভঙ্গের দিনকে 'Happy Day' বলে ঘোষণা করে বলেন যে, বিগত পঞ্চাশ বছরে পিছিয়ে পড়া মুসলমান সমাজের সর্বমুখী সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রিক উন্নয়ণের উদ্দেশ্যেই মুসলিম লীগের জন্ম। তিনি মুসলিম সমাজকে বিভিন্নভাবে হিন্দু প্রধান স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেন।

৫. ২০-শে ডিসেম্বর, ১৯০৬ খ্রিঃ-এর 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় ময়মনসিংহের ইব্রাহিম খাঁ, খোজা নওয়াজ খাঁ ও সাদত্ উদ্দিন প্রমুখ কিভাবে মুসলিমদের হিন্দুদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলেছিল-তা জানা যায়।

৬. ১৯০৭ খ্রিঃ-এর প্রথমদিকে, মুসলিমদের হিন্দু বিরোধিতার ফলে বাংলার বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়েছিল। ৪-ঠা মার্চ, ১৯০৭ খ্রিঃ কুমিল্লাতে নবাব সলিমুল্লাহের আগমন উপলক্ষ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দাঙ্গা সৃষ্টি করে। ২১-শে এপ্রিল, ১৯০৭ খ্রিঃ ময়মনসিংহের জামালপুরে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়। সেখানে দুর্গাবাড়ির মন্দিরের দুর্গা প্রতিমা ভেঙে ফেলা হয়। কয়েকদিন ধরে এই দাঙ্গা চলেছিল। ২-রা মে, ১৯০৭ খ্রিঃ-এর স্টেটসম্যান পত্রিকা, এই দাঙ্গার জন্য ইংরেজ সরকারকেই দায়ী করে। এরূপ দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় পূর্ববঙ্গে মুসলিমরা 'লাল ইস্তাহার' নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। এই পত্রিকায় স্বদেশী আন্দোলন প্রতিরোধকল্পে 'স্বজাতি আন্দোলন ও হিন্দুদের সঙ্গে কট্টর বিরোধিতা'-র কথা বলা হয়। এক্ষেত্রে আশ্চর্যের বিষয় হল যে, এই সকল দাঙ্গার জন্য সরকারী আমলারা হিন্দুদের স্বদেশী আন্দোলনকে দায়ী করেছিল এবং দাঙ্গা দমনে নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়েছিল। এ কথা কোনভাবেই অস্বীকরা যায় না যে, সরকারী মদতেই স্বদেশী আন্দোলনের সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল।

স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দু-মুসলিম অনৈক্যের পাশাপাশি, সাম্প্রদায়িক ঐক্যের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। বঙ্গভঙ্গের সূচনা থেকেই ইংরেজদের ভেদনীতি অনুধাবন করে প্রগতিশীল ব্যক্তিত্ব হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি ২৫-শে আগস্ট, ১৯০৫ এক জনসভায় 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' নামক প্রবন্ধ পাঠ করে বলেন,- "আজ ... ত্যাগের ঐক্য দ্বারা আমরা পরস্পর নিকটবর্তী হইয়া দেশকে বলিষ্ঠ করিতে পারিব।"[৮] আবার ৯-ই অক্টোবর, ১৯০৫ বাগবাজারে পশুপতি বসুর বাসভবনে তিনি 'বিজয়া সম্মিলন' নামক ভাষণে সকলকে 'ভাই' বলে কাছে ডাকার আহ্বান জানান। ১৬-ই অক্টোবর, ১৯০৫ বঙ্গভঙ্গ কার্যকরের দিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'রাখি বন্ধন' উৎসব পালন করেন। এমনকি তিনি 'সাধনা' 'ভারতী' 'নবপর্যায়' 'বঙ্গ দর্শন' 'ভান্ডার' 'তত্ত্ববোধিনী' প্রভৃতি পত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বাণী প্রচার করেছিলেন।

এরূপ হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বাতাবরনে প্রগতিশীল মুসলিমরা বৃহত্তর স্বার্থে এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। মুসলিম নেতৃবর্গের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আব্দুল রসুল, মহম্মদ ইউসুফ খান বাহাদুর, আব্দুল হালিম গজনভী, মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন, মৌলবী দেদার বক্স, ডাক্তার আব্দুল গফুর, মহম্মদ ইব্রাহিম হোসেন, মৌলবী আব্দুল হোসেন, মুজিবর রহমান প্রমুখ। তারা বিভিন্নভাবে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যবদ্ধ ইংরেজ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। যেমন-

১. ৭-ই আগস্ট, ১৯০৫ খ্রিঃ কলকাতার টাউন হলে ও ময়দানের প্রতিবাদ সভায় বহু মুসলিম হিন্দুদের সাথে যোগদান করেছিলেন। ঐদিন দুপুরে কলেজ স্কোয়ার থেকে টাউন হলের দিকে প্রতিবাদ মিছিলে, কলকাতা মাদ্রাসার বহু মুসলিম ছাত্র অংশ নিয়েছিল। ৮-ই আগস্ট, ১৯০৫ খ্রিঃ-এর 'অমৃতবাজার' পত্রিকায় এর উল্লেখ আছে।

২. ২৩-শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৫ খ্রিঃ রাজাবাজারে আব্দুল রসুলের সভাপতিত্বে মুসলিমদের এক সভায় বয়কট আন্দোলনে মুসলিমদের সমর্থন নেই- এরূপ গুজবের প্রতিবাদ করা হয় এবং স্বদেশী আন্দোলনে মুসলিমদের পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করা হয়েছিল। 'মিলন মন্দির'-এর শিলান্যাস সভায় বহু মুসলিম নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

৩. ২৪-শে অক্টোবর, ১৯০৫ খ্রিঃ 'ফিল্ড এ্যান্ড অ্যাকাডেমি ক্লাব'-এর মাঠে এক প্রতিবাদ সভায় সভাপতি আব্দুল রসুল 'কার্লাইল সারকুলার'-এর বিরোধিতা করেন এবং মুসলিম সমাজকে 'জাতীয় শিক্ষা' আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি ১৪-ই এপ্রিল, ১৯০৬ খ্রিঃ বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভায়, সভাপতির ভাষণেও মুসলিমদের স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করার কথা বলেন।

৪. ৭-ই নভেম্বর, ১৯০৭ খ্রিঃ-এর 'বন্দেমাতরম্'-এ প্রকাশ যে, 'অ্যান্টি সারকুলার সোসাইটি'-র অন্যতম সদস্য মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন স্বদেশী আদর্শের সমর্থক ও প্রচারক ছিলেন। এর জন্য তাকে কারাদণ্ডও ভোগ করতে হয়েছিল।

৫. ডাক্তার আব্দুল গফুর ও আবুল হোসেনকে তৎকালীন গোয়েন্দা পুলিশের রিপোর্টে 'হিন্দুদের ভাড়াটিয়া মুসলমান প্রচারক' বলে উল্লেখ করা হয়।

৬. আব্দুল হালিম গজনভী স্বদেশী দোকান 'ইউনাইটেড বেঙ্গল স্টোর্স' প্রতিষ্ঠা করে এই আন্দোলনে সদর্থক ভূমিকা পালন করেন। স্বদেশী যুগে বাংলার বিপ্লবী দলে বহু মুসলিম যুবক যোগ দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন মুজিবর রহমান। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ-এর ৯২ জন সদস্যের মধ্যে ৬ জন মুসলিম সদস্যের কথা জানা যায়।

উল্লেখ্য যে, শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মুসলিম নেতৃত্বের পাশাপাশি, বহু সাধারণ অশিক্ষিত পেশা ত্যাগী মুসলীম তাঁতি ও জোলারাও স্বদেশী আদর্শে নিজ নিজ পেশা আবার গ্রহণ করেন। এ ছাড়া বরিশালের বিভিন্ন স্থানে 'জারি গান'-এর মাধ্যমে সাধারণ মুসলিমরা বঙ্গভঙ্গের বিপদ, বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণের উপকারিতা প্রচার করতেন। স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন প্রতিবাদ সভা ও মিছিলে সাধারণ মুসলিমরাও হিন্দুদের সাথে অংশ নিয়েছিলেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, ব্রিটিশরা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেই বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। আর তা কার্যকর করার জন্য ভেদনীতির সাহায্যে বিরোধী কণ্ঠকে দমন করার চেষ্টা করেন। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বার্থকেন্দ্রিক মুসলিম সমাজ স্বদেশী আন্দোলনের সক্রিয় বিরোধিতা করেন। পাশাপাশি প্রগতিশীল মুসলিমরা বাংলার অখণ্ডতার স্বার্থে হিন্দুদের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে স্বদেশী আন্দোলনে আংশ নিয়েছিলেন। অর্থাৎ এই আন্দোলনে সমগ্র মুসলিম সমাজ অংশগ্রহণ করেনি। এর কারণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রিটিশদের ভেদনীতিকে খুব একটা গুরুত্ব দেননি। তিনি তার 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধে লিখেছেন,- ‘‘শনি তো ছিদ্র না পাইলে প্রবেশ করিতে পারে না,...’’[৯] এক্ষেত্রে তিনি 'শনির ছিদ্র' হিসেবে শিক্ষিত ভদ্রসমাজ ও সাধারণ মানুষের মাঝখানে মহাসমুদ্রের

ব্যবধানকে চিহ্নিত করেছেন। আর এই ব্যবধান ঘোঁচাতে পারলেই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করা সম্ভপপর হত।

তথ্যসূত্র:

১. সুমিত সরকার, 'আধুনিক ভারত'(১৮৮৫-১৯৪৭), কলকাতা, ২০১৩ পৃঃ-৯০
২. বিপান চন্দ্র, 'আধুনিক ভারত' (ভাষান্তর-গৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত), কলকাতা, ১৯৮৫, পৃঃ-৩৫৮
৩. Sumit Sarkar, 'The Swadeshi Movement in Bengal(1903-1908)', New Delhi, 2013, Page-30-63
৪. বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য, 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম' (১৮৫৭-১৯৪৭), কলকাতা, ১৯৯৪ পৃঃ-১০২
৫. তদেব, পৃঃ-১০১
৬. সেমন্তী ঘোষ, 'স্বজাতি স্বদেশের খোঁজে', কলকাতা, ২০১২, পৃঃ-১৯
৭. হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়, 'স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ', কলকাতা, ১৯৬১, পৃঃ-১৭৪
৮. কঙ্কর সিংহ, 'বঙ্গভঙ্গ রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশ', কলকাতা, ২০১২, পৃঃ-১৭
৯. সুমিত সরকার, 'আধুনিক ভারত' (১৮৮৫-১৯৪৭), কলকাতা, ২০১৩ পৃঃ-১০৩

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

১. Sarkar Sumit, The Swadeshi Movement in Bengal(1903-1908). Parmanent Black, New Delhi, 2013
২. মুখোপাধ্যায় হরিদাস ও মুখপাধ্যায় উমা, স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ, দে'জ পাব্‌লিশিং, কলকাতা, ১৯৬১
৩. ঘোষ সেমন্তী, স্বজাতি স্বদেশের খোঁজে, দে'জ পাব্‌লিশিং, কলকাতা, ২০১২
৪. সিংহ কঙ্কর, বঙ্গভঙ্গ রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশ, র‍্যাডিক্যাল, কলকাতা, ২০১২
৫. গোস্বামী অর্জুন, বঙ্গভঙ্গঃ ১৯০৫, চয়নিকা, কলকাতা, ২০০৫
৬. চন্দ্র বিপান, আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ, কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, ২০১
৭. সেন সত্যেন, ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের ভূমিকা, ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৭
৮. চন্দ্র বিপান ও অন্যান্য, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোং, কলকাতা
৯. রায় সুপ্রকাশ, ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৮৯৩-১৯৪৭), র‍্যাডিক্যাল, কলকাতা, ২০১৩
১০. সরকার সুমিত, আধুনিক ভারত (১৮৮৫-১৯৪৭), কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, ২০১৩

সংকটের প্রশ্নে ঘোড়ামারা দ্বীপ : একটি ঐতিহাসিক অনুসন্ধান

বিদ্যুৎ সরকার
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
মহারাজা শ্রীশচন্দ্র কলেজ

সারসংক্ষেপ : মূল ভূখণ্ড থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ঘোড়ামারা দ্বীপকে ঘিরে রয়েছে নদী ও সমুদ্র। একদিকে বটতলা, মুড়িগঙ্গা ও হুগলী নদী। অন্যদিকে বঙ্গোপসাগর। ঘোড়ামারা ভাঙছে দ্রুত। প্রত্যেকবার কোটালের সময়ে বাঁধ ভেঙে জল ঢোকে। প্রতিবারহ কেউ না কেউ ভিটেমাটি হারান। পরিবেশবিদদের মতে, নদীর স্রোত এখানে বেশী। ভূপৃষ্ঠের নীচের অংশে বালির ভাগ বেশী। সেহ অংশ দূর্বল হওয়ায় সহজে ক্ষয়ে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেহ দেখা যাচ্ছে, নীচের অংশ ক্ষয়ে গিয়ে নদীর পাড় ঝুলছে শূন্যে। ওহ অংশ ক্রমশ ভারী হয়ে গিয়ে ধসে পড়ছে। ভূবিজ্ঞানীদের মতে, সমুদ্রে জলস্তর বৃদ্ধিও ভাঙনের অন্যতম কারণ।

সূচক শব্দ : দ্বীপবাসী, পরিবেশ, ভাঙন, সংকট, ঐতিহাসিক অনুসন্ধান, প্রাকৃতিক বিপর্যয়।

প্রাচীনকাল থেকেই সুন্দরবন যে মনুষ্য জাতির বসবাস ভূমি ছিল, তা পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান থেকে জানা যায়। প্রমাণস্বরূপ খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সুন্দরবনে সভ্যতার কিছু নিদর্শনও পাওয়া গেছে। এই সুন্দরবনের অন্তর্গত সাগর দ্বীপের (সাগর দ্বীপ কলকাতা থেকে ১০০ কিলোমিটার দক্ষিণে প্রায় ৩০০ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল নিয়ে অবস্থিত) একটি অংশ ঘোড়ামারা দ্বীপ বর্তমান ঐতিহাসিক আলোকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। দ্বীপটি ১৯03 সালের আগে পর্যন্ত সাগর দ্বীপের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল যার জন্য 'ছোট গঙ্গাসাগর' বা 'মিনি গঙ্গাসাগর' বলা হয়ে থাকে এবং নদীর অত্যধিক ক্ষয় কার্যের দরুণ যেখানে ১৯৩৫ সালে ১৮.৫৯ বর্গ কিলোমিটার ছিল তা কমে গিয়ে ২০১5 সালে ৩.৪৫ বর্গ কিলোমিটারে পরিণত হয়, যার জন্য দ্বীপটিকে 'সিংকিং আইল্যান্ড' বা 'ডুবন্ত দ্বীপ' নামেও অভিহিত করা হয়[২] এবং জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে ৪০,০০০ থেকে ৩০০০ কমে আসে। ব্রিটিশ অধিকৃত সময় থেকেই পার্শ্ববর্তী মেদিনীপুর, কাঁথি, ডায়মন্ড হারবার লাগোয়া অঞ্চল থেকে মানুষজন এসে বসবাসের উপযোগী করে তুলেছিল। এই জন-জীবনের দরুণ পাকা রাস্তাঘাট, মাটির বাড়ি, পাকা বাড়ি, স্কুল, পোস্ট অফিস, মন্দির, মসজিদ, স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রভৃতি তৈরি হয়েছিল। কিন্তু ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে ঘোড়ামারা দ্বীপটি নিশ্চিহ্নের পথে, যার জন্য এঁরা পাশাপাশি সাগর-দ্বীপ, কাকদ্বীপ, ডায়মন্ড হারবার, পাথরপ্রতিমা, নামখানা লাগোয়া

অঞ্চল গুলিতে পরিযায়ী হিসেবে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। একদিকে তাঁদের স্থায়ী বসতির সংকট এবং অন্যদিকে কর্মহীনতা তাদের জীবনকে বিধ্বস্ত করে তুলেছে। বর্তমান আলোচিত প্রবন্ধে বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের মধ্যে ঘোড়ামারা দ্বীপের অবস্থানগত সংকট, জনগোষ্ঠীর যাযাবর ন্যায় জীবন-যাপন, সার্বিক সমস্যা ও নতুন পুনর্বাসনকে ইতিহাসের আঙ্গিকে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

মানব প্রজাতির শারীরিক, মানসিক ও জৈবিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে (অস্ট্রালোপিথেকাস, হোমো হাবিলিস, হোমো ইরেক্টাস, হোমোসেপিয়েন্স ও হোমোসেপিয়েন্স সেপিয়েন্স)[৩] তারা বসবাসের জন্য, আহারের জন্য, আবহাওয়া-জলবায়ুগত পরিবর্তনের জন্য যাযাবরের ন্যায় স্থান পরিবর্তন করতে থাকে যা আমরা ইতিহাসের পাতায় দেখেছি কিন্তু বর্তমানে ঘোড়ামারা দ্বীপেও একই রকম মনুষ্য প্রজাতির স্থান পরিবর্তনকে যাযাবরের ন্যায় লক্ষ করা যায়। ঘোড়ামারা দ্বীপটি কলকাতা থেকে ১৫০ কিলোমিটার ও হলদিয়া বন্দর থেকে ১৮.৩৬ সামুদ্রিক মাইল দূরে হুগলি নদীতে অবস্থিত। দ্বীপটি শুরু হয়েছে ২০°৫৩' ৫৬" উত্তর থেকে ২১°৫৫′ ৩৭" উত্তর অক্ষাংশ এবং ৪৪°০৬′ ৫৬" পূর্ব থেকে ৮৮°০৮. ৩৫" পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত।[৪] ঘোড়ামারা দ্বীপটি অত্যধিক ক্ষয়কার্যের দরুণ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর অবস্থান নিচ্ছে তা দেবস্মিতা মুখার্জি[৫] এবং সুভনীল গুহ, অনিন্দিতা দে[৬] ১৯৩৫ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত দেওয়া বর্ণনাতে পাওয়া যায়। ঘোড়ামারার আয়তন ক্রমানুসারে বর্ণনা করলে দেখা যায়--

বছর	এলাকা.মি.কি.বর্গ/
১৯৩৫	১৮৫৯.
২০০০	৫১.৫
২০০১	৫.১০
২০০৫	৪.৬৪
২০০৮	৪.২
২০১০	৩.৯৮
২০১৫	৩.৪৫

পঞ্চায়েত শাসিত ঘোড়ামারায় অনেকগুলি বড় বড় গ্রাম ছিল যেমন কাশিমারা, লোহাচর, হাত কালো, বাঘপাড়া, রায়পাড়া, মন্দিরতলা, চুনপুরী ও লক্ষীনারায়ণপুর। এই গ্রাম গুলির কাশিমারা চর, লোহাচর (১৯৮০) ও লক্ষী নারায়ণপুর জলের তলায় চলে গেছে।[৭] অরিন্দম রায় এবং গিয়াস উদ্দিন সিদ্দিকী'র[৮] দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ঘোড়ামারাতে ভূমিক্ষয় ছাড়াও আরও যেসব সমস্যার[৯] রূপ পরিলক্ষিত হয়েছিল তার বিবরণ পাওয়া যায় যেমন--

বছর	১৯৭২	১৯৭৯	১৯৮৯	২০০০	২০১০
সমুদ্রের জল	৬.১২	৭.৯৩	২.১১	৪.০৫	৮.২৬
উদ্ভিদ	১৬.৭৪	১২.১৬	১৫.৮৫	১৯.৪৮	২৩.৮৩
জলাভূমি	১৬.০৯	১৭.৮৯	২৩.৯৮	১৭.৭৩	১৭.৮৬
ধানজমি	৩১.৬১	৪০.৭৭	২৬.৮২	২১.০৩	২৩.২৪
অনুর্বর জমি	২৮.৯৮	২০.৮২	৩০.৯৯	৩৭.৪৯	২০.৪৮
ফিশারি	০.৫০	০.৪৬	০.২৯	০.২২	০.৩৫
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

ঘোড়ামারা দ্বীপে ৪০০০০ মানুষ বসবাস করত। এই জনসংখ্যার মধ্যে ছিল ৪৩%। এস. সি. ও ৬.৬% মুসলিম।[১০] কিন্তু ২০০১ সালে সরকারি হিসাব অনুযায়ী জনসংখ্যা হয় ৫০০০ জন।[১১] ২০১৬ সালে সেই জনসংখ্যা ৩০০০ এ এসে পৌঁছায়। ঘোড়ামারা দ্বীপবাসীরা মূলত মেদিনীপুর, কাঁথি, ডায়মন্ড হারবার থেকে এসেছিলেন। ঘোড়ামারা দ্বীপবাসী শেখ সুলেমান বলেছিলেন “আমাদের পরিবারের আমাকে নিয়ে এই তিন পিঁড়ি এখানে বসবাস করছি, পূর্বপুরুষেরা এসেছিল নন্দীগ্রাম (মেদিনীপুর) থেকে, আবার কেউ এসেছিল ডায়মন্ড হারবার থেকে। দ্বীপটাই ছিল আন্দাজ ২১ হাজার বিঘে জমি। বাপ দাদাদের আমলে এক একজন জমিদারের হাতে ছিল ৭-৮ হাজার বিঘে জমি। গল্প শুনেছি জমিদারের ঘরের দুই ছেলে বেরিয়েছিল বাঘ শিকারে, দুজনেই ঘড়ার পিঠে চেপে দুদিক থেকে এসে বন্দুক তাক করেছে বাঘের দিকে। একজন গুলি করতেই মারা পরল একসাথে বাঘ, ঘোড়া আর সয়ারির অন্য ছেলে, সেই থেকেই নাম হয় ঘোড়ামারা।[১২]

ঘোড়ামারা বাসীদের প্রাথমিকভাবে জীবিকা নির্বাহের অন্যতম কেন্দ্র ছিল নদী, নদীকে কেন্দ্র করেই তাদের এই সভ্যতা। ভারতে পূর্বে নদীকেন্দ্রিক সভ্যতার বিস্তারিত কেন্দ্রগুলো পাই যেমন হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো বা সিন্ধু সভ্যতা, আর্য সভ্যতা প্রভৃতি। যারা নদীকে কেন্দ্র করে তাদের বসবাসের উপযোগী করে তুলেছিল। আবার নদীর গতিপথের পরিবর্তনের সাথে সাথে তাদের বসবাসের অসুবিধা হয়েছিল এবং তারা অন্যত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থান। করেছিল। তাই নদী খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক মাধ্যম যাকে অবলম্বন করে একটা সুসম্পন্ন সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে। একই রকম ভাবে ঘোড়ামারা বাসিরাও নদীতে মাছ ধরা (যেমন- বাগদা বা মিন, বড় চিংড়ি, ভুঁড়ি চিংড়ি, কাঁকড়া, নিহেরা মাছ, প্রভৃতি সামুদ্রিক মাছ), জঙ্গলে মধু সংগ্রহ করা, চাষবাস (ধান, উচ্ছে, ঝিঙে, পান ইত্যাদি) এসবের মধ্য দিয়ে জীবন জীবিকার পরিচালনা করতেন। এমনকি মাছ ধরার জন্য সেখানে 'খটি কেন্দ্র' বা 'ফিসিং ক্যাম্প' বসত। আশেপাশের দ্বীপগুলিতেও যেমন- সাগর-দ্বীপ, জম্মু দ্বীপ, মৌসুনী দ্বীপ, নামখানা, ফ্রেজারগঞ্জ-

বকখালিতে এরকমই খটি মৎস্য কেন্দ্র বসিয়ে মাছ ধরা হত। এখানে মেহেন্দি জাল ও সরু নেট জাল দিয়ে মাছগুলোকে ধরে এনে হয় জ্যান্ত, না হয় শুকিয়ে পাইকারি হিসেবে বিক্রি করা হতো।[১৩] নিরঞ্জন জলদাস তাঁর Fisherman 'The Forest Act' and Narratives of Eviction from Jammudwip Island[১৪] গ্রন্থে দেখিয়েছেন ১৯৫০ এর দশকে অন্ধ্রপ্রদেশ, মেদিনীপুর এবং পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন উপকূলের কাকদ্বীপ, নামখানা, ফ্রেজারগঞ্জ, বকখালি, শিখরপুর, সাগর আইল্যান্ড, জম্মু দ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে একই রকম "খটিকেন্দ্র" শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং মৎস্য ব্যবসার এক বড় মাধ্যম তৈরি হয়েছিল। বর্তমানে নদীর ক্ষয় কার্যের জন্য উপযুক্ত মাছ ধরার পরিবেশ না থাকার দরুণ আজ মৎস্য জীবিকা অস্তিত্বহীন। বর্তমানে নদীর পাড় অঞ্চলে মীন যা বাগদা মাছ ধরার ব্যবস্থা থাকলেও তার সংখ্যা খুবই নগণ্য। এক্ষেত্রে এও লক্ষ্য করা যায় যে পুরুষদের তুলনায় মহিলারাই বেশি এই মীন বা বাগদা মাছ ধরার কাজ করতো।

একদিকে যখন বসবাসের জমি, চাষবাসের জমি নদী গর্ভে চলে যাচ্ছে তখন জনসাধারণ কাজের সন্ধানে শহর অঞ্চলে বা ভিন রাজ্যের দিকে পাড়ি দিতে থাকে। এই সমস্যা শুধু ঘোড়ামারাতে শুরু হয়েছিল তা নয়, সুন্দরবনের প্রায় সর্বত্রই এই একই সমস্যা শুরু হয়েছিল কারণ কৃষি কাজ ও নদীতে মাছ ধরার থেকে শহরতলী বা ভিন রাজ্যে কাজ করে তুলনামূলক অধিক পরিমাণ অর্থ উপার্জন সম্ভব। এছাড়া ১৯৯১ সালের অর্থনৈতিক উদারীকরণের প্রভাব ভারতবর্ষের গ্রামে-গঞ্জে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল, যার কারণে প্রায় প্রতি বাড়ির মালিকের মুখ থেকে শোনা গেছে যে সংসার চালানোর জন্য বাড়ির এক বা একের বেশি সদস্য স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে ভিন রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছে। এমনকি দেখা গেছে পুরো পরিবারটাই কাজের সন্ধানে কেরালা (সবচেয়ে বেশি), গুজরাট, মহারাষ্ট্র, ব্যাঙ্গালোর, অন্ধ্রপ্রদেশ, চেন্নাই প্রভৃতি স্থানে গিয়ে রাস্তায়, এমনকি স্টেশনেও পর্যন্ত থেকেছেন।

শিক্ষা ব্যবস্থার দিক থেকে ঘোড়ামারা অনেক পিছিয়ে। অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুল রয়েছে হাটখোলা, মন্দিরতলা, রায়পাড়া, বাকপাড়া ও ঘাসিমারা গ্রামে। দ্বীপের চুনকুড়ি গ্রামে রয়েছে 'ঘোড়ামারা মিলন বিদ্যাপীঠ হাইস্কুল' যা ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখানে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনার সুবিধা আছে কিন্তু মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার জন্য পার্শ্ববর্তী কাকদ্বীপের কোন এক স্কুলে এসে পরীক্ষা দিতে হতো এবং পরবর্তী উচ্চ শিক্ষার জন্য তাদেরকে দ্বীপের বাইরে আসতে হতো যা ছিল খুবই খরচ সাপেক্ষ যা সব বাড়ির পক্ষে অসম্ভব। এই কারণে খুব কম বয়সে বিয়ের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। দীর্ঘ নদী পথের জন্য স্কুলের শুরু থেকেই শিক্ষক নিয়োগ একটি বিমূর্ত বিষয়। ২০১৮ সালে প্রধান শিক্ষকের বর্ণনা অনুযায়ী মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৪৩২ জন, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সহ স্থায়ী শিক্ষক দুজন, পার্শ্ব শিক্ষক তিনজন এবং আংশিক সময়ের শিক্ষক ছয় জন। এমনকি বাধ্য হয়ে ক্লাস নিচ্ছেন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীরাও।[১৫]

স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি সুরজিৎ কর বলেছিলেন "এই ছয় জন পার্শ্ব শিক্ষকের বেতন দেওয়া হয় অভিভাবকের চাঁদার টাকায়" এবং এও জানায় যে "দীর্ঘ ২৯ বছর বছরে মাত্র দুই জন শিক্ষক নিয়োগ হয়েছিল।" এই বর্ণনা অনুযায়ী পরিষ্কার এক সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, ঘোড়ামারার শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবেশ অনেক . পিছিয়ে এবং এই পিছে থাকার পেছনে সমকালীন সরকারের অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে। ঘোড়ামারার স্বাস্থ্য পরিসেবা শুরু থেকেই রয়েছে গ্রামকেন্দ্রিক হাতুড়ে বা কোয়াক ডাক্তার। যে স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি চুনপুরী গ্রামে সরকার দ্বারা তৈরি হয়েছিল তা বেশিরভাগ দিনেই ডাক্তার না আসার কারণে বন্ধ থাকে। চুনপুড়ি গ্রামের অধিবাসী সমীর মণ্ডল[১৬] বলেছিলেন, "পরিষেবা না থাকার জন্য সাপের কামড়ে প্রতিবছর ৪-৫ জন করে মারা যায়।" তাদেরকে পার্শ্ববর্তী কাকদ্বীপ হাসপাতাল ও ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালের ওপর নির্ভর করতে হয়। সময়মতো পৌঁছাতে না পারলেই রোগীর প্রাণ বাঁচানোই দুষ্কর।

ঘোড়ামারা দ্বীপের নদীর ক্ষয় কার্য প্রতিকার করার জন্য নানাবিধ প্রকল্প হাতে নিয়েছিলেন সরকার যেমন গাছ বসিয়ে, মাটির বাঁধ বসিয়ে, কখনো খাঁচা লাগিয়ে ভূমিক্ষয় আটকানোর চেষ্টা হয়েছে কিন্তু কাজে দেয়নি কিছুই। সম্প্রতি বিশেষ ধরনের এক ঘাস 'ভেটিভার' বসিয়ে মাটির ক্ষয় রোধের চেষ্টায় নেমেছিলেন সরকার। দক্ষিণ ভারত থেকে আনা এই ঘাস স্থানীয় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে লাগানো হয়েছিল। প্রশাসনের দাবি এই ঘাস মাটির উপর ৪-৫ ফুট পর্যন্ত বাড়ে এবং মাটির ভিতরে ১২-১৫ ফুট পর্যন্ত খুবই শক্তিশালী ভাবে তার শিকড় চারায়। তা সত্ত্বেও নদীর ক্ষয় কার্য রোধ করা সম্ভব হয়নি। পার্শ্ববর্তী সাগর-দ্বীপ ও মৌসুনী দ্বীপের (মৌসুনী দ্বীপ হল সাগর-দ্বীপের পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি ছোট দ্বীপ, যা একটি মাত্র পঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত) ভৌগোলিক মানচিত্র লক্ষ্য করলে পরিষ্কার হয় যে দ্বীপগুলি পূর্বের তুলনায় ছোট হয়ে গেছে। এই দ্বীপগুলিরও জনসংখ্যা লক্ষ্য করলে জানা যায় অনেক সংখ্যক মানুষ দ্বীপগুলি ছেড়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছেন। মৌসুনী দ্বীপের পূর্ব ও পশ্চিম ধার বরাবর অনেকটা এলাকা জলের তলায় চলে গেছে। একই রকম সাগর দ্বীপের পূর্ব ও দক্ষিণের অঞ্চলগুলোও অসংরক্ষিত। তবে সাগর-দ্বীপ ও মৌসুমী দ্বীপে সরকার শক্ত ইটের বাঁধ নির্মাণের উদ্যোগ নিলেও ঘোড়ামারা দ্বীপের ক্ষেত্রে এরূপ লক্ষ্য করা যায়নি। মধুসূদন কর্মকার, মধুশ্রী রায়[১৭] এবং WWE[১৮] দেখিয়েছেন কিভাবে মৌসুনী দ্বীপসহ সাগর- - দ্বীপ, ঘোড়ামারা দ্বীপ, অম্বু দ্বীপ (জম্বু দ্বীপটি বকখালি বা ফ্রেজারগঞ্জ থেকে ৮ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত) কাকদ্বীপ ও নামখানা দ্বীপগুলির আয়তন সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে।

এই আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে 'বিশ্বায়ন[১৯] এর প্রভাবে সারা বিশ্বে যখন উন্নয়নের জোয়ার বইছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে ঘোড়ামারা দ্বীপবাসীদের ভাটাময় জীবন। জীবন সংগ্রামের বাণ বইছে অবিরত। বিশ্বায়নের 'বিশ্ব মুখী গ্রাম' ঘোড়ামারার গ্রাম গুলিকে ধরে রাখতে পারেনি। দেখা যায় ঘোড়ামারা থেকে অনেক সংখ্যক মানুষ নিজের

জন্ম ভূমি ছেড়ে দিয়ে পার্শ্ববর্তী সাগর-দ্বীপ, কাকদ্বীপ ও ডায়মন্ড হারবার লাগোয়া অঞ্চলে বসবাসের জন্য চলে আসে যা খুবই কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল আর যারা অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল নয় তারা ঘোড়ামারাতেই থেকে গেছে। একদিকে দ্বীপবাসী যেমন অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে আবার অন্যদিকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দরুণ তাদেরকে প্রতিনিয়ত অস্তিত্বের জন্যে লড়াই করতে হচ্ছে, যা ঐতিহাসিক আলোকে মূল্যায়ণ করা জরুরী। তাই আমাদের প্রয়োজন পরিবেশকে রক্ষা করা ও দ্বীপ অঞ্চলকে সুরক্ষিত রাখা। এই কর্মসূচির জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গে সরকারি উদ্যোগ থাকাও গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ঘোড়ামারা তে অবস্থিত বাসিন্দা রয়েছে, যারা আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে জন্মভূমি ছেড়ে আসতে পারছে না, সরকারকে তাদের পুনর্বাসনের সহায়তা করতে হবে। এইভাবে হয়তো ঘোড়ামারা দ্বীপবাসী তাদের জীবন ধারণের কিঞ্চিৎ উপকার পাবে।

তথ্যসূত্র:

১. Biraj Kanti Mondal And Sajal Ghosh, Vulnerability Status Of Ghoramara Island And Probable Alternatives, West Bengal: Geoinformatics for Sustainable Environment Management, July, 2018, P. 195: Sources: https://www.researchgate.net/publication/332097993. VULNERABILITY.STATUS. OF GHORAMARA ISLAND AND PROBABLE ALTERNATIVES, Date: 23.07.2018, at 07:45 pm.

২. আবুল আসাদ, নিশ্চিহ্নের পথে বঙ্গোপসাগরের ঘোড়ামারা দ্বীপ, দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকা, বৃহস্পতিবার, ১৩ ই আগস্ট, ২০১৫, পৃ. ২৪।

৩. রামশরণ শর্মা, ভারতের প্রাচীন অতীত, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, হায়দ্রাবাদ, ২০১১, পৃ. ৫৫-৫৭।

৪. Biraj Kanti Mondal And Sajal Ghosh, Vulnerability Status Of Ghoramara Island And Probable Alternatives, West Bengal: Geoinformatics for Sustainable Environment Management, July, 2018, P. 189, Sources: https://www.researchgate.net/publication/332097993. VULNERABILITY STATUS. OF. GHORAMARA ISLAND AND PROBABLE ALTERNATIVES, Date 13.07.2018, at 03:25 pm.

৫. Debasmrity Mukherjee, Environmental Appraisal of an Eroded Island, the Ghoramara: Hugli Estuary, West Bengal, IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume

24, April, 2019, p. 61: Sources: https://www.iosrjournals.org/ios-jhss/papers/Vol.%20 24%20Issue4/Series-3/J2404035865.pdf, Date: 17.04.2019, at 03:45 p.m.

৬. Subhanil Guha and Anindita Dey, Morphological Change Analysis of Exposed Ghoramara Island, International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), Vol. 02, November, 2015, p. 331: Sources: https://www.irjet.net/archives/V2/18/IRJET-V21856.pdf, Date: 16.11.2015 at 06:39 p.m.

৭. Adarsa Jana, Shamina Sheena, and Arkoprowo Biswas, Morphological Change Study of Ghoramara Island, Eastern India Using Multi Temporal Satellite Data, Research Journal of Recent Sciences, ISSN 2277-2502, Vol. 1(10), October, 2016, P. 71: Sources: https://www. researchgate.net/publication/360962986. Morphological Change Study of Ghoramara Island Eastern India Using Multi Temporal Satellite Data, Date: 17.10.2012 at 04:35 p.m.

৮. Hirak Sarkar, Arindam Roy and Giyasuddin Siddique, Impact of Embankment Breaching on Rural Livelihood: A Case of Ghoramara Island of the Sundarbans Delta in South 24 Parganas District, West Bengal, The journal of Bengal geographer Vol. V, No. IV, October, 2016, P. 101: Sources: https://www.researchgate.net/publication/331198458 Impact of Embankment... Breaching on Rural LivelihoodA Case of Ghoramara_Island of the Sundarbans.Delta. in South 24 Parganas. District. West Bengal, Date: 19.10.2016 at 06:37 p.m.

৯. ibid, p. 108.

১০. Debasrurity Mukherjee, Environmental Appraisal of an Eroded Island, the Ghoramara: Hugli Estuary, West Bengal, IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Vol. 24, April, 2019, p. 63. Sources: https://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol.%2024%20 Issue4/Series-3/J2404035865.pdf, Date: 21.04.2019 at 06:37 p.m.

১১. Census of India, final population totals ministry of Home affairs Government of India New Delhi, 2001.

১২. শেখ সুলেমান, তলিয়ে যাচ্ছে ঘোড়ামারা দ্বীপ, সংবাদ মন্থন পত্রিকা, ২৭ আগস্ট ২০২২, পৃ. : Sources https://web.archive.org/web/20200827201319/https://sites.google.com/site/song badmanth an/1march2009eleven, Date: 26.11.2022 at 05:38 p.m.

১৩. Bikash Ray Chaudhary, The Moon And Net: Study of Transient Community of Fisherman at Jumbudwip, Anthropological Survey of India, Kolkata, 1980, P. 73.

১৪. Niranjan Jaladas, Fisherman 'the forest act' and narratives of eviction from Jammudwip Island, Nehru memorial museum and library, Kolkata, 2013, P. 15.

১৫. শিবনাথ মাইতি, ঘোড়ামারা আইল্যান্ড তলিয়ে যাওয়ার আগে, আনন্দবাজার পত্রিকা, ডিসেম্বর, ২০২৩, Surces:https://www.anandabazar.com/rabibashoriyo/ghoramara-the-sinking-island-of- sundarbans-1.796366 Date: 03.12.2023 at 05:37 p.m.

১৬. সমীর মণ্ডল: সাক্ষাৎকার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ঘোড়ামারা (চুনপুড়ি গ্রামের অধিবাসী ছিল, যে ইয়াস বন্যার (মে মাসের ২০২১ সালের) পর কাকদ্বীপ অঞ্চলের ময়না পাড়া গ্রামে বসবাস করেন।), ১০ই মে ২০২৩।

১৭. Madhusudan Karmakar, ParthapratimDey and Madhushree Roy, Rise Of Sea Level And The Sinking Islands Of Sundarban Region: A Study Of Mousuni Island In India, Journal of Global Resources Vol. 6 (01), August 2019-January 2020, P. 235: Sources: https://www.researchgate. net/publication/340548471 Rise_of_sea_level_and_the_sinking Islands of Sundarban... region A study of Mousuni Island in India, Date: 08.03.2020 at 03.55 p.m.

১৮. WWF, Sundarban: Future Impact Climate Adoption Report, WWF (India) Report, 2010, P. 28.

১৯. Baldev Raj Nayar, India's Globalisation: Evaluating The Economic Consequences, SEGE, 2006, P. 24.

“Cinema as the Mouthpiece of the Lower Class People of the Society : A Descriptive Study of Select Buddhadev Dasgupta's Films”

Balaram Mistry
Research Scholar, Dept. of Journalism and Mass Communication
University of Technology, Jaipur
&
Ashok Kumar Meena
Professor, Dept. of Journalism and Mass Communication
University of Technology, Jaipur

Abstract: As Buddhadev Dasgupta understood the language of cinema, he also understood every incident happening around him. Therefore, we have witnessed that incident appearing again and again in his movies, maybe the same has appeared in his poetry in other languages. In his movie, he has highlighted the deprived people of Bengal's remote villages. For example, in the movie 'Neem Annapurna' (1979) he highlighted the collective crisis of colonialism and the social reality of North-West Bengal. Based on the story of Kamalkumar Majumder, the film is a completely realistic production. The collective is a crisis but to shape it the individual has to be brought in as a character. However, Buddhadev Dasgupta adds a scene later to show that the march of hunger and poverty does not stop. Even though the story of one *‘Brajo’* is over for the time being, another family like *‘Brajo’* is seen on the train heading towards Calcutta.

“People live, people die / Whose loss is it? What is the damage?
I only secretly get a fever in my chest, people live and people die.”

Buddhadev Dasgupta is a poet. So the feeling of sadness in the 'poet's heart' becomes twelve times more. Maybe that is the reason his films speak for individuals and society. So many subjects have come back again and again as repetitive motifs in his films. These are dwarfs, wrestling matches, child idols as symbols of optimism, elements of folk culture, cultural codes, minimalist approaches, etc. All in all, his movies

have become movie novels. Buddhadev Dasgupta's movies show his deep knowledge and wisdom on politics, social policy and human life. Buddhadev Dasgupta is a politically conscious person, so his movies have several scenes on burning-hunger of the backward people of the society.Buddhadev Dasgupta did not hesitate to project the image of an unknown demon-state through his movies and poetry. Buddhadev Dasgupta's first and foremost responsibility as a poet was to reach the people. This responsibility may have taken him to the world of films. As Buddhadev Dasgupta himself said,

"Cine-poetry has the ability to take our known reality into a new poetic world."

None of BuddhadevDasgupta's movies are autobiographical. However, he sprinkled some of his life's mixed feelings and perceptions in his construction. As an example, the movie *'Bagh Bahadur'* can be mentioned along with *'Kalpurush'*. His thoughts are not only confined to the cinema of this subcontinent, he continues to leave an important impression on world cinema. For him, movies are just like hunger pangs. Just as hunger drives us away, it becomes difficult for him to survive without movies. He thinks that the passion of making movies has kept him alive.

Key word: Buddhadev Dasgupta, Uttara (2000), Kaalpurush (2008), Purulia, Lower Class of Society, Director of Bengal Lower Class of Society.

Discussion: Buddhadev Dasgupta is a powerful Bengali poet. His name is mentioned with respect only after Sunil-Shakti. He has transformed the poetic world of the poem into film. He is an internationally renowned film director. His films are screened at major festivals around the world. Repeated participation in major film festivals in Venice, Toronto, Lucarno, Carlo B. Veri, Athens, China, Iran. He has received multiple awards. His films are among the best in the world and are also taught in the best film institutes. Buddhadev Dasgupta's place is very important in the history of Bengali cinema. Buddhadev Dasgupta was the first to free himself from the tradition of simple and narrative storytelling that is the lifeblood of Bengali cinema. In his movies, the story of the life of

ordinary working people of Bengal is framed. Maybe that is why he is called the ‘poet of films.’

About fifty years ago, Buddhadev Dasgupta got into films. From scene to scene he can mix the smell of poetry. He also created complex life stories. Like the intuition of the poem, the audience can mix it in the heart. Poems have been written in words, rhymes and sentences for thousands of years. But the history of film is only a hundred years old. This medium has come of age with the arrival of some era-creating directors. This medium has been diversified by outstanding directors like Buddhadev Dasgupta. He grew up in Purulia, a once backward district of Bengal. So his movies showed the lamentation of all these backward people. With that, he has shown the plight of deprived people to the audience many times in his movies. He also got the result. He has won many national awards. As a director, he has won India's Best National Award many times. Of course, these do not touch him. He considers his film a success if an informed audience loves it. He studied economics and has also taught for some time. But film scan be considered as his addiction, profession, meditation and knowledge. He grew up watching the films of Charlie Chaplin, Ingrid Bergman, Akira Kurosawa, Vittorio De Sica, Roberto Rossellini. ‘*Durotwo’* (1978), *‘Neem Annapurna’* (1979), *‘Griho Juddho’* (1982), *‘Andhigali’* (1984), *‘Phera’* (1988), *‘Bagh Bahadur’* (1989), *‘Tahader Katha’* (1992), *‘Charachar’* (1993), *‘Laal Dorja’* (1997), *‘Uttara’*(2000), *‘Swapner Din’* (2004), *‘AamiYasin Aar Amar Madhubala’* (2007), *‘Kaalpurush’* (2008), *‘Janala’* (2009), ‘*Anwar Ka Ajab Kissa’* (2013), *‘Tope’* (2017) - only the viewers of these films know the real magic of this director. A good poetry reading has the same sense of excitement that a film has.The basic intention of the present work is to explore the aesthetic comfort of Buddhadev Dasgupta's film language and filmmaking style. Buddhadev Dasgupta is the purest filmmaker among the filmmakers in the Bengali-speaking region after Satyajit-Ritwik-Mrinal. His films have received mixed reviews. He himself has spoken about his films. In order to understand the language and aesthetics of his films, the evaluation of various people and his own opinion have been taken into account.

The socio-economic situation of Bengal is repeatedly reflected in Buddhadev's movies. He has given a strong message to the decadent attitude of the society in his films. He was first attracted to films when he was a school student. This interest grew further when he watched Charlie Chaplin with his uncle. After that, he was impressed by the films of some world famous film directors. Among them are Akira Kurosawa, Vittorio De Sica, Roberto Rossellini and Antonioni. But his favorite creators are Luis Buñuel, Andrei Tarkovsky and Thodōros Angelopoulos. Satyajit Ray inspired him towards realistic films. He says about himself and his passion -

“Actually, I am a very passionate person. I am crazy about movies. I am a man in love. This love is not only for women, this love is also for poetry,for movies too. I think it's very convenient."

While answering, he observed that there is no point in de-internationalizing Purulia to highlight the primitive public life. Regionalism does not extend the boundaries of the film. He used examples from Akira Kurosawa's ‘*Dreams’*and Ingmar Bergman's ‘*Silence’* to show that humanity is impaired. When he made the film *‘Griho Juddho’,* after getting inspiredfrom Costa-Gavras’sfilm‘G’, based on the radical left, he used a mobile hand-held camera. To do that perfectly, the director castedGautamGhosh as one of the actors in that film as Gautam Ghosh is known as an amazing camera person.

Buddhadev Dasgupta is an important poet during the sixties. His works are different from all the other famous film makers as he did not think of any specific timeline. His constructions in the sixties are still modern. They will not look old. Because he always talked about changing his mind. Times are moving forward, and to keep up with the time, ideas have to change and tasks should be timely.The reality of the film will extend beyond the square of the white screen into the society. The characters will talk and move with the viewer's mind. Their situation will make them think, the music will make them sympathize, they will look for their own life story. Sadly, instead of doing that, in the mainstream films the audience is transported to a world where they cannot relate the story with their lives, which doesn't exist anywhere in the world. In this scenario of the film, the poet Buddhadev felt that when the

interrelationship of the individual and the society is coming out from the story of the films, before the solutions are born, there are many more questions which the viewer's grow in their minds. He said about this -

"I saw, as a result of the emergence of a similar force against the influence of internal corruption,I have given birth to adverse poetry and have been practicing it."

An extended form of this practice can be seen in Buddhadev's films. He made the presence of all his poetic elements in his films. In his words,

"Poetry, music and film - which binds the vitality of these three art forms to the same thread, that is none other than rhythm."

A film has its own style. It also has a rhythm. That rhythm develops itself. It can be broken again to build anew. He has found this rhythm as a filmmaker which took his sense of proportion to another height.The use of motifs in his films along with the poetic style gave it a distinctive feature. A motif is usually a symbolic character or a color or piece of music that is repeated here and there to convey a complete analysis of the whole story. Buddhadev plays with that motif with great mastery, talking about his dream.For example, in the movie *'Kaalpurush'* (2008), *Sumantha (the lead character)* had a good relationship with his father. But parents' misunderstanding takes *Sumantha* far away from his father. After a long time, when *Sumantha* himself is now a father andwhen the distance with wife *Supriya*, children *Shanta* and *Shantanu* are creating walls in his relationship, as it happened in his past life,he now understands his father. So, he thinks about his father in his imagination, he has unspoken conversations with his father and after hearing *Supriya*'s compassion, the father says, 'Actually we couldn't be what they wanted us to be. That's why everyone leaves us, there is no one left to love.'

In his films, that state is sometimes behind the curtain and sometimes it becomes clear by removing the curtain. In *'Swapner Din'* (2004), the first scene shows the dead bodies of some policemen, the restless running of squirrels over the broken glass of their cars, and the policeman's nameplate looking away. In the midst of state chaos, this carefree sneaking of pet squirrels raises questions. Maybe, even if the

armed police, in other words, the state structure 'falls', the dream of the common man does not stop, life goes on smoothly. We saw the squirrel a second time in Paresh's car with his usual curiosity and agility. Paresh with the State and the Squirrel with Paresh, along with the ID card,they are playing with each other.

Similarly, after losing her husband, Amina dreams of being well with her unborn child. Even though he did not find a place for shelter, he said to his unborn child, "One day I will bring you a paper, not any rubbish, but a paper from a beautiful place." Paresh is not concerned about his stolen car; he is more concerned about the reels. So, we hear Paresh say, 'Didn't you bring the reels down?' Because, within these reels, his dreams come and go! One of Kurosawa's words comes to mind, ‘If dreams are gone from my life, at least nightmares remain.’

Similarly, in *‘Mondo Meyer Upakhyan’* (2002), Rajni, Basanti, Bakul dream of a permanent place to find shelter. It is known that the state is responsible for fulfilling the basic needs of its citizens. But it is not true that the state has taken a step back from its responsibility. It has done its job for ‘Notobor’, who has a cinema hall, oil mill, paddy mill, pea-car business. But for their bread and butter, *Rajani* has to sellher body to 'dogs and foxes'. *Lati*, *Rajani*'s daughter, wants to study just to escape that hell. *Lati*'s dream becomes futile in teacher *Nagen Babu*'s dream. But *Notbor* got in the way. They want to get Lati's flesh by creating a false dream. People step from the earth to the moon, but a part of the society still has to sell their bodies to live, eat and wear, and has to fight with the society-state. Yet the journey does not stop, that journey is of Lati-Bakul-Basanti.*Dilip*, *Yasin* and *Madhubala* came to Kolkata with dreams like *Basanti* or *Bakul*. But *Ami Yashin Aar Amar Madhubala* (2007) is about the dream that is shown to them, which turns out to be a nightmare. Some ordinary people walk with sofas on their heads along the roads of the city. Buddhadev Dasgupta moves to the core with that small scene that comes up again and again on the screen. The sofa with the legs of the tiger's paws, instead of sitting on the ground, rides on the neck of the commoners.

For the sake of discussion, the topics of 'film language' and 'film aesthetics' have been taken up in examining the language and aesthetic

dimensions of Buddhadev Dasgupta's films for theoretical understanding. The discussion about 'film language' and 'film aesthetics' is necessary from the urge to understand the two aspects of Buddhadev Dasgupta's film yagna, i.e. 'language' and 'aesthetics'. It needs to be said that a structural-functional-discursive approach has been taken to understand the classified films.Are not his movies challenging the modernity anywhere? Modernity separates us from nature. But he doesn't have a single movie where nature is also a special character. But did he reject the modern existentialist cinema which are detached from nature? This question remains. But it is not difficult to say that, when he created his 'extended reality' in nature, it was driven by a logic of its own, transcending the so-called logic of stories. If Buddhadev Dasgupta was only a film director instead of a poet, or if he was only a poet instead of a film director, then maybe the world of poetry and cinema would not have found this excellent language of his thoughts. Since he is a poet and a filmmaker effectively, both mediums have come up with a whole new language. The language of poetry and cinema became intelligent through his works.

References:

Ghosh, S. (2020).*A study on the path- breaking intellectual impact of the Marxist cultural movement (1940s) of India.*https://www.semanticscholar.org/paper/A-Study-On-The-Path-Breaking-Intellectual-Impact-Of-Ghosh/d58f2485cc3655b98b884b2fa7c10a379f930e41

Dasgupta, S. (2004). INDIAN SECURITY AND BANGLADESH: INTERNAL DIMENSIONS AND EXTERNAL LINKAGES. *Jadavpur Journal of International Relations/Jadavpur Journal of International Relations*, *8*(1), 141–173. https://doi.org/10.1177/0973598404110010

Chatterjee, M. (2024, January 1). *A KALEIDOSCOPE OF MULTISENSORY PERCEPTIONS IN THE FILMS OF BUDDHADEB DASGUPTA*.MonaliChatterjee - Academia.edu. https://www.academia.edu/116991720/A_KALEIDOSCOPE_OF

_MULTISENSORY_PERCEPTIONS_IN_THE_FILMS_OF_BUDDHADEB_DASGUPTA

Staff, F. (2021, June 10). BuddhadebDasgupta, National Award-winning Bengali filmmaker, passes away aged 77 after prolonged kidney ailment. *Firstpost*.https://www.firstpost.com/entertainment/buddhadeb-dasgupta-national-award-winning-bengali-filmmaker-passes-away-aged-77-after-prolonged-kidney-ailment-9702361.html

Chatterji, S. A. (2021, June 11). *BuddhadebDasgupta*. Upperstall.com. https://upperstall.com/profile/luminary/buddhadeb-dasgupta/

Islam, K. M. B. (2021). BuddhadebDasgupta's 'The Voyeurs' (2007): Treatment of the Private Space. *ResearchGate*.https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14912388

Tobin, Y., &Dasgupta, B. (2001). "Uttara": Interview with Indian film director BuddhadebDasgupta. *ResearchGate*.https://www.researchgate.net/publication/296882646_%27Uttara%27_Interview_with_Indian_film_director_Buddhadeb_Dasgupta

Gupta, S. (2021, June 11). BuddhadebDasgupta (1944-2021): A poet at heart whose cinema was a mix of realism, lyricism. *The Indian Express*.https://indianexpress.com/article/entertainment/regional/buddhadeb-dasgupta-cinema-was-timeless-a-unique-mix-of-realism-and-lyricism-7352585/

The Tribune - Magazine section - Saturday Extra. (n.d.).https://www.tribuneindia.com/2008/20080531/saturday/main1.htm

Ghosh, S. (2019, February 12). BuddhadebDasgupta: Five unforgettable Bengali films directed by the iconic director. *The Times of India*.https://timesofindia.indiatimes.com/entertainment/bengali/movies/news/buddhadeb-dasgupta-five-unforgettable-bengali-films-directed-by-the-iconic-director/photostory/67960304.cms

Indiablooms.(n.d.).*National Award-winning Bengali filmmaker BuddhadebDasgupta passes away | Indiablooms - First Portal on Digital News Management*. Indiablooms.com. https://www.indiablooms.com/showbiz-details/T/14115/national-

award-winning-bengali-filmmaker-buddhadeb-dasgupta-passes-away.html#google_vignette

Filmmaker, A. T. (n.d.).*Tope (The Bait, 2016) | BuddhadebDasgupta | MFF*. A Potpourri of Vestiges.https://www.apotpourriofvestiges.com/2016/11/tope-bait-2016-budhadeb-dasgupta-mff.html

Kaumudi, K., &Kaumudi, K. (2021, June 10). National award-winning director BuddhadebDasgupta dies at 77. *Keralakaumudi Daily*. https://keralakaumudi.com/en/news/news.php?id=567897&u=

Migrator, Migrator, &Dtnext. (2021, June 10). *dtnext*. Dtnext.https://www.dtnext.in/cinema/2021/06/10/national-awardwinning-filmmaker-buddhadeb-dasgupta-dies-at-77

Journey to Liberation : A study of Moksha in Indian philosophy

Shashank Pandey
Research Scholar, Dept. of Philosophy and Religion
Banaras Hindu University

Abstract: Indian philosophy originates with the explanation of sorrows and sufferings in life and gives the path by which we can completely overcome our all sorrows and sufferings with some realistic and practical approaches. The main cause of all suffering is ignorance because due to it the self identifies it with the body and suffers from various types of suffering. That's why everybody wants liberation or moksha which ends all suffering and also gives transcendental peace and Happiness. In the words of Swami Vivekananda, "The ultimate aim of human life is to attain liberation or moksha, to break free from the cycle of birth and death and to merge with the infinite."

So we can say Moksha is a fundamental concept in Indian philosophical traditions that gives different methods to attain the ultimate goal of human life. There are three Heterodox and six Orthodox schools in Indian philosophy, except charvaka all other schools accept the need and relevance of the concept of liberation. In Hindu ethics, there are four Purushartha - Dharma, Artha, Kama, and Moksha in which Moksha is the supreme and summum bonum of life.

The main objective of this article is to examine the nature, scope, and methods of liberation or moksha in Indian philosophical schools. Also in this, I want to find out how these various paths of the conception of liberation are still relevant in today's world.

Keywords: Liberation, Suffering, Happiness, Indian philosophy, Dharma, Ignorance.

Introduction: Philosophy means love for knowledge which comes from an enthusiastic search of the world but Darshan means to see the truth and try to find it. As we know, individuals live by their philosophy of life and conception of the world. It is true because everybody wants to view their

life from a different perspective. However, philosophy is not just a view of life; it is a way of life. In Indian Philosophy the goal of human life is 'Atyantika Dukha Nivritti' which means ultimate liberation from suffering or in other words to attain Moksha. Here there is an image of life in everything and it teaches us how without going anywhere or seeking anything from the outside one can attain transcendental liberation.

If we see and try to understand there are many basic outlines in Indian as well as Western philosophy and if we see in Indian philosophy, the doctrine of moksha or liberation is a central concept and the ultimate goal of human life. Moksha means liberation from the cycle of birth, death, and rebirth where the individual soul (atman) breaks free from the cycle of karma and merges with the universal soul. The concept of Moksha is often associated with the idea of overcoming ignorance (avidya) and realizing the true nature of self and universe. The Bhagavad Gita states that just like a man sheds off his old clothes and wears new ones, so does the soul. It simply casts off an old body and enters a new one. This continues until one is liberated from the cycle of birth and rebirth and attains moksha.

Due to extensive discussions on moksha in Indian philosophy, it is also known as moksha darshan. Max Müller once said, "In India, philosophy is not just about attaining knowledge but about attaining the supreme goal of life, which is known as moksha." In Indian ethics, there are four purusharthas- Dharma, Artha, Kama, and Moksha in which Moksha is the last and most prominent part of Purushartha. Moksha is a central concept of Hinduism but also its core part of Buddhism, Jainism, and some other religions.

When we see in Indian philosophy only a carvaka denies the concept of moksha but all other Heterodox and Orthodox schools accept the concept of moksha. There are differences between nature, scope, and methods to attain moksha in Indian philosophy which we will discuss and understand here. As we know Indian philosophy is classified into Orthodox (astika) and Heterodox (nastika), schools of philosophy. Here Orthodox school believes in the authority of the Vedas and the Heterodox school doesn't believe in the authority of the Vedas. Firstly we will start

to see the concept of Moksha in Heterodox schools such as Buddhism and Jainism.

Buddhism- In Buddhism Moksha is commonly used as a term “Nirvana” which is the ultimate goal of Buddhist practice. Buddhism accepts that there is suffering, we are suffering due to our ignorance. For Buddha, the path to salvation starts from an understanding of the root causes of suffering and there are right paths to end the suffering. Nirvana is achieved when a person perceives the true nature of reality. As we know getting rid of the fire of sorrow is Nirvana and some people call it extinguishing of the lamp of life but this meaning is wrong. Even after attaining salvation, the Buddha continued to do public welfare work till the age of eighty years. Sometimes Nirvana is indescribable in nature and we can understand it only with the help of analogy. In Nagsen word's, “Nirvana is as deep as the ocean, as high as a mountain and as sweet as mango.”That's the reason some scholars accept that Nirvana is a state of pure bliss and some accept that it is the end of all types of sorrow.

The eightfold path to Nirvana is for monks and laymen also. These are Right views, Right Resolve, Right speech, Right conduct, Right livelihood, Right effort, Right mindfulness, and Right concentration.

Jainism- Like Buddhism, Jainism also believes that virtue is sufficient for salvation and ignorance of knowing the self as the body is the cause of all suffering. When bondage of the soul is associated with matter, liberation must be a complete dissociation of the soul from matter. This can be attained by stopping the influx of new matter with which the soul as well as by complete elimination of the matter with which the soul has become already mangled. The first process is known as sanvar(the stoppage of influx and the second nirjara(wearing out of karma in the soul).

As we know our ignorance is the real cause of all sorrow and knowledge alone can remove all ignorance. For it, there are three means suggested which is the Right view, Right knowledge, and Right conduct, and with the help of these paths, we can attain the ultimate state of salvation. After attaining salvation the soul returns to its natural state which is four perfections in reality- Infinite faith, Infinite knowledge, Infinite power, Infinite bliss, and peace.

We have seen the concept of Moksha and its means in Heterodox schools of Indian philosophy. Now we will see the nature, concept, and scope of Moksha in Orthodox schools of Indian Philosophy. As we all know there are six Orthodox schools which are- Sankhya, Yoga, Nyaya, Vaisheshik, Purva-Mimamasa, and Uttara-Mimamsa.

Samkhya: It is one of the oldest schools of Indian philosophy and it believes in two dualistic independent realities prakriti and purusha. Our life in this world is a mixture of Happiness and Sorrows. There are many things that give pleasurable circumstances and many more give pain or suffering. There are three kinds of pain or dukkha in Samkhya that living beings suffer from- "Adhyatmika", "Adhibhautika" and "Adhidaivika." Adhyatmika is suffering with one's own self like physical and mental suffering, Adhibhautika is the suffering that extra-organic natural causes like with family members, friends, and relatives etc, Adhidaivika is the suffering that arises from supernatural forces like planets, ghosts, and demons etc and this dukha is beyond the human control. Our main focus should be to attain liberation or absolute freedom from all pain and suffering. It is possible only due to the right knowledge of reality or Vivek gyan which is archived through the distinction between the self(purusha) and the non-self(Prakriti). A being does not experience happiness or sorrow in the state of liberation and this is just the name of the state without suffering. In Samkhya, two types of liberation mentioned are "Jivanmukti" and "Videhmukti" and attaining liberation while assuming a body is Jivanmukti whereas liberation achieved after death is Videhmukti.

Yoga: It is the application of the theory of the Samkhya in Practical life. Here moksha is described as a state of complete realization, self-awareness, and liberation from the limitations of the material world. In practical life, Yoga emphasizes the practice of various exercises for self-cultivation of a healthy and happy life in reality, some different paths or practices can lead to liberation and these are Karna yoga, Bhakti yoga, Jnana yoga, and Raj yoga. The karma yoga is the path of selfless action, where one performs their duties without attachment to the results. The bhakti yoga is the path of devotion where one cultivates love and devotion towards supreme power. The jnana yoga is the path of

knowledge and wisdom, where one seeks to understand the true nature of reality, the self, and the universe. The raj yoga is the path of meditation and self-control where one practices meditation, mindfulness, and ethical discipline to calm the mind. In the Patanjali book “Yoga Sutra” there are eight limbs or paths for attaining liberation or moksha and they form a sequence from outer to inner. They are yama(abstinence), niyama(observances), asana(posture), pranayama(withdrawal), dharna (concentration), dhyana(meditation), and samadhi(absorption).

Nyay-Vaishesik: According to Nyaya-Vaisheshika philosophy the soul is completely separate from the body, mind, and senses. Due to ignorance, when the soul accepts the body, mind, and senses as its parts then this is the state of bondage. In this state, the soul has to get trapped in the cycle of birth and death and when the soul completely frees itself from the influence of body, mind, and senses, then it attains liberation from life and death. There is discussion of various padarth in Nyaya-Vaisheshika philosophy and everybody can attain liberation by knowing the true nature of the padartha.

The Naiyayikas and Vaisheshikas have given a negative picture of salvation and in this ideal state along with all sorrows, happiness also ends. So we can say it is a perfect state beyond suffering and bliss. They do not consider consciousness as a natural quality of the soul and this is an accidental quality of the soul. That is why, according to them, the soul does not experience any happiness or sorrow in the state of salvation. Naiyayikas and Vaisheshikas call salvation by the name of 'Apavarga'. In Apavarga, rebirth ends and the person becomes free from all kinds of sorrows. In this philosophy, the nature of salvation has been described as negative. Here there is no consciousness of happiness, sorrow, religion, unrighteousness, etc.

So we can finally say that Nyay-Vaishesika believes that by knowing the true substances and true nature of the self one can attain transcendental liberation which is free from sukha and dukkha.

Mimansa: It is a philosophy that believes in the presence of an everlasting planet and its infinite number of individual souls. Ancient Mimamsak considered heaven as the ultimate goal of life. But, later Mimamsakas started considering salvation as the ultimate goal or as

selfless. It considers actions as extremely important and by doing inauspicious work a person becomes bound. Actions performed for the attainment of happiness or fulfillment of other desires are called inauspicious or inappropriate. A person can become free from bondage only by renouncing these deeds and performing selfless actions because bondage also arises due to the rituals of previous births. Self-knowledge and selfless action gradually destroy the accumulated sanskaras and free a person from rebirth.

The Mimansic focuses on Vedic text and ritual actions and every human activity, the motivating force to act is his innate longing for Priti (pleasure or happiness). So we can say in mimansa salvation in human life arises mainly from one's actions, rituals, past life karma, actions of gods and others.

Advaita Vedant: According to Shankara's Advaita Vedanta, both the soul and Brahma are actually one and the same and due to ignorance, a person considers the soul to be separate from the body or senses and as a result becomes bound. Self-knowledge is Brahmagyan and when the soul knows itself as Brahma then it becomes free from bondage. According to Shankar, the soul always remains free and due to ignorance, she forgets her real nature and becomes a victim of various sorrows. The Attainment of salvation is merely the recovery of what has already been achieved and nothing new is found here. There are two types of salvation in Advaita Vedanta – Jivanmukti and Videhamukti. Shankara emphasizes in emotional form, salvation is a state of happiness and in negative form, it is a state without sorrow. So According to Shankara Moksha is not something to be achieved but it is already within ourselves which is identical to Brahman and Sat-chit-Ananda in nature.

Conclusion: The various methods and nature of the conception of liberation in Indian philosophy have been discussed above. The heterodox and orthodox schools have presented different ways to achieve liberation and also there are some similarities between them. Many say that these conceptions are not relevant in today's modern era but I think it is still relevant and more important because in a world filled with materialism and rapid change, people are seeking deeper meaning and purpose in life, so moksha gives vital paths towards it. Moksha is

associated with freedom from the cycle of birth, death, and rebirth, and the cessation of suffering. So it provides a vision of ultimate peace and happiness. In this journey of liberation, the concept of jivanmukti is relevant today and the concept of moksha in various schools gives moral guidance and personal transformation which originated in the realization of the ultimate unity of all beings.

Overall, the concept of liberation or moksha in Indian philosophical tradition continues to be relevant in today's world because it offers insights and guidance for those seeking spiritual growth, mental well-being, ethical living, deeper understanding of oneself and the universe.

References:

1. Sharma, Chandradhar, A Critical Survey of Indian Philosophy. India, Motilal Banarsidass, 1964, pp. 60,156.
2. Chatterjee, Satischandra, An Introduction to Indian Philosophy. India, Rupa & Company, 2015, pp. 95,116,367.
3. Hiriyanna, M., Essentials of Indian Philosophy. United Kingdom, George Allen & Unwin, 1985.
4. Tiwari, Kedar Nath. Classical Indian Ethical Thought: A Philosophical Study of Hindu, Jaina and Bauddha Morals. India, Motilal Banarsidass Publishers, 1998.
5. Radhakrishnan, S, The Hindu View Of Life. India, HarperCollins Publishers India, 2015.

Moral Standard : An analysis from Kantian Perspective

Nripen Biswas
Research Scholar, Department of Philosophy
Sidho-Kanho-Birsha University

Abstract: Human beings have always been bothered by the question of moral good and bad. The question of the true and ultimate moral standard has been answered differently by different schools of moralists. In the present paper, an attempt is being made to give an account of the supreme moral principle as conceived by Kant along with some observations thereon as brevity allows. For Kant, 'right' is superior to 'good'. Now, if we look at the different stages in the evolution of moral consciousness, we will find that morality tends to present itself to the human race first in the form of commandments, and even in the form of threats. It is only at a later stage of development that men learn to regard the moral life as a good or an end which is intrinsically desirable. From this point of view, it seems most natural to interpret the moral standard as based on the idea of law or on the idea of rule rather than on that of an end. According to Kant, the categorical imperative or an unconditional command, as intuitively apprehended by conscience or practical reason is the ultimate standard of morality. The paper ends with the conclusion that there is more to the moral point of view than being willing to universalize one's rules. Apart from conforming to Kant's principles to decide whether an action is right or wrong certain other considerations also need to be taken into account.
Keywords: Morality, Good will, Duty, Categorical Imperative, Universalizability.

Since the beginning of time, the question of moral good and bad has not only ignited thoughtful human beings, but often bothers common people as well. Consequently, men can hardly escape the search for a moral standard or principle which would help us to determine what we morally ought to do and what not. The question of the true and ultimate moral

standard has been answered differently by different schools of moralists. The moral theories may mainly be divided into *legal or juristic* theories and *teleological* theories. The former conceives of the supreme standard in morality as some sort of law, rule or imperative from which we learn what is *right* to do; while the latter conceives rather of a *good* or some end at which men aim, and by reference to which their actions are to be praised or blamed. Thus, we may think of morality as conformity to a *rule* or as the pursuit of an *end.*

In this paper attempt is being made to give an account of the supreme moral principle as conceived by Kant along with some observations thereon as brevity allows. For Kant, 'right' is superior to 'good'. Now, if we look at the different stages in the evolution of moral consciousness, we will find that morality tends to present itself to the human race first in the form of commandments, and even in the form of threats. It is only at a later stage of development that men learn to regard the moral life as a good or an end which is intrinsically desirable. From this point of view, it seems most natural to interpret the moral standard as based on the idea of law or on the idea of rule rather than on that of an end.

Now all laws which are not simply expressions of natural uniformities (for example, law of gravitation) may be said to be of the nature of commands. The laws of nations, for example, are commands issued by the government, with penalties attached to the violation of them. Moral laws may also be said to be commands, though here the external dictates are replaced by the internal dictates of *conscience.* According to Kant, moral law intuitively apprehended by conscience or what he calls practical reason is a *Categorical Imperative* or an unconditional command. What we ought to do we ought to do irrespective of consequences, regardless of ends, unmoved by any feeling or desire, out of pure respect for the Moral Law. This Moral Law or the Categorical Imperative which-Kant calls the ultimate standard of morality – is applicable to all rational beings. For Kant the sole and proper source of moral principle is pure practical reason; it is a faculty which all rational beings own.

Kant endeavored to find out, though he did not claim to invent, the moral standard or principle which would help us to determine what we morally ought to do and what not. He knew, of course, that he was trying to do something which no one had succeeded in doing before – namely, to set forth the first principle of morality apart from all considerations of self-interest and even apart from their application to particular human problems. Yet he did not claim to invent it since he believed that it is the principle by which men had always judged moral excellence, although such people may not be able to articulate it in clear and precise terms or to separate it off sharply from other principles concerned with the happiness of the individual and the benefits arising from the moral life. Kant thus embarked on the task to state and elucidate the moral principle.[1].

Kant argues that just as moral principle cannot be originated in experience, so also it cannot emerge from anything conditional; i.e., it cannot emerge from anything the goodness of which is contingent on something else. The existence of a universal and absolute moral principle, therefore, requires there to be something of absolute, unconditional value, something which is unconditionally good. Here we are led to the famous declaration with which Kant opened his great treatise on Ethics *(Metaphysic of Morals)*. He begins it by saying that "there is nothing in the world, or even out of it, that can be called good without qualification, except a good will". The gifts of fortune, he said, and the happiness which they bring with them, are to be regarded as good only on condition that they are rightly used. Talents and worldly wisdom are, in like manner, good only when they are subordinated to the attainment of high aims. These things are only conditionally good – good only on condition that they are used by a good will. They are not good if they exist quite alone. But a good will is good without condition, it is in itself good, in that its goodness is owned in terms of its own nature and not derived from any external source.

Now Kant contends that this good will is a rational will. This is obvious. Since the supreme principle of morality is the dictate of pure rationality, good will, being the 'geneses of Kant's supreme principle of morality, can also be called purely rational will. Moreover, Kant attempts

to explain his contention – that good will is a rational will – by reference to the purpose or function of reason in human life. Man is an organic being, and he has as one organ a reason which is practical in the sense that it directs his will. Now why has nature appointed reason to rule the will? Not for the sake of adaptation, which would be more efficiently accomplished by instinct. Moreover, when a cultivated reason makes enjoyment its end, true contentment rarely ensues. Reason, then, is intended for something more worthy than production of happiness. Being a practical faculty, yet not suitable for producing a will that is good merely as a means (instinct would do better), reason must be given us to produce a will good in itself..

In order to make clear the nature of a good will Kant proposes to examine the *concept of duty*. The will that wills those actions be done from a sense of duty is the good will. But it must not be supposed that Kant's concept of a good will is identical with that of duty, and hence it would also be wrong to conclude that the good will necessarily intends to do duty for the sake of duty, that is to say, whatever it intends to do, it intends only because it is its duty. A completely good and perfect will would never act for the sake of duty; for in the very idea of duty there is the thought of desires and inclinations to be overcome. A completely good or 'holy' will, as Kant calls it, is essentially good but never requires self-constraint and hence cannot act from the motive of duty. It is only to the imperfect rational beings, such as humans, who are subject to various animal inclinations which may be hindrances and obstacles to the good will present in them, that a good will applies as a *dutiful or normative* will. Kant considers the concept of duty, distinguishing between what is done *in accordance with duty* (but motivated perhaps by a natural inclination or a selfish purpose) and what is done *from duty*. An action accords with duty if it complies with what duty requires, whatever might be the agent's motive for doing it. Kant argues that a person demonstrates possession of a good will not just by performing an action that is in conformity with duty, but by performing an action from duty. Self-interest cannot be strictly regarded as the ground of moral worth is usually agreed on. If someone performs what his duty requires him to do but performs it only to ensure his own interest, we do not say that he has

done his duty for the sake of duty and hence accord him no distinctive moral merit. The point which concerns Kant here is that inclinations are too fickle and unreliable to provide a coherent and consistent motivation in performing duties; an inclination can sometimes incline one to do what is right but sometimes what is wrong. Kant would condemn the action of a man who, out of compassion, helps his neighbor. This is primarily because such kindliness of heart, since grounded in inclination, may well-and in all likelihood sometimes would-give rise to unregulated conduct. Such a person will be benevolent, by inclination, to all and sundry, so that such a person's benevolence will not be regulated by an appropriate rule, and hence he may offer help where that is contrary to duty as well as where it is required by it. Hence Kant concludes that nothing can be our moral duty if we simply happen to have an inclination to pursue it.[2]

For Kant, as it has just been stated, the moral value of an action does not depend on its being done to satisfy any inclination. Now, Kant further claims that the moral value of an action does not also depend on the results sought or attained. This is obvious. If an action depends for its moral value on results sought or attained then it would have this value even if it were done only from an inclination to produce these results; and this is a possibility which has just been rejected. So, if the moral value of an action is to be connected to its motivation rather than its outcome, then it must lie *in the principle of the will* without regard for the ends that can be brought about by such an action, that is, in a moral principle that has nothing directly to do with the ends or consequences of the actions it commands. From this, Kant next infers, "duty is the necessity of an action from respect for law" rather than from any "inclination" – that is, naturally occurring desire – for an object or state of affairs. Kant says, stems from our own pure practical reason and is not imposed upon us by some external agency, and therefore it should generate in our psyche a respectful feeling toward it. That is the claim of the supreme principle of morality on us lies in the fact that it is not only a principle for us but also a principle by us, and that therefore we should respect it. In caring for the supreme principle of morality, one thus really honors himself; he acts in obedience to himself-that is to say, moral agency is basically a self-regarding project.

The implication of all this is that, for Kant, *'duty for duty's sake'* is the true rule of life. Although only what is done from duty has moral worth, it is not possible to be certain in even one instance that an action was in fact done from duty. Kant is exceedingly sceptic about the availability of unquestionable or secure examples of morality. For how can we be sure that what we most sincerely and carefully concluded to be an action from duty was not in reality prompted by some hidden impulse of inclination? Perhaps, this is the reason why Kant urges that self-examination is a moral duty and must always be undertaken clear-headedly with a view to moral betterment. Given this, it would be proper to say that Kant seems to regard moral perfection as an ideal for man to pursue as much as he can. Now, due to the human being's enduring temptations to do otherwise than what its reason tells it to do, the cultivation of his will up to the purest moral disposition, that is the disposition to act from pure duty, is to be reckoned as a constraint, that is as an "imperative", but only for perpetual progress.[3]

Kant has argued that if reason, which tells us what principles of action are objectively required, infallibly determined the will, we would always choose the good. However, in fact, the will is affected also by subjective incentives that clash with the dictates of reason. Thus, the will, when not completely good (as it never is in human beings), experiences the pull of reason as constraint. This command of reason, the objective principle (i.e., the supreme principle of morality) constraining the will, is also called an *imperative*. A perfectly good or holy will, being always determined to action only by objective laws, would not experience constraint.

Now imperatives can be of several different types. The major distinction between them is between those that are *hypothetical* and those that are *categorical*, that is, those that tells us what we must do if we want to attain some end – these are hypothetical-and those that tell us what we must do regardless of any such "reference to another end" – categorical imperatives. Hypothetical imperatives, in turn, is divided into two further types: *"problematic"* ones, which tells us what we must do in order to attain some *particular end we might have,* and *"assertoric"* ones, which tells us what we need to do in order to attain *an end we do have.*

Problematic hypothetical imperatives are obviously unfit to serve as principles of morality, since they clearly depend upon merely contingent ends. But assertoric hypothetical imperatives are also unfitted to be moral principles. The only end that everyone obviously does have is that of happiness. But happiness is excluded as a possible foundation for morality. Our conceptions of happiness are simply too inderminate, for often what we think would make us happy at one moment conflicts with what we think would make us happy at another, or what one person thinks will make him/her happy conflicts with what would make another happy. Furthermore, morals can, and often do, demand that one act contrary to happiness, even though happiness is a naturally necessary goal of all human beings. And when the pursuit of happiness conflicts with morality, the pursuit would not be morally permitted. Thus, the categorical imperative, one that tells us what we must do independently of any end we might have, is the only possible candidate for a fundamental principle of morality.

The fundamental principle of morality, Kant has claimed, must be unconditionally valid for any rational being. If any being were perfectly rational, it would automatically act in accordance with this law, and the law would therefore not appear to be a constraint. But we human beings are not perfectly rational, and thus although we recognize the unconditional validity of the moral law, it also appears as a constraint to us, something that may be in conflict with our irrational side. The fundamental principle of morality thus presents itself to us in the form of a "categorical imperative": Categorical, because we recognize that its demands are unconditional, but an imperative, because we recognize this law as something we ought to follow, thus as a constraint, that is, not something we always want to follow.[4]

Kant then argues that the moral law is a pure form without any matter. It has no particular content. It cannot tell us what we should do or what we should not do. This is obvious. All particular things have in them an empirical and contingent element, and the moral law can have no reference to any such element. Hence the moral law cannot tell us what the matter or content of our actions ought to be; it can only instruct us with regard to the form. But a pure form, without any matter, must be

simply the form of law in general. That is to say, the moral law can tell us nothing more than that we are to act in a way that is conformable to law. And this means simply that the principles on which we act, the subjective principle of one's action, one's maxim, should conform to the objective law valid for all rational beings. Therefore, Kant contends, there is only a single categorical or moral imperative: "Act only on that maxim which you can at the same time will that it should become a universal law"

The criterion of Universalizability is undoubtedly Kant's most original and important contribution to ethical theory. It expresses more precisely and unambiguously the "golden rule" to be found in all the great religions, and it has been incorporated, in one form or another, in most modern systems of ethical theory. Yet this criterion allows no exception and is therefore said to be absolute and rigorous. Kant inclines to say that the moral law and the maxims based on categorical imperatives are applicable to every human being under all possible circumstances and in this process, he rules out moral exceptions. For Kant there is no scope of moral exception or moral dilemma in morality guided by categorical imperatives. For example, Kant believes that it is always wrong to lie because it cannot be universalized. Always speak the truth – this moral principle has no alternative. Truth should be spoken – duty should be performed – even if in doing so the heaven comes down upon us or the world is destroyed. Now we, no doubt, do have a duty to tell the truth, but we can also hold that we have a duty to save the innocent life when feasible, and in cases in which there is a conflict between the two – in which we need to lie to save the innocent life – then we should go with the stronger duty, that of saving the innocent life; in this special circumstance, to tell a lie and save the innocent life is the best possible course of action. The major point is that, under situational constraints, there might be stronger grounds for rejecting truth-telling as a duty and accepting the stronger duty of saving an innocent life. We, therefore, need to take into account other considerations than mere conformity to Kant's principles to decide whether an action is right or wrong. In other words, there is more to the moral point of view than being willing to universalize one's rules; Kant and his followers fail to

see this fact, although they are right in thinking that such a willingness is a part of it.

References:

1. H.J. Paton, *The Categorical Imperative: A Study in Kant's Moral Philosophy,* London. Hutchinson & Co. (Publishers) Ltd., 1947, p.15.
2. See Tirthanath Bandyopadhyay, *Kantian Ethics: A Brief Introduction,* Kolkata., Ebang Mushayera, 2010, pp 22-23.
3. Ibid pp 37-39.
4. Paul Guyer, *Kant,* London, New York. Routledge, 2006, pp 179.180.
5. William K. Frankena, *Ethics*, New Delhi. Prentice-Hall of India Private Limited,2005, p.31

Bibliography:

1. Bandyopadhyay, Tirthanath, *Kantian Ethics: A Brief Introduction,* Kolkata. Ebang Mushayera, 2010.
2. Driver, Julia, *Ethics: The Fundamentals,* U.K. Blackwell Publishing Ltd., 2006.
3. Frankena, William K., *Ethics,* New Delhi. Prentice – Hall of India Private Limited, 2005. Originally published by Prentice – Hall, Inc., New Jersey, 1973.
4. Guyer, Paul, *Kant,* London, New York. Routledge, 2006.
5. Kant, Immanuel, *Groundwork of the Metaphysic of Morals,* translated and analysed by H.J. Paton, New Delhi. B.I. Publications, 1979. First Published by Hutchinson & Co. (Publishers) Ltd., London, 1948.
6. Paton, H.J., *The Categorical Imperative: A Study in Kant's Moral Philosophy,* London. Hutchinson & Co. (Publishers) Ltd., 1947.
7. Roth, John K., (ed.), *World Philosophers and Their Works,* Vol II, California. Salem Press, Inc., 2000.
8. Wood, Allen W., *Kantian Ethics,* New York. Cambridge University Press, 2008.

The Relation between Aesthetics and Morality : An Ethical Perspective

Pankaj Sen
Assistant Professor, Department of Philosophy
Sarat Centenary College, Dhaniakhali, Hooghly

Abstract: Morality and aesthetics have been deeply intertwined throughout the history of art. The relationship between morality and art raises important questions about the nature of artistic representation, the impact of art on society, and the responsibilities of artists. Different cultures and historical periods have had varying perspectives on the connections between morality and aesthetics, and these perspectives have influenced the creation and reception of art in complex ways. One of the fundamental ways in which morality intersects with art is through the content and subject matter of artistic works. Artists have often used their work to explore and challenge moral and ethical issues, from societal injustices to personal struggles. Art can serve as a powerful platform for drawing attention to social issues, and for advocating for positive change. At the same time, the relationship between morality and art is complex and multifaceted. While some artworks are explicitly moral or ethical in their themes and messages, others are more ambiguous or open to interpretation. This raises questions about the extent to which artists have a moral responsibility to their audience, and whether they should strive to convey clear moral values through their work. Some argue that all art is inherently moral in nature, as it reflects the values and beliefs of the society in which it is created. Others contend that art can and should exist for its own sake, separate from moral considerations, and that the freedom of expression is a crucial aspect of artistic creation.

Keywords: Art, Aesthetics, Artistic Value, Morality, Autonomism, Ethicism.

The relationship between aesthetics and morality is complex and multifaceted, in regard to the human values and human experience. Aesthetics is a brunch of philosophy which deals with the art,

appreciation of beautyand nature, on the other hand morality concerns with the ideal of human behaviour, principles of right and wrong actions. One common appearance isaesthetics or artworks may have moral interpretation, touching our moral actions and moral judgments. Besides an another perspectives that aesthetic experience may havea profound impact on our ethical sensibilities. When we envisage something aesthetically beautiful and pleasing, it can infuseemotions like empathy, tenderness, or sympathy. These emotions can nourish a sense of relation to others and a awareness of moral considerations. For instance, a piece of art may motivate us to incline with the human moral values like social justice and equality or human conditions. When we encounter a beautiful artwork or appearing a pleasant sunset, it may evoke moral sensitivity or a sense of compassion, sympathy, feelings of fear, bonding with others. So aesthetic experience or some works of artcan fecundate our ethical understanding andenrich moral values like respectfor others, care, empathy etc.

Besides, some philosophers argue that thereis a huge connection between aesthetics and morality,exposing that moral considerations are unabated with aesthetic judgments. According to this view, our all aesthetic preferences are not extremely subjective, but also informed with moral principles and moral values. For example, we can find a work of artmorally repugnant if it instigates violence or perpetuate detrimental thoughts or trends. So in that sense, aesthetic judgments may reverberate our ethical commitments,sensibilitiesor contribute to our moral discernment.Some philosophers also argue that ethical values areimplicit in aesthetical judgments. Our aesthetic pronenessare not always subjective, but it can also ascertain moral principles and moral values. For example, we can find some artworks are ethically obnoxious or heinous if theyexacerbate social discrimination or violence. So in that view, aesthetic appreciation or evaluations are entangled with moral apprehension and evaluation, as our appreciation of beauty are fabricated by our moral values and beliefs.

Through the history of art, we can find that art has been used as a powerful tool to incriminate social injustices, immoral actions or behaviour. For example, if we see the famous painting ‘Guernica’ by

Pablo Picasso, which is created in respect to the bombing at the Guernica townduring the Spanish War, is a robust anti-war statement. Through its entire imagery and emotional intensity, his work reflects as a harrowing reminder of the subversive impact of conflict and impingement on civilians. Moreover, an another neoclassical painting 'The Death of Marat' by Jacques Louis David, delineates the assassination of Jean-Paul Marat, a native French revolutionary figure. David's portraiture of Marat's slaughter as a martyrdom for the justice and equality focus the moral dilemmas ethical complexities of political activities.

These artworks offer intense and poignant reflex on social injustices, immoral actions, and moral straits, urgingpeople to imagine the complexities of human behaviour. By involving these artworks, viewers are prompted to question embedded power structures, confront painful truths,andfigure out alternative perspectives on the morality, and issues of justice.Some philosophers thinkthey may show that the moral properties of an artwork can have a impact on its aesthetic values.

The interactionist philosophers think that there is a necessary connection between artistic value and the moral value. Though some have refused this view that an artwork may be judged as being ethical or unethical. Other philosophers think that the moral streams of an artwork affect its aesthetic value negatively, and some of them believe that the ethical flawsof an artwork may promote its aesthetic value.

The view of fundamental autonomists is that artworks cannot be considered in moral terms. They count those two values are extremely independent and it doesn't make any sense that aesthetic object may evaluate in moral terms. It is a sort of category mistake.These radical autonomists think that artworks are not considered with the attribution of ethical properties. Richard Posner firmly refuses that art may associate to moral education.[1] On the other hand, moderate autonomists accept that artworks may be judged for its ethical value and they concede that we may delineate artworks as impeccable or unethical. Moderate autonomism is intimidated by any argument which shows how moral value of an artwork impact on its artistic value.[2]

The interactionist philosophers that they may show there is an impact of an artwork's moral properties on its aesthetic value.Noël

Carroll, an interactionistseems that sometimes moral flows and artistic defectsare identical and moral virtues and artistic virtues are equivalent.[3]The main argument of Carroll of moderate moralism is “uptake argument”. An artwork needs an emotional uptake, that its object is to awaken emotional responses to the viewer’s uptake.The argument of uptake only befits if anyone is committed that the artistic value of an artwork be assessed from the viewpoint of a ethically sensitive audience, though Carroll didn’t give any argument in support of the claim.

Now Berys Gaut offers a different argument called “merited response argument” which is better than Carroll’s uptake argument. This position is more valiant than moderate moralism, that the moral scars sometimes reduce or enhance artistic value.□This strong position is ethicism. Ethicism contains that if any artwork owes an aesthetically pertinent moral virtue, it will always consider as an aesthetic flaws or artistic virtues.In general artworks attempt to instigate particular responses to the appreciator. For instance, thrilling movies refer a thrilling and stirring response with a scaring scene.Though some movies fail to incite desired scare to the audience. So, in this case, the intended reaction in unmerited. Sometimes it may occur due lack of aesthetic composition. On other purpose, the referred response in unsuited on moral grounds. In this regard, the artwork is aesthetically lacking for its moral defects. The claim is barely that the aesthetic value of the work is compromised, as why it depends on a response that shouldn’t be accepted, as it is not deserved on moral grounds.

Ethicism is also given away to the idea that a moral perspective of an artwork is going to promote the artistic value of the work. Gaut believes that the acquired response argument can vindicate this too, as a morally commendable notion of an artwork delivers reason to take up the response arranged by the work.It is quite true that a morally flawed artwork is not always aesthetically imperfect. Actually ethicism emphasizes to the concept that the manifested substance of an artwork will be considered for its aesthetical evaluation. If an artwork evolves any unethical attitude, still it would be commendable for some hidden or unique transcendental properties. For example if we notice the great artwork *Rape of Europa* by Titian, which seems to be morally flawed,

because there are no signs of violent force against Europa, rather the painting reflects that the woman is enjoying the act instead of interference.

In this way, we have emerged to the exposition that howaesthetic value of an artwork is reduced with the ethical flaws or defects. Though some authors believe that sometimes the flawed ethical aspect of an artwork may enrich the aesthetic value of it. And this view is entitled with the name ‘immoralism’. Daniel Jacobson thinks that an ethically condemnable artwork sometimes count as artistically worthy because it impels us to react to its substance in which way that we should not react.□ Matthew Kieran’s view is also like Jacobson that an artwork’s immoral perspective sometimes promotes aesthetic value.□ It is significant to focus that immoralism does not eliminate the possibility of ethical flaws that negatively instigate the aesthetic value of an artwork.□ Now I conclude that we have seen in the first section of this paper the possibility of getting ethical knowledge through artwork and the artworks have the efficiency that may have impact on our moral sensitivity.Thr ethical value of an artwork may exacerbate its aesthetic valueand the artistic properties may have potentiality to develop moral insight. And if this view is true to some extent, that it may assist the view of interactionist.

References:

1. Posner, Richard. (1997). “Against Ethical Criticism.” *Philosophy and Literature* 21, no.1: 1-27.
2. Clavel-Vazquez, Adriana. (2018). “Rethinking Autonomism: Beauty in a World of Moral Anarchy.” *Philosophy Compass:* e12501. https://doi.org/10.1111/phc3.12501.
3. Carroll, Noël. (1996). “Moderate Moralism.” *The British Journal of Aesthetics*36 no.3: 223-239.
4. Carroll, Noël. (2013). “Aesthetics and Ethics.” *In* LaFollette, H. (Ed.) *The International Encyclopedia of Ethics,* pp.101-109
5. Gaut, Berys. (2007). *Art, Emotion and Ethics*. Oxford: Oxford University Press.

6. Jacobson, Daniel. (1997). “In Praise of Immoral Art.” *Philosophical Topics* 25, no.1: 11-36
7. Kieran, Matthew. (2006).”Art, Imagination and the Cultivation of Morals.” *The Journal of Aesthetics and Art Criticism* 54, no.4: 337-351
8. Ravasio, Matteo. ‘What is the Connection between Art and Morality’. Vino, Valery.etal.(Ed.) *Introduction to Philosophy: Aesthetic Theory and Practice,* pp. 70-71

Post Pandemic Education in India : A Feministic Perspective

Kamalika Basu
Assistant Professor, Department of Geography
Dwijendralal College, Krishnagar, Nadia

Abstract: The COVID-19 pandemic has caused a disastrous impact in almost every sector of society. The educational system of India has been majorly affected and the most vulnerable segment has been identified to female education. As the pandemic hits every sector in the country, the entire education sector in India is also affected by the pandemic, leading to the closures of schools, colleges, and universities. There is an unprecedented challenge in front of the education sector in India. The disruption of academic schedules has a significant impact on all the teachers and students across the country. The following study has been aimed to evaluate the impact of the COVID-19 pandemic on female education in India. Regarding this, a Literature Review has been conducted by exploring existing data and it has been observed that the pandemic has developed a destructive crisis for female education in India. The sudden school closure and lockdowns have introduced new issues and challenges for female education and have thoroughly exacerbated the context of women's education in the country. The economic impacts of the pandemic have affected online learning for females and gender inequality in Indian society has been observed to be another reason behind these issues. Apart from this, there lies a huge disparity in the condition of female education in rural and urban areas. Most of the students from rural areas are dependent on mid-day-meal programs and the pandemic crisis forced them to stop these activities. Several initiatives and actions taken by the Indian Government have been discussed, however, it has been identified that the programs and actions taken by the Government were inadequate.

While everyone is suffering and struggling with uncertainty, the impact of any crisis is always more severe for the most disadvantaged

and marginalized section. When the value of services increases in society, then it is the deprived section of the society which is most affected. COVID 19 pandemic has had a very bad impact on education. Since ancient times, women have been denied the right to education, which is a major reason for women's subordinate position in society. The pre-existing gender inequality in education in India is further impacted by the pandemic. There are several ways in which pandemic has worsened the condition of female education in the patriarchal society of India.

Keyword: pandemic, female education, drop-out rate, patriarchal society.

Introduction:

In India, access to education for girls had improved tremendously over the last seven decades. India's female literacy rate had risen from 9% during Independence to 65% in 2011. Primary-level female gross enrolment ratio rose from 61% in 1970 to 115% in 2015. At the secondary level, enrolment rose from 14% in 1970 to 75% in 2015. This upward trajectory has been severely disrupted by COVID19 and is likely to regress. As of July 22, 2020, nationwide school closures in 40 countries affect 282 million children, of whom 134 million are girls. UNESCO's Stefania Giannini, warned of the "potential for increased drop-out rates which will disproportionately affect adolescent girls, further entrench gender gaps in education and lead to increased risk of sexual exploitation, early pregnancy and early and forced marriage". Nearly 10 million secondary school girls in India are likely to drop out of school due to COVID19 that will put them at physical, emotional and intellectual risk and reverse the gains made in the recent years. Many schools have launched online classes to keep on the momentum of learning. Over two decades ago when information technology was introduced in education, expectations were high and there was optimism that this would increase easy access to education for the underprivileged. However, this has not happened, and the digital gap has widened quite fast, and impacts are now vivid. Online classes do not factor in the country's digital divide where 16% females have internet access, compared to 36% males, according to the National Sample Survey 2017-

18. This gap can sometimes have tragic consequences as in Kerala where a 14-year-old girl, a merit scholar, committed suicide when she couldn't access her online classes.

Even before COVID19 crisis, it was found that girls who engage in two hours of housework per day had a lesser probability of finishing secondary school in the country. With social stigma associated with menstruation, girls have been discouraged from continued learning. In India where limited social security nets are in place, the financial and social hardships caused by COVID19 can only exacerbate the gender inequality in education. And now India's digital divide on top of the ever-growing gender divide, will only further enhance the education gap that already exists. And yet India could add a whopping $770 billion to the country's GDP by 2025 by encouraging girls to study and participate in the workforce according to McKinsey's gender parity report. And that can happen if India adopts a gendered approach in planning for the post crisis reconstruction of education that will mitigate the large-scale consequences of COVID19 on girls. Special attention has to be given to accelerate girls' return to school. It is important that sex-disaggregated and decentralised data is locally collected to monitor girl's attendance on the reopening of schools. Remedial and additional courses can be adopted to catch up with the lost academic schedule. Rigorous evidence from across the globe can help support Indian policy makers in designing programs to protect girls during the crisis and help them build resilience for future shocks.

Objectives

The purpose of this study is to assess and evaluate the impact of the COVID-19 pandemic on girls' education in India.

- ✓ To illustrate the impact of the COVID-19 pandemic on the educational context of India.
- ✓ To identify the potential impact of the pandemic on girls' education in India
- ✓ To develop strategic recommendations for improving girls' education in India and preventing the negative impacts of the COVID-19 pandemic.

Literature Review

Potential educational challenges for girls' in India during pandemic

According to "Article 21A" of "The Indian constitution", education is a fundamental right for every human being. Education growth is a crucial indicator for the development of a country. Education helps girls to participate in economic and political decision-making at the community level as well as in their homes. However, the education system suffered a lot due to the outbreak of Covid-19 and created many negative impacts on girls' education in India (Dar& Lone, 2021).

Educational activity hampered

Due to the countrywide lockdown classes of school colleges were stopped, and examinations and new admissions were also suspended. Different boards from different states have postponed the annual examination and entrance tests also, which affects the girls' education badly. Due to the countrywide lockdown many universities and schools implemented online classes to continue the teaching procedure, but in India due to economic breakdown and unemployment rate families are not supporting their girls to participate in online classes (Khanet al. 2021). Girls from rural India are not getting enough support from their families to continue their education as a consequence they failed to participate in online courses.

Additional household works Indian homes are not gender-neutral, girls need to do various household works as compared to boys for that reason girls and women failed to join the class during the pandemic.Situations were more critical for the girls living in a joint family. It is also a major cause behind girls not participated in online classes during the lockdown, which increases the dropout rate among rural girls.

School closure is the reason for the loss of nutrition

The mid-day meal programme is a meal programme in government schools in India, and a huge number of girls are dependent on that in rural India (Gupta &Jawanda, 2020). Due to the closure of schools, rural girls face difficulties getting proper nutrition, for this reason, they become

weak and get serious health issues during the pandemic, which affects girls' education badly.

Effects of COVID-19 on girls of rural and urban India

Girls from rural India always face more difficulties for getting equal opportunities for education; however, in the time of pandemic, girls from rural as well as urban areas of India faced lots of issues. A huge number of people in India are living under the poverty line, due to the countrywide lockdown; the rural people lost their source of income. As a consequence, school dropout among rural girls increased, which increased the domestic violence among girls and women as well. Due to school dropouts during the pandemic girls from rural India failed to get social support and programs such as reproductive and sexual health. This is the main reason behind the global spike in sexual and domestic violence in rural India. Reduced income and low food security during the pandemic affect the mental health of girls in rural India, there is around a 38% increase in depression as compared to pre-COVID period among girls (MISHRA,2022).Child marriage in rural areas of India also increased during this period. "The Union Ministry of Women and Child Development" revealed that between June and October 2020 there is around 33% increase in the number of child marriages as compared to last year (Thomas, 2021). This indicates that there is a surge in child marriage due to the country-wide lockdown in India. Due to the high rate of unemployment and decrease in per capita income during the lockdown, girl child trafficking increased in rural areas of India. The "Supply chain"of menstrual products was affected due to the pandemic, and as a consequence, girls from rural and urban areas faced difficulties during the pandemic. It increases health-related issues among rural and urban girls. Therefore, the pandemic has emerged as one of the most crucial aspects for hampering overall life of rural as well as urban girls in India.

Governmental initiatives for girls' education in India during the pandemic

During the COVID-19 pandemic, around 158 million female students have enrolled "from pre-primary to tertiary levels". The pandemic has not only affected education, but it has also impacted the

economy, demographics, health and social aspects in India. “The Indian Committee on Women Empowerment” has provided a report to take urgent initiatives for providing support to access digital education to girls from poor families (Economic times, 2022). The Indian government has organised several committees for collecting accurate data on girls’ education and has implemented new initiatives through the existing program of the “Beti Bachao-Beti Padhao Scheme”. In addition, the government has taken several initiatives to enable access to digital education for all students regardless of gender and caste.

The Indian government developed “Diksha” with the aim to ensure access to digital education through this virtual platform. Apart from this, another initiative “Manodarpan" has been arranged for providing mental support to the students and families who have been affected due to the pandemic (Pib, 2021). In addition, the government has also invested in enabling access to digital education for all students as very few students had access to the internet before the pandemic. Several NGOs and organisations have also worked for ensuring no loss of education for girls during the pandemic. However, it has been observed that the Indian government has taken no initiative for only girls though girls have been proven to have less access to smart phones and other digital devices than boys in the country. Hence, it can be stated that the government has to arrange more innovative programs and schemes for ensuring access to education for girls who have been affected due to the pandemic crisis.

Descriptive analysis

The state of girl child education in India can be attributed to several factors. The five prominent causes are:

1. Child Marriages: Out of the 223 million girl children married in India, 102 million girls are married before attaining the age of 15. Around 27% of girls in India are married before their 18th birthday and 7% much before they can even attain the age of 15.
2. Lack of geographical proximity of Secondary Schools: The total numbers of girls enrolled in schools are higher as compared to the enrolment figures for boys in India. However, their mean years of schooling remains almost half that of boys. Girls manage to just get

4.7 years of schooling in comparison to 8.2 years for boys. Definitively one of the critical reasons is attributed to the non-availability of secondary education schools in village proximity.Added to the list is the Indian patriarchal driven mindset where the boys still manage to continue but it becomes very difficult for girl children to carry on their studies in the longer perspective owing to the distance of school from their abode of living.

3. Mind-set Blocks - Although Indian Government has created various schemes to incentivize kids to take up education seriously in government run schools; girl child in India is often seen as a liability, a burden to pass on. Parents are unwilling to send daughters to schools due to reasons like a girl must help family in household chores; girls have the responsibility to take care of new born siblings and many a times they have to support their families financially by working in the fields. 22% of Indian population still live under poverty line and prefer to use additional hands to earn their living instead of depending on education to make their daughters' lives better.

4. Poor Learning Outcomes: The existing predicament of not getting the right family support deters girl children to take up education seriously. Lack of motivation from social circle, inadequate assistance for children with learning inability and various other reasons create withdrawal symptoms resulting in comparatively poor scores that end up involuntary drop outs. Moreover, they never get a push from their families to join back school considering that their parents who are generally illiterate never understand the importance of education.

5. Financial Constraints and nature of job: Another important factor for girl children to sacrifice education is due to financial challenges and the nature of their parents' job. In case of daily wage labours, migrant workers and contract employees, the head of the family has to keep relocating, resulting no systematic education plan for their children. No matter how talented the girls are, they often

receive the shorter end of the stick. In fear of exploitation and abuse, parents get them to work alongside which help them address their financial woes.

Role of COVID in aggravating the Problem:

In spite of all the criticisms and apprehensions expressed, it is evident that the numbers of girls in education is slowly on the rise. Whether it is entirely through individual endeavour irrespective of government efforts or not, India's female literacy rate had risen from 9% during Independence to 65% in 2011. Primary-level female gross enrolment ratio rose from 61% in 1970 to 115% in 2015. At the secondary level, enrolment rose from 14% in 1970 to 75% in 2015. Unfortunately, this upward trajectory has now been severely disrupted by COVID19 and is likely to go on a downslide. As of July 22, 2020, a nationwide school closure in 40 countries has affected 282 million children, of whom 134 million are girls. UNESCO's Stefania Giannini, warned of the "potential for increased drop-out rates which will disproportionately affect adolescent girls, further entrench gender gaps in education and lead to increased risk of sexual exploitation, early pregnancy and early and forced marriage." Nearly 10 million secondary school girls in India are likely to drop out of school due to COVID19 that will put them at physical, emotional and intellectual risk and reverse the gains made in the recent years. The problems of not attending school are multi-fold and severely enhanced in the case of girl students.

Girls are likely to drop out of school when schools reopen

As the economic crisis with loss of pay and unemployment is being experienced it is estimated that girls' education is likely to feel the impact. When faced with limited resources, households may prioritise sending the boys to school rather than the girls. There is enough data from the Ebola crisis of 2014 in West Africa when girls dropped out of school due to increase in domestic caring responsibilities and shift to income generation. In most cases boys were prioritized over girls to attend schools. Lessons from the Ebola crisis validates the point that all the effort made by NGOs and governments to get girls to school may get lost because of COVID19.

Girls are being engaged in household work

Even before COVID19 crisis, it was found that girls who engage in two hours of housework per day had a lesser probability of finishing secondary school in the country. With social stigma associated with menstruation, girls have been discouraged from continued learning once they reach the age of puberty. In India where limited social security nets are in place, the financial and social hardships caused by COVID19 can only exacerbate the gender inequality in education. A recent study, aptly titled 'whatever she may study, she can't escape from washing dishes: Gender inequity in secondary education', also finds that the engagement of girls in housework and domesticchores is the largest contributor to a gender gap in secondary education. (Singh. R, P. Mukherjee,2018).More data from the above study reveals that the engagement of children, especially girls, in housework is "the single largest contributor to the gender gap" in secondary education (Classes 9 and 10).Another report, by the India arm of Young Lives, an international research project studying childhood poverty, found that 358 boys (76.8%) and 322 girls (66.3%) of the survey sample completed secondary education successfully, pointing to a gender gap of over 10 percentage points. According to the survey, 72.7% of boys who spent two hours on household work every day completed secondary school compared to 55% of girls – a gap of 17.7 percentage points. And, just 40% of boys and 34% of girls who worked for three hours or more completed Class 10. The difference in the percentage of boys and girls finishing secondary school was largest for those with mothers who had received primary education, followed by those whose mothers had no formal education. However, a gap existed even where mothers had completed secondary education or studied further. The study found the overall contribution of mother's education to the gender gap to be 2.6%.

Girls are being deprived of the Mid-Day meal served in schools

For many girls particularly in the rural areas, the mid-day meal given in the schools is the only wholesome meal they have in the day. Studies show that mid-day meal scheme first introduced in 1995, has helped in reducing gender gaps in education, given they reduce the family

cost of providing nutrition to girls. Economists Dreze and Kindgdon estimated that mid-day meals increase the likelihood of a girl completing primary school by 30% and reduce the proportion of girls not enrolled in schools by 50%. Closure of schools has caused complete disruption of the mid-day meal scheme. In the absence of this incentive, families may withdraw daughters from schools.

Girls are being exposed to more abuse and violence

Centre for Global Development did a survey among 82 unique organisations in at least 32 different countries including South Asia and published the key findings in May 2020. 56% report girl's exposure to abuse and violence is one of the key concerns.

Girls will be vulnerable to early marriage and pregnancy

Centre for Global Development survey further reveals that 40% of the respondents believe that the girls are at a greater risk for early marriage and pregnancy because of school closures. With increased household economic strains and school closures, parents are deciding to get their daughter married early especially in contexts of dowry payment or girls may face pressure to engage in transactional sex. Past evidence from the Ebola outbreak suggest that adolescent pregnancies rose during this time.

Girls are likely to being deprived of online classes

Many schools have launched online classes to keep on the momentum of learning. Over two decades ago when information technology was introduced in education, expectations were high and there was optimism that this would increase easy access to education for the underprivileged. However, this has not happened, and the digital gap has widened quite fast, and impacts are now vivid. Using data collected by the National Sample Survey as part of the Survey of Education (2014) A. Mukhopadhyay of Indian Statistical Institute argues that only 27% of households in India have some member with access to the internet. As such only 12.5% of the households in India have internet access at home. Mukhopadhyay argues that this distinction between home and in-general access to the internet is important to take cognizance of, especially during this period when students have been confined to home during lockdown.

(The Print, April 9, 2020). Holding online classes for students during COVID19 belong to urban households have access to the internet, only 41% are likely to have access at home. Among students from rural households, only 28% are likely to have internet access at home. Online classes do not factor in the country's digital divide where 16% females have internet access, compared to 36% males, according to the National Sample Survey 2017-18.

Government initiatives

The government of India has been aggressively working in the area of improving literacy rate in the country with a special focus on girl child. There are various schemes running at national, state and local level to achieve this goal and improve India's stature at global level. The government has been initiating regular efforts to lift the status of the girl child in the society besides subsidizing or funding their education through enormous welfare and constitutional provisions. Some of the schemes and initiatives that the Indian government had categorically created with a focus on girl child are:

1. Beti Bachao, Beti Padhao: This program aims to address skewed gender ratio at the district level. Spreading large scale awareness to reduce the preference for male children and empower girls through education, it still has a long way to go when it comes to addressing prejudices. The program cannot work in isolation and need to work in tandem with the much needed education sector reform.
2. Sarva Shiksha Abhiyan (SSA): The program focuses on improving existing school infrastructure by building more classrooms, toilets, providing clean drinking water and improvement grants. It simultaneously stresses on the education of girl children, kids with special needs and promotes computer literacy.
3. Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Yojna (KGBV): The scheme implemented in educationally backward blocks (EBBs) of the country for places with low female rural literacy aims to reduce the evident gender gap ineducation. The objective of KGBV is to ensure access and quality education to the girls of disadvantaged

groups of society by setting up residential schools at upper primary level.

Recommendations

Existence of national strategy on girl child education is in place and the Indian Government has already taken a giant step by unifying different programs under one roof of Samagra Shiksha. With added objectives to harmonize implementation mechanisms and transaction costs at all levels, this program envisages a better future on education of girl child. Furthermore, the program is aligned with SDG Goal 4 that focuses on education as defined by United Nations to achieve by the year 2030. Girls' education is a strategic development priority for the nation. Considering over 60 percent of the female in the age bracket of 15-59 years focusing in household work, it would be very difficult to achieve the goal of USD 5 trillion economies by 2025. The government has initiated various unique schemes including gender-based quotas to promote employment for women. However, it would still be a daunting task to accomplish the target until the country prepares to deck up for a huge participation from the women segment of India. There is an intense need to strengthen and empower local governance systems for bringing in a significant change. Some of the initiatives and possible solutions that can address the challenge during and after COVID-19 era can be:

1. *Solving the plight of migrant workers:* The situation of girl child of migrant workers at such unprecedented times is shaken. A factor that is arguably even more important is to track the existing girl students who can be prevented from drop outpost COVID-19. For this, the government can use data of migrant workers collected under Ayushman Bharat to map the location of girlchild of migrants. Using the above data, local level administrators can supply packed food grains at student's homes.An app can be launched by the government to track movement of each migrant worker familywhose girl child has a school enrolment. This technology enabled tracker can eventually help intransferring records of girl child from one government school to another in much faster and easier way.

2. *Need to have Schools Closer to Home:* Government is currently working hard to improve the over all infrastructure by creating policy changes to increase number of schools. However, over 13,500 villages do not have a single school in their village and there is only 1 secondary school on every 9 primary schools. A girl child is forced to leave school after primary education inmost cases due to the distance of school from home even if she wishes to continue. The vulnerability to attacks and rampant cases of molestations prohibit parents to allow their girls to travel long distances.
3. *Mentoring Program for breaking stereotypes:* Effective training programs for teachers to counter gender stereotypes should be made mandatory in schools at all levels. Educators should be trained every year with innovative techniques on dealing with the newer generation effectively. Psychometric assessment should be part of the teacher's training need analysis.Incentive plans should be designed to provide additional bonuses to teachers where the drop-out rates are lessthan district/state average.Appointment of significant numbers of female educators should be taken up to help counter discrimination against girls. Creating an e-mentoring platform between female role models and girl students can help them discover the opportunities education can create for them in future. Student online mentoring session can be included in the curriculum to bring an emotional connect and bond of educators with the girl child.
4. *Health Support and short term incentives:* There are government policies to incentivize parents for sending their children to school. However, there is a dearth of student centric incentive scheme that must aim to motivate children. Government should bring in new incentive strategy targeted towards girl children to manage the dropout rates in consultation with various experts and advisors. Under the current COVID-19 situation, monetary incentives should not have a far fetched approach and introduction of schemes that helps to survive the health crisis must be top priority.Local

authorities must extend unemployment benefits to single mothers of families where girl children are willing to carry forward their education post COVID-19.Government must tie-up with health centres for girl child to distribute general medicine for immunity boost.Sanitary pads should be supplied free of cost to all enrolled students by the school authorities.

5. *Access to e-Education*: Creating a technology-enabled rural India education wing is the need of the hour.Local authorities need to tie-up with telecom companies for laying out infrastructure and increasing bandwidth availability in rural areas.Schools need to circulate recording of videos prepared by educators from home. The loss of classes can be compensated in some way to adapt to the COVID-19 era. Students can anytime refer to these class lectures for better understanding of the subjects. Distribution of mobiles by the local administration at a subsidized cost in rural areas that contain pre-recoded lectures and assignments could do wonders to reduce the drop out percentage for girl students. This will also allow children to access vast content straight from the government's National Digital Library free of cost.

Conclusion

It can be concluded that the pandemic crisis has negatively impacted girls' education in India. Education of rural girls has been majorly impacted due to lower access to computer skills and the internet. Online education through computers, mobile, tablets, laptops and the internet became the only way to continue learning and education at that time. Different challenges arose during the pandemic crisis for the girls of primary education as they were unable to properly use computers and the internet for online education. Apart from that poor economic condition due to increasing unemployment rate in India became another major reason for the increase of the number of girls dropping out from education. Most of the people were unable to invest in education and that resulted in the increased number of girls dropping out from primary and secondary education in India during the pandemic crisis. Some initiatives are taken by the Indian government for improving girl's education but it

is recommended to ensure proper computer and internet accessibility in primary and secondary schools for making them able for the infrastructures of online education.

Many evidences from the past reflect that effective strategies to address challenges of girl child education in India require governmental cross sector cooperation and local level integration. There are policies and programs that are uniquely positioned to directly address the plight of girl child education. Many developmental programs are engaging key stakeholders to cultivate broad partnerships and mobilize communities to shift norms for the betterment of the nation. However for fostering a transformative shift and making greater progress; IMPLEMENTATION is the key.

References

- Amrhein, V., Trafimow, D., & Greenland, S. (2019). Inferential statistics as descriptive statistics: The American Statistician, 73(1), pp. 262-270
- Atmowardoyo, H. (2018). Research methods in TEFL studies: Descriptive research, case study, error analysis, and R & D. Journal of Language Teaching and Research, 9(1), pp.197-204.
- Dar, S. A., & Lone, N. A. (2021). Impact of COVID 19 on education in India. In The journal of Indian art history congress 26(2), pp. 46-55)
- Gupta, S., Jawanda, M. K. (2020). The impacts of COVID-19 on children. Acta Paediatr, 109(11), pp. 2181-2183.
- Khan, M. A., Kamal, T., Illiyan, A., & Asif, M. (2021). School students' perception and challenges towards online classes during COVID-19 pandemic in India: An econometric analysis. Sustainability, 13(9), pp. 4786.
- Obilor, E. I., &Amadi, E. C. (2018). Test for significance of Pearson's correlation coefficient. International Journal of Innovative Mathematics, Statistics & Energy Policies, 6(1), pp. 11- 23
- Ryan, G. (2018). Introduction to positivism, interpretivism and critical theory. Nurse researcher, 25(4), pp. 41-49

- Singh, S. (2022). Investigating the Status of Women Engineers in Education and Employment during the COVID-19 Pandemic. Challenges, 13(1), p. 27.
- S. Barua, (2018) "Is Beti Bachao Beti Padhao actually working?", Economic Times
- Singh. R,. Mukherjee P, (2018)"Whatever she may study, she can't escape from washing dishes': gender inequity in secondary education – evidence from a longitudinal study in India", A Journal of Comparative and International Education, 48(2), pp. 262-280
- Mukhopadhyay A, (2020) "Who goes online to study in Covid times? 12.5% homes of Indian students have internet access", The Print

PUBLIC HEALTH AND MEDICAL SYSTEM IN MEDINIPUR DISTRICT DURING COLONIAL PERIOD : A HISTORICAL STUDY

Indrajit Mahanta
Guest Lecturer, Department of History
Mahatma Gandhi University

Abstract: Health is wealth. And good health is a symbol of brightness. Social, economic, cultural everything depends on health. If the body is not healthy, the mind is not healthy.Although our body and mind grow and develop normally, it is highly dependent on the environment. Because society is dynamic.With the flow of time, new needs are seen, values are loosening, new diseases are being affected. Medical science has been developed to prevent this disease and lead a healthy life.Health is considered to be a crucial factor for the social,economic and overall development of the individual as well as the country. The Public Health education and Medical system in India has a long history that has been deeply responsive to the unique needs and Medical traditions of the country and sensitive to global influences. In India, centuries old health care traditions were influenced during the colonial period by British rule. When the British Empire came into power In India, they faced the challenge of a new set of diseases that were endemic in that region. India is a vast country with diverse regions that had its own peculiar diseases, which were difficult to prevent with limited resources by Brithishers. So in this situation the colonial government is trying to set up A new type of Medical system in India as well as Bengal for better condition Of public Health. In this Article I am going to discuss The Public Health and Medical system in Medinipur District during the colonial period.

Key words : Public Health, Medical system, Colonial India, Colonial Government, Medinipur District, Health care services, Disease.

Introduction :
A set of measures aimed at protecting the overall health of the people and ensuring a healthy life is called public health. It can be said in another way - public health is the medical system necessary for the benefit of the people.Public health is the management of health-related infrastructure based knowledge with practical applications.Public health, communicable diseases, individual health, healthy environment - all these concepts came to us when the colonial era started in India.[1]Bengal was an administrative office during the colonial period.It was formed out of West Bengal and (present) Bangladesh. This administrative office was forced by the British government to weigh the consequences of the epidemic for the empire when cholera broke out in an epidemic in Bengal in 1870. Because the death of military personnel in the middle of the 19th century was of concern to the colonial government.[2]However, the colonial Government took some measures to get rid of the disease. Actions were taken in this regard from the administrative level.[3]

District Health System:

Medinipur was the largest district of Burdwan division of Bengal during the colonial period.[4]The combination of mountains and sea can be seen in this district of West Bengal. The district is mainly agricultural so poverty is endemic here. Lack of rain, floods and famines are frequent. And natural disasters are the main public health problem of Medinipur district. Most of the district is drought-prone, not flood-prone. Due to the diversity of topography of the district, the climate here is different. Very cold during winter. It is very hot during summer. Air is dry, water content is low. Temperature fluctuates during summer. Rainfall is more during the months of June to September. Most of the rain falls in the months of July and August. The soil color is red in the north and north-west of the district. Nature is hard and rocky. On the other hand, the soil in the east of the district is formed by the sediments carried by the Hooghly River and its several tributaries and tributaries. To the south of the district are the endless waters of the Bay of Bengal and the plateau. The topography of the South and South West region is similar to that of Orissa. Being close to the sea, summers are long, winters are short and transient. From north-west region to south-east regions are inundated for many days even

after the monsoon. Rainfall is also high here. Average annual rainfall is 2.03 mm.[5]So it is natural to have public health problems in such a diverse district. Added to this are the barren, red kankur soils and forests, the poor socio-economic status of the local population has repeatedly challenged the public health system. Again the colonial government's negative attitude towards Medinipur district had an impact on public health.

Major Health issues of the District:

Diseases including fever, Diarrhea, Cholera, Jaundice, Anemia, Hepatitis "B," etc are common in the Medinipur district.[6] Several different diseases caused by infection by microorganisms have been observed in the region. In addition, some diseases are known, such as dysentery, malaria, filariasis, leprosy, and eye diseases.[7] Fever occurs usually in October-November. Some fevers are again malaria. Diarrhea occurs usually in March-April and August-September. Cholera occurs. mainly in urban areas, especially in summer.[8] L.S.S.O' Mallay's report shows that Malarial fever, Dysentery, Smallpox, Cholera, Encephalitis,etc are prevalent in the Medinipur District.[9]

During the colonial period in Medinipur district, common cold, cholera, malaria, plague - all these old diseases are seen in epidemic form. The epidemics of these diseases were thought by the common people to be the result of the political troubles of the English. Because many times the increasing economic exploitation of the colonial era is the main cause of the epidemic. From the Manvantar of 1770 to the famine of 1942-43, the vitality of the people was depleted. Along with this, the conservatism and superstition of the people during the colonial period, the god-dependent way of life became the cause of their health loss. People believed that God's curse was the cause of disease. So people used to leave their diseases in the hands of fate. Sometimes hammer doctors, mantra-tantras, herbs, guninvidya etc. were approached. But we must not forget that government health centers were also lacking during that period. Although a couple of regional or urban areas had health centers where the patients were at the right time Could not be reached. At that time there was a lack of communication system, roads and vehicles from rural areas to health centers. During the colonial period, the people of

Medinipur district were economically and socially backward, as a result of which diseases spread to the people of this district in epidemic form.Here the causes and prevalence of some diseases in Medinipur district are described.

Cholera:

Cholera was a deadly disease in the 19th century.[10] Cholera is the father of public health. It was first discovered in the Western world in the 19th century.But in 1860 there was an epidemic in the entire district of Medinipur. Cholera broke out in an epidemic form in other parts of the city. Out of 140 people in the town, 66 died.[11] In March 1861 Medinipurdistrict,Cholera infected out of 15 people, 5 died.[12]In the 19th century, cholera was at its worst. Doctors in our country were very worried about this disease. Because of the death of people and the rapid spread of the disease.[13] In 1866 cholera was again seen as an epidemic. This year cholera occurred twice in 1866, in which 42 people were infected and 23 were in critical condition.[14]

Although cholera brought many deaths and great suffering to the masses in But it had a greater influence on the first European soldiers. Between 1818 and 1854, more than 8,500 British soldiers died of cholera. The annual death rate from cholera among white soldiers was 69 per thousand.[15]During this time cholera broke out among the troops in North India in a terrible form. About 2,000 British soldiers and their families were affected. The result forced the British government to think about controlling the disease.[16]A large-scale toilet renovation project was undertaken to control cholera. But its inevitable result was not observed. Although the health of the soldiers improved The colonists did not make much progress. 8 lakhs in the year of famine in 1900 People died from cholera.

Malaria:

Malaria is an infectious disease. Malaria was one of the oldest and most contagious diseases. By 1870, malaria had spread to the fertile areas of Medinipur district. Malaria is endemic in areas bordering Hooghly district. It was also seen in Tamluk.[17] The same fever as Lakshmana, which occurs in Hooghly and Burdwan, was first seen in Medinipur. In 1872 the epidemic of this disease became so alarming that the

Government was compelled to call for a report. For a detailed description of the disease.[18]

In 1897-98, 'Ross' proved that only one type of mosquito (Anopheles) is capable of carrying the germs of the disease, through which malaria is transmitted.[19]Various literatures show that malaria is the oldest disease in our country. Malaria fever spread in Bengal from the mid-19th century. Malaria fever has been called the new fever by the people. It is officially called Burdwan Fever.[20] Even now mosquito-borne diseases are seen in the form of epidemics of dengue and malaria in West Bengal as well as Medinipur district.

Malaria was one of the most common diseases in Medinipur district during the colonial period. A large number of people died due to this disease. In the district of MedinipurChandrakona, Ghatal, Tamluk, Garbeta, Khirpai, Nayagram, Daspur, Keshpur, Narajol, effects of this disease can be observed in such areas.[21] The colonial government toured malaria prone areas Quinine was distributed through the medical team. Also among the students in Medinipur district Quinine is dispensed.In 1919, the colonial government took several measures to prevent malaria. Malaria survey was conducted in 24 municipalities this year. There is no doubt that a large number of people died of malaria in Medinipur district during the colonial period.

Environmental factors and self-interested attitude of the government are responsible for the epidemic of malaria in Medinipur district due to drainage theory, railway construction theory, road construction colonial policy, lack of awareness among Indians etc. As a result, most of the poor peasants and working class are affected by this disease.

Smallpox:

Many people died in Medinipur district due to Smallpox disease like cholera. Vaccination programs are emphasized in the district to eradicate and control Smallpox diseases. Smallpox is an infectious disease, which is infected by the ‘Variola virus’. In Medinipur district smallpox appeared in epidemic form in 1866-67.

Medinipur district was most affected by Smallpox disease in 1902. About 17 thousand 841 people died of this disease.[22] Smallpox disease

claimed more lives than any other disease. The disease has long followed with terror, in which countless lives have been put to death.[23]

Vaccination is administered to eradicate the disease. During the colonial period, a large number of people died when Smallpox occurred in the form of an epidemic in Medinipur district. The colonial administration instituted vaccination to prevent this disease. But the native people did not accept this inoculation easily. Following their traditional traditions, they could not erase their faith in Mother Goddess Sheetala from their minds. This Smallpox disease was not only present during the colonial period, but the outbreak of this disease can be observed for several decades after independence.

Black Fever:

Black fever is a parasite-borne infectious disease. This disease is caused when a type of parasite called Lismania enters the body. The famous British doctor William Pugh Lisman first identified this parasite in Calcutta in 1903 by examining the liver of a dead soldier and named this parasite Leishmania after his name. This black fever was seen in epidemic form in our country during the colonial period. The villages of Bengal were greatly affected by this fever. An outbreak of this fever was noticed in Calcutta in 1923.

Tuberculosis or T. B. Disease:

Tuberculosis is an infectious disease caused by infection with a virus called M. tuberculosis.This infectious disease is spread everywhere in cities, ports and villages. This disease can occur at any age. As the saying goes, 'He who has tuberculosis has no protection.It is a worldwide infectious disease that is a major public health problem. The treatment of this disease started in the colonial period. The number of deaths due to this disease in Medinipur district is often high.

Leprosy:

Leprosy is a major health and social problem. This disease affects the skin and nerves. This disease is caused by a bacterium called Mycobacterium leprae. However, the rate of infection in this disease is very low.During the colonial period, the government did not bother to prevent leprosy. Compared to the government, voluntary organizations were engaged in the service of leprosy patients. However, the colonial

government built many asylums in the country in the 19th century to treat these leprosy patients.[24] Many leprosy ashrams and hospitals were also built in Medinipur district during the colonial period.

Although some other diseases are found in Bengal as Well as Medinipur district like pluge, Dysentery, Jaundice etc.

Medical services and Medical institutions In Medinipur district during colonial period:

In 1783, the company made Medinipur the headquarters of the district.Naturally, the importance of the health center in the district headquarters increased. The first District Magistrate of Medinipur, John Pearce, laid eyes on this health center. This health center was established near the ward master's room where it is now. It was a thatched mud hut. Open daily from 9 am to 12 pm and on except Saturdays and Sundays that a gentleman doctor used to treat from 3 pm to 5 pm. Patients from different villages and ganj of Medinipur used to throng this health center from morning for treatment.In 1839, the health center became a hospital. This hospital was named 'KING EDWARD MEMORIAL HOSPITAL (KING EDWARD MEMORIAL HOSPITAL - 1839) to commemorate the time of King Edward's accession to the throne of England.Outdoor as well as indoor department was opened for the treatment of patients. The 20-bed seat system was also introduced from this time. Later, various medical departments were opened to provide better services and it's Became Midnapore Medical college and Hospital which Is a most significant role play in the public health sector in Medinipur district.

Medinipur Homeopathy Medical College and Hospital has a reputation for disease-prevention and treatment services for the general public. 6 decades ago during the Second World War, the freedom fighters jumped for India's freedom movement at the exact juncture. At that time the homeopathic profession continued to agitate the British government against homeopathy at a furious pace.1945 AD as a Charitable Out Department Medical Center in this situation. This institution was established on the 3rd of December. Since the dawn of independence, the situation began to change. Ever since the transfer of power from the British to the Indians, the central and state governments have taken joint

initiatives to modernize homeopathic medicine. As a result, the benefits of this homeopathy treatment extend to all regions.

The withdrawal of the Quit India Movement by the Indian National Congress brought some end to the chaotic political situation. The British government took advantage of this favorable situation and engaged in social welfare work in Medinipur district. At this time the Secretary of Indian Red Cross Society (Bangla Branch) came to Medinipur and his intention was to set up a branch of the Red Cross Society at Medinipur. It was through his efforts that the then District Magistrate held a meeting with the elite people of the city to establish the Red Cross Society. Then in 1945 Medinipur Red Cross Society was established. It is noteworthy in this context that the first Red Cross Society was established in India in 1920. Since then, about 400 branches of this institution have spread across the country in different regions, among which this Medinipur branch is one.

Conclusion:

Public health is the management of health-related infrastructure based on knowledge and practical application. According to some medical scientists, public health is a reflection of a country's political philosophy, and until the last decade of the nineteenth century, health care was a purely private matter. In 1859, the first Public Health Act was written in this country. The administrative structure of public health in Medinipur district was discovered at the beginning of the 20th century. From this time the public health structure gradually expanded beyond the district town to the village level. Since the colonial period, various steps have been taken to improve health.There is no doubt that the health policy of Midnapur district during the colonial period was guided by service work, not imperialist attitude and colonial governance structure. In fact, colonial rule was not only limited to the political or economic spheres, it also maintained cultural dominance. While discussing the health structure of Medinipur district during this period, it can be seen that-Lack of health centers except in a few core towns of the district. Besides, most of the people of the district are agriculturists, they lacked awareness. Poverty is like skin to the people of this region. Floods, droughts and famines are frequent in some parts of the district. Again, the

poor socio-economic condition of the residents of the district puts the public health system in the face of problems again and again. Moreover, from time to time, a disease appeared in the form of an epidemic in the district, the fear of which was severe. Infectious diseases like cholera, malaria, and malaria were prevalent.

Reference:

1. Park.J.E, Park.K,1989,Text Book of preventive and Social Medicine (Twelfth Edition),Jabalpur: M/s. BanarsidasBhanat, India,p.39.
2. Singh,Maina Chawla,2006,Hazards of Health and discourses of Disease: Brith Medical handbooks for "The Tropics'. (The Indian Historical Review - Vol. XXXIII, p.67.
3. Ibid,p.67
4. Das,Harisadan,1997,Midnapore-O-Swadhinta,Medinipur,p.3.
5. Bhattacharya,Tarundev,1979,Paschim BangaDarsan:Midnapore, kolkata, Firma K.L.M. private Ltd., p.5.
6. Hunter,W.W.,1997,A Statistical Account of Bengal, Vol.-III, Part-I Midnapore District (West Bengal District Gazetteers)W.B. Calcutta,p.227.
7. Das,Harisadan, 1988,Medinipur Sampad,kolkata, Dey book store,p.118.
8. Hunter, W.W.,Ibid,P.227.
9. Malley, L.S.S.O, 1911,Bengal District Gazetteers, Midnapore , p.77.
10. Arnold , David, 2000, The New Cambridge History of India, Science, Technology and Medicine in Colonial India, Cambridge University press, p.81.
11. Hunter,W.W.,Ibid,p.227.
12. Hunter, W.W., Ibid,P.227-228.
13. Arnold, David, Ibid,p.81
14. Hunter, W.W.,Ibid,p.228.
15. Arnold,David, Ibid,p.84.
16. Ibid ,p.84.
17. Hunter, W.W.,Ibid,p.234.
18. Hunter, W.W.Ibid,p.229.

19. Ackerknecht, Erwin Heinz,1982, A short History Of Medicine, Baltimore : Johns Hopkins University Press,P.183.
20. Kazi,Ihtesham,Environmental Factors contributing to Malaria in Colonial Bengal. (Edited by Deepak Kumar), P.124.
21. Hunter, W.W., Ibid ,p.234-236.
22. Malley, L.S.S.O, 1911,Bengal District Gazetteers, Midnapore , p.78.
23. Arnold, David, 1993,Colonizing the Body, State and Epidemics in Nineteenth Century, New Delhi, Oxford University Press, p.116.
24. Kakar,Sanjiv,2001,Medical Developments and Patient Unrest in the Leprosy Asylum, 1860 to 1940 (Edited by BiswamoyPari and Mark Harrison),Orient Langman, p.189-190.

Women's empowerment in India

Utkalika Sahoo
Assistant Professor, Department of History
Bangabasi Evening College

Abstract : The power of women has increased day by day in the history of post-independence period. Women's sufferings are widespread in the social, political and economic spheres. Even before independence, Indian women have sacrificed themselves as social reformers or for revolutionary activities. Since the 19th century, there has been an influx of Western education and Western thought in India.Various laws have been adopted, including opposing degrading treatment of women and maintaining a healthy normal environment at the workplace. Maternity benefits, female infanticide, gender discrimination, women's health, and education are also legally protected. But has it improved women's health? KamlaBhasin said in the 'Yojana' magazine that half of the population is women and girls.Women's economic empowerment is very important. Women's access to jobs, self-reliance, access to resources, etc. are the result of her economic empowerment. No society can progress without women. But in a patriarchal society, the right to property stands in such a place that girls are forced to live under the male domination. Therefore, the National Policy on Empowerment of Women lays special emphasis on gender neutrality in inheritance of property.The Constitution of India has put a lot of emphasis on the empowerment of women to end discrimination against women. Article 14 deals with equality. Article 15 also enables the state to make special provisions for women.The Constitution of India has put a lot of emphasis on the empowerment of women to end discrimination against women. Article 14 deals with equality. Article 15 also enables the state to make special provisions for women. Human development is not possible without women. The 'BetiBachaoBetiPadhao' movement has been launched to educate all the girl children of the country. Attention has been paid to reducing the incidence of female infanticide.The responsibility for this is to protect the dominance of men. Because of living below the poverty line, many villagers and women tie their children to their backs and work as

labourers to build large buildings or roads. All they want is food.The day the level of women's development increases, the women themselves will come forward. They are equally compatible with men. Women should first respect their own existence and start seeing each other as sympathizers rather than as competitors. But how can women be equal to men? In a country like India, people of different castes and religions live together. Even in their own religion or caste, they are not allowed to move forward in many cases without helping him.
Key word: Women- India- empowerment- education- society.

The power of women has increased day by day in the history of post-independence period. Women's sufferings are widespread in the social, political and economic spheres. Even before independence, Indian women have sacrificed themselves as social reformers or for revolutionary activities. Since the 19th century, there has been an influx of Western education and Western thought in India. The sphere of the so-called thinking of men also changed. They went beyond looking at women as mere domestic servants or child-rearing instruments and preferred to educate women in modern education. The anti-sati movement of Rammohun Roy, the widow marriage movement of Ishwar Chandra Vidyasagar and JyotiraoPhule, the formation of public opinion in favour of women's education and women's emancipation of Derozio and neo-Bengalis, PanditRamabai in Maharashtra, Begum Rokeya Sakhawat Hossain's efforts to educate Muslim women in Bengal and many other women-developing efforts were seen at that time. There were four major movements of women in British India. For example, the anti-partition movement of 1905, the non-violent non-cooperation movement in 1920, the civil disobedience movement in 1930, the Quit India movement in 1942. The participation of women in these movements has been seen. Women like PritilataWaddedar, Kalpana Dutta, Veena Das played an exemplary role in the anti-British movements of the 20th century. After independence, the development of women in democratic India has happened and is happening. Women are advancing in the political and social spheres. His economic condition has improved. At the root of this empowerment of women, the cooperation of men cannot be

denied. But still the question arises, is it really the scope of work for women in the 21st century that they have developed which was desired for so many years? Has she achieved her dream? Can women be equal to men? So, this empowerment of women in India is a relevant issue.

Article 14-35 of the Indian Constitution provides seven fundamental rights to its citizens. Articles 36-51 contain the Directive Principles for making India a welfare state. The 42nd Amendment provides special benefits to the unemployed, women, children and the elderly. The Constitution of India enshrines the right of women to equality, non-discrimination by the state, equal opportunities and equal opportunities. Various laws have been adopted, including opposing degrading treatment of women and maintaining a healthy normal environment at the workplace. Maternity benefits, female infanticide, gender discrimination, women's health, and education are also legally protected. But has it improved women's health? Kamla Bhasin said in the 'Yojana' magazine that half of the population is women and girls. Why are they discriminating only in India? Violence against women and girls. According to the United Nations, one in every three women is a victim of violence. Most of this happens within the family. The majority of women in India still subscribe to patriarchal structures and ideologies. Women have to overcome many obstacles. Women need to be given more power. Women can't be empowered.[1] The process of empowerment is a political process.

In colonial India, gender discrimination existed from the very beginning. Shekhar Banerjee has shown in his book 'Plassey to Partition' that the society under the colonial rule in this country was considered to be full of misogyny and opposed to colonial masculinity. The question of women figures prominently in these colonial narratives, as Western observers such as James Mill use the theme of women in their critique of India's civilisation. In response to the harsh criticism of 57, the country's intellectuals envisioned a golden past when women were given enough dignity and respect. The reformers of the society demanded the reformation of those customs which they considered distorted or

---

[1]Vasin, Kamala, 'BharaterNariderKhamatayan'. Yajona,2016, September issue, p. 6

abnormal. In this way, widow marriage was legalized starting from the abolition of Sati. But interestingly, in this case, these male reformers had no sympathy or compassion for women. But they appreciated the modernization of women. These reformers could not have imagined that women would be liberators with the same spirit as men. The backlash among Hindus began when the Consent to Sex Act of 1891 proposed to raise the age of consent from 10 to 12 for girls to have sex after marriage. The child bride is seen as a symbol of Hindu pride. Control over it is the prerogative of the native man. Soon there was opposition to allowing foreign states to encroach there.[2] Various restrictions were also imposed on women in Muslim society. There were two reform movements among Indian Muslims in the 19th century. One was the Islamic revivalism led by the ulema, the other was the drive to modernize Muslim society led by the class among the educated.[3] When we talk about women's empowerment in India, it means being aware of the special rights of women. That is, women's right to vote, property rights, freedom of movement and other rights through which women can realize their self-esteem.

Women's economic empowerment is very important. Women's access to jobs, self-reliance, access to resources, etc. are the result of her economic empowerment. No society can progress without women. But in a patriarchal society, the right to property stands in such a place that girls are forced to live under the male domination. Therefore, the National Policy on Empowerment of Women lays special emphasis on gender neutrality in inheritance of property. The measures taken for economic empowerment of women are - Firstly, micro-credit and lending institutions should be strengthened to include women in the production system in such a way that women can get loans easily. Second, to make the workplace inclusive so that women can develop further, and to help women earn independently, and to empower women more through health and education. Thirdly, the benefits of developing Oman's global economy should be given more importance to the women's community and women's empowerment should be provided by creating a favourable

[2] Banerjee, Sekhar, 'Plassey to Partition', Orient Longman, 2014, p. 448
[3]Ibid, p. 449

environment for inclusion in agriculture and industry. At the same time, attention should be paid to the important role that women can play in industries such as electronics and other technologies, food processing, agro-based industries and textile industries. [National policy for the empowerment of the women (2011)] So the first step of women's emancipation is of course her own economic independence and development.[4] Whether the position of women in India has really improved - this question still worries people. After independence, only one woman became the Prime Minister of India. There have only been two female presidents. However, in other states of India where women are participating in elections, only a handful of women have become chief ministers. But that's a very small number. Here is the list of women candidates:

GENERAL ELECTION	YEAR	MALE (%)	FEMALE (%)	TOTAL (%)
1ST	1951-52	-	-	61.16
2ND	1957	-	-	63.73
3RD	1962	-	46.63	55.42
4TH	1967	63.73	55.48	61.33
5TH	1971	60.09	49.11	55.27
6TH	1977	65.63	54.91	60.49
7TH	1980	62.16	51.22	56.92
8TH	1984-85	61.20	58.60	64.01
9TH	1989	66.13	57.32	61.95
10TH	1991-92	61.58	51.35	55.88
11TH	1996	62.06	53.49	57.94
12TH	1998	65.72	57.88	61.97
13TH	1999	63.97	55.64	59.99
14TH	2004	61.66	53.30	58.07
15TH	2009	60.24	55.82	58.21
16TH	2014	67.09	65.30	66.40

[Source: Election Commission of India][5]

---

[4] Siddiqi, Naurin, 'BharatiyoGanatantreNariKhamatayan, Songrokkon o PrasangikSamassa', Pratidhwani the Echo,2021, Vol IX, p. 141

[5] Ibid, p. 145

N.B. Gender wise break up of electors of General Election conducted before 1971 is not available.

The Constitution of India has put a lot of emphasis on the empowerment of women to end discrimination against women. Article 14 deals with equality. Article 15 also enables the state to make special provisions for women. Human development is not possible without women. The 'BetiBachaoBetiPadhao' movement has been launched to educate all the girl children of the country. Attention has been paid to reducing the incidence of female infanticide. The project was first launched at Panipat in Haryana in 2015. The UN General Assembly has adopted the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Article 10 of the Universal Declaration of Human Rights states that women have the right to education. In India, a scheme called MUDRA Yojana or 'Micro Unit Development and Refinance Agency Limited' has been launched. It was launched on April 8, 2015. From this scheme, 10 lakh rupees were given to women entrepreneurs without any deposit. In addition, 26 weeks of maternity benefit has been given to working women in 2017. The government has also provided many opportunities for the education of single girl child.[6] The principle public initiative: Integrated Child Development Services (ICDS) aims at responding to the challenge of providing pre-school education for children in the age group 0-5 years. ICDS also AIIMS at breaking the wishes cycle of malnutrition, morbidity, reduced learning capacity and morality.[7] Efforts to educate women in India began in 1854. Wood's Despatch initially created several schools for women's education. After independence women's enrolment was less than 10% of the total enrolment but in the year 2011 it increased up to 41.5%. This increasing rate of women's enrolment does not do enough, is commendable. 48% of

---

[6] Empowerment of women through Education, Skilling and Micro-financing, 22nd May, 2022, https://www.niti.gov.in.

[7] Das Sayani, 'Women and Education', https://www.ebooks.inflibinet.ac.in, cited in 21-04-2024.

the Indian population is occupied by women."[8] The Constitution has given importance to women's education, Article 14, 15, 16 in the third part of the Indian Constitution talks about equal rights for all. In addition, sections 22 (a), 41, 45, 46, 51A (k) have in some way supported and protected the interests of women and education. Although the government focuses on women's education, the constitution does not specifically state that women and men should have equal access to education. The long journey of women's education began in 1948-49 with the important recommendations of the University Education Commission on higher education. From then on, women's education began.[9] According to the census of 2011, the overall literacy rate of India is 74 percent, while the female literacy rate is 65 percent. 46 percent, and the male literacy rate is 82.1 percent.[10] The only way to liberate women is to educate women in the true sense.

One of the biggest obstacles to women's empowerment in India is ignorance. Women don't have the experience; they don't have the confidence. Most importantly, women are economically disadvantaged. All the responsibilities of the family have been imposed on them but they are not aware of the laws of the country. The responsibility for this is to protect the dominance of men. Because of living below the poverty line, many villagers and women tie their children to their backs and work as labourers to build large buildings or roads. All they want is food. Despite being beaten by their alcoholic husbands for being financially backward, many women are forced to live with their husbands in tears for fear of losing social and economic security. In Indian society, women had to live tactfully with the husband of the father's youth and the son in old age. Only the day women speak up for their rights will women's real power be empowered. 'Vishakha 'law has been issued to prevent harassment of

---

[8] Roy Chowdhury, Sucharita, 'Women's Participation in Higher Education'. Mukherjee, Pradipta. Dev, Prapti. Upadhyay, Geetanjali (Eds), 'Women's Education in India', Avenel Press, 2016, Kolkata, p. 177.

[9]Samanta, Arpita, 'SikkhaBisayakNitirAlokeBharatiyaNariShikkharSamassa o BhabishyatSamvabana', Mukherjee, Pradipta. Dev, Prapti. Upadhyay, Geetanjali (Eds), Ibid, p. 195

[10] Ibid, p. 204.

women in the workplace. The Constitution now provides opportunities for the development of women. Some experts have presented empowerment in three different dimensions:

1) Power-Two means the ability to live by one's own efforts.

2) Power-width means the direction of women's collective exercise of power.

3) Power Within; which involves the development of gender self-esteem.[11]

The schemes that were taken from the Government of India for the upliftment of women was the Central Social Welfare Board which was created in 1953. And the very purpose was to do welfare work for women and children. The scheme was launched in 2002. The goal of the project was to rescue women who were victims of natural disasters or girls who had been trafficked. The Rajiv Gandhi National Creche Scheme for the Children of Walking Mothers was launched in 2006. The project was designed with a focus on the health and well-being of working mothers and their children. Although earlier in 1993 RashtriyaMahilaKosh was formed through which poor women were provided with rice. In 2015, the Women Helpline Scheme was created to protect women from any sexual harassment in the day and night. West Bengal is the only state in India where the Kanyashree scheme has been abandoned. Even after giving protection to women, incidents like Hathras in Uttar Pradesh, the Nirbhaya case, the Park Street incident in Kolkata are linked to it. Women are still not safe in many areas of society.

On the one hand, women are respected as mothers and goddesses, on the other hand, these women are subjected to male oppression and discrimination. The day the level of women's development increases, the women themselves will come forward. They are equally compatible with men. Women should first respect their own existence and start seeing each other as sympathizers rather than as competitors. But how can women be equal to men? In a country like India, people of different castes and religions live together. Even in their own religion or caste,

---

[11]Karmakar, Pradip, 'Lingabaisamyo O NarirKhamatayan', In Sarkar, Kalyan Kumar, Jana, Sanchita, Pal, Biswajit (Eds), 'Nari O Samaj', Avenel Press, Kolkata,(2023) p. 151.

they are not allowed to move forward in many cases without helping him. So, women should awaken the power within themselves then only real empowerment will come.

References:

1. Vasin, Kamala, 'BharaterNariderKhamatayan'. Yajona,2016, September issue, p. 6
2. Banerjee, Sekhar, 'Plassey to Partition', Orient Longman,2014, p. 448
3. Ibid, p. 449
4. Siddiqi, Naurin, 'Bharatiyo Ganatantre Nari Khamatayan, Songrokkon o Prasangik Samassa', Pratidhwani the Echo, 2021, Vol IX,p. 141
5. Ibid, p. 145
6. Empowerment of women through Education, Skilling and Micro-financing, 22nd May, 2022, https://www.niti.gov.in.
7. Das, Sayani, 'Women and Education', https://www.ebooks.inflibinet.ac.in, cited in 21-04-2024.
8. Roy; Chowdhury, Sucharita, 'Women's Participation in Higher Education'. Mukherjee, Pradipta. Dev, Prapti. Upadhyay, Geetanjali (Eds), 'Women's Education in India', Avenel Press, 2016, Kolkata, p. 177.
9. Samanta, Arpita, 'Sikkha Bisayak Nitir Aloke Bharatiya Nari Shikkhar Samassa o Bhabishyat Samvabana', Mukherjee, Pradipta. Dev, Prapti. Upadhyay, Geetanjali (Eds), Ibid, p. 195
10. Ibid, p. 204.
11. Karmakar, Pradip, 'Lingabaisamyo O NarirKhamatayan', In Sarkar, Kalyan Kumar, Jana, Sanchita, Pal, Biswajit (Eds), 'Nari O Samaj', Avenel Press,Kolkata,2023, p. 151.

Bibliography:

1. Vasin,Kamala, 'Bharater Narider Khamatayan'. Yajona, 2016 September issue,
2. Banerjee, Sekhar, 'Plassey to Partition', Orient Longman, Hyderabad, 2014.

3. Siddiqi, Naurin, 'Bharatiyo Ganatantre Nari Khamatayan, Songrokkon o PrasangikSamassa', Pratidhwani the Echo,2021 Vol IX,
4. Empowerment of women through Education, Skilling and Micro-financing, 22nd May, 2022, https://www.niti.gov.in.
5. Das,Sayani, 'Women and Education', https://www.ebooks.inflibinet.ac.in, cited in 21-04-2024.
6. Mukherjee, Pradipta. Dev, Prapti. Upadhyay, Geetanjali (Eds), 'Women's Education in India', Avenel Press, 2016, Kolkata,
7. Sarkar, Kalyan Kumar, Jana, Sanchita, Pal, Biswajit (Eds), 'Nari O Samaj', Avenel Press, 2023, Kolkata,

NEP 2020 And Inclusive Education For All : A Comprehensive Review

RIYA BISWAS
Post Graduate Student, Dept. of Education
University of Calcutta
SARTHAK PAUL
Assistant Professor, Dept. of Mathematics
B. L. Educational Teachers' Training College

ABSTRACT : Education plays a significant role in all of our lives, paving the way for all of us to reach our highest potential. Education is a fundamental right for realizing human potential and developing an equitable society. Education is the key to the development of the country and realizing the aspirations of the nation.Development of the country is possible by providing education to all. Many laws and policies have been implemented to achieve the goal of making education universal and inclusive butd iscrimination persists.After 34 years, finally, our much-awaited National Education Policy is here.The National Education Policy of 1986 is replaced by NEP 2020.The National Education Policy 2020, which is based on the recommendations of an expert committee headed by former ISRO chairman Dr, Kasturirangan, aims to transform the Indian education system by 2040. This article aim to discusses NEP 2020 recommendations for curriculum in the fields of school educationand higher education, women's education, as well as transgender education, socio economically disadvantaged groups, children with disabilities, children with specific learning disabilities, special education zone and gender inclusion fund.

Key word: National education policy 2020, Inclusive education, Recommendation.

INTRODUCTION

The role of education is important in leading a better life and progressing society. As a developing country, it is our responsibility to provide education for all, irrespective of caste and creed.If education is still not

accessible to all, then as a developing nation, we will fail. The 21st century demands inclusive education; it is no longer a privilege(Panigrahi & Malik, 2020). NEP 2020 has given special emphasis to inclusive education. NEP 2020 aims to provide high-quality education that is impartial and inclusive. Educating students from different backgrounds and appreciating their unique contributions is known as inclusive education, and it is thought to be the most successful method. The five guiding pillars of access, equity, quality, affordability, and accountability serve as the foundation for the NEP2020. Inclusive education according to the RPWD Act, 2016 is “a system of education wherein students with and without disabilities learn together and the system of teaching and learning is suitably adapted to meet the learning needs of the different types of students with disabilities".The policy's goal is to prevent the segregation and isolation of people with disabilities, members of racial and ethnic minorities, those who struggle with language challenges, experience educational marginalization, and those who have disabilities. Language is how we make sense of the world, and it is through language that legitimacy, authority, and power are created and renewed(Anuja, 2020).

The National Education Policy 2020 has brought a structural change to the education system aiming to make India a comprehensive knowledge society, ensuring equity and Inclusion. It aims to bridge the rural-urban and gender gaps in education, NEP 2020 acknowledges the significance of early childhood education, vocational training, and technology integration in education to equip students with skills and knowledge.

CONCEPTUAL FRAMEWORK

National education policy 2020

The Union Cabinet approved the National Education Policy (NEP) 2020 on July 29, 2020. Krishnaswamy Kasturirangan, the former head of ISRO, is the chairman of the policy, which is the first education policy of the twenty-first century. This policy aims to make education in schools and colleges more multidisciplinary, flexible, holistic, and responsive to the demands of the twenty-first century. It is founded on the

essential principles of accessibility, equity, quality, affordability, and accountability.

Inclusive Education

Inclusive education means all students learn together in the same classroom and the same school. It is an effort to mainstream and provide education to all students regardless of ability or disability. caste, creed, culture, socio-economic status, and learning ability.

Recommendation

A recommendation is a suggestion or advice that is based on knowledge, analysis, or experience and is intended to help someone decide what to do or make a decision. A suggestion or plan for optimal procedures, particularly one issued by a higher authority.

OBJECTIVE OF THE STUDY

- ❖To study the impact of NEP 2020 to inclusive education.
- ❖To study the recommendationof NEP 2020.

DATA COLLECTION AND METHODS

The present research article is qualitative and theoretical in nature, totally based on secondary data. Most of the data have been collected from website and journals.

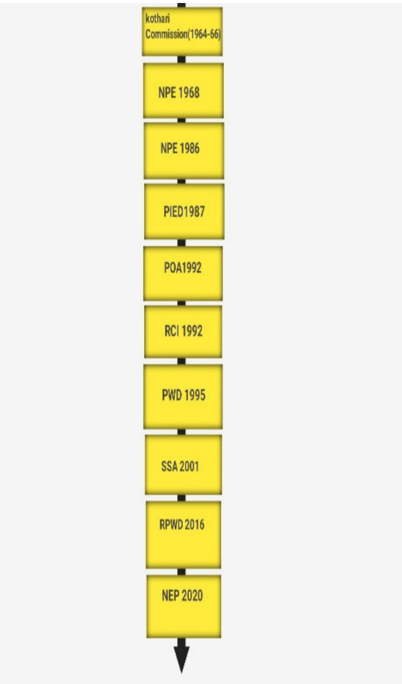

RESULTS AND DISCUSSION

AN OUTLINE OF INCLUSIVE EDUCATION

The emphasis on inclusive education in India evolved with the 1964-1966 Education Commission Report, which suggested admitting students with disabilities to regular schools. Subsequently, there was the 1986-1990 National Policy on Education and Program of Action (POA), along with two significant programs that targeted inclusive

education: the District Primary Education Program (DPEP) and Sarva Shiksha Abhiyan (SSA). The India Planning Commission for Integrated Education Program was established in 1971. In December 1974, the Integrated Education for Disabled Children (IEDC) program was introduced. The program's goal was to encourage kids with mild to moderate disabilities to attend mainstream schools. Later in 1976, education was added to the concurrent list through the 42nd Amendment. Article 45 ensures free and compulsory education for all children between the ages of 6 and 14. In 1987, the Mental Health Act emphasized Project Integrated Education (PIED).The POA emphasized raising public awareness about the education of handicapped children and encouraging the education of handicapped children in various ways. In September 1992, the Rehabilitation Council of India Act was also enacted. The act was implemented to train rehabilitation professionals and maintain a central rehabilitation register. In 1995, the Persons with Disabilities Act was passed, which ensured full participation and equality of persons with disabilities in the Asian and Pacific region. It aimed to ensure equal opportunities, protection of rights, and full participation. In 2001, the Education Campaign (SSA) began. Although SSA had no specific interventions for disability, it emphasized education for all. In 2009, the Inclusive Education of the Disabled at Secondary Level (IEDSS) was introduced. In the same year, the Government of India launched the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) to universalize secondary education.2009 was a significant year for Indian education. The Right to Education Act was passed in the same year and came into effect on 1st April 2010, except in Jammu and Kashmir. RTE 2009, under Article 21 A, makes education a fundamental right of every child in India. Education is compulsory for children aged 6-18. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, replaced the PwD Act of 1995. This law was in line with the UNCRPD. In 2018, the Whole Education Campaign was launched by MHRD. It is an integrated scheme for school education, bringing together the three schemes SSA (Sarva Shiksha Abhiyan), RMSA (State Secondary Education Scheme), and TE (Teacher Education).After 34 years, the eagerly anticipated National Education Policy was finally released, based on the suggestions made by

the Kale Kasturirangan Committee (2019). This policy is extremely thorough and applies to all educational levels. NEP 2020 was developed in response to Sustainable Development Goal No. 4:'Quality education for all.' In 2016, the NEP 2020 draft was made public, with T.S. Subramanian serving as chairman, who submitted its report on May 7, 2016 (MHRD)The motto of New Policy is-"Educate, Encourage and Enlighten".

TOP HIGHLIGHT OF NEP 2020

- To Provide Universal Access to All Educational Levels, Pre-Primary to Grade 12.
- By 2030, the New Policy aims to achieve 100% Gross Enrolment Ratio (GER) in schooling from pre-school to secondary level.
- NEP 2020 aims to get back two million out-of-school children into mainstream.
- New Curricular and Pedagogical Structure (5+3+3+4).
- No strict divisions exist between the academic and professional streams, between extracurricular and curricular activities, or between the arts and sciences.
- To build up National Mission on Foundational Literacy and Numeracy.
- Setting up PARAKH, a new national assessment center that stands for Performance Assessment, Review, and Analysis of Knowledge for Holistic Development.
- Socially and Economically Disadvantaged Groups (SEDGs) are given special attention in equitable and inclusive education.
- Establishment of the State School Standards Authority (SSSA).
- GER will be raised to 50% in higher education.
- Establishment of Academic Bank of Credit.
- To build up of Multidisciplinary Education and Research Universities (MERUs).
- Setting up of National Research Foundation (NRF).
- The Higher Education Commission of India (HECI) will be established as the one comprehensive organization that oversees all aspects of higher education. It will consist of four

separate verticals: the National Accreditation Council (NAC) for accreditation, the Higher Education Grants Council (HEGC) for funding, the General Education Council (GEC) for standard-setting, and the National Higher Education Regulatory Council (NHERC) for regulation.

- A 360-degree Holistic Progress Card that tracks student progress toward learning outcomes is one of the assessment improvements.
- The NCTE will work with NCERT to develop the new, comprehensive National Curriculum Framework for Teacher Education, or NCFTE 2021.
- By 2030, an integrated four-year B.Ed. degree will be the required minimum degree for teaching.

NEP 2020 ININCLUSIVE EDUCATION

National Education Policy 2020 has brought about a massive transformation in the Indian education system, promoting equitable and inclusive education as a necessary goal for society's development. The expansion of an inclusive society is impacted by the National Education Policy (NEP) 2020, which highlights education as the most effective weapon for attaining social justice and equality. Everyone has the right education regardless of caste, or creed. The right to education cannot be taken away from anyone. In this regard, the National Education Policy has put forward some important recommendations.

- **Chapter 6** contains recommendations on inclusive education at the school education level, and this chapter is titled **"Equitable and Inclusive Education for All: Education."**
- **Chapter 14** contains recommendations on inclusive education at the higher education level, and this chapter is title “**Equity and Inclusion in Higher Education."**

SCHOOL EDUCATION

The regular schooling process for children with disabilities from the primary level to higher education includes the option for children with moderate to severe disabilities to attend regular or special schools (NEP 2020, Part-1, Section 6.10).

The policy suggests that education should be provided in accordance with the nature and characteristics of these kinds of institutions. Teachers must improve their skills through pedagogical practices and orientation in order to provide high-quality instruction. High-quality literature and educational resources need to be available in libraries. Subjects and learning areas from the National Curriculum Framework for Secondary Education (NCFSE) will be integrated to enhance school children's education and make it easier for them to transition to higher education. To facilitate their enrolment in higher education, students from these kinds of schools should be encouraged to take the state or other board exams administered by the National Testing Agency (NTA).The policy suggests encouraging these schools to maintain their traditions and methods of instruction.

HIGHER EDUCATION

- Gender parity in higher education institutions will be ensured by government regulation of the admissions process.
- For the SEDGs, the government will create more high-quality HEIs to provide access to highereducation.
- The government will set up or provide the necessary funds for SEDGs education.
- Further financial aid in the form of various scholarships, mostly for SEDGs will be given to students attending public or private higher education institutions.
- The government will run some outreach activities for SEDGS in order to make it easier for them to get scholarships and opportunities for higher education.

SOCIO ECONOMIC DISADVANTAGED GROUPS

NEP 2020 recognizes that some groups are glaringly underrepresented in the current educational system.Specifically to address their educational needs, the NEP created a new social group called SEDG, combining gender identity, socio-cultural identity, geographic identity, disability and socio-economic status.

Socio-Economically Disadvantaged Groups (SEDGS) can be broadly classified into:

- Based on gender identity (especially women and transgender persons).
- socio-cultural identity (Scheduled Castes, Scheduled Tribes, OBCs and Minorities) .
- Geographical identity.
- disability (including learning disability).
- socio-economic status (migrant community, lowincome families, children in vulnerable situations, orphans and the urban poor).

NEP 2020 recognizes the unique needs of these groups and suggests several policies and programs that have been proven to increase enrolment in the past, such as conditional cash transfers, targeted scholarships, and bicycles for commuters, which encourage parents to send their children to school.

SEZ(Special Education Zone)

One of the most notable recommendations made by the NEP is the creation of Special Educational Zones (SEZs) in aspirational districts and areas where a sizable portion of the population belongs to Socio Economically Disadvantaged Groups.Spreading education to India's most rural and distant locations is the main goal. In order to revitalize these underdeveloped areas, the Centre and the states will combine various plans and programs.

GENDER INCLUSIONFUND

National Education Policy (NEP), 2020 recommends that the Government of India will establish a 'Gender-Inclusion Fund'. to enhance equitable quality education for all female and transgender students.Inclusion Fund schemes will also be created to address similar access issues for other socio-economically disadvantaged groups

This policy aims to eliminate remaining disparities for children of any gender and socio-economically disadvantaged groups, so that they no longer face discrimination in access to education.

WOMEN EDUCATION

- Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya will be strengthened and expanded to increase participation in quality schooling (up to

grade 12) of girls from socio-economically backward backgrounds.

- Bicycles will be given to girls to increase their participation in school education, so that they can easily go to school.
- For their advancement in education, policies and plans will be designed in the best way so that they can access education without any hindrance.
- Free boarding facilities will be created to increase the participation of socio-economically disadvantaged girls.
- Additional Jawahar Navodaya Vidyalayas and Kendriya Vidyalayaswill be created across the country, especially to increase access to high quality education.

CHILDREN WITH DISABILITIES

This policy has emphasized the Rights of Persons with Disabilities (RPWD) Act 2016. Children with disabilities will continue their education together in the same classroom with children of the same age. The most appropriate teaching-learning strategies will be adopted to meet the needs of the students. Ensuring the inclusion of such children in the early childhood care and education (ECCE) and schooling system will be given top priority. To ensure full participation of children with disabilities in the regular school education system from primary level to higher education. Assistive devices, appropriate technology-based equipment, as well as adequate and language-appropriate teaching-learning materials shall be made available to facilitate the integration of children with disabilities into classrooms in the context of teaching Indian Sign Language and other fundamental**.**

Provision of regular and special schools will be affirmatively provided to those children with benchmark disabilities as per their choice and Children unable to go to school shall be provided with home based education and such home based education must be treated at par with the general education system.

CHILDREN WITH SPECIFIC LEARNING DISABILITIES

NEP2020 have been suggested for children with specific learning disabilities these are as follows:

- Some assessment and certification organizations, such as the recently proposed National Assessment Center and PARKH, will be established to conduct such exams in order to guarantee access and opportunity for children with particular learning difficulties.
- This assessment and certification systems will evolve from primary level to higher education. It will be developed for entrance examinations at any level of education.

TEACHER EDUCATION

Programs for teacher education will create instructional tactics aimed at improving that particular group, confirming that teachers are the intended audience for these groups. Programs for marginalized groups and gender sensitization will be included in teacher education courses. In teacher education programs, there is a focus on raising awareness of certain learning difficulties and incorporating children with disabilities.

CURRICULUM

The curriculum is particularly essential in complementing any educational system. Achieving educational goals is facilitated through the curriculum. The curriculum assists in guiding and streamlining the entire education system efficiently. The National Education Policy 2020 has suggested recommendations for improving the curriculum.

- The curriculum will be more knowledgeable and relevant.
- It should be diverse.
- The curriculum will emphasize society and learner needs.
- Humanistic principles like "respect for all persons, human rights, gender equality, non-violence, global citizenship, inclusion, and equality" will be covered in this curriculum.
- The curriculum should be unbiased.

CONCLUSION

The role of education is essential in the overall development of a country. The country must ensure that no one is deprived of the right to education. Education should beprovided to all students irrespective of caste, religion, or disability. The mentality should be changed by seeing disability as an ability only then will the development of the country be possible. NEP 2020, if properly implemented, will bring a new wave in the concept of

inclusive education, opening up new directions in the Indian education system.

References References

Retrieved from Ministry of Education:
https://www.education.gov.in/shikshakparv/docs/Inclusive_Education.pdf
Retrieved from Ministry of Education:
https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English.pdf
Anuja, D. (2020, August Tuesday). *The times ofIndia*. Retrieved from https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/voices/nep-2020-making-education-more-inclusive/
Hussain, A. (2023). National Education Policy 2020And Inclusive Education: A Comprehensive Analysis. *International Journal of Creative research Thoughts, 11*(7), f719-f727. Retrieved from https://ijert.org/papers/UCRT2307670
Kumar, D. (2020). A Critical Analysis and a Glimpse of New Education Policy-2020. *International Journal of Scientific& Engineering Research, 11*(10), 248-253.
Kumar, D. (2021). Inclusive Education and National Education Policy 2020: A Review. *International Journal of Creative Research Thoughts, 9*(9), d23-d28. Retrieved from https://ijcrt.org/papers/IJCRT2109318.pdf
Panigrahi, M., & Malik, M. (2020). A Roadmap to Inclusive Education in NEP2020. 44-47. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/346937469_A_Roadmap_to_Inclusive_Education_in_NEP2020
Singh, J. (2016). Inclusive Education India Concept, Need and Challenges. *Scholarly Research Journal For Humanity Science& English Language*, 3222-3232. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/301675529_INCLUSIVE_EDUCATION_IN_INDIA_-_CONCEPT_NEED_AND_CHALLENGES

Community Identities through Oral Narratives of Partition

Prajna Paromita Podder
Assistant Professor, Department of History,
B H K Mahavidyalaya, North 24 Pgs

.

Abstract: The meta-narrative of the birth of the Indian nation state, in a sense, culminates in the year 1947 with the Partition of India. And with it there emerged the 'other' histories of displacement, of migration. Afterlife of Partition really springs to life in all its complexities, in immense range of plurality in India only when it is studied in specific lived experiences which deals with the differences and variation- over time and across space- into the otherwise notional concepts of the Partition's afterlife. The traditional archives fail to demonstrate the subjectivity of these displaced people. On the other hand, oral sources are often discounted as being less authentic. This essay would try to cope with the methodological concerns about oral sources in the first segment. Then with the aid of oral narratives of Partition collected from the districts of Coochbehar and Jalpaiguri, West Bengal, this essay would try to situate the identity of the Partition displaced people in India historically and to trace the importance of a place left behind in shaping their identity.

Key Words: Oral narratives, Partition, Community, Identity.

With the Partition (1947) induced displacement there emerged memories of pain, grief; the nostalgia for the lost 'home', the kin, folks; and the obligatory determination to create a new 'home' in the place of resettlement. All these are certainly difficult things to capture 'factually' in History. Still these have their claim to have their place in history. In other words, there is a very strong sense in which the afterlife of Partition in one part of India is different from another and that is the historicity. I have selected my respondents from north Bengal, as it was felt that the experience of northern part of Bengal was very different from Western part and Kolkata.

When the displaced people tried to create a space for their selfhood, there is also a process, inseparable and concomitant, a process

of place making. This is situated in a historical situation and this requires historian's attention by its own merit. The sentimental and nostalgic aspects of remembrances also refer to a more complex phenomenon, which have significant historical material and ideological parameters. Indeed the concepts of space and place have in recent years very forcefully come up as meaningful lines of enquiry and critical reading in the social sciences. The migrant people had to adjust with differences, differences in natural atmosphere, topography, host society, culture, so on and so forth. The home- making is not a simple process. Also, the reinvention of the community is not always easily accomplished, as history of the everyday life in a new place creates new contingencies which challenge and transmute the agenda of preserving the 'tradition' of the '*desh*' (native place) left behind. When identity is to be reformulated, readjusted, reasserted, it has to take note of different agencies outside of the displaced communities. Complicating the afterlife, the host society in India , contribute in their own way in not only reconstituting their own identities as a response to the post partition influx but also in inscribing their own signature on the process whereby the immigrants seek to emplace themselves as a community and creates an identity of their own.
For my purpose working with oral narratives appeared to be a pertinent methodology. But remembrances are often discounted as 'sentimental and nostalgic', and are unfortunately not read with a critical mind that argues for socially and historically sensitive rehabilitation of emotions around a left behind place and a newly acquired space, where place making begins amidst great complexities. So let us first start with some methodological concerns about oral sources.

I.

'The narrator not only recalls the past but also asserts his or her interpretation of that past, and in participatory oral history projects the interviewee can be a historian as well as the source.'[1]

When used as a source, 'oral history' can open new windows to explain experiences of people within the constraints of the discipline of history. The most important contribution is highlighting the role of subjectivity in history, and thereby opening new horizons of historical

---

[1] Robert Perks and Alistair Thompson, eds. *The Oral History Reader*,(London: Routledge, 2003), Introduction.

inquiry; in Luisa Passerini's words—'….oral sources refer to and derive from a sphere which I have chosen to call subjectivity'.[2] A methodology of giving importance to the conscious and unconscious meanings of experience as lived and remembered helped to include hitherto neglected, if not untouched, areas of historical enquiry. '…we should not ignore that the raw material of oral history consists not just in factual statements, but is pre-eminently an expression and representation of culture, and therefore includes not only literal narrations but also the dimension of memory, ideology and subsconscious desires'.[3] However, assuming that oral history projects are providing a scope for the members of oppressed groups to 'speak for themselves', invites another problem. Inherent in the methodology of using 'oral history' there might lay attitude of 'facile democratisation' and 'complacent populism' of oral history projects. A historian should be critical enough to locate how and in what ways memories might be influenced by dominant histories and thus require critical interpretation. But these cautions cannot minimize the importance of oral sources. As a matter of fact, in historical enquiry, we cannot discount oral or any other sources relevant for a particular study. Because oral and written sources are not mutually exclusive, both of these possess qualities and questions on their validity, and in a particular aspect of study one of them can be a better fit than the other.[4]

The debatable status of memory calls for some clarifications regarding why memories should be used as the source material for reconstructing history. Memory is not only a passive repertoire of 'facts' but also an active process of creation of meanings of those 'facts'. On the other hand, researches show that memory is never 'pure' or 'unmediated'. Who remembers, when, with whom and how, all these shape the interviews. But how people choose to remember an event is also important for History. Scholars have rightly recognized that the interview situation depends on an interaction. But it is also inaccurate to suppose that the interviewer is weaving the interview for his or her purpose. The interviewer's response, of disapproval or approval, of encouragement or

[2] Luisa Passerini, ibid, p.54.
[3] Ibid, p.54.
[4] Alessandro Portelli, 'What Makes Oral History Different', in *The Death of Luigi Trastulli And Other Stories: Form And Meaning in Oral History*, (Albany: State University of New York Press, 1991),p.67.

indifference, of more intense listening to some things than to others, without any doubt play a role, but the different themes narrated by the respondents ultimately depend on them. We cannot simply discount the oral narratives of the Partition as 'Memory, then, is far more complicated than what historians can recover and it poses ethical challenges to the investigator historian who approaches the past with one injunction: tell me all'.[5]

II.

Everyone, who had to migrate, had an established sense of themselves in the place where they used to live. During their resettlements they continuously remembered , compared, contrasted and mourned for 'that place', which is very frequently than not referred as '*desher bari*'. So, there is a 'there' in shaping the identities of the migrants here. The seemingly sentimental and nostalgic remembrances can point to a number of layers of various themes of the Partition, such as socio-economic and cultural displacement and tearing all ties with the environment around them. Crossing the border was a 'solution' for them. This was followed by their efforts to recreate the 'home'.

In this process the presence or absence of the mundane elements of everyday living made the difference, made this place 'different'. Differences regarding houses, natural atmosphere, topography and soil,non-existence of ponds, availability of fish, and the socio-cultural differences with the native people are frequently remembered motifs, with the help of which this place is contrasted and compared with the place left behind.[6]

---

[5] Dipesh Chakrabarty, 'Remembered Villages: Representation of Hindu Bengali Memories in The Aftermath of the Partition', in Mushirul Hasn (ed.), *Inventing Boundaries: Gender, Politics and Partition of India*, (New Delhi: Oxford University Press, 2000), p.318.

[6] Interviews used in this essay are recorded and preserved, interviews of Aparna Roy,Harish Chandra Sarkar,Namitarani Kar,Narayan Acharya,Sadhan Chandra Dey ,Subir Kumar Dey – taken from "Remembering the Native Place: A Nucleus of Social Memory among the People Displaced by Partition of India (1947)" (a SEPHIS- funded project under the Department of History , Jadavpur University) and Arati Sarkar,Aruna Roy (Das),Ashalata Saha,Ashok Maitra,Benimadhab Debnath,Binoy Kumar Poddar,Bireshwar Saha,Dulali Chakrabarty,Kamala Sen,Laxmi Paul,Laxmi Sutradhar, Mihir Saha,Namita Bhattacharya,,Naresh

The Rajbansis have the major share in the population of North Bengal, specially in the districts of Coochbehar and Jalpaiguri. There are also the Rabha, Mech, Polia, Bhutia, Lepcha, Garo, Toto and other tribes. The Rajbansis speak Bengali, but it is a local dialect, sometimes widely away from the standard Bengali. Their physical feature show Mongoloid origins and the then lifestyle did not conform to so-called ‘civilized’ norms. Their food habits, dressing and cultural practices were also different.In North Bengal, large scale transfer of land from Rajbansis to non- Rajbansis had started from the late nineteenth century. Apart from the changes that were taking place in the economic sphere as a result of war, depression , and famine in Bengal , another important reason for land transfer to the non- Rajbansis was the migration of a large number of people to different districts of North Bengal.[7] A report of the Refugee Relief and Rehabilitation Department of Government of West Bengal of 1974 shows that by then 4, 42,500 partition displaced people had come to Coochbehar and 2,49,000 people had come to Jalpaiguri. This influx of people led to a growing demand for land and a rise in land prices. In Jalpaiguri , while the number of *jotes* held by the Rajbansi decreased, those held by the Marwaris, the upper caste Bengali middle class people and others increased sharply. In Coochbehar too, the people from outside, those who were mostly in the administration of the Coochbehar state and were perceptively more resourceful than the local inhabitants , grabbed a large number of *jotes*. By 1872, in Coochbehar, 54 percent of the revenue

---

Chandra Sarkar,Nirmal Krishna Pandit,Dr. Nirod Chandra Sutradhar,Nitya Ranjan Sarkar, Parimal Kumar Das,Phanindra Chandra Roy, Phanindra Dey, Phuleshwari Roy, Pradip Kumar Nath, Ranjan Bhattacharya, Rathindranath Ghosh,Sabitri Talukdar, Naresh Chandra Talukdar and Anil Talukdar,Sandhya Das,,Sandhya Das,Subhash Chandra Saha Roy, Subhashini Roy, Sunil Kumar Paul, Sunity Chakrabarty, Dr. Tushar Kanti Chakrabarty,Upendranath Barman interviewed by the author on 08.02.2011,7.01. 2011,17.01.2011,29.01.2011, 14.01.2011, 18.01.2011, 17.01..2011, 07.01.2011, 08.02.2011, 08.02.2011, 02.02.2011,28.01.2011, 06.02.2011, 02.02.2011, 19.01.2011,05.01.2011,14.01.2011, 08.02.2011, 29.01.2011 ,18.01.2011, 7.01.2011, 17.01.2011,06.02.2011, 06.02.2011, 15.01.2011,15.01.2011, 15.01.2011, 02.02.2011,20.01. 2011, 29.01.2011,16.01.2011,02.02.2011,06.01.2011,21.01.2011 respectively

[7] Swaraj Basu, *Dynamics of A Caste Movement: The Rajbansis of North Bengal,* (New Delhi: Manohar, 2003), P.43.

paying lands had passed into the hands of outsider.[8] Indeed, all over North Bengal this phenomenon of transfer of land from the hands of the Rajbansis became a standard pattern and in course of time it generated a sense of grievance among the disposed Rajbansi gentry.

There were sharp dissimilarities between the cultural practices of these two groups.The migrated people used to refer to the Rajbansis as bahe, the usage was informed by the conscious ascriptions of cultural inferiority. The word '*bahe'* was a distortion of the word '*babahe'*, by which the Rajbansi generally addressed a person.[9]Thus the migration became instrumental to form 'us' and 'them', to form '*bhatia*' and '*bahe'*(the migrated people were called '*bhatia*' –it meant people who had come from '*bhatir desh'* or land of ebb) . In such conditions comparisons were used not only for consolidation of the identity of the migrated people, but also for the consolidation of the identity of the Rajbansis. Later on it took an ethnic dimension as the Rajbansi elites tried to raise caste sentiments among the members of their community. Around the demand of Kshatriya status a movement among the Rajbansis was perceptible from the early years of twentieth century[i], they asserted their caste status amidst the waves of caste movement of that period and they took certain steps towards what might be called 'sanskritization'.[10]

But confrontations with the migrant 'other' on a daily basis, as their neighbours, gradually accelerated the process to mark their community with markers of high caste, '...the socio-cultural traditions of the Koch-Rajbansis have been raised as the proofs of their distinct cultural identity'.[11] Recently this has been recognized by the Rajbansis, specially the educated Rajbansis. Now they fall back on a different kind of memorialization, memorialization of what they consider to be their pristine cultureand this finds expression in organizing programmes demonstrating their culture, publishing dictionary (Rajbansi language to

---

[8] Sarkar, S., *Land Settlement and Revenue Administration and Taxation under the Maharajas of Coochbehar*, unpublished Ph. D dissertation, North Bengal University, (Siliguri:1990), pp. 7-32.
[9] Basu, ibid, p.63.
[10] Mysore Narasimhachar Srinivas, *Caste in Modern India: And other Essays*, (Bombay: Asia Publishing House, 1962), p.48.

[11]Rupkumar Barman,,*Post Colonial Ethnicity and Regionalism*, , (New Delhi: Abhijeet Publications, 2007), P.147.

standard Bengali), publication of many little magazines on weekly – fortnightly- monthly basis, etc.

But it is not always true that '...the attitude of cultural superiority of the immigrant upper caste Hindus and their general tendency to look down upon the Rajbansis prevented a closer relationship between the two'.[12]Here the oral narrative comes to our help, to find out the nuances in the interaction of communities. The first reaction of most of my respondents about the Rajbansis of this side was about the warmth of reception, helpful nature, hospitality and simple but cordial behaviour. They did not hesitate to help them to be settled or to bear the burden of the population. For example I quote one of my respondent Nirmal Krishna Pandit '*…asole rajbansira eto sorol prokritir lok chilen, amra je purba banga theke esechi, tader opor je barti ekta chap porlo…..seta tara takhono bujhe nai, sutorang keu kono kichu tader kache chaile seta prai bina poisaie diye ditto…'*(actually the Rajbansis were so simple that they did not understand that as we, the people of East Bengal came it meant an extra burden on their resources. So when a person asked for something they took almost no money for that.). Others also referred in the similar way: '*…onader achoron byabohar khub valo lagche , kothai bari , kotah theke aschen. amader barite aso, paan gua khao, cha khao , thako, eder jothesto sohojogita. karon amar mone ache ekhaner jara rajbansi…purba banglar jato lok dukche, prothom rajbansider ashroiyei niyei tara,tader songe attiyota, bondhubandhob, matha gojar ekta astana koira tara dhire dhire agaiche…help korche. tara jodi ashroi na diten ba help na korten tahole dakhkhin desira eidike aise daraite parten na…'* [Their behaviour was really good and cordial. They asked about our home, from where we have come , also asked to visit their house , asked to have betelleaf and 'guya'(betel nut which are kept under the soil for some time), and tea. They also asked to stay in their house. They really helped. I remember the people, who came from East Bengal, they were initially given shelter by them, they made friends, relations with them and made shelter for the family. Then they gradually moved on. If the Rajbansis did not offer shelter and help the people of south could not establish themselves here.- Phanindra Chandra Dey]. '*...asar por byabohar khub valo korche, sahajyo korche…ghor tor korate, bansh*

---

[12] Basu, ibid,p.64

chaichi, je amar to dewani bas lagbe, ghor korbo ami, koi je nen kyane'(when we came they behaved really well, they helped. For example, when I asked for bamboos to make rooms, they readily gave.- -Naresh Chandra Sarkar). Some people did not need their help. Sunil Kumar Paul says, *'byabohar chilo opurbo, sahajjer prosno ase nai'*(behaviour was really nice, but we did not need their help). *…takon ora khub valo chilo, tomare je dekhbo na, tomare khub bhalobasbo, ekkere pran dia bhalobasbo…..ei je tomar thakurdada rajbansigo mama, kaku koira dakto, ar tarao bhaigna bhaigna koira poran ditto, kriya korme nimontron hoito, amra kriya kormo korle oder nimontron kortam, orao kriya kormo korle nimontron korto*…[thenthey were really good, they would love you from their heart. Your grandfather (her husband) regarded them as uncle, maternal uncle; they also loved their nephew and could do anything for him. During celebrations we invited each other. – Phuleshwari Roy].

They also established kinship relations with these people, through marriage and through a local custom as well. In North Bengal , the Rajbansis used the custom of '*jal chitano*'(literally means, sprinkling water), to make close relations with people who are not related by blood, but after performing the ritual are regarded as blood relations.Subhash Chandra Saha Roy has such a son here('*amar to ek chelei ache jol chita byata bole ekhane*').

Both the communities mocked one other, as each of them held the other different from themselves. The migrant population called them *'edeshi'* and the natives called them *'bhatia'*. '*...eder kach theke to konorokom kharap byabohar painai, majhe majhe dui ekjoner thika, -tone korche bangal bole, bhatia bole, ar amrao tader takon boltam 'koch', 'bahe' ei arki...'* (I did not receive any ill treatment from them, sometimes some of them taunted us as '*bangal*', '*bhatia'*, and we also taunted them as '*koch*' , '*bahe*', it was nothing more..'- Benimadhab Debnath). However, this acceptance of the migrants by the pre-existing Rajbansis of Coochbehar and Jalpaiguri districts is not uncomplicated. Initially the taunting was not used to insult or to disrespect, but as time went on and more people came from East Bengal, the situation changed. Nitya Ranjan Sarkar , from his own experience, explained the difference. He came to Coochbehar district first in 1944. He then went back, and finally with his family he shifted to Coochbehar in 1962. He says, '*...oi*

timetai khub valo byabohar paitam, kintu jakhon partirion hoya gelo takhon ora khub hinsa kore ….bhatia shobdota byabohar kore besirbhag, desi- Bhatia shobdo tole' (earlier they behaved really well, but after Partition their hostility came to the surface). It is difficult to ascertain from when the behaviour of the host population changed and to what extent. Because a number of people who came during the later years of 1960s assert that the behaviour, the reception of the host population was good enough. This change may also have regional- local variations. It seems that simplicity of mocking denoted humiliation later. But it changed over time, it is a lived experience, *'ekon jeno kemon hoiche na eirokom chilo na'*(They have changed, their behaviour now adays, is not like their previous cordial behaviour.- Phuleshwari Roy).

II.

What is more striking that even the people from East Bengal do not always form 'us'. At one level, they are '*desher barir lok'*(people of native land), but at another they often refer to the people of the same district or village ,exclusively, as *'desher barir lok'*. At the same time, paradoxically , the people of that same village or district now fail to confer the sense of '*desher barir lok*', the community left behind. 'We need to ask question about how the 'us' and 'them' are constituted – or… reconstituted- in and by these accounts'.[13] .Because the re- creation of the community is not always easily accomplished, as the history of the everyday life has many details, which always compare and contrast and mess things up. When asked whether you still have such relations with your neighbours, or with people who came from your district or village, the answer was 'no'. Some initially stated that they have good relations, but later they found that something is lacking. It was quite natural that they required time to build up cordial relationships with neighbours, as

'*…jara amra notun, tader sathe porichiti , antorikota hoite ektu deri hoilo….porichiti hoite ektu samay darker...prothom prothom ektu dwidha chilo, ar purba banglai jakhon chilam prottekei amar bhagi-gusti, grambasi, bondhu bandhob…*'(we, who are new here, we

---

[13] Gyanendra Pandey, *Remembering Partition,* (Cambridge: United Kingdom: Press Syndicate of The University of Cambridge, 2001), p.197.

neededtime to know each other, initially we had hesitations. But in East Bengal all the neighbours were my relatives, fellow villagers and friends – Phanindra Chandra Dey).

The present communities perhaps do not live as they once used to. Still new relations grew; but comparison remained and there also remained a sense that something is lacking. People tried to find that flavour of cordiality, fellow feelings, among the people who came as migrants, more specifically, among the people of same district or village, if they are available.These people also tried to continue their customs, broto, puja and cooking styles. It is clear that there is a sense of dismemberment and a need for reconstruction is very much present in their efforts. But, when there is a sense of continued existence of the community, there is also a sense of rupture that comes to the surface.

References:

Barman, Rupkumar ,*Post Colonial Ethnicity and Regionalism*, , (New Delhi: Abhijeet Publications, 2007).

Basu, Swaraj, *Dynamics of A Caste Movement: The Rajbansis of North Bengal,* (New Delhi: Manohar, 2003).

Chakrabarty, Dipesh, 'Remembered Villages: Representation of Hindu Bengali Memories in The Aftermath of the Partition', in Mushirul Hasn (ed.), *Inventing Boundaries: Gender, Politics and Partition of India*, (New Delhi: Oxford University Press, 2000).

Pandey, Gyanendra, *Remembering Partition,* (Cambridge: United Kingdom: Press Syndicate of The University of Cambridge, 2001).

Perks, Robert and Thompson, Alistair eds. *The Oral History Reader*,(London: Routledge, 2003).

Portelli. Alessandro, 'What Makes Oral History Different', in *The Death of Luigi Trastulli And Other Stories: Form And Meaning in Oral History*, (Albany: State University of New York Press, 1991).

Sarkar, S., *Land Settlement and Revenue Administration and Taxation under the Maharajas of Coochbehar*, unpublished Ph. D dissertation, North Bengal University, (Siliguri:1990).

Srinivas, Mysore Narasimhachar, *Caste in Modern India: And other Essays*, (Bombay: Asia Publishing House, 1962).

The Fever in South West Bengal – A Study

Subhankar Sengupta
Assistant Professor, Department of History,
Balurghat Mahila Mahavidyalaya
Dakshin Dinajpur, W.B.

Abstract: In the colonial period, the jungle tracts of south west Bengal were very turbulent regarding the political aspects. But famine, flood, and fever also greatly affected this area. Predominantly tribal populated the districts of Midnapore and Bankura had an excellent jungle tract that underwent severe periods of epidemic fever. In the nineteenth century, the people of this area were distressed by the fatal fever which almost swept the area's population and affected the rise of population. Here discussions have been made about how the fever left a deep imprint on the health of the tribal population of this large jungle tract by disrupting the demographic profile and the various environmental aspects.
Keywords: fever, malaria, Jungle Mahal, Bengal, colonial.

Introduction :

From Burdwan, I marched for seven days north-eastward along the left bank of the Dammhoudoerr...it was there that I came across the Jungles. I confess I was much disappointed. I had pictured a thick, impenetrable forest presenting all the richness of the forms and colours of the vegetation of the tropics, bristling with thorny shrubs, festooned with creepers, with climbing plants reaching to the tops of even the tallest trees and trailing down gracefully in cascades of flowers in, Rio de Janeiro and Son Domingo, I had seen a few isolated features of such a picture. But far from that being the case, I found myself in woods even more monotonous than those of Europe, beneath a few woody little trees; and instead of the roaring tigers in the distance, only the sound of the woodcutter's axes.

Victor Jacquimont wrote a letter to his father on 24 December 1829, "from the camp at Huinguilisse, on the banks of Sone" during his travel from Calcutta to Benaras; what he is describing, in the main, is Jungle Mahals.[i]

This Jungle Mahal was never the same because diseases ravaged it along with political disturbances. The public health system was a significant concern in the jungle tracts of South West Bengal as many people in this area were affected with several epidemic diseases like fever (like malaria, plague, dengue, influenza), smallpox, measles, chicken pox, and others. 'The consensus of medical opinion was in favour of malarial disease.'[ii] A study shows that the fever (mentioned by the native Kavirajs as 'Jwar bikar' and as 'natun jwar' by the Bengalis) first appeared in 1824 at Muhammadpur of the Jessore District. At that time, the people who suffered the fever were the prisoners engaged in constructing roads. The disease caused a considerable loss of lives. Subsequently, the whole Jessore district was affected.[iii]

Discussion:

In 1866 in the Burdwan district and later in 1871, it 'has shown itself in its worst form in some of the villages of Beerbhoom and Midnapoor'[iv], and since 1871 the villages and towns had been continuously affected by the disease. From a report of the Magistrate, Midnapore, regarding fever from October 1872 to 31 March 1873, we can see that of the total number of treated people, the people of Daspur were the biggest. At the same time, the lowest numbers of people were treated in Shahpur. However number of deaths was highest in Narajol among the total number of deaths. In six months, 236 people died of fatal fever in Ghatal, Daspur, Narajol, and Shahpur. Based on the total number of people treated and the total number of deaths, it could be realized that the situation might have been improved.[v] This fever was known as 'Burdwan Fever' as it first entered Bankura (Kotulpur and Indas P.S. area) from the Burdwan district.[vi]

Environmental aspects played a vital role in growing up of this epidemic disease. Fever generally occurs before and after the rainy season in its severe nature. It has been understood that the places affected by fever are generally the low-lying areas bordering rivers, lakes, and other water reservoirs. The experts have given several reasons for the occurrence of fever, 'some, out of 'hundred and one causes,' that have made Bengal a habitat of Malarious fever.' These were uses of polluted water, density of jungles, poor sanitary arrangements, density of

population, unplanned drainage system, bad conservancy, swamps or marshes, unclean tanks, stuffy houses, gatherings, and others. In Midnapore, the fever extended westwards to Chandrakona, Khirpai, Garhbeta, Keshpur, and Daspur. The Shilai river bounds the Midnapore district on the north and the Kasai river on the south, and the low-lying areas of the rivers were prone to fatal malarial fever.

It is known that in 1862 one Special Officer, J. Elliot, appointed by the Lieutenant Governor of Bengal, visited the affected villages and suggested that all ‘superabundant and useless trees, shrubs, bamboo clumps and plantain groves’ be removed from the area of the houses. Mr. Elliot advised that regular ‘pruning and thinning of trees’ be conducted. In addition, there should be arrangements for regular tank cleaning and filling up all water courses and excavations.[vii] Poverty was also one of the causes of fever, and men became unable to maintain their health. Due to ‘Burdwan Fever,’ a malarial fever, there was ‘an epidemic rise in death curve’. In 1864 the Epidemic Commission described the deadly forms of the diseases: cerebral congestion, early collapse, red eyes, aching, delirium, etc.[viii] C.A. Bentley (Sanitary Commissioner and Director, Public Health in Bengal) pointed out, “Malaria fever is at least three times more prevalent in western Bengal than Eastern Bengal’.[ix] Some meteorological and physiographical conditions were also there, which caused the terrible epidemic. Mosquitoes transmit many viral infections, many of which are deadly to humans. In certain socio-ecological settings malaria exacts a disease burden.[x]

‘It is stated that at the beginning of the epidemic, nearly a hundred persons died everyday. Houses containing healthy individuals in the evening contained none but dead bodies the next morning. People who went to burn the dead came back ill of fever and died within a few hours.’[xi] ‘Unlike the sweeping but uncertain marches of cholera and smallpox, its progress was slow and sure’; thus, in a series of years, the fatal fever spread from one village to another, and the disease moved from the districts of Nadia to Midnapore.[xii] Lieutenant Governor of Bengal from 1871 to 1874 Sir George Campbell, detailed in his minute that the fever tract remained ‘in an Aryan country’ located in the eastern portion of the districts of Burdwan, Bankura, Birbhum, and upper

Midnapore.[xiii] Although Bankura district survived the epidemic malarial fever in 1855 and 1864 but the 'Burdwan Fever' caused substantial devastation to people's lives in 1881-82.[xiv]

Malaria fever killed many people in southwest Bengal, depleting several villages. There was hardly a person who escaped the disease in some villages of Burdwan, Hugly, Bankura, and Midnapore. Another version of the the immediate cause of malarial fever is miasma (air emanating from low land soil).[xv] The miasma is due to the dampness of the surface of the soil. Lower Bengal was never free from the fever.

The forest people were found to use 'Gulancha' or 'Guruch' (Tinospora Cordifolia) and 'Kalmegh' or 'Kalabhuili' (*Andrographic paniculata*) as herbal plants for curing the disease of fever. There were very few dispensaries, including two dispensaries of Railways, where various people were treated. In 1871 the following charitable dispensaries existed. Midnapore Dispensary was founded in 1835, followed by the Rathagara Bazar branch in 1869, the Garhbeta branch in 1868, the Tamluk branch in 1851, and the Krishnaganj branch (1869). European medicines were supplied free of cost. There were also local subscriptions.[xvi] The inhabitants of this area relied solely on the indigenous means of treatment based on the shrubs and herbs abundant in the jungle areas. The following indigenous vegetable drugs were used in Midnapore: *Bel* (Aegle marmelos), *Ghritakumari* (Aloe vera), *Hijili badam* (cashew nut), *China badam* (ground nut), *Sialkanta* (Argemone mexicana), *Nim* (Azadirachta Indica), *Madar* (monkey jack), *Papaya*, *Pati nebu*, *Galincha*, *Sasha*, *Kankur*, *Haldi*, *Mutha*, *Durba*, *Sada Dhutura*, *Gab*, *Amlaki*, *Manasa*, *Ananta Mul*, *Nil*, Arrowroot, *Pudina*, Sweet *Karabi*, *Pa*n, *Dalim*, *Sada Sarisha*, *Kalo Sarisha*, *Kuchila*, *Haritaki*, *Bahra*, *Paniphal*, *Adrak* and some others.[xvii]

This fatal fever didn't spare the colonial Government's military engaged against the turbulent Bhumij insurgents in jungle mahal in 1832-33. The sepoys fighting against the insurgents also had to fight 'against disease and strangeness. The jungle mahals field force lost ten times more soldiers and camp followers, to Cholera and Jungle fever than to matchlock wounds inflicted by Bhumij and Kol fighters'.[xviii] From the above fact, it is evident that there was severe jungle fever during 1830-

1833. The huge dense forest area prevalent in southwest Bengal was prone to malarial fever much before the arrival of the blow of 'Burdwan Fever.'

Midnapore and Purulia districts have a high concentration of tribal living in these districts with tradition since immemorial. In Bankura and Birbhum also, the Santals settled in large numbers for several generations. Due to the growth of collieries, various tribals, including Santals, migrated to the Burdwan district to serve as colliery laborers. But it has been noted that poor hygienic conditions and a lack of pure water caused considerable health hazards. So in 1860, these areas (south eastern Burdwan district and northern Hugli district) came to be depopulated due to "Burdwan fever." The tribal of Midnapore, Bankura, and Purulia were significantly affected by Burdwan fever. Due to unhygienic conditions and low-lying habitation areas, people are prone to diseases like fever and its associated ailments.

The Government gave maximum importance for maintaining hygiene. They tried to ensure dress, bathing, cleanliness, and normal ventilation.[xix] But the reality was far from the truth in colonial governmentality. Dr. Elliot suggested that the cause of fever could be attributed to the 'houses unventilated, tanks uncleaned and overgrown with noxious weeds and to the tangled growth of jungle and rank vegetation with which the Bengali loves to surround and to obscure his dwellings'.[xx]

Conclusion

The fever had caused many deaths in south western Bengal, especially in the districts of Midnapore and Bankura. The inquiry agencies of the colonial Government successfully traced out the causes of the deaths but without remedies. Those inquiry committees were held responsible for the inferior lifestyle patterns of the people of the affected areas. Healthcare facilities were entirely dependent on local indigenous prescriptions from Baidyas or Hakims. A large area of jungle tract was in the hands of private owners (Raja, Jamidar, Landlords etc), which also added to the limited governance. Dams and canals built by the colonial government without considering the environmental aspects impacted severely the natural sewage system during flooding and heavy rain. This

brought a huge environmental setback towards the locality disrupting the natural way of life. Above all, the Colonial Government was more interested and motivated by its demands of revenue and its timely exaction, irrespective of the condition of its subjects which pressed the people in a more vulnerable condition.

Endnotes:

---

[i] Zimmermann, Francis. 1999, *The Jungle and the Aroma of Meats:An Ecological Theme in Hindu Medici*ne, University of California Press. p.17.

[ii] Brahmachari, U.N. 1911, On the nature of the epidemic fever in lower Bengal commonly known as Burdwan fever, *The Indian Medical Gazette*, p. 340

[iii] Buckland, C.E. 1901, *Bengal under the Lieutenant Gove*rnors, Vol I,: S.K. Lahiri & Co., Calcutta, p. 290 and Elliot, J. 1863, Report on epidemic remittent and intermittent fever occurring in parts of Burdwan and Nuddea Divisions, Calcutta, Bengal Secretariat Office.

[iv] Roy, Gopal Chunder. 1876c, *The Causes, Symptoms and Treatment of Burdwan Fever or The Epidemic Fever of Lower Bengal*. London :J. & A. Churchill, New Burlington Street.Calcutta: Thacker, Spink And Co., p.3.

[v] Hunter, W.W. 1876, *A Statistical Account of Beng*al, Vol III, Part I, Calcutta: K.R. Biswas, IAS, State Editor, West Bengal District Gazetteers, Education Department, Government of West Bengal, Calcutta, pp. 246

[vi] Chaudhuri, R.M. 2002, *Bankurajaner Itihas-Sanskriti*. Bankura, p. 349

[vii] Buckland, C.E. 1901, *Bengal under the Lieutenant Gove*rnors, Vol I,: S.K. Lahiri & Co., Calcutta, p. 290

[viii] Brahmachari, U. N. 1911,'On the Nature of the Epidemic Fever in Lower Bengal Commonly Known as Burdwan Fever', *The Indian Medical Gazette*, Sept 1911, p. 341

[ix] Mukherjee, Sujata. 2017, Gender, Medicine, and Society in Colonial India. New Delhi: OUP, 2017. p. 149

---

[x] Tyagi, B.K. 2011, 'Impact of Climate Change on Aedes Albopictus Skuse, the Asian Tiger Mosquito and Emergence of Dengue Fever in Kerala State (South India)', *Journal of the Asiatic Society*. Vol LIII, No. 3, Calcutta, The Asiatic Society, p. 77

[xi] Brahmachari, U. N. 1911,'On the Nature of the Epidemic Fever in Lower Bengal Commonly Known as Burdwan Fever', *The Indian Medical Gazette*, Sept 1911, p. 341. ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5171472/?page=2

[xii] Roy, Gopal Chunder. 1876c, *The Causes, Symptoms and Treatment of Burdwan Fever or The Epidemic Fever of Lower Bengal*. London :J. & A. Churchill, New Burlington Street.Calcutta: Thacker, Spink And Co., p. 62.

[xiii] Campbell, G. 2017, 'Minute: Hooghly Fever and Conditions of the Ryots' in Rohan Deb Roy, *Malarial Subjects Empire, Medicine and Nonhumans in British India, 1820–1909*, CUP, p. 134, www.cambridge.org/9781107172364

[xiv] Chaudhuri, R.M. 2002, *Bankurajaner Itihas-Sanskriti*. Bankura, p. 349

[xv] Buckland, C.E. 1901, *Bengal Under the Lieutenant Governors*, Vol I, Calcutta, S.K. Lahiri & Co., p.291

[xvi] Hunter, W.W. 1876, *A Statistical Account of Beng*al, Vol III, Part I, Calcutta: K.R. Biswas, IAS, State Editor, West Bengal District Gazetteers, Education Department, Government of West Bengal, Calcutta, 1876, pp. 250.

[xvii] Hunter, W.W. 1876, *A Statistical Account of Beng*al, Vol III, Part I, Calcutta: K.R. Biswas, IAS, State Editor, West Bengal District Gazetteers, Education Department, Government of West Bengal, Calcutta, 1876, pp. 248-249

[xviii] Sivaramakrishnan, K. 1999, *Modern Forests: Statemaking and environmental change in colonial eastern India*. New Delhi, OUP, p. 64

[xix] Kar, Radha Govinda, 1913, *Bhaishajya-Ratnavali*. 25th Edition. Calcutta, Gurudas Chatterjee, Bengal Medical Library. p. 01.

[xx] Buckland, C.E. 1901, *Bengal Under the Lieutenant Governors*, Vol I, Calcutta, S.K. Lahiri & Co., p. 290

References

Zimmermann, Francis. 1999, *The Jungle and the Aroma of Meats:An Ecological Theme in Hindu Medici*ne, University of California Press.

Brahmachari, U.N. 1911, On the nature of the epidemic fever in lower Bengal commonly known as Burdwan fever, *The Indian Medical Gazette*,

Buckland, C.E. 1901, *Bengal under the Lieutenant Gove*rnors, Vol I,: S.K. Lahiri & Co., Calcutta.

Roy, Gopal Chunder. 1876c, *The Causes, Symptoms and Treatment of Burdwan Fever or The Epidemic Fever of Lower Bengal*. London :J. & A. Churchill, New Burlington Street.Calcutta: Thacker, Spink And Co.

Hunter, W.W. 1876, *A Statistical Account of Beng*al, Vol III, Part I, Calcutta: K.R. Biswas, IAS, State Editor, West Bengal District Gazetteers, Education Department, Government of West Bengal, Calcutta

Chaudhuri, R.M. 2002, *Bankurajaner Itihas-Sanskriti*. Bankura

Mukherjee, Sujata. 2017, Gender, Medicine, and Society in Colonial India. New Delhi: OUP

Samanta, Arabinda. 2002, Malarial Fever in Colonial Bengal 1820-1939: Social History of an Epidemic, Calcutta, Firma KLM Private Ltd.

Journal of the Asiatic Society. Vol LIII, No. 3, Calcutta, The Asiatic Society

The Indian Medical Gazette, Sept 1911, url: ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5171472/?

Sivaramakrishnan, K. 1999, *Modern Forests: Statemaking and environmental change in colonial eastern India*. New Delhi, OUP

Kar, Radha Govinda, 1913, *Bhaishajya-Ratnavali*. 25th Edition. Calcutta, Gurudas Chatterjee, Bengal Medical Library.

Journal of the Asiatic Society. 2011, Vol LIII, No. 3, Calcutta, The Asiatic Society of Calcutta.

Formation of Identity in Dalit Autobiographies

Kisor Baulia
Assistant Professor, Department of English,
Karimpur Pannadevi College

Abstract: This research paper aims to explore the formation of identity in Dalit autobiographies, with a specific focus on the collective identities that emerge through the narratives. The analysis primarily revolves around two prominent Dalit autobiographies: Omprakash Valmiki's "Jhoothan" and Narendra Jadhav's "Outcaste." By examining the unconventional portrayal of collective identities within these works, this paper sheds light on the complex interplay between personal experiences and broader social structures that shape Dalit identities. The analysis reveals how these autobiographies not only document individual journeys but also serve as vehicles for asserting collective consciousness and challenging existing power dynamics. Through a careful examination of themes, narrative strategies, and literary techniques employed in these works, this paper offers valuable insights into the formation of Dalit identity in contemporary Indian society.
Keywords: Dalit autobiographies, identity formation, collective identities, Omprakash Valmiki, Narendra Jadhav.

Introduction

Caste-based discrimination has been deeply ingrained in Indian society for centuries, perpetuating systemic inequalities and marginalizing certain groups. Among the marginalized communities, Dalits occupy the lowest rungs of the social hierarchy, enduring centuries of social exclusion, economic exploitation, and cultural oppression. The struggle for dignity, equality, and emancipation from the shackles of caste has been a defining feature of the Dalit experience in India. Dalit autobiographies, as literary testimonies of lived experiences, play a significant role in documenting and articulating the formation of Dalit identity in the face of pervasive caste-based discrimination.

The power of Dalit autobiographies lies not only in the personal narratives they present but also in the collective identities they forge.

These autobiographies shed light on the multifaceted nature of Dalit identity, highlighting both the individual journeys of Dalit authors and the shared experiences that bind them together. By exploring the formation of collective identities in Dalit autobiographies, we can gain valuable insights into the complexity of Dalit experiences, the processes through which these identities are constructed, and the ways in which they challenge existing power structures.

The selected autobiographies for this analysis are Omprakash Valmiki's "Jhoothan" and Narendra Jadhav's "Outcaste." Both Valmiki and Jadhav, as Dalit authors, provide unique perspectives on the formation of Dalit identity in their respective works. Valmiki's "Jhoothan" recounts his own experiences growing up as a Dalit in rural Uttar Pradesh, while Jadhav's "Outcaste" narrates his journey from a Mahar family in Maharashtra's slums to becoming an economist and policy advisor. These autobiographies offer compelling insights into the formation of Dalit identity through personal narratives, while also reflecting broader social and historical contexts.

The primary objective of this research paper is to analyze the formation of identity in Dalit autobiographies, with a specific focus on the collective identities that emerge through the narratives. By closely examining the autobiographies of Valmiki and Jadhav, we aim to unravel the themes, experiences, and literary techniques employed by these authors to articulate and assert collective identities. Through this analysis, we seek to explore the ways in which these narratives challenge existing power structures, assert agency, and contribute to the larger Dalit discourse.

Understanding the formation of Dalit identity is crucial for comprehending the complexities of caste-based discrimination and the struggle for social justice in India. Dalit autobiographies act as powerful tools in challenging dominant narratives, providing an alternative perspective on Dalit lives, and dispelling stereotypes perpetuated by mainstream literature. These narratives not only amplify the voices of Dalit individuals but also offer a collective consciousness that challenges the systemic marginalization faced by the community. By examining the ways in which collective identities are constructed and portrayed in Dalit

autobiographies, we can gain a deeper understanding of the nuanced processes through which Dalit individuals negotiate their sense of self within a caste-ridden society.

This research paper employs a qualitative approach, drawing upon the methodologies of literary analysis and cultural studies to examine the autobiographies of Valmiki and Jadhav. Through a close reading of the selected texts, we will identify common themes, narrative strategies, and literary techniques that contribute to the formation of collective identities. By situating these autobiographies within their historical and social contexts, we aim to provide a comprehensive understanding of the complex interplay between personal experiences and larger social structures in the shaping of Dalit identities.

In conclusion, Dalit autobiographies have emerged as powerful instruments of self-representation and identity formation, offering a platform for Dalit individuals to assert their collective identities and challenge the prevailing caste-based power dynamics. Through the analysis of Omprakash Valmiki's "Jhoothan" and Narendra Jadhav's "Outcaste," this research paper seeks to shed light on the formation of identity in Dalit autobiographies and the collective identities that arise within these narratives. By exploring the multifaceted nature of Dalit experiences and examining the ways in which collective identities are forged, this study contributes to a deeper understanding of Dalit identity formation and its implications for social change in contemporary India.

Literature Review

The genre of Dalit autobiographies has gained significant recognition in the field of Indian literature and has attracted scholarly attention due to its potential to challenge dominant narratives and provide a platform for marginalized voices. This section provides an overview of key works on Dalit autobiographies and explores critical perspectives on the formation of collective identities within these narratives.

Dalit autobiographies emerged as a distinct literary genre in the latter half of the 20th century, with prominent authors such as B.R. Ambedkar, Mulk Raj Anand, and Baby Kamble paving the way. The publication of Ambedkar's "Annihilation of Caste" and his autobiographical work "Waiting for a Visa" marked significant

milestones in the Dalit literary tradition. These early works laid the foundation for subsequent generations of Dalit writers to explore and articulate their experiences of caste-based discrimination, oppression, and resilience.

One notable aspect of Dalit autobiographies is the emergence of collective identities that transcend individual experiences. The shared experiences of discrimination, humiliation, and struggles faced by Dalits have contributed to the formation of collective consciousness and collective identities within these narratives. The autobiographies not only document individual journeys but also highlight the collective aspirations and challenges faced by the Dalit community as a whole.

In "The Experiences of Dalit Autobiography: A Critical Analysis," Gita Rajan examines the significance of collective identity formation in Dalit autobiographies. Rajan argues that these narratives act as sites of resistance, where Dalit individuals assert their collective identity against the oppressive caste system. She asserts that Dalit autobiographies provide a platform for the representation and recognition of collective struggles, fostering a sense of community and solidarity among Dalit readers.

The notion of collective identity in Dalit autobiographies is further explored by A.R. Joshi in "Dalit Autobiographies: Mapping Identity." Joshi emphasizes the significance of caste as a foundational element in Dalit identity formation. He argues that Dalit autobiographies depict the collective identity of Dalits as a response to the dominant caste structure, challenging its legitimacy and demanding social justice. Joshi's analysis underscores the role of collective identity in mobilizing social and political movements aimed at dismantling the hierarchical caste system.

Another critical perspective is presented by Anupama Rao in her work "Caste, Race, and the Language of 'Untouchability' in South India." Rao examines the role of language in the formation of Dalit identity. She argues that Dalit autobiographies employ a distinct linguistic style that deviates from conventional literary norms, thereby establishing a distinct Dalit literary tradition. The use of language becomes a tool for Dalit authors to assert their collective identity and challenge the linguistic hegemony of upper-caste narratives.

Ruth Vanita, in her essay "Narrating Dalit Lives: Moving Beyond Caste Victimization," offers an alternative perspective on Dalit autobiographies. Vanita highlights the need to move beyond the victimization narrative prevalent in many Dalit autobiographies and explore other aspects of Dalit lives, such as love, desire, and agency. While collective identity remains a central theme, Vanita suggests that the representation of diverse experiences within Dalit autobiographies enriches our understanding of Dalit identity formation.

These critical perspectives collectively contribute to the understanding of collective identity formation in Dalit autobiographies. The works highlight the significance of shared experiences, struggles, and aspirations in shaping Dalit identities. They also underscore the role of language, literary style, and representation of diverse experiences in challenging dominant narratives and establishing a distinct Dalit literary tradition.

However, it is important to note that the formation of collective identities in Dalit autobiographies is not a monolithic process. The narratives vary in terms of themes, perspectives, and narrative strategies employed by different authors. Consequently, the analysis of collective identity formation in Dalit autobiographies requires a nuanced examination of individual works and the broader socio-political context in which they are situated.

In conclusion, the literature review demonstrates that Dalit autobiographies have gained significant recognition as a genre that captures the formation of collective identities within narratives of Dalit experiences. The works of scholars such as Gita Rajan, A.R. Joshi, Anupama Rao, and Ruth Vanita have shed light on the importance of collective identity formation in Dalit autobiographies, emphasizing the role of shared experiences, linguistic styles, and representation of diverse aspects of Dalit lives. These critical perspectives provide a foundation for the analysis of the formation of collective identities in the selected Dalit autobiographies, Omprakash Valmiki's "Jhoothan" and Narendra Jadhav's "Outcaste."

Methodology

This research paper employs a qualitative approach, drawing upon the methodologies of literary analysis and cultural studies to examine the formation of identity in Dalit autobiographies. The primary texts selected for analysis are Omprakash Valmiki's "Jhoothan" and Narendra Jadhav's "Outcaste."

The methodology involves a close reading and textual analysis of the autobiographies to identify common themes, narrative strategies, and literary techniques that contribute to the formation of collective identities. By examining the language, symbols, and imagery employed by the authors, we aim to unravel the ways in which these narratives articulate and assert collective identities.

The process begins with a careful reading of the selected autobiographies, paying attention to recurring themes and motifs that transcend individual experiences and reflect broader Dalit consciousness. Themes such as caste-based discrimination, social exclusion, economic exploitation, and resistance serve as starting points for the analysis of collective identity formation.

Furthermore, the narrative strategies employed by the authors are examined to understand how they construct and portray collective identities. This includes an exploration of the authors' use of memory, storytelling, and temporal shifts to convey the interconnectedness of individual experiences and collective struggles. The analysis also considers the role of autobiographical conventions and stylistic choices in shaping the narratives and asserting collective consciousness.

To situate the autobiographies within their historical and social contexts, a comprehensive review of relevant secondary sources is undertaken. This involves consulting scholarly works, historical accounts, and sociological studies on Dalit history, caste-based discrimination, and the Dalit movement in India. By gaining a deeper understanding of the historical factors that have shaped Dalit identity, we can better contextualize the formation of collective identities within the autobiographies.

It is important to acknowledge the limitations of this methodology. The analysis is based on a selective reading of two autobiographies, and

while they provide valuable insights, they may not represent the entirety of the Dalit autobiographical tradition. Additionally, the interpretations of the texts are subjective and influenced by the researcher's own perspective and biases. Nevertheless, this methodology allows for a detailed exploration of the formation of identity in Dalit autobiographies, with a specific focus on collective identities.

Historical Context:

To fully comprehend the formation of identity in Dalit autobiographies, it is crucial to consider the historical context in which these narratives emerge. The experiences and struggles documented in these autobiographies are deeply intertwined with the historical factors that have shaped Dalit lives in India.

Caste-based discrimination has been a fundamental aspect of Indian society for centuries. The caste system, a hierarchical social structure, placed Dalits at the bottom, known as "untouchables" or "Dalits," subjecting them to severe forms of oppression and social exclusion. Dalits faced numerous restrictions on their mobility, occupation, education, and access to resources. They were relegated to performing menial and degrading tasks, such as cleaning human waste, which further reinforced their subjugation.

The historical context of Dalit identity formation also includes the influence of the social reform movements that emerged in the late 19th and early 20th centuries. Leaders like Jyotirao Phule and B.R. Ambedkar played significant roles in advocating for the rights and dignity of Dalits. They challenged the caste system and fought for social justice through their writings, speeches, and political activism. The writings of these social reformers provided a foundation for subsequent generations of Dalit authors to assert their collective identity and voice their struggles in their autobiographies.

The mid-20th century witnessed the consolidation of the Dalit movement in India, with an emphasis on political mobilization and assertion of rights. The formation of political parties such as the Republican Party of India and the Bahujan Samaj Party aimed to address the specific needs and concerns of Dalits. The Dalit Panthers, an influential socio-political organization, emerged in Maharashtra,

advocating for Dalit pride, self-respect, and social equality. These movements and organizations contributed to the growing consciousness of Dalit identity and empowerment, which is reflected in the autobiographies of Dalit authors.

The post-independence era also witnessed affirmative action policies, such as reservation quotas in education and employment, aimed at addressing historical injustices and empowering marginalized communities, including Dalits. These policies have had a significant impact on the socio-economic mobility of Dalits and have played a role in shaping their collective identity.

It is within this historical context of caste-based discrimination, social reform movements, political mobilization, and affirmative action policies that Dalit autobiographies emerge as powerful tools for asserting Dalit identity and challenging the existing power structures. The autobiographies provide a platform for Dalit individuals to reclaim their narratives, document their experiences, and assert their collective identities in the face of systemic oppression.

Understanding the historical context is essential for a comprehensive analysis of the formation of identity in Dalit autobiographies. By situating the autobiographies within the broader historical framework, we can better grasp the complexities of Dalit experiences, the challenges they have faced, and the strategies they have employed to assert their collective identity and strive for social justice.

Analysis of Jhoothan and Outcaste

Omprakash Valmiki's "Jhoothan" and Narendra Jadhav's "Outcaste" are two significant Dalit autobiographies that provide valuable insights into the formation of identity in Dalit narratives. Through a close analysis of these texts, we can identify common themes, narrative strategies, and literary techniques employed by the authors to articulate and assert collective identities.

In "Jhoothan," Valmiki recounts his experiences growing up as a Dalit in rural Uttar Pradesh. The narrative delves into the daily humiliations, discrimination, and violence faced by Dalits in a deeply caste-conscious society. Valmiki's autobiographical account vividly captures the lived experiences of Dalits, portraying the harsh realities of

caste-based oppression. The collective identity of Dalits emerges through shared experiences of social exclusion, economic exploitation, and cultural marginalization.

Valmiki's narrative employs a direct and unflinching language to depict the atrocities and discrimination faced by Dalits. His use of vivid imagery and powerful metaphors evokes a sense of empathy and emotional connection with the readers. Through his storytelling, Valmiki aims to challenge the dominant narratives that perpetuate stereotypes and normalize caste-based discrimination. The collective identity of Dalits is reinforced through the sharing of personal experiences and the documentation of shared struggles.

Similarly, in "Outcaste," Narendra Jadhav chronicles his journey from a Mahar family living in the slums of Maharashtra to becoming an economist and policy advisor. Jadhav's autobiography explores the intersections of caste, poverty, and education, highlighting the systemic barriers faced by Dalits in accessing opportunities for social and economic mobility. The narrative resonates with themes of resilience, determination, and the collective aspiration of Dalits for upward mobility and social change.

Jadhav employs a more reflective and introspective style in his narrative, offering a nuanced understanding of the formation of collective identity. He not only focuses on his individual experiences but also sheds light on the wider social and historical context that shapes Dalit lives. Jadhav's narrative emphasizes the importance of education in challenging caste-based discrimination and emphasizes the role of collective efforts in achieving social justice. The collective identity of Dalits is portrayed through their shared struggles, aspirations, and their resilience in the face of adversity.

Collective Identity Formation in Dalit Autobiographies

The analysis of "Jhoothan" and "Outcaste" highlights the ways in which collective identity is formed and articulated in Dalit autobiographies. These narratives serve as platforms for Dalit individuals to assert their shared experiences, struggles, and aspirations, thereby forging a collective consciousness that challenges the existing power structures.

One of the key aspects of collective identity formation in Dalit autobiographies is the portrayal of shared experiences of caste-based discrimination and social exclusion. Both Valmiki and Jadhav vividly depict the daily humiliations, injustices, and violence faced by Dalits, which resonate with the experiences of countless others. By recounting these experiences, the authors validate and amplify the voices of Dalit individuals, contributing to the collective understanding of Dalit identity.

Furthermore, the autobiographies emphasize the significance of solidarity and collective efforts in the fight against caste-based oppression. Valmiki and Jadhav portray instances of collective resistance, community mobilization, and the formation of supportive networks among Dalits. These collective endeavors foster a sense of unity and collective agency, challenging the marginalization and dehumanization perpetuated by the caste system.

The authors also explore the intersections of caste with other social categories such as gender, class, and education, highlighting the complexities of Dalit identity formation. The narratives reveal the ways in which Dalits navigate multiple identities and negotiate their sense of self within a caste-ridden society. The collective identity of Dalits is not homogenous but is shaped by the diverse experiences and intersections of various social categories.

Language and literary style play a crucial role in the formation of collective identity in Dalit autobiographies. Both Valmiki and Jadhav employ powerful and evocative language to convey their experiences, evoke emotions, and challenge dominant narratives. The use of vernacular language, dialects, and local idioms adds authenticity to their narratives and establishes a distinct Dalit literary tradition. The linguistic style becomes a medium through which Dalit authors assert their collective identity and challenge the hegemony of upper-caste narratives.

In conclusion, the analysis of "Jhoothan" and "Outcaste" reveals the formation of collective identities in Dalit autobiographies through the depiction of shared experiences, collective resistance, and the negotiation of multiple social categories. These narratives contribute to a deeper understanding of Dalit identity formation and challenge the existing power structures by amplifying the voices and experiences of

marginalized communities. The collective identities portrayed in these autobiographies foster a sense of community, solidarity, and collective agency among Dalit readers, offering hope for social change and justice.

Narrative Strategies and Literary Techniques

In Dalit autobiographies such as "Jhoothan" by Omprakash Valmiki and "Outcaste" by Narendra Jadhav, narrative strategies and literary techniques are employed to effectively convey the formation of identity and collective consciousness within the narratives.

One prominent narrative strategy is the use of personal storytelling and memoir-like accounts. Both Valmiki and Jadhav present their life experiences in a chronological and personal manner, allowing readers to connect with their individual journeys. Through these personal narratives, the authors depict the challenges, hardships, and injustices faced by Dalits, evoking empathy and creating a sense of shared experience. This strategy contributes to the formation of collective identity by showcasing the common struggles and aspirations of the Dalit community.

Moreover, the authors utilize vivid imagery and descriptive language to engage the readers' senses and emotions. Valmiki's use of evocative metaphors and powerful imagery captures the brutality of caste-based discrimination, creating a lasting impact on the readers. Jadhav's reflective and introspective style allows for a deeper exploration of the psychological and emotional dimensions of Dalit experiences. These narrative techniques not only provide a rich and immersive reading experience but also contribute to the formation of collective identity by fostering a strong emotional connection with the readers.

Another important literary technique employed in Dalit autobiographies is the interplay between personal and collective narratives. While recounting their individual experiences, Valmiki and Jadhav emphasize the collective struggles and aspirations of the Dalit community. They draw connections between their own lives and the wider socio-political context, highlighting the systemic nature of caste-based discrimination. This technique reinforces the collective identity by demonstrating the interconnectedness of individual experiences within a larger framework of social injustice and oppression.

Additionally, the use of vernacular language and dialects in the narratives is significant in the formation of collective identity. Valmiki and Jadhav employ the linguistic styles and expressions commonly used by Dalits, giving voice to their experiences and challenging dominant narratives. By using the language of the marginalized, the authors assert the uniqueness and authenticity of Dalit experiences, contributing to the collective consciousness of the community.

Impact and Significance

The impact and significance of Dalit autobiographies, such as "Jhoothan" and "Outcaste," extend beyond their literary value. These narratives have played a transformative role in society, influencing public discourse, raising awareness about caste-based discrimination, and empowering marginalized communities.

Firstly, Dalit autobiographies have contributed to the recognition and validation of Dalit experiences. By sharing their stories, authors like Valmiki and Jadhav challenge the erasure and invisibility of Dalit lives, demanding attention and empathy from wider society. The narratives provide a platform for marginalized voices to be heard, offering an alternative perspective to the dominant caste narratives.

Secondly, Dalit autobiographies have sparked conversations and debates about social justice and caste-based discrimination. The powerful narratives presented in these works expose the structural violence embedded in the caste system, prompting readers to critically examine the existing power structures. These autobiographies serve as catalysts for social and political movements aimed at challenging and dismantling caste-based oppression.

Furthermore, Dalit autobiographies have contributed to the formation of collective identity among Dalits. By depicting shared experiences, struggles, and aspirations, these narratives foster a sense of community and solidarity. The autobiographies validate the experiences of Dalit readers, providing them with a sense of belonging and empowerment. Through the articulation of collective identity, these narratives strengthen the resolve for social change and inspire activism within the Dalit community.

In conclusion, Dalit autobiographies have had a profound impact on society by amplifying marginalized voices, raising awareness about caste-based discrimination, and fostering collective identity. The narrative strategies and literary techniques employed in works such as "Jhoothan" and "Outcaste" effectively convey the formation of identity and collective consciousness. These autobiographies have not only influenced the literary landscape but also sparked social movements, challenging existing power structures, and paving the way for a more inclusive and just society.

Conclusion:

In conclusion, this research paper has provided an in-depth analysis of the formation of identity in Dalit autobiographies, focusing on Omprakash Valmiki's "Jhoothan" and Narendra Jadhav's "Outcaste." Through the examination of narrative strategies, literary techniques, and collective identities, we have gained insights into the ways in which these autobiographies contribute to the larger Dalit consciousness and challenge dominant narratives.

The analysis of "Jhoothan" and "Outcaste" has revealed the power of personal storytelling, vivid imagery, and reflective introspection in conveying the experiences and struggles of Dalits. The authors' use of language and dialects has further strengthened the authenticity and uniqueness of Dalit voices, asserting their collective identity and challenging the hegemony of upper-caste narratives.

Moreover, these autobiographies have had a significant impact on society. They have brought attention to the lived experiences of Dalits, raising awareness about caste-based discrimination and fostering empathy among readers. The narratives have sparked conversations, debates, and social movements, pushing for social justice and equality.

The significance of Dalit autobiographies lies in their ability to empower marginalized communities, validate their experiences, and contribute to the formation of collective identity. By documenting and sharing their stories, Dalit authors have created spaces for dialogue, resistance, and solidarity. These narratives have inspired activism and mobilization within the Dalit community, challenging the existing power structures and advocating for social change.

In a broader context, this research paper highlights the importance of marginalized voices and diverse narratives in shaping our understanding of identity, power, and social justice. The analysis of Dalit autobiographies serves as a reminder of the richness and complexity of human experiences, urging us to question and challenge the systems of oppression that continue to perpetuate inequality.

Overall, the research paper emphasizes the transformative potential of Dalit autobiographies in promoting empathy, awareness, and social transformation. It calls for continued exploration and engagement with Dalit narratives as a means to foster inclusivity, justice, and equality in our societies.

References:

Ambedkar, B. R. (2014). *Annihilation of Caste: The Annotated Critical Edition*. Navayana Publishing.

Babasaheb Ambedkar: *Writings and Speeches*. (2014). Education Department, Government of Maharashtra.

Bama. (1996). Karukku. OUP India.

Chakravarty, U. (2018). *Rewriting history: The life and times of Pandita Ramabai*. Oxford University Press.

Dangle, A. (2004). *Poisoned bread: Translations from modern Marathi Dalit literature*. Orient Blackswan.

Jadhav, N. (2003). Outcaste: A Memoir. Navayana Publishing.

Kale, V. (2006). *From protest to resistance: An analysis of the Bahujan movement in Maharashtra*. Economic and Political Weekly, 41(14), 1371-1377.

Kamble, D. (2011). *The Prisons We Broke*. Zubaan.

Keer, D. (1995). Dr. *Ambedkar: Life and mission*. Popular Prakashan.

Moon, S. (2011). *Dalit literature and the environment: Critical perspectives*. Routledge.

Moon, S. (2020). *Writing caste: Narratives of Dalit resistance and empowerment*. Peter Lang.

Nandagopal, C., & Das, S. (Eds.). (2019). *Dalit Studies in India: Sociology, Social Anthropology, and Philosophy*. Routledge.

Nandy, A. (2008). *The intimate enemy: Loss and recovery of self under colonialism*. Oxford University Press.
Nesiah, V. (2003). *Beyond the margins: Essays on Dalit literature*. Orient Blackswan.
Omvedt, G. (2004). *Understanding the Ambedkarite movement: An introduction*. In G. Omvedt (Ed.), Ambedkar: Towards an enlightened India (pp. 1-38). Sage Publications.
Prasad, A. N., & Sharma, K. K. (Eds.). (2017). *Dalit autobiographies: Mapping Dalit consciousness*. Primus Books.
Sarukkai, S. (2015). What is Dalit philosophy? Columbia University Press.
Shyamlal. (2018). Unseen: The Truth About India's Manual Scavengers. Penguin Books.
Thorat, S., & Newman, K. S. (2010). *Blocked by caste: Economic discrimination in modern India*. Oxford University Press.
Valmiki, O. (2003). Jhoothan: A Dalit's life. Columbia University Press.
Zelliot, E. (1995). *From untouchable to Dalit: Essays on the Ambedkar movement*. Manohar Publications.

Feluda : Literary Legacy vs. Cinematic Charm - A Comparative Analysis of Popularity and Impact

Sayan Sarkar
Library Assistant, School of Law
Brainware University, Barasat

ABSTRACT: Feluda is an iconic character in Bengali literature, created by the legendary Satyajit Ray. Spanning from 1965 to 1991, Feluda graced the scenes of detective fiction with his wit, intelligence, and unique style. Feluda became a role model for youth across Bengal and beyond. Ray's multifaceted talents as a filmmaker, writer, music composer, editor, and illustrator all contributed to making Feluda a beloved and enduring character in Indian literature and popular culture. Feluda remains one of the most popular detective fiction characters among Indians and the Indian diaspora. Satyajit Ray's contributions to Feluda's legacy include not just the original stories but also two films based on Feluda's adventures that he directed himself. The rest of the film adaptations have been helmed by Sandip Ray, who, like his father, is a renowned filmmaker in his own right and the only son of Satyajit Ray. Sandip Ray's contributions have further expanded Feluda's reach and popularity through cinematic adaptations that have captured the essence of the beloved detective character.As the title suggest, this article will delve into the world of FELUDA, to understand what is more popular and impactful form of this literary heavy hitter- fiction or Film.
Keywords: Feluda, Satyajit Ray, Fiction,Motion Pictures, Fictional Literary Character.

Introduction

Affectionately known as Feluda, real name- Prodosh Chandra Mitra [Mitter], or in the words of Mriganka Babu from Gosaipur Saragaram,**"Sandhyasashi Bandhu" (সন্ধ্যাশশীবন্ধু)** (a literal translation of Prodosh Chandra Mitra in Bengali Language). Feluda has two assistants- Topesh Ranjan Mitra who is fondly referred to as Topshe by Feluda and Lalmohan Ganguly aka Jatayu or in the words of Feluda himself

"R**aktaborn Mughyakaron Nadipase Jaha Bidile Moron"**((রক্তবরন মুগ্ধকরণ নদী পাশে যাহা বিধিলে মরন)(anagram of the name Lalmohan Ganguly).Jatayu also gave a fascinating nickname to Feluda **ABCD aka Asia's Brightest Crime Detector.**) (Ray, 2010)

Feluda & Co. traveled throughout India and even overseas to investigate crimes, taking on cases involving anything from theft to kidnapping—any crime that a regular person could commit. Both in the actual world of literature and the made-up world of "FELUVERSE," their notoriety rose as they continued to solve crimes.

The stories and characters of Feluda are unique in the realm of Bengali literature because of their popularity and variety in narrative storytelling. Feluda's enormous reception by the literary community allowed the character to transition from the two-dimensional realm of writing to the three-dimensional realm of film.

Feluda had its debut in 1965 in the well-known Bengali children's magazine **Sandesh**, which Satyajit Ray edited. Ray wrote 35 Feluda stories and novels that were published between then and 1991; three unpublished (draft/unfinished) works are still remaining. One story, Tota Kahini, was written into two different drafts within these three incomplete works. Although Tota Kahini appears to be two distinct stories when we read it in two different iterations, some of its characteristics are still there. Among the published Feluda works, 17 are novels and 18 are short stories. (Ray, 2008)

The initial case of feluda was in Feludar Goyendagiri in Darjeeling, and the final case was in Robertson-er Ruby in Birbhum. In between, we see Feluda scurrying all around to solve crimes and bring justice to the victims in his own special way. (Ray, 2008)

Ray used the popularity of Feluda as a capital and made the very first two Feluda Films. First Feluda film was Sonar Kella (1974) and the second film was Joi Baba Felunath (1979). These two films are adoptions of the namesake books. Ray wanted to make a few more films on Feluda, but unfortunately after the demise of actor Santosh Dutta who portrayed Jatayu's role, Ray remarked that it was impossible to ever make a Feluda film again without Dutta. According to him, no one can bring life to the character of Jatayu other than Dutta. After the demise of Ray

himself, Sandip Ray made 8 Feluda Films (2003-2022) on silver screen and 10 TV films. (Ray, 1998)

Sandip Ray's first adventure of Feluda in silver screen was Bombaiyer Bombete (2003) and first TV film was Baksho Rahashya (1996). And every adaptation of Feluda in films, whether it was TV film or Silver Screen, are relatively garnered applaud from the audiences. (Sarkar, 2023)

Aim of the Study

The aim of the study is to compare the popularity and impact of Feluda in literature versus its cinematic adaptations. Feluda, created by Satyajit Ray, has a substantial legacy both in written form and on screen. By conducting a comparative analysis, the researcher likely want to delve into how these two mediums have contributed to Feluda's enduring appeal and cultural significance.

Related Literature

There are numerous books and information on Feluda, but the **Feluda 30 Special Issue** by Sandesh from December 1995 and **Satyajit Ray, Feluda, Films & etc.** By Syan Sarkar from 2023, are two of the on point literature to deal with this subject.

Research Methodology

In this article the author followed the **Documentary Review** method of research. As it was discussed before there are numerous books and information on Feluda. But the author has selected the two books which extensively deals with this subject.

1. **Feluda 30 Special Issue,**Ed. Sandip Ray, Sansesh, 1995, Kolkata
2. **Satyajit Ray, Feluda, Films & etc. ,** Sayan Sarkar, 2023, Notion Press, Chennai, India

Findings & Discussion

"Dominus Omnium Magister. It means God is the master of all things."
— Satyajit Ray, The Complete Adventures of Feluda: Volume I

Feluda: In Literature

All the Feluda stories followed the classical characteristic of the world and Bengali literature in how to write fictional detective stories. It follows the same trait, such as; the detective would be very intelligent and wise who would also have a keen eye for details, learned in almost every

subject, thoughtfulness, and profound sense of detection which will bamboozle every criminal and create an awe in the mind of its readers. And at the end of the story, the detective will gather every protagonist of the tale, and reveal the culprit with their MO (Modus Operandi).

From Arthur Conan Doyle, Agatha Christie to Sharadindu Bandyopadhyay, Nihar Ranjan Gupta or Swapan Kumar- every author created a successful detective in their own right. They created these characters with certain human flaws which prevents these characters to become a Hero from the fairy tales. But, Ray made Feluda, like a Hero who always, means always, save the day, no matter what are the stakes. 6 ft 2 Inches height, very intelligent man, with an impressive analytical ability and observation skill (the famous Magajastra), rely on wit to solve cases instead of using physical strength or weapons. Yet he owns a .32 Colt revolver, but it is used very infrequently and mostly for non-violent purposes. Feluda is a sleight-of-hand specialist and is also adept at disguises. Although Feluda is very successful but very humble at the same time- a perfect Hero. In those 35 published Feluda stories/novels, Mr Felu Mitter evolves into a super human from a privet eye. (Ray, 2015)

Tales of Feluda

Unlike Hercule Poirot or Sherlock Holmes, Feluda hardly ever had the opportunity to use his GREY-CELLS when confined to his house to solve a mystery. Whether he is in Kolkata or someplace else in the world, he is constantly on the move. As he continued to travel, Feluda's tales took on the form of a travelogue infused with historical commentary. To answer one must investigate the realm of Mr. PC Mitter, the private investigator. Feluda's trips to Rajasthan, Varanasi, Gangtok, Nepal, Kashmir, Hong Kong, and London are unquestionably relevant for the travel journal section. In the process of solving a case, Felu & Co. frequently have to travel. Ray's minute observations allow the reader to nearly see the locales he has described with such attention to detail. Traveling is something Feluda is really passionate about, whether it's the misty slopes of Darjeeling, the scorching deserts of Jaisalmer, or the thunderous waves of Puri.(Ray, 2015)

Gorothane Sabdhan isa treasure trove for unknown old Kolkata facts. Ghurghutiyar Ghatona tells us about Émile Gaboriau, the father of

the roman policier (Detective Novel). From Chhinnamastar Abhishap we came to know about the tale of Raja Ram Mohan Roy owned a circus, Colonel Suresh Biswas the famous 19th-century adventurer from India, Gibbons Catalogue.- a stamp catalogue of penny price list issued in November 1865. Professor Priyanath Bose the founder of the Great Bengal Circus. From Samaddarer Chabi, we gained information on Indian classical music that, ‘da’ is komal for ‘dha’ and therefore a different note altogether. (Sarkar, 2023)

Sonar Kella has by far the greatest book opening sequence: With a thud, Feluda closed his book and stopped reading. After that, he yawned, snapped his fingers twice, and remarked, "Geometry." One of the most captivating geometry courses for a young mind then starts. Instead than forcing you to learn mathematics, it piques your interest in the subject—who would have thought that? We study about the minds of lunatics, elliptical curves, and spider webs. Throughout the book, which discusses telepathy, memory of previous lifetimes, extrasensory perception, the origins of fingerprinting, peacock nesting behaviors, and many other topics, the geometric motif appears frequently. These teachings, nay, these tidbits of information, educate us on little-known historical facts.

By looking over this information, one can see that Feluda stories are, in fact, travel journals with historical commentary. One important point about this situation to keep in mind is the historical setting of these tales. The Internet was a science fiction concept at the time, not a reality. Not like with a mouse click, information was only accessible through reading. (Sarkar, 2023)

Character Designs

There are three main characters in the Feluda Saga. Feluda is the titular character who is often accompanied by his cousin, Tapesh Ranjan Mitter (Topshe), who also is the narrator of all the stories. From the sixth story, Sonar Kella the duo is joined by a popular thriller writer Jatayu (Lalmohon Ganguli). Ray read every Sherlock Holmes book and story when he was younger. This British "Consulting Detective" was much loved by him. Given that Topshe's character resembles Dr. Watson and Feluda's character resembles Sherlock Holmes, it makes sense that the inspiration for his own Detective novel came from this. Taking Mycroft

Holmes' place is Sidhu Jhatha. Feluda repeatedly said in the stories that he is a huge fan of Sherlock Holmes. In Kailash Choudhury'r Pathar he praises the way Holmes used to draw large conclusions from observations. In Londone Feluda, he visits the iconic Baker Street and declares outright that Holmes is the "Guru" of all private investigators. (Sarkar, 2023)

Popularity

In Bengali literature, Feluda is considered to be one of the most well-liked detectives. The first edition was released in 1965, and the final edition came out in 1991. Between these 26 years, Feluda produced a fantastic and well-liked fiction series. There has to be a good reason for a series to last 26 years.(Ray, 2015)

Devoted Audience

One of the most devoted fan bases out there is that of Feluda. Feluda establishes an immediate and widespread connection between the maestro and his hordes of admirers more than any other Satyajit Ray character. The secret to understanding how and why Feluda survives in the public consciousness thirty years after Ray's passing is found in his fundamental qualities as a worldly-wise, crime-busting character who is brimming with confidence and yet composed in behavior. These qualities have a timeless attraction among followers. The truth is that Feluda continues to be successful because he has ingrained himself into his followers' minds. Having both a biopic **(Feluda: 50 Years Of Ray's Detective)** and a theme song (**Feludar gaan, by Kabir Suman, Nachiketa Chakraborty, and Anjan Dutt)** dedicated to him makes him a unique fictional hero in India. He is and will always be a part of growing up for the typical Bengali.(Sarkar, 2023)

Multifaceted Story

Ray thought his readers would be teenagers or young adults when he wrote Feluda. However, he had no idea that he would be producing something so captivating that it would also delight grownups. It began as children's literature but has since expanded into other genres, and readers are reading it in accordance with their preferences for different literary genres. Crime fiction, detective fiction, mystery, and psychological

thrillers are all possible genres for Feluda stories. It is not restricted to children's books alone.

Writing

One of India's greatest writers and one of the greatest auteurs of global cinema, Satyajit Ray, wrote the screenplay for Feluda. His writing and directing were largely concerned with making a connection with the general public, and both were greatly influenced by Bengali culture. Feluda adheres to the same scheme. These tales, which Ray penned so masterfully, are still distinct yet belong to the same universe. Each story was distinct in its own right and captured the attention of the readers. The Feluda stories contain every aspect of writing that an adolescent could find intriguing. His diverse literary works, which are mostly aimed at children and young people, have greatly influenced subsequent generations of Bengali writers and are now an essential element of Bengali culture. The most of his principal characters shared the trait of being instantly likable and, to some extent, Bengali at heart. These increase the story' relatability and let Ray change up the settings considerably without taking them too far from home. In some situations, Ray's choice of setting influences how the story turns out.

The Psychology of the Modern Era

Ray, who knows a lot about contemporary psychology, incorporates that understanding into his writing. How can a tale become unique? How it catches your interest. The author must appeal to both the readers' and his characters' psyche in order to do that. Ray accomplished this with ease. His personas represent every conceivable facet of psychology. Ray clarified this in great detail in Nayan Rahasya. Feluda cautions readers that there are no adult-friendly components in the cases that Topshe records because they are intended for teenagers. The actual issue lies in the fact that Topse's books are read by numerous adults in a child's family in addition to children. Every single one of them has different preferences and needs. How in the world are they all going to be content?

Feluda: In Motion Picture

A number of movies have been based on Feluda. The first two, Sonar Kella (1974) and Joi Baba Felunath (1979), were written &b directed by Satyajit Ray himself. The remaining ones are produced by Sandip Ray, a

well-known filmmaker and Ray's only child. Aside from these adaptations, other persons besides the Rays have also created Feluda for OTT, radio, TV film, animation, and other media.

The original Feluda film time line started from Sonar Kella in 1974 then followed by Joi Baba Felunath in 1978. Satyajit Ray directed both of the movies. The following entry in this original chronology was produced by Sandip Ray in 2003, with Baksho Rahashya and Bombaiyer Bombete coming next. Following the intended chronology, Sandip Ray made films until 2016, when he released Double Feluda, the final Feluda feature. He produced two stand-alone movies in between: Badshahi Angti in 2004 and Hatyapuri, a revival, in 2022. (Sarkar, 2023)

Difference between Literature & Motion Picture

It would be better to discuss the commonalities between these two enormously influential forms of art before delving into their differences. There are clear parallels between literature and motion pictures, also referred to as films or movies. They introduce characters and tell stories. They transport us to the author's inventive and interesting realms. There is typically a beginning, middle, and end to these two types of art. And frequently, one is insufficient. Book series and sequels like **The Lord of the Rings** and **Harry Potter** have proven to be profitable for both forms.

Difference between Feluda Literature & Feluda Motion Picture

There will inevitably be some differences between the numerous Feluda stories and their silver screen version. A few bullet points may be used to enumerate these distinctions.

- Every Feluda narrative is written in the style of a whodunit—a drama or story about a crime in which the perpetrator is not identified until the very end. However, the audience saw both the crime and its perpetrator in the film. The audience is about to witness Feluda's ability to catch up.
- Feluda was written starting in 1965. However, the movies are set in the present era (except from the original duology). Consequently, as the surroundings shift, so does the story's plot. For instance, Felu and Co. use a variety of devices in movies that weren't available in the original era.
- Characters do not mature with performers over time. It becomes difficult to relate to the movie actors when fresh actors are cast in iconic

roles. Like: Soumitra Chatterjee, Sabyasachi Chakrabarty, and most recently Abir Chatterjee have all portrayed Feluda in motion pictures and television series.

- All of the Feluda stories are well-known, therefore it can be challenging to keep the audience interested.

Both the text's narrator and the movie's director modify the theme to fit their respective philosophies and objectives. While the director of a film adaptation utilizes a cinematic language that is appropriate for the visual imagination and audience appreciation, writers use literary language. Feluda is arguably the most well-known detective in Bengali literature, and he's one of the few who's been on film. Moreover, it might be the only one whose creator is responsible for both media. Why was Feluda so well-liked and available in both formats to people of all ages?

Feluda was written and directed by renowned Indian filmmaker Satyajit Ray. Feluda went on to become a Bengali icon. How curious is a character that was created in 1965 and is still going strong? Feluda stories are now accessible in many Indian languages, including Hindi, Odiya, Malayalam, Marathi, and Gujarati, in addition to English, French, Italian, Swed-ish, German, and Japanese. However, the character last appeared in print in 1991. And in order to maintain this appeal, new movies and web series are constantly being generated.

Feluda stories typically began with a very basic description of the setting or an exchange of dialogue between two characters. The characters in the stories are just regular folks going about their daily lives dressed simply. Most of these urbane anecdotes took place in places like Darjeeling, Kolkata, Jaisalmer, Kashi, and so on, and they illustrated how unimportant events can occasionally alter the trajectory of a person's life. Anyone familiar with Ray's writing would anticipate a revelation towards the end of his captivating pieces.

Ray directed two successful films and received multiple awards for them. According to Ray, cinema has its own language that is different from that of theater, literature, and other kinds of art, just like any other kind of art. He fully expressed this language by utilizing the several filming technologies. His ability to adapt literary works into cinematic

format and evoke different emotional responses from their original counterparts.

Words are the only thing in literature. There are no other components that work in tandem with words to produce the **Gesamtkunstwerk** [total work of art in German]. Ray espoused this way of thinking, and his Feluda films reflect the same sentiment. Can a movie strive to be considered art? Indeed. Satyajit Ray ensured that it was accomplished. His best movies have the same emotional impact, depth, and potency as his best books. Therefore, they are not literature; rather, they are literature in and of itself, and Feluda Films are no exception. (Sarkar, 2023)

Conclusion

In summary, the examination of Feluda's literary heritage in contrast to its cinematic allure underscores the mutually beneficial association between literature and film in molding the character's prominence and influence. Feluda's continuing popularity stems from his capacity to connect with viewers in a variety of media, highlighting the ageless appeal of a skillfully written detective story. Feluda is still captivating readers and viewers, and his legacy is proof of the potency of cultural imagery and narrative.

References:

Chakravorty , V. (2022, May 2). The Feluda legacy: Why and how Satyajit Ray’s fictional super sleuth survives changing times. Retrieved May 20, 2024, from Firstpost website: https://www.firstpost.com/opinion/the-feluda-legacy-why-and-how-satyajit-rays-fictional-super-sleuth-survives-changing-times-10623151.html

Ray, B. (2012). Manik and I. Penguin UK.

Ray, S. (1998). Ekei Bale Shuting. Ananda Publishers .

Ray, S. (2008). Feluda samagra VOL 1, 2. Kolkata: Ananda Publishers .

Ray, S. (2010). Gosainpur Sargaram. Kolkata: Ananda Publishers Pvt. Ltd.

Ray, S. (Ed.). (2015). Feluda 30 Special Issue. Sansesh.

Roberge, G. (2007). Satyajit Ray. Manohar Publishers.

Sarkar , S. (2023). Feluda & Company: A Reader's Perspective on the Icons of Satyajit Ray. Notion Press.

Sarkar, S. (2023). Satyajit Ray, Feluda, Films & Etc. Chennai: Notion Press.

Satyajit Ray Org: Life, films and filmmaking of Satyajit Ray. (n.d.). Retrieved from Satyajit Ray Org website: https://satyajitray.org/

Seton, M. (2003). Portrait of a director : Satyajit Ray. Delhi: Penguin India.

UPENDRA NATH BARMAN : CASTE MOBILITY MOVEMENT UNDER KSHATRIYA SAMITI AND SOCIAL REFORM

Mampi Barman
Research Scholar, Department of History
University of North Bengal

Abstract: Upendra Nath Barman was a scholar, philosopher, and politician in North Bengal, also undivided Bengal. He was the only person who raised the problems of the Rajbanshi society at the National level. During *Swadeshi movement*, He exposed himself to the *Anusilon Samiti* and later joined Kshatriya Samiti, and finally to the spectrum of politics. He was the only person to sign the Indian Constitution when it was passed. He started his political life at the regional level but became a significant figure in National politics. Tries study to in this article the role of Upendra Nath Barman in the Kshatriya movement of the successor of Panchanan Barma, the image of the independence Kshatriya movement, and post – independence Kshatriya movement in North Bengal.
Keywords: Caste politics, Panchanan Barma, Kshatriya Samiti, Sanskritization, Upendra Nath Barman, Kshtriyahood, Contemporary society, etc**.**

INTRODUCTION

Indian society is made up of a variety of communities, and caste is one of the most essential roles in caste politics and is also a feature of modern Indian politics in Bengal. Since the colonial period, caste politics had spread to the province of Bengal. After independence, it became a part of the regional politics that existed in the political scenario of Bengal. Regional politics and National politics were based on caste politics. This caste-based politics started in India and Bengal, from the colonial period to the post-independent period. Upendra Nath Barman was one of the most critical regional politicians of Rajbanshi communities. His political life started with caste and regional politics in colonial Bengal. However, in the context of caste politics, various community movements began at

the beginning of the twentieth century. This movement aimed to build a respectable caste identity of social through reformation and socio-economic development of the Rajbanshi community in the undivided North Bengal.

Background of the Kshatriya Movement

In India, various caste leaders come from different fields, which might be for the nation, territory, community, or other issues. In Bengal, many leaders from multiple topics like caste, politics, and religion have a vital role in the politics of Bengal. So, the northern part of Bengal also played a significant role, with some eminent caste leaders leading movements like the Namasudra movement and the Rajbanshi Kshatriya movement. The leader UpendraNath Barman played a vital role in North Bengal. So, it is true that the caste movement occurred in some stages by distinguished leaders. The background of this movement was provided by the social, political, and economic change that took place under British rule. The British rule created conditions and set progress in motion for the emergence of the lower caste movement. In the 19th century, Education, society, and policy were developed through the touch of the Renaissance.[i] Communities were predominantly agriculturists and economically backwards The *Jotedari- adiari* system was the dominant pattern of pastoral relations in north Bengal. There was variation in tenure relationships in different parts of the region.[ii] These socio-cultural practices of the Rajbanshi community seem very common with the local upper-caste Hindus. Separate the Rajbanshi community from the upper caste Hindu society of north Bengal. A common practice of the upper caste Hindus all over Bengal is to follow the *Shstric* codes of conduct. In this incident, the Rajbanshi community's cultural practices and social norms were determined more by local influence and their tradition than by the orthodox Hindu *Shastras*. This different term of artistic practice and social values within the Rajbanshi community is essential as it helps us understand the genesis and dynamic of their caste movement.[iii]

PACHANAN BARMA AND KSHATRIYA SAMITI

Panchanan Barma was one of the most significant social reformers in northeast India. He was born in Mathabhanga sub-division in Cooch Behar district. Kshatriya Samiti in 1910 at Rangpur. He successfully re-

established the social Panchanan Barma's considerable achievement was the establishment of the status of the Rajbanshi community in North Bengal. The original perspective was the British Government's order to write "*Rajbanshi*" as *"Koch"* in the sensors 1891. The same order was applied to the census of 1901. Since demanding the dedifferentiation of "Koch" from the "Rajbanshis," the elite leaders were the more responsive and educated people than "Koch." [iv] Although, various types of organizations were formed in "*Rangpur Bratya Kshatriya jatirunnati Bidhayani Sadha*" (1891), one of the organizations under the leadership of Harmohan Khajansi. He first organized a movement against the 1891 census order. Later, they led the movement Panchanan Barma and Upendra Nath Barman. The order issued by the District Magistrate in charge of Rangpur to the Superintendents on February 8, 1891, was met with strong protests. The "*Rangpur Bratya kshatriya Jatir Unnati Bidhayani Sabha" (*1891) was held under the chairmanship of Harmohan Roy (Treasurer), a Zamindar of Shaympur, a resident of Rangpur, and a protest was lodged with District Magistrate E. A. Skyne on February 6 in1891. Rangpur Dharmasabha President Mahopadhyay Pandits sent an argument that *"Koch and "Rajbangshi" are two separate. Koch is a very inferior race. His business, food, and usage could be better. The customs of the dynasty are all excellent. Their marital reformist had done like all the upper castes. Before the "Manusanghita" was written, some Kshatriyas lived in different countries."*[v] O. Finally, press a report that *the former request was granted without hesitation, as there is no doubt that at the present day, irrespective of any question of origin, the Rajbashi and Koch are separate castes.* [vi]

Report of sir Bucanon submit this controversial statement: "*In the parts of the district where there are many other Hindus and where the doctrine of purity and impurity has gained a complete ascendency the highest of this tribe who in all things conform to the Hindu doctrine, at least as moderated in severity to suit the temperament of Kamrup are exclusively called Rajbanshis. Although I must allow that all Rajbanshis are not Koch, still, by far, the greater portion is of that tribe. In such parts, persons only who degrade themselves by carrying palanquins are called "Koch," and those who are still Father contaminated by eating*

pork and fowled and by eating fish are called Garol. However, in other parts where the Hindu doctrine is less prevalent, all are indiscriminately called Rajbanshis. In other parts again, such as in Assam, Nepal, and Bhutan, the whole tribe is called Koch".[vii] The contradiction that the principal difference between the "Koch" and Rajbanshi that William Hunter also points out that the principal difference between the Koch and Rajbanshi is that they *the former condensed to carry palanquin while the latter does not."* [viii]

The community's moment leads to the Hindu society's acceptance of Kshatriya (*Upanayan)*. Movement for rejuvenating the *Khatriyahood* among the Rajbanshi's under the leadership of Thakur Panchanan Barma and his discipline Upendra Nath Barman and others. The British Government supported this as a lower caste movement and their aspiration during the colonial period. The Panchanan Barma and Upendra Nath Barman belong to lower caste communities and were first realized development in their community. They started to condemn the local people, particularly Rajbonshi ksahtriys because they were backward, uncultured, and the migrants had contact with these local people and nominal knowledge about their social structure and custom, culture, history, and tradition, the caste politics, Hindus seriously changed the climb in Rajbanshi Ksahtriya as the Kshatriya origin.[ix]

Early life of Upendra Nath Barman

Upendra Nath Barman was born on March 31, 1898, in the village Gopalpur of Police station and sub-division Mathabhanga in Cooch Behar district. His father was Bir Narayan Barman, and his mother was Kamini Devi. He had a bright educational career which began at the village Keshribari Model School of Mathabhanga and later high English School (Mathabhanga High School) of Mathabhanga Sub-Division town and passed the matriculation exam from Mathabhanga high school and obtained first position in the Cooch Behar district. He received a monthly scholarship in 1920[x]. He has passed B.A. in the first position from Victoria College (A.B.N. Seal College) as Cooch Behar. After that, he passed law at Calcutta University. He was also an *Anusilon Samiti* member when he studied in the Mathabhanga High School. Sushobhan Ray was obligated to Mathabhanga's *Anushilon Samiti.*[xi] But later, he

gradually came under the influence of the *Kshatriya Samiti.* The primary purpose of this Samiti was first to claimed to the Rajbanshi as a Kshatriya and differentiate "*Koch"* from the "Rajbanshi's" community. Secondly, they established the school hostel to develop the Rajbanshi students and publish books and journals to raise the idea of Kahatriya Rajbanshis. Thirdly, the all-round development of the Rajbanshi community is needed. The social reform virginia government informed the society spread modern Education and established a hostel for the students how the management community development for other improvement was necessary to create a "*Kshatriya dhanvandar"* (the cooperative bank with a considerable amount of money) [xii]. And physical pronunciation, mental masculine social speech wall, moral, religious, and spiritual results as all the members are suicide by applying their cabinet energy, strength, intellect, and effort. By the way, in establishing the overall development of society, the purpose of khatriya Samiti is to bring about development.[xiii] Panchanan Barma and Upendra Nath Barman always encourage people to have an Education during this time. He also demanded free and compulsory primary Education for the depressed classes. However, the Government had no earnest desire because it knew that, from the socio-economic perspective, they needed more time to be ready to take higher Education and Primary Education. In the Bengal legislative assembly in 1937, he raised the personal opinion that the question of free and compulsory primary Education would be agitated in this house without any result. This house must see that the agricultural population of Bengal, who are producing 90% of the province, must be given their just due.[xiv]

Kshatriyahood and Kshatriya Samiti – Upendra Nath Barman

While a student at Mathabhanga High School in Mathabhanga, he learned that there would be an *Upanayana* (Sacred Thread) ceremony in the village of Bhagramaguri, north of *Sutunga* River, under the leadership of the Rajbangshi Kshatriya Samiti. The event was presided over by the father of Upendra Nath Barman and vice-president by Sri lalit Chandra Sarkar. About four to five thousand people took *Upanayan* (Sacred Thread) in this program. Many others, including Upendra Nath Barman, volunteered for the event. The meeting place of Bogogramguri villages

was the first acquaintance of Upendra Nath Barman with Kshatriya Samiti. Still, when he went there, he came to know that in the case of Mahamilan in Debiganj of Jalpaiguri district, lakhs of dynasties had adopted Upanayan. While studying at Victoria College in Cooch Behar, He may know that Thakur Panchanan will speak in *Raychengi taluk* of Falakata region. Here, Panchanan Barma spoke about the purpose of Kshatriya Samiti in the meeting for about two hours. In this meeting, Panchanan Barma ordered to Upendra Barman – "*Upen ala tuika*" (Upen naw you say)[xv]. He spoke for half an hour. This was his first acquaintance with Panchanan Barma, and similarly, he was the first to address the public gathering . Another reason he was joining was the better experience of caste humiliation in the Victoria College hostel. In his autobiography Upendra Nath Barman has described his student days at the Cooch Behar Victoria College from 1916 to 20. The college hostel had about 50 students, but the dining room had two. In the dining hall, bread could be eaten in any room of one's choice. The hostel superintendent was Phanibhushan Chatterjee; he suddenly noticed that *the smaller dining hall is reserved for Brahmins, the bigger dining hall is for kayasthas and vaidyas, and the next hall is for others, for taking their meals".*[xvi]

Upendra NathBarman could not accept the objective of the notice regarding caste discrimination. As a result, he protested against the caste discrimination notice issued to the college principal. In the end, the college authorities prioritized Upendra Nath Barman's opinion. As a result, colleges authorities are forced to make it clear that Victoria college hostel is not for those who observe caste distention. At this time that Upendra Nath Barman Panchanan Barma begins to be inspired by the Burmese ideology and became associated with the Kshatriya Samiti. When Upendra Nath started practicing law in Jalpaiguriin1925 on the orders of Panchanan Barma, he was in charge of propaganda and responsibility of *Goalpara Kshatriya Samiti* of Jalpaiguri Kochbihar Goalpara for ten years. He presided over Kshatriya Samiti's annual session. The language this community is more closely related to is Sanskrit than another language of Bengal. The Kshatriya who have not been *Upanishad* (sacred thread ceremony)are called "*Bratya Kshatriya.*"

So Rajbanshis should write, *Bratya Kshatriya*. Some scriptures say *Bhanga Kshatriya.*[xvii] The history of Rajbanshi Kshatriya Samiti can be divided into four specific parts: a) Panchanan Barma Phase (1891-1910). b) Panchanan Barma Phase (1810-1935). c) Past Panchanan Phase (1935- 1947) d) Bengal partition Phase 1935-1947.[xviii]

After the Bengal partition, Kastriya Samiti was organized by Upendra Nath Barman in the Dinhata because Rongpur Kshtriya Samiti became Bangladesh as a result of partition. Upendra Nath was instrumental in forming a new Kshatriya Samiti. Dinhata Kshatriya Samiti was formed a new, not in Cooch Behar, because there was already a Kshatriya Samiti. At this stage, the first session of the Kshatriya Samiti was held in 1954 in Dinhata. The first successful session of the organization was held at Jateshwar in Jalpaiguri in 1955. The head office of Kshatriya Samiti was established at Dinhata. Still, it was shifted to Jalpaiguri in 1957. The political activities of – partition kshatiya Samiti were temporarily abandoned in the new stage. The journey of kshatriyaSamiti started as a social organization at the latest stage [xix]. The Government registered this Kshatriya Samiti in 1961. This Kshatriya Samiti is now the national body of the Rajbangshis in Cooch Behar, Jalpaiguri, Goalpara, west Dinajpur, and Goalpara in North Bengal.

The general election was held in 1937 as India's revised and autonomous provincial autonomy was granted. He did not miss this opportunity to represent kashtriya Samiti in Indian politics. Initially, kashtriya Samiti did not start with a political motive; the letter on the kashtriya Samiti played a political role directly. This began when Upendra Nath Barman became the representative in the election of 1937. Kashtriya Samiti tried to implement the object of the association and sometimes tried to solve the problem of the common peoples in Jalpaiguri and north Bengal. It was a testament to his historical foresight that supporting Gandhi's party policies would pave the way for a small race with various benefits such as high-ranking jobs, educational facilities, and scheduled castes for the Kshatriya community in the future. The fifteen members from the Indian scheduled caste party sat in separate blocks of the Legislative Assembly. The initiator was Upendra Nath Barman, and the secretary was Jogendranath Mondal. Party our community's various

problems, even the cause problem of North Bengal, help rise in parliament. He was the minister of undivided Bengal from December 18, 1941, to December 31, 1943. Upendra Nath Barman was part of the 9-member cabinet formed on December 11 by the Congress, led by fazlulHaque Bose, the national party including Shaymaprasad Mukharjee and the Independence Schedule Caste Party. But when the Fozlul Haque signed the resignation letter on March 29, 1943, the 16-month cabinet was dissolved.[xx]

CONCLUSION

In the nineteenth century, Thakur PanchananBarma directly created the Education and social reform of the native state of Coochbear during the National Awakening. At a very young age, Upendra Nath Barman met with Panchanan Barma. The ideology of Rang Panchaan Barma inspired Upendra Nath Barman. Panchanan Barma made Upendra Nath Barman the successor of his social reform movement. The main social and political movement area of Panchanan Barma was Rangpur, while Upendra Nath Barman's main field of work was Jalpaiguri. Upendra Nath Barman was a well-established figure among contemporary citizens. He introduced it to the leadership in all the parliamentary politics from the municipality. Emerging from North Bengal, regional politics, joining national politics, and gaining a prominent place in the All India Leadership Gathering of the then Congress is a testament to his personality and leadership qualities. Rise and anti-Pakistan voice along with the special session of Indian National Congress with the title *"Ideal and Thinking of the kahstriyaSamiti. "*Upendranath Barman was awarded a deleted degree from North Bengal University in 2001.

Reference :

---

i Goswami, Komlesh., "*Bidroha O Andolone Uttar Banga,"* Driya Book house. Kolkata.,p-135.

ii Basu, Saraj,Op.Cit ., P-47.

iii Ibid.,p- 46.

iv Ghosh, Ananda Gopal , Barman , Girindra Nath, Das , Nilangshu Sekhar,and Roy, Nirmal Chandra, "*Britta-Bibarani(Kshatriya Samiti*

Aadibeshan – Bibaran 1910-1935", Khagendra Nath Das. Mathabhanga , Coochbehar ,2019,p- 6.

v Barman, Upendra Nath Barman, and Roy, Noni Gopal (ed), "*Rajbanshi Kshatriya Jatir Itihas*," Nond, Gopal Roy, Rajbari para, Jalpaiguri 2011,. P- 53.

vi Barman, Girindra Nath., *"Rajbanshi Kshatriya Jatir utsa* sandhane*".,* Jaydeep prokashan., Jatamari, Coochbehar., 2021.,p-38.

vii Barman, Upendra Nath Barman, and Roy, Noni Gopal (ed), *"Rajbanshi Kshatriya Jatir Itihasd.*", Nondo Gopal Roy, Jalpaiguri, 2011., 32.

viii Ibid., p-34.

ix Barman, Binoy, and Barman, Kartick, Chandra (ed), "*History and Culture of North Bengal* VOL-3", Pragatishil Prokashal, 2015, P-22.

x Barman, Upendra Nath., Ghosh, Ananda Gopal (ed)., " *Uttarbanglar Sekal o Amar Jiban Smrity".,*Sangbeden, 2015,p-220.

xi Ibid ., p-48-49.

xii Ghosh, Ananda Gopal, Barman, Girindra Nath, das, Nilangshu Sekhar,and Roy Nirmal Chandra,*Op.Cit.*, p- 4.

xiii Barman , Binay and Barman, Chandra , Kartick , *Op.Cit.,*p.29.

xiv Barman, Tushar., "*Upendra Nath Barman: Rise of a Leader from Regional to National polities 1898-1988, Karatoya: North Bengal University Journal of History, vol-8"*. N.B.U. 2015 ., P., 144.

xv Ibid., p- 61.

xvi Ibid., p-57.

xvii Barman, Upendra Nath, Barman, and Roy, Noni Gopal(ed)., *Op.Cit.,* p-54.

xviii Ghosh, *Anandagopal*, "*Manishi Panchanan Barma o Tar Andolaner Uttardhikar (A Collection Of Essays in History),"* Sangbean, B.S.Road, Malda .p-150.

xix Adhikari, Madhab. *Op.Cit.,* p -51.

xx Barman, Upendra Nath, Ghosh, Ananda Gopal (ed).,p-88.

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal Published Thrice a Year

পত্রিকা দেখুন ওয়েবসাইটে
www.ebongprantik.in

Ebong Prantik
2582 3841

Ebong Prantik
2348 487X

Published By : Ashis Roy, Chandiberiya Sarada Palli, Kestopur, Kolkata - 700 102
Ph : 9804923182, 8250595647
Email : ebongprantik@gmail.com
Website : www.ebongprantik.in

₹ 950/-